

বনফুল

রচনাবলী ০৭

বনফুল রচনাবলী

সপ্তম খণ্ড

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

সম্পাদনা :
ডঃ সরোজমোহন মিত্র
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী
সহযোগী :
শ্রীশুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ-রূপায়ণ :
শ্রীশৈলেন শীল
শ্রীসমরেশ বসু

মুদ্রাকর :
শ্রীদুলালচন্দ্র ভুঞ্যা
সুদীপ প্রিণ্টার্স
৪/১এ, সনাতন শীল লেন, কলকাতা-১২

প্রকাশক :
মুরলীধর ঘটক
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

সূচীপত্র

স্বপ্ন-সম্ভব

ব ন ফু ল

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৫৩

মূল্য তিন টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১২—১১, ৩, ৪৭

শ্রীমান সৌরেন বসু

কল্যাণীয়েষু

আমাদের স্বপ্ন যদি কোনও দিন সম্ভব হয়, তা হ'লে তা তোমাদের মত আদর্শনিষ্ঠ কর্মীর জন্যেই হবে। আমার এই ক্ষুদ্র কাব্য যদি তোমার কর্মে প্রেরণা যোগাতে পারে তা হ'লে আনন্দিত হব।

ভাগলপুর
শ্রীপঞ্চমী, ১৩৫৩

বলাইদা

যতীন কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রতিদিন খবরের কাগজ আর সে পড়িতে পারিতেছিল না। সেদিনকার কাগজটা নামাইয়া রাখিল। মনে হইল, মনুষ্যত্ব অবলুপ্ত হইয়া গেল নাকি! এই বিংশ শতাব্দীতে সমস্ত দেশ জুড়িয়া মানুষেরা যাহা করিতেছে, তাহাতে পিশাচেরাও যে লজ্জা পায়! হিন্দু আর মুসলমান··· অনেক কথাই মনে হইতেছে। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এই হিন্দু-মুসলমান এক ছিল। নানাসাহেবের প্রধান সহকারী ছিলেন আজিমুল্লা খান। বেরেলির বাহাদুর খান ঘোষণা করিয়াছিলেন, আমরা কোরবানি বন্ধ করিয়া দিব। দিল্লীর সম্রাট গো-হত্যা বন্ধ করিবার হুকুম দিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি যুদ্ধ করিয়াছিল। প্রত্যেক বিদ্রোহী বাহিনীতে মৌলভী ছিলেন, পুরোহিতও ছিলেন। মুসলমানের মহরমে হিন্দুরা যোগ দিতেন, হিন্দুর হোলিতে মুসলমানের অংশ গ্রহণ করিতে বাধিত না। দেখিতে দেখিতে কি হইয়া গেল! ইংরেজ-শাসনের মহিমায় মুসলমান সহসা আজ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা পৃথক 'নেশন'। সব মুসলমানেরা হয় নাই, নিরক্ষর অসহায় কৃষকের দল বোঝেও না, 'নেশন' বলিতে কি বুঝায়। যতীনের কয়েকটা ছবি মনে পড়িল। পলাশীর প্রান্তর, ক্লাইব ও মীরজাফর। উভয়ে উভয়ের পরম বন্ধু। তাহার ঠিক এক শত বৎসর পরে সিপাহী-বিদ্রোহের অবসানে ক্যাপ্টেন রবার্ট্‌স্‌ লিখিতেছেন, পাজি মুসলমানদের ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও যে, ইংরেজরাই এ দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা। নবাবেরা ফাঁসিকাঠে ঝুলিতেছেন। শাহাজাদাদের সারি সারি দাঁড় করাইয়া গুলি করা হইতেছে। ফতেপুরের পাঠান-বস্তি আক্রান্ত, ব্রিটিশের গুলিতে দলে দলে নিরীহ মুসলমান মরিতেছে, ব্রিটিশ সৈন্য দুই হাতে মুসলমানের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতেছে। নির্বাসনে দিল্লীর বাদশাহ ভাঙা খাটিয়ায় শুইয়া অন্তিম নিশ্বাস ফেলিতেছেন।

···তাহার পর এক শত বৎসর এখনও অতীত হয় নাই, ইংরেজের সঙ্গে মুসলমানের বন্ধুত্ব আবার জমিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ এখন মুসলমান মাইনরিটির স্বার্থরক্ষা করিতে ব্যাকুল। মুসলমানের দুঃখে চার্চিলের চক্ষে নিদ্রা নাই! কিন্তু দেশের সকলে এ কথা জানে না, এ কথার তাৎপর্য কে তাহাদের বুঝাইয়া বলিবে? এখানেও নাকি দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। বাতাসে বিষ সঞ্চারিত হইতেছে। সাধারণ মানুষ এ সবের প্রকৃত অর্থ জানে না। একটু আগে মেজদি আসিয়াছিলেন, দেশের কথা ভাবিবার সামর্থ্যই তাঁহার নাই। নিজের অতি-তুচ্ছ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার তুচ্ছতম খুঁটিনাটিই তাঁহার নিকট একমাত্র সত্য। নিজের কথাই সাতকাহন বলিলেন। তাঁহার অনেক দুঃখ। যতীনের মনে হইল, আমার দুঃখও কিছু কম নয়। মেজদি নিজের দুঃখের কথা পাঁচজনকে বলিয়া মনের ভার হালকা করিতে পারেন, আমি তাহা পারি না। আমার দুঃখের স্বরূপ কেহ বুঝিবে না। আমি যে স্বপ্নলোক সৃষ্টি করিয়া তাহাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি, রূঢ় বাস্তবের আঘাতে তাহা বার বার ভাঙিয়া যাইতেছে বলিয়া যে কষ্ট পাইতেছি, তাহা কে বুঝিবে, কাহাকে বুঝাইব? মেজদির কথাগুলাই যতীনের মনে পড়িতে লাগিল। শুধু মেজদির নয়, মধ্যবিত্ত বাঙালী-জীবনের গ্লানিকর ছবির টুকরাগুলা আবর্জনার মত তাহার স্বপ্ন-লোককে ম্লান করিয়া তুলিতেছে। সে স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই সৃজন করিতে পারে না, কিন্তু বাস্তবের আঘাতে সে স্বপ্নও অক্ষুণ্ণ থাকিতে পাইতেছে না। হঠাৎ মনে পড়িল, সমর নোয়াখালি চলিয়া গিয়াছে। রুমিকে আজ দেখিতে আসিবে। রুমির এখনও বিবাহ হয় নাই বলিয়া সেজদার চিন্তার অন্ত নাই। বহু চেষ্টা করিয়া তিনি একটা পাত্র জুটাইয়া আনিয়াছেন। এখানেও দাঙ্গা বাধিবে নাকি? সহসা তাহার বাল্যবন্ধু মহীউদ্দিনের কথা মনে পড়িল। সেও কি বিশ্বাস করে, সে আলাদা 'নেশন'? মেজদি বলিতেছিলেন, মহীউদ্দিনের বউটি নাকি ভারি লক্ষ্মী। মেজদি সকলের খবর রাখেন। নিজের

পাড়ার তো বটেই, অপর পাড়ারও। কাহার বউ কবে পলাইয়া গিয়াছে, কোন্ মেয়ে বুড়া বাপকে আলুভাতে ভাত খাওয়াইয়া আপিসে বিদায় করিয়া দিয়া দুপুরে বন্ধুবান্ধব ডাকিয়া বাড়িতে আড্ডা জমায়, কাহার ছেলে চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে, কে কাহার গরুকে খোঁয়াড়ে পাঠাইয়াছে, কুকুর-কামড়ানোর ভাল দৈব ঔষধ কাহার জানা আছে··· যতীনের স্বপ্নলোকে আবার মেজদি ঢুকিয়া পড়িলেন। যতীন প্রাণপণে তবু মনটাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিল।

ভাবিতে লাগিল, আমি এখন যে জগতে আছি, যে জগতে থাকিতে চাই, সেখানে মেজদির এই সব কথা অতিশয় বেমানান। অথচ সকলের চক্ষে মেজদিই বাস্তব, আমার চক্ষেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিলেন, কিন্তু এখন মনে হইতেছে ঠিক উল্টা, মেজদিই অবাস্তব অস্বাভাবিক। ওই সদ্য-ফোটা অপরাজিতার পাপড়িতে বসিয়া যে নীল পরীটা দোল খাইতেছিল, যাহার অতি সূক্ষ্ম ওড়নাখানা প্রচ্ছন্ন কম্পনে নীল পরীর মনের ইঙ্গিতময় ভাব প্রকাশ করিতেছিল, আমার চোখে এখন ওই নীল পরীটাই বাস্তব, মেজদি নয়। নীল পরীর অতি-সূক্ষ্ম ওড়নাখানাকে বাস্তববাদীরা মাকড়সার জাল বলিয়া ভুল করিবে। পরীরা যে ওড়না কাঁপাইয়া মনের কথা প্রকাশ করে, এ কথাও কেহ বিশ্বাস করিবে না জানি ; কিন্তু ইহা সত্য। যে সোনার নৌকায় চড়িয়া নীল পরী অপরাজিতার সবুজ কুঞ্জে ভিড়িয়াছে, সেই সোনার নৌকাটাই এ জগতে মানায় ভাল ; মেজদির নাকী সুরের কান্নাটা নয়। নৌকাখানাই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছিলাম। সোনার অথচ স্বচ্ছ, ক্ষণে ক্ষণে আকৃতি পরিবর্তন করে। একটু আগেই ঠিক নৌকার মত ছিল, কিন্তু যেই আমি লক্ষ্য করিতে শুরু করিয়াছি অমনই টের পাইয়া গিয়াছে, আত্মগোপন করিতে চায়, দেখিতে দেখিতে লম্বা রেখার মত হইয়া গেল। আমার কাছে এখন কিন্তু লুকানো শক্ত। অপরাজিতার পাপড়িতে দোল খাইতে খাইতে ওড়না কাঁপাইয়া নীল পরী ইঙ্গিতে সব কথা আমার কাছে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। এখন আর আমাকে

ফাঁকি দেওয়া চলিবে না। নীল পরী এখন আমার পক্ষে। আগে যখন বাস্তববাদী ছিলাম, তখন আমিও ওটাকে এক টুকরা রোদ বলিয়া জানিতাম। এখন বুঝিয়াছি, সেটা ভুল। আসলে ওটা সোনার তরী, নীল পরী উহাতে চড়িয়া পাড়ি দেয় অরূপলোক হইতে রূপলোকে, সত্য হইতে স্বপ্নে, অসীম আকাশে অদৃশ্য তরঙ্গের শিখরে শিখরে। আর আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা আশ্বাসজনক ঘটনা—নীল পরী ইঙ্গিতে আমাকে জানাইয়াছে, অপ্রত্যাশিত পথে সে একদিন আসিবে, আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবে, লইয়া যাইবে সেই রহস্যলোকে—যেখানে জ্যোৎস্না ফুল হইয়া ফোটে, ফুলেরা প্রজাপতির মত উড়িয়া বেড়ায়, যেখানে সমস্ত সৌন্দর্যের উৎসমুখে চাপা আছে একটি রহস্যময় মণি—যে মণি কেহ খুলিতে পারে না, যাহা আপনি মাঝে মাঝে একটু একটু করিয়া খোলে আর নব নব সৌন্দর্যের প্লাবনে নিখিল বিশ্ব ভরিয়া যায়। ঠিক তাহার পাশেই পাতালপুরীর সুড়ঙ্গ আছে, অদ্ভুত অন্ধকার সুড়ঙ্গ, কোথায় কতদূরে চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না—অতল অশেষ। এই সব কথা নীল পরী আমাকে বলিয়াছে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার—নীল পরী নীলও নয়, পরীও নয়। আজ নীল পরী সাজিয়া আসিয়াছে, কাল আসিয়াছিল কাঠঠোকরার বেশে—মাথায় ঝুঁটি, লম্বা সরু ঠোঁট, গলার কাছটা বাদামী রঙের, পিঠে ডানায় সাদা-কালো ডোরা ডোরা, ক্ষণে ক্ষণে মাথার ঝুঁটিটা ফর্‌র্‌ করিয়া খুলিয়া যায়। ওই যে ভ্রমর, ওই যে টিকটিকি—উহারাও হয়তো নীল পরীর ছদ্মরূপ। যে বেশেই আসুক, আমি উহাকে চিনি, উহাকে ঘিরিয়াই নূতন জগৎ গড়িয়াছি, সেই জগৎটাই আমার কাছে সত্য, মেজদি নয়।··· আবার মেজদি আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মূর্তিটা আবার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতেছে, তাঁহার কথা শুনিতে পাইতেছি।

আজ একটু চলতে গেলেই হাঁপ ধরছে বড্ড, বুকের ভেতরটা ধকধক করছে, হাতুড়ি দিয়ে পিটছে যেন কেউ। আর এই বাঁ দিকের শিরটা এমন টেনে ধরেছে, যেন বঁড়শিতে গেঁথেছে। লোকের কাছে

না ব'লেও পারি না, সবার কাছে বলতে আবার লজ্জাও করে, সবাই বিশ্বাস করবে কেন, নিজের ঘরের লোকই করে না।···

মেজদি নাকটা ঈষৎ কুঁচকাইয়া চশমাটা ঠিক করিয়া লইলেন। এটি তাঁহার মুদ্রাদোষ। চশমা ঠিক করিয়া আবার শুরু করিলেন—

উনি মনে করেন, বুড়ো মাগীর হিস্টিরিয়া হয়েছে। হয়তো হিস্টিরিয়াই।—একটু হাসিলেন, তাহার পর একটু থামিয়া আবার বলিলেন, যে নামই দাও তোমরা, কষ্ট তো হয়। এই দেখ না, বাঁ দিকের রগটা সমানে দপদপ ক'রে চলেছে, অথচ হাত দিয়ে দেখ ঠাণ্ডা হিম, সমস্ত বাঁ অঙ্গটাই ঠাণ্ডা। আশ্চর্য, নয়? যখন যেদিকটার দপদপানি বাড়ে, অমনই সেদিকটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।···

মেজদির ফোকলা দাঁতের হাসি বড় মিষ্ট। কিন্তু এই মিষ্টতা এখন মনে আর সে মাধুর্য সঞ্চার করিতে পারে না, আগে যেমন করিত। এই মেজদির সঙ্গে আমাদের কোন রক্তের সম্পর্ক নাই। উনি পাড়ার সকলেরই মেজদি। ছেলেবেলায় এই মেজদির কাছে কত আগ্রহে কত রূপকথাই না শুনিয়াছি! কিরণমালার গল্পটা কত রঙে রাঙাইয়াই না বলিয়াছিলেন, এখনও একটু একটু মনে পড়ে। এখন মেজদিকে একটা অদ্ভুত অস্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। সবুজ ক্ষেতের মাঝখানে কিম্ভুতকিমাকার কি একটা যেন! খড়ের তৈয়ারি দেহ, লম্বা হাত পা, গায়ে বেমানান একটা জামা, মাথায় কালো হাঁড়ি, তাহার উপর চুন দিয়া চোখ মুখ নাক আঁকা। পাখিরা দেখিয়া ভয় পায়। শুধু মেজদি নয়, সকলেরই এই অবস্থা। হাসি পায়, দুঃখও হয়। আর একটা কথা ভাবিয়া আশ্চর্যও লাগে। বাড়ির মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ আমি—আমার চেয়েও ছোট অবশ্য আছে একজন, আমাদের একমাত্র ছোট বোন রুমি —কিন্তু আমিই কেবল দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছি। আমিই কেবল বুঝিয়াছি, বাহিরের এই এত বাহ্যাড়ম্বর, এই দেশব্যাপী দাঙ্গা কলহ, রুমির রোমান্স, বড়দার আভিজাত্য, মেজদার অহঙ্কার, সেজদার 'ঠাকুর-ঘর, পাড়ার শৈলেনদার কমিউনিজ্‌ম প্রতিটি লোকের নানা আজগুবি

আচরণ, যাহা বাস্তববাদীদের বিচারে বাস্তবিক, বস্তুত তাহার প্রত্যেকটিই অলীক। বাস্তবিক কেবল নীল পরী—যে নীল নয়, পরী নয়, যে যখন-যেমন-খুশি-বেশে দেখা দিতে পারে এবং দেয়।

কিন্তু মেজদিরা থামিবেন না··· আবার মেজদির কথাগুলা শুনিতে পাইতেছি।

পাশের ঘরে ভোর থেকে লুচি ভাজা হচ্ছে, পেঁয়াজ ভাজা হচ্ছে, চা হচ্ছে, গন্ধ পাচ্ছি ; কিন্তু বেল পাকলে কাকের কি বল, আমি আমার ঘুঁটের উনুন ধরিয়ে চাটুকু ক'রে নিলাম। চা করতে গিয়ে দেখি, চিনি নেই। তোমার বউদি কাল যে লক্ষ্মীপুজোর বাতাসা প্রসাদ দিয়েছিল, তাই ছিল ছুখানা—তাই দিয়েই করলাম, বেশ লাগল।···

মেজদি আবার হাসিলেন। আবার নাক কুঁচকাইয়া চশমাটা ঠিক করিয়া লইলেন। ভাবিয়াছিলাম, প্রত্যুত্তর না করিলে মেজদি বুঝি চলিয়া যাইবেন। কিন্তু মেজদি প্রত্যাশাভরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিতে হইল, চিনির অভাবে বাতাসা দিয়ে চা খেতে হ'ল ? চিনি আনিয়ে রাখেন নি কেন ? কন্‌ট্রোলে তো চিনি দিচ্ছে আজকাল।

তা তো দিচ্ছে। আমাকে কে আর এনে দেবে, বল ? নিজেকে গিয়েই তো আনতে হবে দোকান থেকে। যা ভিড়, দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ফিরে এলাম কাল।

কেন আপনার নাতিরা ?

নাতিরা ! তবেই হয়েছে। কি বললে জান আমার বড় নাতি ? আমাদের কল থেকে জল নিও না, বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে বুড়ী ডাইনী—এই সব কথা ভদ্দরলোকের ছেলেরা বলে কখনও তার ঠাকুমাকে ? শুনেছ কখনও ? ঘরের কথা কত আর বলি ! ছেলে এই সব বলছে, আর তার মা ফিকফিক ক'রে হাসছে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে। দেখেছ কখনও এমন কাণ্ড ?

মেজদির কথায় বিস্ময় খেদ ব্যঙ্গ যুগপৎ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ঘোষাল মশায়ের উচিত নাতিদের শাসন করা।

তা করলে ভাবনা কি ছিল, উনি কিছু বলবেন না।

ইহার পরই মেজদির সুর বদলাইয়া গেল। ঘোষাল মশায়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া তিনি ওকালতি শুরু করিলেন।

কি ক'রেই বা বলবেন বল ভাই। শোকাতাপা মানুষ। বুড়ো বয়সে অত বড় ঘা খাবার পর কি আর শাসন করতে ইচ্ছে হয় কাউকে···

মেজদি ঘাড় ফিরাইয়া বোধ হয় উদ্গত অশ্রুটাই গোপন করিতে চাহিলেন। পুত্রশোকে অশ্রুপাত করা এমন কিছু লজ্জাজনক ব্যাপার নয়, কিন্তু মেজদি কিছুদিন হইতে অশ্রুটা গোপন করিতেছেন, কেন জানি না। বোধ হয় লোকের সহানুভূতি এড়াইবার জন্য। লোকের সহানুভূতি অনেক সময় বড় কষ্টদায়ক। কিছুদিন পূর্বে মেজদির উপযুক্ত পুত্রটি মারা গিয়াছে। বড় চাকরি করিত। বিধবা পুত্রবধূ এবং তাহার একপাল ছেলেমেয়ে লইয়া প্রদ্যোত ঘোষাল বৃদ্ধবয়সে সত্যই বড় বিপন্ন। তিনি নাতি-নাতনীদের শাসন করিতে পারেন না। পুত্রবধূকে কিছু বলা তাঁহার পক্ষে নাকি আরও কঠিন। তাহার বিধবা-মূর্তি দেখিলেই তিনি এমন অবসন্ন হইয়া পড়েন যে, তাহাকে কিছুই বলিতে পারেন না। তাহার সমস্ত আবদার সহ্য করিতে হয়। সে শাশুড়ীকে অপমান করে, ডাইনী বলে, তাঁহাকে আলাদা হেঁসেল করিতে হইয়াছে, তাহার বাক্যের জ্বালায় মেজদির বাড়িতে টেঁকাও দুষ্কর, পথে পথে তিনি ঘুরিয়া বেড়ান, পাড়ার লোকে বলে—বউটা বিধবা হইয়া যেন সকলের মাথা কিনিয়াছে। ঘোষাল মহাশয় কিন্তু চুপ করিয়া থাকেন। প্রাণ ধরিয়া কিছু বলিতে পারেন না। শুধু তাই নয়, যাহা কিছু উপার্জন করেন সব ওই পুত্রবধূকেই আনিয়া দেন। মেজদিকে বলেন, পয়সা নেড়ে-চেড়ে তবু যদি ভুলে থাকে থাক্— আহা!

ইহার পর মেজদি যে প্রসঙ্গটি তুলিয়াছিলেন, তাহা প্রবলভাবে

যতীনের আবার মনে পড়িয়া গেল। যাইবার পূর্বে মেজদি বলিয়া গেলেন, যাই নীলিদের বাড়ি, দেখি সেখানে কতদূর কি হ'ল, আত্মীয়-স্বজনরা তো কেউ আসবে না শুনছি। তুমি যাবে তো ?...

আজ নীলার বিয়ে। সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া নীলা পাড়ার একটি বয়াটে ছোকরা প্রবালকে বিবাহ করিতেছে। আত্মীয়-স্বজনরা এতদিন নীলার সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন, কেহ তাহার সুশিক্ষার বা বিবাহের ব্যবস্থা করেন নাই, সকলের সঙ্গে যথেচ্ছ মিশিবার অবারিত সুযোগও দিয়াছিলেন। এখন সকলের মনে ধর্মভাব জাগিয়াছে। সগোত্রে বিবাহ তাঁহারা কিছুতেই হইতে দিবেন না। অতি-দূর-সম্পর্কের বিনয়বাবু বর্মা হইতে প্রচুর অর্থোপার্জন করিয়া ভাগ্যে কিছুদিন পূর্বে ফিরিয়াছেন, তিনিই দাঁড়াইয়া বিবাহ দেওয়াইবেন। তাঁহার মতে ভ্রূণ-হত্যা করাটা বোকামি। বাঙালী হিন্দুরা যে জীবন-যুদ্ধে হটিয়া যাইতেছে, তাহার একটা কারণ—তাঁহার মতে—ভদ্র হিন্দুরা ক্রমশ সংখ্যায় কমিয়া যাইতেছে। সংখ্যা বাড়িবে কি করিয়া ? অধিকাংশ ভদ্র হিন্দু-নারীর জীবনই নিষ্ফল। যে সব শিক্ষিত ভদ্রলোক সমাজকে জীবনযুদ্ধের উপযোগী সমর্থ সন্তান দিতে পারেন, বিলাস ও স্বার্থপরতার কবলে পড়িয়া তাঁহারা বিলাতী উপায়ে জন্মনিরোধ করিতেছেন, কুমারীদের বিবাহ হইতেছে না, বিধবারা তো আছেই। ইহাদের মধ্যে দুই-একটা যদি জীবনের প্রাবল্যে সমাজের বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া ফলবতী হইতে চায়, মন্দ কি ? বিনয়বাবুর ইহাই মত। নীলাকে তিনি সাহায্য করিবেন। আজই বিবাহ। যতীন নীলার কথাই ভাবিতে লাগিল—মনের কি অদ্ভুত ক্ষমতা! কত দিনের ঘটনা দুই মিনিটে ভাবিয়া ফেলিতে পারে। নীলা! নীলার রাজরাণী হইবার যোগ্যতা ছিল, কিন্তু কাঙালিনীর মত সে সবার দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছে। আমার কাছেও আসিয়াছিল, আমিও তাহাকে লইয়া কবিতা লিখিয়াছি। শুধু আমি নয়, অনেকেই লিখিয়াছে। হয়তো বিনয়বাবুও। আমি শুধু কবিতা লিখিয়াই ক্ষান্ত

হই নাই, তাহাকে বিবাহ করিতেও চাহিয়াছিলাম। যদিও সে অন্য জাত, তবু বউদিদিদের দিয়া বাবার মত করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। বড় বউদিদি বাবাকে কাশীতে পত্র লিখিয়াছিলেন। বাবা মত দিলেন না। তবু আমি নীলাকে চাহিয়াছিলাম··· যাক সে কথা··· একটা কথাই কেবল মনে হইতেছে, শেষ পর্যন্ত প্রবালের মত ছেলেকে ফাঁদে ফেলিয়া নীলাকে মাতৃত্ব অর্জন করিতে হইল! জীবনের প্রবাহকে তো কেহ রোধ করিতে পারে না। তুমি যদি অস্বাভাবিক আইনের বাঁধ তুলিয়া তাহাকে আটকাইতে যাও, বারম্বার সে বাঁধ ভাঙিয়া যাইবে। মানুষ নিজেকে ভুলাইতে গিয়া একটা কথা ভুলিয়া যায়—প্রকৃতি কোন বঞ্চনাকেই কখনও প্রশ্রয় দেয় না। তাহার নিয়ম অমোঘ, পরিণাম অব্যর্থ। আত্মবঞ্চনা শেষ পর্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠে।··· আত্মবঞ্চনার কথায় নিভাননীর কথা মনে পড়িতেছে। বিধবা নিভাননী। বছর দশেকের একটি ছেলে লইয়া সে খুড়ার আশ্রয়ে থাকিত।. কিছুদিন পরে কানাঘুষা শোনা গেল, সে নাকি সন্তানসম্ভবা। সমস্ত চিহ্নও সর্বাঙ্গে ক্রমশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। নিভাননী নির্বিকার। নির্বিকার থাকিয়া কিন্তু লোকের মুখ বন্ধ করা যায় না। খুড়া মহাশয় বিচলিত হইলেন। খুড়ীমার মারফৎ সকলের সন্দেহটা নিভাননীর গোচর করিলেন। নিভাননী সোজা অস্বীকার করিল। বলিল, আমার পেটে মাংস বাড়িতেছে। কেন বাড়িতেছে, বলিতে পারি না। ডাক্তার ডাকা হইল। নিভাননী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই ডাক্তার ডাকাইল। ডাক্তার যখন সত্য কথা বলিলেন, তখন, নিভাননী হাসিয়া উঠিল। ডাক্তারের মুখের উপরই বলিল, আপনি কিছু জানেন না। খুড়া মহাশয় বিপন্ন হইলেন। তিনি ছাপোষা গৃহস্থ লোক। ঘরে কয়েকটি বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। একটা কেলেঙ্কারি হইয়া গেলে তিনি অকূল সমুদ্রে পড়িয়া যাইবেন। তিনি নিভাননীকে দূর করিয়া দিলেন। নিভাননী আমাদের বাড়ির পাশের গোয়াল-ঘরটাতে আসিয়া আশ্রয় লইল। কাঁদিতে কাঁদিতে নয়, হাসিতে হাসিতে। অবুঝ শিশুর অসঙ্গত

আচরণে বয়স্ক ব্যক্তি যে হাসি হাসে, নিভাননীর হাসিটা সেইরূপ। প্রথম হইতেই নিভাননী ব্যাপারটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল। কোন সমালোচনা, কোন গালাগালি গায়ে মাখে নাই। কেন সে এরূপ করিয়াছিল, জানি না। নিজেই সে সম্ভবত ব্যাপারটাকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার দশ বৎসরের ছেলে বিশুর পক্ষে ব্যাপারটা মর্মান্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রথমটা সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। মোটরে চড়িয়া বড় ডাক্তার আসিয়া ঘরে খিল বন্ধ করিয়া মাকে যখন পরীক্ষা করিয়া গেল, তখন সে অবাক হইল। মায়ের কি হইয়াছে? সকলে বলিল, মায়ের অসুখ করিয়াছে। তাহার পর দাছ যখন মাকে দূর করিয়া দিলেন, মাকে একটা স্যাঁতসেঁতে প'ড়ো গোয়ালে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইল, তখন বিশু কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। মাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার অসুখ করেছে, তবু তোমায় দাছ তাড়িয়ে দিলে কেন মা? নিভাননী উত্তর দিল, তোমার দাছর মাথা খারাপ। তাঁহার কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল, তাহাতেই দিন চলিতে লাগিল। বিশু যেমন স্কুলে যাইতেছিল, যাইতে লাগিল। স্কুলেরই একটি ছেলে আসল কারণটা একদিন তাহার নিকট ব্যক্ত করিল। বলিল, তোর মাকে কেন তাড়িয়ে দিয়েছে জানিস? তোর মায়ের ছেলে হবে। বিস্মিত বিশু স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিভাননীকে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা মা, অবুদা আজ বলছিল যে, তোমার নাকি ছেলে হবে, তাই দাছ তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ মা, সত্যি? নিভাননী ছেলেকে ধমক দিল, না, মিছে কথা। ওসব ফাজিল ছেলের সঙ্গে মিশতে যাস কেন তুই?··· যথাসময়ে নিভাননী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। পাড়ার লোকে দেখিতে আসিল। নিভাননীর লজ্জা নাই। সে যেন নিজেই সর্বাপেক্ষা বেশি বিস্মিত হইয়াছে। সকলের সমক্ষেই সে ছুই হাত জোড় করিয়া সগ্যোজাত শিশুটাকে প্রণাম করিল। তাহার পর সকলকে বলিল, এঁকে তোমরাও প্রণাম কর, ইনি যীশুখ্রীষ্ট। পাড়ার লোকেরা মুচকি হাসিয়া গা-টেপাটেপি করিতে করিতে চলিয়া

গেল। নিভাননী আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়া হয়তো আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু বিশু পারে নাই। একটা চিত্র মনে পড়িতেছে। স্কুলের সমস্ত ছেলেরা হাততালি দিতে দিতে সমস্বরে বলিতেছে, বিশুর মায়ের ছেলে হয়েছে—ছুয়ো, ছুয়ো···। বিপন্ন বিশু কোথায় যে মুখ লুকাইবে, ভাবিয়া পাইতেছে না। নিভাননী পাগল নয়, পাগল হয়ও নাই। কাশীতে গিয়া সে সুখেই বাস করিতেছে শুনিয়াছি।···

এই পর্যন্ত ভাবিয়া যতীনের সহসা মনে হইল, এমনভাবে একটানা ভাবিয়া চলিয়াছি কেন? যাহা ভাবিতেছি, কাগজ কলম লইয়া তাহা লিখিয়া ফেলিলেই তো হয়। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হইল, কত লিখিব? জীবনের প্রতি মুহূর্তে যাহা ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে এবং ঘটিবে, তাহার আলেখ্য আঁকিতে পারি, এত রঙ তো আমার নাই। এ নাটক যে মহা-নাটক! অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এ নাটকের দৃশ্যপট, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত সমস্ত কিছুই ইহার পাত্র-পাত্রী। ইহা কি লিখিয়া শেষ করা যায়?···

বিস্ফারিত নয়নে সে খোলা জানালার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। বিস্তৃত নীলাকাশে সাদা মেঘের অপরূপ আস্তরণ। ওখানে কি অভিনয় হইতেছে? কে উহারা!··· একটা অদৃশ্য নাটকের অদ্ভুত অভিনয় তাহার চোখের সম্মুখে মূর্ত হইতে লাগিল। এতক্ষণ বুঝিতে পারে নাই যে, সে নিজেও একজন অভিনেতা—অজ্ঞাতসারে অভিনয় করিতেছিল। এইবার সচেতনভাবে করিতে লাগিল।

গুনগুন করিয়া একটা ভ্রমর ঘরে ঢুকিল।

যতীন। এস নীল পরী।

ভ্রমর। [বিস্মিত] নীল পরী! সে আবার কি? এতকাল আমাকে ভ্রমর, অলি এই সব নামে ডাকতে, হঠাৎ আজ নূতন নাম কেন?

যতীন। পুরোনো জিনিস বড় একঘেয়ে। নূতন নাম দিয়ে পুরাতনকে আধুনিক করবার চেষ্টা করছি।

ভ্রমর। নাম বদলালেই আধুনিক হয় নাকি? আমার নাম বদলাবার দরকার নেই, আমি এমনিই আধুনিক, কতই বা আমার বয়স, একটিমাত্র বসন্ত তো উপভোগ করেছি।

বাহিরে কুড়ুরুক কুড়ুরুক শব্দে একটা পাখি ডাকিয়া উঠিল।

ভ্রমর। ওই শোন, আমাকে ডাকছে, আমি চললাম।

যতীন। প্রায়ই ওর ডাক শোনা যায়, কে বল তো?

ভ্রমর। পাখি।

যতীন। তা তো জানি। কি পাখি?

ভ্রমর। ওর বেশি আমিও জানি না। তোমরাই তো সবাইকে নাম দাও। তুমিই বল না, কি ওর নাম?

যতীন। ওর সঙ্গে তোমার খুব বন্ধুত্ব নাকি?

ভ্রমর। বন্ধুত্ব কাকে বল? ও কথারও মানে বুঝি না। তবে ওকে ভাল লাগে—ছোট্ট সবুজ পাখিটি, কিন্তু গলায় কেমন সুর!

যতীন। আলাপও নেই?

ভ্রমর। না।

যতীন। তবে যে বললে, ডাকছে তোমাকে।

ভ্রমর। (যা আমার ভাল লাগে, তাই আমাকে ডাকে, তার কাছেই আমি যাই।) আলাপ থাকবার দরকার কি! তোমরা কথা ব'লে বড় সময় নষ্ট কর।

ইলেক্‌ট্রিক স্বইচের ব্র্যাকেটের আড়াল হইতে একটি টিকটিকি বাহির হইয়া আসিল এবং উদ্‌গ্রীব হইয়া উৎসুক দৃষ্টিতে ভ্রমরটির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল।

যতীন। আমরা কথা কই, তোমরা গুনগুন কর। হঠাৎ এলে কেন বল দেখি?

ভ্রমর। তোমাদের খবর নিতে।

যতীন। কি খবর?

ভ্রমর। তোমাকে দেখতে পেলাম, এই তো একটা খবর।

চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে লাগিল।

টিকটিকি। [নীরব ভাষায়, যতীনকে] ভোমরাটাকে কথায়-বার্তায় অন্যমনস্ক ক'রে আমার দিকটায় আনতে পার একটু যদি—

যতীন। কেন, কি করবে?

টিকটিকি। খপ ক'রে ধরব, তারপর চিবিয়ে খাব।

তাহার টুকটুকে লাল জিবটা বার দুই বাহির করিল।

যতীন। [স্বগত] কি ভয়ানক! [প্রকাশ্যে] ও আমার অতিথি, ওকে নাই বা খেলে।

টিকটিকি। আমিও তো তোমার অতিথি, আমার খাবার ব্যবস্থা কর তা হ'লে।

যতীন। আমার ঘরে এত জিনিস আছে, খাও না।

টিকটিকি। আমি পাঁউরুটিও খাই না, সিগারেটও খাই না, পোকা খাই। তোমার ঘরে কদিন থেকে আলো জ্বলছে না, পোকাও আসছে না, অনাহারে আছি।

ভ্রমর তাহার কথা শুনিতে পাইল কি না, বোঝা গেল না। অন্তত তদনুসারে সে কিছু করিল না। ঘরের চতুর্দিকে গুনগুন করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। তাকের উপর একটা 'টাইম্‌পিস' ছিল, সেইটাই

সম্ভবত তাহার কৌতূহল বেশি উদ্রিক্ত করিয়াছিল, সেইটাকেই সে বারম্বার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।

টিকটিকি। ভোমরার প্রতি তোমার যে বেশি পক্ষপাতিত্ব, তা আমি আগে থেকেই জানি। অতিথি-সৎকারের বড়াই করলে কিনা, তাই বাজিয়ে দেখলাম একবার।

যতীন। হ্যাঁ, সত্যিই তাই, কেন বল তো?

টিকটিকি। তোমাদের মতে ও যে সুন্দর, [সশ্লেষে] মানুষের বিশেষত্বই তো ওই। পক্ষপাতিত্ব। তারা সাম্যের ভান করে, কিন্তু কিছুতেই সম-দৃষ্টি হতে পারে না।

যতীন। তোমাদের কাছে সুন্দর কুৎসিত ব'লে কিছু নেই নাকি?

টিকটিকি। আমাদের কাছে যা প্রয়োজনীয়, তাই সুন্দর। ওই ভোমরাটা আমার চোখেও সুন্দর, কিন্তু খাদ্য-হিসাবে। আমার সঙ্গিনী—কোথায় গেল সে—তাকে দেখলে তুমি ঘৃণায় আঁতকে উঠবে। আমার চোখে কিন্তু সে রমণীয়। তোমার এই কাঠের ব্র্যাকেটটিও বেশ সুন্দর, এর ফাঁকে বেশ নিরাপদে ঘুমুতে পারি। প্রয়োজনের বাইরে তোমরা কেন যে আর এক দল সুন্দর কুৎসিত সৃষ্টি ক'রে অকারণ পক্ষপাতিত্ব কর, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

অশরীরী ফ্রয়েড প্রবেশ করিলেন।

অশরীরী ফ্রয়েড। মানুষের সৌন্দর্যবোধের মূলেও প্রজনন-স্পৃহা বর্তমান।

টিকটিকি। [সবিস্ময়ে] তাই নাকি?

যতীন। তা হ'লে টিকটিকির আমাদের মত সৌন্দর্যবোধ নেই কেন?

অশরীরী ফ্রয়েড। ওর প্রজনন-স্পৃহা লুকিয়ে রাখবার দরকার হয়

না। সভ্য মানুষই তা লুকিয়ে রাখে এবং রূপান্তরিত ক'রে প্রকাশ করে সেটা বহু বাসনায়, বহু ভঙ্গীতে, বহু বৈচিত্র্যে—কখনও জ্ঞাতসারে, কখনও অজ্ঞাতসারে।

যতীনের তর্ক করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু কিছু বলিবার পূর্বেই অশরীরী ফ্রয়েড অন্তর্হিত হইলেন। লোকটাকে কাঠখোট্টা বলিয়া মনে হইল। ভ্রমর উড়িয়া টিকটিকির সামনে আসিল এবং তাহার লোলুপ চোখের সামনে বেশ একটু দূরত্ব রক্ষা করিয়া বৃত্তাকারে ঘুরিতে লাগিল। ভাবটা যেন—ধর না দেখি, ধর না দেখি! মনে হইতে লাগিল, সে যেন যতীনের সহিত টিকটিকির কথাবার্তা সব শুনিয়াছে।

ভ্রমর। [যতীনকে] ভারি ভীতু লোক তো তুমি। কি ব'লে ওই ঘৃণ্য টিকটিকিটাকে আমার জন্যে অনুরোধ করলে! ওদের কি আমরা গ্রাহ্য করি নাকি ?

যতীন। কর না ?

ভ্রমর। বাঃ, দেখছ না, আমাদের ডানা আছে যে।

বাহিরে আবার কুড়ুরুক কুড়ুরুক শব্দ হইল।

ভ্রমর। আমি চললাম।

বোঁ করিয়া বাহির হইয়া গেল। যতীনের মনে হইল, টিকটিকির দেহ হইতে একটা রক্তবর্ণ দন্তুর ছায়া ডানা মেলিয়া ভ্রমরের পশ্চাদ্ধাবন করিল। যতীন দেখিল, কায়াবান টিকটিকি বেশ হাসিমুখে বসিয়া আছে।

টিকটিকি। ডানার গুমরে কিন্তু একটা কথা ভুলে গেল বেচারী। ওই ডানা-ওয়ালাদেরই রোজ আমরা খাই।

যতীন। সেটা ওরা আলো দেখে তন্ময় হয়ে পড়ে ব'লে। ওতে তোমাদের কৃতিত্ব তেমন নেই।

টিকটিকি। তোমরা যখন আলো জ্বালতে শেখ নি, তখনও আমরা পোকা ধ'রেই খেতাম। অনাহারে থাকি নি কখনও। তবে তোমাদের আলোতে আমাদের সুবিধে হয়েছে তা অস্বীকার করছি না। আলো জ্বাললেই ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ে ওরা। আচ্ছা, আলো জ্বালছ না কেন আজকাল ?

যতীন। ডাক্তারের মানা। রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, তাই তিনি আলো জ্বালতে বারণ করেছেন।

টিকটিকি। এ আবার কি বেয়াড়া চিকিৎসা! আলো না জ্বেলে ঘুম হচ্ছে ?

যতীন। না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে যতীন চমকাইয়া উঠিল। ইলেক্‌ট্রিক টেবিল-ল্যাম্পটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে। শ্বেতপ্রস্তর-নির্মিতা নগ্না তরুণীটির দিকে যতীন সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। উত্থিত বাহুর উপর ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বটা দীপ্তিহীন ম্রিয়মাণ। তরুণীটির চোখের দৃষ্টিও বেদনাময়, কিন্তু অগ্নি-গর্ভ।

যতীন। তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে ?

প্রস্তর-তরুণী। হ্যাঁ।

যতীন। কেন ?

প্রস্তর-তরুণী। বাইরে থেকে মনে হয়, আমি তোমার রাতের অন্ধকারকে আলোকিত করবার ভূমিকায় অবতীর্ণ। কিন্তু আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমার ঊর্ধ্বোত্থিত বাহুতে যে প্রদীপ দিয়েছ, তা তোমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় জ্বলে নেবে। সুইচ তোমাদের হাতে। আমি সামান্য জড়, [সহসা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে] জড় ক'রে রেখেছ আমাকে।

যতীন। কে বললে, তুমি জড় ? আমি জানি, তোমার দেহের প্রতি অণু-পরমাণুতে বহ্নিকণা আবর্তমান, তুমি নিজেকে জড় ব'লে ভাবছ কেন ?

প্রস্তর-তরুণী। তোমার ভাষার ছটায় বহ্নিদীপ্তি আছে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের সম্বন্ধে যখন কথা বল তখন সেটা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তাও জানি। আমাদের মধ্যে যে বহ্নি আছে তা তোমাদেরই প্রদীপ্ত বর্ণনায় শুনেছি, নিজের মধ্যে তা অনুভব করবার সুযোগ দাও নি কখনও। রক্ষা করেছ, বন্দনা করেছ, দলিত করেছ, সত্যিকার স্বাধীনতা দাও নি ।

টিকটিকি। ঠিক ঠিক ঠিক।

চতুর্দিক কেমন যেন ঝাপসা হইয়া আসিল। সেই স্বল্পান্ধকারে অশরীরী সীতা, অহল্যা, দ্রৌপদী ও জোয়ান অব আর্ক প্রবেশ করিলেন ।

সীতা। আমি আজও পাতালে আছি।

অহল্যা। আমারও পাষাণত্ব ঘোচে নি এখনও। গৌতমের দাসী ইন্দ্রের অনুগৃহীতা পৌরাণিক কল্পনাটাই রামচন্দ্রের পদস্পর্শে সঞ্জীবিত হয়েছিল, আমি নয়।

দ্রৌপদী। কৌরবের রাজসভায় দুঃশাসন আমার কেশাকর্ষণ ক'রে উলঙ্গ করবার চেষ্টা করেছিল, দুর্যোধন উরু দেখিয়েছিল, খলখল ক'রে হেসে উঠেছিল কর্ণ, তবু আমি আত্মরক্ষা করতে পারি নি। আমি যে অপমানিতা, তা প্রমাণ করবার জন্যে ধর্মরাজের সঙ্গে তর্ক করতে হয়েছে। প্রতিশোধকামনায় কাঁদতে হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের কাছে, শরণাপন্ন হতে হয়েছে অর্জুনের, উত্তেজিত করতে হয়েছে ভীমকে। কুরুক্ষেত্রের সমরানলে যা প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল, তা পৌরুষের অহঙ্কৃত বহ্নি। তখন বুঝি নি, কিন্তু এখন জেনেছি, আসলে তা নারীর আত্মসম্মানের

চিতা। দুঃশাসনের তপ্ত-শোণিতে বেণী বন্ধন করেছিলাম, কিন্তু দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করেছিলেন ভীম, আমি নয়। আমার অন্তরের জ্বালা প্রদীপ্ত করেছে পুরুষকে, আমি শুধু হাহাকার করেছি।

জোয়ান অব আর্ক। তা ছাড়া আমরা আর কিছু পারি না বোধ হয়। আমি যুদ্ধে নেবেছিলাম, কিন্তু ওরা আমায় পুড়িয়ে মেরে ফেললে। এখন মনে হয়, ওদেরই আগুন আছে, আমাদের আছে বোধ হয় শুধু দেহটা। পুরুষ সৈনিকদের মনে আমার জীবন্ত যৌবনের স্পর্শ যে আগুন জ্বালিয়েছিল, তা আমার আগুন নয়, আমার প্রভাব। আমার শীতল প্রস্তরমূর্তিটা আজও সে প্রভাব বিকীর্ণ করছে ক্ষীণভাবে। আমরা কেউ নই। আমরা পুরুষদের মনে যে ভাব জাগাই, তাই আমাদের পরিচয়।

পথ হাতড়াইতে হাতড়াইতে স্খলিত-চরণা গান্ধারী প্রবেশ করিলেন।

গান্ধারী। অন্ধকার, চতুর্দিক অন্ধকার···চোখের কাপড়টা সরাতে পারছি না···মনের সামনেও অন্ধকার যবনিকা দুলছে···

যতীন। কিন্তু আপনারা যে স্বাতন্ত্র্য কামনা করছেন, তা পেলেই কি সুখী হতেন? বলুন না, কি চান আপনারা?

কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে সকলে চলিয়া গেলেন। এতক্ষণ যে পাখির করুণ কণ্ঠস্বর অস্পষ্টভাবে উক্ত দৃশ্যের পটভূমিকা রচনা করিতেছিল, তাহা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। ফটিক জল—ফটিক জল—ফটিক জল। মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহা বাতায়ন-পথে প্রবেশ করিল

যতীন। ফটিক জল কি জিনিস বল তো? দেখেছ কখনও?

পাখির স্বর। চোখে দেখি নি, স্বপ্নে দেখেছি।

যতীন। কি রকম শুনি?

পাখির সুর। স্বচ্ছ কঠিন পাথরের বুকের ভিতর টলমল করছে তরল জ্যোতির বিন্দু।

যতীন। তাই চাও তুমি?

পাখির সুর। অন্য কিছুতে তৃপ্তি নেই।

টিকটিকি। ওসব কবিত্ব অনেক শুনেছি দাদা। আমি নিজে তোমায় পুকুরের জল খেতে দেখেছি। সত্যি কথা হচ্ছে, পিপাসার সময় যে কোনও জলই ফটিক জল, ক্ষুধার সময় যে কোনও খাদ্যই সুখাদ্য।

পাখির সুর। সুখাদ্য নয়, খাদ্য। ওই সুই তো স্বপ্ন সৃজন করে। তাই তো মাটি ছেড়ে ডানা মেলে আকাশে উড়েছি।

টিকটিকি। [সশ্লেষে] ঠিক ঠিক।

প্রস্তর-তরুণীর দীর্ঘনিশ্বাস আবার শোনা গেল। যতীন তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল এবং নির্নিমেষ হইয়া রহিল। তাহার মনে হইল, প্রস্তর ভেদ করিয়া অশরীরী নীলা বাহির হইয়া আসিতেছে। যতীন সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। পাখির সুর ধীরে ধীরে বাতায়ন-পথে বাহির হইয়া গেল।

নীলা। যতীনদা, আমি এসেছি।

যতীন। নীলা!

নীলা চুপ করিয়া রহিল। তাহার চোখের দৃষ্টিটা শুধু বাঙ্ময় হইয়া উঠিল। তাহা যেন নীরবে বলিল, হ্যাঁ, ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, আমি নীলাই।

যতীন। তোমার আজ বিয়ে না?

নীলা। হ্যাঁ।

যতীন। তবে এলে যে এখন?

নীলা। ক্ষমা চাইতে এসেছি।

যতীন। [সবিস্ময়ে] কিসের ক্ষমা!

নীলা। এতদিন তোমাকে প্রলুব্ধ করেছি ব'লে।

যতীন অধীর হইয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু নীলা তাহাকে থামাইয়া দিল।

নীলা। প্রতিবাদ ক'রো না, তোমার চেয়ে আমি ভাল জানি, আমাকে বলতে দাও। হ্যাঁ, প্রলুব্ধই করেছি,— ইচ্ছে ক'রে নানা ছলে তোমাকে আমি প্রলুব্ধ করেছি এতদিন। কিন্তু এইবার সব শেষ। হাসি কথা রূপ যৌবনের মায়ালোক সৃষ্টি ক'রে তোমাকে আকুল ক'রে তুলেছিল যে নীলা, তার মরণ ঘনিয়ে এসেছে এবার। মৃত্যুর নিবিড় অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে যাবার আগে তাই সে ক্ষমা চাইতে এসেছে। তোমাকে ঠকিয়েছিলাম। তোমার মুগ্ধ কল্পনায় যে লোলুপ আশা মূর্ত ক'রে তুলেছিলাম, তা পূর্ণ করবার সামর্থ্য আমার নেই। কোনদিনই ছিল না। রাঙতা-মোড়া যে জিনিসটা দেখে তুমি প্রলুব্ধ হয়েছিলে, তা মাটির ঢেলা, সন্দেশ নয়। আমি আলো নয়, আলেয়া। [হাসিয়া] অদ্ভুত মনে হচ্ছে, না? মরীচিকা ক্ষমা চাইছে পথ-ভ্রান্ত পথিকের কাছে! কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি মরীচিকাই— এই আমার স্বরূপ—আমি অন্যরকম হতে পারতাম না। ক্ষমা চাইবার অধিকার আমার আছে, কারণ আমি নিজেকে জেনেছি এবং অকপটে স্বীকার করেছি সব। আমি যা করেছি, তা অনিবার্য ছিল আমার পক্ষে। আমায় ক্ষমা কর তুমি।

যতীন। ক্ষমা করবার কোনও প্রশ্ন তো ওঠে না নীলা। আমিও তো তোমাকে ভোলাতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, দুজনে মিলে এক অপূর্ব স্বর্গলোক সৃষ্টি করব এই মাটির পৃথিবীতে। কল্পনা

করেছিলাম, আমাদের নন্দন-কাননে যে পারিজাত ফুটবে তার পাপড়িতে থাকবে তোমার রূপ, পরাগে থাকবে আমার সৌরভ— যে সঙ্গীত মূর্ত হয়ে উঠবে আমি হব তার কথা, তুমি হবে তার সুর। তুমি যদি আসতে, এ স্বর্গ সম্ভব ক'রে তুলতে পারতাম। তুমিই তো এলে না। তুমি যদি আসতে, সকলের অমতেও আমি বিয়ে করতাম তোমায়।

নীলা। আসি নি তার কারণ নিজেকে আমি চিনি। আমাকে বিয়ে করলে তোমার বাবা তোমায় ত্যাজ্যপুত্র করতেন। আমি জানি, আমাকে নিয়ে দারিদ্র্য বরণ করতেও আপত্তি ছিল না তোমার, কিন্তু নিজের নিঃস্বতায় ভয় পেয়ে গেলাম। আমার কি আছে যে তোমাকে দেব, তোমার স্বর্গসৃষ্টির কণামাত্র উপকরণও যে আমার মধ্যে নেই। যৌবনের জোয়ার যখন নেবে যাবে তখন শিথিল-পেশী এই দেহপিণ্ডটার মধ্যে কাদা আর আবর্জনা ছাড়া যে আর কিছুই থাকবে না। দারিদ্র্যের মধ্যে সেই ক্লিন্ন গ্লানি নিয়ে তুমি যে স্বর্গসৃষ্টি করতে পারবে না তা আমি জানতাম, তাই আসি নি।

যতীন। কিন্তু প্রবালের কাছে তো গেছ, সেও তো দরিদ্র?

নীলা। প্রবাল স্বর্গসৃষ্টি করতে চায় না, আমাকে চায়—মানে, আমার এই দেহটার বেশি আর কিছু কাম্য নেই তার। আমিও আমার দেহটার বেশি আর কিছু নই। সে যা চেয়েছে তাই পাবে, ঠকবে না।

যতীন। কিন্তু নীলা সত্যিই কি তুমি দেহটা ছাড়া আর কিছু নও? তুমি যা এতক্ষণ বললে, তা কি একটা মাংসপিণ্ডের উক্তি?

নীলার ঠোঁট দুইটা সহসা কাঁপিয়া উঠিল। যতীনের ভয় হইল, চোখের কোণে এইবার জল দেখা দিবে বুঝি। কিন্তু জলের বদলে আগুন দেখা দিল।

নীলা। মাংসপিণ্ডের একটা বক্তব্য থাকতে পারে বইকি। তোমার মুখেই একদিন শুনেছিলাম যে, জড়ের মধ্যেও বিদ্যুৎ আছে,

তারও প্রতি পরমাণুতে সৌরজগতের বহ্ন্যুৎসব বর্তমান। মাংসপিণ্ডও বিদ্যুৎ-পিণ্ড, তার বক্তব্যও চমকপ্রদ হওয়া অসম্ভব নয়। আমি কিন্তু চমকপ্রদ কিছু করতে আসি নি, ক্ষমা চাইতে এসেছি। তুমি ক্ষমা করেছ, এইটুকু জানতে পারলেই চ'লে যাব।

যতীন। ক্ষমা করার প্রশ্ন উঠছে কি ক'রে, তাই আমি বুঝতে পারছি না। তোমাকে আমি চেয়েছিলাম, পাই নি। তুমি যাকে বেছে নিয়েছ, সে যে কিসে তোমার যোগ্য, তাও আমার বুদ্ধির অগম্য। আমি একটা প্রহেলিকার মধ্যে দিশাহারা হয়ে আছি, ক্ষমা করার কোনও সঙ্গতি তো আবিষ্কার করতে পারছি না। তুমি সহজ ভাষায় আমাকে বল, কেন তুমি আমাকে চাও নি, কেন তুমি সকলের দ্বারে দ্বারে রূপ-যৌবনের পণ্যপসরা নিয়ে ঘুরে বেড়ালে, কেনই বা অবশেষে আত্মসমর্পণ করলে প্রবালের কাছে ?

টিকটিকি। [জনান্তিকে, ফিসফিস করিয়া] এস এস, এইবার এস। ভেঙে দাও হাঁড়িটা হাটের মাঝখানে।

বিরাট একটা মুণ্ড বাতায়ন-পথে প্রবেশ করিল। আকর্ণবিস্তৃত মুখ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তীক্ষ্ণ দাঁত, লালায়িত রসনা, দুই কশ বাহিয়া লালা ঝরিতেছে, চক্ষুর দৃষ্টি লোলুপ। নীলা তাহাকে দেখিয়া ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল।

যতীন। [চমকাইয়া] কে তুমি ?

আগন্তুক মুণ্ড। আমি লোভ, [নীলাকে দেখাইয়া] ওর লোভ। আমিই ওকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছি। হি-হি-হি-হি···শাড়ি গাড়ি গয়না···হি-হি-হি···বড় চাকরি, ব্যাঙ্কে মোটা টাকা···রুই কাতলা গাঁথবার চেষ্টায় ছিল···হি-হি···পারলে না, টোপ গিললে না কেউ··· তুমি গিয়েছিলে, কিন্তু তোমার বাবা ত্যাজ্যপুত্র করবেন বলাতে ভেস্তে গেল সব··· বঁড়শি খুলে নিয়ে অন্য ঘাটে ছিপ ফেলতে হ'ল আবার··· হি-হি-হি···

যতীন। প্রবাল তো রুইও নয়, কাতলাও নয়!

লোভ। মাছই নয়—কাদা। সেখানে গিয়েছিলেন নাচতে—হি-হি…পিছলে গেলেন, এঁটেল মাটির চটচটে কাদা মাখামাখি হয়ে গেল সর্বাঙ্গে, লুকোবার আর উপায় রইল না, ধরা প'ড়ে গেল। আহা! বড় সাধ ছিল—শাড়ি গাড়ি গয়না—তিন সেট গয়না—ব্যাঙ্কে মোটা টাকা—প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি—গেটে দারোয়ান থাকবে… হি-হি—

লালায়িত রসনা বাহির করিয়া উপরের ও নীচের ঠোঁট বীভৎসভাবে চাটিতে লাগিল। মুখে অদ্ভুত হাসি। যতীন নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। লোভ ধীরে ধীরে বাতায়ন-পথে বাহির হইয়া গেল। যতীন নীলার দিকে ফিরিয়া দেখিল, তাহার চোখে মুখে আগুন জ্বলিতেছে।

নীলা। শুনলে তো, তোমার উপর আস্থা স্থাপন করতে পারি নি ব'লে তোমাকে ত্যাগ করেছিলাম।

যতীন। বুঝতে পারলাম না।

নীলা। জীবনে আমার যা কাম্য, তা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা ছিল তোমার বাবার টাকায়। পিতৃধনবঞ্চিত তোমার উপর আমার কোন ভরসা ছিল না।

যতীন। কেন, তুমি কি মনে কর, আমি কিছু রোজগার করতে পারব না?

নীলা। পারতে, যদি ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মাতে। তখন তোমার এম. এ. ডিগ্রীর বাজার-দর ছিল, এখন কিছুই নেই। ক্ষুদিরাম যেদিন মজঃফরপুরে বোমা ফেললে, সেইদিন থেকেই শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর কপালে ফাটল ধরল—এ কথা তো তোমার মুখেই শুনেছি। সুতরাং তোমার উপর নির্ভর করব কোন্ আশায়?

যতীন। চাকরি পাব না তা ঠিক, করবারও ইচ্ছে নেই, কিন্তু

এমন অনেক স্বাধীন ব্যবসা আছে, যা ঠিকমত করতে পারলে অনেক উপার্জন করা যায়।

নীলা। সেটা অনিশ্চিত। অত সবুর আমার সইত না।

যতীন। শাড়ি-গয়নাটাই তোমার কাছে বড় হ'ল নীলা? ভালবাসাটা তোমার কাছে কিছু নয়?

নীলা। [সবিস্ময়ে] কে বললে, আমি তোমায় ভালবেসেছিলাম? আমি তো তোমায় ভালবাসি নি, আমি তোমায় ভুলিয়েছিলাম।

যতীন। কিন্তু বেশ মনে পড়ছে, তুমি নিজের মুখে একদিন বলেছিলে যে, আমায় ভালবাস।

নীলা। তখনই তোমার সন্দেহ করা উচিত ছিল। ভালবাসার কথা মুখ ফুটে বলে না কেউ কখনও।

যতীন। কিন্তু আমি যে তোমায় ভালবেসেছিলাম, সেটা তো তোমার অজ্ঞাত ছিল না, তার কি কোনও মূল্য নেই?

নীলা। মূল্য আছে, কিন্তু নিছক ভালবাসাকে মূল্য দিতে হ'লে অন্তত ডজন খানেক ভালবাসাকে মূল্য দিতে হয়। ঘেয়ো কুকুরের পিছু পিছু একপাল মাছি যেমন ভনভন ক'রে ওড়ে, রূপসী যুবতীর পিছু পিছু উড়ে বেড়ায় তেমনই একপাল ভালবাসা। তার মধ্যে কোন্‌টা স্বর্গীয় কোন্‌টা পার্থিব তা বিচার করবার প্রবৃত্তিও থাকে না, সামর্থ্যও থাকে না। আর্থিক মাপকাঠি দিয়েই মাপতে হয় তাদের।

টিকটিকি। ঠিক ঠিক। ঘেয়ো কুকুরের উপমাটা কিন্তু ঠিক হ'ল না। বলা উচিত ছিল, কার্তিক মাসে কুক্কুরী যেমন বলিষ্ঠতম প্রণয়ীর কাছেই আত্মসমর্পণ করে, আমিও তেমনই মালা দিতে চেয়েছিলাম শ্রেষ্ঠ ধনীর গলায়, কারণ বর্তমান যুগে অর্থই শক্তি। ভাল ক'রে গুছিয়ে বল।

যতীন। [নীলাকে] ছি ছি, তোমারও ওই মত নাকি?

নীলা। [নির্বিকারভাবে] সন্দেহ করছ কেন?

যতীন। ভালবাসার কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু ঐশ্বর্যই

একমাত্র কাম্য তোমার জীবনে? উচ্চতর আর কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই?

নীলা। আছে কি না জানি না। ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, মনের ভিতর কোন উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা আছে কি না তা অনুসন্ধান করবার অবসর পাই নি এখনও।

যতীন। কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে ঐশ্বর্যই চাই? সাধারণ খাদ্য-পানীয়ে তা মিটবে না?

নীলা। না। আমি যে অসাধারণ। তুমিই তো একদিন বলেছিলে, আমি কোহিনুর। যেখানে সেখানে কি কোহিনুর মানায়? তার স্থান স্বর্ণমুকুটের মাঝখানে, পচা আঁস্তাকুড়ে নয়।

যতীন। আঁস্তাকুড়ের কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করতে এসেছ কেন তবে?

নীলা। আমরা যে মায়ের জাত, আঘাত পেয়ে কেউ যখন 'উহুহু' ক'রে ওঠে, তখন আমরা থাকতে পারি না, ছুটে যাই। এ ক্ষেত্রে আরও বিশেষ ক'রে এসেছি, কারণ আঘাতের হেতু আমিই। তাই ক্ষমা চাইছি। তোমার গলায় মালা দিতে পারি নি ব'লে তোমার ব্যথাতেও হাত বুলিয়ে দিতে পারব না? সে অধিকার যে সব মেয়েরই জন্মগত অধিকার।

যতীন। [হাসিয়া] আঁস্তাকুড়ে এসে কেন অপবিত্র করছ নিজেকে। আমার কোনও আঘাত লাগে নি, যাও তুমি।

নীলা। সত্যি লাগে নি? [হাসিয়া] তোমাদের শিশুত্ব কোনকালে ঘোচে না, আশ্চর্য! একটা অদ্ভুতরকম অবাস্তব লোকে বাস কর তোমরা। কাব্যের ক্লিওপেট্রাকে নিয়ে তোমরা উন্মত্ত, কিন্তু বাস্তবজীবনে তার সামান্য ছোঁয়াচটুকু পর্যন্ত সইতে পার না।

যতীন। পারি কি না, তা জানবার সুযোগ তো তোমার হ'ল না। সাহস ক'রে যদি আসতে, আসল পরিচয় পেতে পারতে হয়তো।

নীলা। বরাবর অমনই ভদ্র পোশাকী ভাষায় আহ্বান করেছ ব'লেই আরও যেতে পারি নি। ভয় হয়েছে, বাইরের ওই রঙিন লেফাফাটার ভিতরে হয়তো শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নেই।

সহসা সমস্ত অবলুপ্ত হইয়া গেল। অপূর্ব দিব্য আলোকে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বাতায়ন-পথে যতীন দেখিতে পাইল, অদূরে মহাগিরি রৈবতক। দেবার্চনা সমাপন করিয়া বসুদেব-দুহিতা সুভদ্রা গিরি প্রদক্ষিণ করিতেছেন। অকস্মাৎ তিনি সচকিত হইয়া, ঘাড় ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন…দূরাগত অশ্বক্ষুরধ্বনি পার্বত্য শান্তি বিঘ্নিত করিতেছে…এক অশ্ববাহিত রথ প্রচণ্ড বেগে রৈবতক অভিমুখে আসিতেছে…দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল…সুবর্ণ-কিঙ্কিণী-জালালঙ্কৃত প্রজ্বলিত হুতাশনকল্প দিব্যরথ…রথে বসিয়া আছেন মহাবীর অর্জুন…ক্ষাত্রবীর্যের মূর্ত প্রতীক…চোখের দৃষ্টি নির্ভয় একাগ্র… পরিধানে কবচ, বর্ম, অঙ্গুলিত্রাণ। আশায় আশঙ্কায় আনন্দে উত্তেজনায় সুভদ্রা শিহরিয়া উঠিলেন; কিন্তু চীৎকার করিলেন না, পলায়নও করিলেন না…মুহূর্তমধ্যে রথ নিকটবর্তী হইল…অর্জুন রথ হইতে নামিয়া সুভদ্রাকে রথে তুলিয়া বায়ুবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলেন…অশ্ব-ক্ষুরোত্থিত ধূলিজালের দিকে যতীন সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল… তাহার পর একটা কোলাহল শোনা গেল…ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ আস্ফালন করিতেছেন… তাহাও ক্রমশ থামিয়া গেল…দিব্য আলোক অন্তর্হিত হইল…। যতীন দেখিল, নীলা তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

নীলা। [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া] যদি আমাকে সবলে অধিকার ক'রে অভিমন্যুজননীর মর্যাদা দিতে পারতে, তা হ'লে এ দুর্দশা হ'ত না আমার। বীরভোগ্যা আমরা, তোমাদের অক্ষমতায় আজ বর্বরভোগ্যা হয়েছি। আমার উপর রাগ ক'রো না যতীনদা, আমার ব্যথাটা বোঝবার চেষ্টা কর। চললাম।…

অশরীরী নীলা অন্তর্হিত হইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে ব্যক্তিটি প্রবেশ করিলেন, তাঁহার মূর্তি ভয়ঙ্কর। আকৃতি দীর্ঘ, বর্ণ কৃষ্ণ, সমস্ত মুখমণ্ডল কৃষ্ণ কুঞ্চিত রোমে সমাচ্ছন্ন। চক্ষু দুইটি অতিশয় প্রদীপ্ত। মনে হইতেছে, দুইটি হীরকখণ্ড যেন কালো মখমলের আবেষ্টনীতে জ্বলিতেছে। আগন্তুকই প্রথমে কথা কহিলেন।

আগন্তুক। আমি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। পাছে ভুল বোঝ, তাই আমাকে আসতে হ'ল। অর্জুন যা করেছিল, তা সেকালে নিন্দনীয় ছিল না। শোলার টোপর প'রে বিয়ে করা এখন যেমন তোমাদের বর-ধর্ম, নারী হরণ ক'রে বিয়ে করাটা তেমনই সেকালের বীর-ধর্ম ছিল। সুভদ্রা-হরণে প্রলুব্ধ হবার আগে অর্জুন হতে হবে, এই কথাটা মনে করিয়ে দিতেই আমি এসেছিলাম।

অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

টিকটিকি। [হাসিয়া] লোকটা ভারি বেরসিক তো, সব ভেস্তে দিয়ে গেল !

যতীন। তুমি কি ভেবেছিলে, আমি নারীহরণ করতে চাই !

টিকটিকি। লুণ্ঠনের সপক্ষে একটা যুক্তি পেয়ে মনে মনে একটু খুশি হয়ে উঠেছিলে বইকি। তোমাদের ওই যে এক মহদ্দোষ, পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ।

যতীন। ওটা দোষ নয়, গুণ। মনুষ্যত্বের লক্ষণ। নিছক পশুর মৌখিক লজ্জা থাকে না।

টিকটিকি। থাকবার দরকার কি, তাও তো বুঝি না।

অশরীরী ডারবিন আবির্ভূত হইলেন।

ডারবিন। মনুষ্যনামধেয় পশুর জীবনযুদ্ধে ওইগুলোই দামী উপকরণ। লজ্জা, ক্ষমা, অহিংসা অর্থহীন মানস-বিলাস নয়, নিপুণ যোদ্ধার উৎকৃষ্ট অস্ত্র ওগুলো। নখদন্তেরই বিবর্তিত রূপ।

এ বিষয়ে যতীনের মন বহু দিন হইতেই প্রশ্নাকুল ছিল। সে আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিল না।

যতীন। আমার একটা কথার জবাব দেবেন ?

ডারবিন। কি বল ?

টিকটিক। [অর্ধস্বগত] ক্রমাগত দেড়ে লোকের আমদানি হতে লাগল। স'রে পড়া যাক।

টিকটিকি ধীরে ধীরে ব্র্যাকেটের অন্তরালে আত্মগোপন করিল।

যতীন। লজ্জা, ক্ষমা, অহিংসা এই সব বিবর্তিত অস্ত্র নিয়ে কি মানুষ শেষ পর্যন্ত জীবন-যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে ?

ডারবিন। [হাসিয়া] তা ঠিক জানি না। মানে, জীবনটা যে কতদূর বিস্তৃত, দেহের সীমা ছাড়িয়েও তার অস্তিত্ব আছে কি না, থাকলেও কতদূর আছে, তা এখনও ঠিক করতে পারি নি আমি। তবে এইটুকু শুধু বলতে পারি, সব মানুষ একজাতের নয়, সব অস্ত্রও সকলের জন্য নয়। মনুষ্যত্বেরও নানা স্তর আছে, প্রত্যেক স্তরের আকাঙ্ক্ষা-আদর্শও ভিন্ন, অস্ত্র-শস্ত্রও ভিন্ন হতে বাধ্য। তা ছাড়া অস্ত্র পেলেই তো ব্যবহার করা যায় না। তার জন্যে শিক্ষা চাই, সাধনা চাই, স্বাভাবিক প্রবণতাও চাই। বোলতা তার হুলকে কাজে লাগায়, তুমি সে হুল হাতে পেলেও তেমন ভাবে ব্যবহার করতে পার না, তোমার বন্দুকও বোলতার কাছে অর্থহীন। মানুষদের মধ্যেও ঠিক তেমনই। অহিংসা একজনের কাছে শক্তি, আর একজনের কাছে অক্ষমতা।

বাতায়ন-পথে একটা দমকা হাওয়া ঢুকিল। ডারবিন চলিয়া গেলেন। খবরের কাগজটা টেবিল হইতে উড়িয়া গেল। ফুলের গন্ধে সমস্ত ঘর ভরিয়া উঠিল। যতীন খবরের কাগজটা তুলিয়া দেখিল, বলিষ্ঠ ঝাঁকড়া-চুল-ওয়ালা একটি দৈত্য ফুটফুটে সুন্দরী একটি মেয়েকে কাঁধে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মেয়েটিকে কাঁধ হইতে নামাইয়া দৈত্যটা মাথা নাড়িয়া এক ঝটকায় ঝাঁকড়া চুলগুলো চোখমুখ হইতে সরাইয়া ফেলিল। তাহার চক্ষু দুইটি হাস্যদীপ্ত, তাহা হইতে শিশুসুলভ সরলতা যেন উপচাইয়া পড়িতেছে। আকৃতিতে দৈত্য হইলেও, প্রকৃতিতে সে যেন ওই ছোট মেয়েটিরই সঙ্গী।

দৈত্য। যাঃ চ'লে—এ কোথায় এসে পড়লে? বললাম, চল্ মাঠের মাঝখান দিয়ে হু-হু ক'রে ছুটে গঙ্গার চর পেরিয়ে, ধানের ক্ষেতে ঢেউ তুলে, পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওধারে গিয়ে খবর নিয়ে আসি। ঘরের কোণে ঢুকলি কেন?

মেয়েটি। দাঁড়াও না, খুঁজে নিই এখানটা। শুনলে তো, এই ঘরেই ঢুকেছিল।

দৈত্য। নে তা হ'লে চটপট। উফ্—দমবন্ধ হয়ে আসছে এখানে।

হাত দিয়া নিজেকে বাতাস করিতে লাগিল।

মেয়েটি। [যতীনকে] ভোমরা এসেছিল এখানে?

যতীন। এসেছিল একটু আগে। এখন তো নেই।

মেয়েটি। কোথা গেল বলতে পার?

যতীন। ওই জানলা দিয়ে তো বেরিয়ে গেল। ভোমরাকে খুঁজছ কেন?

মেয়েটি। ফুল ডেকেছে তাকে। অনেকক্ষণ থেকে খুঁজছি। জামগাছের কোটরে তার বাসা, সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখি, বেরিয়ে

গেছে। মাঠের মাঝে বাবলা-বুড়ী দাঁড়িয়ে ছিল, সে বললে, এই দিকে উড়ে এসেছে। তারপর দেখা হ'ল গঙ্গাফড়িঙের সঙ্গে, তোমার বাগানে রঙ্গনগাছের উপর ব'সে আছে, সে বললে, ঢুকেছে তোমার ঘরে। তুমি বলছ, জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। [সন্দিগ্ধভাবে] কোথাও লুকিয়ে রাখ নি তো ?

যতীন। না।

মেয়েটি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে যতীনের দিকে চাহিয়া রহিল। মেয়েটির দিকে চকিতে একবার চাহিয়া দৈত্যটাও ঘাড় ফিরাইয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে যতীনের দিকে চাহিল।

দৈত্য। [মেয়েটিকে] চেয়ার টেবিল খাট বিছানা উলটে দিই ? দেখবি খুঁজে ? জিজ্ঞেস ক'রে সময় নষ্ট করবার দরকার কি ? দেব ?

মেয়েটি। [ধমক দিয়া] না। ভদ্রলোকের বাড়িতে গুণ্ডামি করতে হবে না। তা ছাড়া ওলটপালট ক'রে দিলেই কি খোঁজা হয় ?

দৈত্য সঙ্গে সঙ্গে ভালমানুষের মত মুখ ফিরাইয়া হাত দিয়া নিজেকে আবার বাতাস করিতে লাগিল।

মেয়েটি। [যতীনকে] কিছু মনে ক'রো না তুমি, ওর স্বভাবই ওই রকম দুরন্তপনা করা।

যতীন। ও কে ?

মেয়েটি। ও ? ও আমার বাহন। [হাসিয়া] ওর অনেক নাম।

যতীন সবিস্ময়ে দৈত্যটার দিকে চাহিয়া রহিল। মুখে কিছু বলিতে না পারিলেও তাহার মনের কথা চোখের দৃষ্টিতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দৈত্যও তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। দৈত্যের মনের ভাবও তাহার

চোখের দৃষ্টিতে মূর্তি পরিগ্রহ করিল। টিকটিকি সন্তর্পণে ব্র্যাকেটের তলা হইতে বাহির হইয়া আসিল।

যতীনের মনের ভাব। কি আশ্চর্য, তোমার মত একটা লোক এমন সুন্দরী মেয়ের বাহন !

দৈত্যের মনের ভাব। ওকে বহন করবার একমাত্র অধিকার আমারই আছে।

যতীনের মনের ভাব। কেন ?

দৈত্যের মনের ভাব। কারণ আমার শক্তি আছে। শক্তিমানই সৌন্দর্যকে বহন করবার অধিকারী। আমি ওকে বহন করি, রক্ষা করি, প্রচার করি। আমি পবন, ও সুরভি।

টিকটিকি। ঠিক ঠিক ঠিক। পবনদেব, আমার প্রতি একটু দয়া করবে ? ক্ষিধেয় ম'রে যাচ্ছি, দাও না কিছু খাবার যোগাড় ক'রে—তুমি ইচ্ছে করলেই পার।

টিকটিকির উক্তিটা ভিখারীর আবেদনের মত শুনাইল। ধনী যেমন দরিদ্রকে পয়সা ছুঁড়িয়া দেয়, পবন ঠিক তেমনই ঔদাসীন্যভরে বাহির হইতে একটা ছোট কীট উড়াইয়া আনিয়া টিকটিকির মুখে ফেলিয়া দিল। টিকটিকি লুব্ধ আগ্রহে সেটা চিবাইয়া খাইতে লাগিল।

সুরভি। এখানে যখন ভোমরা নেই, তখন চল আমরা যাই। খুঁজে বার করতেই হবে তাকে তাড়াতাড়ি। বেলা তো শেষ হয়ে এল, ফুল বেচারী কতক্ষণ আর অপেক্ষা করবে, সন্ধ্যে পর্যন্ত তো তার মেয়াদ।

পবন। চল।

উভয়ে চলিয়া গেল। যতীনের মনও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া গেল অতীতলোকে।··· জতুগৃহে আগুন লাগিয়াছে। সুড়ঙ্গপথে জননীসহ

পঞ্চপাণ্ডব চলিয়াছেন। সুড়ঙ্গপথ অন্ধকার উপলাকীর্ণ। ভীম ব্যতীত আর কেহই সে বন্ধুর পথে চলিতে পারিতেছেন না, মুহুর্মুহু আর সকলেরই পদস্খলন হইতেছে। রাত্রি-জাগরণে সকলেই অবসন্ন। কিন্তু দুর্যোধনের চরেরা চতুর্দিকে ঘুরিতেছে, বিলম্বে সর্বনাশ ঘটিবে। মহাবলপরক্রান্ত ভীম তখন মাতাকে স্কন্ধদেশে এবং নকুল-সহদেবকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, তাহার পর যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের হস্তদ্বয় ধরিয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন।··· যতীন মুগ্ধ-বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ইনিই পবননন্দন ভীম, যে পবন সুরভিকে বহন করিবার অধিকারী···যে সুরভি··· হঠাৎ ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজিয়া উঠিল। যতীনের মন মুহূর্তে বর্তমানের পটভূমিকায় ফিরিয়া আসিল।

অ্যালার্ম। চল চল চল চল চল চল···

যতীন উঠিয়া অ্যালার্মটা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘড়িকে প্রশ্ন করিল।

যতীন। কি বলছ, কোথায় যাব ?

ঘড়ি। কোথা যাবে, তা তুমিই জান। আমাকে মনে করিয়ে দিতে বলেছিলে, মনে করিয়ে দিলাম।

যতীন। আমার তো কোথাও যাওয়ার কথা ছিল না, লিখতে বসার কথা ছিল।

ঘড়ি। কোন কিছু করা মানেই—চলা।

যতীন। তোমার ঐ ভাষা তো শুনি নি কোনদিন এর আগে !

ঘড়ি। নতুন কান পেয়েছ আজ। শুধু কান নয়, চোখও।

ধীরে ধীরে ঘড়িটা একটা মানুষের মুখের মত হইয়া গেল। অদ্ভুত সে মুখ! সীমাবদ্ধ, কিন্তু অসীম সম্ভাবনাপূর্ণ। ললাটে যেন অনন্ত মহাকাশের ইঙ্গিত, দৃষ্টিতে অসংখ্য সূর্যের আভাস, ওষ্ঠাধরে অভাবনীয় ভাবের আকুতি. রসনাতে অগণিত বাণীর আগ্রহ। তাঁহার সুদূরপ্রসারী

দৃষ্টি যতীনের মুখের উপর নিবদ্ধ হইতেই যতীন বুঝিতে পারিল, দেবতার আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

যতীন। [সসম্ভ্রমে] কে আপনি ?

দেবতা। আমি মহাকাল। অভিনব শ্রবণশক্তি পেয়েছ, একটা কথা শোন। আদর্শকে স্বপ্নে নিবদ্ধ না রেখে বাস্তবে মূর্ত কর। যে স্বপ্নলোকে স্বার্থপরের মত তুমি একা বিচরণ করছ, তার দ্বার খুলে দাও। সকলে সেখানে প্রবেশ করুক, তোমার আদর্শ সকলের আদর্শ হোক, চাওয়া-পাওয়ার ব্যবধান ঘুচে যাক। তবেই তোমার বিদ্রোহ সার্থক।

যতীন। আমি কি বিদ্রোহী ? জানতাম না তো।

দেবতা। নিশ্চয়ই, বিদ্রোহী বইকি। বিদ্রোহী নানা জাতের হয়। বস্তুত প্রত্যেক মানুষই বিদ্রোহী, প্রত্যেক মানুষই নিজের পারিপার্শ্বিককে ছাড়িয়ে মাথা তুলতে চেষ্টা করছে। ওই দেখ…

যতীন প্রথমটা কিছুই দেখিতে পাইল না। চোখের সম্মুখে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নাই। সূচীভেদ্য অন্ধকার। একটু পরে মনে হইল, খানিকটা অন্ধকার যেন নড়িতেছে। সবল একটা অন্ধকার-পিণ্ড যেন গুঁড়ি মারিয়া অগ্রসর হইতেছে। সে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। একটু পরে কিন্তু বুঝিতে পারিল এবং বুঝিতে পারিয়া আরও বিস্মিত হইল। যাহাকে ইনি বিদ্রোহী বলিয়া দেখাইয়া দিলেন, সে একটা চোর। অন্ধকারে গুড়ি মারিয়া বসিয়া সিঁধ কাটিতেছে। অন্ধকার একটু স্বচ্ছ হইল। যতীন শিহরিয়া উঠিল… অসংখ্য বিদ্রোহী…কিলবিল করিতেছে…। কেহ কাহারও বুকে ছুরি বসাইয়াছে, কেহ নারী-ধর্ষণ করিতেছে, কেহ লুণ্ঠনরত। একটি মেয়ে হাসিমুখে স্বামীর খাদ্যে বিষ মিশাইতেছে…

যতীন। এরা বিদ্রোহী ?

দেবতা। হ্যাঁ, এরা বিদ্রোহী। সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থায় এরা কেউ সুখী নয়, প্রচলিত আইন অমান্য ক'রে তাই এরা প্রত্যেকে সুখের সন্ধান করছে আপন আপন রুচি অনুসারে। আর এরাও—

অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া একটা সন্ধানী আলোর রেখা আকাশ পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল। যতীন দেখিল, সেই আলোকরেখা ধরিয়া বিরাট মিছিল চলিয়াছে। কয়েকজনকে সে চিনিতে পারিল। যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, লেনিন, মহাত্মাজী, সুভাষ বসু, অ্যাব্রাহাম লিংকন···আরও অনেকে···

দেবতা। সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থায় এঁরাও কেউ সন্তুষ্ট নন। এঁরাও সব উলটে দিতে চান, উলটে দিয়ে আনন্দ পেতে চান। কিন্তু একা একা আনন্দ ভোগ ক'রে তৃপ্তি হয় না এঁদের। এঁরা প্রত্যেকেই নিজের আদর্শ অনুযায়ী সমগ্র সমাজটাকে ভেঙে গড়তে চান, সকলেই যাতে সুখী হয়। তাই করবার জন্যে সারাজীবন কৃচ্ছ্র সাধন ক'রে চলেছেন। এই দেখ, আর এক জাতের বিদ্রোহী···

সন্ধানী আলোর রেখা মিলাইয়া গেল। যতীন দেখিল, দিব্য আলোকে এক অপূর্ব দৃশ্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। নির্মল আকাশে যেন নীলকান্ত মণির দ্যুতি··· দিগন্তপ্রসারী প্রান্তর যেন সবুজের স্বপ্ন দেখিতেছে··· দূরে পাহাড়ের শ্রেণী অদ্ভুত রহস্যময়···আঁকিয়া বাঁকিয়া একটা নদী বহিয়া চলিয়াছে কোন্ সাগরের উদ্দেশ্যে কে জানে···নদীর তীরে ছোট ছোট পল্লী, শান্তির ছোট ছোট নীড় যেন···পাখি ডাকিতেছে—পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা···ফটিক জল—ফটিক জল···বহু কবি বৈজ্ঞানিক ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন···যতীন কয়েকজনকে চিনিল···প্লেটো, টল্‌স্টয়, রুসো, ভল্‌টেয়ার, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ড্যাল্‌টন,··· ফ্যারাডে···হান্‌স্‌···

দেবতা। এঁরাও প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থায় স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব না করতে পেরে নির্জন মানসলোকে সংহরণ করেছেন নিজেদের। কিন্তু এঁরা পলাতক নন। এঁরা তপস্বী। এঁরাই যুগান্তরকারী অবতার। তপস্যাবলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন যুগান্তরকারী যন্ত্র, কবি আবিষ্কার করেন যুগান্তরকারী মন্ত্র।

যতীন চুপ করিয়া রহিল। দৃশ্যপট ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

দেবতা। সব তো দেখলে, এইবার মিলিয়ে দেখ নিজের সঙ্গে। ঝ'ড়ো হাওয়া, অনুর্বর জমি, আলোর অভাব সত্ত্বেও যে স্বপ্নের কুঁড়িটি ধরেছে তোমার মনে, তাকে বাঁচিয়ে রাখ। বাস্তবের পুষ্পে তা মূর্ত হোক—রূপ নিক।

অদৃশ্য হইয়া গেলেন। টাইম্‌পিসের পুরাতন ডায়ালটা আবার স্পষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার টিকটিক শব্দে যতীন শুনিতে লাগিল—রূপ নিক, রূপ নিক। দ্রুতপদে সশরীরে রুমি আসিয়া প্রবেশ করিল। বাইশ বছরের তরুণী। রূপসী। শুধু দেহের রূপ নয়, মনের রূপও তাহার চোখে মুখে ঝলমল করিতেছে।

রুমি। আমি বিদেয় ক'রে দিয়ে এলাম লোকটাকে ছোটদা। তুমি কি করছ একা একা এই তেতলার ঘরে ব'সে?

যতীন। কোন্ লোকটাকে?

রুমি। যিনি আমাকে দেখতে এসেছিলেন। [হাসিয়া] কোন অভদ্রতা করি নি; কেবল বললাম, যতদূর মনে হচ্ছে, আপনি রাঁধুনী কিংবা চাকরাণী খুঁজতে বেরিয়েছেন। আমাদের বাড়িতে সে রকম তো কেউ নেই আপাতত।

যতীন। [সবিস্ময়ে] এই কথা বললি তুই! কি বললে তারা?

রুমি। কি আবার বলবে, মুখ কালো ক'রে ব'সে সন্দেশ গিলতে লাগল, আমি উঠে চ'লে এলাম।

যতীন। সেজদা ছিল না?

রুমি। হ্যাঁ, বড়দা, মেজদা, সেজদা সবাই ছিল।

যতীন। সেজদা কিছু বলে নি?

রুমি। বড়দা আর মেজদার ভয়ে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে নি, কিন্তু চোখের দৃষ্টি থেকে যা ফুটে বেরুচ্ছিল, তা মনুর পঞ্চম অধ্যায়। মেজদা কিন্তু বেশ মজার কথা বলেছে একটি, যদিও বড়দার কাছ থেকে ধমক খেলে বেচারী সে জন্যে।

যতীন। কি কথা?

রুমি। মেজদা প্রথমে একটি কথা বলেন নি, কিন্তু আমি ওই কথা ব'লে উঠে আসবার পরই একজন বললেন, আমাদের বাড়িতে গিয়ে আপনাদের মেয়েকে অবশ্য রাঁধতে হবে না, বাসনও মাজতে হবে না। কিন্তু মানুষের অবস্থা বলা তো যায় না, কার কখন কি হবে কে বলতে পারে? আপনাদের মেয়ে ইতিহাসে এম. এ. পাস, সে কথা তো জানিই আমরা, কিন্তু ভগবান না করুন, যদি দুঃখের দিন আসে, তখন হাতা বেড়ি ধরতে পারবে কি না, তা জানতে চাওয়াটা কি অন্যায়? মেজদা তখন বললেন, না, কিছুমাত্র অন্যায় নয়। আপনারাও আপনাদের ছেলেকে আশা করি মসলা-পেশা কাঠ-চ্যালানো কুয়ো থেকে জল তোলা প্রভৃতিতে দক্ষ করেছেন। সত্যিই তো, কখন কি হয় কে বলতে পারে? মেজদার চোখ দুটো বাঘের মত জ্বলছিল। আমি পাশের ঘরে জানলা দিয়ে দেখছিলাম তো সব।

যতীন। বড়দা কি বললেন?

রুমি। বড়দা মেজদার দিকে ফিরে বললেন, ও-রকম কথা বলছ কেন তুমি? তোমাদের অভদ্র ব্যবহারে মাথা হেঁট হয়ে গেল আমার। তারপর ওঁদের দিকে ফিরে বললেন, খুবই লজ্জিত আমি, আমাদের ক্ষমা করুন। আচ্ছা, নমস্কার। ওঁদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন গিয়ে।

বাড়িতে এসে সেজদার সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, তোমার পছন্দর প্রশংসা করতে পারলাম না। রুমির বিয়ের জন্যে ভাবতে হবে না তোমাকে। তুমি তোমার ঠাকুরঘর নিয়েই থাক।

যতীন। [হাসিয়া] যাক, এ যাত্রা নিস্তার পেয়ে গেলি।

টিকটিকির কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়াছিল। সে আগাইয়া আসিল এবং রুমিকে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

রুমি। [আবদার করিয়া] আমার একটা উপকার করবে ছোটদা ?

যতীন। কি ?

রুমি। বেশ ভাল ক'রে একটা অ্যাপীল লিখে দেবে ? অ্যাপীলের বাংলা কি—আবেদন ? লিখে দাও না, তুমি তো বেশ লিখতে পার।

যতীন। কিসের আবেদন ?

রুমি। বাংলা দেশের সমস্ত কুমারী মেয়েদের একটা সমিতি গঠন করতে চাই আমি—অনেকটা ট্রেড ইউনিয়ন গোছের। তার উদ্দেশ্য হবে—কুমারী মেয়েদের সম্মান রক্ষা করা। বাংলা দেশের পুরুষদেরই তা করা উচিত ছিল, কিন্তু তা যখন তাঁরা করেন নি, করবার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না, তখন আমাদের নিজেদেরই তা করতে হবে। বাংলা দেশের সমস্ত কুমারী মেয়ে যদি সত্যিই আমার দলে যোগ দেয়, তা হ'লে বাংলা দেশের পুরুষদের শিক্ষা দিয়ে দিতে পারি। কোনও মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কোনও রকম অসম্মানজনক প্রস্তাব করে যদি কেউ, তাকে বয়কট করব আমরা। বাংলা দেশের কোনও মেয়ে তাকে বিয়ে করবে না। আমরা নিজেদের অত্যন্ত সস্তা ক'রে ফেলেছি ব'লেই ওরা ভুলে গেছে যে, বিয়ে করাটা শুধু আমাদেরই প্রয়োজন নয়, ওদেরও প্রয়োজন। এ দেশের মেথর, মুচি, ধোবা, নাপিত, কুলি, কেরানী, সবাই নিজেদের দর বাড়িয়ে নিয়েছে ধর্মঘট ক'রে, কেবল আমরাই প'ড়ে আছি মূল্যহীন অবহেলিত, অপমানিত। অথচ আমরাই গার্হস্থ্যের

ভিত্তি, ভবিষ্যৎ সমাজের জননী, আমাদেরই অসম্মানের পঙ্ককুণ্ডে ডুবিয়ে রেখেছ তোমরা, আর ভণ্ডামির মুখোশ প'রে সতীলক্ষ্মী-মহিমার বাঁধা বুলি আউড়ে চলেছ শতাব্দীর পর শতাব্দী। এ আর সহ্য করব না আমরা, সহ্য করা উচিত নয়। এই কাজেই আত্মনিয়োগ করব ঠিক করেছি। তুমি আমাদের সমিতির উদ্দেশ্যটা বেশ ভাল ক'রে গুছিয়ে লিখে দাও ছোটদা—দেবে ?

যতীন। তা না হয় দেব। কিন্তু জিনিসটা ভাল ক'রে ভেবে দেখা উচিত কিছু করবার আগে।

রুমি অধীরতাসূচক একটা ভঙ্গী করিল।

রুমি। ও ভাবাই আছে।

যতীন। ধর, যে সব মেয়ে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, তাদের ভরণ-পোষণের একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো ?

রুমি। নিশ্চয়। তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, উপার্জনের ব্যবস্থা থাকবে, রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে, তাদের প্রত্যেকের বিয়ের ব্যবস্থা করবে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলী। ছেলের বিয়ে দিতে হ'লে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই হুড়মুড় ক'রে মেয়ের বাপেরা ফোটোগ্রাফের বোঝা নিয়ে গিয়ে হাজির হবে না তখন, হ'লেও কোনও ফল হবে না। সকলকে ছেলের বিয়ের জন্যে যেতে হবে ওই প্রতিনিধিমণ্ডলীর কাছে। সেখানে কোনও রকম অসম্মানজনক প্রস্তাব করেন যদি কেউ, তা হ'লে সমস্ত বাঙালী মেয়ে 'স্ট্রাইক' করবে—সে ছেলের বিয়ে হবে না যতক্ষণ না সে ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

টিকটিকি। ঠিক, ঠিক সবই ঠিক। কেবল ওই রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারটায় একটু খটকা লাগছে। ও বিষয়ে বেশি কড়াক্কড়ি করতে গেলে অনেক মেয়ে পালাবে, আর ঢিলে দিলে অনেক মেয়ে কেলেঙ্কারি করবে। জানি তো সব…

টিকটিকির কথা রুমি শুনিতে পাইল না। যতীন পাইল।

যতীন। তোমার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাটা কি রকম হবে ?

রুমি। [হাসিয়া] কারাগারে বন্দী ক'রে রেখে 'ফিডিং বট্‌লে' উপদেশ পান করিয়ে কতদিন আর বাঁচিয়ে রাখবে আমাদের ? অন্ধকূপ হত্যা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ না ? বাইরের আলো-বাতাসের অভাবে ভেপসে প'চে মলুম যে আমরা ! তালাটা খুলে দিলে ক্ষতি কি ?—তু-চারজন পথ হারিয়ে মরবে হয়তো—তা মরুক, অধিকাংশই কিন্তু বাঁচবে।

যতীন। তা হ'লে রক্ষণাবেক্ষণের কোনও প্রয়োজন নেই বলছ ?

রুমি। বাইরে থেকে কেউ কি রক্ষণাবেক্ষণ করতে পেরেছে কখনও কাউকে ? সিন্দুকের ভিতর বন্ধ ক'রে রেখেও পারে নি।

টিকটিকি। ঠিক ঠিক।

রুমি শুনিতে পাইল না, বলিয়া চলিল—

রুমি। সেই দৈত্যের গল্পটা ভুলে গেছ—সেই যে, একটা দৈত্য সিন্দুকের ভিতর একটা মেয়েকে পুরে মাথায় ক'রে নিয়ে বেড়াত ?

যতীন। ও গল্প জানি, তোমার সঙ্গে আমার মতদ্বৈধও নেই—তোমার 'স্কীম'টা কি, তাই শুধু জানতে চাইছি। রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে বলছ, সেটা কি রকম হবে ?

রুমি। মেয়েরা তাদের বাপ-মায়ের কাছেই থাকবে যেমন আছে, কেবল তাদের আমাদের সমিতিতে যোগ দিতে হবে এবং প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, বিয়ের ব্যাপারে অসম্মানজনক কোন কিছু তারা সহ্য করবে না। সমিতি তাদের সে বিদ্রোহ সমর্থন করবে। আমরা যেখানে যেমন দরকার, শিক্ষার ব্যবস্থা করব, উপার্জনেরও ব্যবস্থা করব, কিন্তু ওই একটি শর্তে। "বিয়ের ব্যাপারে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, প্রয়োজন হ'লে সে বিষয়ে কর্তৃত্ব করবে আমাদের প্রতিনিধিমণ্ডলী। মেয়েদের বাপ-মাকে নিয়েই প্রতিনিধিমণ্ডলী হবে অবশ্য।

যতীন। কিন্তু যাদের মেয়ে আছে, তাদের ছেলেও আছে। মেয়ের স্বার্থের কাছে ছেলের স্বার্থ বলি দিতে রাজি হবে কি সবাই?

রুমি। আমার বিশ্বাস, অনেকে হবে। ছেলেদের স্বার্থকে বলি দেব কেন আমরা? তাদের স্বার্থ তো আমাদেরই স্বার্থ। সমাজ মেয়েদের উপর যে অত্যাচারটা করছে, সেইটে নিবারণ করাই শুধু আমাদের উদ্দেশ্য।

যতীন। ধর, যদি বাপ-মায়েরা রাজি না হয়?

রুমি। তখন তাদের নিয়ে আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়বার চেষ্টা করতে হবে।

যতীন। তাতে কি পরিমাণ টাকার দরকার, তা ধারণা আছে তোর?

রুমি। আছে, অনেক টাকার দরকার। কিন্তু সেই ভয়ে থামলে চলবে না। আরম্ভ করতে হবে।

যতীন। আমার বিশ্বাস, রাজশক্তি সাহায্য না করলে এক-আধ-জনের চেষ্টায় এ হওয়া অসম্ভব। বিদেশী রাজার কাছে সাহায্য পাওয়া যাবে না, আমাদের পঙ্গুতাই তার কাম্য। সুতরাং স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে সকলের আগে। দেশ স্বাধীন না হ'লে কিছুই হবে না।

রুমি। সে চেষ্টা তো চলছে, এটাও চলুক। না ছোটদা, তুমি ঝগড়া লাগাবার চেষ্টা করছ খালি। কোনও বাধা আমি মানব না।

যতীন। [হাসিয়া] কোনও বাধাই না? ধর, যদি—

কথাটা বলিতে গিয়া যতীন থামিয়া গেল। সমরের সম্বন্ধে রুমির মন যে ব্যাঘ্রিনীর মত সজাগ, তাহা যতীনের জানা ছিল। সমরকে লইয়া কোনও রসিকতাও সে সহ্য করিবে না। কিন্তু যতীনের মনের ভাব তাহার চোখের দৃষ্টিতে মূর্ত হইয়া উঠিল। রুমির মনের ভাবও মূর্ত হইল রুমির চোখের দৃষ্টিতে।

যতীনের মনের ভাব। ধর্, যদি সমর এতে আপত্তি করে?

রুমির মনের ভাব। সমর আপত্তি করবে? সমরকে চেন না তামরা। সোনায় মরচে ধরতে শুনেছ কখনও?

যতীনের মনের ভাব। শুনি নি, কল্পনা করছি। যদি আপত্তি করে, কি করবি তখন তুই?

রুমির মনের ভাব। সমরের মুখদর্শন করব না কখনও তা হ'লে।

মূর্ত মনোভাব দুইটি অদৃশ্য হইল। যতীন দেখিল, রুমি তাহার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার চোখের দৃষ্টিতে বহ্নি-দীপ্তি।

রুমি। কোনও বাধাই আমি মানব না ছোটদা। প্রাণ দিয়েও আত্মসম্মান রক্ষা করব।

যতীনের মনে হইল, রুমির সমস্ত দেহটাই যেন স্বর্ণ-শিখার মত জ্বলিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে শিখা আকাশবিসর্পী হইল—দিগ্-দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল অপূর্ব জ্যোতির্ময় দীপ্তিতে। সেই দীপ্তি ভেদ করিয়া ঝঞ্ঝার বেগে একটি অশ্ব যেন ছুটিয়া আসিতেছে···কাছে আসিয়া গ্রীবাভঙ্গী করিয়া অশ্বটি দাঁড়াইয়া পড়িল···যতীন সবিস্ময়ে দেখিল, অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রহিয়াছে মূর্তিমতী তেজঃস্বরূপিণী এক নারী···তাহার উত্তোলিত হস্তে তীক্ষ্ণ তরবারি···সে বলিতেছে, মেরি ঝান্সি নেহি দেউঙ্গি, নেহি দেউঙ্গি, নেহি দেউঙ্গি···। দৃশ্য মিলাইয়া গেল।

রুমি। আমি চললাম ছোটদা—লিখে রেখো, বুঝলে? আমি আসব আবার।

যতীন। আচ্ছা।

রুমি চলিয়া গেল।

টিকটিকি। নানা গোলমালে একটা কথা চাপা প’ড়ে গেছে।

যতীন। কি কথা?

টিকটিকি। নীলার কথাটা। সে যে তোমাকে অক্ষম ব’লে অত বড় একটা বিদ্রূপ ক’রে গেল, সহ্য ক’রে থাকবে সেটা? তুমি কি একটা কেউ-কেটা নাকি! আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি, তোমার শক্তি কত!…

যতীন চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর চোখ বুজিয়া ভাবিবার চেষ্টা করিল, সত্যই কি তাহার কোন শক্তি আছে? থাকিলে তাহা কিরূপ?…চোখ খুলিয়া দেখিল, একটি কঙ্কাল সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

কঙ্কাল। আমিই তোমার শক্তি।

যতীন। তুমি!

কঙ্কাল। খেতে পাই না।

যতীন। কেন, আমি খাই তো। জীবনে কখনও খাওয়ার কষ্ট পেয়েছি ব’লে তো মনে পড়ে না।

কঙ্কাল। ওইখানেই তোমার ভুল। তুমিই তোমার শক্তি নও, সে রকম তপস্যা তোমার নেই। দেশের সম্মিলিত শক্তিই তোমার শক্তি…তোমার শক্তি…

কঙ্কালের দাঁতগুলা সহসা কড়মড় করিয়া উঠিল। অক্ষিকোটর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া বাহির হইল…

কঙ্কাল। তোমার শক্তি? লজ্জা করে না বলতে? এর মধ্যেই কি ক’রে ভুলে গেলে যে, তোমার শক্তি একমুঠো উচ্ছিষ্ট অন্নের জন্য মাথা কুটে মরেছে প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে, ‘ফ্যান দাও’ ‘ফ্যান দাও’ ব’লে হাহাকার ক’রে বেড়িয়েছে শহরের গলিতে গলিতে, পুলিসের গুলিতে মরেছে হাজারে হাজারে, ঝড়ে উড়ে গেছে, আগুনে পুড়ে গেছে, বানে

ডুবে গেছে ?…[করুণ কণ্ঠে] কিছু নেই—অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শিক্ষা নেই, আদর্শ নেই। সমস্ত নিয়ে গেছে। চামড়া ছিঁড়ে নিয়েছে, মাংস কেটে নিয়েছে, চোখ উপড়ে ফেলেছে। বাকি আছে শুধু হাড় কখানা…বাঁচাও এগুলোকে…এখনও এ দিয়ে বজ্র তৈরি হতে পারে।

যতীন। [সাগ্রহে] বল, কি উপায় তার ?

টিকটিকি। কি ভণ্ড, কিছু জানে না যেন !

কঙ্কাল। উপায়—ত্যাগ, স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ, ভালবাসা। শুধু নীলাকে ভালবাসা নয়, সকলকে ভালবাসা। সকলকে ভালবাসতে না পারলে নীলার ভালবাসাও টিকবে না। বিশাল হৃদয়ের বলিষ্ঠতাই নীলাকে নির্ভয় করতে পারে, বিশাল গাছের শাখাতেই পাখি নীড় বাঁধে, মাটির উপরই গৃহ নির্মিত হয়। তোমার উদারতার অভাব ঘটেছে ব'লেই দেশজোড়া এই অশান্তি, এই হানাহানি, তোমার সঙ্কীর্ণ প্রেমের ভিত্তিও ন'ড়ে উঠেছে তাই। বাঁচাও আমাকে—এখনও বাঁচাতে পার…বাঁচাও…বাঁচাও…

কঙ্কাল ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল। দূর হইতে কেবল শোনা যাইতে লাগিল, বাঁচাও—বাঁচাও—বাঁচাও—

টিকটিকি। এই মরেছে !

যতীন। কি হ'ল ?

টিকটিকি। [সানুনয়ে] আমাকে চট ক'রে একটা গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, এক জোড়া বাটারফ্লাই গোঁফ, আর এক জোড়া গ্লেজ্‌ড্ কিড্‌সের পাম্পশু দিতে পার ? দাও ভাই চট ক'রে।

যতীন। [সবিস্ময়ে] কেন ?

টিকটিকি। ওই দেখ, টিকটিকিনীর কাণ্ড !

যতীন সবিস্ময়ে দেখিল, পাশের দেওয়ালে টিকটিকিনী সত্যিই অদ্ভুতবেশে সাজিয়া আসিয়াছে। ঠোঁটে রঙ, মুখে পাউডার, পরনে

চটকদার হাওয়াই শাড়ি। আঁকিয়া বাঁকিয়া ওরিয়েণ্টাল নাচ নাচিতেছে।

টিকটিকি। দাও চট ক'রে—আদ্দির পাঞ্জাবি, বাটারফ্লাই গোঁফ আর ভাল একজোড়া পাম্পশু ; না হ'লে তো ওকে ভোলানো যাবে না। দাও না।

যতীন। আমার কাছে নেই।

টিকটিকি। আঃ, বিপদে ফেললে দেখছি। পাশের বাড়িতে থিয়েটারের আখড়া আছে না? সেখানে পাওয়া যেতে পারে, দেখি চেষ্টা ক'রে।

ত্বরিতপদে বাহির হইয়া গেল। টিকটিকিনীও নাচিতে নাচিতে তাহার অনুসরণ করিল। যতীন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' শব্দটা আবার শোনা গেল। স্পষ্টতর হইয়া ক্রমশ সেটা নিদারুণ হাহাকারে পরিণত হইল। সহসা খবরের কাগজের পাতা হইতে নোয়াখালি ও কলিকাতার অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের দল পিলপিল করিয়া বাহির হইয়া আসিল। মনে হইল, চতুর্দিক যেন ভরিয়া গেল। আকাশ লাল হইয়া উঠিয়াছে···ঘর পুড়িতেছে···গ্রাম পুড়িতেছে। বাঁচাও—বাঁচাও—কে কোথায় আছ, বাঁচাও···চীৎকার-ক্রন্দন-হাহাকারের মধ্যে কে যেন অট্টহাসি হাসিতেছে! যতীন এতক্ষণ প্রাণপণে যে বিভীষিকাকে নিজের মগ্নচৈতন্যের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিবার, চেষ্টা করিতেছিল, তাহা অতিশয় নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। কাগজে পড়িয়া তাহার মনে যে কৌতূহলটুকু জাগিয়াছিল, তাহা এই বিরাট জনতায় দিশাহারা হইয়া গেল। তাহার ভয় করিতেছিল না, সে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। চতুর্দিকে জনতা, চীৎকার, হাহাকার, অট্টহাসি, আগুনের হলকা, শবদাহের গন্ধ আর ধোঁয়া। হঠাৎ সে দেখিতে পাইল, এক বিরাট পুরুষ ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছেন···যতীনের

একটা ছবি মনে পড়িয়া গেল···যেন লিলিপুট-জনতার মধ্যে গালিভার আবির্ভূত হইয়াছেন। বিরাট পুরুষ অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

বিরাট পুরুষ। বিভ্রান্ত হ'য়ো না, এর স্বরূপ বাইরে থেকে অমন এলোমেলো ক'রে দেখলে ঠিক বোঝা যাবে না। ঠিক ক'রে দিচ্ছি, দাঁড়াও।

যতীন। আপনি কে?

বিরাট পুরুষ। আমি ইতিহাস।

ইতিহাস জনতার মধ্যে কি যে করিলেন, যতীন ঠিক বুঝিতে পারিল না; কিন্তু অদ্ভুত একটা রূপান্তর ঘটিল। জনতার বিশৃঙ্খলা আর রহিল না।···এক ধারে কতকগুলি বন্দিনী নারী সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে ···মানুষ নয়, যেন প্রাণহীন নিস্পন্দ পুতুলের সারি—চোখের দৃষ্টিতে ভাষা নাই, সজীব আতঙ্কও নাই, সমস্ত জমিয়া যেন পাথর হইয়া গিয়াছে···আর এক ধারে বন্দী পুরুষের দল···মৌন ঘৃণা আর ভয় তাহাদের চোখের দৃষ্টিতে মূর্ত হইয়া আছে···দুই দলের মধ্যে কয়েকটি শিশু···কিছু দূরে নরমুণ্ড ও কবন্ধের স্তূপ···তাহারই পাশে একটা অগ্নিকুণ্ড দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহাতে পুড়িতেছে একটা জীবন্ত মানুষ···আর এই সমস্তটা স্পর্ধিত নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছে একটা অদ্ভুত পশু। পশুটার আকৃতি ভয়াবহ। মুণ্ডটা হায়েনার, বীভৎস দাঁতগুলা রক্তাক্ত। হাত দুইটা হাত নয়, সাপ। আঙুল নাই, আঙুলের স্থানে ফণা। বুকটা যেন শ্যাওলা-ধরা পাথর, তাহার উপর অসংখ্য শুঁয়া-পোকা সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। পা দুইটাও মানুষের নয়, শ্বাপদের। মাথায় একটা লোহার হেল্‌মেট। কোমরে একটা ছোরা গোঁজা। অস্পষ্ট দুইটি মূর্তি নেপথ্যে বন্দুক কাঁধে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে··· মনে হইতেছে, তাহারা যেন এই

পশুটার দেহরক্ষী। ইতিহাস কখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন যতীন বুঝিতে পারে নাই।···পশুটা আগাইয়া আসিয়া বন্দী নর-নারীদের মধ্যস্থলে কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইল। দুইটা সাপের ফণা দুই দিকে উদ্যত হইয়া রহিল।

পশু। তোরা মানবি কি না এখনও বল্··· যদি মানিস জিন্দা থাকবি, আর যদি না মানিস—

শ্বাদন্ত নিষ্কাশিত করিয়া ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি করিল একটা। সর্পরূপী বাহু-যুগল কুঞ্চিত প্রসারিত হইতে লাগিল। চোখের দৃষ্টি হইতে আগুন নয়, খানিকটা পুঁজ যেন গলগল করিয়া বাহির হইয়া আসিল।···

পশু। [সগর্জনে] মানবি কি না বল্, জলদি বল্, (পুরুষদের দিকে চাহিয়া) জলদি।

একজন পুরুষ। না, মানব না।

পশুটা হাসিয়া উঠিল? অদ্ভুত সে হাসি! কোন শব্দ হইল না। মুখ-গহ্বরটা কান পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গেল কেবল।

পশু। [সহসা উচ্চৈঃস্বরে] এই, আয় তোরা।

সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা পশু ছুটিয়া আসিল। কাহারও মুণ্ড শৃগালের মত, কাহারও কুকুরের মত, কাহারও শকুনির মত··· ।

পশু। নিয়ে আয় মাংস আর রক্ত।

একজন গিয়া মাংস ও রক্ত লইয়া আসিল।

পশু। খাওয়া এই ব্যাটাকে··· শালা, হারামির বাচ্চা···

যে পুরুষটি আপত্তি করিয়াছিল, তাহাকে সকলে মিলিয়া জোর করিয়া মাটিতে ফেলিল এবং মাংস ও রক্ত মুখে পুরিয়া দিল।

পশু। এইবার মার্ জুতো শালার মুখে।

মুখে জুতা মারা হইল।

পশু। কাট্ এবার।

কাটিল। তাহার মাথাটা পিছন দিকে ঝুলিয়া পড়িতেই ছিন্ন শিরামুখ হইতে ফিনকি দিয়া রক্তের ফোয়ারা ছুটিয়া বাহির হইল। ওঃ—ওঃ—ওঃ—ওঃ—ভগবান— বন্দিনী মেয়েদের মধ্যে একজন হাহাকার করিয়া উঠিল। নিহত ব্যক্তি তাহারই স্বামী। মেয়েটির চীৎকারে যতীন আত্মস্থ হইল, এতক্ষণ তাহার চিত্ত যেন অসাড় হইয়া গিয়াছিল—সেও চীৎকার করিয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া বারণ করিল। কিন্তু কোন ফল হইল না। পশুরা তাহাদের কাজ ঠিক করিয়া যাইতে লাগিল। জননীদের আর্তনাদ অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা শিশুদের মধ্যে কাহাকেও অগ্নিকুণ্ডে ছুঁড়িয়া দিল, কাহাকেও আছড়াইয়া মারিল, কাহারও দুই পা ধরিয়া চিরিয়া ফেলিল। যতীন আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না—সে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। পশুরা নির্বিকার। যে বন্দিনী হাহাকার করিয়া উঠিয়াছিল, একটা পশু তাহার দিকে চাহিয়া একটা পৈশাচিক হাসি হাসিল। এ হাসি নিঃশব্দ নয়—মনে হইল, গলার ভিতর খলবল করিয়া জল ফুটিতেছে।

বন্দিনী। আমাকেও মেরে ফেল তোমরা···আমাকেও মার··· তোমাদের পায়ে পড়ছি, দয়া ক'রে আমাকে মার···আমার ছেলেকে মেরেছ, স্বামীকে মেরেছ···আমাকেও মার···

পশু। তোমাকে মারব না সুন্দরী, অঙ্কশায়িনী করব···

বন্দিনী। না—না—না—

পশু। না বললে শুনছে কে! ওরে, ধর্‌—

কয়েকজন পশু আসিয়া মেয়েটিকে চিত করিয়া মাটিতে ফেলিল। একজন আগাইয়া গিয়া পা দিয়া তাহার মাথায় আঘাত করিল, হাত ভাঙিয়া দিল। তাহার পর তাহার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গেল। ক্ষণপরেই ধর্ষিতা নারীর হাহাকারে চতুর্দিক শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। নেপথ্যে যে দুইটি অস্পষ্ট মূর্তি বন্দুক কাঁধে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা নির্বিকারভাবে দাঁড়াইয়াই রহিল।···যতীনের হস্ত মুষ্টিবদ্ধ, নাসারন্ধ্র স্ফীত, চক্ষু রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া তারস্বরে আবার সে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল। কিন্তু পশুদের কার্যকলাপে এতটুকুও ছেদ পড়িল না। বরং তৎক্ষণাৎ তাহারা আর একটি মেয়ের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া ভূপাতিত করিয়া ফেলিল। যতীন আর দেখিতে পারিতেছিল না, বুকফাটা হাহাকার শোনাও আর সম্ভব ছিল না তাহার পক্ষে। নিরুপায় হইয়া সে চোখ বুজিয়া কানে আঙুল দিল···কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে আবার চোখ খুলিল। দেখিল, ইতিহাস তাহার সম্মুখে পুনরায় মূর্ত হইয়াছেন।

ইতিহাস। কেন বৃথা চীৎকার করছ?

যতীন। মেয়েদের এই নির্যাতন চুপ ক'রে দেখব? কি বলছেন আপনি!

ইতিহাস। [হাসিয়া] মেয়েদের নির্যাতন চুপ ক'রে দেখাই তো তোমাদের অভ্যাস।

যতীনের চোখের সম্মুখে নূতন দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইল। চিতা জ্বলিতেছে। চিতায় পুড়িতেছে একটি মৃত পুরুষের সহিত একটি জীবন্ত নারী। মেয়েটি

হাত জোড় করিয়া মৃত স্বামীর পা দুইটা মনে মনে জড়াইয়া ধরিয়া নিদারুণ যন্ত্রণাটা ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না; চেষ্টা সত্ত্বেও মুখ দিয়া আর্তনাদ বাহির হইয়া পড়িতেছে। সে আর্তনাদকে চাপা দিয়া গর্জন করিয়া উঠিতেছে ঢাক ঢোল দামামা রামশিঙার তুমুল নির্ঘোষ। এ দৃশ্য অবলুপ্ত হইয়া গেল, আর একটা দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল ...একসঙ্গে শত শত নারী সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া হাতের শাঁখা ভাঙিয়া বৈধব্য-বেশ ধারণ করিতেছে—একটিমাত্র কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যুতে এতগুলি মেয়ে পতিহীনা হইয়াছে, অদূরে নিষ্ঠুর-মূর্তি একটা পাণ্ডা দাঁড়াইয়া আছে, সকলের টুঁটি টিপিয়া জোর করিয়া নির্জ্জলা একাদশী করাইবে।...এ দৃশ্য মিলাইয়া গেল, আর একটা মূর্ত হইল। পর্তুগীজ বণিকের জাহাজে সারি সারি মেয়ের দল উঠিতেছে, প্রত্যেকের কোমরে দড়ি। পর্তুগীজ বণিকেরা উহাদের কাহাকেও লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছে, কাহাকেও কিনিয়াছে।...জাহাজ ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইল একটি নৌকায়। নৌকার গলুইয়ের উপর ম্লানমুখী একটি কিশোরী বসিয়া আছে—ভরার মেয়ে...ভরার মেয়ে দেখিতে দেখিতে রূপান্তরিত হইল স্নেহলতায়...স্নেহলতার সর্বাঙ্গে আগুনের শিখা... স্নেহলতাকে দগ্ধ করিয়া আগুনের শিখা ধীরে ধীরে স্তিমিত হইয়া আসিল...সেই স্তিমিত আলোকে যতীন দেখিতে পাইল, প্রেতিনীর মত সারি সারি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে পণ্য-রমণীর দল...তাহাদের নিষ্পলক দৃষ্টিতে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ...এ দৃশ্যও ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল... যতীন দেখিল, ইতিহাস তাহার দিকে চাহিয়া আছেন।

যতীন। অতীতে কিছু করি নি ব'লে বর্তমানেও চুপ ক'রে থাকব, এ আপনার কেমন যুক্তি?

ইতিহাস। বর্তমানেও তোমরা চুপ ক'রে আছ। ওই দেখ।

অশরীরী নিভাননী ছুটিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল। চোখের দৃষ্টিতে সপ্রতিভ ছদ্ম হাসি।

নিভাননী। [হাসিয়া] আমার উপর করুণা প্রকাশ ক'রে কেন যে সময় নষ্ট করছ, বুঝি না। আমার কোন দুঃখ নেই, তোমরা আমার দুঃখটা বুঝলে না, কিন্তু স্বয়ং বাবা বিশ্বেশ্বর আমাকে পায়ে ঠাঁই দিয়েছেন। বরং তোমাদের কথা ভেবেই দুঃখ হয় আমার···ঠিক আমার বিশুর মতই অবুঝ তোমরা···ওই যে আসছে—আর পারি না ওকে নিয়ে।

অশরীরী বিশু আসিয়া প্রবেশ করিল। মাথার চুল অবিন্যস্ত, পরিধানে ময়লা হাফপ্যান্ট, ছেঁড়া কামিজ। চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। গালের উপর অশ্রুর ধারা শুকাইয়া রহিয়াছে। নিভাননীকে দেখিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু বলিল না, কেবল নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল।

নিভাননী। আচ্ছা, তুই অমন করছিস কেন বল্ দিকি ?

বিশু। [অস্ফুটকণ্ঠে] মা!

তাহার দুই চোখ আবার জলে ভরিয়া উঠিল।

নিভাননী। কতবার বোঝাব তোকে! এ কি আমার নতুন হয়েছে, এ রকম অদ্ভুত কাণ্ড কতবারই তো হয়েছে পৃথিবীতে মহাভারত খুলে দেখ্ না। বিনতার দুই ছেলে অরুণ আর গরুড় জন্মেছিল ডিম থেকে, গান্ধারী প্রসব করেছিলেন একটা মাংসপিণ্ড, সেটা ঘৃতকুণ্ডে রাখবার পর তবে তার থেকে শত পুত্র জন্মাল, দ্রোণও জন্মেছিল কলসী থেকে, শরস্তম্ভ থেকে কৃপ কৃপী, আগুন থেকে অগ্নিবেশ, দ্রৌপদী, ধৃষ্টদ্যুম্ন···রামায়ণ পড়েছিস তো—সীতা মাটি থেকে জন্মায় নি ?—কি অবুঝ ছেলে বাবা, কিছুতেই বুঝবে না—চল্—

বিশুকে নিভাননী টানিতে টানিতে লইয়া চলিয়া গেল।

অশরীরী মেজদি প্রবেশ করিলেন।

মেজদি। কাণ্ডখানা দেখে এস একবার। তোমার মেজদা পা ছড়িয়ে ব'সে আছেন, আর ওই বিধবা বউ তাঁর উরুতে গরম তেল মালিশ করছে। আচ্ছা, এমন অনাছিষ্টি কাণ্ড শুনেছ কখনও? পুত্রবধূ অবশ্য মেয়ের মত তা মানি, কিন্তু সোমত্ত মেয়েকে দিয়েও কেউ উরুতে তেল মালিশ করায় নাকি? আমি মালিশ ক'রে দিতে গেলুম, তোমার মেজদা বললেন, তোমার হাতে জোর নেই, তুমি পারবে না। মানে মানে স'রে এলুম—নিজের মান নিজের কাছে—অ্যাঁ, কি বল? কিন্তু এমন অনাছিষ্টি কাণ্ড বাপের জন্মে শুনি নি কখনও বাপু!

দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। একবার অসহায়ভাবে এদিক ওদিক চাহিলেন। তাহার পর নাক কুঁচকাইয়া চশমাটা ঠিক করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

মেজদি। আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, কতটুকুই বা বুঝি, কিই বা জানি! [একটু হাসিয়া] আর এটাও ঠিক, হাতে কিছু জোর নেই আমার—কিচ্ছু না। সর্বাঙ্গ কেমন যেন অবশ হয়ে আসছে দিন দিন—একটু জোরে মালিশ ক'রে না দিলে কামড়ানি কমবেই বা কেন? [পুনরায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া] যাই, তেলটুকু নিয়ে আসি, জীবু দোকান বন্ধ ক'রে দেবে আবার—তেলের শিশিটা সকাল থেকে তার দোকানে প'ড়ে আছে—অন্ধকারও হয়ে এল...যাই।

চলিয়া গেলেন। একটি সিনেমা-অভিনেত্রী ধীরে ধীরে ছায়ালোক হইতে নামিয়া আসিলেন। অদ্ভুত রূপসী। অভিনয়ের সময়ে যতীন ইঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছে। চোখে-মুখে-কথা চটপটে চটুলা—যতীনের ইহাই ধারণা ছিল। এখন দেখিল, তাহার চোখের দৃষ্টি বড় করুণ।

সিনেমা-অভিনেত্রী। আমার শিল্প-চর্চার অন্তরালে কি শোচনীয় অপমান—কি নিদারুণ বেদনা যে প্রচ্ছন্ন আছে, তা যদি দেখতে পেতে!

সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাশে একটি লোলচর্ম লোলুপদৃষ্টি বৃদ্ধ মূর্ত হইল। গায়ের শাল এবং হাতের আংটি দেখিয়া মনে হয়, লোকটার আর কিছু না থাক্, টাকা আছে।

বৃদ্ধ। কি করছ এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

অভিনেত্রী। [অনুযোগভরা আবদারমাখা কণ্ঠে] তোমার জন্যেই তো অপেক্ষা করছি কতক্ষণ থেকে!

বৃদ্ধ। ও। চল তা হ'লে—এই ভূপৎ সিং···

নিঃশব্দে প্রকাণ্ড একখানা মোটরকার আসিয়া দাঁড়াইল। অভিনেত্রীকে লইয়া বৃদ্ধ তাহাতে প্রবেশ করিলেন। মোটর অন্তর্হিত হইল···ধীরে ধীরে এবং অনিবার্যভাবে আর একটা দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। ছোট একখানি ঘর। দেখিলে মনে হয়, কিছুক্ষণ আগেই তাহাতে লক্ষ্মী-শ্রী ছিল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাব এখনও আছে; কিন্তু ঘরের চতুর্দিকে জিনিসপত্র ছড়ানো। ঘরের এক কোণে একটা তোলা উনুনে ভাত ফুটিতেছে। ঘরের মেঝেতে হাত-পা-বাঁধা একটি নারী, তাহার পাশেই হাত-পা-বাঁধা একটি পুরুষ। পুরুষটির গায়ে মাথায় তেল দেখিয়া মনে হয়, সে বোধ হয় স্নান করিতে যাইতেছিল। সেই পশুটা আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

পশু। কি ঠিক করলি?

নারী। [করুণ কণ্ঠে] ও জ্বরে ভুগছিল, তিন দিন খায় নি কিছু। আজ পথ্য করবে চারটি। ভাত হয়ে গেছে, আগে ওকে খেতে দাও তোমরা, তারপর সব হবে।

পশু। [পুরুষকে] আমার কথা মানবি কি না?

পুরুষ। না।

পশুটা তাহার মুখে থুতু দিল, লাথি মারিল। ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া শেষে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িটা তুলিয়া সমস্তটা তাহার মুখের উপর উপুড় করিয়া দিল।

যতীন। এই—এই—এই—কি করছ তুমি?

পশুটা যতীনের কথায় কর্ণপাত করিল না। মেয়েটার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিতে টানিতে বাহির হইয়া গেল।

ইতিহাস। তুমি বৃথা চীৎকার ক'রে মরছ। ও তোমার একটি কথা শুনতে পাচ্ছে না।

যতীন। শুনতে পাচ্ছে না!

ইতিহাস। না।

যতীন। শুনতে না পাবার কারণ?

ইতিহাস। কারণ ও মানুষ নয়, যন্ত্র। তুমি মাথা খুঁড়ে মরলেও ও থামবে না, থামবার শক্তিই নেই ওর। তোমার ঘড়িতে এখন পাঁচটা বেজেছে, ধর, কেউ যদি কাঁটা সরিয়ে দুটো ক'রে দিত, আর তুমি যদি ঘড়ির দিকে চেয়ে ক্রমাগত চীৎকার ক'রে যেতে—এখন দুটো নয়, পাঁচটা বেজেছে, কি করছ তুমি? তা হ'লে তা যেমন হাস্যকর হ'ত, তোমার এ চীৎকারও তেমনই হাস্যকর।

যতীন। কিছু করা যাবে না তা হ'লে?

ইতিহাস। (যাবে, যে হাতটা ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়েছে, সেই হাতটাকে যদি প্রভাবিত করতে পার, কিংবা ঘড়িটা নিজের আয়ত্তে এনে নিজেই যদি কাঁটা ঘুরিয়ে ঠিক ক'রে দাও, তা হ'লে যাবে।)

যতীন। তার উপায় কি ?

ইতিহাস। উপায় বার করবে তোমরা। [হাসিয়া] আমি শুধু তার বিবরণটা সংগ্রহ ক'রে রেখে দেব, যেমন রেখে আসছি বরাবর। আমার প্রাচীন অভিজ্ঞতার ছবি দেখাতে পারি খানিকটা, দেখ, তার থেকে যদি বার করতে পার কিছু।

যতীনের চোখের সম্মুখে পর পর ছবির পর ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। শতদ্রু নদীর তীর, মহাবীর আলেকজাণ্ডারের অসংখ্য অশ্বারোহী সৈন্য সমাবিষ্ট হইয়াছে··· মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক শিবিরে সমর-কৌশল শিখিতেছেন··· বাংলা দেশে গঙ্গারাঢ়ীদের বিরাট হস্তি-বাহিনী সজ্জিত হইতেছে···'বৈদিক সভ্যতা তখনও অবলুপ্ত হয় নাই··· গঙ্গার তীরে তীরে মহাসমারোহে তখনও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে··· যজ্ঞাগ্নি ধীরে ধীরে মন্দীভূত হইল....রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গোপনে গৃহত্যাগ করিতেছেন··· বোধিদ্রুমমূলে অমিতাভ বুদ্ধ··· পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সারা ভারতবর্ষ যেন স্বপ্ন দেখিতেছে.... বৌদ্ধ শ্রমণ, বৌদ্ধ বিহার, বৌদ্ধ রাজা··· অশোকের সাম্রাজ্য··· আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী··· গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও, সত্যনিষ্ঠ হও, অহিংস হও—সর্বত্র এই বাণী প্রচারিত হইতেছে—সুদূর দাক্ষিণাত্যে তাম্রপর্ণী নদীর তীরেও··· সিংহলে, গ্রীসে, ঈজিপ্টে, সিরিয়ায়··· ধীরে ধীরে অন্ধকার নামিতেছে··· অশোকের বিশাল সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে ভাঙিয়া পড়িতেছে··· বিন্দুসার অযোগ্য পুত্র··· চারিদিকে বিশৃঙ্খলা···বিরাট সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল··· বৃহদ্রথকে তাহার ব্রাহ্মণমন্ত্রী পুষ্যামিত্র হত্যা করিয়া সুঙ্গ সাম্রাজ্য স্থাপন করিতেছে··· তাহার পর কাম্ব, তাহার পর অন্ধ্র.... বাহিরের শত্রু আক্রমণ করিল··· গ্রীক, তাহার পর শক, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তক্ষশিলায় পার্থিয়ান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল। শকেরা উজ্জয়িনী অধিকার করিয়াছে··· সমস্ত ভাসিয়া গেল কুশান-আক্রমণের বন্যা-বিপ্লবে··· হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া দলে দলে ছুটিয়া আসিতেছে

কুশান অশ্বারোহীরা··· গান্ধার, তক্ষশিলা, পাঞ্জাব, ক্রমে ক্রমে সব গেল··· নর্মদার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইল কুশান সাম্রাজ্য··· তৃতীয় কুশান সম্রাট কণিষ্ক কিন্তু আর অশ্বারোহী দস্যু নন···তিনি ভারতবর্ষীয় সম্রাট··· সর্বধর্মসমন্বয় করিতে ব্যস্ত···জরথুস্ত্র, হিন্দু, গ্রীক, পারস্য সকলের দেবতাই তাঁহার আরাধ্য··· কিন্তু শেষ বয়সে তিনি বুদ্ধের শরণ লইতেছেন··· রাজধানী পুরুষপুর বৌদ্ধমন্দিরে অলঙ্কৃত হইতেছে··· কাশ্মীরের কুন্তলবনে মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থ তাম্রলিপিতে খোদিত হইয়া স্তূপ-মধ্যে রক্ষিত হইতেছে··· বৌদ্ধ সম্রাট কণিষ্কের যুদ্ধপিপাসা কিন্তু মেটে নাই···সারাজীবন ধরিয়া তিনি যুদ্ধই করিতেছেন··· কাশগড়, খোটান, ইয়ারখণ্ড, চীন···কণিষ্কের সৈন্যেরা সর্বত্র বিজয়পতাকা হস্তে বিরাজমান··· যুদ্ধের জ্বালায় পাগল হইয়া শেষে তাঁহার সেনাপতিরা কণিষ্ককে গলা টিপিয়া হত্যা করিল··· কোলাহল, অন্তর্দ্বন্দ্ব, অন্ধকার··· একশতাব্দীব্যাপী অন্ধকার.... ধীরে ধীরে অন্ধকার আবার স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে··· চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তসাম্রাজ্য স্থাপন করিতেছেন··· লিচ্ছবি-রাজকুমারী কুমারী দেবীর যোগ্য সন্তান সমুদ্রগুপ্তের কিরণে সমস্ত ভারতবর্ষ উদ্ভাসিত··· তিনি শুধু সম্রাট নন, তিনি কবি, পণ্ডিত, সুরশিল্পী··· দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত··· কুমারগুপ্ত··· স্কন্দগুপ্ত···ফাহিয়ান ভারত ভ্রমণ করিতেছেন··· অজন্তার গুহায় শিল্পীরা প্রাচীর-চিত্রণে রত··· হুন দস্যুরা ভারত আক্রমণ করিল··· গুপ্তসাম্রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত সৌন্দর্য অবলুপ্ত হইয়া যাইতেছে··· দস্যু তোরমানা মহারাজাধিরাজ হইলেন···. তাহার পর মিহিরগুলা··· মালবের অধিপতি যশোধর্মণ মগধের অধিপতি বালাদিত্যের সহিত মিলিত হইয়া মিহিরগুলাকে পরাজিত করিলেন··· তাহাকে বন্দী করিলেন, কিন্তু হত্যা করিলেন না··· মিহিরগুলা কাশ্মীররাজের আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে··· বিশ্বাসঘাতক মিহিরগুলা··· কাশ্মীর-সিংহাসন অধিকার করিল··· হাহাকারে চতুর্দিক পূর্ণ··· মিহিরগুলার অত্যাচারে বুদ্ধ-শ্রমণ-শ্রমণীরা সন্ত্রস্ত··· বৌদ্ধ স্তূপ, বৌদ্ধ মন্দির ভাঙিয়া পড়িতেছে

…হুন-প্রতাপ নির্বাপিত হইয়া আসিল… দস্যু হুন অবলুপ্ত হইয়া রূপান্তরিত হইল ভারতবর্ষের রাজপুত জাতিতে… হর্ষবর্ধন… গৌড়াধিপতি শৈব রাজপুত্র শশাঙ্ক থানীশ্বররাজ বৌদ্ধ হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন…হিউয়েন সাং… তাহার পর অন্ধকার… আবার যুদ্ধ… যুদ্ধ… গৃহবিবাদ… চীৎকার… হাহাকার…আবার আলো… বিরাট জনতা এক বিরাট সিংহাসন মাথায় করিয়া বহিয়া আনিতেছে…সিংহাসনের উপর প্রজা-নির্বাচিত রাজা গোপালদেব… ধর্মপাল দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছেন… দেবপাল…তাহার পর আবার অন্ধকার… কাবুলে শাহী-বংশীয় জয়পাল মাথা তুলিতেছে… সবুক্তগীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল… চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়িয়াছে… কাণ্যকুব্জ চৌহান চন্দেল্ল সকলে ছুটিয়া আসিতেছেন… সবুক্তগীনকে কিন্তু রোধ করা গেল না…সিন্ধুনদের তীরে তীরে সবুক্তগীনের বিজয়-পতাকা উড়িতেছে… গজনী হইতে ছুটিয়া আসিল আর এক দস্যু… সুলতান মামুদ… আবার জয়পাল তাহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন …পারিলেন না… ক্ষোভে অপমানে তিনি স্থির করিতেছেন—প্রাণ দিব, কিন্তু মান দিব না… জীবন্তে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিলেন… সুলতান মামুদের লুণ্ঠন-লিপ্সা মিটিল না… বারম্বার আসিতেছে… বারম্বার আক্রমণ করিয়া হত্যায় লুণ্ঠনে ধ্বংসে বিচূর্ণিত দেব-মন্দিরে ভারতবর্ষে মুসলমান-বিদ্বেষ বপন করিয়া যাইতেছে… মুলতান, থানেশ্বর, সোমনাথ সব গেল… সুলতান মামুদের সৈন্যবাহিনী হইতে সহসা একটি লোক বাহির হইয়া আসিলেন। যোদ্ধা নয়, পণ্ডিত। যতীনের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন…

যতীন। কে আপনি?

লোকটি। আমার নাম আলবেরুনি। একটিমাত্র খবর দিতে চাই কেবল। সে সময় তোমাদের দেশে সাহিত্য-দর্শন খুব উঁচুদরের ছিল…কিন্তু একটা কি জিনিস দেখেছিলাম জান? তোমরা মানুষের

মধ্যে 'ম্লেচ্ছ' আবিষ্কার করেছ। বিদেশী ছুঁলে জল তো বটেই, আগুনও অপবিত্র হয়ে যেত। কি ভয়ানক!

আলবেরুনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আবার ছবির মিছিল শুরু হইল। ...বৃদ্ধ দীপঙ্কর অতীশ হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া তিব্বতে চলিয়াছেন... বঙ্গদেশে সেন-বংশ রাজত্ব করিতেছে... কর্ণাটের সেন-বংশ বাংলায় আসিয়া বৌদ্ধ-দলনে নিযুক্ত... বিজয় সেন...বল্লাল সেন...কাণ্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়া কৌলিন্য স্থাপন করিলেন... অন্ধকার... লক্ষ্মণ সেন... বাংলায় পাঠান সৈন্য প্রবেশ করিতেছে...সপ্তদশ অশ্বারোহীর পুরোভাগে বক্তিয়ার খিলিজি... খিলিজিবংশের রাজত্ব শুরু হইয়া গেল... পিতৃব্যরক্তরঞ্জিত হস্তে আলাউদ্দিন খিলিজি সিংহাসনে আরোহণ করিল... গুজরাটের রাণী কমলা দেবী বন্দিনী হইয়া আলাউদ্দিনের হারেম-কারাগারে প্রবেশ করিতেছেন...রূপসী হিন্দুনারীর লোভে পাঠান পাগল হইয়া উঠিয়াছে... মেবার আক্রমণ করিল... চিতোরে দলে দলে মেবারী সৈন্য প্রাণ দিতেছে...একজন পুরুষ বাঁচিয়া থাকিতে তাহারা চিতোরে পাঠানকে প্রবেশ করিতে দিবে না... গোরা কিশোর বাদলও সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ দিল...কিন্তু চিতোর রাখিতে পারিল না...পাঠান সৈন্য অগণিত—চিতোরে প্রবেশ করিয়া আলাউদ্দিন দেখিল, পদ্মিনী নাই... দাউদাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে...জহর-ব্রতের জহর খিলিজি-বংশকে ছারখার করিয়া দিল... পদ্মিনীর চিতার আগুনই যেন লেলিহান শিখায় মূর্ত হইল তৈমুরলঙ্গে... চতুর্দিক শবাকীর্ণ...নরমুণ্ডের পাহাড়... রক্ত-কর্দমে দিল্লীর সুলতান-বংশ ধরাশায়ী...রাজা গণেশ মাথা তুলিয়াছেন... খ্রীষ্টান ইউরোপীয় বণিকেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল... পর্তুগীজ জলদস্যুরা অত্যাচার করিয়া বেড়াইতেছে...লোদী-বংশ...তাহাও বেশি দিন টিকিল না... পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী বাবরের নিকট পরাজিত হইল... মোগল সাম্রাজ্য... হুমায়ুন... শের শাহ... হুমায়ুন নিজ ভ্রাতা

কামরানের চক্ষু উৎপাটন করিতেছেন··· আকবর···আকবরের রাজ্য-বিস্তার··· বাংলার পাঠান-নায়ক হিমু পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আকবরের নিকট পরাজিত হইলেন—বৈরামের হস্তে তাঁহার মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হইতেছে··· গুজরাট, খাণ্ডোয়ানা, আহমদ-নগর, অম্বর, সব গেল··· অম্বরপতি ভগবানদাস সম্রাট আকবরের শ্যালক হইলেন··· তাঁহার পুত্র মানসিংহ হইলেন যুবরাজ সেলিমের শ্যালক। পাহাড়ের মত মাথা উঁচু করিয়া রহিলেন কেবল উদয়পুরের রাণা প্রতাপসিংহ··· আকবরের খুশরোজ···সম্ভ্রান্ত হিন্দু-পুরনারীরা আকবরের উদ্যান-উৎসবে সমবেত হইতেছেন··· সেলিম জাহাঙ্গীর হইল··· বর্ধমানের শের আফগান···স্বামী-হন্তা জাহাঙ্গীরের পাশে নূরজাহান শোভা পাইতেছেন··· ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেম্‌সের দূত সার্ টমাস রো জাহাঙ্গীরের সভায় আসিয়াছেন··· শাহজাহান···নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খসরুর চক্ষু উৎপাটন করিয়া পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন···কনিষ্ঠ ভ্রাতা শারিয়রও রক্ষা পাইলেন না··· ইংরেজ বণিক হুগলিতে কুঠি স্থাপন করিতেছে··· ময়ূর-সিংহাসন··· তাজমহল··· ভ্রাতৃরক্তে স্নান করিয়া বন্দী পিতার চোখের সামনে ঔরঙ্গজেব ময়ূর-সিংহাসন দখল করিতেছেন···এক হাতে কোরাণ আর-এক হাতে কৃপাণ··· জিজিয়া কর পুনরায় প্রবর্তিত হইতেছে··· পর্বতের শিখরে শিখরে গৈরিক পতাকা উড়িতেছে··· মহারাষ্ট্রবীর ছত্রপতি শিবাজী মাথা তুলিয়াছেন···অশ্বারোহণে চতুর্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন··· ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে গেলেন···দাক্ষিণাত্যেই তাঁহাকে শেষ-শয্যা পাতিতে হইল··· মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হইয়া আসিতেছে··· নাদির শাহ···দিল্লীর লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড···সারি সারি মৃতদেহ···সারি সারি উট চলিয়াছে···বহু অশ্ব···কাতারে কাতারে গাড়ি··· ময়ূর-সিংহাসন, কোহিনূর, কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা—ভারতবর্ষের বিপুল ঐশ্বর্য নাদির শাহ বহিয়া লইয়া চলিয়াছে··· মারাঠার অভ্যুদয়··· পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ··· সারি সারি তিন শত তোপ, দ্বাদশ সহস্র তোপরক্ষক··

তাহার পিছনে চল্লিশ সহস্র ভোঁসলে, বিংশ সহস্র আরব, ত্রিশ সহস্র হাবসি, চল্লিশ সহস্র পাঠান, জাঠ, রোহিলা, সিন্ধি, জাদব, বহু রাজপুত, জগ্‌কোজি সিন্ধিয়া এবং মহল্লর রাও হোলকারের নেতৃত্বে আহমাদ শাহ দুরানির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান…মধ্যস্থলে সেনাপতি ভাউসাহেব…ঈর্ষাদগ্ধ বিশ্বাসঘাতক বলবন্ত রাও সৈঁচলের চোখে পৈশাচিক হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে… মহারাষ্ট্রশক্তির পরাজয় ঘটিল… আবার অন্ধকার…ইংরেজ বণিকের দল…ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি…ফরাসী বীর ডুপ্লে… প্রথম কর্ণাট যুদ্ধ…দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধ…রবার্ট ক্লাইভ…সিরাজদ্দৌলা… মীরজাফর…পলাশীর যুদ্ধ…ওয়ারেন হেস্টিংস…নন্দকুমারের ফাঁসি… লর্ড ডালহৌসি…দেখিতে দেখিতে সব লাল হইয়া গেল…সিপাহী-বিদ্রোহ… রুটি ও লালপদ্ম… সিপাহী-বিদ্রোহের অবসান ঘটিল… ইংরেজের ভীষণ প্রতিশোধ… বিশেষ করিয়া মুসলমানদের উপর অত্যাচার…দিল্লীর হত্যাকাণ্ড নির্মমতায় নাদির শাহকে অতিক্রম করিল… সুরেন বাঁড়ুজ্জে…কংগ্রেস…বঙ্গবিচ্ছেদ…সাগ্নিক বিপ্লবীর দল… এক হাতে গীতা, আর-এক হাতে বোমা… সারি সারি ফাঁসি-কাঠে অসংখ্য মড়া ঝুলিতেছে… অরবিন্দ, সুভাষ বসু, চিত্তরঞ্জন… জালিয়ানওয়ালাবাগ…বুকে হাঁটিয়া সকলকে পথ অতিক্রম করিতে বাধ্য করা হইতেছে… চাবুকের চোটে সকলের পিঠের চামড়া ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল…চতুর্দিকে হত্যা আর হাহাকার… যতীন আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

যতীন। আর তো দেখা যায় না…এ ছাড়া আর কিছু নেই ?

ইতিহাস। না, এরাও আছে—

এক জ্যোতির্ময় পটভূমিকায় আসিয়া দাঁড়াইলেন—বাল্মীকি, ব্যাস, কপিল, কণাদ, গৌতম, পাতঞ্জল, জৈমিনি, চরক, নাগার্জুন অশ্বঘোষ, বসুমিত্র, হরিসেন, কালিদাস, ভবভূতি, ভাস, শঙ্করাচার্য রামানুজ,

বাণভট্ট, সুবন্ধু, ভারবী, শ্রীহর্ষ, মাঘ, কহ্লন, বিহ্লন, নন্দী, আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য, খনা, লীলাবতী, রঘুনন্দন, মাধবাচার্য, রামানন্দ, কবীর, নানক, গুরুগোবিন্দ সিং, চৈতন্য, ফৈজি, আবুল ফজল, টোডরমল, তানসেন, বীরবল···তাহার পর কিছুক্ষণ অন্ধকার···পটভূমিকা আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল···দেখা গেল রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ···তাহার পর ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল মহাত্মা গান্ধীর ছবি···অসহযোগ অন্দোলন···চম্পারণ সত্যাগ্রহ··· দাণ্ডি অভিযান···শীর্ণকান্তি খর্ব ব্যক্তিটি লাঠির উপর ভর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছেন···নগ্নগাত্র পরিধানে শুভ্র খদ্দরের কটিবাস···পশ্চাতে বিরাট জনতা আব্রাহ্মণ চণ্ডাল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সব চলিয়াছে··· জনতার ভিতর হইতে গুঞ্জন উঠিতেছে···জনতার দৃশ্য মিলাইয়া গেল। ইতিহাসও অদৃশ্য হইলেন। কিন্তু গুঞ্জনটা থামিল না। ঘাড় ফিরাইয়া যতীন দেখিল, ভ্রমরটা ঘরের ভিতরে গুনগুন করিয়া বেড়াইতেছে। কখন ঢুকিয়াছে, সে টের পায় নাই।

যতীন। তুমি আবার এলে যে?

ভ্রমর। আমি খুঁজছি।

যতীন। কাকে?

ভ্রমর। তাকে।

যতীন। কে সে?

ভ্রমর। তা তো জানি না।

যতীন। যাকে জান না, তাকে খুঁজছ!

ভ্রমর। জানি, কিন্তু তোমাকে বোঝাতে পারব না।

বাহিরে পাখির সুর শোনা গেল—ফটিক জল, ফটি—ক জল। আর একটা দৃশ্য চকিতে ফুটিয়া মিলাইয়া গেল। নোয়াখালির জঙ্গলে

মহাত্মাজী অন্ধকারে কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন—সঙ্কীর্ণ সাঁকো পার হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

যতীন। আমি কিন্তু যা জানি, তা তোমাকে বোঝাতে পারি।

ভ্রমর। তার মানেই, ঠিক জান না।

যতীন। জানি না? বল কি?

ভ্রমর। অন্তরের গভীর অনুভূতি কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়?

সহসা এক অদ্ভুত রূপান্তর ঘটিল। ভ্রমর দেখিতে দেখিতে উপনিষদের ঋষি-মূর্তি পরিগ্রহ করিল। তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ বর্ণ, পিঙ্গল কেশ, নীল নয়ন, ঋজু সমুন্নত দেহ, জ্যোতির্ময়।

উপনিষদের ঋষি। যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ—যে ভাবে, আমি জানিয়াছি, সে জানে নাই; যে মনে করে, আমি জানি না, সে-ই জানিয়াছে।

ঋষি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইলেন। ভ্রমর আবার ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

যতীন। অজানাকে খুঁজবে তা হ'লে কোন্ পথে?

ভ্রমর। অজানা পথে।

যতীন। কিন্তু তুমি তো ঘুরে বেড়াচ্ছ আমার ঘরের মধ্যে, এর সমস্তই তো জানা তোমার!

ভ্রমর। জানার মধ্যেই অজানা থাকে। আপাত-তৃপ্তির মধ্যেই লুকিয়ে থাকে যে-পিপাসা, সেই অজানা পথের সন্ধান দেয়।

বাহিরে শোনা গেল—ফটিক জল—ফটিক জল…

ভ্রমর। আমি চললাম। তোমাকে বলা রইল, একটু খোঁজ রেখো।

যতীন। কিসের খোঁজ রাখব, তাই তো বুঝতে পারলাম না!

ভ্রমর। খোঁজ পেলেই বুঝতে পারবে। চললাম।

ভ্রমর চলিয়া গেল। অশরীরী মেজদি প্রবেশ করিলেন।

মেজদি। ও মিছে কথা বলে নি। আমারও মনে হচ্ছে, এই যে আমার মাথার দপদপানি, হাতের কনকনানি, বুকের ভেতর হু-হু করছে, এর আসল কারণ, তাকে খুঁজে পাই নি। দেখি—

অসহায়ভাবে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। সশরীরে রুমি প্রবেশ করিল। মুখ অতিশয় গম্ভীর, মনে হইতেছে, যেন চোখে মুখে ঝঞ্ঝা স্তব্ধ হইয়া আছে।

রুমি। আজকের পত্রিকাটা কি এখানে?

যতীন। হ্যাঁ।

রুমি। নোয়াখালির খবর পড়েছ?

যতীন। পড়েছি।

রুমি। আমি নীচে বাংলা কাগজটায় পড়লাম। কি ভয়ানক!

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনাইয়া উঠিল।

রুমি। এখানেও দাঙ্গা লেগেছে। নীচে বৈঠকখানায় প্রকাণ্ড মীটিং। বড়দা মেজদা দুজনেই ক্ষেপে গেছেন। সেজবউদির ঘন ঘন ফিট হচ্ছে—নীলু-বিলুর কোনও খবর আসে নি। . .

যতীন। নীলু-বিলু নোয়াখালি থেকে ঢাকায় চ'লে এসেছে হয়তো, ওদের সকলেরই তো ঢাকা আসার কথা।

রুমি। কেন যে সেজবউদি ওদের মামার বাড়ি পাঠাতে গেল এখন!

যতীন। ছুটিতে বেড়াতে গেছে, এমন হবে কে জানত?

রুমি। তুমি ওটা কি লিখেছ?

যতীন। না, এখনই চাই নাকি?

রুমি। না, থাক্, এখন দরকার নেই। ও পরে হ'লেও চলবে। এখন [একটু ইতস্তত করিয়া] আমাকে কিছু টাকা দিতে পারবে ছোটদা। হাতে টাকা আছে তোমার?

যতীন। কেন?

রুমি। আমি নোয়াখালি যাব।

যতীন। নোয়াখালি! একা?

রুমি। হ্যাঁ, একাই। সেখানে নীলু বিলু আছে, তা ছাড়া মেয়েদের উপর যে ভীষণ অত্যাচার হয়েছে, তা শুনে এখানে স্থির হয়ে ব'সে থাকা অসম্ভব আমার পক্ষে। আমাকে যেতেই হবে।

যতীন। চল্, আমিও না হয় যাই তোর সঙ্গে।

রুমি। তা গেলে তো ভালই হ'ত, কিন্তু এখন তোমার যাওয়া হবে না। বড়দা মেজদা ঠিক করেছেন এখনই বেরিয়ে যাবেন, সেজদা ঠাকুরঘরে গিয়ে খিল দিয়েছেন। কেউ বাড়িতে থাকবে না, বড়দা ঠিক করেছেন, তোমাকেই বাড়ি আগলাতে হবে। পাড়ায় কোথায় কোন্ ভলাণ্টিয়ার থাকবে, তাই ঠিক হচ্ছে। এই ফাঁকে আমি চুপিচুপি চ'লে যেতে চাই স্টেশনের দিকে খিড়কি দিয়ে। ট্রেন ছাড়বার আগে ওঁরা যেন ঘুণাক্ষরে জানতে না পারেন, দেখো—তা হ'লে কিছুতেই যেতে দেবেন না আমাকে। আমি কিন্তু যাবই—টাকা আছে তোমার কাছে তো? আমার স্কলারশিপের টাকাগুলো তো তোমাকে রাখতে দিয়েছিলাম, কোথা রেখেছ সেগুলো?

যতীন। টাকা আছে। কিন্তু তোকে ওই বিপদের মধ্যে যেতে দিতে আমারও ইচ্ছে করছে না রুমি।

রুমি। [দৃঢ়স্বরে] আমি কিন্তু যাব।

যতীন। [হাসিয়া] টাকা যদি না দিই?

রুমি। হেঁটে যাব। কি ক'রে বলছ তুমি এ কথা ছোটদা! মেয়েদের এতবড় অপমান সহ্য করব ঘরে ব'সে ব'সে?

যতীন। গিয়েই বা কি করবি তুই?

রুমি। সমস্ত প্রাণ তুচ্ছ ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ব তাদের মাঝখানে, সমস্ত বুক দিয়ে আগলাব, সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করব।

যতীন। কিন্তু—

রুমি। দাও, টাকা দাও। না দিলে এই দেওয়ালে মাথা ঠুকে মরব আমি। উঃ, কি অসহায় ক'রে রেখেছ তোমরা আমাদের!

যতীন। পুরুষের কর্তব্য নারীদের রক্ষা করা, তাই বলছি।

রুমি। তোমরা নিজেদেরই রক্ষা করতে পার না, আমাদের রক্ষা করবে কি ক'রে? রক্ষা করবার অজুহাতে পঙ্গু ক'রে রেখেছ শুধু। দাও, [প্রায় চীৎকার করিয়া] দাও না—

যতীন। দিচ্ছি, দিচ্ছি। দাদারা বেরিয়ে গেলে তবে তো যাবি, ব্যস্ত কি?

রুমি। ট্রেনের বেশি দেরি নেই। আমি খিড়কি-দরজা দিয়ে এখনই বেরিয়ে যেতে চাই।

যতীন। তোর ভয় করছে না?

রুমি। ভারতবর্ষের মেয়েরা আবার ভয় করেছে কবে! গার্গী মৈত্রেয়ী থেকে শুরু ক'রে অহল্যাবাঈ, রাণী ভবানী, কস্তুরবা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, কমলা নেহেরু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, বীণা দাস, প্রীতি ওয়াদ্দার, সুচেতা কৃপালনীর যা ইতিহাস, তা কি ভয়ের ইতিহাস?

রুমির চোখ মুখ হইতে এক অপরূপ আলো বিকীর্ণ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার সমস্ত দেহটাই জ্যোতিতে রূপান্তরিত হইয়া

গেল। সেই জ্যোতি ভেদ করিয়া আবিভূ'ত হইলেন রাণী দুর্গাবতী ও চাঁদ সুলতানা—

রাণী দুর্গাবতী। তোমরা এর মধ্যেই কি ক'রে ভুলে গেলে যে, এই সেদিনই সম্রাট আকবরের বিপুল বাহিনীকে তুচ্ছ ক'রে সামান্য রাজপুতানী আমি সম্মুখ-সমরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, প্রাণ দিয়েছিলাম, কিন্তু মান দিই নি?

চাঁদ সুলতানা। মান দেওয়ার কথা ভাবতেই পারে না ভারতবর্ষের নারীরা। তারা জানে, নারীদের অপমান করে যে শয়তানরা, আসলে তারা দুর্বল ভীরু। তাদের হুমকিতে ভয় পায় নি কখনও আত্মসম্মানবতী ভারতরমণী। তাই শয়তান মোরাদের বিরুদ্ধে ভগ্ন দুর্গ-প্রাকারে দাঁড়িয়ে অসিহস্তে যুদ্ধ করতে করতে হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছিলাম নির্ভয়ে। কারণ মুসলমানী হ'লেও আমি ভারতরমণী। প্রাণ দিয়েছিলাম; কিন্তু মরি নি, আজও আমরা বেঁচে আছি এদের মধ্যে—

হস্ত প্রসারিত করিলেন। জ্যোতির্ময় দৃশ্য মুছিয়া গেল। যতীন দেখিল, রুমি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে—প্রদীপ্তনয়না, স্ফুরিতাধরা, বিদ্র

রুমি। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না ছোটদা, দেবে তো দাও।

যতীন। এই যে দিচ্ছি। আজ ডাক আসে নি?

রুমি। আমার একখানা চিঠি এসেছিল শুধু।

যতীন। কার চিঠি?

রুমি। উষা লিখেছে।

যতীন। সমরের বোন উষা?

রুমি। হ্যাঁ।

যতীন। সমরের খবর কি ?

রুমি। সমর নোয়াখালিতে গুণ্ডার হাতে মারা গেছে।

যতীন। সে কি !

যতীন নির্নিমেষে রুমির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রুমির মুখের একটি পেশীও বিচলিত হইতেছে না···চোখের দৃষ্টি কঠোর প্রদীপ্ত। শাণিত অসির মত।

রুমি। কতক্ষণ আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখবে ছোটদা ?

যতীন। এই যে দিচ্ছি।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া টাকা বাহির করিয়া দিল। রুমি চলিয়া গেল। যাইবার সঙ্গে সঙ্গে যতীন কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, সকলে, এমন কি রুমিও, কর্তব্যে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে, সে-ই কেবল অলসের মত বসিয়া স্বপ্নের জাল বুনিতেছে। পাড়ার শৈলেনবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। শৈলেন তথাকথিত কমিউনিস্ট।

শৈলেন। তুমি কি করছ হে যতীন, তেতলার ঘরে ব'সে ? যুদ্ধে যাবে না ? তোমার দাদারা তো সম্মুখ-সমরের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন।

যতীন। সম্মুখ-সমরের জন্যে ! তাই নাকি ?

শৈলেন। হ্যাঁ, ওদের বস্তিটা আক্রমণ করবার আয়োজন হচ্ছে।

যতীন। আপনিও যাবেন ?

শৈলেন। আমি ? [হাসিলেন] না, আমি যাব না। [গম্ভীর হইয়া গেলেন। পুনরায় হাসিয়া] যেতাম, যদি তোমার বড়দার মতের সঙ্গে সায় দিতে পারতাম। কিন্তু পারলাম না। আমি মনে করি, মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবিটা সঙ্গত দাবি। সেটা মেনে নিলে

আর ঝগড়া থাকে না। হাজার মারপিট ক'রেও কোন ফল হবে না, যতক্ষণ না আসল সমস্যাটার সমাধান হচ্ছে। তোমার কি মত?

যতীন। আমার তো মনে হয়, আপাতত আমাদের আসল সমস্যা পরাধীনতা। আমাদের সকলেরই আগে চেষ্টা করা উচিত তার থেকে মুক্তি পাবার। স্বাধীনতা-অর্জনের চেষ্টায় যারা বাধা দেবে, তারাই আমাদের শত্রু—তা সে হিন্দু মুসলমান যেই হোক।

শৈলেন। পাকিস্তান যারা চায়, তারাও ঠিক ওই কথা বলছে। কিন্তু স্বাধীনতা পাবার আগে তারা জানতে চায়, ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতে তাদের অবস্থাটা কি হবে অর্থাৎ তাদের ধর্ম সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ থাকবে কি না! যে দেশে শতকরা পঁচাত্তর জন হিন্দু, সেখানে তাদের এ দাবিটা কি অগ্রাহ্য করবার মত?

যতীন। দাবিটা গ্রাহ্য করবার মত হ'লে কেউ তা অগ্রাহ্য করত না, করতে পারত না। ইতিহাসের দিক দিয়ে পাকিস্তানের কোন ভিত্তি নেই। ভৌগোলিক ঐক্য যে নেই, তা আশা করি আপনিও মানবেন। পূর্ব-পাকিস্তান আর পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে সহস্র মাইলের ব্যবধান, দক্ষিণ-ভারতের হিন্দুপ্রধান হায়দ্রাবাদ ওসমানিস্তান হবে নাকি শুনছি! সংস্কৃতির দিক থেকেই বা ঐক্য কোথায়? পেশোয়ারী মুসলমান আর নোয়াখালির মুসলমানের সংস্কৃতি কি এক? ষষ্ঠ শতাব্দীর ইসলাম-সংস্কৃতি কি কোন দেশে আছে এখন আর? বর্তমান ইসলাম-জগৎ অনেক দিন তার থেকে বহুদূরে স'রে গেছে, প্রত্যেক ইসলাম-দেশের এখন আলাদা চেহারা, আলাদা আদর্শ। মিশরে অর্ধরাজতন্ত্র, প্যালেস্টাইনে গোলযোগতন্ত্র, সিরিয়াতে প্রজাতন্ত্র, আরবে ইবন সাউদের ইচ্ছাতন্ত্র, ট্রান্সজর্ডনে আমিরতন্ত্র। ইরাকের শিশুরাজাকে কেন্দ্র ক'রে যে রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠছে, তা কি ইসলাম-রাষ্ট্র? আফগানিস্তান কার ইঙ্গিতে চলেছে? সুতরাং পাকিস্তানের দাবির যুক্তি কোথায়? রাষ্ট্রগঠনের পটভূমিকায় যে সব জিনিস থাকা দরকার—ভৌগোলিক ঐক্য, সংস্কৃতির ঐক্য, আদর্শ-নিষ্ঠা, আদর্শের সার্বভৌমিকতা

—পাকিস্তানের তা আছে কি? যাঁরা আজ পাকিস্তানের পরিকল্পনা করছেন, তাঁরাই কি আচারে ব্যবহারে কর্মে চিন্তায় ইসলাম-আদর্শকে অনুসরণ করেন? তা ছাড়া আরও একটা কথা। রাশিয়াতে মুসলমান আছে, চীনে মুসলমান আছে, কই, সে সব দেশে তো পাকিস্তান হয় নি, আর হয় নি ব'লে যে সে দেশে মুসলমান-সংস্কৃতি লোপ পেয়েছে তাও নয়।

শৈলেন। সবচেয়ে বড় যুক্তি—ওরা ভয় পাচ্ছে যে, স্বাধীন ভারতে হিন্দুর প্রাধান্য হ'লে ওদের অবলুপ্ত হয়ে যেতে হবে।

যতীন। [হাসিয়া] ভয়টা ওদের নয়, ভয়টা আসলে ইংরেজদের। মুখোশটা তো খুলেই গেছে এখন। ওদের মাইনরিটির জন্যে চমৎকার চিন্তা আসলে যে ওদের অন্নচিন্তাচমৎকারা, তা আর বুঝতে কারও বাকি নেই। মজ্জমান ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম পাকিস্তান-খড় আঁকড়ে বাঁচতে চাইছে।

শৈলেন। সেটা তোমরা বলছ বটে, কিন্তু হিন্দু মেজরিটির হাতে ওরা যে নিরাপদ নয়, সে কথা মানতেই হবে।

যতীন। ইতিহাসের নজির কিন্তু অন্য রকম। মোগল সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনেও কোনও মুসলমান কি সংস্কৃতিলোপের ভয়ে হিন্দুরাজ্য ত্যাগ করেছে? মানসিংহ রাজমহলে মুসলমানদের জন্য মসজিদ করিয়েছিলেন, রাজা জয়সিংহ করেছিলেন জয়পুরে। মালবের হিন্দু রাজারা মুসলমান প্রজাদের জন্য মক্তব করিয়েছিলেন, মুসলমান মৌলভীদের বৃত্তি দিতে দ্বিধা করেন নি। ঔরংজেবের অত্যাচারেই বরং শিয়া মুসলমানেরা দাক্ষিণাত্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। হিন্দুরাজ্যে যৌথভাবে মুসলমাননারী-নির্যাতনের কটা দৃষ্টান্ত দিতে পারেন আপনি? ঔরংজেব-মহিষী শিবাজীর হাতে বন্দিনী হয়েও সসম্মানে স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পেরেছিলেন। খোঁজ ক'রে দেখুন, প্রত্যেক হিন্দু রাজার অধীনে সব সময়েই মুসলমানেরা স্বেচ্ছায় সৈন্য-বিভাগে চাকরি করত। মারহাট্টারাই বিজাপুর-গোলকুণ্ডা-পতনের পর আশ্রয় দিয়েছিল

মুসলমানদের। বার-ভুইঞার মধ্যে মাত্র তিনজন মুসলমান ছিলেন। চান্দ রায়ের ভগ্নী সোনামনিকে হরণ ক'রেই তো ইসা খাঁ মুসা খাঁর রাজ্য ধ্বংস হ'ল। মুসলমান রাজত্বের অবসানে মুসলিম অত্যাচারের ভয়ে মধ্যভারত থেকে মুসলমানরা দলে দলে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে—হিন্দুরাজ্যে। বিচার ক'রে দেখলেও এটা বোঝা শক্ত নয় যে, হিন্দুধর্মই একমাত্র ধর্ম, যা শুধু ইসলামকে কেন, যে কোন ধর্মকেই প্রসন্নচিত্তে আশ্রয় দিতে পারে। কারণ সনাতন হিন্দুধর্মের কোনও' গণ্ডি নেই, কোনও বেড়া নেই, অসীম উদারতাই এর বিশেষত্ব। মুসলমানদের ভয়টা অমূলক, অখণ্ড ভারতে ওরা আনন্দেই থাকবে।

শৈলেন। [হাসিয়া] দেখ ভায়া, যা আওড়ালে তা, কেতাবের মুখস্থ বুলি। হিন্দুধর্মের উদারতার নজির দেখতে পাবে পাড়াগাঁয়ের পুকুরঘাটে গেলে। হিন্দুর ঘাটে মুসলমান জল নিতে পায় না, হিন্দুর গ্রামে মুসলমানের কোরবানি' করবার উপায় নেই। হিন্দুধর্মের উদারতার ঠেলায় আর একটা নতুন জাতই তৈরি হয়ে উঠছে— শিডিউল্‌ড কাস্ট্‌।

যতীন। সেটা হিন্দুধর্মের দোষ নয়, অশিক্ষার দোষ। বহুদিন পরাধীন থেকে আত্মবিস্মৃত হয়েছি। শিডিউল্‌ড কাস্ট্‌—এখনকার বুলি। ভারতের সনাতান ধর্ম যে অস্পৃশ্যকে ঘৃণা করে নি, তার প্রমাণ—কবীর, নানক, দাদু, রজ্জব, কত নাম করব? না, স্বাধীন ভারতে ভারতধর্মই প্রতিষ্ঠিত হবে, অস্পৃশ্যতা ব'লে কিছু থাকবে না। এখন থেকেই তা দূর করবার চেষ্টা চলেছে। সফলও হবে সে চেষ্টা। ওর জন্যে ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করার দরকার নেই। অখণ্ড ভারতই আমাদের কাম্য।

শৈলেন। আচ্ছা, হঠাৎ আজ তোমরা অখণ্ড ভারতের ধুয়ো তুলেছ কেন, বুঝি না। অখণ্ড ভারত কি ছিল কোনকালে? রামায়ণ-মহাভারতের আমল থেকেই দেখ না, পঞ্চাশটা দেশের পঞ্চাশটা রাজা

পরস্পরের মধ্যে মারামারি করছে। আরও এগিয়ে এস, থানীশ্বরের সঙ্গে মৌখরী, গৌড়ের সঙ্গে থানীশ্বর, পৌণ্ড্রের সঙ্গে বঙ্গ, বঙ্গের সঙ্গে সমতট—কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ। আর সকলের মূলে ওই সেল্‌ফ-ডিটারমিনেশন—প্রত্যেকেই নিজের সংস্কৃতি বাঁচাতে চায় এবং প্রচার করতে চায়। কারও দেবতা বিষ্ণু, কারও শিব, কেউ বৌদ্ধ, কেউ শাক্ত। এ ছাড়া আর কি আছে? ক্রমাগত দেখে যাও, এই পাবে। এই যাদের ইতিহাস—মানে, দেশের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—হঠাৎ তাদের আজ অখণ্ড ভারত ব'লে চীৎকার করবার মানে?

যতীন। কারণ ওইটেই আদর্শ। ইতিহাসেই দেখা গেছে, যখনই ভারত অখণ্ড হয়েছে কিংবা অখণ্ডতার কাছাকাছি এসেছে, তখনই তার সমৃদ্ধি। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, হর্ষবর্ধন, ধর্মপাল, আকবর প্রভৃতি তার উদাহরণ, এমন কি ইংরেজ-রাজত্বের নিষ্ঠুর শোষণ সত্ত্বেও আমাদের যা কিছু উন্নতি তা ভারতের অখণ্ডতার জন্যে—ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্রতন্ত্রে তাই আমরা অখণ্ডতা চাই।

শৈলেন। কিন্তু এই ছত্রিশ জাতের মধ্যে অখণ্ডতা রাখতে হ'লে যে নিরপেক্ষতার প্রয়োজন, তা কি ওই হিন্দু-মেজরিটি স্বাধীন রাষ্ট্রতন্ত্রে থাকবে? বিদেশী ইংরেজের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা অসম্ভব ছিল তবু কতকটা। সুতরাং মুসলমানদের ভয়টা অমূলক নয়।

মেজদা প্রবেশ করিলেন এবং শৈলেনবাবুর কথার খানিকটা শুনিতে পাইলেন।

মেজদা। মুসলমানদের ভয়? কে মুসলমানদের ভয় করছে?

ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া এমনভাবে চাহিলেন, যেন মুসলমান-ভীত কোনও লোকের সান্নিধ্য তিনি সহ্য করিতে প্রস্তুত নন।

শৈলেন। [হাসিয়া] না, মুসলমানকে ভয় করছে না কেউ। আমি যতীনকে শুধু বোঝাচ্ছিলাম যে, মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবিটা অসঙ্গত নয় নিতান্ত।

মেজদা। [অপ্রত্যাশিত রুক্ষকণ্ঠে] দেখ শৈলেন, তোমার ওই কমিউনিস্টিক বুজরুকি নিয়ে স'রে পড় মানে মানে বলছি। তা না হ'লে অপমানিত হবে।

শৈলেন। [সবিস্ময়ে] হঠাৎ আমার উপর রাগের কারণ! [হাসিয়া] যাঃ বাবা!

মেজদা। কারণ তোমাদেরও আমি মুসলমান ব'লে মনে করি। মেটিয়াবুরুজে তোমরা যা করেছ, তা কাগজে প'ড়ে অবধি আপাদমস্তক জ্বলছে। তুমি পাড়ার ছেলে, অনেকদিনের আলাপ, [তিক্ত হাসি হাসিয়া] হিন্দু কিনা, তাই এ দুর্বলতাটুকু কাটিয়ে উঠতে পারি নি এখনও, কিন্তু ব্যারোমিটার যে রকম নাবছে তরতর ক'রে, কি হয় বলা যায় না। স'রে পড়।

শৈলেন। মেটিয়াবুরুজে কোথায় কে কি করেছে তার জন্যে আমার উপর ঝাল ঝাড়বে! আশ্চর্য বিচারবুদ্ধি তোমার!

মেজদা। সেদিন গোখরো সাপটা মারবার বেলায় তোমার বিচারবুদ্ধিও এই রকম ছিল। সে তো তোমায় কামড়ায় নি কিংবা কাউকে কামড়াতেও যায় নি, খড়ের গাদায় লুকিয়ে ছিল। মারলে কেন তাকে?

শৈলেন। উপমাগুলো একটু ভদ্রলোকের মত দিলেই ভাল হয়। মানুষের সঙ্গে সাপের তুলনা যে চলে না, সে বুদ্ধিটুকু তোমার কাছে প্রত্যাশা করি অন্তত মেজদা।

অনুকম্পাভরে একটি সবজান্তাগোছ হাসি হাসিল।

মেজদা। [সহসা সপ্তমে চড়িয়া] বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

ঠাস করিয়া তাহার গালে একটা চড় মারিলেন। শৈলেনবাবু পড়িয়া যাইতেছিলেন, যতীন ধরিয়া ফেলিল এবং চেয়ারটায় বসাইয়া দিল।

যতীন। ছি ছি, মেজদা, কি করলে তুমি ?

মেজদা। বেশ করেছি। ঘাড়ধাক্কা দিয়ে দূর ক'রে দে। সাপের জাত। তোকে যা বলতে এসেছিলাম, শোন্। বড়দা আর আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, এখানেও গোলমাল শুরু হয়েছে, তোমার সেজদা পূজোর ঘরে, কখন বেরুবেন ঠিক নেই। তোমার উপরই বাড়ির ভার রইল, কোথাও বেরিও না যেন।

যতীন। আচ্ছা।

মেজদা চলিয়া গেলেন। কিন্তু অশরীরী বেশে তখনই আবার ফিরিয়া আসিলেন। যতীন শৈলেনবাবুর দিকে চাহিল, দেখিল, তিনি আশ্চর্যরকম সামলাইয়া লইয়াছেন। এমনভাবে জানালার দিকে চাহিয়া বহির্দৃশ্য দেখিতেছেন, যেন কিছুই হয় নাই। অশরীরী মেজদার অস্তিত্ব তিনি অনুভবই করিতে পারিলেন না। যতীনের মনের ভাবও অশরীরী বেশে মূর্ত হইল এবং অশরীরী মেজদার সহিত আলাপ করিতে লাগিল। শৈলেনবাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

অশরীরী মেজদা। দেখ যতীন, আমার ওই শৈলেনের কাছে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু পারছি না।

যতীনের মনের ভাব। খামাখা কেন তুমি ওঁকে অপমান করতে গেলে মিছিমিছি!

অশরীরী মেজদা। কারণ ওকে ঘৃণা করি। [একটু থামিয়া] শুধু ওকে নয়, সকলকে—হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বাঙালী বিহারী সাহেব মাড়োয়ারী আত্মীয় অনাত্মীয়—সকলকে। নিদারুণ ঘৃণার উত্তপ্ত

ঘূর্ণাবর্তে সারাজীবনটা নাকানি-চোবানি খাচ্ছি, সর্বাঙ্গ জ্ব'লে পুড়ে খাক হয়ে গেল, কিন্তু কি করব— নিজের যুক্তিকে অতিক্রম করতে পারি না।

যতীনের মনের ভাব। যুক্তি মানে?

অশরীরী মেজদা। যুক্তি দিয়ে বিচার ক'রে দেখেছি, কোথাও এতটুকু ভাল দেখতে পাই নি। ধার্মিকের মধ্যে ভণ্ডকে, স্বদেশসেবীর মধ্যে স্বার্থপরকে, সাহিত্যিকের মধ্যে যশাকাঙ্ক্ষীকে, বীরের মধ্যে গোঁয়ারকে দেখেছি, মাতৃস্নেহেও প্রত্যক্ষ করেছি পাশবিক ক্ষুধা, পত্নীপ্রেমে যৌন-লালসা, নিপুণ অতিথি-পরায়ণতার মধ্যে দেখেছি বাহাদুরি প্রকাশের চেষ্টা, উপকারীর মধ্যে দেখেছি মতলববাজকে— কোথাও একবিন্দু আলো দেখতে পাই নি—কোথাও না। এখন যা করতে যাচ্ছি তা ভাল ব'লে নয়, বড়দাকে ভয় করি ব'লে।

যতীন। কিন্তু আলো তো অনেক আছে মেজদা, তুমি দেখতে পাচ্ছ না কেন?

বিস্ফোরণের মত একটা শব্দ হইতেই যতীন ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, একটি রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র বামনমূর্তি দাঁড়াইয়া আছে—তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া স্পর্ধার লাল আভা বিকীর্ণ হইতেছে। বিস্ফোরণের শব্দটা বোধ হয় বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র হইতে নির্গত হইল। চোখের দৃষ্টিতে ঔদ্ধত্য মূর্ত।

বামন। আমি দেখতে দি নি।

যতীন। কে আপনি?

বামন। আমি ওর অহঙ্কার।

যতীন। মেজদার অহঙ্কার—বামন!

বামন। বাপের সম্পত্তি ছাড়া আর কি আছে ওর? সারাজীবন উদ্বাহু হয়ে আছে চাঁদ ধরবে ব'লে, কিন্তু নাগাল পায় নি, চাঁদের

কলঙ্কটাকে নিয়েই মাতামাতি করছে তাই। তোমাদের মধ্যেও আমি আছি, কিন্তু ভিন্ন রূপে। [হাসিয়া] চিনতে পারছ না তোমার নীল পরীকে? তোমার চোখে আমিই পরিয়েছি স্বপ্নের অঞ্জন, আমিই সুবর্ণখচিত পুষ্পকরথে চড়িয়ে তোমার বড়দাকে নিয়ে গেছি আভিজাত্যের অলকাপুরীতে, তোমার সেজদাকে বেঁধেছি স্বেচ্ছাবৃত কৃচ্ছ্র সাধনে। [আবার চোখে মুখে স্পর্ধা মূর্ত হইল] আমিই অসম্ভবকে সম্ভব করি, স্বয়ং বিধাতার সৃষ্টি-প্রেরণার মূলেও আমি বর্তমান।

সহসা অদৃশ্য হইয়া গেল। যতীনের চোখে চকিতের মধ্যে আর একটা *দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল।* অন্ধকার গভীর অরণ্য··· একটা জটিল শাখাপত্র-বহুল গাছে একটা ঘড়ি টাঙানো আছে···তাহাতে দুইটা বাজিয়াছে··· পাঁচটা বাজা উচিত···অরণ্য ভেদ করিয়া অতিকষ্টে মহাত্মাজী অগ্রসর হইতেছেন, ঘড়িটাকে ঠিক না করা পর্যন্ত তিনি থামিবেন না।···এ দৃশ্যও ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।···যতীন দেখিল, অশরীরী মেজদা তখনও দাঁড়াইয়া আছেন।

অশরীরী মেজদা। না, কোথাও আলো দেখতে পাই না। সূর্যের স্পটগুলোর কথাই আগে মনে পড়ে, মেঘের মধ্যে ধূলিকণার অস্তিত্ব কল্পনা করি। বুঝতে পারি যে, আমার মধ্যেও গলদ আছে, কিন্তু স্বীকার করতে পারি না। শৈলেনের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত, কিন্তু পারছি না। চললাম।

অশরীরী মেজদা চলিয়া গেলেন। যতীন দেখিল, শৈলেনবাবু ঠিক তেমনিভাবে জানালার দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন।

যতীন। [অতিশয় সঙ্কোচভরে] কিছু মনে করবেন না শৈলেন-দা। মেজদা একটু—

শৈলেন। [এক মুখ হাসিয়া] আরে, ওতে মনে করবার কি আছে! তোমার মেজদাকে চিনি না? ছেলেবেলা থেকে দেখছি, চিরকালের গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক। রাস্তায় একটা ষাঁড়ে যদি গুঁতিয়ে দিত, কি আর করতাম!

বড়দা প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে দুইটি বন্দুক।

বড়দা। যতীন, দুটো বন্দুক রেখে যাচ্ছি তোমার কাছে। বাড়ি থেকে এক পা নড়বে না। আমরা দুটো বন্দুক নিয়ে যাচ্ছি, তোমার কাছে দুটো থাক্। একটা তোমার জন্যে, আর একটা তোমার সেজদার জন্যে। তোমার সেজদা পুজোর ঘরে, তাই তার হাতে দিয়ে যেতে পারলাম না, তোমার কাছেই থাক্, যদি চায় দিও। ইদানীং পুজো নিয়ে মেতেছে, কিন্তু ও-ই আগে সবচেয়ে ভাল বন্দুক চালাত। আচ্ছা, যাই তা হ'লে। খুব সাবধানে থেকো।

বড়দা শৈলেনবাবুর উপস্থিতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। শৈলেনবাবু কিন্তু এ তাচ্ছিল্য সহ্য করিতে পারিলেন না, গায়ে পড়িয়া আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

শৈলেন। আপনারা চললেন তা হ'লে?

বড়দা। [অভিজাতসুলভ নম্রতাসহকারে] যেতেই হবে, না গিয়ে উপায় নেই। তুমি কি এখানেই থাকবে? মেয়েদেরও নিয়ে এস না হয় এখানে। তোমাদের অঞ্চলটায় ওরা আছে দু-এক ঘর—

শৈলেন। না, আমি বাড়ি যাব। [হাসিয়া] আমার সে সব ভয় নেই।

বড়দা। ও, তা হ'লে সেই ভাল। চা খেয়ে যাও তা হ'লে, চা কি এখানে পাঠিয়ে দিতে বলব?

শৈলেন। সে হবে এখন। কিন্তু একটা কথা—

বড়দা চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু কথাটা শুনিবার জন্য ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

শৈলেন। আমার খুবই আশ্চর্য লাগছে যে, আপনার মত লোকও এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্ব করতে যাচ্ছেন। কেন যাচ্ছেন ভেবে দেখেছেন কি একবারও?

বড়দা। আমার ব্যক্তিগত ভাবনার স্থান এতে নেই। ডাক এসেছে, যেতেই হবে। [হাসিলেন]

শৈলেন। আপনাদের এই উৎসাহ যদি দেশের প্রোলিটারিয়েটদের উন্নতি-সাধনে লাগাতে পারতেন, তা হ'লে একটা কাজের মত কাজ হ'ত। অ্যারিস্টক্র্যাটদের চাপে ম'রে গেল যে বেচারারা!

বড়দার চোখের কোণে একটা আলোর দীপ্তি ক্ষণিকের জন্য জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই হাসির আভায় তাহার জ্বালা নিবিয়া গেল। শৈলেনের সঙ্গে তর্ক করিয়া তিনি নিজেকে অবনত করিতে চাহিলেন না, একটু মুচকি হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

যতীন। একটু চা খেয়ে যান।

শৈলেন। তা যেতে পারি, কাল থেকে চা খাই নি। আমাদের বাড়িতে চা ফুরিয়েছে কাল থেকে। [হাসিয়া] দোকান-পাট বন্ধ, কিনতেই পারি নি। একটু তাড়াতাড়ি পেলে ভাল হ'ত, বাড়ি থেকে অনেকক্ষণ বেরিয়েছি, মেয়েরা ভাবছে হয়তো।

যতীন। হ্যাঁ, এই যে— ছট্টু ছট্টু—এই বেহারী— ওরে, কে আছিস? সব পালিয়েছে বোধ হয়। ওরে ছট্টু—

সহসা দ্বারপ্রান্তে অশরীরী বড়দা প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে রূপার ট্রে, ট্রের উপর অতিশয় মূল্যবান টী-সেট। ট্রেটি সামনের

তেপায়ার উপর রাখিয়া নিজহস্তে তিনি চা ছাঁকিতে লাগিলেন। উৎকৃষ্ট দার্জিলিং চায়ের গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হইয়া উঠিল। এক কাপ চা ছাঁকিয়া তিনি শৈলেনের দিকে আগাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, শৈলেনবাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। যতীনের অশরীরী-মনোভাবের সহিত বড়দার নীরব আলাপ শুরু হইল।

যতীনের মনোভাব। বড়দা, তুমি কেন চা আনতে গেলে?

অশরীরী বড়দা। কেন, তাতে ক্ষতি কি? অতিথিকে সেবা করলে আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয় না। তা ছাড়া আর একটা কারণে এলাম, শৈলেন প্রোলিটারিয়েটদের কথা তুলেছিল। ওর মুখের ওপর জবাবটা দিলে অশোভন হ'ত তাই দিই নি; তোকে ব'লে যাচ্ছি, তুই যদি পারিস আভাসে ইঙ্গিতে ব'লে দিস, [হাসিয়া] অভদ্রতা ক'রো না যেন। আভিজাত্যের সঙ্গে অভদ্রতা মানায় না। আচারে, ব্যবহারে, চিন্তায়, কর্মে যা নিখুঁত, তাই আভিজাত্যের ভিত্তি। আভিজাত্য আদর্শবাদী, কোন কারণেই তার সুর নেবে যায় না। এরা ইংলণ্ডের চার্লস্, ফ্রান্সের লুই, রুশিয়ার নিকোলাস আর পরাধীন ভারতবর্ষের জনকতক হঠাৎ-বড়লোক ডাকাত রাজা-জমিদারদের দশ-হাত-ফেরতা ইতিহাস মুখস্থ ক'রে আসল আভিজাত্যের স্বরূপ ভুলে গেছে। রাজর্ষি জনক বা রাজা হরিশ্চন্দ্রের নাম এদের কচিৎ মনে পড়ে, আর যখন পড়ে তখন এদের কাণ্ড দেখে দুঃখ হয়। আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের বিষয়ে রচিত জনপ্রিয় নাটকে আজকাল রামের চরিত্র যে ভাবে আঁকা হয় এবং তা দেখে লোকে যে রকম হাততালি দেয়, তাতে জনতার রুচিবোধের প্রশংসা করতে পারি না। সীতাকে বনে পাঠিয়ে রামচন্দ্র কুলগুরু বশিষ্ঠের সামনে অশিষ্টের মত দাপাদাপি করছে আর সামান্য কেরানীর মত হাউহাউ ক'রে কাঁদছে, এই দেখে সবাই মহা খুশি। এর থেকে মনে হয়, আভিজাত্যের স্বরূপ এরা ভুলে গেছে। অর্থলোলুপ ইহলোকসর্বস্ব বণিকসভ্যতার আওতায় বহুকাল বাস করার ফলে এদের

ধারণা হয়েছে যে, নিছক পশুত্বের চর্চা করাটাই পরমার্থ, আর যেন-তেন-প্রকারেণ টাকা জমাতে পারলেই বুঝি আভিজাত্য হয়। ইংরেজী 'অ্যারিস্টক্র্যাসি' শব্দটারও ব্যাকরণ যদি এরা অনুধাবন করত, তা হ'লে বুঝতে পারত যে, যে প্রাচীন আর্য গ্রীকজাতি থেকে সমস্ত ইয়োরোপীয় সভ্যতার জন্ম, সেই গ্রীক ভাষার 'অ্যারিস্টস' শব্দ থেকে অ্যারিস্টক্র্যাসি কথাটা উৎপন্ন হয়েছে ; 'অ্যারিস্টস'-এর অর্থ—যা সর্বোৎকৃষ্ট। অসভ্য কোটিপতিরা নয়, যারা সর্ববিষয়ে সর্বতোভাবে সর্বোৎকৃষ্টপন্থী তারাই 'অ্যারিস্টক্র্যাট'। বিদুর অ্যারিস্টক্র্যাট, ধৃতরাষ্ট্র নয়। কিন্তু আজকাল কেউ ব্যাকরণ পড়তে চায় না, নোট মুখস্থ ক'রে পরীক্ষা পাস করে। ব্যাকরণের মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতির যে ইতিহাস লেখা আছে, তা জানতে চায় না কেউ আজকাল—কষ্ট ক'রে কার্ল মার্কস পড়ে, পাণিনি পড়ে না। তাই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত তা জানে না কেউ, আভিজাত্যের স্বরূপও অজ্ঞাত তাই অনেকের কাছে। এরা মনে করে, পৃথিবীতে দুটি মাত্র জাত আছে—ধনী এবং দরিদ্র, এবং এই ধনী-দরিদ্রদের কোন রকমে একটা কটাহে চড়িয়ে বিদ্রোহের আগুনে গালিয়ে, বিজ্ঞানের ফ্যাক্টারিতে অর্থনৈতিক ছাঁচে ঢালাই ক'রে ফেলতে পারলে পিলপিল ক'রে বাজারে যে মানুষ বেরুবে, তাদের মধ্যে আর কোন বৈষম্য থাকবে না, ছাঁচে-ঢালাই-করা পুতুলের মত সব সমান হয়ে যাবে, জগতে সাম্য স্থাপিত হবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যে সূর্য-চন্দ্রের মত সব সমাজে চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে, তা এরা বোঝে না ; মনে করে, কোনও একটা বিশেষ ফরম্যুলায় ফেলে দিলেই সব বুঝি একাকার হয়ে যাবে। ওদের সোভিয়েট রাশিয়ার দিকেও ভাল ক'রে চেয়ে দেখে না ওরা, দেখলে দেখতে পেত, সেখানেও এই চতুর্বর্ণ বিরাজমান। সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে তাকালে আমার আনন্দ হয়, নবজাগ্রত জাতির জীবন্ত শক্তির মহিমায় ওরা ভরপুর, ওরা জেগেছে, ওরা বাড়ছে। ওরা ভাঙবে গড়বে বদলাবে, কত কি করবে! ওদের নকল ক'রে আমাদের দেশে এই যে

অদ্ভুত একটা জগা-খিচুড়ি হয়েছে, এদের দেখলে দুঃখ হয়, হাসিও পায়। আমাদের বেচু খানসামার কথা মনে পড়ে, গত যুদ্ধের সময় খবরের কাগজ দেখে সে কাইজারের মত গোঁফ রেখেছিল। এরাও শ্রমিকের দুঃখে বিগলিত হয়েছে। দুঃখীর দুঃখে বিচলিত হয়ে যাঁরা আত্মবিসর্জন করেন, তাঁরাই তো প্রকৃত আভিজাত্যমণ্ডিত মহাত্মা, মহাত্মা গান্ধীই বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজাত ব্যক্তি। কিন্তু এ রকম মহাত্মা যুগযুগান্তরে দু-একজন আবির্ভূত হন,—বুদ্ধ চৈতন্য অলিতে গলিতে ক্লাবে থিয়েটারে কিলবিল ক'রে বেড়ায় না কখনও। সর্বহারা শ্রমিকদের দুঃখে বিগলিতচিত্ত এদের দেখলে মনে হয়, এদের চিত্ত যে বিগলিত সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা শ্রমিকের দুঃখে নয়, ফ্যাশানের মোহে এবং ভোগের লোভে। সত্যিই যদি এরা শ্রমিকদের দুঃখে বিচলিত হ'ত, তা হ'লে এদের ব্যবহার মনকে ক্ষুব্ধ করত না, মুগ্ধ করত। মতের সঙ্গে না মিললেও মুগ্ধ করত। আমি এদের শ্রদ্ধা করবার চেষ্টা করেছি, পারি নি। বার বার মনে হয়েছে, তা হ'লে এরা এত বিলাসী, এত উচ্ছৃঙ্খল হ'ত না। (ইটের উপর ব'সে মাটির গ্লাসে বাজে চা খায় যারা, তাদের দুঃখে বিগলিত হয়ে এরা যখন গদি-আঁটা চেয়ারে ব'সে দামী কাপে উৎকৃষ্ট দার্জিলিং চা অনর্গল পার করে, তখন, সত্যি বলছি, সন্দেহ হয়।) অতীত গৌরব, জাতীয় সংস্কৃতি, আত্মমর্যাদা সমস্তই মূল্যহীন এদের কাছে—তাই শৈলেন অনায়াসে প্রশ্ন করলে, আপনি এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্ব করতে যাচ্ছেন কেন? না গেলেই যে অন্যায় হ'ত, সে বোঝবার বুদ্ধি ওর নেই—আত্মসম্মানের কোনও ধার ও ধারে না। বার বার কপচে প্রোলিটারিয়েট কথাটা মুখস্থ করেছে কেবল। এংগেল্‌সের কথা বেদবাক্য ব'লে মনে করে, গীতা ওর কাছে মূল্যহীন। 'হত্যাকাণ্ড' 'হত্যাকাণ্ড' ব'লে চীৎকার করছে তাই। যুদ্ধে চিরকালই নিরীহ লোক মারা যায়। আমরা যুদ্ধ করতে চাইও না। কিন্তু বাড়ি চড়াও হয়ে নিরীহ ছেলেমেয়েদের মারবে, আমরা আত্মরক্ষাও করব না? বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, চণ্ডীতে

আমরা আস্থাবান, কাউকে মারতে বা বাঁচাতে পারি এ অহঙ্কার আমাদের নেই, কর্তব্যপথে নির্ভয়ে নিরাসক্তচিত্তে অগ্রসর হওয়াটাই পৌরুষ ব'লে মনে করি, এবং তাই আমরা শক্তির উপাসক। মহাত্মাজীর অহিংস শক্তি যদি ব্যবহার করতে পারতাম, তা হ'লে তাই করতাম; কিন্তু দেখলাম, তা পারব না। তাই যা পারব তাই করতে যাচ্ছি—কারণ মহাত্মাজীই বলেছেন—Where there is only a choice between cowardice and violence I would advise violence.... এখন চুপ ক'রে ব'সে থাকাটা ভীরুতা হবে—পারিস তো বুঝিয়ে দিস ওকে এসব।

অশরীরী বড়দা অন্তর্হিত হইলেন। ছট্টু চা লইয়া প্রবেশ করিল।

যতীন। বড়দা-মেজদা চ'লে গেলেন?
ছট্টু। হাঁ হুজুর।
যতীন। রুমি কোথা?
ছট্টু। তিনি আগেই বেরিয়ে গেছেন।

ছট্টু দুইজনকে চা দিয়া বাহির হইয়া গেল। শৈলেন চায়ে একটা বড়-গোছের চুমুক দিয়া যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। যতীন অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে চা খাইতে লাগিল।

শৈলেন। দেখ যতীন, তোমার মেজদা যে আমাকে অপমান করলেন তাতে আমার দুঃখ নেই, কারণ কমিউনিস্ট হয়েছি যখন, তখন অপমানই আমাদের অঙ্গের ভূষণ। [হাসিলেন] তা ছাড়া মেজদাকে ছেলেবেলা থেকে দেখছি তো, চিরকালই ওই রকম। কিন্তু চড়ের চেয়ে বেশি লাগল কি জান?

যতীন। কি?

শৈলেন। তোমার বড়দার মুচকি হাসিটা। ছুরির চেয়েও তীক্ষ্ণ। মেজদার সঙ্গে ঘুষোঘুষি ক'রে কোনদিন হয়তো তাঁকে আমাদের দলে টানলেও টানতে পারি, কিন্তু তোমার বড়দা সাংঘাতিক। ঘাড় ফিরিয়ে নির্নিমেষে চেয়ে আছে অতীতের দিকে, কিছুতেই সে ঘাড় ফেরানো যাবে না। বেশি জোর করলে ভেঙে যাবে, তবু নুইবে না। পাথরের তৈরি বিরাট একটা 'ফসিল' যেন। আচ্ছা যতীন, তুমি তো এ যুগের ছেলে, তুমিও কি বিশ্বাস কর না যে, সামাজিক বৈষম্য দূর করাই আমাদের সর্বপ্রধান কাজ হওয়া উচিত? সাম্য না হ'লে স্বরাজের কোনও মানে হয়?

যতীন। বৈষম্য কোনও দিন দূর হবে ব'লে মনে করি না। তবে যে স্বরাজ আমি কামনা করি, তাতে সাম্য না থাকলেও প্রতিটি লোকের স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে। খাওয়া, পরা, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানের অভাবে কেউ কষ্ট পাবে না, সকলেই সমান সুযোগ পাবে বড় হওয়ার। আর সবচেয়ে বেশি কি চাই জানেন—প্রত্যেকটি ভারতবাসী ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকবে। লোভে লালায়িত হবে না, হিংসায় জর্জরিত হবে না। ঐশ্বর্য নয়, শান্তিই হবে তার কাম্য।

শৈলেন। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকলে কি কোনও সমাজের উন্নতি হয়?

যতীন। ভারতবর্ষের শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা থাকবে। তা আধিভৌতিক নয়, আধ্যাত্মিক; ভোগে নয় ত্যাগে।

শৈলেন। তুমি দেশসুদ্ধ সবাইকে তা হ'লে লেংটি পরিয়ে সন্ন্যাসী বানাতে চাও নাকি?

যতীন। [হাসিয়া] আমি বানাতে চাইলেও হবে না, সন্ন্যাসী হওয়া অত সহজ নয়। তবে ত্যাগের আদর্শকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ ব'লে যদি মেনে নেয় সকলে, তা হ'লে সন্ন্যাসী না হতে পারলেও অনেক ভদ্রলোক হবে, সমাজে শান্তি থাকবে। ঐশ্বর্য লোটবার জন্যে

পৃথিবীব্যাপী এই যে কদর্য ছুড়োছুড়ি মারামারি রক্তারক্তি চলেছে, এর থেকে রক্ষা পাবে সমাজ।

শৈলেন। তোমার ত্যাগের আদর্শ অন্য দেশকে যদি উদ্বুদ্ধ না করতে পারে? তারা যদি এসে আক্রমণ করে?

যতীন। ত্যাগের আদর্শ থাকবে ব'লে যে দেশরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না, তা তো নয়। আদর্শ ক্ষত্রিয়সমাজ গ'ড়ে তুলতে হবে। তারা যুদ্ধ করবে নিজের দেশ রক্ষা করবার জন্যে, অপর দেশ লুণ্ঠন করবার জন্যে নয়।

শৈলেনবাবু কিছুক্ষণ স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

শৈলেন। তোমার এই স্বপ্ন সফল হবে ব'লে মনে কর?

যতীন। আশা করি।

শৈলেন। কি ক'রে হবে, শুনি?

যতীন। শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল সংস্কার ক'রে। তা করবার আগে অবশ্য দেশের স্বাধীনতা চাই।

শৈলেন। কি উপায়ে পাবে সে স্বাধীনতা?

যতীন। স-হিংস অ-হিংস যে কোনও উপায়ে।

শৈলেন। এর মধ্যে কোন্‌টা ভাল মনে কর তুমি?

যতীন। ভারতবর্ষের আদর্শই হচ্ছে প্রেম। সুতরাং অহিংস উপায়টাই ভাল ব'লে মনে করি। কিন্তু সকলের পক্ষে সে পথে চলা সম্ভব না-ও হতে পারে। না যদি হয়, তা হ'লে স-হিংস উপায় অবলম্বন ক'রেও স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। মোট কথা, স্বাধীনতা চাইই—স্বাধীনতা না পেলে কিছুই হবে না।

ছটু প্রবেশ করিল।

ছট্টু। শৈলেনবাবু, আপনাকে বাড়ি থেকে ডাকতে এসেছে। মাইজীরা ভয় পেয়েছে বড়।

শৈলেন। ও, আচ্ছা, উঠি তা হ'লে ভাই।

উঠিলেন। যতীনও উঠিয়া দাঁড়াইল।

শৈলেন। তোমরা সব মহৎ লোক, আকাশচুম্বী তোমাদের আদর্শ। আমরা মাটির মানুষ, আমাদের কারবার ছোটলোক নিয়ে। আমাদের তোমরা ঘৃণা করতে চাও, কর—

যতীন। কি যে বলেন শৈলেনদা!

তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল।

যতীন। আপনাকে ঘৃণা করতে পারি কখনও? আমাদের সঙ্গে মতে না মিললেও সারাজীবন আপনি যে দেশের কাজই করেছেন, তা কি ভুলতে পারি কখনও? তা ছাড়া ঘৃণার কোনও স্থানই নেই আমার আদর্শে, আমি কাউকে ঘৃণা করি না।

শৈলেন। তুমি কাউকে ঘৃণা কর না?

যতীন। না।

শৈলেন। কথাটা শুনতে ভাল, কিন্তু— আচ্ছা, চলি।

যতীন। রাগ ক'রে যাচ্ছেন না তো শৈলেনদা? [পুনরায় জড়াইয়া ধরিয়া] বলুন, আপনি ব'লে যান—

শৈলেন। না না, রাগ করব কেন? আহা, ছাড়্ না। কি যে অবুঝ তুই—

নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। বাহিরে গিয়া হাত দিয়া চোখটা মুছিয়া ফেলিলেন। যতীনের ব্যবহারে তাঁহার চোখে

জল আসিয়া পড়িয়াছিল। যতীন দেখিল, টিকটিকি ফিরিয়া আসিয়াছে। বিমর্ষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

টিকটিকি। আচ্ছা, তোমার ওই শৈলেনবাবু আমার কিছু উপকার করতে পারবেন ?

যতীন। কেন, কি হ'ল তোমার ?

টিকটিকি। আমার টিকটিকিনী পালিয়ে গেল।

যতীন। কোথায় ?

টিকটিকি। আর একটা টিকটিকির সঙ্গে। [সক্ষোভে] তোমরা কেন যে জানলার ওপরে টিনের 'সান-শেড' লাগাতে গেছ, বুঝি না। একটা গুণ্ডা এসে আশ্রয় নিয়েছে।

যতীন। গুণ্ডা!

টিকটিকি। হ্যাঁ গো। ইয়া কেঁদো মোটা গুণ্ডা একটা। ওদিকের সমস্ত দেওয়ালটা জুড়ে রাহাজানি ক'রে বেড়াচ্ছে, কারও ঘেঁষবার উপায় নেই। টিকটিকি তো নয়, যেন কুমীর একটা।

যতীন। কই, দেখি নি তো!

টিকটিকি। [সশ্লেষে, তাহার কথার অনুকরণ করিয়া] কই, দেখি নি তো! তুমি আবার আমার দুঃখ কবে দেখতে পাও ? নিজের দিকেই তো সারা দৃষ্টি ফিরিয়ে ব'সে আছ সর্বক্ষণ। স্বার্থপর কোথাকার! একটু আলো জ্বেলেও তো উপকার করতে পার না। না খেয়ে খেয়ে রোগা হয়ে গেলাম। খেতে পেলে আমিও অমনই কেঁদো মোটা হতাম। তা হ'লে কি আমার টিকটিকিনী পালায়! আমার এ দুর্দশার জন্যে দায়ী তুমি।

যতীন। আমি! বল কি ?

টিকটিকি। হ্যাঁ, তুমি ছাড়া আবার কে ?

যতীন। আমার আলোর উপর ভরসা ক'রে ব'সে আছ কেন ? বাইরের পৃথিবীতে চ'রে বেড়াও না, যেমন আর সবাই করছে।

টিকটিকি। তা পারলে আর ভাবনা ছিল না। ঘরে বাইরে সব জায়গায় আমাদের এলাকা ঠিক করা আছে, একজনের এলাকায় আর একজনের প্রবেশ নিষেধ। বাইরে যাব কি, তোমার ওই জানলার চৌকাঠের কাছ পর্যন্ত ঘেঁষবার জো নেই, ওত পেতে ব'সে আছে গুণ্ডাটা। একমাত্র উপায়—গায়ের জোর বাড়ানো, কিন্তু খেতে পাচ্ছি না, জোর বাড়বে কি ক'রে? তোমার উপর আর ভরসা নেই, দেখি শৈলেনবাবুর সঙ্গে আলাপ ক'রে—শুনেছি উনি অনেক অত্যাচারীকে জব্দ করেছেন।

যতীন। মানুষ-অত্যাচারীকে জব্দ করেছেন। টিকটিকি-অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কিছু করেছেন ব'লে তো শুনি নি।

টিকটিকি। মানুষ-অত্যাচারীর বিরুদ্ধেই আমি নালিশ করব। ওঁকে ব'লে তোমাকে বাধ্য করব আমি আলো জ্বেলে রাখতে। হেঁ-হেঁ, আজকাল আর সেদিন নেই যে, যা খুশি তাই করবে। তুমি কিনেছ ব'লে ও আলো যে একলা তোমারই, সে আইন নেই আজকাল—হেঁ-হেঁ—শৈলেনবাবুকে ধ'রে দেখ না—

যতীন। [হাসিয়া] শৈলেনবাবুকে ধরবার দরকার নেই, আমি আলো জ্বেলে রাখব।

টিকটিকি। [গদগদ] রাখবে? সত্যি? সত্যি বলছ?

যতীন। রাখব।

টিকটিকির মনের আনন্দ পুচ্ছে প্রকট হইল।

টিকটিকি। [সানুনয়ে] আর একটি উপকারও কর না তা হ'লে।

যতীন। আবার কি?

টিকটিকি। ওই গুণ্ডাটাকে তাড়িয়ে দাও না। তোমার ওই জানলার টিনটার পাশে ব'সে আছে। তুমি উঠে এক তাড়া দিলেই পালাবে। তোমার ওই লাঠিটা তুলে যদি খোঁচা দাও একটা, তা হ'লে তো বাছাধন একেবারে—

যতীনের মনে হইল, টিকটিকিটার উপর্যুপরি রূপান্তর ঘটিতেছে। (প্রথমে সে হইল জয়চন্দ্র, তাহার পর বলবন্ত রাও, তাহার পর মানসিংহ, তাহার পর উমিচাঁদ, তাহার পর মীরজাফর···) যতীনের সমস্ত চিত্ত গ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সে আর চাহিয়া থাকিতে পারিল না, চোখ বুজিল। তাহার সমস্ত অন্তর যেন নীরব ভাষায় বলিতে লাগিল, হে সুন্দর, কোথায় তুমি, এস, আর কত বিলম্ব? বাহিরে অনেক দূরে শোনা গেল—ফটিক জল—ফটি—ক জল। অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়াই বসিয়া রহিল। তাহার পর যখন চোখ খুলিল, তখন অস্তায়মান সূর্যের আরক্তিম কিরণে সমস্ত ঘর উদ্ভাসিত···এবং সেই স্বর্ণালোক-পরিবেষ্টনীতে দাঁড়াইয়া আছে পুরুষবেশিনী একটি নারী। অপরূপ রূপসী। নয়নে বহ্নি, পৃষ্ঠবিলম্বিত কেশদামে ঝঞ্ঝার মেঘ, মস্তকে মুকুট, হস্তে কৃপাণ, অঙ্গে বর্ম, এবং সমস্ত মণ্ডিত করিয়া এক অপূর্ব পবিত্রতা—নির্মল, অপাপবিদ্ধ।

যতীন। কে আপনি?

রূপসী। আমাকে চেন না?

যতীন। মনে হচ্ছে চিনি চিনি, কিন্তু মনে করতে পারছি না ঠিক।

রূপসী। [ঈষৎ হাসিয়া] ছেলেবেলায় চিনতে খুব, দক্ষিণাবাবু আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন, মনে পড়ছে? আমি রূপকথার কিরণমালা। অরুণ-বরুণের বোন। অরুণের তলোয়ারে মরচে ধরেছে, বরুণের ধনুকের ছিলে ছিঁড়ে গেছে। মায়ার মোহে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তারা সব হয়ে গেছে এখন পাথর। আমি চলেছি তাদের উদ্ধার করতে। তোমার জয়চন্দ্র উমিচাঁদ মীরজাফররাও পাথর হয়ে প'ড়ে আছে সেখানে। সবাইকে উদ্ধার ক'রে আনব।

যতীন। কোথায় সে জায়গা?

রূপসী। সব ভুলে গেছ দেখছি। মায়া-পাহাড়, যেখানে রূপোর গাছে সোনার ফল ফলে, মুক্তা-গলা জল ঝরে মুক্তি-ঝরনা

থেকে, হীরের গাছে সোনার পাখি গান গায়, যেখানকার রাস্তায় কাঁকর নেই, তার বদলে ছড়িয়ে আছে চুনি পান্না মণি মাণিক্যের দানা। এই সবের লোভে সবাই ছুটে গিয়েছিল সেখানে, কিন্তু মাথা ঠিক রাখতে পারে নি, প্রাণহীন পাথরে পরিণত হয়ে গেছে সব। আমি চলেছি তাদের উদ্ধার করতে। মুক্তি-ঝরনার মুক্তা-গলা জল ছিটিয়ে তাদের বাঁচাব—তারপর ডঙ্কায় দেব ঘা। চললাম। ভেবো না, সবাই বাঁচবে আবার।

ঘড়ি। রূপ নিক, রূপ নিক, রূপ নিক, রূপ নিক…

কিরণমালা চলিয়া গেল। যতীনের মনে হইল, ওই যে আকাশের গায়ে বহুদূরে দেখা যাইতেছে—মেঘের স্তূপ নয়, মায়া-পাহাড়। দুর্গম, দুরারোহ। অন্ধকার নামিতেছে…অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া আছে ঝঞ্ঝা মেঘ, বিদ্যুৎ বজ্র, সরীসৃপ শ্বাপদ, পিশাচ প্রেতিনীর বিভীষিকা। কিরণমালা চলিয়াছে, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, নিষ্কম্প অগ্নিশিখার মত আঁধার ভেদ করিয়া চলিয়াছে সে…। দ্বারপ্রান্তে শব্দ হইল। যতীন ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, বড় বউদি প্রবেশ করিতেছেন। বড় বউদি ঈষৎ স্থুলাঙ্গিনী। ধপধপে ফরসা রঙ। কপালের মাঝখানে ছোট একটি উলকির টিপ। টকটকে লালপেড়ে শাড়ি, মাথা-ভরতি সিঁদুর। হাতে কয়েকগাছা করিয়া সোনার চুড়ি আছে, কিন্তু শাঁখাটাই সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হাতে একটি পানের ডিবা। পরিপুষ্ট গোল মুখখানিতে মাতৃত্ব যেন মূর্ত। চোখের দৃষ্টিতে শঙ্কা বা ক্ষোভ নাই, অধীরতাও নাই। বরং একটা শান্ত অথচ সকৌতুক ঔৎসুক্য চোখের কোণে উঁকি দিতেছে। ভাবটা যেন—সাড়ম্বরে তোমরা অনেক আয়োজনই তো করিলে, শেষ পর্যন্ত কি কর দেখি! তিনি নির্নিমেষে কয়েক মুহূর্ত যতীনের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর একটু হাসিলেন। তাঁহার ভাব-ভঙ্গীতে কেমন যেন একটা চাপা গোপন ভাব। যেন প্রয়োজন হইলে তিনি যাহা করিবেন, ঠিক করিয়া

ফেলিয়াছেন এবং সেইজন্য নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন—কিন্তু সে কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে চান না।

বড় বউদি। ছোট বীরপুরুষটির খবর নিতে এলাম।

যতীন। [হাসিয়া] আমি ঠিক আছি।

বড় বউদি। আমরাও বেঠিক নেই। আচ্ছা, রুমি কোথা গেল, তাকে দেখতে পাচ্ছি না!

যতীন। [একটু ইতস্তত করিয়া] সে নোয়াখালি চ'লে গেছে।

বড় বউদি। ওমা, সে কি! কখন?

যতীন। এই একটু আগে।

বড় বউদি। তোমাকে ব'লে গেল?

যতীন। হ্যাঁ।

বড় বউদি। মানা করলে না?

যতীন। করলাম, শুনলে না।

একটা সূক্ষ্ম গর্বের আভা বড় বউদির সারামুখে ছড়াইয়া পড়িল। ভাষায় কিন্তু তিনি যাহা বলিলেন, তাহা অন্যরকম।

বড় বউদি। একলা এমন ভাবে যেতে দেওয়া ঠিক হয় নি। তোমার দাদারা শুনলে রাগ করবেন।

যতীন। কি করব, জোর ক'রে চ'লে গেল। চেন তো তাকে।

বড় বউদি। চিনি না আবার, ডাকাত একটা।

যতীন। অমল বিমল কোথা?

বড় বউদি। তোমার দাদা তাদের রেখে গেছেন নাকি! তারাও পা বাড়িয়েছিল, বলামাত্রই দু ভাই বল্লম নিয়ে তৈরি। [হাসিলেন] বাবা ভাগ্যে এ সময় কাশীতে, তিনি থাকলে কক্ষনো যেতে দিতেন না ওদের। আর তাই নিয়ে এক কাণ্ড হ'ত বাড়িতে। তোমাকেও

যেতে হ'ত, কেবল আমাদের আগলাবার জন্যে তোমাকে রেখে গেলেন। আমাদের নিয়েই বিপদ তোমাদের, আমরা হয়েছি তোমাদের পায়ের বেড়ি। বেড়ি না পরলে চলেও না যে তোমাদের, [হাসিয়া] তোমার জন্যেও বেড়ির যোগাড় করতে হবে এবার একটা। বংশ রাখতে হবে তো। আমার ছেলে দুটি তো যুদ্ধে গেল, ফিরবে কি না ভগবানই জানেন। তোমার মেজ বউদির যা ভাবগতিক, মনে হচ্ছে, দশ বছরেও হ'ল না যখন, তখন আর হবে না বোধ হয় কিছু। আর সেজ বউয়ের ছেলে দুটি তো নোয়াখালিতে মামার বাড়ি গেছে। যা খবর এসেছে, তাতে—

যতীন। খবর এসেছে নাকি ?

বড় বউদি। এখনই পেলাম। তোমার সেজদা সেজ বউদি শোনে নি এখনও। [চুপিচুপি] পরেশবাবুর স্ত্রী এসেছিলেন এখনই, তাঁর মুখেই শুনলাম। পরেশবাবু নিজের বোনের খবর আনতে ছুটেছিলেন কলকাতায়, সেখানে নোয়াখালির কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাদের একজন নাকি বলেছে যে, সেজ বউয়ের বাপের বাড়ির একটি প্রাণী বাঁচে নি, পুড়ে মরেছে সবাই।

নির্নিমেষে গম্ভীর মুখে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর একটু হাসিলেন, কিন্তু নির্নিমেষে চাহিয়াই রহিলেন।

যতীন। বউদি, তুমি নীচে গিয়ে বেহারী কিংবা ছট্টু—কাউকে দিয়ে খিড়কির দিকে বৈঠকখানার ছাতটায় বাঁশের সিঁড়িটা লাগিয়ে দিতে বল।

বড় বউদি। কেন, কি হবে ?

যতীন। আমার ঘর থেকে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে বৈঠকখানার ছাতে নামা যায়, সেখান থেকে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে খিড়কি-দরজায় যাওয়া যাবে।

বড় বউদি। তা না হয় যাবে, কিন্তু কেন?

যতীন। যদি বাড়ি ঘিরে ফেলে, তা হ'লে খিড়কি দিয়ে আমরা সরকারদের বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারব।

বড় বউদি। ও, পালাবার বন্দোবস্ত! আমি তো প্রাণ থাকতে পালাব না। অনেকদিন বেঁচেছি, কি হবে আর বেঁচে? সবাই যদি ম'রে যায়, আমি একা বেঁচে করবই বা কি? [হাসিয়া] আমার ভয় নেই।

যতীন। আসল ভয় প্রাণের নয়, মানের।

বড় বউদি। [হাসিয়া] সে ভয়ও নেই। মান রাখতে জানলে কেউ নিতে পারে না। [ডিবা খুলিয়া এক খিলি পান মুখে পুরিলেন] তুমি নেবে নাকি এক খিলি? বীণা কি যে ছাই ক'রে সেজেছে পানগুলো, দেখি, ভাল ক'রে নিজেই সাজি গিয়ে। তুমি তো কাব্য নিয়ে থাকবে! আমরা পান চিবুই ব'সে ব'সে, কি আর করব! রান্নাঘরেও যেতে হবে একবার। সকালে তো জানি না, এত কাণ্ড হবে, মাংস আনিয়েছিলাম—। [হাসিয়া] তোমার দাদা পোলাও-মাংসের ফরমাশ দিয়ে গেছেন। ফিরে এসে খাবেন। ফিরে এসে নোয়াখালির খবর শুনলে খাওয়া অবশ্য মাথায় উঠবে জানি, কিন্তু রেঁধে রাখতে হবে। [মুচকি হাসিয়া] চেন তো মানুষটিকে, হুকুমের নড়চড় হবার উপায় নেই। যাই। আর একটু চা পাঠিয়ে দেব নাকি?

যতীন। না, এখন থাক্, এই তো খেলাম। তুমি সিঁড়িটা লাগিয়ে দিতে ব'লো। সাবধান থাকাই ভাল।

বড় বউদি। আচ্ছা। কি বীরপুরুষের উপরই ভার দিয়ে গেছেন কর্তারা!

আর একবার মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন। যতীন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার চোখের সম্মুখে ধীরে ধীরে মূর্ত হইয়া উঠিল সেজদার দুই ছেলে—নীলু ও বিলু। অনিন্দ্যকান্তি কিশোর দুইটি।

জীবন্ত প্রাণের উন্মুখ আগ্রহ তাহাদের সর্ব অঙ্গে পরিস্ফুট। চোখের দৃষ্টি জ্বলজ্বল করিতেছে। তাহারা কি যেন বলিতে যাইতেছিল, সহসা আগুনের শিখা আসিয়া তাহাদের ঘেরিয়া ফেলিল। তাহাদের চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল—হঠাৎ আগুন কেন! তাহারা যতীনের দিকে চাহিয়া আরও আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহাদের চারিদিকে আগুন, অথচ ছোটকাকা নির্বিকার হইয়া বসিয়া আছেন!

নীলু। উঃ—উঃ—এ কি! চারদিক বন্ধ যে—কোথা যাই? ছোটকাকা, কপাটটা খুলে দাও, কপাটটা খুলে দাও।

বিলু। ছোটকাকা, ও ছোটকাকা, উঃ, কি করি আমরা?

নীলু। কাপড়ে আগুন ধ'রে গেল—বাঁচাও—পুড়ে যাচ্ছি—

বিলু। বাঁচাও ছোটকাকা, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি—শুনতে পাচ্ছ না? বাঁচাও আমাদের, বাঁচাও—বাঁচাও—

আগুনের লেলিহান শিখা লকলক করিয়া তাহাদের গ্রাস করিয়া ফেলিল। শিখা ভেদ করিয়া চীৎকার উঠিতে লাগিল—বাঁচাও—বাঁচাও—বাঁচাও। মনে হইল, স্বয়ং অগ্নিই যেন তারস্বরে আর্তনাদ করিতেছেন। যতীন উত্তেজনাভরে উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু পরমুহূর্তেই লজ্জিত হইয়া বসিয়া পড়িয়া ছুই হাতে মুখ ঢাকিল। নিরুপায় ক্ষোভে তাহার সমস্ত চিত্ত মথিত হইতে লাগিল। চোখের সম্মুখে সমস্ত দৃশ্যটা ফুটিয়া উঠিতেছে, অথচ কিছু করিবার উপায় নাই। বাঁচাও—বাঁচাও—বাঁচাও— চীৎকার এখনও থামে নাই। বাঁচাও—বাঁচাও—বাঁচাও— চীৎকার তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল। আকাশে বাতাসে, নদীতে প্রান্তরে, উর্ধ্বে নিম্নে, অন্তরে বাহিরে কেবল—বাঁচাও—বাঁচাও—বাঁচাও—বাঁচাও। আগুন নিবিল, কিন্তু চীৎকার থামিল না। অবশেষে চীৎকারটা যেন মূর্তি ধরিয়া অগ্নিস্তূপ হইতে বাহির হইয়া আসিল··· সমস্ত দেহ জ্বলন্ত-অঙ্গারময়। সেই জ্বলন্ত-অঙ্গারময় মূর্তি যতীনের দিকে আগাইয়া আসিল।

অঙ্গারমূর্তি। এখনও ব'সে আছ? বাঁচাও আমাদের,—সর্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল যে, জ্ব'লে পুড়ে খাক হয়ে গেল। ম'রে গেছি, কিন্তু জ্বালা কমছে না। জ্বালা কমিয়ে দাও, শিগগির জ্বালা কমিয়ে দাও।

যতীন। [অসহায়ভাবে] কি করলে কমবে, তা তো জানি না।

অঙ্গারমূর্তি। [সশ্লেষে] এখনও জান না?

যতীন। না।

হাহাকার করিতে করিতে অঙ্গারমূর্তি অদৃশ্য হইয়া গেল। অগ্নিকাণ্ডও ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হইল। যতীন বুঝিতে পারিল, যাহা সে এতক্ষণ লেলিহান অগ্নিশিখা বলিয়া মনে করিতেছিল, আসলে তাহা রক্ত-কিরণ-রঞ্জিত সন্ধ্যার মেঘ—খোলা জানালা দিয়া দেখা যাইতেছিল। সূর্য অস্ত গিয়াছে··· চতুর্দিকে অন্ধকার নামিতেছে। সমস্ত ঘর অন্ধকারে ভরিয়া গেল। নিবিড় অন্ধকারে আত্মনিমগ্ন হইয়া যতীন কি যেন খুঁজিতেছিল। সহসা শুনিতে পাইল—আলো জ্বাল। হাত বাড়াইয়া 'সুইচ' টিপিতেই প্রস্তর-তরুণীর উর্ধ্বোত্থিত বাহুর উপর 'বাল্‌ব'টা জ্বলিয়া উঠিল। যতীন দেখিতে পাইল, আলোকিত দেওয়ালে টিকটিকি লোলুপ আগ্রহে বসিয়া আছে।

টিকটিকি। কতক্ষণ থেকে বলছি, আলো জ্বাল, আলো জ্বাল—শুনতেই পাচ্ছ না। আশ্চর্য! ঘরে ঘরে আলো জ্ব'লে উঠেছে, পোকাগুলো সব চ'লে গেল বোধ হয় এদিকে ওদিকে।

একটা মানসিক অবসাদ যতীনকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। কিছুই করিতে না পারিয়া এবং করিবার আশা নাই অনুভব করিয়া তাহার পৌরুষ যেন ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। নিজের পৌরুষকে মর্যাদা দান করিবার জন্যই সে টিকটিকির উপকারে প্রবৃত্ত হইল।

যতীন। ব্যস্ত হচ্ছ কেন, অনেক পোকা আসবে এখনই। গুণ্ডাটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি আমি। কোন্‌খানে আছে বললে ?

টিকটিকি। [সাগ্রহে] দেবে ? দেবে ? ওই 'সান-শেড'টার ঠিক নীচেই আছে, লাঠিটা নিয়ে যাও।

যতীন উঠিয়া জানালার কাছে গেল এবং 'সান-শেড'এর নীচে বলিষ্ঠ টিকটিকিটাকে দেখিতে পাইল। অদূরে টিকটিকিনীও রহিয়াছে।

যতীন। তোমার টিকটিকিনীও রয়েছে। দুজনকেই তাড়িয়ে দেব ?

টিকটিকি। আরে না না, টিকটিকিনীকে তাড়াবে কেন, গুণ্ডাটাকে তাড়িয়ে দাও।

যতীন ঘরের কোণ হইতে ছড়িটা তুলিয়া লইল এবং বলিষ্ঠ টিকটিকিটাকে নীচে ফেলিয়া দিল।

প্রস্তর-তরুণী। অন্যায় করলে।

যতীন চমকাইয়া তাহার দিকে চাহিল।

টিকটিকি। হি-হি-হি-হি—

অদ্ভুত একটা হাসি হাসিতে লাগিল।

যতীন। [প্রস্তর-তরুণীকে] অন্যায় করলাম নাকি ?

প্রস্তর-তরুণী। অন্যায় করলে না ? এই একই অপরাধে গুণ্ডাদের 'পিশাচ' বলেছ তোমরা—তারাও তেতলার ছাদ থেকে মানুষ ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে নীচে।

টিকটিকি। [প্রস্তর-তরুণীকে] তোমার আস্পর্ধা বড্ড বেড়েছে

দেখছি। নির্জীব পাথর হয়ে বেশ তো জীবন্ত প্রাণীদের সমালোচনা ক'রে যাচ্ছ! তোমার পাথুরে বুদ্ধিতে যা অন্যায়, আমাদের জীবন্ত বুদ্ধিতে তা অন্যায় নয়। [যতীনের দিকে চাহিয়া] কি বল!

যতীন কোন উত্তর দিল না। তাহার চোখের সামনে পর পর দুইটা ছবি কেবল মূর্ত হইয়া মিলাইয়া গেল—মিস্টার চার্চিল এবং জেনারেল স্মাট্‌স্‌। চতুর্দিকে নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। যতীনের মনে হইল, সব যেন ক্রমশ ঘন হইয়া আসিতেছে··· আকাশ বাতাস সব পাথর হইয়া গেল বুঝি··· একটা নিরুদ্ধ নির্বাক আকুলতা আত্মপ্রকাশের বেদনায় যেন টনটন করিতেছে··· এইবার ফাটিয়া যাইবে বুঝি··· প্রস্তর-তরুণী কথা কহিয়া উঠিতেই যতীন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল।

প্রস্তর-তরুণী। [সানুনয়ে] জীবন্ত ক'রে তোল আমাকে। কিরণমালাকে ডাক, মুক্তি-ঝরনার জল ছিটিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে তুলুক।

যতীন। সে কি আর আসবে?

প্রস্তর-তরুণী। তুমি ডাকলেই আসবে। এই উপকারটি কর আমার, এত লোকের এত উপকার কর তুমি—

টিকটিকি। ঠিক ঠিক,—ভারি উপকারী লোক। সভ্য মানুষের লক্ষণই ওই। হ্যাঁ, ভুলে যাবার আগে কথাটা ব'লে ফেলি তোমাকে। উপকারের ঋণটাও কিছু শোধ হয়ে যাক। [চুপিচুপি] তোমার বড় বউদিকে লক্ষ্য করেছিলে ভাল ক'রে?

যতীন। লক্ষ্য করবার মত কিছু ছিল নাকি?

টিকটিকি। ছিল বইকি। পেট-কাপড়ের তলায় চকচকে ছোরা ছিল একটা।

যতীন। কই, দেখি নি তো!

টিকটিকি। [সশ্লেষে] তা দেখবে কেন, ওই পাথরের মূর্তিটার দিকেই হাঁ ক'রে চেয়ে আছ কেবল সর্বক্ষণ, আর বেফয়দা বকরবকর করছ ওর সঙ্গে··· থাম থাম, পোকা এসেছে একটা।

দেওয়ালের গায়ে একটা ছোট কালো পোকা আসিয়া বসিয়া ছিল। টিকটিকি সন্তর্পণে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

প্রস্তর-তরুণী। কিরণমালাকে ডাক। তুমি ডাকলে ঠিক আসবে। তোমাদের ডাকে উর্বশী উঠে আসে সিন্ধু থেকে, গঙ্গা নেমে আসে স্বর্গ থেকে ধরণীর ধূলিতে। কিরণমালাও আসবে, তুমি ডাকলেই আসবে। [সানুনয়ে] ওগো, আমাকে সঞ্জীবিত কর, লোভে, মোহে, অশিক্ষায় পাথর হয়ে আছি কতকাল থেকে, উদ্ধার কর আমায়, দয়া কর, ডাক, কিরণমালার সোনার ঝারিতে ক'রে নিয়ে আসুক সে মুক্তি-ঝরনার জল, ছিটিয়ে দিক আমার সর্বাঙ্গে। চুপ ক'রে আছ কেন? [অধীর-ভাবে] ডাকছ না কেন? ডাক।

যতীন। ডাকলে আসবে না, সময় হ'লে আসবে। পরিবেশ অনুকূল হ'লে নিজেই আসবে সে।

সহসা চতুর্দিকে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। যতীনের মনে হইল, কিরণমালা বুঝি আসিতেছে, তাহারই বুঝি এ অভিনন্দন··· সে সাগ্রহে দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল··· কেহ আসিল না··· শঙ্খঘণ্টারব উগ্র হইতে উগ্রতর হইয়া উঠিল··· অভিনন্দন নয়, একটা ভীত আর্ত হাহাকার যেন মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। অন্ধকারকে চিরিয়া তীক্ষ্ণ তীব্র স্বরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল কয়েকবার। 'জয় হিন্দ্', 'বন্দে-মাতরম্', 'জয় হিন্দ্', 'বন্দে-মাতরম্', 'জয় হিন্দ্', 'বন্দে-মাতরম্'—শতকণ্ঠ হইতে উৎসারিত হইয়া মুখরিত করিয়া তুলিল আকাশ-বাতাস-অন্ধকারকে। আলুথালু বেশে মেজ বউদি ছুটিয়া আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বন্ধ্যা নারী। দেখিলে মনে হয়, বয়স উনিশ-কুড়ির বেশি নয়। আঁটসাট গড়ন। সুশ্রী। নিপুণ প্রসাধনের জন্য আরও সুশ্রী দেখাইতেছে। তাঁহার বিস্ফারিত বড় বড় চোখের দৃষ্টিতে আতঙ্ক।

মেজ বউদি। শুনছ ঠাকুরপো, ছট্টু বলছে, গুণ্ডার দল ঢুকে পড়েছে আমাদের পাড়ায়।

যতীন। ভয় কি, ঢুকুক না।

মেজ বউদি। আমার বড় ভয় করছে।

যতীন। পাগল নাকি, ভয় কি? বড় বউদি কোথায়?

মেজ বউদি। তিনি পোলাও চড়িয়েছেন, তাঁর ভয়-ডর নেই, রান্নাঘরে বেশ নিশ্চিন্ত মনে মাংসের আলু কুটছেন ব'সে ব'সে। আর সেজ বউ আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে মড়ার মত শুয়ে আছে, তোমার সেজদা ঠাকুর-ঘরে। আমার একলা বড্ড ভয় করছে।

যতীন। চাকরগুলো কোথা?

মেজ বউদি। তারা গেটের কাছে বর্শা বল্লম নিয়ে ব'সে আছে লুকিয়ে।

যতীন। তবে আর ভয় কি, আমার কাছেও বন্দুক আছে, একটা নয়, দু-দুটো। ভয় কি?

বাহিরে শঙ্খ, ঘণ্টা, জয় হিন্দ্, বন্দে মাতরম্ আরও উদ্দাম হইয়া উঠিল··· মেজ বউদি যতীনের বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন···হঠাৎ বাহিরের উদ্দাম শব্দটা থামিয়া গেল··· একটা মোটরকারের শব্দ স্পষ্ট হইয়া উঠিল··· যতীন তাড়াতাড়ি স্মেলিং-সল্টের শিশিটা আলমারি হইতে বাহির করিয়া মেজ বউদির নাকের কাছে ধরিতেই তিনি উঠিয়া বসিলেন···কাপড়-চোপড় সামলাইয়া লজ্জিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

যতীন। উঠলেন কেন, শুয়ে থাকুন না।

মেজ বউদি। না, আমি যাই। [উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন] আর তো কিছু শোনা যাচ্ছে না। সব থেমে গেল, নয়? ও কিছু নয় বোধ হয় তা হ'লে, নয়? [ভীত হাসি হাসিয়া] আমাদের পাড়ায় কিছু হবে না বোধ হয়, নয়? আমি যাই, দিদি একলা আছেন নীচে।

যতীন। ভয় করে তো এইখানেই থাকুন না।

মেজ বউদি। না, আমি যাই।

মেজ বউদি চলিয়া গেলেন, কিন্তু অশরীরী বেশে পুনরায় প্রবেশ করিলেন।

অশরীরী মেজ বউদি। আমার ভয় দেখে হেসো না ঠাকুরপো। আমার ছেলে মেয়ে নেই, বিদ্যা বুদ্ধি নেই, দেহটা ছাড়া আর আমার কিছু নেই। এই দেহটাকেই ঘ'ষে মেজে, সাজিয়ে গুছিয়ে তোমার মেজদার মত অসুরকে বশ ক'রে রেখেছি। এই দেহটাই আমার যথাসর্বস্ব, সামান্য ফোড়া হ'লেও তাই আমি ভয়ে মরি। এই দেহটাকে নিয়ে গুণ্ডারা ছেঁড়াছিঁড়ি করবে, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না··· এ ছাড়া যে আমার আর কিছু নেই ঠাকুরপো। হেসো না, দয়া কর আমাকে···

মিনতি-ভরা করুণ দৃষ্টি তুলিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন···তাহার পর অদৃশ্য হইয়া গেলেন। যতীন গুণ্ডাদের কথাই ভাবিতে লাগিল। তাহারা মানুষ নয়? মানুষ কি করিয়া এত নৃশংস হইতে পারে?···ঠিক সামনের দেওয়ালেই যতীনের পুস্তকের আলমারি ছিল। আলমারির কপাট খুলিয়া এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ বাহির হইয়া আসিলেন। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় আব্দুল গফ্ফর খাঁ। পরিধানে মূল্যবান মখমলের জরিদার পোশাক, মাথায় মুসলমানী টুপি। চোখের দৃষ্টি আভিজাত্য-মণ্ডিত।

দীর্ঘাকৃতি পুরুষ। ওরা মুসলমান নয়, ওরা মেওয়াটি। আমার রাজত্বকালে ওরা একবার মাথা চাড়া দিয়েছিল, চাবুকের চোটে শায়েস্তা ক'রে দিয়েছিলাম সবাইকে। দিল্লীর তখ্তে কে আছে এখন? ঘুমুচ্ছে নাকি লোকটা? তারই উচিত এদের শাসন ক'রে দেওয়া।

মুসলমানদের বদনাম দিচ্ছ কেন,—এরা মুসলমান নয়, হতে পারে না, —মুসলমান ইমানদার জাত।

যতীন। কে আপনি?

দীর্ঘাকৃতি পুরুষ। আমি দিল্লীর সুলতান ঘিয়াসুদ্দিন বলবন্। আমার শাসনকালে বাংলা দেশে বিদ্রোহ করেছিল তুঘ্রিল। আমার তখন সত্তর বছর বয়স, তবু আমি নিজে গিয়ে সে বিদ্রোহ দমন করেছিলাম। গৌড়ের বাজারে দু'ধারি ফাঁসিকাঠ পুঁতে লটকে দিয়েছিলাম বদমাশ তুঘ্রিলের চরদের। বদমাশকে কখনও খাতির করি নি, কখনও না। এরা মুসলমান নয়, এরা কাফের। বাদাউনের এক আমীর একবার চাবুকের চোটে তার এক গরিব চাকরকে মেরে ফেলে। চাকরের বিধবা আমার দরবারে নালিশ জানাতে আমি কি করেছিলাম জান? ওই বিধবার সামনে সেই আমীরকে চাবকে হত্যা করেছিলাম। মুসলমান ব'লে খাতির করি নি। সে মুসলমান নয়, সে কাফের। [চীৎকার করিয়া] দিল্লীর সুলতান পাঠান ঘিয়াসুদ্দিন বলবন্ আমি—আমি বলছি, ওরা মুসলমান নয়, ওরা বদমাশ কাফের,—বেতমিজ, বেইমান। চীন থেকে স্পেন পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল যে মুসলমান, তারা কাপুরুষ নয়, তারা বীর, তারা খোদার খিদমৎগার, আল্লাদীর উপাসক···

তাঁহার বাহুর ঊর্ধ্বোৎক্ষেপে যতীন নিমেষে যেন সুদূর অতীতে ইসলাম-ধর্মের মর্মমূলে নীত হইল।···আরবের মরুভূমি ধুধু করিতেছে। কাছে দূরে ছোট বড় অসংখ্য বালির পাহাড়। আর কিছু নাই, কেবল মরুভূমি আর মরীচিকা। দূর চক্রবালরেখায় আকাশ নামিয়া আসিয়াছে। নীল নির্মল মহাকাশ। সেই মহাকাশের পটভূমিকায় কণ্টকসমাকীর্ণ একটি গোলাপগাছ···তাহাতে গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তরাঙা গোলাপ ফুটিয়া আছে··· দূরে একটি উট চলিয়াছে···উটের পিঠে বসিয়া আছেন ইসলাম-জগতের হর্তাকর্তা বিধাতা খলিফা ওমর।

তিনি বৃদ্ধ, কিন্তু অসমর্থ নন। সোজা বসিয়া আছেন, দৃষ্টি সুদূর আকাশে নিবদ্ধ। সঙ্গে একটিমাত্র চাকর, এক বোরা যব, কিছু খেজুর, এক মশক জল এবং একটি কাঠের থালা। আর কিছু নাই।···আরব-সৈন্য জেরুজালেম অবরোধ করিয়াছে। জেরুজালেমের পেট্রিয়ার্ক একটি শর্তে আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছেন—তিনি খলিফা ওমরের কাছে আত্মসমর্পণ করিবেন, আর কাহারও কাছে নয়। খলিফা ওমর তাই চলিয়াছেন। উষ্ট্রপৃষ্ঠে ছয় শত মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। তা হোক, কর্তব্য সর্বাগ্রে।···জেরুজালেমের বাহিরে আরব-সেনাপতিরা তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন। উট আসিয়া থামিল। খলিফা ওমর সবিস্ময়ে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন—ইহারা কাহারা! বহুমূল্য সজ্জায় সজ্জিত অশ্বের সারি, সেনাপতিদের পরিচ্ছদে মখমল রেশম, তাহাতে হীরা মুক্তা জ্বলিতেছে। বৃদ্ধ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, সড়াক করিয়া উটের পিঠ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং মাটি হইতে ঢেলা তুলিয়া তাহাদের দিকে ছুঁড়িতে লাগিলেন। তাঁহাকে এতবড় অপমান? এই সব জরি-জড়োয়ার অর্থ কি? তাঁহার যোদ্ধারা কোথায়? কোথায় সেই মরুচারী বেদুঈনরা? তিনি এই সঙের দল লইয়া জেরুজালেমে প্রবেশ করিবেন না। ইহাদের কাছে আত্মসমর্পণ না করিয়া পেট্রিয়ার্ক ঠিকই করিয়াছেন। ঢিল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সুসজ্জিত সেনাপতি-বৃন্দ দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। নিজের ভৃত্যটিকে মাত্র সঙ্গে লইয়া খলিফা ওমর একাই নগর-প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবার পূর্বে যতীনের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলেন। তাঁহার দৃষ্টি যেন বলিয়া উঠিল—ইসলামধর্ম ভোগী গুণ্ডার ধর্ম নয়, ত্যাগী শহীদের ধর্ম। তাহা দুর্বলকে পীড়ন করে না, তাহা অসত্যের কবল হইতে জান কবুল করিয়াও সত্যকে মুক্ত করে।··· ধীরে ধীরে আর একটি ছবি ফুটিয়া উঠিল—হুগলির হাজি মহম্মদ মহসিন···অতিশয় নিষ্ঠাভরে স্বহস্তে কোরাণ নকল করিতেছেন··· অগাধ সম্পত্তির মধ্যে বাস করিয়াও

তিনি ফকির… স্বজাতির উন্নতির জন্য সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া গেলেন।… এ দৃশ্যও মিলাইয়া গেল।… পর পর কয়েকটা ছবি ফুটিয়া উঠিল। মীর মশার্‌রফ হোসেনের ছবি— 'বিষাদ-সিন্ধু' রচনা করিতেছেন… 'অগ্নিবীণা' হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন কবি কাজি নজরুল ইসলাম… আবিদ মিঞা—চমৎকার রামায়ণ গান করিত…

প্রস্তর-তরুণী। আমাকে মুক্ত কর, মুক্ত কর, মুক্ত কর…

যতীন ফিরিয়া দেখিল, উন্মুখ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে প্রস্তর-তরুণী নয়, বন্দিনী সীতা। এ তো তাহার ঘর নয়, এ যে অশোক বন। রাবণ স্মিতমুখে অদূরে দাঁড়াইয়া আছে।

রাবণ। [সীতাকে] যাদের উপর নির্ভর ক'রে এতদিন তুমি আমার দিকে ফিরে চাও নি, এবার সেই রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে বেঁধেছি, ওই দেখ—

লঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্র ধীরে ধীরে মূর্ত হইয়া উঠিল। অসংখ্য শবাকীর্ণ বিরাট প্রান্তর। বহু সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। নাগপাশ-বদ্ধ হত-চেতন রাম-লক্ষ্মণকে ঘিরিয়া বহু বীর বিলাপ করিতেছেন। রাম-লক্ষ্মণের বর্ম বিধ্বস্ত, শরাসন বিক্ষিপ্ত, সর্বাঙ্গ শরবিদ্ধ, মনে হইতেছে, যেন তাঁহারা শরস্তম্ভময়। অসংখ্য নাগ শররূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অদূরে রাবণ দাঁড়াইয়া হাসিতেছে…তাহার দশ মুণ্ডে কামনালুব্ধ লক্ষ চক্ষু জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে…ধীরে ধীরে একটা অদ্ভুত রূপান্তর ঘটিতে লাগিল…রাবণের রূপটা প্রথমে ক্লাইব, পরে লর্ড ডাল্‌হাউসিতে পরিণত হইল…বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা অযোধ্যা বেরার পাঞ্জাব সব একে একে নাগপাশে বাঁধা পড়িতেছে…রাম-লক্ষ্মণ হিন্দু-মুসলমানে রূপান্তরিত হইল। তাহার পর অন্ধকার। অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছে। দূরে ওটা কিসের শব্দ? রাবণের

হাসি, না ইংরেজের কামান? সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া গেল আবার। ভয়াবহ নিস্তব্ধতা। তাহার পর ঝড় উঠিল, কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল কালো কালো বিশাল মেঘ, মেঘের বুকে জ্বলিয়া উঠিল বিদ্যুৎবহ্নি। চরাচর প্রকম্পিত হইয়া উঠিল, মনে হইল, যেন ভূমিকম্পে বসুধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; আকাশেও আলোড়ন; সপ্ত-সমুদ্র গর্জন করিতেছে···বিরাট পক্ষ সঞ্চালন করিয়া উড়িয়া আসিলেন বিনতা-নন্দন গরুড়···গরুড়কে দেখিয়া সর্পকুল পলায়ন করিতেছে···নাগপাশমুক্ত রাম-লক্ষ্মণ পুনরায় ভীম-পরাক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।···গরুড় দেখিতে দেখিতে রূপান্তরিত হইল সিপাহী-বিদ্রোহে···পরাধীনতার নাগপাশ খুলিয়া গেল···হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি যুদ্ধ করিতেছে···নানাসাহেব, আজিমুল্লা খান।···সিপাহী-বিদ্রোহ রূপান্তরিত হইল কংগ্রেসে···সেখানেও হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বদরুদ্দিন তায়েবজি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহম্মদ রহিমতুল্লা সয়ানী, আর. এন. মুধলকর, নবাব সৈয়দ মামুদ, হাকিম আজমল খান, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মৌলানা মহম্মদ আলি, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।···সহসা একটা প্রচণ্ড শব্দ হইল···কংগ্রেস মিলাইয়া গেল···লঙ্কার প্রান্তরে রাম হাহাকার করিতেছেন···রাবণ লক্ষ্মণের বুকে শক্তিশেল হানিয়াছে। রামের হাহাকার ক্রমশ যেন শঙ্খধ্বনিতে পরিণত হইল···চারিদিকে আবার শাঁখ বাজিয়া উঠিয়াছে··· আবার হাহাকার···জয় হিন্দ্, বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ্, বন্দে মাতরম্, জয় হিন্দ্, বন্দে মাতরম,···গুড়ুম গুড়ুম···বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল···জয় হিন্দ্, বন্দে মাতরম্, জয় হিন্দ্, বন্দে মাতরম্···আবার সব স্তব্ধ···একটা মোটর আসিবার শব্দ শোনা গেল।

প্রস্তর-তরুণী। আমাকে মুক্ত কর, মুক্ত কর, মুক্ত কর···

যতীনের মনে হইল, তাহাদেরই বাড়ির গেটের সামনে কলরব উঠিয়াছে। সে তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। বড়দা যে বন্দুক দুইটা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই একটা তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইতে গিয়া সে এক কাণ্ড করিয়া ফেলিল। বন্দুকের নলের ধাক্কায় প্রস্তর-তরুণী মেঝেতে পড়িয়া গিয়া সশব্দে চুরমার হইয়া গেল। অন্ধকার।

…যতীন হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দেওয়ালের কাছে গিয়া আর একটা সুইচ টিপিতেই আলোটা জ্বলিয়া উঠিল। আলোর ঠিক নীচেই এক সারি ছবি ছিল—মহাত্মা গান্ধী, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র। ইঁহারা সকলেই যেন তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গান্ধীজীই প্রথমে হাসিমুখে সম্বর্ধনা করিলেন, তাঁহার ফোকলা দাঁতের হাসিতে শিশুর সরলতা ফুটিয়া উঠিল।

মহাত্মা গান্ধী। তুমি একটু আগেই যা দেখলে তা স্বপ্ন নয়, সত্য, দেশজোড়া এই যে বিক্ষোভ, সত্যিই তা লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ। কিন্তু রাম আজ আত্মবিস্মৃত। লক্ষ্মণের বুকে রাবণ আজ যে শক্তিশেল হেনেছে, তা যে হিন্দুবিদ্বেষ তা সে বুঝতে পারছে না। সেই বিদ্বেষের বিষে আজ মূর্ছিত হয়ে পড়েছে সৌমিত্রি। তাকে বাঁচাতে হবে। শক্তিশেলে লক্ষ্মণ যখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, তখন রাম তো তার বুকে গুলি করতে যায় নি। তোমার হাতে তবে বন্দুক কেন?

যতীন লজ্জিত হইয়া পড়িল।

মহাত্মা গান্ধী। [হাসিয়া] মহর্ষি বাল্মীকি ব'লে গেছেন, গন্ধমাদনেই এর ওষুধ আছে। গন্ধমাদন পাহাড় নয়—গন্ধে যা চতুর্দিক আমোদিত করে অথচ যা পর্বতের মত দৃঢ়, সেই বিশুদ্ধ মানব-চরিত্রের নামই—গন্ধমাদন। বিশল্যকরণীও গাছের শিকড় নয়—ওসব

রূপক—যা সত্যিই মানুষকে বিশল্য অর্থাৎ বেদনামুক্ত করে, তার নাম—ভালবাসা, প্রেম। এই গন্ধমাদনের ভার যিনি বহন করতে পারবেন, তিনি শাস্ত্রবিৎ মহাশক্তিশালী আত্মত্যাগী মহাবীর। বন্দুক নয়, তাঁরই এখন প্রয়োজন। তিনি না এলে সীতা উদ্ধার হবে না।

গান্ধীজীর পাশেই বিবেকানন্দের ছবি। যতীন দেখিল, বিবেকানন্দের আয়ত-নয়ন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। নীচে কলরবটা বাড়িয়া উঠিল। ...কিন্তু সমস্ত ছাপাইয়া গমগম করিয়া উঠিল বিবেকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠস্বর। যতীন নড়িতে পারিল না, মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতে লাগিল।

বিবেকানন্দ।

শোন বন্ধু, শোন শোন, কহিতেছি অন্তরের কথা,
আমার জীবনে আমি বুঝিয়াছি এই সত্য সার।
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ এ সমুদ্রে চারিদিকে তরঙ্গ ভীষণ,
একটি তরণী আছে, যা শুধু করিতে পারে পার।

নহে তন্ত্র, নহে মন্ত্র, নহে জপ, নহে প্রাণায়াম,
বিজ্ঞান দর্শন নহে, নহে কোন বিধান বা বিধি,
নহে ত্যাগ, নহে ভোগ, মায়া ওরা ছদ্মবেশী কাম।
ভালবাসা ভালবাসা একমাত্র ওই শ্রেষ্ঠ নিধি।

অমৃতের পুত্র তুমি, অনন্তের প্রতীক মহান
অফুরন্ত প্রেমসিন্ধু তোমারই অন্তরে উথলায়।
দাও—দাও—দাও শুধু— চাহিও না কোন প্রতিদান,
প্রতিদান চাহিলেই মহাসিন্ধু বিন্দু হয়ে যায়।

মহত্তম ব্রাহ্মণ বা ক্ষুদ্রতম কীট পরমাণু
সকলেরই মাঝে তিনি প্রেমের ঠাকুর নারায়ণ।
দেহ প্রাণ মন আত্মা দাও, বন্ধু, সর্বস্ব তোমার
তাঁহারই চরণে সব ভক্তিভরে কর সমর্পণ।

নিখিল বিশ্বের মাঝে হের তাঁর বিচিত্র প্রকাশ
এঁরে অবহেলা করি মুক্তি কোথা করিছ সন্ধান ?
উচ্চনীচনির্বিশেষে ভালবাস—শুধু ভালবাস
ওই মুক্তি, ওই মন্ত্র, ওই পূজা, ওই ভগবান।

বিবেকানন্দ থামিতে না থামিতেই দেশবন্ধুর কণ্ঠ শোনা গেল।

দেশবন্ধু। ওই যে বাঙালী কৃষক সমস্ত দিন বাঙলার মাঠে মাঠে আপনার কাজ ও আমাদের কাজ শেষ করিয়া দিবা অবসানে ঘর্মাক্ত-কলেবরে বাঙলার কুটিরে কুটিরে গান গাহিতে গাহিতে ফিরিতেছে, উহারা মুসলমান হউক শূদ্র হউক চণ্ডাল হউক উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ। অহঙ্কারী, মাথা নোয়াও। অবিশ্বাসী, তোমার প্রাণে বিশ্বাস জাগাও, জাগাও—তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ। আততায়ী, তোমার হাতের ছুরি ফেলিয়া দাও, জন্মের মত ফেলিয়া দাও—তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ। ডাক ডাক, সবাইকে ডাক। প্রাণের ডাক শুনিলে কেহ কি না আসিয়া পারে ? ওঠ, জাগ, আপনার কল্যাণকে জাগাও···

রবীন্দ্রনাথের চক্ষু হইতে বহ্নি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। শাণিত ছুরিকার মত তীক্ষ্ণ কণ্ঠ যেন অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া দিল।

রবীন্দ্রনাথ।

শতেক শতাব্দী ধ'রে নামে শিরে অসম্মান-ভার
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি দেখিবারে পাও নাকি
নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে
সবারে না যদি ডাকো এখনও সরিয়া থাকো
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতা-ভস্মে সবার সমান।

বঙ্কিমচন্দ্র। [স্মিতহাস্যসহকারে] বন্দে মাতরম্।

আলোর নীচেই ছোট একটা টেবিল ছিল। তাহার উপর একখানা বই ছিল—ব্রাদার্স কারামাজোভ। সেই পুস্তকের ভিতর হইতে একটি মূর্তি বাহির হইয়া আসিল। রুশদেশীয় কৃষকের মূর্তি। অন্তর এবং বাহিরের বহুবিধ উৎপীড়নের কাহিনী তাহার চোখের দৃষ্টিতে লেখা রহিয়াছে। যতীনের দিকে চাহিয়া সে দৃষ্টি ঈষৎ হাস্যদীপ্ত হইল।

মূর্তি। অনেক উত্থান-পতনের মধ্যে জীবন কেটেছে আমার, সাইবেরিয়ায়, জেলে, গরিবের কুঁড়েতে, চোরের আড্ডায়, ধনীর প্রাসাদে—বহু জায়গায় ঘুরেছি। বইও পড়েছি অনেক রকম; কিন্তু জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা কি লাভ করেছি জান—যার চেয়ে বড় সত্যের সাক্ষাৎ জীবনে আর পাই নি, কি তা জান?

যতীন। না।

মূর্তি। কথাটি বাইবেলে আছে—লাভ দাই নেবার। প্রতিবেশীকে ভালবাস।

যতীন। আপনি কে?

মূর্তি। ফিয়ডর ডস্টয়েভ্‌স্‌কি।

ডস্টয়েভ্‌স্‌কি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। দ্রুতপদে মেজ বউদি প্রবেশ করিলেন। তিনি অতিশয় উত্তেজিত।

মেজ বউদি। শুনেছ, কি কাণ্ড হয়েছে! উঃ!

যতীন। কি?

মেজ বউদি। নীলার আজ বিয়ে ছিল, জান তো? বিয়ে হচ্ছিল, এমন সময় হৈ-হৈ ক'রে একদল গুণ্ডা তাদের বাড়িতে ঢুকে প্রবালকে মেরে ফেলেছে, যোগেন পুরুতকেও মেরে ফেলেছে— নীলাকে পিঁড়ে থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের ভলান্টিয়াররা রীতিমত লড়াই ক'রে কেড়ে নিয়ে এসেছে তাকে। দুজন ভলান্টিয়ার—ছকু বীরেন লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছ।

যতীন। সে কি! নীলা কোথায় এখন?

মেজ বউদি। মোটরে ক'রে আমাদের বাড়িতেই তাকে দিয়ে গেল যে। মোটরের শব্দ শুনতে পেলে না? নীচে শুইয়ে দিয়েছি তাকে। একটি কথা কইছে না, ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে আছে খালি।

যতীন কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল।

যতীন। বড়দা-মেজদার কোনও খবর এসেছে?

মেজ বউদি। হ্যাঁ, ওই ভলান্টিয়াররাই ব'লে গেল। তাঁদের কোনও বিপদ এখনও হয় নি, তবে তাঁরা এখনও ওই ভিড়ের মধ্যেই আছেন। ওঁরা কখন যে ফিরবেন! ভাল লাগে না বাপু আমার এ সব।

যতীন। বড় বউদি কি করছেন?

মেজ বউদি। তিনি রান্নাঘর থেকে এই তো বেরুলেন। নীলাকে একটু গরম দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছেন।

যতীন। চলুন, দেখি গিয়ে।

মেজ বউদি। না, তুমি যেও না। বড়দি তোমাকে যেতে মানা করলেন এখন।

এত দুঃখের মধ্যেও মেজ বউদির মুখে বউদি-সুলভ ব্যঙ্গের মৃদু হাসির ঝিলিক একবার দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল।

মেজ বউদি। বড়দি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি খাবে এখন? রান্না হয়ে গেছে।

যতীন। না, খাব না। সেজদা পূজোর ঘর থেকে বেরোন নি এখনও?

মেজ বউদি। না। আমি জানলার ফাঁক দিয়ে দেখেছিলাম একটু আগে। চোখ বুজে নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে আছে—মনে হয় বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

যতীন। সেজ বউদি?

মেজ বউদি। বীণাও তেমনই আপাদমস্তক মুড়ে শুয়ে আছে। ওঠাতেও সাহস হচ্ছে না। বুঝতে পেরে গেছে বোধ হয়। মায়ের প্রাণ তো!…ভাল লাগে না বাপু এ সব। [কেমন যেন অন্যমনস্ক অস্থির হইয়া পড়িলেন] তুমি তা হ'লে খাবে না? আমি যাই তা হ'লে।

চলিয়া গেলেন। যতীন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আলমারির অন্ধকার কোণ হইতে অশরীরী একটি মূর্তি বাহির হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। দেখিলে মনে হয় রাজপুত।

যতীন। কে আপনি?

অশরীরী মূর্তি। আমি একজন মুসলমান নেতা।

যতীন। মুসলমান নেতা?

অশরীরী মূর্তি। হ্যাঁ। তুমি যা ভাবছ, তার জবাব দিতে এসেছি। [দাঁতে দাঁত চাপিয়া নিরুদ্ধ আক্রোশে] মুষ্টিমেয় ব'লে ভয় পাবার লোক নই আমরা। মনে নেই, গজনীর মামুদ মাত্র এক হাজার সৈন্য নিয়ে এসে কি কাণ্ড করেছিল?

যতীন। [হাসিয়া] এখন আর সেদিন নেই জনাব। এখন ভারতবর্ষের এক প্রান্তের খবর আর এক প্রান্তে নিমেষে পৌঁছয়। দরকার হ'লে এক প্রান্ত থেকে হাজার হাজার লোক উড়ে চ'লে যাবে আর-এক প্রান্তে এক ঘণ্টার মধ্যে। তা ছাড়া গজনীর মামুদের নজির দেখিয়ে তুমি আস্ফালন করছ কেন মিঞা সাহেব? তার সঙ্গে তোমার রক্তের তো সম্পর্ক নেই কোনও, রক্তের সম্পর্ক আছে বরং আমাদেরই সঙ্গে। নোয়াখালিতে আজ তোমরা যেমন অসহায় লোকদের জোর ক'রে মুসলমান করছ, ওই গজনীর মামুদরা তেমনই এককালে ভয় কিংবা লোভ দেখিয়ে তোমাদের বাপ-দাদাদের মুসলমান করেছিল।(তোমরাও তো এ দেশেরই লোক ভাই। তোমাদের সঙ্গে আমাদের এইটুকু মাত্র তফাৎ, গজনীর মামুদেরা তোমাদের মুসলমান করতে পেরেছিল, আমাদের পারে নি। তোমরা যদি আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসতে চাও, আমরা রাজি আছি। না যদি আসতে চাও, তাতেও আপত্তি নেই—যেমন আছ তেমনই থাক— মুসলমান ধর্মও ভাল ধর্ম, কোনও ধর্মই খারাপ নয়। তবে আস্ফালন ক'রো না। ওটা হাস্যকর···)

হঠাৎ হা-হা করিয়া কে যেন হাসিয়া উঠিল। তাহার পর আলমারির আর এক দিক হইতে বাহির হইয়া আসিল পাগল নজরুল ইসলাম।

নজরুল। "হিন্দু না ওরা মুসলিম?"—ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন
কাণ্ডারী, বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!
দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

ইহারা দুইজন অদৃশ্য হইবার পর আর একটি তৃতীয় মূর্তি আবির্ভূত হইল। কুড়ি বৎসরের ছেলে একটি। চোখে নির্ভীক দৃষ্টি।

যতীন। আপনি কে?

ছেলেটি। আমার নাম বিভূতিভূষণ সরকার। আমি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বোমা দিয়ে ছোট লাটের গাড়ি ওড়াবার চেষ্টা করেছিলাম। কেন জান? তার কিছুদিন আগে জামালপুরের মেলায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়। সে দাঙ্গায় রাজপুরুষরা মুসলমানদের সাহায্য করেছিলেন। এই ইংরেজদের তাড়াতে না পারলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন হবে না।

বিভূতি সরকার অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা দৃশ্য মূর্ত হইল,—একটা সাপুড়ে সাপ খেলাইতেছে। সাপুড়ের মুখটা মিস্টার চার্চিলের মুখের মত।···এ দৃশ্যও অন্তর্হিত হইল। যতীন দেখিল, দেওয়ালে অসংখ্য পোকা আসিয়াছে, টিকটিকি উন্মাদের মত পোকা শিকার করিতেছে। টিকটিকিনী সন্তর্পণে ওদিকের কোণ হইতে মুখ বাড়াইল, কিন্তু টিকটিকির সে দিকে চাহিবার অবসর নাই··· সে ক্রমাগত খাইয়া চলিয়াছে। সহসা একটা গম্ভীর উদাত্ত ধ্বনি শূন্যে ভাসিয়া আসিল।

কেমনে ভুলিলে

হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে।
হে রাঘব-কুল-চূড়া, তব কুলবধূ
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয়? না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন— বীর-বীর্যে সর্বভুক সম
দুর্বার সংগ্রামে তুমি—উঠ ভীমবাহু···

আবৃত্তি করিতে করিতে মাইকেল মধুসূদন প্রবেশ করিলেন। পিছনের দিকে দুই হস্ত নিবদ্ধ। আপনমনে আসিলেন এবং চলিয়া গেলেন, কোনদিকে ফিরিয়া চাহিলেন না।···সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। পাড়ার একজন ভলান্টিয়ার—অশোক, দ্রুতপদে আসিয়া প্রবেশ করিল।

তাহার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত। কপালটা কাটিয়া গিয়াছে। মুখের হাসি কিন্তু ম্লান হয় নাই, চোখের দৃষ্টি নির্ভীক। বয়স বেশি নয়, কিশোর।

অশোক। আপনার কাছে টিঞ্চার আইডিন আছে যতীনদা?

যতীন। ইস্, কি হ'ল?

অশোক। অন্ধকারে বোঁ ক'রে একটা ঢিল এসে লেগে গেল। হয়তো আমাদেরই কেউ ছুঁড়েছে। [হাসিল]

যতীন আলমারি হইতে তুলা ও টিঞ্চার আইয়োডিন বাহির করিয়া অশোকের কপালে লাগাইয়া দিতে লাগিল। অশোক অবিচলিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যতীন। বড়দা-মেজদার খবর জান?

অশোক। বড়দার ডান হাতে চোট লেগেছে। মেজদা তাঁকে নিয়ে হাসপাতালে গেলেন। উঃ, বড়দা মেজদা দুজনেই কি লড়াটাই লড়েছেন! ওঁরা না থাকলে নীলাদিকে ঠিক নিয়ে চ'লে যেত।

যতীন। বড়দার হাতের চোট খুব বেশি নাকি?

অশোক। না, খুব বেশি নয়। বড় জোর ফ্র্যাকচার হতে পারে, আবার কি হবে!

বড়দার হাতের আঘাতটা যে কিছুই নয়, এই ভাব প্রকাশ করিয়া ভুরু নামাইয়া অশোক তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিল। যতীন তুলা ও একটা রুমাল দিয়া তাহার মাথাটা বাঁধিয়া দিল।

যতীন। এইবার শুয়ে পড় গিয়ে।

অশোক। [বিস্মিত] শোব কি! ওই মোড়ে আমার ডিউটি রয়েছে এখন। আর একটা খবর শুনেছেন যতীনদা, ভারি মজার

খবর। শৈলেনবাবুকেও ওরা খুন করেছে। আমি চলি যতীনদা, মোড়ে কেউ নেই।

ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। যতীন যেন কিরণমালার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল··· বহুদূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে।

কিরণমালা। [বহুদূর হইতে] মায়াপাহাড়ের রহস্য ভেদ করেছি। আসছি আমি—আসছি—

যতীন উৎসুক নয়নে দ্বারের দিকে চাহিল। কিরণমালা আসিল না, বড় বউদি প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একটা থালা। থালার উপর একটা বাটি।

বড় বউদি। তোমার খাবার দিয়ে গেলাম। আমি হাসপাতালে যাচ্ছি।

যতীন। হাসপাতালে কেন?

বড় বউদি। তোমার দাদাদের খাইয়ে আসি। তোমার বড়দাকে খাইয়েই দিতে হবে বোধ হয়। ডান হাত ভেঙেছে শুনছি। [হাসিলেন]

যতীন। ওঁরা আসবেন না হাসপাতাল থেকে?

বড় বউদি। রামদীন এসে বললে, ডাক্তারেরা রাতটা ওইখানেই থাকতে বলেছে।

যতীন। মোটর তো খারাপ, তুমি যাবে কি ক'রে? ভাড়া-গাড়িও তো পাওয়া যাবে না এখন।

বড় বউদি। রামদীনকে সঙ্গে ক'রে হেঁটেই চ'লে যাব। কতটুকুই বা!

যতীন। চল, আমিই না হয় যাই তোমার সঙ্গে।

বড় বউদি। না না, তুমি বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেও না।

তোমাকে এখান থেকে এক পা নড়তে মানা ক'রে গেছেন। তোমাকে যদি হাসপাতালে দেখেন, বাঁ হাত দিয়েই হয়তো গুলি ক'রে বসবেন। [হাসিয়া] চেন তো মানুষটিকে! দরকার নেই তোমার গিয়ে। দু-চারটে গুণ্ডা শুনছি নীলার সন্ধানে ঘুরছে এখনও। তুমি থাক বাড়িতে। রামদীন আমার সঙ্গে থাকবে, কিছু ভয় নেই। রুমি নোয়াখালি দৌড়তে পারল, আর আমি এটুকু যেতে পারব না! নীলা ঘুমুচ্ছে—তুমি এখন নীচে যেও না যেন, মেজ বউ রইল তার কাছে। বৈঠকখানার ছাতে বাঁশের সিঁড়ি লাগিয়ে দিইয়েছি। খাবারটা এই টেবিলে রইল। গরম গরম খেয়ে নাও না বাপু, তুমি মাংসের যে যে পীস ভালবাস, তাই দিয়েছি বেছে বেছে। আচ্ছা, চললুম আমি।

চলিয়া গেলেন। যতীন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মনে হইতে লাগিল, বড় বউদি যেন তাহার মা। মেজ বউদির সঙ্গে ঠিক এই সম্পর্ক তাহার নয়। তাহাকে সে এখনও 'আপনি' বলে। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কতক্ষণ তাহার খেয়াল ছিল না। একটা শব্দ হইতে সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল—পাশের ঘরের খোলা দরজা দিয়া ছাতটা দেখা যাইতেছে—বৈঠকখানার ছাত হইতে কাঠের সিঁড়ি দিয়া কে সন্তর্পণে উপরে উঠিতেছে।

যতীন। কে?

কোনও সাড়া নাই। মূর্তিটা সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়া পাশের ঘরের খোলা দরজাটার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। যতীন ত্বরিত হস্তে বন্দুকটা তুলিয়া লইল।

যতীন। কে—জবাব দাও, তা না হ'লে গুলি করব।
মূর্তি। ভাই যতীন, আমি মহীউদ্দিন।

যতীন। মহীউদ্দিন!

মহীউদ্দিন। আমায় তুমি বাঁচাও ভাই, আমার বাল্যবন্ধু তুমি।

যতীন পাশের ঘরে গিয়া আলোটা জ্বালিয়া দিল। মহীউদ্দিন দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে। ভয়ে তাহার চোখ মুখ বিবর্ণ।

যতীন। মহীউদ্দিন? তুমি! ভেতরে এস।

যতীনের বন্দুকটার দিকে মহীউদ্দিন বার বার চাহিতে লাগিল।

যতীন। ভেতরে এস।

মহীউদ্দিন। তোমার হাতে—

সে আর কথা শেষ করিতে পারিল না, বিস্ফারিত চক্ষে বন্দুকটার দিকে চাহিয়া বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

যতীন। বাইরে কেন, ভেতরে এস না!

মহীউদ্দিন। ভাই—

সহসা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

যতীন। [আগাইয়া গিয়া হাত ধরিয়া] এস—এস—

মহীউদ্দিন। [সভয়ে পিছাইয়া গেল] না—না—না—

যতীন। ও, তুমি বুঝি ভয় পাচ্ছ, আমি তোমায় ঘরে পুরে মেরে ফেলব! সে ইচ্ছে থাকলে এতক্ষণ ফেলতাম। আশ্রিতকে রক্ষা করাই আমাদের ধর্ম যে ভাই। শুধু আমাদের ধর্ম নয়, তোমাদেরও

ধর্ম। আমাদের যুদ্ধ গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়, ভুল ক'রো না। এস, ভেতরে এস, ব'স।

মহীউদ্দিন তবু দাঁড়াইয়া রহিল।

যতীন। আচ্ছা, তোমার ভয় ভাঙিয়ে দিচ্ছি।

দ্বিতীয় বন্দুকটি বাহির করিয়া আনিয়া তাহার হাতে দিল।

যতীন। এই নাও, এইবার হ'ল তো? আমি যদি তোমাকে আক্রমণ করি, তুমি আত্মরক্ষা করতে পারবে। এস—ব'স।

মহীউদ্দিন ভিতরে আসিয়া বসিল।

মহীউদ্দিন। আমি খেতে বসেছিলাম, এমন সময় শুরু হয়ে গেল। উঃ—উঃ—

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

যতীন। খাবে কিছু? খাবার আছে।

পোলাও মাংস আনিয়া তাহার সামনে ধরিয়া দিল।

যতীন। খাও, খেয়ে খিল দিয়ে শুয়ে পড় তাড়াতাড়ি। কেউ যদি এসে দেখে ফেলে তোমাকে, তা হ'লে একটু মুশকিলে প'ড়ে যাব—বুঝতেই পারছ। আমি বিছানা দিচ্ছি—বেশ ক'রে খেয়ে দেয়ে শুয়ে থাক, কোন ভয় নেই। বিছানাটা পাতি, থাম।

যতীন বিছানা পাতিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। মহীউদ্দিন নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া কেবল জল পড়িতেছিল। সহসা উঠিয়া সে আবেগভরে যতীনকে আলিঙ্গন করিল। তাহার মুখ হইতে অস্ফুটকণ্ঠে বাহির হইল—ভাই!

...অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। মহীউদ্দিন পাশের ঘরে খিল দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যতীন একটা ঈজি-চেয়ারে ঠেস দিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া আছে। তাহার মন ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতের আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছিল—যে ভারতে দারিদ্র্য নাই, নীচতা নাই, হিংসা নাই, দ্বন্দ্ব নাই, যাহা বহু শতাব্দীর পঙ্ককে অতিক্রম করিয়া রূপে রসে গন্ধে শতদল পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে... যে ভারতে মানুষ কামনা করে, ধন নয়, মান নয়—আনন্দ... আনন্দ আর শান্তি। ...দ্বারপথে একটা শব্দ হইতেই যতীন চোখ খুলিয়া দেখিল, নীলা দাঁড়াইয়া আছে। কপালে কনে-চন্দন, পরনে চেলী।

নীলা। আমি আবার ফিরে এলুম যতীনদা।

ধীরে ধীরে সে ঘরে প্রবেশ করিল এবং যতীনের পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা গুঞ্জনরবে চতুর্দিক পূর্ণ হইয়া উঠিল। যতীন দেখিল, অশরীরী ভ্রমরটা মনের আনন্দে গুনগুন করিয়া বেড়াইতেছে।

অশরীরী ভ্রমর। একটা সুখবর তোমায় দিতে এলাম—আমি তার দেখা পেয়েছি।

যতীন কোন উত্তর দিল না। নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল শুধু।

শেষ

মানদণ্ড

120

সেদিন স্টেশন প্লাটফর্মে খুব ভিড়। ট্রেন এসেছে অনেক দেরিতে। এর আগে যে ট্রেনখানা এসে পৌঁছবার কথা সেটাও এসে পৌঁছয় নি। দুটো ট্রেনের যাত্রী তাই ভিড় করেছে। ট্রেনটা আসবামাত্র হুড়োহুড়ি পড়ে গেল একটা, যে যেখানে পারল চড়ে বসল। যথাসময়ে গার্ড সাহেব হুইস্‌ল্‌ দিলেন, সবুজ আলো দেখালেন, যথারীতি ঘণ্টা পড়ল। শ্রীমতী তুঙ্গশ্রী যখন এলেন তখন ট্রেন চলতে শুরু করেছে। ছুটোছুটি করেও ট্রেনটা ধরতে পারলেন না তিনি। অপসৃয়মান গার্ড-গাড়িটার দিয়ে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। ট্রেনটা চলে গেল। কোথায় থাকবেন তিনি এখন রাত্রে এই বিদেশে! তা ছাড়া থাকা নিরাপদও নয় যে! কুলিটার দিকে ফিরে চাইলেন। সে তাঁর সুটকেস ও বিছানাটা মাথায় করে দাঁড়িয়েছিল পিছনেই। সমস্ত রাগ পড়ল তার উপরে। লোকটা নিজে যেচে এসে মালটা নাবালে লরি থেকে। তারপর মাল মাথায় নিয়ে গল্প করলে একটা লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে। তারপর বিড়ি কিনতে গেল তাঁকে দাঁড় করিয়ে রেখে। রোষ-বহ্নি ধকধক করে উঠল তুঙ্গশ্রীর চোখের দৃষ্টিতে। কুলিটার দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে তিনি বললেন—"তোমার জন্যেই তো ট্রেনটা পেলাম না। এখন কি করি বল তো? কুলিটা বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ তাঁর দিকে। তারপর বললে—"ওয়েটিং রুমে থাকবেন কি?"

"না।"

"ধরমশালায় নিয়ে যাব?"

"না।"

"হোটেলও একটা আছে স্টেশনের কাছে।"

"না, সেখানেও যাব না।"

"তাহলে—"

ইতস্তত করে থেমে গেল কুলিটা। তুঙ্গশ্রীও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি এমন কোনও স্থানে থাকতে চান না, যেখানে আর পাঁচজনে তাঁকে দেখতে পায়। তিনি যে এখানে এসেছিলেন, এ কথা কাউকে জানতে দিতে চান না তিনি। গোপনে এসে গোপনে চলে যাবেন—এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। কিন্তু এই কুলিটার জন্যে সব মাটি হয়ে গেল। কুলিটা আবার বললে—"আপনি তাহলে কোথায় যাবেন বলুন, সেইখানেই নিয়ে যাই।"

"আমি এমন কোনও জায়গায় রাত কাটাতে চাই, যেখানে বাইরের লোক থাকবে না। মানে, একা থাকতে চাই। এমন কোনও জায়গা জানা আছে তোমার?"

"আছে। সেটা কিন্তু শহর থেকে বাইরে।"

"কত দূর?"

"তা মাইল দুই হবে। আমার জানা-শোনা একটি বাবুর বাড়ি। তিনি এখন এখানে নেই। আমি তাঁর বাড়ি দেখাশোনা করি, চাবি আমার কাছে আছে।"

তুঙ্গশ্রী ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবলেন ক্ষণকাল। কাল সন্ধ্যার আগে ফেরবার ট্রেন নেই। সকালের দিকে আছে অবশ্য একখানা ট্রেন, কিন্তু দিনের ট্রেনে যাবেন না তিনি। যাওয়া নিরাপদ

নয়। আজ সমস্ত রাত কাল সমস্ত দিন আত্মগোপন করে থাকতে হবে তাঁকে। কুলিটা যে রকম বলছে সে রকম একটা বাড়ি যদি থাকে, তাহলে মন্দ কি!

"সেখানে যাব কি করে?"

"হেঁটে যেতে পারেন। গাড়িও পাওয়া যায়।"

"বেশ, গাড়িই কর একটা তাহলে—"

"চলুন।"

"প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে পড়লেন তিনি কুলিকে অনুসরণ করে। ছ্যাকড়া গাড়ি যেখানে দাঁড়িয়ে থাকে কুলিটা সেই দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু সেখানে গিয়ে সে যে গাড়িটার সঙ্গে কথা বলতে লাগল তা মোটেই ছ্যাকড়া গাড়ি নয়, বেশ দামী একটা ফিটন। ঘোড়াটাও অভিজাত-বংশীয়। এই মফস্বলে এ রকম গাড়ি যে পাওয়া সম্ভব, তা তুঙ্গশ্রীর ধারণাতীত ছিল। হঠাৎ তাঁর মনে হল, অর্থনৈতিক চাপেই এটা সম্ভব হয়েছে বোধ হয়। যা বিলাসের দ্রব্য ছিল একদিন, প্রয়োজনের তাগিদে ভাড়া দিতে হচ্ছে তা, বড় মানুষি আর চলছে না। যারা মাথা উঁচু করে থাকত, তাদের মাথা নীচু হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। অনিবার্যগতিতে সাম্য আসছে। আনন্দ হল তুঙ্গশ্রীর। এরই জন্য তো জীবনপাত করছেন তিনি। ফিটনটা এগিয়ে আসতেই উঠে পড়লেন। কুলিটা তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে দিলে সামনের দিকটায়। তারপর বললে—"আমি কোচোয়ানের পাশে বসছি। এখনই পৌঁছে যাব আমরা।" বলেই সে কোচোয়ানের পাশে উঠে বসল। গাড়ি চলতে শুরু করে দিল। হঠাৎ তুঙ্গশ্রীর মনে হল, কুলিটার কথাবার্তাও ঠিক সাধারণ কুলির মতো নয়, একটু যেন ভদ্রগোছের। হয়তো অভাবের তাড়নায় ভদ্রলোকের ছেলেই কুলিগিরি করছে। মাথার ঘাম পয়ে ফেলে রোজগার করতে হবে সবাইকে, সুদের টাকায় নবাবী করবার দিন শেষ হয়েছে। হঠাৎ ঝনঝন করে ঝনাৎকার দিয়ে উঠল গাড়ির ঘন্টাটা—হাঁক দিয়ে উঠল পিছনের সহিস—"সাম্‌হালকে।" চমকে উঠলেন তুঙ্গশ্রী, তাঁর চিন্তাধারাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল যেন কেউ।

খপ্ খপ্ খপ্ খপ্—ছুটে চলেছে বলিষ্ঠ ঘোড়া। বিলাতী স্প্রিং-দেওয়া গদির উপরে দোলায়িত হচ্ছে তুঙ্গশ্রীর যৌবন-পুষ্ট দেহটা। অজানা পথের চারিদিকে অন্ধকার, গাছকে মনে হচ্ছে দৈত্য, গৃহকে মনে হচ্ছে স্তূপ, তারা দ্রুতবেগে আসছে আর চলে যাচ্ছে—নিজের পরিচয় রেখে যাবার সুযোগ পাচ্ছে না। গ্রাম্য কুকুর ডেকে উঠছে মাঝে মাঝে, দু একটা আলো দেখা যাচ্ছে দূরে। কুকুরের ডাক থেমে যাচ্ছে আবার, আলোও মিলিয়ে যাচ্ছে। দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে গাড়ি।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি এসে দাঁড়াল বিরাট একটা অট্টালিকার সামনে। অন্ধকারে মনে হতে লাগল, ছোট পাহাড় যেন একটা। কুলিটা নেমে এল। এসে তুঙ্গশ্রীকে বললে—"আমরা এসে গেছি। নামুন আপনি।"

তুঙ্গশ্রী নেমে পড়লেন।

"আসুন আমার সঙ্গে।"—পথে দেখিয়ে নিয়ে চলল কুলি তাঁকে। নিয়ে গেল বিশাল

বাড়িটার এক প্রান্তে। একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তালা খুললে, তারপর তুঙ্গশ্রীকে বললে—"আসুন।"

অজানা জায়গায় অন্ধকার ঘরে একজন অপরিচিত পুরুষের আহ্বানে এগিয়ে যাবার সাহস হল না তুঙ্গশ্রীর। দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন—"একটা আলোর ব্যবস্থা হলে ভালো হতো।"

"আপনি আসুন না, আলো আছে, ইলেকট্রিক আলো।"

ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে দিলে সে। জ্বেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"আপনার জিনিসগুলো নিয়ে আসি।"

তুঙ্গশ্রী আলোকিত ঘরটায় ঢুকে বিস্মিত হয়ে গেলেন রীতিমত। সোফা সেটি, চমৎকার চমৎকার ছবি, বইয়ের শেল্‌ফ, দেওয়াল ঘড়ি—বেশ বড়লোকী কাণ্ডকারখানা। দেওয়াল ঘড়িটার দিকে চেয়ে তিনি নিজের হাত-ঘড়িটাও দেখলেন একবার। দেওয়াল-ঘড়ি ঠিক চলছে কাঁটায় কাঁটায়। অথচ কুলিটা বললে—বাড়িতে কেউ নেই। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন তুঙ্গশ্রী। জিনিসপত্র নিয়ে প্রবেশ করল কোচোয়ানটা।

"আপনি ভিতরের দিকে আসুন—"

পাশের একটা দরজা খুলে ভিতরের দিকে একটা ঘরে প্রবেশ করলে লোকটা। সেটা পার হয়ে আর একটা দরজা খুলে তৃতীয় একটা ঘরে ঢুকল সে। যন্ত্রচালিতবৎ তার অনুসরণ করে তুঙ্গশ্রী যে ঘরটিতে প্রবেশ করলেন তার সাজসজ্জা দেখে মনে হল, সেটি শয়নকক্ষ। একধারে চমৎকার একটি খাট, খাটে নেটের মশারি টাঙানো বিজলী পাখাও রয়েছে। খাটে বিছানা পর্যন্ত পাতা। মাথার কাছে একটি টেবিলে টেবিল-বাতি। ইংরেজী বাংলা আধুনিক বই কয়েকটি। খাটের হাতলের উপরই বেডসুইচ রয়েছে। নিখুঁত বন্দোবস্ত। কেউ যেন কারও জন্যে করে রেখেছে।

জিনিসপত্র ঘরের একধারে রেখে সুইচ টিপে বিজলী পাখা চালিয়ে দিলে কোচোয়ানই। তারপর তুঙ্গশ্রীর দিকে সসম্ভ্রমে ফিরে বলল—"এই দিকটায় বাথরুম, চান করবার ব্যবস্থাও আছে—" আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে ঘরগুলো।

তুঙ্গশ্রী নির্বাকবিস্ময়ে দেখছিলেন সব। মুখ দিয়ে কথা সরছিল না তাঁর। কোচোয়ানটা যখন চলে যাচ্ছে তখন খেয়াল হল, ভাড়া দেওয়া হয় নি।

"তোমার ভাড়াটা নিয়ে যাও। কত দিতে হবে?"

"ভাড়া দিতে হবে না।"

তাঁকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে নিঃশব্দ চরণে বেরিয়ে গেল সে। পর পর দুবার কপাট বন্ধ হওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। তুঙ্গশ্রী দাঁড়িয়ে রইলেন আরও ক্ষণকাল। তারপর এগিয়ে গেলেন ব্যাপারটা ভাল করে জানবার জন্যে। পারিপার্শ্বিকটা কেমন যেন অদ্ভুত রকম লাগছে। তা ছাড়া লোকটা ভাড়াই বা নেবে না কেন? দ্বারের কাছে এগিয়ে গিয়ে যা দেখলেন, তাতে সমস্ত বুকটা কেঁপে উঠল তাঁর। টেনে দেখলেন, বাইরে থেকে কপাটটা বন্ধ। তিনি বন্দিনী! হঠাৎ চমকে উঠলেন... ঝন ঝন ঝন করে টেলিফোন বেজে উঠল কোথায় যেন। মনে হল, অনেক দূরে—বাড়ির ওদিককার কোনও ঘরে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন আরও কিছুক্ষণ তিনি। ভাবতে লাগলেন, এখন কি করা উচিত? চিৎকার করবেন? কিন্তু তাতে কোনও ফল হবে না তো! আশেপাশে এমন কেউ নেই যে, তাঁকে উদ্ধার করতে পারে এসে,

যদি কেউ থাকে তো তারা শত্রুপক্ষ। খুট করে শব্দ হল একটা পিছন দিকে। বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ ঘুরে দাঁড়ালেন তুঙ্গশ্রী, দেখলেন, একটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে। সুশ্রী তন্বী যুবতী একটি। চোখাচোখি হতেই নমস্কার করে এগিয়ে এল সে।

"আপনাকেই দাদা স্টেশনে আনতে গিয়েছিলেন বুঝি? আসুন।"

"আমাকে কেউ তো স্টেশন থেকে আনতে যায় নি। আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে কুলি।"

"কুলি? কি জানি, দাদারই তো স্টেশনে যাবার কথা ছিল। আপনিই তুঙ্গশ্রী দেবী?"

"হ্যাঁ।"

"আপনাকে আনতেই তো দাদা গেছেন স্টেশনে। যা খামখেয়ালী মানুষ, কোথাও কিছুতে মেতে গেছেন হয়তো, একটা চাকরকে পাঠিয়ে দিয়েছেন স্টেশনে। আসুন, হাত-মুখ ধুয়েছেন আপনি? চা আনছে।"

"না, কিছু করি নি। কিন্তু দেখুন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না আমি—"

"কোন ব্যাপারটা?"

"এখানে আমাকে এমনভাবে নিয়ে আসা হল কেন?"

"দাদা এলেই বুঝতে পারবেন। আমি কিচ্ছু জানি না। দাদা শুধু আমাকে বলে গিয়েছিলেন যে, ঠিক আটটার সময় আমি এসে যেন আপনাকে অভ্যর্থনা করি। আমি তাই এসেছি। হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়চোপড় ছেড়ে ফেলুন। বাথরুমে জল-টল সব ঠিক করা আছে, ইচ্ছে করলে স্নানও করতে পারেন। আমি চা জলখাবার নিয়ে আসছি, আপনি ততক্ষণ যা করবার করে ফেলুন।"

মেয়েটি চলে যাচ্ছিল। তুঙ্গশ্রী আবার ডাকলেন তাকে।

"আচ্ছা, আপনার দাদার নাম কি বলুন তো?"

"শ্রীহিরণ্যগর্ভ বর্মন।"

তুঙ্গশ্রীর শরীরের রক্তস্রোত সহসা থেমে গেল যেন, তারপর উদ্দামবেগে বইতে লাগল আবার। মুখটা ক্ষণিকের জন্য ফ্যাকাশে হয়ে লাল হয়ে উঠল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি ধরা পড়ে গেছেন।

মেয়েটিই আবার কথা কইলে।

"দাদার সঙ্গে আপনার আলাপ নেই না কি?"

"না। তেমন নেই, তবে—"

মেয়েটির কাছে সরাসরি ধরা দেবার প্রবৃত্তি হল না তুঙ্গশ্রীর। কিন্তু তার চোখে চাপা একটা হাসি ফুটে উঠতে দেখে সন্দেহ হল যে, মেয়েটিও হয়তো ভিতরের কথা জানে।

"আলাপ হলে অদ্ভুত মনে হবে। আমাদের বংশের সবাই ছিটগ্রস্ত। যাক, সে সব কথা পরে হবে। আপনি এখন হাত-মুখ ধুয়ে নিন। আমি চা নিয়ে আসি।"

মেয়েটি চলে গেল। নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তুঙ্গশ্রী ক্ষণকাল, তারপর মনস্থির করে ফেললেন। বিপদে পড়ে ধৈর্য হারিয়ে ফেলবার মতো চরিত্র তাঁর নয়, তাই তিনি এত অল্পবয়সেও অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পেয়েছেন। মৃত্যুকে ভয় করেন না তিনি। অপ্রত্যাশিতভাবে ধরা পড়ে গিয়ে নিজের কাছেই ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন শুধু, মানসিক সাম্যটা ক্ষণকালের জন্যে বিচলিত হয়েছিল। পরিস্থিতিটা হৃদয়ঙ্গম করবামাত্র নিজেকে সামলে

নিলেন। দেখাই যাক, কী করেন হিরণ্যগর্ভ বর্মন। মেরে ফেলবেন? ফেলুন। কিন্তু যে আদর্শকে জীবনে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন, তা জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আঁকড়ে থাকবেন তিনি। প্রয়োজন হলে রক্তের স্বাক্ষর দিয়েও সমর্থন করে যাবেন সেটা মৃত্যুর পূর্বক্ষণে। মাথা নোয়াবেন না কিছুতেই। হিরণ্যগর্ভকে দেখেন নি তিনি কখনও, কিন্তু শ্রমিকদের দাবির উত্তরে যে চিঠিখানা তিনি লিখেছেন সেটা দেখেছেন। তাঁর মিলের কর্মচারীদের একটি দাবিও তিনি গ্রাহ্য করেন নি। তারা ধর্মঘট করেছিল। কোনও ফল হয়নি। অনির্দিষ্টকালের জন্যে মিল বন্ধ করে দিয়েছেন তাই হিরণ্যগর্ভ৷ সমস্ত কর্মচারীর চাকরি গেছে, বেকার হয়ে পড়েছে বহুলোক। হিরণ্যগর্ভ নূতন কর্মচারীর সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন। দপ করে জ্বলে উঠল তুঙ্গশ্রীর চোখের দৃষ্টিটা। আরও ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থেকে তিনি বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলেন। আবার ফিরে এলেন বাক্স থেকে নিজের কাপড় বার করবার জন্যে। তাঁর জিনিসপত্রগুলো কোচোয়ানটা কোণের দিকে রেখে দিয়েছিল। সেখানে গিয়ে আবার একবার দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে বজ্রাহতবৎ। তাঁর অ্যাটাচি কেসটা নেই। একটা রিভলভার ছিল তার মধ্যে।

.... বাথরুমটি নিখুঁত। সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি। স্নান করে তৃপ্তি হবার কথা। কিন্তু তুঙ্গ শ্রীর সমস্ত অঙ্গ জ্বলে গেল যেন, বুকের ভিতরটা টনটন করে উঠল। জেল থেকে বেরিয়ে আসবার পর থেকে যে কথাটা কাঁটার মতো বিঁধে আছে বুকের মধ্যে, সেইটেই যেন নড়ে-চড়ে উঠল আবার। সাদা মার্বেল পাথর দেখে মনে হল, এ যেন বহুযুগের অশ্রু জমে পাথর হয়ে গেছে—সেই সব বঞ্চিত হতভাগ্যদের অশ্রু, যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও খেতে পায় নি, দুর্ভিক্ষে রোগে জর্জরিত হয়ে অবশেষে মারা গেছে অত্যাচার-অবিচারের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে।

স্নান সেরে বেরিয়ে এলেন তুঙ্গশ্রী। এসেই দেখতে পেলেন, সেই সুশ্রী মেয়েটি তাঁর জন্যে চা জলখাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে।

"স্নান হল? একটু চা খান এবার। দাদাকে আপনার কথা বললাম। তিনি কাজে ব্যস্ত আছেন একটু, তা না হলে নিজেই আসতেন এখনই। আসবেন একটু পরে বোধ হয়। আপনি ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করে নিন।"

তুঙ্গশ্রী খেতে খেতে ভাল করে লক্ষ্য করলেন মেয়েটিকে। পরনে খদ্দরের শাড়ি, মাথায় সিঁদুর, অঙ্গে অলঙ্কারের বাহুল্য নেই। বয়স উনিশ-কুড়ির বেশি নয়। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, চমৎকার মুখশ্রী, অপরূপ চোখ দুটি। এমন নিবিড় কালো চোখের তারা আর কখনও দেখেন নি তিনি।

"তোমার নামটি কি ভাই?"

"আমার নাম শিখরিণী।"

"বাঃ, আমার নামের সঙ্গে তো মিল আছে অনেকটা। এ নাম তোমার বাবা-মাই রেখেছিলেন, না, নিজেই বানিয়ে নিয়েছ আমার মতন?"

"আমার বাবা রেখেছিলেন। তিনি সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন কিনা, তাই সংস্কৃত ছন্দের নামে নাম রেখেছিলেন। ও-নামে কিন্তু কেউ ডাকে না আমাকে। অধিকাংশ লোকেই বলে—শিখু, দাদা বলেন—খরিণী। আপনার নাম আপনি নিজেই বানিয়ে নিয়েছেন? আপনার বাপ-মা কি নাম রেখেছিলেন আপনার?"

"মিনতি দাসী। সেটা বদলে আমি করে নিয়েছি—তুঙ্গশ্রী দেবী। ভাল হয় নি?"

"চমৎকার হয়েছে। কিন্তু আপনি কিছু খাচ্ছেন না যে!"

"খাচ্ছি তো! বেশি মিষ্টি আমি খেতে পারি না।"

"নোনতা খাবার এনে দি আরও?"

"না থাক।"

"গোটা দুই সিঙাড়া?"

"না, দরকার নেই আর।"

পিছনের একটা দ্বারের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে শিখরিণী বললে, "তুমি তাহলে যাও যোগেন। আর কিছু লাগবে না। মণিকে পাঠিয়ে দাও, বাসনগুলো নিয়ে যাক।"

চিত্রার্পিতবৎ যে ভৃত্যটি দ্বারের কাছে দাঁড়িয়েছিল সে সরে গেল। ঐশ্বর্যের আতিশয্য নীরবে আর-একটা খোঁচা দিয়ে গেল তুঙ্গশ্রীকে। মনে পড়ল, না খেয়ে তাঁর মা মারা গেছেন, ভাই যক্ষ্মায় ভুগছে এখনও। হঠাৎ মনে পড়ে গেল কেশব সামন্তকে, চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধরে উঠল আবার ধীরে ধীরে।

"আপনি খেয়ে দেয়ে কি বিশ্রাম করবেন একটু?"

"হিরণবাবু যদি দেখা করতে পারেন এখন, তাহলে সেইটেই সেরে ফেলব আগে।"

"আচ্ছা।"

দুই

তুঙ্গশ্রী আশা করেছিলেন যে, এই অট্টালিকারই আর-এক অংশে বোধ হয় হিরণ্যগর্ভ থাকেন। কিন্তু শিখরিণীর অনুসরণ করে অট্টালিকা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হল।

"কোথায় থাকেন তোমার দাদা?"

"আসুন না।"

একটা বড় বাগান পার হতে লাগলেন দুজনে। ফুলের বাগান। ধনী জমিদারদের বাগানে সাধারণত যে সব জিনিস থাকে, এখানেও তার অভাব ছিল না। মাঝে মাঝে পাথরের তৈরি নগ্ন অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি নানা ভঙ্গীর, জলের ফোয়ারা, লোহার বেঞ্চি, মাঝে মাঝে আলোকস্তম্ভ, লতাকুঞ্জ, সম-চতুষ্কোণ সবুজ সবুজ মাঠ, টেনিস খেলবার প্রাঙ্গণ। অভাব কিছুরই ছিল না। সমস্তটা ঘিরে সু-উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীর ঘেঁষে কিছুদূর অন্তর বড় বড় গাছ।

"আচ্ছা, আমি যদি এখন পালিয়ে যাবার চেষ্টা করি, তুমি আটকাতে পার আমাকে?"—হঠাৎ তুঙ্গশ্রী প্রশ্ন করলেন।

শিখরিণী সবিস্ময়ে ঘাড় ফিরিয়ে বললে—"পালিয়ে যাবেন! কেন? পালিয়ে যাবার কথা মনে হল হঠাৎ যে!"

"এমনি।"

তুঙ্গশ্রী নিঃসংশয় হলেন যে, তাঁকে যেভাবে এখানে আনা হয়েছে তা শিখরিণী জানে না। সুতরাং তিনি যে কে এবং কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিলেন তাও তার অজ্ঞাত। নিঃসংশয় হয়ে একটু আরাম পেলেন যেন। আরাম পাওয়া মাত্রই মনে মনে কিন্তু প্রশ্ন জাগল একটা এবং সে প্রশ্নের উত্তরটা আবিষ্কার করে নিজের কাছেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। শিখরিণীর কাছে নিজের সত্য-পরিচয়টা গোপন রাখবার এ আগ্রহ কেন? শিখরিণীকে তাঁর ভালো লেগেছে। কিন্তু সেইজন্যই তার কাছ থেকে নিজের সত্য-পরিচয়টা গোপন করা দরকার না কি! সে পরিচয়

যদি মহৎ হয়, তাহলে তো সেটা জাহির করবার আগ্রহটাই বেশি হওয়া স্বাভাবিক। তাহলে কি তাঁর নিজের বিবেকের কাছেই তাঁর আদর্শের কোন গলদ ধরা পড়েছে? মনের আর-একটা অংশ তৎক্ষণাৎ তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল—'গলদের প্রশ্ন উঠেছে কি করে? বাইরের লোকের কাছে নিজের সত্য-পরিচয় দেওয়া যায় না কি সব সময়ে? তাতে শুধু যে নিজের বিপদ তা নয়, পার্টিরও বিপদ।'—অন্যমনস্ক হয়ে আত্মবিশ্লেষণ করছিলেন তুঙ্গশ্রী।

"আমরা এসে গেছি। ওই বাড়িটায় দাদা থাকেন।"

তুঙ্গশ্রী সবিস্ময়ে দেখলেন, অতি ছোট—অতি সাধারণ বাড়ি একটা। না বলে দিলে মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে, ওটা চাকরদের থাকবার ঘর। পাশাপাশি গোটা চারেক ঘর, অনেকটা ব্যারাকের মতো। পাকা অবশ্য, কিন্তু কোনও আড়ম্বর নেই।

"তোমাদের ওই বড় বাড়িতে কে থাকে তাহলে?"

"ওখানে আমরা থাকি, কাকা থাকেন আর অতিথিরা থাকেন। দাদার ল্যাবরেটারির কিছু জানোয়ারও থাকে এক ধারে।"

বিস্মিত কণ্ঠে তুঙ্গশ্রী প্রশ্ন করলেন—"ল্যাবরেটারি? কিসের ল্যাবরেটারি?"

"দাদা যে ডাক্তার। কী সব রিসার্চ করেন!"

"উনি যে ডাক্তার তা তো জানতাম না! উনি বড় জমিদার, মিলের মালিক—এই তো জানি।"

"উনি প্র্যাকটিস করেন না, কিনা, তাই ডাক্তার বলে চেনে না অনেকে। এই যে আমরা এসে গেছি। আসুন।"

কপাট ঠেলে শিখরিণী একটি আলোকিত ঘরে ঢুকল। তুঙ্গশ্রীও প্রবেশ করলেন তার পিছু পিছু। ঘরটি বেশ প্রশস্ত। ঘরের এক কোণে একটি টেবিলে একটি ছেলে খুব ঝুঁকে কী যেন করছিল। শিখরিণী প্রবেশ করতেই সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল।

"নরেন, দাদা কোথায়"—শিখরিণী প্রশ্ন করল তাকে।

"তিনি পাশের ঘরে আছেন।"

"ও। আচ্ছা, আপনি বসুন, আমি খবর দি দাদাকে।"

তুঙ্গশ্রী একটি চেয়ারে বসলেন। নরেন আবার কাজে মন দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এল শিখরিণী।

"দাদা কী একটা করছেন, আপনকে ওখানেই যেতে বললেন। আমি বাড়ি যাচ্ছি, আপনি কথা বলুন।"

"আমি আবার ফিরব কি করে?"

"দাদার সঙ্গেই ফিরবেন। আমি থাকতাম, কিন্তু কাকা খাবেন এখনই, আমাকে সেখানে থাকতে হবে। আপনি যান, দাদা ডাকছেন আপনাকে।"

শিখরিণী চলে গেল।

তুঙ্গশ্রী বসে রইলেন খানিকক্ষণ। যদিও একটা অদম্য কৌতূহল তাঁকে পাশের ঘরের দিকে টানছিল, তবু বসে রইলেন। জীবনে নানা রকম বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি। পুলিশের গুলির সামনে পড়েছেন, বাঘের মুখেও পড়েছিলেন একবার সুন্দরবনে, কিন্তু এমন রহস্যময় বিপদের মধ্যে আর কখনও পড়েন নি। পুলিশ এবং বাঘের কাছ থেকে পালাবারই চেষ্টা

করেছিলেন, কিন্তু এই লোকটির কাছ থেকে পালাবার ইচ্ছা হচ্ছিল না, যদিও এঁর সম্মুখীন হওয়াটাও কম বিপজ্জনক নয়, হয়তো মেরেই ফেলতে পারেন—কিছুই বলা যায় না। কিন্তু এই ভয়েই যে তিনি উঠছিলেন না, তা ঠিক নয়। তাঁর ভয়টা হচ্ছিল একটু অন্য ধরনের। তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, মনে মনে লোকটিকে যেভাবে কল্পনা করছেন, সত্যিই তিনি যদি তা না হন।

...হঠাৎ উঠে পাশের ঘরে ঢুকে পড়লেন তুঙ্গশ্রী। দেখলেন, দেওয়ালের ধারে একটা টেবিলের উপর কাচের পাত্রে কি যেন একটা ফুটছে এবং হিরণবাবু ঝুঁকে সেটাকে দেখছেন। কপাটের দিকে পিছন ফিরে ছিলেন বলে তাঁর মুখটা প্রথমে দেখতে পেলেন না তুঙ্গশ্রী। হিরণবাবুও যে তাঁর আগমন টের পেয়েছেন তাও মনে হল না, কারণ তিনি ঝুঁকে দেখতেই লাগলেন। পরনে খদ্দরের আলখাল্লাগোছের একটা কোট আর ঢিলে পাজামা।

হঠাৎ মুখ ফেরালেন হিরণবাবু। মুখটা দেখেই চমকে উঠলেন তুঙ্গশ্রী। এ কি, এ যে স্টেশনের সেই কুলিটা!

চোখাচোখি হতেই হিরণ্যগর্ভের সমস্ত মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"নমস্কার, আসুন, আসুন! কেমন, ঠকিয়েছি তো?"

"এ রকম করবার মানেটা কি বুঝলাম না ঠিক।"

"বোঝেন নি? সত্যি? দাঁড়ান এক মিনিট, এটা আবার ফেটে না যায়, হার্ডগ্লাস যদিও, তবু ফ্লেমটা কমিয়ে নি—"

বুনসেন বার্নারের ফ্লেমটা কমিয়ে দিয়ে হিরণ্যগর্ভ একটা ঘণ্টা টিপলেন। নরেন এসে মুখ বাড়াল।

"না, তুমি নয়। তোমার গ্রাফটা হল?"

"এখনও হয় নি।"

"তাহলে সেইটে শেষ কর আগে। কুঞ্জকে পাঠিয়ে দাও।"

কুঞ্জ নামক ভৃত্যটি এসে দাঁড়াতেই হিরণ্যগর্ভ বললেন—"এঁর জিনিসপত্র দক্ষিণ দিকের শোবার ঘরে আছে বোধ হয়, নিয়ে এস তো। খরিণীকে জিজ্ঞেস করলেই সে দেখিয়ে দেবে।" কুঞ্জ চলে গেল। তুঙ্গশ্রী সবিস্ময়ে বলে উঠলেন—"আমার জিনিসপত্র আনতে বলছেন কেন?"

"হাতে-নাতে দেখিয়ে দিতে চাই, কেন আপনাকে আজকের ট্রেনে যেতে দিলাম না। আমার ফ্যাক্টরির প্ল্যানটা আপনার সুটকেস খুললেই বেরিয়ে পড়বে সম্ভবত। তার সঙ্গে যদি এই চিঠিটার মর্মার্থ জুড়ে দেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন কেন আপনাকে আটকেছি।"—হিরণ্যগর্ভ একটা ড্রয়ার টেনে একটা চিঠি বার করলেন এবং সেটা পড়ে শোনালেন—

"তুঙ্গশ্রী দেবী কাল সকালে রওয়ানা হচ্ছেন। এঁরা ঠিক করেছেন যে, আপনার ফ্যাক্টরিটা 'ডিনামাইট' দিয়ে উড়িয়ে দেবেন। তুঙ্গশ্রী দেবী যাচ্ছেন আপনার ফ্যাক্টরির প্ল্যানটা আনতে, ফ্যাক্টরিরই কোনও লোক বোধ হয় তৈরি করে রেখেছেন প্ল্যানটা। তুঙ্গশ্রী যাচ্ছেন নিজের চোখে সব দেখতে এবং প্ল্যানটা নিয়ে আসতে। উনি একজন নামজাদা টেররিস্ট। তুঙ্গশ্রী দেবীকে চেনা শক্ত হবে না, কারণ উনি রূপসী, বাঁ দিকের গালে ছোট একটা তিল আছে। দেখলেই চিনতে পারবেন।"

চিঠিটা পড়ে হিরণ্যগর্ভ চাইলেন তুঙ্গশ্রীর মুখের দিকে।

"বর্ণনার সঙ্গে চেহারা হুবহু মিলে যাচ্ছে; সুতরাং আশা করছি যে, ফ্যাক্টরির প্ল্যানটাও

আপনার সুটকেসে পাওয়া যাবে। আর তা যদি পাওয়া যায়, তাহলে আমার আচরণের অর্থটা আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে আশা করি।"

তুঙ্গশ্রীর মুখটা পাংশুবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে আবার লাল হয়ে উঠল। তিনি স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, আত্মগোপন করবার চেষ্টা এখন বৃথা। সমস্ত ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না, হাসি বা পরিহাস দিয়ে সেটাকে হালকা করা যেতে পারে।

তাই হেসে বললেন—"না, তাতেও এটা বোঝা যাবে না যে, কি কারণে প্রতাপশালী হিরণ্যগর্ভকে কুলি সাজতে হয়েছিল।"

"স্টেশনে সিপাহী পাঠিয়ে আপনাকে চলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনলেই ভালো হতো বলছেন?"

আর একটু হেসে তুঙ্গশ্রী বললেন—"আজকালকার দিনে অতটা কি পারতেন? জমিদারদের সে দিন আর নেই।"

"জমিদারদের দিন হয়তো ফুরিয়েছে, কিন্তু বুদ্ধিমানদের দিন ফুরোয় নি, কখনও ফুরোবেও না। আমার অনেক ক্যাপিটালিস্ট বন্ধু মুখোশ বদলে শ্রমিকনেতা সেজেছেন, তা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। আপনারাও তাদের কথায় বেশ নাচছেন।"

হিরণ্যগর্ভের চোখে যে হাসির দীপ্তি ঝলমল করে উঠলো তা যে শাণিত ছোরার মতো নয়—প্রসন্ন সূর্যালোকের মতো, তা লক্ষ্য করে তুঙ্গশ্রী শুধু যে আশ্বস্ত হলেন তা নয়, আকৃষ্টও হলেন ঈষৎ। কিন্তু হিরণ্যগর্ভ যে সাধারণ জমিদারদের মতো শূন্যগর্ভ নন, এর চাক্ষুষ প্রমাণ· পেয়ে তাঁর মনের আর-একটা অংশও ক্ষোভে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এ রকম লোক তাঁদের দলে না এসে বিপক্ষ দলে থাকবার মানেটা যে কি, তাও তিনি জানেন। শ্রেণী-স্বাতন্ত্র্য! ধনীর দম্ভ। তুঙ্গশ্রীর চোখ দুটো জ্বলে উঠল। হিরণ্যগর্ভের মনে হল, যে তাঁর কথাতেই বুঝি আহত হলেন ভদ্রমহিলা। মনে হওয়ামাত্র লজ্জা হল তাঁর, আভিজাত্যে আঘাত লাগল। আর একটু হেসে বললেন—"দেখুন, আমাদের আলাপ আর বেশিদূর অগ্রসর হবার আগে প্রথমেই একটা কথা বলে নিই। আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি আপনাকে এমনভাবে ছলনা করে এখানে এনে ফেলার জন্যে। বিশ্বাস করুন, ব্যক্তিগতভাবে আপনার ওপর আমার কোনও রাগ নেই, আপনাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার ইচ্ছা বা অবসর কোনটাই আমার নেই—আবার বোধ হয় রূঢ় হয়ে পড়ছে কথাগুলো।"—হা-হা করে হেসে উঠলেন হিরণ্যগর্ভ—"বিজ্ঞান নিয়ে কারবার আমার, চাঁচাছোলা সত্যি কথাগুলোই বেরিয়ে পড়ে মুখ দিয়ে। রেখে-ঢেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে বলতে যে পারি না তা নয়, খুব ভাল অভিনয় করতে পারি তার তো প্রমাণই পেয়েছেন আজকে, কিন্তু অভ্যাস নেই। মাপ করবেন। হ্যাঁ, যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম, আপনার প্রতি আজ যে এই অশোভন আচরণ করে ফেলেছি, বিশ্বাস করুন, তা নিছক কর্তব্যের খাতিরে। যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সৈনিক আর একজন সৈনিকের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিক্ষেপ করে যে মনোভাব নিয়ে—অবশ্য আজকালকার সৈনিকদের ঠিক এ রকম মনোভাব আছে কি না জানি না, যদিও 'অল কোয়াএট্ অন দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট" বইখানাতে এর আভাস আছে খানিকটা—'গীতা' পড়েছেন? ও, পড়েন নি—গীতাতে অর্জুনকে যে মনোভাব নিয়ে নিজের আত্মীয়দের বিরুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র ধারণ করতে বলেছেন, আমার মনোভাব অনেকটা সেই ধরনের, মানে, নিষ্কামভাবে কর্তব্য করে যাচ্ছি কেবল।"

"আপনার কর্তব্যটা কি?"

"যা ভাল বলে মনে করি তাকেই রক্ষা করা"—এবং একটু থেমে বললেন—"প্রয়োজন হলে তার জন্যে যুদ্ধ করা।"

"কি ভাল বলে মনে করেন তার একটু আভাস পেতে পারি কি? কারণ আমরাও তো ওই একই উদ্দেশ্যে জীবনপাত করছি।"

কুঞ্জ এসে প্রবেশ করল তুঙ্গশ্রীর সুটকেস-বিছানা নিয়ে।

"ওই টেবিলটার ওপর রেখে দিয়ে তুমি চলে যাও। দেখো, ফ্লাস্কগুলো ভেঙো না যেন।"

কুঞ্জ টেবিলের উপর জিনিসপত্রগুলো রেখে চলে গেল। হিরণ্যগর্ভ তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন, "ফাক্টরির প্ল্যানটা দিন বার করে।"

তুঙ্গশ্রী প্রদীপ্ত চক্ষে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ; তারপর বললেন—"দেব না।" প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টা টিপলেন হিরণ্যগর্ভ। নরেন আবার এসে উঁকি দিলেন। "কুঞ্জকে ডেকে দাও আর-একবার। তোমার গ্রাফের কতদূর?"

"কয়েকটা ফিগার খুঁজে পাচ্ছি না। ওই ড্রয়ারটাতেই তো রেখেছিলাম।"

"ফিগার খুঁজে পাচ্ছ না! বল কি! ফিগার খুঁজে না পেলে ডালকুত্তা দিয়ে তোমাকে খাওয়াব।"—হিরণ্যগর্ভের চোখের দৃষ্টি ভীষণ হয়ে উঠল সহসা। নরেন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। নরেন চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকদীপ্ত হয়ে উঠল আবার হিরণ্যগর্ভের চোখ দুটি। তারপর তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"ইনি মস্ত বড় একজন কমিউনিষ্ট, দল পাকাতে ওস্তাদ, অথচ কাজের বেলায় অকর্মার ধাড়ী একটা।"

তুঙ্গশ্রী চুপ করে রইলেন। কোনও উত্তর দিলেন না। কুঞ্জ এসে হাজির হল আবার দ্বারপ্রান্তে।

"দেখ কুঞ্জ, এই সুটকেসটা খুলতে হবে। চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। ভেঙে বা যেমন করে হোক খুলে নিয়ে এসো তো ওটাকে।" কুঞ্জ সুটকেসটা নিয়ে নীরবে বেরিয়ে গেল। তুঙ্গশ্রীর দিকে একনজর চেয়ে মৃদু হেসে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"চাবিটা দিলেই পারতেন। আপনাকে যেতে দিই নি যখন, তখন প্ল্যানটা যে আপনার কাছ থেকে না নিয়ে আমি ছাড়ব না, তা আপনার বোঝা উচিত ছিল।"

"তা আমি বুঝেছি। আপনার দৌড়টা কতদূর তাই কেবল আমি দেখছি।"

"দেখুন।"

হিরণ্যগর্ভ গিয়ে বুনসেন বার্নারটার শিখা বাড়িয়ে দিলেন আর-একটু। তারপর হঠাৎ ঘুরে বললেন—"ও হ্যাঁ, আপনার প্রশ্নটার জবাব দেওয়া হয় নি এখনও। আদর্শটা কি জানতে চেয়েছিলেন। আমার আদর্শটা ভারতীয় আদর্শ, নতুন কিছু নয়।"

তুঙ্গশ্রী হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠলেন যেন।

"ভারতীয় আদর্শ বলতে আপনি কি বোঝেন জানি না, কিন্তু ওই ভারতীয় আদর্শের মুখোশ পরে মুষ্টিমেয় কতকগুলো লোক অগণিত লোকের ওপর যে অত্যাচার চালিয়ে এসেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী, তার বর্ণনা ইতিহাস খুললেই পাবেন। তাই যদি আপনার আদর্শ হয়—"

"না, তা আমার আদর্শ নয়, কারণ সেটা ভারতীয় আদর্শ নয়। জ্ঞাতসারে কারও ওপর অত্যাচার করা ভারতের আদর্শ হতে পারে না। জ্ঞাতসারে কথাটা মনে রাখবেন, কারণ

130

অজ্ঞাতসারে আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ওপর কিছু না কিছু অত্যাচার করছি। বেঁচে থাকা মানেই—অপরকে কিছুটা বঞ্চিত করা। ভারতীয় আদর্শ সে বিষয়েও পদে পদে সাবধান করেছে আমাদের। ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—ভারতীয় আদর্শের মূলমন্ত্র বলতে পারেন।"

"কিন্তু ইতিহাসে আমরা যা পড়ি, তা—"

"ভুল পড়েন। সাহেবদের লেখা বইয়ে ভারতের ইতিহাস নেই। ভারতের ইতিহাস আছে রামায়ণে, মহাভারতে, উপনিষদে, জাতকে, পুরাণে, রূপকথায়, আমাদের দৈনন্দিন জীনযাত্রার প্রতিটি খুঁটিনাটিতে, যাদের আমরা অশিক্ষিত জনসাধারণ বলি তাদের আচার-ব্যবহারে, কথাবার্তায়, তাদের সামাজিক জীবনের কর্মসূচীতে। এই ইতিহাস যদি পড়ে দেখেন দেখবেন, ভারতীয় আদর্শে নীচতার স্থান নেই।"

তুঙ্গশ্রীর অধরে তীক্ষ্ণ হাসি ফুটে উঠল একটা।

"তাহলে আপনি যে এই মিল বানিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করছেন আর এতগুলো শ্রমিককে অল্প বেতন দিয়ে অভাবগ্রস্ত করে রেখেছেন, এটাও কি আমাকে ভারতীয় আদর্শের নমুনা বলে ধরতে হবে?"

স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ হিরণ্যগর্ভ। তারপর বললেন—"আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশা করি নি এটা। আমি আশা করেছিলাম যে, আমার মিলের সমস্ত খবর আপনি রাখেন। আমার মিলে অত লাভ হলে আপনি আমার মিল ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার জন্যে আসতেন না, আসতেন হয়তো বড়গোছের একটা চাকরি পাবার জন্যে। আপনাদের সবাইকে অনায়াসে কিনে রাখতে পারতাম, অন্যান্য বড়লোকেরা যেমন রেখেছে। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য তা নয়। চিরাচরিত পথে চললে আমার শত্রু জুটত না, আমি নূতন ধরনের একটা কিছু করেছি বলেই এবং তা অনেকের স্বার্থে আঘাত করছে বলেই আমার বিরুদ্ধে এই অভিযান।

তুঙ্গশ্রী বিস্মিত হয়ে গেলেন একটু। তাহলে এঁর সম্বন্ধে যা তিনি শুনেছিলেন তা কি ভুল? এখানকার পার্টির লোকেরা তাঁকে যে খবর পাঠিয়েছিল, যে রিপোর্ট দেখিয়েছিল, তার কোনও ভিত্তি নেই তাহলে? ইনি মিল করেছেন, অথচ লাভের জন্যে করেন নি। এই বা কেমন যুক্তিহীন কথা! ছলনা করছেন বোধ হয় ভদ্রলোক?

"আপনি কি আপনার মিলের কর্মীদের কম বেতন দিতেন না?"

"দিতাম। কিন্তু তাদের কাছ থেকে কাজও কম নিতাম। আমার মিলে যত কাপড় তৈরি হওয়া সম্ভব, তত কাপড় আমি কোনও দিনই করাই নি। কারণ আমার উদ্দেশ্য ছিল, আমার জমিদারির লোকদের বস্ত্রকষ্ট দূর করা। আমার পূর্বপুরুষরা যেমন প্রজাদের জলকষ্ট দূর করবার জন্যে জলাশয় খনন করাবার ব্যবস্থা করতেন, বিদ্যা বিতরণের জন্য চতুষ্পাঠী বিদ্যালয় করতেন, আমিও তেমনি বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে বস্ত্রকষ্ট দূর করবার চেষ্টায় ছিলাম। কাপড় বিক্রি করে লাভ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আশা করেছিলুম, যাদের জন্যে কাপড় তৈরি করা হচ্ছে তারা এই যন্ত্রের সাহায্যে নিজেরাই সেটা তৈরি করে নেবে, আমি যন্ত্রটা দিয়ে তাদের সাহায্য করছি, কিছু কিছু মজুরি দিয়েও সাহায্য করব কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠল না আপনাদের জ্বালায়। মিল বন্ধ করে দিয়েছি। আপনারা এখন বাড়িটাও ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইছেন। কিন্তু তা পারবেন না।"

হাস্যপ্রদীপ্ত চক্ষে চেয়ে রইলেন হিরণ্যগর্ভ।

কুঞ্জ ভাঙা সুটকেসটা নিয়ে প্রবেশ করল।

"চাবিটা ভাঙতে হল হুজুর।"

"আচ্ছা, রেখে যাও। হ্যাঁ, শোন, খরিণীর কাছ থেকে আমার নতুন সুটকেসটা চেয়ে আন, চাবিটা আনতে ভুলো না।"

কুঞ্জ চলে গেল। হিরণ্যগর্ভ তুঙ্গশ্রীর সুটকেসটা খুলে খুঁজে দেখতে লাগলেন তন্ন তন্ন করে। কিছু পাওয়া গেল না। বিছানাটা খুলে দেখলেন। বিছানাতে কিছু নেই। বালিশের ওয়াড় খুলছিলেন, এমন সময় তুঙ্গশ্রী বললেন—"আপনার কি ফুটছে সেইটে দেখুন আগে, পুড়ে কালো হয়ে গেল যে!"

ফ্লাস্কটার দিকে চকিতে একবার চেয়ে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"ও ঠিক আছে। ওই কালোটা যখন কালারলেস্ (colourless) হয়ে যাবে, তখনই আমার মনোযোগ দেবার সময়, জেল্‌ডহাল হচ্ছে কি না।"

বিছানা খুঁজেও কিছু পাওয়া গেল না।

তুঙ্গশ্রীর দিকে চকিতে একবার চেয়ে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"কুঞ্জ আসবার আগেই সামলে ফেলতে চাই সব। তার কাছে আপনাকে অপ্রস্তুত করবার ইচ্ছে নেই।"

"আমার চেয়ে আপনারই তো বেশি অপ্রস্তুত হওয়ার কথা, কিছু পেলেন না যখন।"

হিরণ্যগর্ভের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"জিনিসটা কোথায় রেখেছেন বলুন তো?"

তুঙ্গশ্রী চুপ করে রইলেন। তাঁর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল শুধু। ত্বরিত নিপুণ হস্তে হিরণ্যগর্ভ তুঙ্গশ্রীর বিছানা বেঁধে ফেললেন, সুটকেস গুছিয়ে দিলেন। তারপর তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না। এখানে ভাল চেয়ার নেই যদিও, ওই উঁচু টুলটার ওপর বসতে আপনার অসুবিধে হবে বোধ হয়, দাঁড়ান, চেয়ার আনাই একটা—"

"আপনি ব্যস্ত হবেন না, টুলের ওপরই বসছি আমি।"

"হ্যাঁ ভাল করে বসুন। আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে। এক মিনিট, আমি কয়েকটা সাব-কালচার (sub-culture) করে নিই দাঁড়ান, টাইফয়েড ব্যাসিলাসগুলো মরে যাবে না হলে।"

হিরণ্যগর্ভ এগিয়ে গেলেন একটা আলমারির দিকে। আলমারি থেকে বার করলেন লোহার জাল দিয়ে তৈরি একটা চৌকোণা বাক্স। বাক্স থেকে কয়েকটা 'আগার টিউব' (Agar Tube) নিয়ে তিনি ইন্‌কিউবেটারের (Incubator) কাছে এলেন। তারপর ইন্‌কিউবেটারের থেকেও একটা জালের বাক্স বার করলেন। এর মধ্যেও 'আগার টিউব ছিল । তারপর হঠাৎ একটা সুইচ টিপে এমন জোর একটা আলো জ্বালালেন যে, চোখ ঝলসে গেল তুঙ্গশ্রীর। তারপর প্ল্যাটিনাম লুপটা (Platinum Loop) বুনসেন বার্নারে পুড়িয়ে নিলেন ভাল করে। টকটকে লাল হয়ে উঠল সেটা। তারপর যে আগার টিউবগুলো ইন্‌কুবেটার থেকে বার করেছিলেন, প্ল্যাটিমান লুপের সাহায্যে সেইগুলো থেকে সন্তর্পণে ব্যাসিলাস বার করে করে প্রথম আগার টিউবগুলো খুলে আগারে লাগিয়ে দিলেন একে একে। তারপর সবগুলো ইন্‌কিউবেটারে বন্ধ করে দিয়ে জোর আলোটা নিবিয়ে দিলেন।

"হ্যাঁ, এইবার অসুন। প্রথমেই একটা কথা জিগ্যেস করি, আপনি আমার শত্রুতা করছেন

কেন? আপনার সব খবর আমি জানি বলেই আপনার ব্যবহারে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। দেশের ভালো হোক—আপনিও চান আমিও চাই। বিরোধটা কোথায়? হঠাৎ আমাকে শত্রু মনে করার হেতুটা কি?"

"ধনী মাত্রকেই আমি শত্রু মনে করি, কারণ তারা দেশের শত্রু।"

"কথাটা কি যুক্তিযুক্ত হল? রূপসী মাত্রেই পতিতা, বুদ্ধিমান মানেই চোর, বলবান মানেই ডাকাত নাকি তাহলে? এ যে অদ্ভুত যুক্তি আপনার!"

"উপমা দিয়ে কথা বলা আমার স্বভাব নয়। তবে আপনি যখন উপমা দিলেন তখন উপমা দিয়েই তার উত্তর দিচ্ছি। সাপ মাত্রই বিষাক্ত নয়, কিন্তু তবু সাপ মাত্রকেই আমরা ঘৃণা করি, সুযোগ পেলে মেরেও ফেলি।"

"ঠিক। কিন্তু সাপের আকৃতিগত একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা দেখে চিনতে পারা যায় যে, ওটা সাপ। ধনীর সে রকম কোনও বৈশিষ্ট্য আমার মধ্যে পেয়েছেন কি?"

"ধনীর বৈশিষ্ট্য তো আপনার চতুর্দিকেই ছড়ানো রয়েছে, এত বড় বাড়ি, এত বড় বাগান, এত বড় জমিদারি, এত বড় মিল—"

"এর একটাও আমার নয়। সমস্তই আমাদের কুলদেবতা জগদ্ধাত্রী দেবীর। আমি তাঁর সেবক মাত্র।"

তুঙ্গশ্রীর অধরে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল।

"জগদ্ধাত্রী দেবী কিন্তু বিষয় ভোগ করেন না। বিষয় ভোগ করেন আপনি?

"সেটা ঠিক জানেন কি?"

"এত বড় বিষয় ভোগ করে কে তাহলে ?"

"প্রজারা। বিষয়ের যা কিছু আয় তা তাদেরই হিতার্থে খরচ হয়। তাদের হয়ে অবশ্য আমিই খরচ করি। কিন্তু সবটা তাদেরই জন্যে খরচ হয়।"

"আপনি নিজের জন্যে কিছুই খরচ করেন না?"

"এক কপর্দক নয়। ওই বড় বাড়িতেও আমি থাকি না। এখানে যা দেখছেন, সেটা অবশ্য সবই আবার এবং স্বোপার্জিত।"

"স্বোপার্জিত? তবে যে শুনলুম, আপনি ডাক্তারি প্র্যাকটিস করেন না!"

"প্র্যাকটিস করি কিছু কিছু, কিন্তু তার বদলে অর্থ নিই না। আমি বেশ কিছু টাকা রোজগার করে ফেলেছি অন্য উপায়।"

হিরণ্যগর্ভের চোখ দুটি হাস্যপ্রদীপ্ত হয়ে উঠল। দুষ্কৃতি গোপন করে দুষ্টু ছেলের চোখ মুখ যেমন হয়, তাঁর মুখের ভাবটাও তেমনি হল খানিকটা।

তুঙ্গশ্রী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। এমন একটা অভাবনীয় ব্যাপার প্রত্যাশাই করেন নি তিনি। এ অঞ্চলের সঙ্গে পরিচয় নেই তাঁর ভাল করে। তিনি কাজ করেছিলেন পূর্ববঙ্গে, কিছুদিন চট্টগ্রাম অঞ্চলেও। সহসা সমস্ত বর্তমানটাই যেন অবলুপ্ত হয়ে গেল তাঁর চোখের সামনে থেকে। হিরণ্যগর্ভের শেষ কথাগুলো তার কানেই ঢুকলো না। চট্টগ্রামে পাহাড়তলী ক্লাবের কাছে প্রীতি ওয়াদ্দাদার পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মারা যায় যেদিন, সেদিন ঘটনাচক্রে তুঙ্গশ্রী উপস্থিত ছিলেন সেখানে। প্রীতি ওয়াদ্দাদারের গায়ে বোমাও লেগেছিল। তার রক্তাক্ত চেহারাটা ভেসে উঠল তুঙ্গশ্রীর চোখের উপর। মেয়েরাও যে নির্ভয়ে দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ

করতে পারে—এইটে প্রমাণ করবার জন্যেই নাকি পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছিল সে। ইচ্ছে করলে পালাতেও পারত। বহু-দিনের সেই পুরাতন কাহিনীটা এখন মনে পড়ল কেন, ভাবতে গিয়ে যোগসূত্রটা হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেললেন তিনি। মেয়েরাও নির্ভয়ে দেশের জন্যে মরতে পারে—এ প্রমাণ করবার জন্যে প্রীতিলতা যেমন মরেছিল এই ভদ্রলোক তেমনি কি প্রমাণ করতে চান যে, ক্যাপিট্যালিস্ট হয়েও জনসাধারণের হিতৈষী বন্ধু হওয়া সম্ভব? এমন একটা লোককে কেশব সামন্ত চেনে না—এই বা কেমন!

"আপনি হয়তো সমর্থন করতে পারবেন না ব্যাপারটা।"

আত্মস্থ হলেন তুঙ্গশ্রী।

"কোন ব্যাপারটা বলছেন?"

"আমার টাকা রোজগারের পন্থাটা। কিন্তু কি করি বলুন, ব্যাঙ্কে নির্ভরযোগ্য কিছু টাকা না থাকলে আজকালকার দিনে ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখা কঠিন। বিশেষত আমার মতো রিসার্চ-পাগল লোকেব পক্ষে। গভর্ণমেণ্ট বা সমাজ কেউ তো সাহায্য করবে না। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই, সুতরাং সে রকম বশিষ্ঠও থাকতে পারে না। বশিষ্ঠকে এখন স্বোপার্জিত ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের ওপর নির্ভর করতে হবে। তাই আমার পন্থাটা যদিও খুব—"

"শুনিই না কেন পন্থাটা কি, অবশ্য শত্রুপক্ষকে বলতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে—"

"কিছুমাত্র আপত্তি নেই। তা ছাড়া কারও শত্রুতাকে ভয় করি না আমি। আপনারা তো বাইরের লোক। কতটা শত্রুতা আর করবেন। আমার নিজের কাকাই মস্ত বড় শত্রু রয়েছেন, তাঁকে যখন সামলে রেখেছি, তখন আপনাদের—"

আবার হাসলেন হিরণ্যগর্ভ।

"তাহলে বলুন শুনি, আপনার উপার্জনের পন্থাটা কি?"

প্রশ্নটা করেই তুঙ্গশ্রী নিজেব কাছেই অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন একটু। এ রকম কৌতূহল প্রকাশ করাটা কি অশোভন হচ্ছে না?"

"পন্থাটা খুব সোজা। কয়েকটা পেটেন্ট ওষুধের ফরমুলা বিক্রি করে দিয়েছি। দশটা ফরমুলা বিক্রি করে লাখখানেক টাকা মাত্র পেয়েছি। এইগুলি নিয়ে নিজে যদি ব্যবসা করতুম, তাহলে হয়তো আরও ঢের বেশী রোজগার হতো; কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মেছি, বৈশ্য হবার বাসনা নেই, ব্রাহ্মণ হওয়ার দিকে লোভ আছে বরং।"

"ওরই সুদ থেকে আপনার চলে?"

"হ্যাঁ, কোনও রকমে। আর একটু সচ্ছলভাবে চলত, কিন্তু আমার এই ল্যাবরেটারি করতে প্রায় হাজার কুড়ি টাকা বেরিয়ে গেছে!"

তুঙ্গশ্রী পিছনের টেবিলটায় ঠেস দিয়ে বসলেন, কনুই দুটোও তুলে দিলেন টেবিলের ওপর। তারপর নির্নিমেষে হিরণ্যগর্ভের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন— "জিনিসটা এতই অসম্ভব যে রূপকথার মতো শোনাচ্ছে।"

"তার মনে?"

"অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে।"

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অঘটন ঘটে গেল একটা। তুঙ্গশ্রীর পিছন দিকে ফোঁস করে গর্জন করে উঠল এক গোক্ষুর সর্প। তুঙ্গশ্রী লাফিয়ে উঠতে গিয়ে পড়ে গেলেন। হিরণ্যগর্ভ ধরে তুললেন তাঁকে।

"ভয় পাবেন না, ওর বিষদাঁত নেই। ওটা বেরিয়ে পড়ল কখন? খিদে পেয়েছে বোধহয়। ও, বাক্সর ডালাটা খোলা আছে দেখছি।"

হিরণ্যগর্ভ এগিয়ে গিয়ে নির্ভয়ে সাপটাকে ধরে টেবিলের একধারে যে বাক্সটা ছিল তার মধ্যে ঢুকিয়ে ডালাটা বন্ধ করে দিলেন। বিস্রস্তবাসা তুঙ্গশ্রী দু হাতে চোখ ডেকে আর একটা টুলের উপর বসে পড়েছিলেন। তাঁর হাত-পা থরথর করে কাঁপছিল, বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটছিল যেন কেউ। জীবনে তিনি অনেক রকম ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছেন, পুলিশের গুলিরও সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু এমন ভয় জীবনে আর কখনও পান নি। শুধু ভীত নয়, লজ্জিতও হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

হিরণ্যগর্ভ সাপটাকে বন্ধ করে তুঙ্গশ্রীর দিকে ফিরে চাইলেন। কিন্তু মেঝের উপর ভাঁজ-করা এক টুকরো কাগজ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হেঁট হয়ে কুড়িয়ে নিলেন কাগজটা। তারপর সেটার ভাঁজ খুলেই সমস্ত মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর।

"ও, প্ল্যানটা আপনার কাপড়ের মধ্যেই ছিল তাহলে। আমিও আন্দাজ করেছিলাম সেটা। কিন্তু আপনাকে বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল। খরিণীর সাহায্য নেব কি না ভাবছিলুম। যাক, ভুজঙ্গবাবু সমস্যাটার সমাধান করে দিলে।"

তুঙ্গশ্রী যখন মুখ তুলে চাইলেন চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধরে গেছে তখন তাঁর। অধর স্ফুরিত হচ্ছে।

"একজন ভদ্রমহিলাকে ঘরে এনে তারপর তাঁকে সাপের মুখে ঠেলে দেওয়া কোনদেশী ভদ্রতা জানতে পারি কি?"

"আমি ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, সাপটার কথা আমার মনেই ছিল না। তা ছাড়া ওটা যে বেরিয়ে পড়বে তা ভাবতেই পারিনি আমি।"

"সাপ পুষেছেন কেন?"

"ওটার ওপর আমি এক্স্পেরিমেন্ট করছি। ওকে টাইফয়েড ব্যাসিলাস্ ইনজেকসান করে দেখছি, ওর টাইফয়েড হয় কি না? মানে—"

কুঞ্জ একটা সুটকেস নিয়ে প্রবেশ করল। চাবিটা হিরণ্যগর্ভের হাতে দিয়ে বললে—"দিদিমণি জিগ্যেস করলেন, ইনি কি এখন খাবেন?"

"খাবেন বইকি। আমরা যাচ্ছি এখুনি। তুমি জায়গা করতে বল।"

কুঞ্জ চলে গেল।

হিরণ্যগর্ভ তখন তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"আমারও খিদে পেয়েছে খুব। আপনি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি আমার খাবারটা খেয়ে নিই, তারপর আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।"

"আপনি এখানেই খান?"

"হ্যাঁ, এখানেই। স্বপাক আহার করি। বিশেষ কিছু নয়—গোটা দুই সিদ্ধ ডিম, টু টুকরো রুটি আর এক গ্লাস দুধ। পাশের ঘরেই সব বন্দোবস্ত আছে আমার। আসবেন?"

তুঙ্গশ্রী আড়চোখে একবার সাপের বাক্সটার দিকে চেয়ে পাশের ঘরে যাওয়াটাই ঠিক করলেন।

হিরণ্যগর্ভ পাশের ঘরে ঢুকেই একটা বুনসেন বার্নার জ্বেলে ফেললেন। তারপর দেওয়ালের

জালের আলমারি খুলে দুধ আর ছোট অ্যালুমিনিয়মের প্যান বার করলে একটি। প্যানে দুধটা ঢেলে একটা ট্রিপডের উপর বসিয়ে বুনসেন বার্নারটা টেনে দিলেন তার নীচে।

"আপনি বসুন এই চেয়ারটায়। ততক্ষণ গান শুনুন একটা—দিল্লী পাওয়া যাবে বোধ হয় এখন?"

কোণে একটা ছোট রেডিও ছিল। দিল্লীতে বেশ ভাল গানও পাওয়া গেল একটা।

"বসুন। আমার বেশি দেরি হবে না, পাঁচ মিনিট, ডিম সিদ্ধ করাই আছে।"

সিদ্ধ ডিমগুলি ভাঙতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তুঙ্গশ্রী বলে উঠলেন—"হাতটা ধুয়ে ফেলুন আগে।"

"ও হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।"

এক ধারে দেওয়ালে চিনেমাটির সিঙ্ক ছিল একটা। কলও ছিল।

সাবান দিয়ে হাত ধুতে ধুতে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"এই গ্যাস প্রভৃতি করতে অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে গেছে আমার।"

তুঙ্গশ্রী কোনও উত্তর দিলেন না।

দুধটা ফুটে উঠেছিল। সেটা নাবিয়ে, বার্নারটা নিবিয়ে, ডিম ছাড়াতে শুরু করলেন হিরণ্যগর্ভ।

নিস্পন্দ হয়ে বসে দেখতে লাগলেন তুঙ্গশ্রী।

সুদূর দিল্লী থেকে গান ভেসে এসে আকুল করে তুলতে লাগল চতুর্দিক।

...পাঁচ মিনিটের মধ্যেই খাওয়া শেষ হয়ে গেল হিরণ্যগর্ভের। এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে তুঙ্গশ্রীও নিজেকে সামলে নিলেন খানিকটা। অপ্রত্যাশিতভাবে পা পিছলে পড়ে গেলে লোকের যে রকম দৈহিক বিপর্যয় ঘটে, তাঁর মনে তেমনি একটা ঘটনা ঘটে যাওয়াতে শুধু যে তিনি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন তা নয়, ধরবার ছোঁবার মতো কিছু একটা না পেয়ে দিশাহারাও হয়ে পড়েছিলেন। অন্ধকারে সাপ ভেবে যেটাকে মারবার জন্য আস্ফালন করে লাঠি তুলেছিলেন,—হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় সেটা দূরেই সরে গেল না শুধু অপ্রত্যাশিত টর্চের আলো এসে পড়ল কোথা থেকে, দেখতে পেলেন ওটা সাপ নয়, ফুলের মালা। অনেকে মনে করবেন এতে আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল তাঁর, কিন্তু তা তিনি হলেন না। একটা নিরুপায় আক্রোশ তিক্ত করে তুলল তাঁর সমস্ত মনকে। মনে হতে লাগল—ভুল দেখছেন, ভুল বুঝছেন, ওটা ফুলের মালা নয়, সাপই ছদ্মবেশ ধরে আছে, ধরতে পারছেন না তিনি। তাঁর সমস্ত বুদ্ধি একাগ্র হয়ে উঠল ছদ্মবেশের কৃত্রিমতা আবিষ্কার করবার জন্যে। উপর্যুপরি বিস্ময়ের যে চমকে তাঁর সমস্ত চিত্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিল তার তীব্রতা কমে আসছিল ক্রমশ। পাঁচ মিনিট চুপ করে বসে থেকে তিনি আশ্বস্থ হলেন। অন্তত তাঁর নিজের তাই মনে হল।

"চলুন এবার যাওয়া যাক।"

ল্যাবরেটারি থেকে বেরিয়েই আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন হিরণ্যগর্ভ।

"ও, দাঁড়ান, আপনার জিনিসপত্রগুলো আনতে বলে দি। কুঞ্জ ও কুঞ্জ—" কুঞ্জ বেরিয়ে এল।

"এঁর সুটকেস বিছানা আর নূতন সুটকেসটা এঁর ঘরে দিয়ে এস।"

কুঞ্জ চলে যেতেই নরেন নামক যুবকটি বেরিয়ে এল।

"এবারটি মাপ করুন আমাকে। এবার থেকে ঠিক করে রাখব ফিগারগুলো। ওই টেবিলের উপরেই রেখেছিলাম, হাওয়ায় উড়ে গেছে বোধ হয় কাগজটা।"

"পেপার-ওয়েটের তো অভাব নেই। একটু আগে তুমি যে বললে ড্রয়ারে রেখেছিলাম?"

নরেন প্রত্যুত্তরে হাত কচলাতে লাগল শুধু।

"ওই গ্রাফ করে না দেওয়া পর্যন্ত তোমার আজ ছুটি নেই।"

"ফিগারগুলো পেলেই করে দেব। ইউরিয়াটা হয়ে গেছে, সুগারের ফিগারগুলো পেলেই করে দেব।"

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন হিরণ্যগর্ভ তার দিকে ক্ষণকাল।

তারপর তুঙ্গশ্রীর দিকে ফিরে বললেন—"এক মিনিট। একে ফিগারগুলো দিয়ে আসছি।" নরেনের সঙ্গে ভিতরে চলে গেলেন তিনি।

তুঙ্গশ্রী বাইরে থেকে শুনতে পেলেন—"এই ভদ্রমহিলা এসেছেন বলে খুব বেঁচে গেলে তুমি। তা না হলে টেরটি পাওয়াতাম আজ তোমায়। এই নাও আমার খাতাটা আবার হারিও না যেন।"

পর-মুহূর্তেই বেরিয়ে এলেন।

"চলুন এবার, বড় দেরি করিয়ে দিলাম আপনার।"

হিরণ্যগর্ভের কণ্ঠস্বরে উষ্মার লেশমাত্র নেই আর।

আবার বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে লাগলেন দুজনে। কিছুক্ষণ নীরবতার পর তুঙ্গশ্রী বললেন—"আপনার বিষয়ের সমস্ত আয় প্রজাদেরই হিতার্থে ব্যয় করেন বলছেন, তাহলে বিষয়টা প্রজাদেরই দিয়ে দিন না একেবারে।"

"যা আমার নয়, তা অপরকে দান করব কি করে?"

"বিষয় আপনার নয় তো কার?"

"বললাম তো, জগদ্ধাত্রী দেবীর। আমি তাঁর সেবকমাত্র।"

"আপনি বৈজ্ঞানিক হয়েও দেব-দেবীতে বিশ্বাস করেন?"

"আপনার কি ধারণা বৈজ্ঞানিক হলেই নাস্তিক হতে হবে? তা ছাড়া এতে তো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই আসছে না, আমাদের পূর্বপুরুষদের অর্জিত বিষয়, দেবতাদের নামে দিয়ে গেছেন তাঁরা, আমি সেই দেবতার সেবায়েত হিসেবেই সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবার অধিকারী—এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছেন না কেন! ও-বিষয় আমি দান বা বিক্রি করতে পারি না।"

একটু হেসে তুঙ্গশ্রী বললেন—"আপনি ইচ্ছে করলে একজন সেবায়েত নিযুক্ত করতে পারেন প্রজাদের ভিতর থেকে বেছে।"

"বাছব কি করে?"

"ভোট নিয়ে।"

"তাহলে তো জগন্নাথ মারোয়াড়ী টাকা দিয়ে কিনে নেবে সব ভোট। কথাটা যদিও একটু আত্মপ্রশংসার মতো শোনাবে তবু আমি বলতে বাধ্য যে, জগন্নাথ মারোয়াড়ীর চেয়ে আমি ভাল লোক।"

"ডেমোক্র্যাসিতে আপনার আস্থা নেই তাহলে?"

"কাগজে-কলমে আছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নেই। মানব-সমাজ এখনও তেমন উন্নত হয় নি। তাই ডেমোক্র্যাসির নামে অটোক্র্যাসি চলছে এখনও। চরিত্রবান নয়, প্রতিভাবান নয়, বুদ্ধিমান ধনীই এখনও প্রভুত্ব করতে চাইছে এবং করতে পারছে। মাপ করবেন, আমি আপনার যে শ্রমিকদের হয়ে লড়তে এসেছেন তারা এতই মূঢ় যে নিজেদের ভাল মন্দ কিসে হয়—সে জ্ঞান তাদের নেই। প্রলুব্ধ পশু যেমন ফাঁদে পা দেয়, এরাও তেমনি অতি সহজে শ্রমিকনেতা নামধেয় মতলব-বাজ লোকদের খপ্পরে পড়ে। ওই মতলব-বাজ লোকগুলি সর্বহারা শ্রমিকদের কেউ নয়, সর্বগ্রাসী ধনিকদেরেই এজেন্ট। সকলের কথা আমি বলছি না, যাদের কথা আমি জানি তাদের কথাই বলছি। ব্যক্তিগতভাবে আপনি হয়তো আদর্শের প্রেরণায় এসেছেন, কিন্তু যে দল আপনাদের আদর্শটিকে টোপস্বরূপ ব্যবহার করে আপনাকে গেঁথেছে তাদের স্বরূপ আপনি বোধ হয় জানেন না।"

শেষের কথাগুলিতে তুঙ্গশ্রীর সর্বাঙ্গ রিরি করে উঠল। কিন্তু আত্মসম্বরণ করে ধীর কণ্ঠেই তিনি বললেন—"আপনি যা বললেন, তা হয়তো সবই ঠিক। কিন্তু এইটেই হচ্ছে এ-যুগের হাওয়া। একে আপনি ঠেকাবেন কি করে?"

"বাহুবলে কিংবা বুদ্ধিবলে। আপনাকে ধরে আনলাম কি করে?" একটা ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ হাসি ফুটে উঠল হিরণ্যগর্ভের অধরে, উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেল ভ্রূযুগল।

"আমি আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করছি, কিন্তু যুক্তিটা ঠিক মেনে নিতে পারছি না। আপনাকে ক্যাপিট্যালিস্ট বলে যদি—"

"দোহাই আপনার, ও-কাজটি করবেন না। ক্যাপিট্যালিস্ট বলতে আপনারা যাদের বোঝেন, আমি তাদের দলে নই, বরং আমি তাদের বিরোধী বলতে পারেন। কিন্তু আপনারা যেভাবে এই ক্যাপিট্যালিস্ট সমস্যার সমাধান করতে চাইছেন তারও আমি বিরোধী। এক হিসেবে আপনারা তাদেব বিরোধিতা করেই সম্মান দিচ্ছেন। মনে হচ্ছে, আপনারাও ওই জাতের। ওদের ভাগে বখরাটা বেশি বলেই আপনাদের আপত্তি, টাকার বখরা সমান হয়ে গেলেই আপনাদের আপাতত আর ঝগড়া থাকবে না।"

"আপনি তাহলে কি ভাবে সমস্যার সমাধান করতে চান?"

"আমি চাই বললে ভুল হবে, আমাদের প্রাচীন সভ্যতা যেভাবে এ সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল, আমিও সেই ভাবেই ভাবতে চেষ্টা করেছি। আমাদের দেশে সৎপথে থেকে ধনোপার্জন করতে বাধা ছিল না। কারও স্বোপার্জিত সম্পত্তি কেড়ে নেবার চেষ্টাও করত না কেউ। কিন্তু একটা জিনিস ছিল, কেবলমাত্র ধনী হলেই খাতির পেত না লোকে। আজকাল যেমন সাহিত্য শিল্প ধর্ম—সব সমাজেই ধনীর প্রতিপত্তি, আগে সে রকম ছিল না। সেকালে মনুষ্যত্বই ছিল সম্মানের মেরুদণ্ড। ত্যাগীই সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন পেত, ভোগী নয়। সমাজের শিরোমণি ছিল দরিদ্র ব্রাহ্মণ। রাজ জনক যখন মহর্ষি জনক হলেন, তখনই হল তাঁর খাতির; কান্যকুব্জের রাজা গাধিনন্দন তেমন খাতির পান নি, তপস্যা করে তিনি যখন বিশ্বামিত্র হলেন তখনই সমাজের লোক সম্মান দিল তাকে; রূপসী গণিকা আম্রপালী পাংক্তেয় হলেন ভিক্ষুণী হয়ে—এ রকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। একটা জিনিস তাঁরা বুঝেছিলেন যে, শুধু ধন নিয়েই মানুষ তৃপ্ত হয় না, মানও চায় সকলে। সমাজে অপরের শ্রদ্ধা সম্মান লাভ করতে সবাই

উৎসুক। এই দ্বিতীয় জায়গাটিতে খুব কড়াকড়ি ছিল তাদের। মনুষ্যত্ব লাভ না করলে, ব্রাহ্মণ না হলে সেকালে খাতির পাওয়ার কোনও উপায় ছিল না। এই খাতিরের লোভে সেকালে অনেকে ভদ্রলোক হয়ে যেত। ভণ্ডও হতো অবশ্য—"

তুঙ্গশ্রী হেসে বললেন—"আপনার কি ধারণা যে, এখন খাতিরের লোভ দেখালেই সমস্যাব সমাধান হবে? ধনীরা গরিবদের আর শোষণ করবে না?"

"এ পরিবর্তন হঠাৎ হয় কি! শিক্ষারই আমূল পরিবর্তন করতে হবে, দৃষ্টিভঙ্গীই বদলে ফেলতে হবে? ঐহিক ঐশ্বর্যটা যে কিছুই নয়, রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, মূর্খ-বিদ্বান সকলেই যে নিজ নিজ কর্মফল অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করছে, এই জীবনে সৎকর্ম করে গেলে প্রত্যেকেই যে উন্নততর অবস্থায় পৌঁছতে পাবে—এই বিশ্বাস লোকের মনে বদ্ধমূল করতে হবে, ধনী-দরিদ্র সকলেই যে মুক্তিপথের যাত্রী এটা শুধু মুখের বুলি বলেই হবে না, অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে সেটা। কিন্তু এসব তো একদিনে হবে না।"

"এই সব কুসংস্কার আপনি দেশবাসীর মনে বদ্ধমূল করতে চান। এ সবের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি?"

"আপনি নিজে যদি বৈজ্ঞানিক হতেন তাহলে অত সহজে কথাটা বলতে পারতেন না। দেখুন, কিছুদিন আগে বৈজ্ঞানিকেরাই বলতেন—খারাপ হাওয়ার জন্যেই ম্যালেরিয়া হয়, তখন সেইটেই বৈজ্ঞানিক সত্য ছিল; রস সাহেব যেই মশার তত্ত্ব বার করলেন অমনি সেটা কুসংস্কার হয়ে গেল। এখন আমার নিজের মনে হচ্ছে, মশার তত্ত্বটাও কুসংস্কার বোধ হয়। ব্যাকটিরিয়ারাই সত্যি সত্যি অসুখের কারণ কি না তাতেই সন্দেহ হচ্ছে আমার। বিজ্ঞানের আলোচনা করলে দেখতে পেতেন, প্রতি বিষয়েই বৈজ্ঞানিক থিয়োরী রোজ বদলে যাচ্ছে। কিন্তু যে সব জিনিসকে আপনি কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিলেন, সেইগুলো অবলম্বন করে অনেক বড় বড় সভ্যতা টিকে আছে এখনও।"

"আফিং জিনিসটা টিকে আছে এখনও।" হেসে উত্তর দিলেন তুঙ্গশ্রী—"ধর্মের আফিং খাইয়ে জুজুর ভয় দেখিয়ে সেকালে শ্রমিক-জগৎ'কে পঙ্গু করে রেখেছিল ওই ক্ষমতাপ্রিয় পুরোহিতের দল—ইতিহাস পড়ে এই তো মনে হয়।"

"একালের পুরোহিতের দল টাকার আফিং খাইয়ে পঙ্গু করে বেখেছে তাদের। নিজেই ভেবে দেখুন, কোন্ আফিংটা ভাল। আপনার শ্রমিক-জগৎ কথাটা শুনে একটা কথা মনে পড়ল। আজকাল ডিগ্‌নিটি অব লেবার কথাটা যেখানে-সেখানে যখন-তখন খুব শুনি, কিন্তু সত্যিই কি লেবারদের ডিগ্‌নিটি আজকাল আছে? তাদের মাইনে বাড়িয়ে দিলেই কি তাদের ডিগ্‌নিটি বাড়ে?"

"মাইনে বাড়িয়ে দেখুনই না, বাড়ে কি না!"

"আমার কাকার মিলে সে চেষ্টা করেছিলাম একবার। কাকার সঙ্গে ঝগড়া করে তিন গুণ করে দিলাম সকলের মাইনে। ফলে কি হল জানে? তাদের ডিগ্‌নিটি বাড়ল না, আশেপাশে তাড়ির দোকান বেড়ে গেল কয়েকটা, দু ক্রোশ দূরে যে গণিকাপল্লীটা ছিল তার আয় বেড়ে গেল অনেক।"

"আপনারা ধনীরা যদি মদ খেতে পারেন, গণিকা নিয়ে আমোদ করতে পারেন, ওরাই বা বঞ্চিত হবে কেন সে সব থেকে?"

"ঠিক। আপনি আপনার অজ্ঞাতসারেই বোধ হয় সায় দিয়ে ফেলেছেন আমার কথায়। আমার মতে আজকালকার শ্রমিক ধনিক দুই-ই একজাতের লোক। তফাতটা কেবল আর্থিক। দুই দলই কষ্ট পাচ্ছে। আপনি মনে করবেন না যে, ক্যাপিট্যালিস্টরা খুব সুখে আছে—আমার কাকাকে যদি দেখেন বুঝতে পারবেন সেটা। টিপিকাল ধনী তিনি—"

"এই বললেন আপনাদের বিষয়-সম্পত্তির মালিক জগদ্ধাত্রী দেবী! আপনার কাকা টিপিকাল ধনী হবার সুযোগ পেলেন কি করে তাহলে?"

"আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পত্তির দুটো ভাগ আছে। আমার ভাগটা জগদ্ধাত্রী দেবীর, আমার কাকার ভাগটা নয়। উনি আমার বাবার সহোদর নন। আমার ঠাকুরদার বাবারা দুই ভাই ছিলেন, সেই সময় সম্পত্তি দু ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটা ভাগ দেবোত্তর করেন একজন, আমরা সেইটেরই সেবায়েত। বাকি অর্ধেকটার বর্তমান উত্তরধিকারী আমার নিঃসন্তান কাকা।"

"ও!"

"কাকার সঙ্গে আলাপ করবেন? দ্রষ্টব্য ব্যক্তি একজন।"

"করতে পারি।"

"আচ্ছা, আগে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিন।"

বড় অট্টালিকার কাছাকাছি হতেই দপ করে আলো জ্বলে উঠল—একটা ইলেকট্রিক আলো। যে পথে তাঁরা প্রবেশ করবেন, আলোকিত হয়ে উঠল সেটা।

"আপনারা এই মফস্বলে ইলেকট্রিক পান কি করে? ডায়নামো বসিয়েছেন?"

"কাকা বসিয়েছেন। আমার ল্যাবরেটারিটার অবশ্য সুবিধে হয়েছে সেজন্যে। টাকা দিয়ে যা যা হওয়া সম্ভব কাকা সব করেছেন। এমন কি ফোন পর্যন্ত বসিয়েছেন একটা নিজের ঘরে।"

দ্বার প্রান্তে হাস্যমুখী শিখরিণী এসে দাঁড়াল।

সবাই ভিতরে প্রবেশ করলেন।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ার পরও হিরণ্যগর্ভ গল্প করতে লাগলেন তুঙ্গশ্রীর সঙ্গে বসে। তুঙ্গশ্রীর প্রতি কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করছিলেন তিনি যেন। অন্য কোনও কারণে নয়, তুঙ্গশ্রী বিদ্রোহিনী বলে। তিনি যে চিরাচরিত পথ ছেড়ে প্রাণ তুচ্ছ করে দেশের কাজে নামতে পেরেছেন এতেই মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। পথ যতই বিভিন্ন হোক, কিন্তু তিনি যে তাঁরই স্বজাতি—এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ ছিল না তাঁর। তাই তিনি নিজেই তাঁকে স্টেশন থেকে আনতে গিয়েছিলেন এবং হঠাৎ একটা উদ্ভট ফন্দি মাথায় এসে পড়াতে যা করেছিলেন তা তাঁর খেয়ালী শিশুসুলভ স্বভাবেরই পরিচয় দেয় মাত্র। অভিনব একটা কিছু করতে পারলে তিনি যত আনন্দিত হন, এমন আর কিছুতেই হন না। আনন্দের স্বর্গলোকে আজ তাঁর মন তাই ডানা মেলে উড়ছিল। সোচ্ছ্বাসে বক্তৃতা করছিলেন তিনি। যে আলোচনা খাওয়ার আগে শুরু হয়েছিল সেইটেই চলছিল তখনও।

"দেখুন, আজকাল যা হয়েছে তাতে লেবারের ডিগ্‌নিটি মোটে নেই। মানুষের মূল্য আমরা টাকা দিয়ে ঠিক করছি। আগে কিন্তু তা ছিল না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে, তাকেই খাতির করতাম আমরা। ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন প্রত্যেক মানুষই তার নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিজের জগতে সম্রাট হয়ে জন্মেছে। সেই সম্রাটকে যদি আমরা তার প্রাপ্য না দিই, তাহলে তাকে ঠিক সম্মান করা হয় না, তাকে মর্যাদা দেওয়া হয় না। এখন আমরা প্রত্যেক

লোককে এক ছাঁচে ঢেলে ফেলবার চেষ্টা করছি। বড় শিল্পী বা প্রতিভাবান কারিগরকে ফ্যাক্টরিতে চাকরি দিয়ে আমরা তাকে দিয়ে ক্রমাগত বল্টু বানিয়ে নিচ্ছি বা হাতল ঘুরিয়ে নিচ্ছি। যত বেশি মাইনেই দি, সে তৃপ্তি পাবে না তাতে। কারণ তার মধ্যে যে সম্রাট আছে তাকে আমরা খাতির করছি না। মুড়ির মহিমাও আমরা উপলব্ধি করছি না, মিছরিরও না। আমরা কেবল তাদের একটা ঠোঙায় ঢুকিয়ে ঠোঙার গায়ে দরের লেবেল সেঁটে দেবার চেষ্টা করছি। এই যে নরেনকে এক্ষুণি দেখলেন, ওর বাবাকে কি রকম খোশামোদটা করতুম আমরা ছেলেবেলায়! ওরা জাতে তাঁতী, ওর বাবার তাঁত ছিল। আমাদের সমস্ত কাপড় সেই করত। বাবা মিলের কাপড় কেনার বিরোধী ছিলেন। আমি আর শিখরিণী জীবন তাঁতীর বাড়িতে প্রায়ই গিয়ে ধরনা দিতাম কাপড়ের পাড় যাতে ভাল হয় একটু। তার সঙ্গে আমাদের শুধু পয়সার সম্বন্ধ ছিল না, প্রাণের সম্বন্ধও ছিল। তার মধ্যে যে শিল্পী ছিল তাকে আমরা খাতির করতুম। তার ছেলে নরেন, বি-এস-সি পাস করেছে, কেরানীগিরি কিংবা মাস্টারি যে কোনও একটা চাকরি করবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক জায়গায় চাকরি পেয়েওছিল, কিন্তু স্ট্রাইকে যোগ দেওয়ার জন্যে চাকরি গেছে। কিছুতেই কোথাও খাপ খাওয়াতে পারছে না নিজেকে। পারছে না তার কারণ, ওর মনের মধ্যে যে সম্রাট আছে সে ঠিক মর্যাদা পাচ্ছে না। ও বিজ্ঞানের ছাত্র, আমি তাই ওকে সুযোগ দিয়েছি ল্যাবরেটারিতে যদি ও আত্ম-আবিষ্কার করতে পারে। কিন্তু যা দেখছি, ভয়ানক কুঁড়ে আর অন্যমনস্ক। আমাদের সমস্ত শিক্ষাটাই হচ্ছে ভুলপথে।"

তুঙ্গশ্রী চুপ করে শুনে যাচ্ছিলেন সব। তিনিও স্বজাতি বলে চিনতে পেরেছিলেন হিরণ্যগর্ভকে। তিনিও নীরবে ভাবছিলেন কি উপায়ে এই পথভ্রষ্টকে ফিরিয়ে আনা যায়।

শিখরিণী পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়াল।

"কাকা আসতে বললেন তোমাদের। গানের আসর বসবে কিন্তু এক্ষুণি।"

"চলুন যাই। গান শুনতে আপনার আপত্তি নেই নিশ্চয়?"

"কি গান?"

"বাইজীর।"

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তুঙ্গশ্রী। এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। তাঁর মুখভাবে তাঁর অজ্ঞাতসারেই এমন একটা কঠোরতা ফুটে উঠল যে তাঁর মনোভাবটা হিরণ্যগর্ভের অগোচর রইল না।

"বাইজী শুনে চটে যাচ্ছেন কেন? বাইজী নামক শ্রমিকার মজুরি বেশ ভালোই দেন কাকা। তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেন খুব। গেলেই দেখতে পাবেন।"

"চলুন।"

যে প্রত্যুত্তরটা জিহ্বাগ্রে এসে পড়েছিল সেটা সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তুঙ্গশ্রী। কারণ যে সম্ভাবনাটা তাঁর মনে উঁকি দিচ্ছে কিছুক্ষণ আগে থেকে, বাক্‌বিতণ্ডা করে সেটাকে নষ্ট করতে চান না তিনি। অকারণে অসময়ে গর্জন করে ব্যাঘ্রিনী যেমন তার শিকারকে সচকিত করে তোলে না, হিরণ্যগর্ভকে তেমনি অনর্থক উত্তেজিত করতে প্রবৃত্তি হল না তাঁর।

শিখরিণীকে অনুসরণ করে উভয়েই ঘরের পর ঘর, বারান্দার পর বারান্দা পার হতে লাগলেন। সমস্ত ঘরগুলোই ছবিতে আসবাবে পরিপূর্ণ। কিন্তু দেখে মনে হল না যে, কেউ তাতে বাস করে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বারান্দা। একটা বারান্দায় সারি সারি খাঁচায় খরগোশ, গিনিপিগ, পায়রা, সাদা ইঁদুর, এমন কি বাঁদরও রয়েছে।

"ওগুলো হচ্ছে আমার ল্যাবরেটারির জানোয়ার।"

হঠাৎ একটা বিকট শব্দে চমকে উঠলেন তুঙ্গশ্রী।

"কাকা হাঁচলেন।"—মুচকি হেসে শিখরিণী বললে।

"যাক, আপনার কপালটা ভালো। সন্ধ্যের দিকে কয়েকটা হেঁচে না ফেলতে পারলে কাকা স্বস্তি পান না।"

প্রকাণ্ড একটা দালান শেষ হয়েছে যেখানে, সেইখানে পরদা-দেওয়া দরজার সম্মুখে সশস্ত্র দারোয়ান দেখেই তুঙ্গশ্রী বুঝলেন যে, এইবার কাকাবাবুর মহল আরম্ভ হল। হিরণ্যগর্ভকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল দারোয়ান এবং মিলিটারি স্যালুট করলে।

"আসুন।"—শিখরিণীই আহ্বান করলে।

ভিতরে প্রবেশ করলেন সবাই।

প্রকাণ্ড একটি হলের এক প্রান্তে বসেছিলেন মেঘসুন্দর বর্মন। দীর্ঘকান্তি সুপুরুষ। ধপধপে গায়ের রঙ, ধপধপে মাথার চুল। পাকা চুলেও চমৎকার তেড়ি। শুকচঞ্চু নাকের দু পাশে খাঁজ। চোখ দুটি খুব বড় নয়, কিন্তু জীবন্ত। গোঁফ-দাড়ি কামানো। তাঁর বলিষ্ঠ চিবুক, মজবুত চোয়াল, চোখের প্রদীপ্ত দৃষ্টি, ভাষাভরা পাতলা ঠোঁট তাঁর যে ব্যক্তিত্বের সূচনা করছে সে ব্যক্তিত্বের মূলকথা অনমনীয়তা। তা যেন নীরব ভাষায় ঘোষণা করছে—তোমরা কি বল না বল না তা গ্রাহ্য করি না আমি। তোমাদের স্তুতি নিন্দার অনেক ঊর্ধ্বে আমার বাস।

শিখরিণী এগিয়ে গিয়ে বললে—"এই যে কাকা, ইনিই তুঙ্গশ্রী দেবী।"

"ও।"

তুঙ্গশ্রী নমস্কার করতেই বললেন—"বস বস। হিরণ, তুমি তোমার অমূল্য সময় এভাবে নষ্ট করছ যে আজ হঠাৎ?"

"এঁকে নিয়ে এলাম আপনার কাছে।"—মৃদু হেসে কথা কটি বলে একটা চেয়ার টেনে বসলেন হিরণ্যগর্ভ এক ধারে, তুঙ্গশ্রীও বসলেন। মখমলের গদিআঁটা চেয়ারে বসে কেমন যেন স্বস্তি পেলেন না তিনি। নরম নরম কেমন যেন।

মেঘসুন্দর ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়েছিলেন তুঙ্গশ্রীর দিকে।

খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন—"নামটা যে রকম হেঁইও-গোছের, চেহারাটা সে রকম নয় তো! আমাদের শিখুর মতোই অনেকটা।"

শিখরিণী একপাশে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। সে বললে—"আমি এবার যাই কাকু।"

"গান শুনবি না?"

"আসব একটু পরে।"

"তোমার পতিদেবতা কি ফিরেছেন এর মধ্যেই? জগন্নাথপুর গেছে তো?"

"হাতিতে গেছেন। এসেই হয়তো খেতে চাইবেন।"

"ওকে টমাটোর রস দিয়ে হরলিক্স্ করে দিয়েছিলি একদিনও?"

"না, দেওয়া হয় নি এখনও।"

"ওই তো তোমাদের দোষ। যেটি বলব সেটি কিছুতে করবে না। ওসব কাগজি লেবুর শরবত-টরবতের চেয়ে ঢের ভালো। কি বল হিরণ।"

"ভালো তো হওয়া উচিত।"

"শুনলি? করে দিস আজকে।"

"আচ্ছা।"

শিখরিণী চলে যাচ্ছিল। মেঘসুন্দর আবার ডাকলেন।

"ওই বিনি হারামজাদী কি করছে দেখ তো। কমপ্রেসটা এখনও পর্যন্ত আনতে পারলে না। তুই দেখ দিকি।"

শিখরিণী পাশের একটা দরজা দিয়ে চলে গেল।

মেঘসুন্দর হিরণ্যগর্ভের দিকে চেয়ে বললেন—"হাঁটুর বাতটা কিছুতেই বাগ মানছে না. বুঝলে! একটা ব্যবস্থা করতে পার কিছু? রামচন্দ্র তো হিমসিম খেয়ে গেল. কিছুই হচ্ছে না, ব্যথাও বাড়ছে, তার বিলও বাড়ছে।"

"দেখি!"—উঠে দাঁড়ালেন হিরণ্যগর্ভ।

"দাঁড়াও! বেশি টেপাটিপি করো না যেন, তোমাকে দেখাতে ভয় করে।"

হিরণ্যগর্ভ এগিয়ে গিয়ে হাঁটুটা দেখলেন।

"পারগেটিভ নিন একটা। আর মাংস ডিম এগুলো বন্ধ করে দিন একেবারে।"

"এর নাম কি চিকিৎসা? তার চেয়ে সোজা বল না—আপনি চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন, আমি আপনার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলি আপনাকে। আপদ চুকে যাক। এত খরচ করে কি পড়াশোনা যে করলে তোমরা. তা তো বুঝি না। কোথায় অসুস্থ মানুষকে একটু আরাম দেবে,. তা না, তাকে আরও উত্যক্ত করে তুলছ। রামচন্দর বোরিক কম্প্রেসের ব্যবস্থা করে গেছেন। এমন দুর্গন্ধ ওষুধটার—"

বিনি ওরফে বিনোদিনী গরম কম্প্রেস নিয়ে প্রবেশ করল। বিনোদিনীর বয়স পনেরো-ষোল বছরের বেশি নয়। বেশ সুন্দরী। পিঠে চমৎকার বেণী দুলছে একটি। চোখের ভ্রূযুগল ঈষৎ উৎক্ষিপ্ত। অভিমানে সমস্ত মুখ থমথম করছে।

"ও বাবা, চোখে-মুখে মেঘ আর বিদ্যুৎ দুই যে দেখছি। কি হল? শিখুর কাছে বকুনি খেলে বুঝি?"

বিনু কোনও উত্তর না দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল কম্প্রেস দিতে।

"আতর দিয়েছ ভালো করে?"

"দিয়েছি।"

চমৎকার গোলাপী আতরের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। আনতমস্তকে বিনু সেঁক দিতে লাগল হাঁটুতে। বিনির বেণীটা হাত দিয়ে তুলে গুনগুন করে গান ধরে দিলেন মেঘসুন্দর—

বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়,
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।

ঝঙ্কার দিয়ে উঠল বিনি—"আঃ, ছাড় না, লাগছে যে।"

বিনু মেঘসুন্দরের নাতনী। তাঁর ভাগনীর মেয়ে। মা-বাপ-মরা মেয়ে। মেঘসুন্দরই মানুষ করেছেন।

তুঙ্গশ্রী স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। তাঁর মনে পড়ছিল দুর্ভিক্ষের ছবিগুলো—কাতারে কাতারে লোক ভাতের জন্য ফ্যানের জন্য হাহাকার করে বেড়িয়েছে যে দেশের পথেঘাটে, যে দেশের

মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা ইজ্জত দিয়েছে দুটি উদরান্ন সংগ্রহের জন্য, মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত ছেলেরা আদর্শ বিসর্জন দিয়ে যে কোনও উঞ্ছবৃত্তির শরণাপন্ন হয়েছে কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দেশে; সেই দেশে এই সব ধনী মজুতদারেরা গা ভাসিয়ে দিয়েছে বিলাসের স্রোতে। ষোড়শী সুন্দরীকে দিয়ে হাঁটুতে দেওয়াচ্ছে গোলাপী আতরের সেঁক।

সেঁক দেওয়া শেষ করে বিনু উঠে যাচ্ছিল। মেঘসুন্দর বললেন—"হীরা বাইজীকে আজ নাচটা দেখাতে হবে।" এক ছুটে বেরিয়ে গেল বিনু। তার গমনপথের দিকে চেয়ে হাসিমুখে আওড়ালেন মেঘসুন্দর—

গোরি ধীরে চল, গাগরি ছলক না যায়
পাতরি কমরই তেরি লচক না যায়।

তারপর তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"ওহো, অন্যায় হয়ে যাচ্ছে তো! আমি নিজের ব্যাপার নিয়েই মত্ত আছি, তোমার দিকে মনোযোগ দিতে পারছি না। তুঙ্গশ্রী? হুঁ। হিরণের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে নাকি। ওর মতো লোকের সঙ্গে কারও যে বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব তা তো মনে হয় না। সাপ ব্যাঙ ইঁদুর কচ্ছপ নিয়ে কারবার ওর দিনরাত! ভালো কথা হিরণ, তোমার সেই স্বদেশহিতৈষী মিলের কি হল শেষ পর্যন্ত?"

"মিল বন্ধ করে দিয়েছি।"

"তা তো দিতেই হবে জানতাম। জবরদস্তি করে কারও উপকারও যে করা যায় না, তা তো আগেই বলেছিলাম তোমাকে। দিন দশেক আগে কেশব সামন্তদের লোক এসেছিল আমার কাছে। ওরা যদি জমিটা লীজ নিতে চায় দিয়ে দাও না, তোমাদের মিলের জিনিসপত্রও কিনে নেবে ওরা। পূর্ববঙ্গে নিজেদের একটা মিল স্টার্ট করবার ইচ্ছে ওদের। তাছাড়া তোমার ওই জমিটাতে ওরা—"

"গাঁজা চাষ করতে চায়।" হেসে জবাব দিলেন হিরণ্যগর্ভ—"আমার কাছেও এসেছিল ওরা।"

"তা করলেই বা। ওরা কি চাষ করবে তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার কি? তোমাকে মবলগ টাকা দিচ্ছে, নিয়ে নাও না সেটা।"

"না, আমি গাঁজার চাষ করতে দেব না।"

"ওই পাগলামো দেখ। লোকে ধানও খায়, গাঁজাও খায় যে। তুমি তোমার জমি না দিলে কি গাঁজার চাষ উঠে যাবে দেশ থেকে?"

হিরণ্যগর্ভ চুপ করে বসে রইলেন। উত্তর দিলেন না কোনও। আড়চোখে তুঙ্গশ্রীর দিকে চাইলেন একবার কেবল।

কেশব সামন্ত নামটা শুনেই তুঙ্গশ্রীর সমস্ত সত্তা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। কেশব সামন্তও যে ধনী জমিদারের ছেলে তা অবিদিত ছিল না তুঙ্গশ্রীর। কিন্তু তিনি কেশব সামন্তর অন্য যে পরিচয় পেয়েছিলেন, তাতেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। জমিদারের ছেলে হয়েও কেশব সামন্ত জমিদারি প্রথার বিরোধী, তাঁদের পার্টি পরিচালনের অধিকাংশই খরচই তিনি দেন, স্বাধীনতা পাওয়ার পর কংগ্রেস নেতারা যে ক্যাপিট্যালিস্টদের হাতে রেখে ফ্যাসিস্ট মনোবৃত্তিরই পরিচয় দিচ্ছেন—এ সম্বন্ধে তাঁর ওজস্বিনী বক্তৃতা একাধিক বার শুনে তুঙ্গশ্রীর মনে কেশব সামন্ত সম্বন্ধে যে ধারণা হয়েছে তা শ্রদ্ধাবিষ্ট। জেল থেকে বেরিয়ে এসে নিরাশ্রয়ের মতো তিনি যখন পথে পথে

ঘুরছিলেন, তখন মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ ছাড়া আর কেউ তো কিছু করে নি. কেউ তো সাহায্য করতে এগিয়ে আসে নি এক কেশব সামন্ত ছাড়া। দেশের জন্যেই তুচ্ছ করে এগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি, দেশের জন্যেই কারাবরণ করেছিলেন, কিন্তু দেশের লোক তাঁর জন্যে কি করল? তাঁর মাকে একমুঠো খেতে পর্যন্ত দেয় নি। না খেয়ে মারা গেছেন তিনি। নাবালক ভাইটা যক্ষ্মায় ভুগছে। ওই কেশব সামন্তই বলেছেন তাঁকে, কোনও স্যানাটোরিয়ামে ঢুকিয়ে দেবেন এবং প্রয়োজন হলে তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবেন। পূর্ববঙ্গে জন্ম তাঁর, পূর্ববঙ্গেই শিক্ষাদীক্ষা, বাকী জীবনটাও হয়তো পূর্ববঙ্গেই কাটত: কিন্তু সেখানে থাকতে পারলেন না। মুসলমান গুণ্ডাদের অত্যাচারে পালিয়ে আসতে হল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন না কেন? ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উৎখাত করবার জন্যে প্রাণ তুচ্ছ করে যেমন তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তেমন করে এগিয়ে গেলেন না কেন? এ প্রশ্ন অনেকে করেছে তাঁকে। যে উত্তর তিনি দিয়েছেন তার মর্ম কেশব সামন্ত ছাড়া আর কেউ বুঝল না। মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবি তিনি ন্যায্য বলে মনে করেন। এই শুনেই ক্ষেপে গেল সকলে। পাকিস্তানে যে আজ গুণ্ডার আধিক্য তার কারণ, তারা এতদিন শিক্ষিত ভদ্রলোক হবার সুযোগ পায়নি হিন্দুদের আওতায় থেকে। এইবার তারা আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ পেয়েছে। আশা করা যায় যে, অল্পদিনের মধ্যে তারাও সভ্য হয়ে উঠবে। এর জন্যেই তাদের পাকিস্তানের প্রয়োজন ছিল। কেশব সামন্তই কেবল বুঝেছিলেন তাঁর যুক্তি এবং বাঁচিয়েছিলেন তাঁকে তথাকথিত স্বদেশভক্তদের হাত থেকে। পূর্ববঙ্গ থেকে ছোট ভাইটিকে নিয়ে অসহায় অবস্থায় যখন পালিয়ে এলেন তিনি, তখন একমাত্র ওই কেশব সামন্তই তাঁকে সত্যিকার আশ্রয় দিয়েছিলেন কলকাতা শহরে তাঁর নিজের বাড়িতে। তাঁর মন তাঁর মতবাদ সমস্তই আশ্রয় পেয়েছিল এক ঐ কেশব সামন্তের কাছে। কলকাতায় এসে যে রাজনৈতিক গোষ্ঠী তিনি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন. কেশব সামন্তই তার প্রাণ। সে রাজনৈতিক গোষ্ঠীর আদর্শ—শ্রমিকদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করা, দেশের শত্রু পুঁজিবাদীদের ধ্বংস করা। এরই মধ্যে অনেক মিল স্ট্রাইক করিয়েছেন তাঁরা, চূর্ণ করেছেন অনেক ধনীর অহেতুক দম্ভ। হিরণ্যগর্ভের নানা কাহিনী তিনি শুনেছিলেন কলকাতায় বসে। কেশব সামন্তকে লেখা চিঠিখানাও দেখেছেন তিনি। চিঠিটা পড়ে রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠেছিল তাঁর। কিন্তু সে রাগের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেল যখন তিনি অকাট্য প্রমাণ পেলেন যে, কেশব সামন্তকে অপমান করেছেন হিরণ্যগর্ভ। সেইদিন ঠিক করলেন, এমন একটা কিছু করতে হবে, এমন চমকপ্রদ একটা কিছু, যাতে হিরণ্যগর্ভেরই শিক্ষা হবে না শুধু, কেশব সামন্তেরও তাক লেগে যাবে। ডিনামাইট দিয়ে হিরণ্যগর্ভের মিলটা উড়িয়ে দেবার প্রস্তাবে সত্যিই তাক লেগে গিয়েছিল কেশব সামন্তের।..এমন ভাবে ধরা পড়ে যাবেন তা তুঙ্গশ্রী কল্পনা করেন নি। তার চেয়েও বেশি কল্পনাতীত ছিল হিরণ্যগর্ভের যে রূপটা এখন তিনি দেখছেন। খাপছাড়া রকম এ ধরনের অদ্ভুত একটি ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন হবার কল্পনা জীবনে করেন নি তিনি।

কেশব সামন্তের প্রসঙ্গ এসে পড়াতে সমস্ত মন সজাগ হয়ে উঠল তাঁর। হিরণ্যগর্ভের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে মেঘসুন্দর, বললেন—"মিল তো বন্ধ করে দিলে। কি হবে ওটা তাহলে এখন? অত যন্ত্রপাতি, অত বড় বাড়ি, এক শো বিঘে জমি, সব পড়ে থাকবে অমনি?"

"থাক্ না কিছুদিন। ভেবেচিন্তে পরে যা হয় কিছু ঠিক করা যাবে একটা।"

"আপাতত কোনও প্ল্যান নেই তাহলে তোমার?"

"ঠিক প্ল্যান নেই। কিন্তু আমি ভেবেছি মুরারিপুরে যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়টা স্থাপন করেছি, তার ছাত্রদের কাপড়ের কল সম্বন্ধে হাতে-কলমে কিছু শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করলে মন্দ হয় না এখানে। তারাই কলটা চালিয়ে হাতে-কলমে বুঝুক— মিল ভালো, না, চরকা ভালো।"

"এত আজগুবি বুদ্ধি মাথায় আসে তোমার! ছ্যা ছ্যা! লাল কালো যে কোনও কালিতে বল আমি লিখে দিচ্ছি যে, কিচ্ছু হবে না। পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খাবে সব। যন্ত্রটাতে প্রথমে জং লাগবে, তার পরে চুরি যাবে আস্তে আস্তে। কেশবকে যদি জিনিসটা এখন গছিয়ে দিতে পারতে, তোমার ঘরের টাকাটা ঘরে ফিরে আসত। আমারও কিছু হতো—"

"আপনার? আপনার কি হতো?"

"কেশব তার সুনরিঘাটার সমস্ত মহালটা বাঁধা রেখে আমার কাছে টাকা নিতে চাইছিল যে এর জন্যে। তুমি রাজী হয়ে গেলেই হয়ে যেত। সিক্স পার্সেন্ট সুদ দিতে চাইছিল সে। তোমার জবরদস্তিতে পরে স্যানাটোরিয়ামের জন্যে যে টাকাটা দেব বলেছি, সেটা স্বচ্ছন্দে উঠে আসত ওর থেকে। মাছের তেলেই মাছ ভাজা হয়ে যেত।"

হিরণ্যগর্ভ হাসিমুখে চেয়ে রইলেন, কোনও উত্তর দিলেন না। মেঘসুন্দর তখন তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"অহো আবার দেখ, আমরা নিজেদের ঘরোয়া কথা নিয়েই মেতে উঠেছি, তোমার সঙ্গে আলাপ করাই হচ্ছে না! তুমি কি জাতের কি ধাতের লোক তাও তো জানি না। কি নিয়ে কথা কইব তোমার সঙ্গে? রাজনীতি, সাহিত্য, কালোবাজার, না, ট্রেনের ভিড়—কিসের আলোচনা তোমার ভালো লাগবে তাও তো জানি না।"

"বেশ তো, রাজনীতি নিয়েই কিছু বলুন না।"

"ওবে বাবা! খবরের কাগজ আমি আমার ত্রিসীমানায় ঢুকতে দিই না। সকালবেলা উঠেই দুনিয়ার দুঃসংবাদ নিয়ে বেফয়দা মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। সে সময় বরং ভৈরবী বা টোড়ি ভাঁজলে কাজ দেয়। শেয়ার মার্কেটের খবরের জন্যে দু-একখানা কাগজ যা আসে তা মন্মথই দেখে। আমি খবর নিই রেডিও থেকে, ফোনও আছে। রাজনীতির বিষয় কিছু জানি না, জানতে চাইও না। একটি জিনিস জানি, যদি বল সেই সম্বন্ধেই কিছু শোনাতে পারি।"

"কি সেটা?"

"সঙ্গীত। তোমার তুঙ্গশ্রী নামটার অংশটা আমার বেশ ভালো লেগেছে। কারণ ওটা একটা রাগের নাম। তোমার নাম তুঙ্গশ্রী না হয়ে যদি মালবশ্রী হতো তাহলে আরও ভালো লাগত। শ্রী রাগের প্রথমা ভার্যার নাম মালবশ্রী। লতার মতো তন্বী, মুখে মৃদু হাসি, হাতে একটি রক্তকমল—এই তার বর্ণনা। শ্রী রাগের আলাপ শুনবে নাকি একটু? হিরণ, আমার বেহালাটা দাও তো, চেষ্টা করে দেখি একটু—"

হিরণ্যগর্ভ পাশের ঘরে গেলেন।

মেঘসুন্দর বলতে লাগলেন—"সারা জীবন গান নিয়েই আছি। ওই আমার শখ, ওই আমার স্বপ্ন"—বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন। তুঙ্গশ্রী দেখলেন, খোলা জানালাটার দিকে সোৎসুক নেত্রে চেয়ে আছেন তিনি, মুখে ফুটে উঠেছে একটা মৃদু হাসি, যেন স্বপ্নকে প্রত্যক্ষ করছেন।

হিরণ্যগর্ভ প্রবেশ করলেন বেহালা নিয়ে।

শুরু হয়ে গেল শ্রী রাগের আলাপ। দেখতে দেখতে অন্য রকম মানুষ হয়ে গেলেন তিনি। তাঁর সমস্ত মুখে আগ্রহ আর তৃপ্তির এমন অপূর্ব একটা সমন্বয় ফুটে উঠল যে, তাঁর মুখের চেহারাটাই বদলে গেল। তুঙ্গশ্রীর একটা ছবি মনে পড়ল। যখন জেলে ছিলেন, তখন একটি স্ত্রীলোক-কয়েদীর ছেলে হয়। সদ্যপ্রসূত শিশুটিকে সে যখন বসে দুধ খাওয়াত তখন সেই স্তন্যপানরত শিশুর মুখে যে ভাব ফুটে উঠত তাই যেন মেঘসুন্দরের মুখেও ফুটে উঠেছে, তুঙ্গশ্রীর মনে হল। অর্ধনিমীলিত নেত্রে তন্ময় হয়ে বেহালা বাজাচ্ছেন। মনে হচ্ছে যেন ক্ষুধিত শিশু প্রাণদ সুধা পান করছে। হঠাৎ ঝন ঝন করে উঠল পাশের ফোনটা। মেঘসুন্দরের মুখটা ব্যথাতুর হয়ে উঠল নিমেষে, চোখে ফুটে উঠল আতঙ্ক একটা, চোখ দুটো যেন বলে উঠল—ওই রে! বেহালা বন্ধ করে ফোনটা ধরলেন। কলকাতা থেকে ফোন এসেছে। ব্যবসা-সংক্রান্ত কি একটা জরুরী খবর। দুঃসংবাদ সম্ভবত। চোখে মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠল মেঘসুন্দরের। তড়বড় করে কত কি বলে গেলেন। শেষে বললেন, আবার ফোন করতে। ফোনটা নামিয়ে রেখে তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"রসভঙ্গ হয়ে গেল। সারা জীবনই এমনি হচ্ছে। আবার শুরু করি, কি বল?"

তুঙ্গশ্রীর অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই শুরু করলেন। কিন্তু এবারও শেষ হল না। ব্যাগ হাতে ডাক্তার রামচন্দ্র দাস প্রবেশ করলেন।

"তোমার আবার কি! এর মধ্যেই ইন্‌জেক্‌শনের সময় হয়ে গেল?"—একটু রুক্ষ কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন মেঘসুন্দর।

"নটা তো বেজে গেছে অনেকক্ষণ।"

"তা বাজুক, দাঁড়াও একটু।"

"বেশ তো, আমি অপেক্ষা করছি।"

বাধ্য কুকুরের মতোই একধারে গুটিশুটি হয়ে বসলেন রামচন্দ্র। কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে হল না তাঁকে। পরক্ষণেই মত পরিবর্তন করালেন মেঘসুন্দর।

"দাও, দিয়েই দাও। কানের কাছে ছুঁচ উঁচিয়ে বসে থাকলে স্বস্তি পাওয়া যায় না।"

ইনজেক্‌শন দিলেন রামচন্দ্র। তারপর বললেন—"ব্লাড প্রেসারটাও মাপা দরকার আজ।"

"মাপবে? মাপো।"

ব্লাডপ্রেসার মাপা হল।

"কত?"

"সিস্টোলিক দুশো দশ, ডায়াস্টোলিক একশো ষাট।"

"বিশেষ কমে নি তো তাহলে!"

"ওষুধটা খাচ্ছেন?"

"খাচ্ছি বইকি।"

"কমবে আস্তে আস্তে। বিশেষ কোন কষ্ট নেই তো আপনার?"

"আছে বইকি। রগের কাছটা সমানে টিপ টিপ করছে।"

পড়া বলতে না পারলে সেকালে গুরুমশাইরা ছাত্রের দিকে যেভাবে চেয়ে থাকতেন, তেমনি ভাবে মেঘসুন্দর চেয়ে রইলেন ডাক্তারের দিকে। ভাবটা—করছ তো অনেক কিছু কিন্তু

হচ্ছে না তো কিছুই। ডাক্তার মেঘসুন্দরের দৃষ্টি এড়িয়ে অন্যদিকে চেয়ে নিজের যন্ত্রপাতি গোটাতে লাগলেন। তাড়াতাড়ি গুটিয়ে চলে গেলেই পারতেন, কিন্তু অনিবার্য আর একটি প্রশ্ন তাঁকে করতে হল।

"আপনার হাঁটুর ব্যথাটা কেমন আছে?"

এর উত্তরে মেঘসুন্দর যা করে বসলেন, তা অত্যন্ত অদ্ভুত মনে হলে তুঙ্গশ্রীর। হঠাৎ তিনি দু হাতের বুড়ো আঙুল নেড়ে কীর্তনের সুরে গান ধরে দিলেন একটা—

হল না, কিছু হল না, কিছু হল না—
ওহে, ডিগ্রী পুচ্ছধারী
কত করলে তো রকমারি
কত কপচালে কত তড়পালে
কিছু হল না, কিছু হল না।
বলিহারি বলিহা—রি
ওহে বিলাতী-পেখমধারী
পেটেণ্টের মহাসমুদ্রে
কৌশলী কাণ্ডারী
কিছু হল না, কিছু হল না।

রামচন্দ্র এসবে অভ্যস্ত। সুতরাং চটলেন না। বরং গদগদ হবার ভান দেখালেন একটু।

"চমৎকার হয়েছে তো গানটা!"

"ভালো লাগল তোমার?"

"সুন্দর! আপনিই তৈরি করলেন নাকি?"

"না, আমি করব কেন। তোমার যে কম্পাউণ্ডার চটচটে মলম তৈরি করে সেই করে দিয়ে গেছে এসে।"

আর-একটু হেসে বিদায় নিলেন ডাক্তারবাবু।

মেঘসুন্দর তখন হিরণ্যগর্ভের দিকে চেয়ে বললেন—"তুমি তো বেশ লোক, ডাক্তারকে একবার জিগ্যেসও করলে না যে, কি ইন্‌জেক্‌শন দিচ্ছে, কি ওষুধ দিচ্ছে! পাথরের মতো বসে রইলে বেশ!"

"জিগ্যেস করে লাভ কি বলুন! ওর মতের সঙ্গে যদি না মেলে তাহলে একটা অশান্তির সৃষ্টি হবে শুধু। আপনি তো ওকে ছাড়বেন না।"

"তা বলে একবার জিগ্যেসও করবে না? ওই বাঁদরটার টেম্পারেচার নিচ্ছ তিন ঘণ্টা অন্তর এসে, আর তোমার কাকার খবরটা নিতে পার না একবার?" তারপর তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"উনি আবার হতে চান আমার উত্তরাধিকারী।"

"আমি হতে চাই না তো!"—বিস্মিত হিরণ্যগর্ভ বললেন।

"না হতে চাইলে খাবে কি, হাড়ির দুর্গতি হবে যে! এক-একটা আজগুবি খেয়ালে ব্যাঙ্কের টাকাগুলি তো উড়িয়ে দিচ্ছ সব।"

"আমি খরচ করেছি আমার রোজগার-করা টাকা। জমিদারির একটি পয়সা আমি খরচ করি না।"

"ওই যে তোমার মুরারিপুরের ইস্কুল, ওর খরচ তো তোমার জমিদারি থেকেই যায়।"

"প্রজাদের উপকারের জন্যে করা হয়েছে, জমিদারি থেকেই তাই ওর খরচটা দেওয়া হয়।"

"খাজনাও তো তেমন আদায় হয় না শুনতে পাই। যা খুশি কর।"

তারপর তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"এ রকম লোকের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হল কি করে? ও কি মানুষ? জার্মানি থেকে ডাক্তারি পড়ে এল—কোথায় ভালো জায়গায় বসে প্র্যাক্‌টিস করবে—তা নয়, সাপ ব্যাং ইঁদুর বাঁদর এই সব নিয়ে বসে আছে। বেদে একটা।"

তুঙ্গশ্রীর মনে এমন বিবিধ বিচিত্রভাবের দ্বন্দ্ব চলছিল যে, সহসা কোনও উত্তর দিলেন না তিনি। হিরণ্যগর্ভের দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন কেবল একটু। তাঁর এখানে আর বসে থাকতেও ইচ্ছে করছিল না। নির্জনে গিয়ে নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবাব জন্যে সমস্ত মন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কোন্ অজুহাতে যে উঠে পড়বেন তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। হঠাৎ একটা অভাবিত ঘটনা ঘটল। বাইরের বারান্দায় হিরণ্যগর্ভের বাঁদরটা চিৎকার করে উঠল।

"ওটার আবার কি হল?" উঠে পড়লেন হিরণ্যগর্ভ।

তুঙ্গশ্রীও উঠলেন।

"তোমরা চললে না কি? আলাপ শেষ হল না যে।"

"আমি আসছি এখুনি। বাঁদরটা চেঁচাচ্ছে কেন দেখে আসি।" তারপর তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"আপনি বসুন না।"

"চলুন, আমিও দেখে আসি একটু।"

উভয়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁদের প্রস্থান-পথের দিকে আকুল নয়নে চেয়ে রইলেন মেঘসুন্দর। তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন বলতে লাগল—"যেও না তোমরা। আর একটু বসে যাও। শ্রী রাগের আলাপটা শুনে যাও। বাঁদরের ডাকের চেয়ে ভাল জিনিস এটা।" সারাজীবনই তাঁর এই হচ্ছে। গানের আসর জমছে না কিছুতে। সমঝদারই নেই দেশে। পয়সা খরচ করে করে কত ওস্তাদ, কত বাইজী আনাচ্ছেন, কিন্তু তারা নিজের নিজের কেরামতি দেখাতেই ব্যস্ত। মেঘসুন্দরের আলাপ শোনবার আগ্রহ নেই কারও। জোর করে শোনাতে লজ্জা করে, আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। ডাক্তার রামচন্দ্রকে মাঝে মাঝে ডেকে শোনান, সে তারিফও করে; কিন্তু তার মুখভাব দেখে মনে হয় না যে, সে রসিক সমঝদার; মনে হয় একটা বিড়ালকে যেন জোর করে গোলাপ ফুল শোঁকানো হচ্ছে।

হিরণ্যগর্ভ বেরিয়ে দেখলেন, তাঁর বাঁদরের খাঁচার সামনে অ্যালশেসিয়ান কুকুরটা থাবা গেড়ে বসে আছে। নিবিষ্টচিত্তে দেখছে বাঁদরটাকে ঘাড় হেঁট করে।

"দুষ্টু।"

নাম শুনেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল দুষ্টু। সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তুঙ্গশ্রীর দিকেও তাকাল একবার। তারপর তাকিয়ে হঠাৎ উঠে এসে তুঙ্গশ্রীর কাপড়-চোপড় শুঁকলে ঘুরে ঘুরে। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তুঙ্গশ্রী।

"দুষ্টু, যাও, ভেতরে যাও।"

বাধ্য বালকের মতো চলে গেল দুষ্টু।

হিরণ্যগর্ভ হেসে বললেন—"বাঁদরটার ওপর ওর ভয়ানক হিংসে। এরকম পাজি একটা জানোয়ারকে এত তোয়াজ কেন করা হচ্ছে তা ওর বুদ্ধির অগম্য। মানুষই বুঝতে চায় না, ও তো একটা সামান্য কুকুর। কাকা, খরিণী, বাড়ির সবাই বাঁদরটার ওপর চটা। ওকে যে এত ভালো খাবার খেতে দি এটা কেউ বরদাস্ত করতে পারে না।"

"দেন কেন?" তুঙ্গশ্রী প্রশ্ন করলেন।

"ওর ভাইটালিটি বাড়াবার জন্য। আমি দেখাতেই চাই যে, ব্যাক্‌টিরিয়ারা অসুখের কারণ নয়, অসুখের কারণ ভাইটালিটির অভাব।"

বাঁদরটা মিটিমিটি চাইছিল হিরণ্যগর্ভের দিকে। যদিও এটা খাবার সময় নয়, তবু হিরণ্যগর্ভ পাশের বাক্স থেকে একটা পেয়ারা বার করে দিলেন তার হাতে। তারপর তুঙ্গশ্রীর দিকে ফিরে বললেন—"চলুন, কাকা বোধহয় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।"

"আমার আর যেতে ইচ্ছে করছে না হিরণবাবু। আমার শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।"

"চলুন, তাই বলে আসা যাক কাকাকে।"

আবার ফিরে এলেন দুজনে। ফিরে এসে দেখলেন হীরা বাইজী এসে গেছেন। তবল্‌চীও এসেছেন। তানপুরাতে সুর দেওয়া হচ্ছে, তবল্‌চী তবলা বাঁধছেন। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে চোখ বুঝে বসে আছেন মেঘসুন্দর। দুটো বিভিন্ন যন্ত্রের সুর দুটো, বিভিন্ন হাতের তাড়নায় শূন্যে এসে মিলছে কেমন করে—এরই রহস্য প্রণিধান করছিলেন তিনি তন্ময় হয়। তুঙ্গশ্রী আর হিরণ্যগর্ভ কখন এসে ঢুকলেন টের পেলেন না তিনি। ঘরের সমস্ত মেঝে কার্পেট দিয়ে মোড়া থাকাতে পদশব্দও হল না তেমন। হীরা বাইজীকে দেখে চমকে উঠলেন তুঙ্গশ্রী। এ কি, এ যে অলকা! তাঁর সহপাঠিনী ছিল স্কুলে। অলকাই হীরা বাইজী? অলকার গান বাজনার শখ ছিল বটে। অলকা তুঙ্গশ্রীর দিকে একটি পিছন ফিরে চোখ বুজে তানপুরায় ঝঙ্কার দিচ্ছিলেন, তুঙ্গশ্রীকে দেখতে পেলেন না তিনি। তুঙ্গশ্রী নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। হিরণ্যগর্ভ তুঙ্গশ্রীর কানের কাছে চুপি চুপি বললেন—"চলে যেতে চান তো এখুনি কাকাকে বলে সরে পড়ি চলুন। একবার আরম্ভ হয়ে গেলে ওঠা শক্ত হবে।"

"একটু শুনেই যাই।"—নিম্নকণ্ঠে উত্তর দিলেন তুঙ্গশ্রী।

"বেশ। আমি তাহলে ল্যাবরেটারি থেকে ঘুরে আসি একটু। আমার সেইটে ফুটছে, দেখে আসি কতদূর হল সেটা, কাকা যদি খোঁজ করে বলবেন।"

"আচ্ছা।"

সন্তর্পণে আবার বেরিয়ে গেলেন হিরণ্যগর্ভ।

তবলার সঙ্গে তানপুরার সুর মিশে গেল। মেঘসুন্দরের কুঞ্চিত ভ্রূ মসৃণ হয়ে গেল। তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল মুখে। স্নেহভরে চাইলেন তিনি বাইজীর দিকে। বাইজীও চোখ খুলে চেয়েছিলেন।

"কি গাইব আজ?"

"যা খুশি তোমার।"

দু-তিনবার গলা খাঁকারি দিয়ে তানপুরার উপর আঙুল চালাতে লাগলেন হীরা বাইজী ধীরে ধীরে। একটা গম্ভীর সুর মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল, মনে হতে লাগল একটা বিরাট কিছুর আবির্ভাব হচ্ছে যেন। সহসা হীরা বাইজী অভ্যর্থনা করলেন যেন সেই বিরাটকে—

তানা না দেরে দেরে তুম, দেরে দেরে তুম্
দ্রে দ্রে না দেরে দেরে না, দেরে না তা দিম্।
তা না দেরেনা দেরোনা দিম্
না দ্রে দ্রে তুম্ দ্রে দ্রে দিম্
তা দিম্ তা দারে দিম্, দেরে না তা দিম্।

তুঙ্গশ্রী যদিও কিছু বোঝেন না, এ গানে কথাও নেই তেমনি কিছু, তবু তিনি মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন। অলকার কৃতিত্বে চমৎকৃত হয়ে গেলেন। এমন একটা পরিবেশ যে কেবলমাত্র সুর দিয়ে সৃষ্টি করা সম্ভব—এ ধারণা ইতিপূর্বে ছিল না তুঙ্গশ্রীর। গরিবের ঘরে মানুষ তিনি, সত্যিকার সঙ্গীতসভায় প্রবেশ করার সুযোগই পান নি জীবনে। এমন তন্ময় হয়ে শুনছিলেন যে, পাশে কখন যে বিশু এসে বসেছে তা টেরই পান নি; হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে বলিষ্ঠ সুপুরুষ যুবকটিকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। বিশু ওরফে বিশ্বেশ্বর বিনোদিনীর নৃত্য-শিক্ষক। বিনোদিনীও এর মধ্যে কখন এসে যে মেঘসুন্দরের পাশে বসেছে তা টের পান নি তুঙ্গশ্রী। বেশ একটি চমৎকার শাড়ি আঁটসাঁট করে পরে এসেছে সে। চমৎকার মানিয়েছে। গান খুব জমে উঠেছে, এমন সময় এক কাণ্ড ঘটল। মেঘসুন্দরের সামনে যে দরজাটা খোলা ছিল সেখানে দারোয়ানটা এসে দাঁড়াল সেলাম করে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন মেঘসুন্দর।

"হুজুর, এক বাবু আপ সে মিলনে চাহতহেঁ। কুছ জরুরি কাম হ্যায়।"

"এ আবার কি আপদ এসে জুটল! আচ্ছা বোলাও।"

কাবুলি-স্যাণ্ডাল-পরা এক ছোকরা এসে হাজির হল একটু পরেই। গায়ে খাকি হাফশার্ট। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। এসে মেঘসুন্দরের দিকে চেয়ে বিনা ভূমিকাতেই বলল সে—"আমি আপনার যুগলগঞ্জ মিল থেকে এসেছি।"

"কি চান?"

"আমাদের ইউনিয়নের আজ বিকেলে একটা মীটিং হয়েছে, তারই রেজলিউশনগুলোর কপি আপনার কাছে এনেছি।"

"ম্যানেজার মন্মথবাবুকে দিন গিয়ে।"

"আপনাকেই দিতে চাই আমরা।"

"বেশ দিন।"

হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নিলেন মেঘসুন্দর। তারপর কাগজখানার দিকে চেয়ে বললেন—"কি আছে এতে?"

"পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

"তা তো পারব। তবু আপনার মুখ থেকেও শুনি—"

"আমাদের সাত দফা দাবি আছে, তা পূরণ করতে হবে। প্রথম, মাইনে অন্তত তিন গুণ করে দিতে হবে, দ্বিতীয়—"

"আপনি কি মিলে কাজ করেন?"

"আজ্ঞে না। আমি কলকাতা থেকে এসেছি।"

"ও!"—চোখের দৃষ্টি দপ করে জ্বলে উঠল মেঘসুন্দরের। আত্মসম্বরণ করে বললেন—"যাদের দুঃখ, কথাটা তাদের মুখ থেকেই শুনলে ভালো হতো না?"

"আমি তাদের মুখপাত্র হয়ে এসেছি। আপনার যা বলবার আমাকেই বলুন।"

কাগজটা খুলে মেঘসুন্দর বললেন—"এটা কি আল্টিমেটাম্?"

"হ্যাঁ।"

"হঠাৎ আল্টিমেটাম্ দেবার অর্থ বুঝতে পারছি না।"

"এরকম তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে বাইজীর গান শুনতে শুনতে এর অর্থ ঠিক বুঝতে পারবেন না। যদি বুঝতে চান—"

কথা আর শেষ করতে পারলেন না ভদ্রলোক। পর-মুহূর্তেই 'গণপৎ সিং' বলে মেঘসুন্দর এমন একটা চিৎকার করে উঠলেন যে, হকচকিয়ে থেমে যেতে হলে তাঁকে। গণপৎ সিং নামক ভীমকায় সশস্ত্র দারোয়ানটি দাঁড়াল এসে দ্বারপ্রান্তে।

"কান পাকাড়কো গরদানিয়া দেকে ইস্কো নিকাল দো।"

"চলিয়ে বাবু।"—একটু ইতস্তত করে বললেন দারোয়ান।

"কান পাকাড়কে লে যাও"—পুনরায় তারস্বরে আদেশ দিলেন মেঘসুন্দর। গণপৎ সিং সম্ভবত কান ধরেই টান দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার অবসর দিলে না ছোকরা। গণপৎ সিং কাছে আসতেই ঠাস করে একটা চড় মেরে বসল তাকে। ফলে গণপৎ সিংও উত্তেজিত হল। উত্তেজিত সিংহের কবলে মেষশাবকের যে দুর্দশা হয়, পরমুহূর্তেই ছোকরারও সেই দুর্দশা হল। কিল চড় লাথি মারতে মারতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে গেল তাকে গণপৎ সিং।

"অসভ্য ভূত কোথাকার! ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে জানে না—"

অস্ফুট কণ্ঠে কথা কটি উচ্চারণ করে অবনত মস্তকে বসে রইলেন খানিকক্ষণ মেঘসুন্দর। ধীরে ধীরে নিজের পক্ব কেশে হাত বুলোতে লাগলেন। মনে হল, কোনও এক অদৃশ্য গণপৎ সিং এসে তাঁকেও যেন ধর্ষণ করে গেছে। যখন মুখ তুললেন তখন সমস্ত মুখ বেদনাতুর। শিশুর হাত থেকে রঙিন খেলনা পড়ে ভেঙ্গে গেলে তার মুখভাব যেমন হয়, তাঁর মুখও তেমনি হয়ে গেছে যেন। ভাঙা খেলনাটার দিকে তবু হাত বাড়ালেন তিনি আবার। বাইজীর দিকে চেয়ে বললেন—"এমন জমাটি ইমনটা মাটি করে দিলে। আর জমবে কি? চেষ্টা কর তবু।"

আবার শুরু হয়ে গেল—"তা না দেরে দেরে তুম্—"

নিশ্চল পাথরের মতো বসেছিল তুঙ্গশ্রী। কিন্তু সেই পাথরের তলায় টকবগ করে ফুটেছিল নিরুদ্ধ লাভা-স্রোত। তাঁর কানে গান আর ঢুকছিল না। মেঘসুন্দরের বজ্রকণ্ঠের আদেশটাই বারংবার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল তাঁর কানের কাছে—কান পাকাড়কে গরদনিয়া দেখে ইস্কো নিকাল দো! অপমান করে মেরে দূর করে দিল! ক্রোধে অপমানে চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল তাঁর। ছেলেটিকে ইতিপূর্বে কখনও দেখেছেন বলে তো মনে পড়ল না তুঙ্গশ্রীর। তাঁদেরই পার্টির লোক কি? হওয়া অসম্ভব নয়। সকলকে তিনি তো চেনেন না। এ অঞ্চলে কেশববাবুর লোকেরাই তো কাজ করে। একটা ক্ষোভও ঘনিয়ে উঠল ধীরে ধীরে। তাঁর মনে হতে লাগল, আহা, এই কাজের ভারটাও যদি তাঁর উপরে থাকত তাহলে আজ দেখিয়ে দিতেন শ্রমিকের রক্ত শোষণ করার প্রায়শ্চিত্তটা কি করে করতে হয়। রিভল্বারের এক গুলিতে উড়িয়ে দিতেন তিনি ওই ঝুনো খুলিটা। স্পর্ধিত শির লুটিয়ে পড়ত রক্তাক্ত হয়ে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল রিভল্বারটা চুরি গেছে। হিরণ্যগর্ভের মুখটা মনে পড়ল। দ্বারের দিকে ফিরে

তাকালেন একবার। না, তিনি এখনও আসেন নি। ল্যাবরেটারির কাজে মশগুল হয়ে গেছেন হয়তো। সেই সাপটাকে মনে পড়ল—অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন খানিকক্ষণের জন্যে। এই খানিকক্ষণ কিন্তু অনন্তকাল মনে হল তাঁর কাছে। মনে হল, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের সমস্ত খেই হারিয়ে অতি অস্পষ্ট একটা ভেলায় অকূল সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছেন যেন, কোন্‌দিকে চলেছেন তার ঠিক নেই, যেটাকে দ্বীপ বলে মনে হয়েছিল সহসা সন্দেহ হচ্ছে—সেটা দ্বীপ নয়, কুণ্ডলীকৃত প্রকাণ্ড সরীসৃপ একটা ওত পেতে আছে, কাছে গেলেই গ্রাস করে ফেলবে। মেঘসুন্দরের ব্যবহারে তাঁর সমস্ত দেহে মনে আগুন ধরে উঠেছিল, এই পুঁজিবাদী অলস ধনীরাই যে দেশের দুর্দশার আসল কারণ, এর আর-একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে এর বিরুদ্ধেই যে সারাজীবন যুদ্ধ করে কাটাতে হবে—এ সঙ্কল্পটাকে পুনরায় মনে মনে দৃঢ় করে তুলছিলেন তিনি। কিন্তু সংশয়ের যে ক্ষুদ্র ফাটলটা ক্রমশ বড় হয়ে উঠছিল সেটার দিকে হঠাৎ চেয়ে তিনি অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগলেন। সহসা তাঁর মনে হল, সত্যিই তো, কেশব সামন্তর সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানেন তিনি! জেল থেকে বেরিয়ে নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় কলকাতায় এসে যখন সকলের সহানুভতি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন তখন ওই কেশব সামন্ত তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিল বলে তিনি কৃতজ্ঞতায় এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর গুণাগুণ খুঁটিয়ে দেখবার অবসরই হয়নি। ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পেয়ে আরও মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। সাম্যবাদী শুনে, জমিদারের ছেলে হয়েও তিনি যে রাশিয়ান সাম্যবাদের স্বপক্ষে, একটা বিস্ময় উদ্রেক করেছিল তাঁর, অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এখন সহসা তাঁর মনে হচ্ছে, কেশব সামন্তর ভিতরের খবর, পারিবারিক খবর কিছুই তো তিনি জানেন না। তাঁর বক্তৃতা শুনেছেন, কিন্তু আসল লোকটার পরিচয় পেয়েছেন কি? গাঁজা চাষ করতে চান তিনি হিরণবাবুর জমিটা নিয়ে? তাই মিলটা ডিনামাইট নিয়ে উড়িয়ে দেবার প্রস্তাবে অত সাগ্রহে রাজী হয়েছিলেন? পূর্ববঙ্গে মিল করবার একটা স্কীম করেছিলেন বটে।—খানিকক্ষণের মধ্যে অনেক কথাই তাঁর মনের মধ্যে খেলে গেল। কেশব সামন্তকে ঘিরে তাঁর নবজাগ্রত যৌবনের গোপনে যে স্বপ্ন রচনা করে চলেছে, যে স্বপ্নকে আচারে ব্যবহারে আভাসে ইঙ্গিতে রঙিনতর করে তুলেছেন কেশব সামন্ত নিজে, তা কি স্বপ্নের মতোই মিলিয়ে যাবে শেষে! অতিশয় অযৌক্তিকভাবে তাঁর মন রুখে দাঁড়াল। সব মিথ্যা, এরা শত্রুপক্ষ, বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বলছে সব। কিন্তু মেঘসুন্দর তো জানেন না যে, তুঙ্গশ্রীর সঙ্গে কেশব সামন্তর কোনও সম্পর্ক আছে। তিনি তাহলে শুধু শুধু মিথ্যার আশ্রয় নিতে যাবেন কেন? কিন্তু না, অযৌক্তিকভাবে বলে উঠল আমার তাঁর মন—মিথ্যা, এরা যা বলছে সব মিথ্যা...

হঠাৎ সমে এসে থেমে গেল গানটা। তুঙ্গশ্রী আত্মস্থ হলেন এবং ফিরে চাইলেন বাঈজীর দিকে। নূতন করে বিস্ময় জাগল আবার অলকাকে দেখে। ও কি এখন তাঁকে চিনতে পারবে?

"বাঃ, চমৎকার! বেঁচে থাক, দীর্ঘজীবি হও।"—সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন মেঘসুন্দর। মেঘসুন্দরের প্রতি তুঙ্গশ্রীর সমস্ত চিত্ত বিরূপ হয়ে উঠেছিল। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। কি করে লোকটার দম্ভ চূর্ণ করা যায়? কেশব সামন্তর সহায়তায় হয়তো পারা যেত, কিন্তু তিনি যদি—নিজের মনের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন তুঙ্গশ্রী। এর মধ্যেই কেশব সামন্তকে অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন তিনি নিজেও। না, না, ভুল হচ্ছে।

"বিনুর নাচটা দেখবে নাকি আজ?"—মেঘসুন্দরের কথায় মন দেবার চেষ্টা করলেন তুঙ্গশ্রী।

"বেশ তো।" হেসে জবাব দিলেন বাইজী—"আমি সেতার বাজাই।"

"শুরু হয়ে যাক তাহলে; নূপুর এনেছিস? বিশু কোথা গেল?"

বিশু বিনু দুজনেই উঠে দাঁড়াল। প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন দুজনেই। নাচ শুরু হয়ে গেল। অপূর্ব নাচ। নূপুরের নিক্কণ, তবলার বোল সেতারের ঝঙ্কারের সঙ্গে বিনোদিনী আর বিশ্বশ্বরের সুললিত অঙ্গভঙ্গি যে সুরলোক সৃষ্টি করে তুলল তুঙ্গশ্রীও তাতে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। তাঁর হৃদয় অঞ্জলি ভরে যেন সুধা পান করতে লাগল এই আনন্দ-প্রস্রবণ থেকে। মনে হল সারাজীবন অজ্ঞাতসারে যা তিনি সন্ধান করেছেন তা অপ্রত্যাশিতভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে যেন এই তরুণ-তরুণীর যুগলনৃত্যের মধ্যে। সুরে তালে ছন্দে মূর্ছনায় জীবনকে তিনিও তো উপভোগ করতে চান প্রিয়তমের সঙ্গে, দানে ও গ্রহণে, আনন্দসৃষ্টি ও পরিবেশন করে। আদর্শ জীবনের এই তো রূপচ্ছবি। শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল মেঘসুন্দর। চোখের দৃষ্টি থেকে আনন্দ যেন উপচে পড়ছিল তাঁর, হিল্লোলিত হচ্ছিল সর্বাঙ্গ। আনন্দের সাগরে সন্তরণ করে বেড়াচ্ছিলেন তিনি যেন। আবার কিন্তু রস-ভঙ্গ হল। পিছনের একটা দ্বার দিয়ে নিঃশব্দ চরণে শিখরিণী প্রবেশ করে মেঘসুন্দরের কানে কানে কি যেন বললে। বলতেই সমস্ত মুখটা বিরক্তিতে ভরে উঠল তাঁর।

"মন্মথ এখনই আবার যেতে চায়? কেন?"

"জগন্নাথপুরের সেই বাঁধটা নিয়ে দাঙ্গা হবার সম্ভাবনা আজ রাত্রে। কেশবাবুর লোকেরা বাঁধটা জোর করে কেটে দিতে চায় নাকি।"

"কেশব তো ভারি জ্বালালে দেখছি। আচ্ছা, মন্মথকে পাঠিয়ে দে এখানে।"

শিখরিণী চলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্যগর্ভ প্রবেশ করলেন অপর দিক দিয়ে। বাধা পড়াতে নাচ থেমে গিয়েছিল।

হীরা বাইজী বললে—"চমৎকার নাচতে শিখেছে আপনার নাতনী।"

"মাস্টারটি ভালো পাওয়া গেছে কিনা।"

হীরা বাইজী হাসিমুখে বিশ্বেশ্বরের দিকে চাইলেন।

"আপনি শিখেছিলেন কোথা?"

"কাশীতে। কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলাম, উদয়শঙ্করের কাছেও ছিলাম—"

"ও আমাদের এখানকারই ছেলে। ওর বাপ ছিল ছুতোর। আমাদের এ অঞ্চলে একটা যাত্রাপার্টি ছিল, তাতেই ওর নাচ দেখলাম একদিন। মনে হল বাঃ, বেশ নাচে তো, ওকে ভালো করে শেখালে বড় নাচিয়ে হবে। আমিই খরচ দিয়ে পাঠাই ওকে কাশীতে।"

"চমৎকার শিখেছেন।" খানিকক্ষণ নীরবতার পর হীরা বাইজী বললেন—"আমি আজ তাহলে উঠি এবার।"

"উঠবে? তা বেশ। মন্মথ আবার এক বখেড়া জুটিয়েছে—"

"আমিও যাই।"—বিশ্বেশ্বর বললে।

"বেশ। তুই তোর বাসা উঠিয়ে এনেছিস?"

"হ্যাঁ, আমি ওই আউট হাউসটারই এক ধারে আছি এখন।"

"বেশ। আপাতত ওখানেই থাক। তোর ঘর আমি করিয়ে দেব।"

বাইজী, তবল্‌চী, বিশ্বেশ্বর চলে গেল।

বিনোদিনীর দিকে চেয়ে মেঘসুন্দর বললেন—"আমার বসন্ত-কুসুমাকরটা নিয়ে এস তাহলে এবার।"

বিনোদিনীও চলে গেল।

হিরণ্যগর্ভ তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"আমরাও এবার উঠি, চলুন।"

মেঘসুন্দরের দিকে চেয়ে তারপর বললেন—"আমরাও এবার উঠি কাকু।"

"একটু বসে যাও। জগন্নাথপুরের বাঁধ নিয়ে মন্মথ কি আবার কাণ্ড বাধিয়েছে শুনে যাও সেটা। আঃ, আর পারা যায় না।"

"কি কাণ্ড?"

"কি জানি?"

পর মুহূর্তে মন্মথ এসে প্রবেশ কবলেন। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ। পরিধানে ব্রিচেস, মিলিটারী কোট, মিলিটারী বুট। কাঁদে একটা ওয়াটার প্রুফ, হাতে বন্দুক।

"ও বাবা, তুমি যে একেবারে মিলিটারী বেশে এসে হাজির হলে!"

মন্মথ সিং স্বল্পভাষী লোক। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা বলেন না। কিছু না বলে তিনি পাশের চেয়ারটায় উপবেশন করলেন।

"কি হয়েছে বল দেখি?"

"কেশব সামন্ত তার সমস্ত জেলে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে। তারা শুনলাম আজ জোর করে এসে বাঁধটা কেটে দেবে। বাধা দেবার জন্যে আমিও লোকজন ঠিক করে এসেছি। আমাকে নিজেও গিয়ে থাকতে হবে।"

"কেশব নিজে এসেছে?"

"না। বাইরে থেকে একটি মেয়ে এসেছে, শিডিউল্ড কাস্টের। বীরা তার নাম। কয়েকদিন থেকেই সে নাকি ঘুরে বেড়াচ্ছে তার জমিদারিতে। জেলেদের মনে এই ধারণা করিয়ে দিয়েছে যে, আমরা নাকি জেলেদের ব্যবসাটা নষ্ট করে দেবার জন্য বাঁধ কাটতে দিচ্ছি না। বাঁধ না কাটতে দিলে ওদের বিলে জল ঢুকবে না, মাছ হবে না, ওদের ব্যবসা নষ্ট হবে।"

"কিন্তু বাঁধ কাটলে আমাদের প্রজাদের হাজার হাজার বিঘে জমি ডুবে ফসল নষ্ট হবে যে!"

"তাতে ওদের কি? ওরা জোর করে বাঁধ কাটবে।"

"তাহলে উপায়?"

"জোর করে রুখতে হবে।"

"ভেতরে মেয়েমানুষ রয়েছে, শেষকালে আবার একটা ফ্যাসাদে না পড়ে যাও। তুমি কি বল হিরণ?"

হিরণ্যগর্ভ বললেন—"রুখতে হবে জোর করে বা বুদ্ধি করে—যেমন করে হোক। তা ছাড়া উপায় কি?"

মন্মথ হিরণ্যগর্ভের দিকে চেয়ে বললেন—"তুমি আসবে আমার সঙ্গে?"

"ঠিক এখনই তো যেতে পারছি না। জেল্‌ড্‌হাল চড়িয়েছি একটা, কয়েক ঘণ্টা পরে যেতে পারি।"

"বেশ যদি দরকার বুঝি তোমার কাছে হাতি পাঠাব।"

"আচ্ছা।"

"আমি তাহলে চলি।"

মন্মথ সিং চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেঘসুন্দরের চোখ দুটি হাস্যপ্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

"জগৎ সিংহ আর ওসমানে লেগে গেল আবার। তুমি যদি তোমার ওই জমিটা ওকে দিতে হিরণ, তাহলে মিটমাট হয়ে যেত। খুব বুদ্ধিমানের কাজ হতো সেটা!"

"আপনিই বা শিখরিণীর সঙ্গে ওর বিয়ে দিলেন না কেন, তাহলে তো কিছুই হতো না!"

"অন্য জাত যে। একজাত হলে কি আপত্তি করতুম?"

মৃদু হেসে চুপ করে রইলেন হিরণ্যগর্ভ। জাতিভেদের কুসংস্কার নিয়ে কাকার সঙ্গে আর তর্ক করতে ইচ্ছা হল না তাঁর। বহুবার করেছেন, কোনও ফল হয় নি। মেঘসুন্দর তাঁর সেকেলে মতামত কিছুতেই ছাড়তে পারবেন না। পারলে কেশব সামন্তর সঙ্গে সম্পর্কটা তিক্ত না হয়ে মধুর হতো।

"আমরা তাহলে চলি।"

"এস।"

তুঙ্গশ্রী আর হিরণ্যগর্ভ উঠে চলে গেলেন। হিরণ্যগর্ভ বেরিয়ে আবার তাঁর বাঁদরের খাঁচাটার কাছে দাঁড়ালেন কিছুক্ষণ। তুঙ্গশ্রী এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নি। তাঁর সমস্ত অন্তর জুড়ে একটি প্রশ্নই জাগছিল কেবল—বীরা? শিডিউল্‌ড কাস্টের মেয়ে? কই, কখনও এর নাম শুনি নি তো কেশববাবুর মুখে? কলকাতার মেয়ে কি?...

সবাই যখন চলে গেল, নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন মেঘসুন্দর। অত্যন্ত অসহায়ের মতো বসে রইলেন। বার বার তিনি গড়ে তুলছেন, বার বার ভেঙে যাচ্ছে। নিজের আকাঙ্ক্ষিত লোকে কিছুতেই তাঁকে থাকতে দিচ্ছে না কেউ, বার বার সেখান থেকে টেনে নামিয়ে আনছে।... অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বেহালাটি আবার তুলে নিলেন তিনি। খানিকক্ষণ বাজিয়ে নিজের তৈরী একটি গান গুনগুন করে গাইতে লাগলেন বেহালার সঙ্গে—

এ কি মাটি এ দেশের যাহা গড়ি ভেঙে যায়,
যত গড়ি সযতনে কিছুতে থাকে না হায়।
তবুও জানি না কেন হৃদয়ে বাসনা হেন,
শতবার ভেঙে গেছে আবার গড়িতে চায়।
জীবনের বেলা-ভূমে বালু নিয়ে এ কি খেলা,
নামিছে আঁধার ওই শেষ হয়ে এল বেলা।
ছল ছল করে জল বায়ু বলে চল চল,
ভাঙা গড়া নিয়ে শুধু বসে থাকি অসহায়।

"দাদু!"

বিনোদিনী এসে দাঁড়াল—হাতে তার খল।

"আঃ, একদণ্ড কি স্বস্তি দিবি না তোরা আমাকে?"—আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন মেঘসুন্দর।

"বা রে, তুমিই তো আনতে বললে বসন্তকুসুমাকর।"

অভিমানে ফুলে উঠল বিনোদিনীর ঠোঁট দুটি।

"কই দে।"

খলটা তার হাত থেকে নিয়ে স্নায়ুস্নিগ্ধকর ওষুধটা চেটে চেটে খেতে লাগলেন মেঘসুন্দর।

তিন

বাগানটা পার হতে হতে হিরণ্যগর্ভ তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"কাকুকে কেমন লাগল?"

"সাধারণ বড়লোকেরা যেমন হয় তেমনি।"

"তা তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু সাধারণ বড়লোক হওয়ার জন্যে যে শাস্তিটা উনি পাচ্ছেন সেটা চোখে পড়ল? টাকা ওঁর অনেক আছে, কিন্তু ওঁর দুঃখের অন্ত নেই। বেশি টাকা থাকার ফলে ব্যাধি জুটেছে অনেকগুলি—বাত, বহুমূত্র, হাই ব্লাডপ্রেসার। টাকার লোভে ডাক্তারও জুটেছে এমন, যার উদ্দেশ্য ওঁকে চিকিৎসা করা নয়—তুষ্ট রাখা। গালাগালি খেয়েও নড়বে না লোকটা, টাকার লোভে যখন তখন এসে পা চাটছে কুকুরের মতো। চিকিৎসা কিছু হচ্ছে না জেনেও উনি ওকে তাড়িয়ে দেবেন না, কারণ ওঁর পারিষদ দরকার একজন। সত্যিকার চিকিৎসা উনি সহ্যও করতে পারবেন না। রোগও সারছে না, টাকাও খরচ হচ্ছে। এ ছাড়াও খুঁটিনাটি নানারকম অশান্তি লেগেই আছে। দশবার ফোন আসছে কলকাতা থেকে। জমিদারিতে একটা না একটা হুজ্যুত লেগেই আছে। নানা ধরনের লোক এসে নানাফন্দি ঢুকিয়ে দিচ্ছে মাথায়—কি করে কোথায় টাকা খাটালে বেশি সুদ পাওয়া যাবে, আর সেই সব ফন্দিতে পড়ে উনি চিন্তার বোঝা বাড়িয়েই চলেছেন। অথচ আসলে উনি হচ্ছেন আর্টিস্ট, সত্যিকার সঙ্গীত-শিল্পী কিন্তু সেটা—"

হিরণ্যগর্ভের কথার মাঝখানেই তুঙ্গশ্রী প্রশ্ন করলেন একটা। যদিও অবান্তর শোনাল, তবু না করে পারলেন না তিনি।

"আচ্ছা, কেশব সামন্তর সঙ্গে আপনার আলাপ কত দিনের?"

"ওর সঙ্গে আমি একসঙ্গে ছেলেবেলায় পড়েছি স্কুলে। ওর তো এই অঞ্চলেই বাড়ি, আমাদের ঠিক পাশেই জমিদারি ওর। ওর বাবার সঙ্গে আমার বাবার বন্ধুত্বও ছিল—আমাদের বাড়িতেই তো আড্ডা ছিল ওর।"

"তাহলে এখন এত শত্রুতা কেন?"

"তার অনেকগুলো কারণ আছে। আমার ওপর ছেলেবেলা থেকেই ওর হিংসে—ক্লাসে কখনও ফার্স্ট হতে পারত না বলে। স্কুলের সমস্ত মাস্টারকে একসঙ্গে প্রাইভেট টিউটর রেখেছিল তবু পারে নি। তারপর—। কিন্তু এসব কথা বলা ঠিক হচ্ছে না, আপনি হয়তো ভাববেন, মিছিমিছি তার নামে নিন্দে করছি। আপনি হলেন তার বন্ধু একজন। তাছাড়া ওর কথা বলতে গেলেই এমন একটা কাজ করতে হবে, যা আমি করতে নারাজ।"

"কি সেটা?"

"নিজেদের প্রশংসা।"

কিছুক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করলেন দুজনে।

"আচ্ছা, শিখরিণীর সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল নাকি?"

"সম্বন্ধ ঠিক হয় নি। ও আগে তো আমাদের বাড়িতে আসত যেত, শিখরিণীকে ভালো লেগেছিল ওর খুব। বাবা মারা যাবার পর কাকার কাছে ও বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠায়। কিন্তু কাকা তাতে রাজী হন নি। তারপর থেকে ও আরও ক্ষেপে গেছে যেন. কিসে আমাদের অনিষ্ট হয় ক্রমাগত তারই চেষ্টা করছে।"

"কি রকম ধরনের চেষ্টা? জমিদারি নিয়ে খিটিমিটি?"

"জমিদারি নিয়ে খিটিমিটি নয় ঠিক। যে ধরনের চেষ্টার ফলে আপনি এসেছেন, বীরা দেবী বলে আর-একজন কে এসেছেন এখনি শুনলাম। জমিদারদের ধ্বংস কর, পুঁজিবাদীদের ধ্বংস কর, মুনাফাখোরেরা দেশের সর্বনাশ করছে—এই যে সব ধুয়ো উঠেছে আজকাল—এইগুলোর সুযোগ নিয়ে ও আমাদের বিপন্ন করবার চেষ্টা করছে। এখানে আমাদের সবাই চেনে, তাই বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না। ওর নিজের জমিদারিতে নিজের দলের মধ্যেও এমন অনেক লোক আছে যারা ওর ওপর চটা, যাবা আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। ওর অনেক কুমতলব আমাদের কাছে ফাঁস করে দেয় তারা। এই যেমন আপনার আসাটা আগেই জানতে পেরেছিলাম আমি। আমাদের কিছু করতে না পেরে ও আরও চটে যাচ্ছে। বাইরে থেকে লোক আমদানি করছে।"

একটু বাঁকা হাসি হেসে তুঙ্গশ্রী বললেন—"কিন্তু এও তো হতে পারে যে, এটা ব্যক্তিগত রাগ নয়, মতবিরোধ। উনি ক্যাপিটালিজ্‌মের বিরোধী, তাই আপনাদের সঙ্গে বিরোধ বাধছে। এটা তো ঠিক যে, উনি জমিদার হয়ে থাকতে চান না। ওঁর বক্তৃতা পড়েছেন নিশ্চয় কাগজে।"

"বক্তৃতা পড়ি নি, কিন্তু ইচ্ছে করলেও উনি বোধ হয় জমিদার হয়ে আর থাকতে পারবেন না। কারণ জমিদারি বাঁধা দিয়ে যে পরিমাণ টাকা ধার নিয়েছেন, তাতে জমিদারি আর বেশিদিন থাকবে না ওঁর হাতে। সুতরাং এখন জমিদারির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করাতে অলাভ নেই ওঁর। তাছাড়া ভবিষ্যতে সব জমিদারই উঠে যাবে। এখন ওটাকে আঁকড়ে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজও নয়। ওই জামিদারি থেকে যে কোনও উপায়ে হোক যতটা সম্ভব নগদ টাকা তুলে সরে পড়াই ভালো। কেশব করছেও তাই।"

"অত নগদ টাকা দিয়ে কি করবেন উনি?"

"তা তো জানি না।"

আবার কিছুক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করলেন দুজনে।

হঠাৎ তুঙ্গশ্রী আবার বলে উঠলেন—"কিন্তু যাই বলুন আপনি, আমি ওঁর যতটা দেখেছি তাতে আমার ধারণা যে, উনি খুব উঁচুদরের দেশপ্রেমিক একজন। আপনারা ক্যাপিটালিস্ট কিনা তাই—"

কথাটা বলে তাঁর নিজেরই মনে হল, তিনি যেন নিজের কাছে জবাবদিহি করছেন। তাঁর নিজের মনের সন্দিগ্ধ অংশটাকে স্তোক-বাক্যে নিশ্চিন্ত করবার চেষ্টা করছেন।

হিরণ্যগর্ভ হেসে উত্তর দিলেন—"আমি ক্যাপিটালিস্ট নই—সে কথা তো আগেই বলেছি আপনাকে। কিন্তু আপনাদের সঙ্গেও আমার মতের মিল নেই। জু মাত্রেই খারাপ—এ কথা মনে করে হিটলার যেমন ভুল করেছিল, মুসলমান মাত্রেই খারাপ—এ কথা মনে করে যেমন ভুল করেছেন অনেকে, আপনারাও তেমনি ভুল করছেন ক্যাপিটালিস্ট মাত্রেই খারাপ এই কথা ভেবে। কিন্তু এ কি করলাম আমরা—আপনি যে আমার বাড়িতে চলে এলেন, আপনার শোবার কথা যে ও-বাড়িতে। একা ফিরতে পারবেন? চলুন, আবার না হয় পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"এসেই পড়েছি যখন আপনার ল্যাবরেটারিটা দেখেই যাই না হয় আর একবার। জেল্‌ঢাল না কি করছেন বললেন, ব্যাপারটা কি?"—একটু হেসে ছদ্ম-কৌতূহল প্রকাশ করলেন তুঙ্গশ্রী। আসলে তাঁর উদ্দেশ্য কেশব সামন্ত সম্বন্ধে আর-একটু আলোচনা করা।

"জেল্‌ডহাল হচ্ছে নাইট্রোজেন এস্টিমেশন।"

"কি উদ্দেশ্যে করছেন?"

"তাহলে বক্তৃতা দিতে হয়। তা এখন আপনারও ভালো লাগবে না, আমারও না।"

ল্যাবরেটারির ভিতরে ঢুকেই প্রথমে একটা ঘর্ঘরধ্বনি শোনা গেল। হিরণ্যগর্ভ ঘাড় ফিরিয়ে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলেন। তুঙ্গশ্রীও দেখতে পেয়েছিলেন। নরেন টেবিলের উপর পা তুলে চেয়ারে ঠেস দিয়ে নাক ডাকাচ্ছে।

"নরেন—"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল নরেন। পা লেগে টেবিলের উপর দোয়াতটা উলটে পড়ল।

"আমার গ্রাফ হয়ে গেছে।"

"কই, দাও।"

গ্রাফের দিকে চেয়ে কিন্তু নরেনের বাক্যস্ফূর্তি হল না আর। দোয়াতের সমস্ত কালিটা গ্রাফের উপর পড়েছে।

"কি হল?"

"কালি পড়ে গেছে।"

হিরণ্যগর্ভ এগিয়ে গিয়ে দেখলেন। নরেনের মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"আজ অভদ্রা লেগেছে, কাল কোরো। যাও, আজ ঘুমোও গে যাও। তার আগে এক কাজ কর, এঁকে পৌঁছে দিয়ে এস। খাতাটা রেখে দাও আমার ড্রয়ারে।"

নরেন খাতাটা নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। তুঙ্গশ্রী হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, হিরণ্যগর্ভ তাঁর সঙ্গে এখন আর গল্প করতে রাজী নন।

"আপনি নরেনের সঙ্গে যান তাহলে, অনেক রাত হয়েছে।"

"আপনি এখন শোবেন বুঝি?"

"শোব। তবে শুয়ে শুয়ে পড়াশোনা করব একটু। ও হ্যাঁ, একটা কথা—আপনি কাল সকালেই ফিরে যাচ্ছেন কি?"

"আপনি ছেড়ে দিলেই যেতে পারি।"

হিরণ্যগর্ভের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"আমার কাজ তো হাঁসিল হয়ে গেছে, আর আপনাকে আটকে রেখে কি করব? তবে আপনি যদি থাকতে চান খুব খুশী হব আমি।"

"এসেছি যখন, দেখেই যাই এ অঞ্চলটা।"

"বেশ। কাল সকালে দেখা হবে তাহলে। এখানেই চা খান না কাল সকালে।" তারপর হেসে বললেন—"সাপটাকে অবশ্য আমি সামলে রাখব।"

"কিন্তু আপনি কাল সকালে থাকবেন কি? মন্মথবাবু যে বলে গেলেন, জগন্নাথপুরে যেতে হতে পারে।"

"ও, হ্যাঁ ঠিক তো। হাতি এলে যেতে হবে।"

এর পর-মুহূর্তেই তুঙ্গশ্রী যে অনুরোধটি তাঁকে করে বসলেন তার জন্যে হিরণ্যগর্ভ তো প্রস্তুত ছিলেনই না, তুঙ্গশ্রী নিজেও ছিলেন না। তাঁর অবচেতন মানসে অগোচরে যে বাসনাটা জেগেছিল, হঠাৎ সেটা বাঙ্ময় হয়ে ওঠাতে নিজেই একটু লজ্জিত হয়ে পড়লেন তিনি।

"আপনি যদি যান, আমাকেও নিয়ে যাবেন আপনার সঙ্গে?"

"কোথা? জগন্নাথপুরে? সেখানে দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে আপনার যাওয়াটা কি ঠিক হবে? গুলিও চলতে পারে।"

"গুলিতে তত ভয় করি না।"—মৃদু হেসে উত্তর দিলেন তুঙ্গশ্রী।

"ও, আপনি টেররিস্ট ছিলেন—সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।"

"আমার রিভল্‌বারটা ফেরত দেবেন না?"

"নিশ্চয় দেব। এখনই চাই?"

"না, কাল নিলেও চলবে।"

হিরণ্যগর্ভ ভ্রূকুঞ্চিত করে কি ভাবছিলেন।

"সত্যি আপনি যেতে চান?"

"আপনার যদি আপত্তি না থাকে।"

"বেশ, চলুন।"

নরেন ফিরে এল পাশের ঘর থেকে।

হিরণ্যগর্ভ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার বাইকটা এখানে আছে?"

"আছে।"

"তুমি এঁকে পৌঁছে দিয়ে বোঁ করে মহাবীর জেলেকে একবার ডেকে নিয়ে এস তো।"

"আচ্ছা।"

"আপনি তাহলে যান এর সঙ্গে।"

হিরণ্যগর্ভ ঢুকে গেলেন নিজের ল্যাবরেটারির ভিতরে। নরেনের অনুগমন করে আবার সেই বাগানটা পার হতে লাগলেন তুঙ্গশ্রী। মিনিটখানেক নীরবতার পর তুঙ্গশ্রী আর লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না। অশোভন প্রশ্নটা করেই ফেললেন।

"আচ্ছা, হিরণবাবু লোক কেমন বলুন তো?"

"দেবতুল্য লোক। আমি এরকম লোক জীবনে কখনও দেখি নি।"

এর পর আর কোন প্রশ্ন করার দরকারই মনে হল না তুঙ্গশ্রীর। যে লোককে একটু আগে এত বকছিলেন হিরণ্যগর্ভ, তার মুখে এ কথা শোনার পর আর কোন সংশয় রইল না তাঁর। তিনি আশা করেছিলেন যে, এই ছোকরা অন্তত তাঁর বিরুদ্ধে বলবে কিছু। আর একটু এগিয়েই দেখতে পেলেন, একটি ন্যুব্জপৃষ্ঠ বৃদ্ধ লাঠি হাতে ঠুক ঠুক করে এগিয়ে আসছেন। নরেনকে দেখেই থেমে গেলেন তিনি।

"কে বাবা নরেন? বন্ধ করে বাড়ি চললে নাকি? আমার একটু দেরি হয়ে গেছে বাবা আজ। ফিরে যাব?"

"না, আপনি বসুন গিয়ে, আমি আসছি।"

বৃদ্ধ ল্যাবরেটারির দিকে এগিয়ে গেলেন।

তুঙ্গশ্রী প্রশ্ন করলেন—"কোনও রুগী না কি?"

"না। উনি হচ্ছেন কেশববাবুর শ্বশুর। মাসোহারা নিতে এসেছেন।"

"কেশব সামন্তর? তাঁর বিয়ে হয়েছে নাকি? জানতাম না তো!"

"উনি স্ত্রীকে নেন না।"

"কেন?"

"তা আমি ঠিক জানি না। বড় কষ্টে সংসার চলে ওঁদের। হিরণদা মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দেন। সেই টাকাতেই সংসার চলে।"

"হিরণবাবু টাকা দেন কেন?"

"ওঁর ছেলে, মানে—কেশববাবুর শালা, হিরণদার সঙ্গে পড়তেন। তিনি অবশ্য মারা গেছেন এখন।"

তুঙ্গশ্রী সমস্ত পথ আর একটিও কথা বললেন না।

বাড়ির কাছাকাছি এসে একটা আলোকিত কক্ষ দেখে নরেনকে বললেন—"আপনি যান। ওই ঘরটা তো?"

"না, ওটা নয়। ওটাতে তো হীরা বাইজী আছেন। আপনার ঘর কোন্‌টা কুঞ্জকে জিগ্যেস করতে হবে।"

বিশাল অট্টালিকার মধ্যে কোন্ কোণে যে তাঁর ঘরটা আছে তা ঠিক করা যত সহজ ভেবেছিলেন, দেখলেন তত সহজ নয়।

গেটের কাছেই কুঞ্জ দাঁড়িয়েছিল। সেই তুঙ্গশ্রীকে ভিতরে নিয়ে গেল।

"হীরা বাইজী ঠিক পাশেই আছেন না কি?"

"হ্যাঁ। এই বারান্দাটা দিয়ে ঘুরে গেলেই ওঁর ঘর।"

"ও।"

কুঞ্জ চলে গেল। তুঙ্গশ্রী চারদিকে চেয়ে দেখলেন। বন্দোবস্তের কোনও ত্রুটি নেই। মাথার কাছে এক গ্লাশ জল পর্যন্ত ঢাকা দেওয়া রয়েছে। সবাই যখন চলে গেল, নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। তারপর ঘরের কপাটটা বন্ধ করে দিলেন। বন্ধ করে দিয়ে আবার খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন ঘরের মাঝখানে। তারপর গিয়ে বিছানাটার ওপর বসলেন। নিজেকে অত্যন্ত হাল্কা মনে হতে লাগল। এতদিন অন্তরের মধ্যে যা কিছু সঞ্চিত ছিল, একটা ঝড়ে যেন সব

উড়ে চলে গেল। কি সঞ্চিত ছিল এতদিন? ক্ষুদ্র অহমিকার তুচ্ছ জঞ্জালের রাশি কেবল? ক্ষুদ্র? তুচ্ছ? স্বদেশের জন্য এতদিন ধরে যা ভেবেছেন, যা সহ্য করেছেন, কিছুই নয় সে সব? না, সে কথা কিছুতেই মানবেন না তিনি। কিছুতেই মানবেন না যে তাঁর এত ত্যাগ মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, কিছুতেই মানবেন না যে ক্যাপিটালিজ্‌ম্ ভালো, তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন যে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করে পথে পথে যখন হাহাকার করে বেড়াচ্ছে, তখন মুনাফাখোরেরা চাল জমা করে রেখেছে গুদোমে, পচিয়ে ফেলেছে তবু বার করে নি।... হঠাৎ মনে হল, হিরণ্যগর্ভ তো সে কথা স্বীকার করেছেন, তিনিও তো ক্যাপিটালিজ্‌মের বিরোধী। তবে? সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল আবার। কিসের তবে? কেশব সামন্ত তাঁকে ঠকিয়েছে, নিদারুণ সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠল হঠাৎ। সমাজ তাঁকে ঠকিয়েছে, বিদেশী শাসনকর্তা তাঁকে ঠকিয়েছে, তাদের ক্রূর ক্লেদাক্ত হৃদয়হীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে ক্ষত-বিক্ষত বিধ্বস্ত হয়ে তিনি যখন লুটিয়ে পড়েছেন তখন যে ব্যক্তি তাঁকে ধরে তুলেছিল, যাকে তিনি দেবতা বলে ভেবেছিলেন সেও তাঁকে ঠকিয়েছে! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর আবার মনে হল, সত্যি কি ঠকিয়েছে? দেবতাটা তাঁর নিজেরই অচরিতার্থ কল্পনার সৃষ্টি নয় তো—তৃষ্ণার্ত মৃগ মরুভূমিতে ছুটতে ছুটতে মরীচিকা সৃষ্টি করে যেমন! কেশব সামন্ত এমন কিছুই করে নি বা বলে নি, যার উপর নিঃসংশয়ে নির্ভর করা চলে। সে টাকা খরচ করেছে, বুলি আউড়েছে, আর তো কিছুই করে নি! দেবত্ব অর্জনের জন্য ওই কি যথেষ্ট? তিনি জানেন, ওই যথেষ্ট নয়। তিনি—যিনি মাস্টারদার জীবন-কাহিনী শুনেছেন, আধুনিক যুগের বাদল চোদ্দ বছরের কিশোর টেগরার বীরত্ব-কাহিনীর মর্মন্তুদ মর্ম গ্রহণ করেছেন, দেখেছেন ধলঘাটের বৃদ্ধা অশিক্ষিতা সাবিত্রী দেবীকে, পুলিশের অত্যাচারে অর্থলোভ তুচ্ছ করেও যে সাবিত্রী দেবী নিজের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন, তিনি কি করে ভুললেন কেশব সামন্তের ভণ্ডামিতে! কি করে ভুললেন, চিন্তা করতে গিয়ে ভারি অদ্ভুত একটা কথা মনে হল। ভুললেন, কারণ ভোলবার জন্যে তিনি উন্মুখ হয়ে ছিলেন। প্রতি মানুষের মনের মধ্যে সে সত্তা মুগ্ধ হবার জন্যে উৎসুক হয়ে থাকে, যাকে মুগ্ধ করতে না পারলে জীবনের কোন অর্থই থাকে না, তাঁর সেই অন্তরতম সত্তাকে এমন কিছু তিনি দিতে পারেন নি যা নিয়ে সে তন্ময় হয়ে থাকতে পারে। দৈনন্দিন জীবনের বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তি করতে করতে তিনি এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, বিচার করে দেখবার আর শক্তি ছিল না। শূন্য অন্তরের নিরবচ্ছিন্ন হাহাকারকে থামাবার জন্যে হাতের কাছে যা পেয়েছিলেন তাকেই বেদীতে বসিয়ে দিয়েছিলেন, বেদীতে বসবার তার যোগ্যতা আছে কি না যাচিয়ে দেখেন নি, দেখবার ধৈর্যই ছিল না মোটে। দিনের পর দিন সে কি একঘেয়ে জীবন! কলকাতা শহরের রাস্তায় জনস্রোত বয়ে চলেছে, কিন্তু কি একঘেয়ে জনতা—সেই ট্রাম ট্যাক্সি রিক্‌শ, দেওয়ালে দেওয়ালে সেই একঘেয়ে বিজ্ঞাপন, যে বাড়িগুলো প্রত্যহ দেখতে হয় সেইগুলোই আবার প্রত্যহ দেখা, গলির মোড়ে চেনা মুখগুলির সেই পৌনঃপুনিক আবির্ভাব, পাশের বাড়ির গ্রামোফোনে সেই একই রেকর্ড বাজানো, রেডিওতে নিয়মিতভাবে সেই একই ধরনের গান, বক্তৃতার সুনির্দিষ্ট পুনরাবৃত্তি, অজস্র ভিড় কিন্তু বৈচিত্র্যহীন, কমিউনিজ্‌ম্ ক্যাপিটালিজ্‌ম্ নিয়ে সেই একই ধরনের আলোচনা একই ধরনের লোকের সঙ্গে—যন্ত্রচালিতবৎ এরই মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তিনি

দিনের পর দিন, অকৃতজ্ঞ সমাজের প্রতি একটা আক্রোশ নিয়ে, যক্ষ্মাগ্রস্ত ভাইয়ের বোঝা বহন করে। জেলের ভিতর আর জেলের বাইরে তেমন কোনও তফাতই অনুভব করতে পারছিলেন না—ঠিক সেই সময় এসেছিল কেশব সামন্ত তার উদ্দাম উৎসাহ আর বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য নিয়ে, চোখের সামনে তুলে ধরেছিল আদর্শ-উজ্জ্বল কর্মপন্থা, আশ্রয় দিয়েছিল তাঁকে নিজের বাড়িতে, দূর করেছিল তাঁর প্রাত্যহিক অভাবের গ্লানি। না, বিচার করবার অবসর পান নি তিনি, স্বপ্নই রচনা করেছিলেন ওই লোকটিকে ঘিরে, অনেক স্বপ্ন।... হঠাৎ আবার সচেতন হয়ে উঠলেন তিনি, কেশব সামন্ত তাঁকে ঠকিয়েছে। বীরা দেবী? কে মেয়েটি? নামও তো শোনেন নি কখনও। কেশব সামন্ত যে বিবাহিত তাও তো বলেন নি কোনদিন? স্ত্রীকে নেন না? কেন? নিজের পারিবারিক এসব ঘটনা তাঁকে বলেন নি বলে একটা ক্ষোভ ঘনিয়ে উঠল তাঁর মনে। পরক্ষণেই আবার মনে হল, কেনই বা তিনি বলবেন তাঁকে। কতদিনেরই বা পরিচয়? একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। জুতোটা খুলে ফেললেন। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন—ওই যে জিনিসপত্র দিয়ে গেছে! নূতন সুটকেসটি পাশে রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখলেন, সেইটেতেই তাঁর কাপড়-চোপড় গোছানো রয়েছে। ভাঙা সুটকেসটাও রয়েছে পাশে। তাঁর নিজের অগোচরেই একটা মৃদু হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল তাঁর চোখে-মুখে। সুটকেসটা থেকে কাপড়-জামা বার করে বদলালেন। কাপড়-জামা ছেড়ে না শুলে ঘুমই হয় না। এর জন্যে জেলে কি অশান্তিই যে ভোগ করতে হয়েছে। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু ঘুম এলো না। খাঁ-খাঁ করতে লাগল প্রাণের ভিতরটা। নিজেকে একটা শূন্যগর্ভ হাউইয়ের মতো মনে হতে লাগল; শেষ হয়ে গেছে যার ক্ষণস্থায়ী জ্যোতিঃস্ফুরণ, অন্ধকারে মাধ্যাকর্ষণের টানে একা নামছে যে দ্রুতবেগে নিজের নিরুৎসব শূন্যতা নিয়ে। নিজেকে পূর্ণ করা যায় না আবার? কাজ? কাজ নিয়েই তো আছেন, যা আদর্শ কাজ বলে মনে করেন তাই তো করছেন, তবু মন ভরে না কেন? কেন তা বলতে পারবেন না। কিন্তু ভরছে না। সেই লেবার মীটিং, শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে ধনিকদের প্রতি সেই একঘেয়ে বিষোদগার, স্ট্রাইকের সেই অভ্যস্ত ঝামেলা—না, মন ভরে না। যে উন্মাদনা নিয়ে তিনি টেররিস্ট হয়েছিলেন, এতে তা যেন নেই। দেশের জন্যে যে কোনও মুহূর্তে প্রাণত্যাগ করতে প্রস্তুত আমি—এই সর্বত্যাগী নিষ্ঠা সমস্ত হৃদয়টা যে ভাবে পরিপূর্ণ করে রাখত, শ্রমিকদের স্ট্রাইকে উত্তেজিত করিয়ে ঠিক সে ভাবে পূর্ণ করে না। প্রথমটার মূল সুর ত্যাগ, দ্বিতীয়টার ভোগ। কিন্তু ভোগই বা করবেন না কেন তিনি? সকলেই ভোগ করছে, তিনিই বা করবেন না কেন? মেঘসুন্দরকে মনে পড়ল। দাম্ভিক লোকটা গরিবের রক্ত শোষণ করে ভোগের শিখরে বসে আছে। কিন্তু ঐশ্বর্য নিয়েও সুখী হয়েছে কি? দুঃখই পাচ্ছে বরং। ওর আনন্দ গানে, গান নিয়ে মেতে থাকতে চায় লোকটা। ঠিক বলেছেন হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভের মুখটা ভেসে উঠল মনের উপর। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি—দুষ্টুমিভরা। ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে, আবার অতিশয় সজাগ হয়ে উঠছে পরমুহূর্তেই। উনিও মেতে আছেন নিজের রিসার্চ নিয়ে। তুঙ্গশ্রীর সমস্ত মন উন্মুখ হয়ে উঠল ওই রকম কিছু একটা নিয়ে মেতে থাকবার জন্যে। কিন্তু সেই কিছুটা কি?.. হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন তাও বলা শক্ত, ঘুমটা যখন ভাঙল তখন একটা অপূর্ব সুরে সমস্ত অন্ধকার আকুল হয়ে উঠেছে যেন। তানপুরায় আলাপ করছে কে? পরক্ষণেই মনে পড়ল,

অলকা পাশেই আছে। গানের সভায় অলকা যখন তাঁকে চিনতে পারে নি, তখন তার কাছে আত্মপ্রকাশ করবার ইচ্ছে ছিল না তুঙ্গশ্রীর। কিন্তু এখন এই নির্জন অন্ধকারে সুরের অদ্ভুত পরিবেশে সমস্ত সঙ্কোচ চলে গেল। নিশীথের নিবিড়তায় অতীত জীবনের বাল্য-সঙ্গিনীর কাছে যাবার জন্য প্রলুব্ধ হয়ে উঠল মনটা বরং। মনে পড়ল একটা সরু অন্ধকার গলি দিয়ে অলকার বাড়ি যেতে হতো, মনে হল সেই সরু গলিটা যেন আজ অন্ধকার রাত্রির রূপে এসেছে।...বেড-সুইচ জ্বেলে উঠে পড়লেন, তারপর সন্তর্পণে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে—জুতো পায়ে না দিয়েই। ঘর থেকে বেরিয়েই কিন্তু বিপদে পড়লেন তিনি। তাঁর ঘরের সামনে যে বারান্দাটা রয়েছে সেটা দক্ষিণে বামে দু দিকে ঘুরে গেছে, অথচ তানপুরার আলাপটা হচ্ছে তাঁর শয়নঘরের পিছন দিকে। দক্ষিণ, না বাম—কোন্ দিক দিয়ে গেলে অলকার ঘরে তিনি পৌঁছতে পারবেন তা ঠিক করতে পারলেন না সহসা। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলেন আন্দাজে। দক্ষিণ দিকে ঘুরেই কিন্তু বিশাল একটা বারান্দার সম্মুখীন হতে হল। দালানগোছের অনেকটা, বড় বড় অয়েল-পেন্টিং ঝাড়লণ্ঠন টাঙানো রয়েছে। দালানের এক প্রান্তে প্রকাণ্ড সাদা-'ডোম' দিয়ে ঢাকা একটা ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে, স্তিমিতালোক। সেই স্বল্পালোকে সদ্যনিদ্রোত্থিতা তুঙ্গশ্রীর চোখে অতি অদ্ভুত মনে হতে লাগল দালানটা। দু পাশে সারি সারি অয়েল-পেন্টিং ছবি।— বোধ হয় হিরণ্যগর্ভের পূর্বপুরুষদের ছবি, তার মাঝে মাঝে দুলছে বহু শাখা-সমন্বিত বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন, তার মাঝখান দিয়ে গভীর রাত্রে একা হেঁটে চলেছেন তিনি—রূপকথালোকের একটা রহস্য যেন ঘনিয়ে উঠেছে চারদিকে। এই অপূর্ব অনুভূতিটা এতই তন্ময় করে তুলেছিল তাঁকে যে, তানপুরার শব্দটা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে অবশেষে যে আর শোনাই যাচ্ছিল না তা তিনি খেয়াল করলেন না। স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ এগিয়ে যেতে লাগলেন। দালানের এক প্রান্তে সহসা কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাঁকে। কোথা থেকে একটা চাপা কান্নার শব্দ আসছে! ঘাড় ফিরিয়ে যা দেখতে পেলেন, তা এতই অপ্রত্যাশিত যে সহসা যেন তাঁর হৃৎস্পন্দন থেমে যাবার মতো হল। পাশেই যে ঘরটা ছিল তার ঈষৎ-খোলা জানলাটা দিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, একটা বিছানার উপর নৃত্য-শিক্ষক বিশু বসে আছে এবং মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বিনোদিনী তার কোলের ওপর মুখ রেখে কাঁদছে। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ তুঙ্গশ্রী। তাপর ধীরে ধীরে সরে গেলেন জানালাটার কাছে। কিছুতেই আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না তিনি। বিশু বলছে শুনতে পেলেন—"আমি কিছুতেই বলতে পারব না তোমার দাদুকে। সে অসম্ভব। কিছুতেই রাজী হবেন না উনি। কেশববাবু যখন শিখাদিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল মনে নেই সে কি কাণ্ড!"

বিনোদিনী কোনও উত্তর দিল না। সমস্ত দেহটা তার কেঁপে কেঁপে উঠল কয়েকবার। বিশ্বেশ্বরের হাঁটু দুটো আরও জোরে চেপে ধরল সে শুধু। তুঙ্গশ্রী আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে হয়তো চলে যেতেন, কিন্তু দালানের এক প্রান্তে সেই অ্যালসেশিয়ান কুকুরটাকে দেখে আপাদমস্তক শিউরে উঠল তাঁর। নিমেষের মধ্যে তিনি তাদের ঘরে ঢুকে পড়লেন। সৌভাগ্যক্রমে কপাটটা খোলা ছিল। খোলা না থাকলে তাঁকে ডাকতে হল। হতভম্ব বিশু দাঁড়িয়ে উঠল তাড়াতাড়ি, বিনোদিনীও একপাশে সরে দাঁড়াল। অপ্রত্যাশিত এই আবির্ভাবের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না।

তুঙ্গশ্রী বললেন—"যে বাইজী এসেছেন, তিনি কোন্ ঘরটায় থাকেন বলতে পারেন? তিনি আমার পরিচিত লোক, তাঁর কাছে যাব বলেই বেরিয়েছিলাম, কিন্তু রাস্তাটা হারিয়ে ফেলেছি মনে হচ্ছে।"

"তিনি তো ও-দিকটায় থাকেন।" যতদূর সম্ভব সপ্রতিভভাবেই বিশু বললে,—"আপনি উলটো দিকে চলে এসেছেন।"

"ও। বাইরে আপনাদের কুকুরটা ঘোরাফেরা করছে দেখে তাড়াতাড়ি এই ঘরটায় ঢুকে পড়েছি।"

বিনু নতমস্তকে এক ধারে দাঁড়িয়েছিল। বিশু তার দিকে চেয়ে বললে—"বিনু, দুষ্টুকে তুমি সরিয়ে নিয়ে যাও।"

বিনু বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে দেখে, তার লজ্জাকাতর অপ্রতিভ মুখের পানে চেয়ে তুঙ্গশ্রীর মনে সহসা বিপর্যয় ঘটে গেল যেন। সন্ধ্যা থেকে মেঘসুন্দরের বিরুদ্ধে যে ক্রোধ তাঁর মনের ভিতর নিরুপায় আক্রোশে কোণঠাসা সাপের মতো অবরুদ্ধ হয়ে গজরাচ্ছিল, মেঘসুন্দরের অত্যাচারের আর-একটা উদাহরণ দেখে সেটা হঠাৎ যেন ফণা ধরে দাঁড়িয়ে উঠল। অত্যাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তিনি জীবন-মরণ পণ করে দাঁড়াবার যে প্রেরণা পেয়েছিলেন হঠাৎ এই সন্ত্রস্ত প্রণয়ীযুগলের ভীত-চকিত অসহায় অবস্থা দেখে সেই প্রেরণা পেলেন যেন। তাঁর মানসপটে অতীত যুগের একটা নিষ্ঠুর ছবি ফুটে উঠল—স্পর্ধিত ধনী নিরীহ ক্রীতদাসকে চাবকে চলেছে...Uncle Tom's Cabin-এর সাইমন লেগ্রি হঠাৎ মূর্ত হয়ে উঠল চোখের সামনে। তা ছাড়া এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের মধ্যে মেঘসুন্দরকে আঘাত করবারও একটা সুযোগ তিনি আবিষ্কার করলেন। মেঘসুন্দরকে আঘাত করবার একটা আকাঙ্ক্ষা উদগ্র হয়ে উঠেছিল তাঁর মনে। গমোন্মুখ বিনুকে বাধা দিয়ে তাই তিনি বললেন—"শুনুন।" বিনু দাঁড়িয়ে পড়ল। তুঙ্গশ্রী এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে মাথায় হাত বুলিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন—"দেখুন, এখনই হঠাৎ যে ব্যাপারটা আমি দেখে ফেলেছি, তার জন্যে আপনাদের কুণ্ঠিত হবার দরকার নেই। একটা কথা জেনে রাখুন, আমি আপনাদের স্বপক্ষে। দরকার হলে আপনাদের হয়ে লড়ব আমি।"

বিনু ক্ষণকাল নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

বিশু সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বললে—"আপনি বসুন।"

"না, এখন বসব না আর। হীরা বাইজীর ঘরটা কোন্ দিকে আমাকে দেখিয়ে দিন বরং।"

"চলুন, বিনু কুকুরটাকে সরিয়ে নিয়ে যাক।"

"বিনুকে আপনি বিয়ে করতে চান সত্যিই?"

"হ্যাঁ।"

"মেঘসুন্দরবাবুকে সে কথা বলতে পারছেন না, এই তো? আমি যদি কথাটা বলি তাঁর কাছে।"

"তাতে কোনও লাভ হবে না। উনি আমাকে দূর করে দেবেন। তা ছাড়া ওঁর মনে এত বড় একটা আঘাত দিতেও কেমন যেন লাগে। উনি আমাকে মানুষ করেছেন। উনি টাকা দিয়ে আমাকে কাশীতে না পাঠালে আমি নাচ শিখতে পারতাম না, সামান্য ছুতোরই থেকে যেতাম। এ কথাটা আমার ভোলা উচিত কি?"

"ভোলা উচিত নয়।" মৃদু হেসে বললেন তুঙ্গশ্রী—"কিন্তু আর একটা কথাও ভোলা উচিত নয় যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেবার অজুহাতে জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্তব্যকে অবহেলা করার নাম —কাপুরুষতা। বিনুকে যখন প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, তখনই এ কথাটা ভাবা উচিত ছিল আপনার।"

"বিনুকে আমি ইচ্ছে করে প্রশ্রয় দিই নি। ওর কাছে যাবার আমার সাহসও হতো না যদি মেঘুবাবু নিজে ডেকে আমাকে ওর নাচের মাস্টার করে না দিতেন। আমি আমার সমস্ত বিদ্যে বিনুর পায়ে ঢেলে দিয়েছি। বিনুর মতো মেয়েকে নাচ শেখাতে পেরে কৃতার্থ হয়ে গেছি আমি। এতদিন ধরে সমস্ত প্রাণ দিয়ে নিজের স্বপ্নকে ফুটিয়ে তুলেছি ওর মধ্যে—বিশ্বাস করুন, এ ছাড়া আর কোনও লক্ষ্য ছিল না আমার। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখলাম, মানে—"

অভিভূত হয়ে থেমে গেল বিশু। তুঙ্গশ্রীও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বঞ্চিত হৃদয়ও সঙ্গোপনে যেন সুধাপান করছিল।

তিনি বললেন—"আমি বুঝেছি। কিন্তু এটা ঠিক যে দু'দিক রক্ষা করা যাবে না। বিনুকে পেতে হলে ওঁকে আঘাত করতেই হবে।"

"কিন্তু ওঁর সাহায্য না পেলে বিনুকে নিয়ে আমি দাঁড়াব কোথা?"

"ব্যাপারটা হিরণবাবুকে বললে কেমন হয়?"

"হিরণদা ইচ্ছে করলে আমাদের আশ্রয় দিতে পারেন অবশ্য, কিন্তু তা উনি দেবেন না।"

"কেন?"

"দিলে মেঘুবাবুর বিষয় থেকে বঞ্চিত হবেন। মেঘুবাবুর ছেলেপিলে তো নেই, অথচ অগাধ সম্পত্তি। শিখুদি আর হিরণদা পাবেন সব। মন্মথবাবু মানে শিখুদির স্বামী, জমিদারির সর্বেসর্বা ম্যানেজার এখন যদিও। কিন্তু হিরণদারও অংশ আছে ও সম্পত্তিতে। কেউ কেউ একথাও বলে যে, মেঘুবাবু সব সম্পত্তি হিরণদাকে দিয়ে যাবেন বলেছেন যদি হিরণদা বিয়ে করেন। কিন্তু আমাদের যদি উনি আশ্রয় দেন, তাহলে মেঘুবাবু নির্ঘাত ওঁকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করবেন। ভয়ানক একরোখা লোক কিনা। আমাদের জন্যে হিরণদা এত বড় সম্পত্তিটা কি ছেড়ে দিতে চাইবেন?"

তুঙ্গশ্রী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—"যদি চান, আপনি রাজী আছেন তো?"

"হিরণদা যদি আশ্রয় দেন তাহলে—। কিন্তু হিরণদাও একটু ইয়ে-গোছের লোক, মানে—এ কথাটা শুনে তিনি না আবার—"

"আপনি আমার ওপর নির্ভর করুন। এরা কেউ যদি আপনাদের আশ্রয় না দেয় তবু আশ্রয়ের ভাবনা হবে না আপনাদের, কারণ আপনারা দুজনেই যে বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন তার মূল্য কম নয়। যাই হোক, আমি চেষ্টা করে দেখব কি করতে পারি। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। এখন চলুন, অলকার ঘরটা দেখিয়ে দিন আমাকে।"

"অলকা? ওঁর নাম তো হীরা বাইজী শুনেছি।"

"ওটা ওর পোশাকী নাম।"

দুজনে বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে।

"এই দিক দিয়ে আসুন, এইটে শর্টকাট হবে।"

বিশু পাশের একটা ঘরের ভিতর দিয়ে নিয়ে গেল তাঁকে। ঘর থেকে বের হওয়া মাত্র তানপুরার আওয়াজ শোনা গেল। ছোট একটা বারান্দা পার হয়েই হীরা বাইজীর ঘরও দেখা গেল। কপাটের ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

"ওই ঘরটায় উনি আছেন। আমি এখন যাই তাহলে?"

"আচ্ছা।"

বিশু চলে গেল। তুঙ্গশ্রী অগ্রসর হলেন হীরা বাইজীর ঘরের দিকে। বন্ধ দ্বারটার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তানপুরার সঙ্গে সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে গানও গাইছে অলকা। দুটো লাইন শুনতে পেলেন।

ঈশ্বর নাম তুম্‌হারি, বৃন্দারণ্যবিহারী, গিরিগোবর্ধনধারী....

তন্ময় হয়ে গাইছে, মনে হল, পুজো করছে সমস্ত অন্তর উজার করে দিয়ে। এ সময় বিরক্ত করা উচিত নয় মনে হল তুঙ্গশ্রীর। কিন্তু পর-মুহূর্তেই হিংসা হল। একটু সজোরে করাঘাত করলেন তিনি। বন্ধ হয়ে গেল গান। কপাট খুলে হীর বাইজী মুখ বাড়ালেন।

"কে?"

"আমাকে চিনতে পারিস?"

তুঙ্গশ্রী ঢুকলেন গিয়ে ঘরের ভিতর। অলকা নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ তাঁর মুখের দিকে।

তারপর বললে—"ঠিক পারছি না।"

"মিনতিকে ভুলে গেলি এর মধ্যেই?"

"আরে! মিনতি? বস বস। তারপর তুই এখানে হঠাৎ কোথায়?"

চিনতে পেরেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল অলকা। সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ অপ্রস্তুত এবং সন্দিগ্ধও হয়ে উঠল ভিতরে ভিতরে। মিনতি তার কতটুকু খবর জানে এবং জেনে থাকলে ও কি ধারণা করেছে তার সম্বন্ধে? হঠাৎ মনে হল তার।

"আমি আজকাল আর মিনতি নই, আমি এখন তুঙ্গশ্রী। যা দিনকাল পড়েছে এখন আর মিনতিতে চলে না, তুঙ্গশ্রী হতে হয়।"

"তোরই নাম তুঙ্গশ্রী? তোর বিষয়ে অনেক কথাই শুনেছি গো, কাগজে পড়েওছি। টেররিস্ট দলে ছিলি? জেল হয়েছিল তোরই?"

বাল্যসঙ্গিনীর মুখে তাঁর কীর্তিকলাপ একটু নূতন রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠল যেন। স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন তুঙ্গশ্রী।

"এখন কি করছিস তুই?"—অলকাই প্রশ্ন করল আবার।

"দেশের কাজ। যে লোভী ধনিক সম্প্রদায় নিজের সর্বগ্রাসী লোভে দেশের সর্বনাশ করছে, তাদের উচ্ছেদ করাই এখন আমার কাজ।"

"এখানে এসেছিস কি সূত্রে?"

"ওই সব ব্যাপার নিয়েই এসেছি।"

"মেঘসুন্দরবাবুর মিলে স্ট্রাইক না কি সব হচ্ছে, তাই নিয়েই না কি? সন্ধেবেলা আমি যখন ওখানে গান গাইছিলাম, তখন একটি ছেলেকে নিয়ে কি কাণ্ড! ওর মধ্যে তুইও আছিস নাকি?"

"প্রত্যক্ষভাবে ঠিক নেই, থাকলে আমাকে ঘাড় ধরে বার করে দিতেন বোধ হয় মেঘসুন্দরবাবু, সে বিক্রমটুকু এখনও আছে ওঁদের।"

"তুই ছিলি না কি ওখানে, দেখতে পাই নি তো?"

"আমি পিছন দিকে একধারে বসেছিলাম। ওসব কথা থাক, তোর খবর বল শুনি।"

"খবর তো দেখতেই পাচ্ছিস। বাইজী হয়েছি।"

অলকার ম্লান হাসির সঙ্গে চোখে বিদ্যুৎও চকমক করে উঠল একটু।

"দুজনে এক কাজই করছি বোধ হয়, যদিও ধরনটা আলাদা। তোদের মিলের শ্রমিকরা বড়লোকের লাভে বখরা বসাতে চাইছে, আমরাও চাইছি। তফাতটা তোরা কেড়ে নিতে চাইছিস, আর আমাদের ওঁরা সেধে দিচ্ছেন।"

"অনেক টাকা রোজগার করছিস, না?" মুচকি হেসে প্রশ্ন করলেন তুঙ্গশ্রী।

"অনেক আর কোথা? মাসে তিন হাজারও তো হয় না।"

"মাসে তিন হাজারেরও চেয়েও বেশি চাস তুই?"

"কেন চাইব না?"

হীরা বাইজীর চোখের দৃষ্টিতে একটা সদর্প প্রশ্ন ফুটে উঠল।

তুঙ্গশ্রীও হাসিমুখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ তার দিকে। তারপর বললেন—"আমাদের দেশের লোকের গড়পড়তা আয় কত জানিস বছরে? মাত্র পঁয়ষট্টি টাকা।"

"সে জেনে আমি কি করব? আমি নিজের আয় বাড়াতে পারি, পরের আয় বাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা আমার নেই, অবসরও নেই।"

অতিশয় যুক্তিযুক্ত এ কথার উত্তরে তুঙ্গশ্রী কিছু বলতে পারলেন না সহসা। যেমন করে হোক, শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করানো তাঁরও কাজ। অলকাও শ্রমিকা একজন। সে যদি কোনও কৌশলে তার আয় বৃদ্ধি করতে পেরে থাকে তাতে আপত্তি করবার কিছু নেই। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্নও তাঁর মনে জাগল। শ্রমিকদের আয়েরও একটা সীমা থাকা উচিত কি? কোথায় যে সীমারেখা টানা উচিত? বেঁচে থাকবার দাবি প্রত্যেকেরই আছে, সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করতে হলে যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তা সকলেরই চাই অবশ্য। কিন্তু ওই সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের মানদণ্ড সকলের সমান নয়। একজনের পক্ষে যা প্রয়োজন আর একজনের কাছে তা বিলাস। সঙ্গীতচর্চা করা মেঘসুন্দরের প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল, সোভিয়েট ব্যবস্থায় তো শুধু সঙ্গীত কেন, সব রকম শিল্পচর্চার সুন্দর ব্যবস্থা আছে—তবে সেটা শুধু কেবল মেঘসুন্দরের জন্যে নয়, সকলের জন্যে। অলকা কমিউনিজম সম্বন্ধে কিছু জানে কি? কে জানে? সরাসরি কিন্তু কথাটা জিগ্যেস করতে পারলেন না তিনি। হঠাৎ তিনি যেন অনুভব করলেন, ছেলেবেলায় তিনি যে অলকাকে চিনতেন এ সে নয়, এ অন্য ব্যক্তি। যদিও সংজ্ঞা অনুসারে এ-ও শ্রমিক একজন, কিন্তু এর শ্রমলব্ধ আয়ের পরিমাণ এত বেশি দাঁড়িয়েছে যে ওকে ধনিকের পর্যায়ে ফেললেই ঠিক হয়। একটা চিন্তার ঢেউ হঠাৎ তাঁর মনে খেলে গেল—শ্রমিকই শেষকালে ধনিকে পরিণত হয় না কি! কিন্তু এ চিন্তাকে তিনি আমল দিলেন না। বহুকাল পরে বাল্যসঙ্গিনীর সঙ্গে দেখা হলে যে সুরে কথা কওয়া উচিত আবার সেই সুর ধরলেন একটু হেসে।

"অনেকদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভারি ভালো লাগছে সত্যি—"

"আমারও। আচ্ছা, তুই দেশেরই কাজ নিয়ে আছিস? বিয়ে-থা করিস নি?"

"বিয়ে করবার সময় পেলাম কখন? জেলে জেলেই তো কাটল সারা জীবনটা।"

"মা কোথা? দেশেই আছেন?"

"মা মারা গেছেন আমি যখন জেলে ছিলাম। পঞ্চাশের মন্বন্তরে মারা গেছেন, অনাহারে। একটু ফ্যানও জোটে নি।"

"ছোট ভাইটি?"

"তার যক্ষ্মা হয়েছে, সে-ও বোধ হয় বাঁচবে না!"

দুজনেই নীরব হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তুঙ্গশ্রীর চোখ দুটো জ্বলছিল, অলকা শান্তভাবে বসেছিল চুপ করে।

"সবই ভগবানের ইচ্ছে।"—মৃদুকণ্ঠে বলল অলকা।

"ভগবানে বিশ্বাস করিস তুই?"

"করি।"

"তোর অবস্থা স্বচ্ছল বলেই করিস বোধ হয়। আমি করি না। ছেলেবেলা থেকে আমার ওপরে যে অবিচার, যে অত্যাচার চলছে তার দায়িত্ব আমি এক অনির্দিষ্ট ভগবানের ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারি না। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই অত্যাচারী পিশাচদের নির্মূল করতে না পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।"

"শান্তি প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করলে পাবি না। সবাইকে ভালোবাসার চেষ্টা করলেই পাবি।"

"মুখে ওসব কথা বলা খুব সোজা, তুই যদি আমার অবস্থায় পড়তিস তাহলে—"

"পড়েছিলাম, তোর চেয়েও খারাপ অবস্থায় পড়েছিলাম, দারিদ্র্যের ঘূর্ণিপাকে পড়ে আমিও হাবুডুবু খাচ্ছিলাম, কেবল ভালোবাসার জোরেই উঠে আসতে পেরেছি সেখান থেকে।"

একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তুঙ্গশ্রী।

অলকাও এর বেশি আর কিছু বললে না, চুপ করে গেল।

আবার কিছুক্ষণ নীরবতার পর তুঙ্গশ্রী বললেন—"তুই হয়তো পেয়েছিস, কিন্তু আমি ভালোবাসার মতো লোক পাই নি এখনও। সে রকম লোক চোখেই পড়ে নি আমার।"

"লোককেই যে ভালোবাসতে হবে, এমন মানে নেই। কাজকে ভালোবাসলেও সমান ফল হবে। কিন্তু সে ভালোবাসাটা নিষ্কাম আত্মসমর্পণ হওয়া চাই।"

"তুই মানুষকে ভালোবাসিস নি?"

"না, আমি ভালোবেসেছি গানকে। আর সেই ভালোবাসার পথেই আমি ভালোবাসতে পেরেছি গানের সমঝদারদের। আমার বিশ্ব আমার প্রেমের পথে এসেই ধরা দিয়েছে আমার কাছে। যে মেঘসুন্দরের ওপর তোর অত রাগ, আমি তাঁকে ভক্তি করি। অন্য কোনও কারণে নয়, তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রে গুণী বলে।"

তুঙ্গশ্রী তর্কে অপটু নন।

বললেন—"কিন্তু যিনি তোমার গানের সমঝদার নন, তাঁর প্রতি তোমার রাগ হয় না?"

"সে সব লোক আমার ত্রিসীমানায় আসে না। তাদের সম্বন্ধে ঘৃণা বা ভালোবাসার কথাই ওঠে না। তারাও আমাকে চেনে না, আমিও তাদের চিনি না। চেনবার আগ্রহও নেই, কারণ প্রয়োজনও নেই। আমি যাদের পেয়েছি, তাদের নিয়েই আমার জগৎ পরিপূর্ণ। আর বেশি নিয়ে আমি কি করব?"

তুঙ্গশ্রীর হঠাৎ মনে হল, একে নিয়ে আর সময় নষ্ট করা অনুচিত হবে। বাল্যসঙ্গিনীকে দেখবার কৌতূহল মিটে গেছে। তানপুরা পাশে নিয়ে নিশ্চিন্ত আয়ের নিঃসংশয় আরামের মধ্যে বসে যে মহিলাটি হিতকথার বাঁধা বুলি আওড়াচ্ছে, তার সঙ্গে তাঁর বাল্যসঙ্গিনীর চেহারাটি ছাড়া আর কিছুরই মিল নেই। সেই কলস্বরা স্বতঃস্ফূর্তপ্রাণা কিশোরীর লাস্যলীলা (যা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল ছেলেবেলায়) অবলুপ্ত হয়ে গেছে নিঃশেষে, রূপান্তরিত হয়ে যা হয়েছে তা এই ভারতবর্ষের মাটিতেই হওয়া সম্ভব—শাস্ত্রের বুলি-কপচানো যন্ত্র একটি—যে যন্ত্রের সহায়তায় মেঘসুন্দরেরা নিজেদের সঞ্চিত সম্পত্তি আগলাচ্ছেন বংশপরম্পরা ধরে। লোকে সুরের মোহে গানের কথাগুলোও বিশ্বাস করছে। ক্ষুধিত বঞ্চিতরাও ওই নিষ্কাম প্রেমের ভাঁওতায় ভুলে আত্মসমর্পণ করছে যুগের পর যুগ। নিজেদের কামনা যোল আনার জায়গায় আঠারো আনা মিটিয়ে এবং ভবিষ্যতে মেটাবার সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে নিষ্কাম প্রেমের ধর্ম আওড়ানো খুবই সহজ। উঠে পড়লেন তুঙ্গশ্রী।

"আমি উঠি ভাই এবার। কাল হয়তো কলকাতায় চলে যেতে হবে, তাই এত রাত্রে এসে তোকে বিরক্ত করে গেলাম। তুই যে হীরা বাইজী তা হঠাৎ আবিষ্কার করে তোর সঙ্গে দেখা না করে পারলাম না। সঙ্গীতচর্চায় বাধা দিয়ে গেলাম একটু—"

"আমিও খুব খুশি হয়েছি তোকে দেখে। আরও খুশি হতাম যদি তোকে সুখী দেখতাম। কলকাতায় তুই থাকিস কোথায়, ঠিকানাটা কি? আমিও তো যাই মাঝে মাঝে কলকাতায়।"

অলকা উঠে দাঁড়াল এবং একটি ছোট অ্যাটাচি খুলে একটি কলম আর খাতা বের করে দিল তুঙ্গশ্রীকে।

"এতে তোর ঠিকানাটা লিখে দিয়ে যা। কলকাতায় গেলে দেখা করব।"

তুঙ্গশ্রী খানিকক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর লিখে দিলেন ঠিকানাটা।

"আচ্ছা, চলি ভাই তাহলে।"

"আচ্ছা।"

তুঙ্গশ্রী বেরিয়ে গেলেন। বিশুর ঘরে গিয়ে দেখলেন, বিশু জেগে আছে তখনও। বিশুই তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এল তাঁর ঘরে। যেতে যেতে বিশুকে তিনি জিগ্যেস করলেন আবার—"আমি চেষ্টা করি তাহলে?"

"করুন। কিন্তু দেখুন, মেঘুবাবু যদি—"

"মেঘুবাবু যথাসাধ্য বাধা দেবেন, এটা ধরে নিয়েই চেষ্টা করতে হবে। আপনি যদি সম্মতি দেন, আমি আমার যথাসাধ্য করব।"

"হিরণদাকে বলবেন না কি? হিরণদা যদি আবার —"

তুঙ্গশ্রী ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলন বিশুর মুখের দিকে। আর্ত অহসায় মুখচ্ছবি। আবার মনে পড়ল সাইমন লেগ্রির কথা। সাইমন লেগ্রিরা ভোল বদলেছে। তাঁদের চোখ এড়াতে পারবে না কিন্তু।

"কাকে বলব, কি করব, তা আমার ওপর ছেড়ে দিন না। আপনাদের যাতে বিয়ে হয় সে চেষ্টা আমি প্রাণপণে করব। কিন্তু তার আগে আপনার সম্মতিটা চাই।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অস্ফুটকণ্ঠে বিশু বললে—"করুন।"

নিজের ঘরে পৌঁছে তুঙ্গশ্রী দেখলেন যে, আলোটা তিনি জ্বেলেই রেখে গিয়েছিলেন। কপাটটা বন্ধ করে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বিছানায় গিয়ে বসলেন। আজ সন্ধ্যা থেকে কি বিভিন্ন বিচিত্র ঘটনা সব ঘটছে একে একে! একটা ক্যালাইডোস্কোপে চোখ রেখে যেন দাঁড়িয়ে আছেন। হাত একটু নাড়লেই সঙ্গে সঙ্গে নূতন ছবি দেখা যাচ্ছে। হিরণ্যগর্ভ, শিখরিণী, মেঘসুন্দর, হীরা বাঈজি, বিশু, বিনু—প্রত্যেকটাই অদ্ভুত। নিজের মনেই একটু হেসে বেডসুইচটা নিবিয়ে দিলেন তিনি। শুয়ে পড়লেন। চোখ বুজেই মনে হল, কেশব সামন্ত তাকে ঠকিয়েছে। চোখ খুললেন আবার। অন্ধকার। মনে হল, সারা জীবনই তো চোখের সামনে অন্ধকার যবনিকা প্রসারিত হয়ে আছে, আশা হয়েছিল, কেশব সামন্ত হয়তো সেটা সরিয়ে দেবে। কিন্তু কেন আশা করেছিলেন তিনি? মনে মনেও কেন ভিখারিণীর মতো ভিক্ষাপাত্র পেতে দাঁড়িয়েছিলেন? দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। মনের দুর্বলতার টুঁটি টিপে ধরলেন যেন সবলে। তারপর পাশ ফিরে আঁকড়ে ধরলেন পাশ-বালিশটাকে। টং টং করে ঘড়িতে দুটো বাজল। চোখ বুজে ঘুমোতে চেষ্টা করলেন। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়....গুনে যেতে লাগলেন মনে মনে একাগ্র হয়ে।...ঘুমিয়েছিলেন কি? সমস্ত অন্ধকার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে আবার তানপুরার সুরে। কাঁপছে যেন। মুগ্ধ উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলেন...সহসা মনে হল, অলকা যা বললে তা কি সত্যি? সত্যিই কি ও গানকে ভালোবেসে আত্মসমর্পণ করেছে তার কাছে? ভৈরোঁ-আলাপ-নিরতা অলকাকে তিনি যদি এ সময় দেখতে পেতেন, তাহলে তাঁর আর সন্দেহ থাকত না।

...হঠাৎ বাইরে পদশব্দ শুনে উঠে বসলেন তিনি বিছানায়। আলোটা জ্বাললেন। দ্বারে মৃদু করাঘাত করলে কে যেন।

"কে?"

"আমি কুঞ্জ।"

তুঙ্গশ্রী উঠে কপাট খুলে দিলেন।

"বাবু বললেন, হাতি এসেছে, আপনি যদি যেতে চান, চলুন এখনই।"

"চল।"

হঠাৎ তুঙ্গশ্রী আবিষ্কার করে বিস্মিত হয়ে গেলেন যে, এই আহ্বানটির জন্যে মনে মনে তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন।

.....হিরণ্যগর্ভ তখনও ল্যাবরেটারির কাজ শেষ করে উঠতে পারেন নি। খানিকটা ঘি নিয়ে কি যেন করছিলেন। তুঙ্গশ্রীর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে একবার চেয়ে বললেন—"একটু বসুন, আমার হয়ে গেছে।"

তুঙ্গশ্রী বসলেন না, তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

"ঘি পরীক্ষা করছেন নাকি?"

"না। কয়েক রকম ঘি দিয়ে 'মিডিয়া' তৈরি করছি।"

"মিডিয়া কি?"

"মিডিয়মের প্লুরাল। সোজা ভাষায়, চাষের জমি তৈরি হচ্ছে ঘিয়ের সার দিয়ে।"

"জমি?"

"হ্যাঁ। ব্যাক্‌টিরিয়া বুনব।"

তুঙ্গশ্রী বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন।

হিরণ্যগর্ভ হেসে বললেন—"ব্যাক্‌টিরিয়া শুনে আপনার গোলমাল লাগছে সম্ভবত। ব্যাক্‌টিরিয়ারাও উদ্ভিদ। গম যব ধান আম জাম কাঁঠাল গোলাপ চামেলী রজনীগন্ধা যেমন উদ্ভিদ, ব্যাক্‌টিরিয়াও তেমনি উদ্ভিদ। তফাৎ শুধু ওরা ছোট ক্ষুদ্রতম—"

হিরণ্যগর্ভ কয়েকটা টেস্ট টিউব তুলে তুলে দেখলেন, তারপর সেগুলির মুখে তুলো গুঁজে গুঁজে দিতে লাগলেন।

"বাস্, এইবার নরেন্দ্রনাথকে একটা স্লিপ লিখে চলুন যাই। ওই টেবিলে আমার একটা প্যাড আছে, দিন তো। লাল-নীল পেন্সিলটাও আছে ওখানে।"

পাশের টেবিল থেকে প্যাড আর পেন্সিল এনে দিলেন তুঙ্গশ্রী।

হিরণ্যগর্ভ বড় বড় অক্ষরে লিখলেন, "নরেন আমি চললাম। ফিরতে দেরি হতে পারে। আটটার মধ্যে যদি না ফিরি, তুমি এইগুলোকে অটোক্লেভ করে রেখো ১৫ পাউণ্ড প্রেসারে ১৫ মিনিট। গ্রাফটাও যেন ঠিক হয়ে থাকে।"

"আটটার মধ্যেই ফিরতে পারব কি আমরা?"—তুঙ্গশ্রী প্রশ্ন করলেন।

"আশা তো করছি। দেখি। চলুন, এবার যাওয়া যাক। ও হ্যাঁ, একটা অনুরোধ যদি করি রাগ করবেন কি?"

"কি বলুন?"

"দাঙ্গা করার ইচ্ছে নেই। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন, তাহলে অনর্থক রক্তারক্তিটা হয় না। মন্মথ অবশ্য বাঁধের ওপর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তৈরি হয়ে আছে, আমাকে ডেকেছে হতাহতদেব তদ্বির করবার জন্যে। সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি নিয়ে যেতে লিখেছে। কিন্তু আপনি যদি এ সাহায্য করেন, দাঙ্গা হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে।"

"আমি? আমি কি সাহায্য করব?"

"ওই যে বীরা দেবী না কে এসেছে, তারই ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে একটু।"

হিরণ্যগর্ভর হাস্যদীপ্ত চোখ দুটি মিটমিট করতে লাগল।

"অভিনয়! মানে?"

"কিছুই নয়। ক্রুদ্ধ জেলের দল যখন ভৈরবপুরের মাঠ পেরিয়ে বাঁধের দিকে আসবে, তখন আপনি হাতির ওপর থেকে গ্রামোফোনের একটা চোঙে মুখ রেখে বলবেন—তোমরা বাঁধ কেটো না। মন্মথবাবু নিজেই বাঁধ কেটে দেবেন বলেছেন। তোমরা ফিরে যাও এখন।"

"ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা। বীরা দেবী বলে নিজেকে চালাব কি করে? তিনি হয়তো নিজেই থাকবেন ওদের সঙ্গে।"

"থাকবেন না, সে খবর পেয়েছি। আপনি চলে যাবার পর মহাবীর জেলেকে আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম। মহাবীর ওই জেলেদের সব খবর রাখে। সে বললে— বীরা দেবী গেছেন

মহিমগঞ্জে আজ রাত্রে। সেখানে আজ বক্তৃতা করবেন তিনি অস্পৃশ্যদের কাছে। সুতরাং কোস্ট ইজ ক্লীয়ার। আপনি স্বচ্ছন্দে বীরা দেবী হয়ে যেতে পারেন।"

"আমাকে চিনতে পারবে না ওরা?"

"যাতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। আপনাকে কালো গগল্‌স্ পরতে হবে, বীরা দেবী তাই পরেন শুনলাম; কালো শাড়িও যদি পরতে পারেন আরও ভালো হয়। মহাবীর ওঁর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিল, সে বললে, উনি কালো গগলস্ আর কালো শাড়ি পরেছিলেন। ওঁর গায়ের রঙও আপনারই মতো ফরসা। আপনি থাকবেন হাতির ওপরে। তা ছাড়া তখন আলোও তেমন জোর থাকবে না, কাণ্ডটা হবে ভোরবেলায়।"

"কালো শাড়ি আর কালো গগল্‌স্ কোথা পাব?"

"সে সব ঠিক করে রেখেছি আমি। দাঁড়ান, এই স্লিপটা এই টেস্ট টিউবগুলোর ওপরে রেখে দি। এই নিন আপনার গগল্‌স্।"

একটা টেবিলের ড্রয়ার টেনে একটা গগল্‌স্ বার করলেন হিরণ্যগর্ভ।

"কুঞ্জ!"

কুঞ্জ দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াল।

"খরিণী যে শাড়িটা দিয়ে গেল সেটা কোথায় রাখলি? নিয়ে আয়। আর নরেনবাবু এলে তাঁকে এই চিঠিটা দেখতে বলিস, এখানেই রইল এটা।"

"আচ্ছা।"

কুঞ্জ শাড়ি আনতে চলে গেল।

তুঙ্গশ্রী বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। ব্যাপারটার আকস্মিকতায় তিনি যেন খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন।

"মাপ করবেন হিরণবাবু। ও আমি পারব না।"

"কি পারবেন না, অভিনয় করতে? কিছুই তো করতে হবে না আপনাকে!"

"অভিনয় করতে হয়তো পারব। কিন্তু জেলেদের ন্যায্য দাবির পথে বাধা-সৃষ্টি করতে হয়তো পারব না।"

"জেলেদের ন্যায্য দাবি মেটাব আমরা। সে ব্যবস্থার কথাও আমি ভেবে রেখেছি।"

"কি বলুন?"

"কেশবের যে বিলটা ওই জেলেরা বন্দোবস্ত নেয়, যে বিলে জল ঢোকাবার জন্যে ওরা বাঁধ কেটে হাজার হাজার বিঘের ফসল নষ্ট করে দিতে চাইছে, তার চেয়ে ঢের বড় বিল একটা আমার জমিদারিতে আছে, সে বিল আমি বন্দোবস্ত করি নি এখনও কাউকে। সেইটেই ওদের দিয়ে দেব ভেবেছি।"

"দিয়ে দেবেন? সেলামি নেবেন না?"

"কেশবকে ওরা যত দিত ততই নেব। তার বেশি নেব না। যদিও আমার বিল কেশবের বিলের চারগুণ, ইচ্ছে করলে চারগুণ সেলামিও পেতে পারি।"

"কিন্তু আপনি এ ক্ষতি স্বীকার করতে যাচ্ছেন কেন?"

"দাঙ্গা নিবারণ করার জন্যে। অনর্থক রক্তারক্তি করে কি হবে বলুন? তাছাড়া জমিদারি

প্রজাদেরই। এর থেকে যা আয় হয় তা ওদেরই জন্যে খরচ করি আমি। এ বছর ও-বিলটা আমার বন্দোবস্ত করবার ইচ্ছে ছিল না। ইচ্ছে ছিল, একজন ফিশারি এক্সপার্টকে আনিয়ে কি করলে মাছের উন্নতি হয় তারই ব্যবস্থা করার। এ বছর সেটা থাক না হয়।"

"এসব অভিনয়ের মধ্যে না গিয়ে বীরা দেবীকে এই খবরটা পাঠিয়ে দিলেই তো পারতেন।"

"সময় পেলাম কই? তিনি তো মহিমগঞ্জে চলে গেছেন। হুকুম দিয়ে গেছেন জোর করে বাঁধ কেটে দেবার জন্যে। মন্মথও ছাড়বার লোক নয়। বন্দুক-টন্দুক নিয়ে তৈরি হয়ে গেছে সে। আপনি ইচ্ছে করলে এখন এতগুলো প্রাণিহত্যা নিবারণ করতে পারেন। অন্য আর কোনও উপায় নেই।"

কুঞ্জকে দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল আবার। কালো সিল্কের একখানা শাড়ি নিয়ে এসেছে।

"ওই টেবিলের ওপর রাখ। হাতির খাওয়া হল কি না দেখ। সাড়ে তিনটে বেজে গেছে, এখনই বেরুতে হবে।"

কুঞ্জ বেরিয়ে গেল। হিরণ্যগর্ভ তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"আপনি তাহলে আর দেরি করবেন না। এই নিন গগল্‌স্, আপনার রিভল্‌বারটাও নিয়ে নিন, এই যে"—আর একটা ড্রয়ার খুলে অ্যাটাচিটা বার করে দিলেন—"ও-ঘরে গিয়ে শাড়িটা বদলে আসুন চট করে, আমি ততক্ষণ একটু কফি করে ফেলি।"

তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে পাশের ঘরে চলে গেলেন হিরণ্যগর্ভ, যে ঘরে সন্ধ্যাবেলা তিনি খাবার খেয়েছিলেন।

তুঙ্গশ্রী বজ্রাহতবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর শাড়িটা তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন। অবশ্য আর-একটা ঘরে।

চার

ভৈরবীর পালা শেষ হয়ে আরম্ভ হয়েছে তোড়ী। মেঘসুন্দর মেতে উঠেছেন একেবারে। যে পিনাকধারী নীলকণ্ঠ অহিভূষণ সন্ন্যাসীর প্রেমাগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন সতী, যাঁর স্বপ্ন রাজকন্যা উমাকে তপস্বিনী করেছিল, সেই চন্দ্রমৌলি ভৈরবের আরাধনা করছিলেন এতক্ষণ ভৈরবী রাগিণী সমস্ত অন্তরের আকূতি দিয়ে। গম্ভীর সুরের অন্তরালে মধুর মিনতির সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী হতাশার, নিশীথিনীর বিরহের সঙ্গে প্রভাতের প্রত্যাশার যে সূক্ষ্ম মিলন ঘটছিল, যে অরূপ প্রতি মুহূর্তেই অপরূপ হয়ে ওঠার সম্ভাবনায় আবিষ্ট করে তুলেছিল কল্পনাকে, তার অবসান হয়েছে একটু আগে। মেঘসুন্দর তন্ময় হয়ে ভৈরবী রাগিণীর রূপটাই দেখছিলেন যেন চোখের সামনে। স্বচ্ছ স্ফটিকের গৃহে বসে সুনয়নী তন্বী আকুলকণ্ঠে গান গাইছে যে ভৈরবের উদ্দেশ্যে, কোথায় সে আত্মভোলা গঙ্গাধর! হাতের পদ্ম যে শুকিয়ে এল! আকাশের নীলে যার নীলকণ্ঠের আভাস, সূর্যালোকের প্রশান্ত মহিমায় যার প্রসন্নতার প্রতিচ্ছবি, অভ্রভেদী হিমালয়-শীর্ষ যার গম্ভীর রহস্যে বিরাট, কোথায় সে, কোথায় সে! দুই বাহু প্রসারিত করে লুটিয়ে পড়েছিল যেন ভৈরবী রাগিণী—আও আও পিয়তম তুহি। হঠাৎ থেমে গেল সব সুর, শেষ হয়ে গেল ভৈরবী, থেমে গেল হীরা বাইজী। আচ্ছন্ন হয়ে

বসেছিলেন মেঘসুন্দর। কারও মুখ দিয়ে কোনও কথা সরে নি অনেকক্ষণ। ভৈরবী রাগিণীর করুণ মিনতি নীরব কুয়াশার মতো দিশেহারা করে রেখেছিল মেঘসুন্দরকে খানিকক্ষণ। তানপুরার ঝঙ্কারে আবার তাঁর ঘোর কেটে গেল। তিনি চোখ খুললেন। কুয়াশা কেটে গেল ধীরে ধীরে। আবির্ভূতা হলেন তোড়ী। তোড়ীও ভৈরবের পূজারিণী। কিন্তু এঁর পূজার ধরনটা একটু বিভিন্ন। ভৈরবীর ব্যর্থতা ইনি যেন বুঝতে পেরেছেন। কমলপাণি হয়ে মহাকালকে ভোলাবার চেষ্টা তাই ইনি করছেন না। উদাসীনকে ভোলাবার চেষ্টা করা মানে—নিজের আত্মসম্মান হানি করা, এ কথাটা যেন বুঝেছেন তোড়ী। তাই তিনি ভৈরবকে গান শোনাচ্ছেন না। কিন্তু সমস্ত অন্তর গানে ভরে উঠেছে যে! উদ্বেলিত অন্তরের আবেগ যে বুক ফেটে বেরুতে চাইছে শত ধারায়। তাই নির্জন বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তন্বী তোড়ী অস্থির হয়ে, আর গান শোনাচ্ছেন—ভৈরবকে নয়, হরিণদের। তাঁর হিমকুন্দকান্তিতে তাঁর অজ্ঞাতসারেই ফুটে উঠেছে যেন মহাদেব-শিরোলগ্ন শিশু-শশীর রজতাভা, নয়নযুগলে সন্তর্পণে উঁকি দিচ্ছে শঙ্কাতুর প্রত্যাশা। নূতন রসে ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হচ্ছে মেঘসুন্দরের মন। ...হঠাৎ ঝন ঝন ঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন। স্বপ্নের প্রাসাদ ঝনঝন করে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

"হ্যাঁ—হ্যালো, হ্যালো, শুনছি, বল—কি খবর? তাই না কি?"

যে খবর শুনলেন তাতে মুখটা শুকিয়ে গেল তাঁর। শেয়ার মার্কেটের দালাল অতিশয় দুঃসবাদ দিলে একটা, ফোনটা রেখে সোজা হয়ে বসতে গিয়ে হাঁটুর ব্যথাটা টন টন করে উঠল।

"উঃ, উঃ, গেলুম গেলুম—নারায়ণ—নারায়ণ।"

একটু সামলে পর-মুহূর্তেই চড়া গলায় হুকুম দিলেন।—"গণপৎ সিং, রামবাবুকো বোলাও।"

নেপথ্যে একটা 'জি হুজুর' শোনা গেল।

মেঘসুন্দর আপন মনেই গজগজ করতে লাগলেন—"কোথা থেকে একটা অঘা ডাক্তার জুটেছে এসে আমার ভাগ্যে! ইন্‌জেক্‌শন করে কাঁথা সেলাই করে ফেললে, হাঁটুর ব্যথাটা কমাতে পারলে না এখনও।"

পর-মুহূর্তেই কিন্তু হাঁটুর ব্যথা ভুলতে হল তাঁকে দ্বারপ্রান্তে শিখরিণীকে দেখে। মন্মথ এখনও ফেরে নি তিনি জানেন। শিখরিণীকে দেখে মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন তিনি। মন্মথর এই গোঁয়ারতুমির জন্যে তিনিই যেন অপরাধী। তাঁকে কেউ অপরাধী সাব্যস্ত করে নি, তিনি নিজেই মনে মনে এটা ঠিক করে নিয়েছেন। তাঁর জমিদারি রক্ষা করবার জন্যেই তো মন্মথ যখন-তখন নিজের প্রাণ বিপন্ন করে বসে! তাঁর জন্যেই শিখরিণীকে এখানে থাকতে হয়, মন্মথকেও থাকতে হয়। মন্মথর কলকাতায় যা বিষয়-সম্পত্তি আছে, তাতে রাজার হালে থাকতে পারে সে কলকাতায়। তাঁর জন্যেই এখানে থাকতে হয়েছে ওকে। হিরণটা তো বিয়ে-থা করলে না। মন্মথকে অবশ্য সর্বেসর্বা করে রেখেছেন তিনি। মাঝে মাঝে তাঁর ইচ্ছে হয়, উইল করে বিষয়টা মন্মথকেই দিয়ে দেন। কিন্তু তখনই আবার মনে হয়, পূর্বপুরুষের বিষয় পরের ঘরে চলে যাবে। হিরণ যে রকম উড়ন-চণ্ডে, ওকেও দিতে ভয় করে। হয়তো বিষয়-আশায় বেচে বড় বড় চিড়িয়াখানা বানাতে শুরু করে দেবে।

কিন্তু তবু বংশধর তো। এখনও কিছু ঠিক করতে পারেন নি মেঘসুন্দর। শিখরিণীকে দেখে একটু বিপন্ন বোধ করলেন। মন্মথ এখনও ফিরল না—মাটি করলে দেখছি। তিনি জানেন, শিখরিণী কিছু বলবে না। ও কখনও কিছু বলে না, চুপটি করে থাকে। কিন্তু ওই চুপ করে থেকেই ও নিজের বক্তব্যটি বেশ প্রকাশ করে। কেশব যখন ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তখনও ও চুপ করে ছিল, বিয়ে করতে যখন দেওয়া হল না তখনও চুপ করে ছিল। কিন্তু ওই চুপ করে থাকার মধ্যেই মেঘসুন্দর এটুকু অন্তত বুঝতে পেরেছিলেন যে, কেশবকে বিয়ে করতে ওর আপত্তি ছিল না। অথচ শিখরিণী মুখ ফুটে কিচ্ছু বলে নি। ওর কুচকুচে কালো চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত ভাষা আছে একটা। মন্মথকে বিয়ে করে ও অসুখী হয় নি, কিন্তু সুখীও হয় নি খুব। পত্নীর কর্তব্যনিষ্ঠাটা তাই ঠিক আস্ফালন করে না, একটু বেশি করে যেন আঁকড়ে থাকতে চায়। ত্রুটির কোনও ছিদ্র দিয়ে তার মনের কথাটা যেন প্রকাশ না পায় এ বিষয়ে সর্বদা সচেতন। মুখ ফুটে কিচ্ছু বলে না। কিন্তু মেঘসুন্দর বোঝেন সব। আর সেইজন্যে ভয়ও করেন ওকে।

শিখরিণী এসে বললে—"কাকু, তোমার খাবার কি এইখানেই আনব।"

"কি খাবার করেছিস?"

"তুমি তো ডিমের হালুয়া করতে বলেছিলে।"

"বেশ, নিয়ে আয়।"

শিখরিণী তবল্‌চীর দিকে চেয়ে বললে—"আপনার জন্যেও আনব তো?"

তবল্‌চী মুসলমান, আদাব করে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

হীরা বাইজী পুজো না করে খাবেন না—শিখরিণী তা জানে, সুতরাং তাঁকে আর জিজ্ঞাসা করলে না।

"বিনি পোড়ারমুখীকে সকাল থেকে দেখছি না। আমার হাঁটুতে সেঁক পড়ে নি এখনও।"

"বিনুর মাথা ধরেছে বলছে। ঘুমুচ্ছে শুয়ে। সেঁকের ব্যবস্থা করছি।"

শিখরিণী ভিতরে চলে গেল। মেঘসুন্দর মনে মনে বললেন—মন্মথর কথা জিগোস পর্যন্ত করলে না একবার, অথচ—। হঠাৎ যেন অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়লেন তিনি। এই অনুক্ত অভিযোগের কি যে প্রতিকার করবেন, তা তাঁর মাথায় এল না। তা ছাড়া কি-ই বা করতে পারেন? মন্মথই বা ফিরছে না কেন এতক্ষণ? কাল সেই ছোকরা যে আলটিমেটাম্‌খানা দিয়ে গিয়েছিল, সেটা সামনেই পড়েছিল। সেটা তুলে চোখ বুলিয়ে দেখলেন একবার। যুগলগঞ্জের মিলেও স্ট্রাইক শুরু হয়ে গেছে এতক্ষণ! ক্যাণ্ডিল কোম্পানির শেয়ারের দাম এত পড়ে গেছে। ছি, ছি। আল্‌টিমেটাম্‌টা আর-একবার তুলে দেখলেন। মন্মথকে এসেই হয়তো আবার যুগলগঞ্জে ছুটতে হবে! শিখরিণী আবার চুপ করে থাকবে।....সর্বরঞ্জন এসে বিনীত-ভাবে নমস্কার করে বসল। সর্বরঞ্জন দে স্থানীয় উকিল একজন। খোশামোদ করবার জন্যে রোজ আসে একবার। গানের যদিও কিছু বোঝে না, সমঝদারের মতো মাথা নাড়ে তবু। লোকটাকে দেখে অকারণে আপাদমস্তক জ্বলে উঠল তাঁর। বেঁটে লোকটা ছুং ছুং করে কেবলই আসে মকদ্দমার সন্ধানে। মানুষ নয় যেন, বেড়াল একটা। এসেই গলা বাড়িয়ে তবল্‌চীর সঙ্গে কি ফুসফুস গুজগুজ শুরু করে দিয়েছে! দামোদর ভট্‌চাজ্জিও হাজির হলেন এসে। ইনিও একজন

স্তাবক। গানের বিষয়ে নানা শ্লোক মুখস্থ করে এসে শোনাবে খালি, অথচ গানের 'গ' বোঝে না। মেঘসুন্দরের হঠাৎ মনে হল, সর্বরঞ্জনকে কাজে লাগালে মন্দ হয় না। এক ঢিলে দুটো পাখিই মারা হবে। লোকটাকে বিদায় করাও হবে, মন্মথর ধকলটাও কমবে হয়তো।

"সর্বরঞ্জন, একটা কাজ করতে পারবে?"

"তা আর পারব না কেন? হুজুরের কাজ করবার জন্যেই আমরা হাজির আছি।"—ফোড়ন কাটলেন দামোদর।

মেঘসুন্দরের ইচ্ছে হল, লোকটার গালে গিয়ে ঠাস করে চড় মারেন একটা। কিন্তু তা মারবার উপায় নেই। প্রথমত—ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয়ত—অপরিহার্য প্রয়োজনও একটা। আশেপাশে দু-চারটে তাকিয়া থাকা যেমন প্রয়োজন, তাকিয়ার মতো দু-চারটে লোকও থাকা প্রয়োজন তেমনি। ওগুলোকে ঠেসে মেড়ে দুমড়ে অদ্ভুত ধরনের আরাম পাওয়া যায় একটা।

সর্বরঞ্জন উৎসুক নয়নে আদেশের প্রতীক্ষা করছিলেন।

"যুগলগঞ্জ মিলে আবার গোলমাল বেধেছে! কাল এক ছোঁড়া এসে আলটিমেটাম্ দিয়ে গেছে একটা। মন্মথ এখানে নেই, তুমি একবার খবরটা নাও দিকি!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও যাও"—বলে উঠলেন দামোদর।

দামোদরের দিকে চাপা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে সর্বরঞ্জন বেরিয়ে গেলেন। এই রোদে আট মাইল বাইক করা কি সহজ কথা! কিন্তু যেতেই হবে, উপায় নেই।

দন্তসর্বস্ব একটা হাসি হেসে দামোদর তখন বললেন—"হুজুরের হাঁটুটা কেমন আছে? আমি একটা—"

কিন্তু কথা তিনি শেষ করলেন না, হীরা বাইজীকে কথা কইতে দেখে সসম্ভ্রমে থেমে গেলেন।

হীরা বাইজী বললেন—"কাল যে মেয়েটি এসেছিল, সেও একজন শ্রমিকনেতা শুনলাম।"

"নেত্রী বলুন।"—বিকশিতদন্ত দামোদর ব্যাকরণটা সংশোধন করে দিলেন।

"কে, তুঙ্গশ্রী?"—সবিস্ময়ে বলে উঠলেন মেঘসুন্দর।

"হ্যাঁ।"

"তুমি কি করে জানলে?"

"কাল রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। আমরা ছেলেবেলায় একসঙ্গে পড়তাম।"

"আমার মিলে স্ট্রাইক করাতে এসেছে?"

"তা বললে না ঠিক।"

"তা কি বলে কখনও?"— চোখ মটকে ফোড়ন দিলেন আবার দামোদর।

"কিন্তু ওকে তো হিরণের সঙ্গে দেখলুম। সে রকম কিছু হলে হিরণ কি—"

"ও, ছোট হুজুরের সঙ্গে ছিলেন! তাহলে ও কিছু নয়।"—অনাহূতভাবে আবার মন্তব্য করলেন দামোদর। তাঁর চোখে মুখে কিন্তু যে ভাব প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল, তার সঙ্গে তাঁর মুখের কথার মিল আছে বলে মনে হল না। কথাটা বলে আড়চোখে ভিজে বেড়ালের মতো এমনভাবে চাইতে লাগলেন তিনি মেঘসুন্দরের দিকে, যার অর্থ—এত লোকের সামনে ছোট হুজুরের নিন্দাটা কেমন করে করি, কিন্তু হুজুরের তো কিছুই অবিদিত নেই।

দুজন ভৃত্য সমভিব্যাহারে দ্বারপ্রান্তে শিখরিণী আবির্ভূত হল আবার। খাবার নিয়ে এসেছে। মেঘসুন্দর আর তবলচীর সামনে ছোট ছোট তেপায়ায় নিপুণভাবে খাবারগুলি পরিবেশন করিয়ে শিখরিণী দামোদরের দিকে তাকিয়ে বললে—"ভটচাজ্জি মশাই, আপনাকে কিছু ফল-টল এনে দি?"

"তা দিতে পার, দু-একটা মিষ্টি দিলেও আপত্তি নেই।"

মেঘসুন্দরের দিকে চেয়ে শিখরিণী বললে—"কাকু, তোমার সেঁকের জল চড়িয়েছি। তুমি খেয়ে নাও, তারপর সেঁক দিয়ে দিচ্ছি।"

শিখরিণী চলে গেল আবার ভিতরে।

"হুজুরের হাঁটুর ব্যথাটা সারে নি তাহলে এখনও! মাদুলিটা তাহলে বেঁধে দিয়েই যাই। যজ্ঞেশ্বরের হাঁটু এতেই সেরেছে।"

"মাদুলি! কিসের মাদুলি?"

"ও একটা তুক। সাত ছেলের মাকে দিয়ে একটু আদা, একটু বেলের ছাল, আর গোটা চারেক গোঁদো পোকা বাটিয়ে তামার মাদুলিতে সেটা পুরে ধারণ করলে অব্যর্থ ফল হয়। স্বচক্ষে দেখা আমার। যজ্ঞেশ্বরকে ডাকিয়ে জিগ্যেস করে দেখুন। বললে বিশ্বাস করবেন না, হাঁটুটি তার ওই তানপুরার তুম্বাটার মতো হয়েছিল। এই মাদুলিতেই সারল। হুজুরকে কয়েকদিন থেকেই দেব ভাবছি—আদা, বেলের ছাল, গোঁদো পোকা সব জোগাড় করে রেখেছিলাম, কিন্তু সাত ছেলের মা পাওয়াই মুশকিল কিনা, একটি মেয়ে থাকতে পাবে না, উপর্যুপরি সাতটি ছেলে হওয়া চাই, আটটি হলেও চলবে না। এ অঞ্চলে এক আছে আমাদের ওই সমরের মা, সে কাল এসেছিল, তাকে ধরে বাটিয়ে নিয়েছিলাম। ধারণ করে ফেলুন ওটা আজই—"

লাল সুতোয় লটকানো ঢোলকের মতো বেশ বড় একটা মাদুলি বার করে উঠে দাঁড়ালেন দামোদর।

"কোথা পরতে হবে ওটা?"

"গলায়।"

"মাথা খারাপ নাকি তোমার! গলায় আমি ওই ঢোল ঝুলিয়ে বসে থাকব?"

"বেশি নয়, মাত্র তিনটি দিন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথাটা রাখুন হুজুর।"

করজোড়ে করুণকণ্ঠে এমনভাবে কথাগুলি বললেন দামোদর যে, মেঘসুন্দর আর আপত্তি করতে পারলেন না।

"দাও, ছাড়বে না যখন।"

দামোদর ভক্তিভরে মাদুলিটিকে প্রণাম করে ঝুলিয়ে দিলেন সেটা মেঘসুন্দরের গলায়।

"কি যন্ত্রণা!"—অস্ফুটকণ্ঠে স্বগতোক্তি করলেন তিনি।

দামোদর ভট্চাজ্জিরও খাবার দিয়ে গেল একজন ভৃত্য। খেতে শুরু করলেন সবাই।

"মাদুলি পরে ডিম-টিম খাওয়া চলবে তো?"

"সব চলবে।"

আহারপর্ব নীরবেই সমাধা হল। তারপর শিখরিণী নিয়ে এল সেঁকের সরঞ্জাম।

"আতর দিয়েছিস তো ভালো করে? বাবা, যা গন্ধ ওষুধটার!"

"দিয়েছি।"

"আস্তে, উঃ, তুলে তুলে দে না, মেরে ফেলবি না কি? নাঃ, আতর দিয়েও গন্ধ যায় নি—"

শিখরিণী নীরবে সেঁক দেওয়া সমাপ্ত করে চলে গেল।

তারপরেই এলেন ডাক্তার রামচন্দ্র। আসবামাত্রই গান গেয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন মেঘসুন্দর—

সব বীরত্ব হল যে ভোঁতা
গন্ধমাদন আনলে বয়ে,
বিশল্যকরণী কোথা—
কোথায় বল, কমল ব্যথা!

"কম হয় নি?"—স্মিতমুখে প্রশ্ন করলেন হৃষ্টপুষ্ট রামচন্দ্র।

"বেড়েছে।"

"আপনি সেই ওষুধটা খান—"

"ও বাবা! ওতে লিভার খারাপ হয় শুনেছি। লিভার খারাপ করতে হলে হুইস্কির মাত্রাটা বাড়িয়ে দিতে পারি, ও-ওষুধ খেতে যাব কোন্ দুঃখে?"

"স্যালিসিলেট মিকশ্চারটা খেয়েছিলেন কাল?"

"এক দাগ খেয়েছি। বড্ড বিশ্রী খেতে।"

"সিরাপ তো দিয়েছিলাম।"

"তাতে আরও খারাপ হয়েছে।"

"আচ্ছা আজ অন্য ওষুধ দিয়ে একটা পিল করে দি তাহলে?"

"আবার কি ওষুধ! লিভার-টিবার জখম করবে না তো আবার?"

"না। স্যালিসিলেট মিকশ্চারটাও খাবেন দু-একবার।"

"তুমি খাওগে যাও।"

"জিবটা দেখি।"

রামচন্দ্র রুটিন অনুযায়ী মেঘসুন্দরের নাড়ী, জিব, চোখ, পেট, বুক—সব পরীক্ষা করে দেখলেন। না দেখলে মেঘসুন্দর চটে যান মনে মনে। ব্লাডপ্রেসারও মাপলেন।

"কত এখন?"

মিছে কথা বললেন রামচন্দ্র—"আজ তো কম দেখছি। ১৭০ আর ১২০। অদ্ভুত কনষ্টিট্যুশন আপনার!"

খুশি হলেন মেঘসুন্দর। চোখে একটা ছদ্ম বিস্ময় প্রকাশ করে তবু প্রশ্ন করলেন—

"অদ্ভুতটা কি দেখলে?"

"এত বয়সে প্রত্যেকটি অর্গান একেবারে পার্‌ফেক্ট্। বাত বা ব্লাডপ্রেসার—ও কিছু নয়, আর ও বয়সে ইউরিনে সুগার অ্যালবুমেন থাকাটা স্বাভাবিক, চুলে পাক ধরাটা যেমন।"

এইটুকুই রামচন্দ্রের চাকরি। নানা ছলে এবং ছুতোয় মিথ্যা ভাষণটুকু একজন ডিগ্রীধারী ডাক্তারের মুখ থেকে শোনবার জন্যেই তাকে মাইনে দিয়ে রেখেছেন মেঘসুন্দর।

ডাক্তার-পর্ব সমাপ্ত হল। রামচন্দ্র চলে গেলেন। ফোন এল আবার। কলকাতার দালাল বলছে—আজকের দরেই শেয়ারগুলো বেচে দিলে দশ হাজার টাকার ওপর দিয়ে যাবে। কিন্তু ধরে রাখলে আরও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। কেমন যেন দুর্বল বোধ করতে লাগলেন মেঘসুন্দর, জবাব দিলেন—মন্মথর সঙ্গে পরামর্শ করে জানাবেন একটু পরে।

হীরা বাইজী তানপুরায় ধীরে ধীরে ঝঙ্কার দিলেন আবার। উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন মেঘসুন্দর। মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ ওয়েসিস দেখতে পেলেন যেন।

"কি ধরবেন?"—ভুরু নাচিয়ে প্রশ্ন করলেন দামোদর।

"তোড়ী।"

"ওঃ তোড়ী বল ভালো জিনিস। প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকে উল্লেখ রয়েছে এর—তোড়ীনাদাদিরামক্রী ভৈরবী বসন্তাশ্চ—"

"আমাকে একটুও কি রেহাই দেবে না তোমরা?" বোমার মতো ফেটে পড়লেন মেঘসুন্দর—"তোমার খোঁড়া ভাইপোটার চাকরি করে দেব দেব দেব, শপথ করছি। বাড়ি যাও তুমি।"

"যে আজ্ঞে।"—কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে দামোদর উঠে পড়লেন এবং সুট করে চলে গেলেন।

হীরা বাইজী তানপুরা রেখে দিয়ে সেতারে গত ধরলেন একখানা। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বেশ জমে উঠল। চোখ বুজে এল মেঘসুন্দরের। "বাঃ বাঃ, সাবাস সাবাস"—অস্ফুটকণ্ঠে বলতে লাগলেন।

কিন্তু আবার বাধা পড়ল। জুতো মশমশিয়ে রাইফেল কাঁধে মন্মথ এসে প্রবেশ করলেন।

"কি হল ওখানকার ব্যাপার?"— মেঘসুন্দর প্রশ্ন করলেন উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে।

"দাঙ্গা হয় নি।"

"যাক, বাঁচা গেল। তোমাদের দেখে সরে পড়ল বুঝি সব?"

"না, ওরা কেউ আসেই নি?"

"আসেই নি? তাহলে কি ভুল খবর পেয়েছিলে না কি?"

"খবর ঠিকই পেয়েছিলাম। ওরা দাঙ্গা করবে বলে তৈরিও হয়েছিল জানি, কিন্তু কেন যে এল না—তা বুঝতে পারলাম না।"

"যাক, তাতে দুঃখের কিছু নেই। বাঁচা গেছে। যাও, তুমি বিশ্রাম করগে একটু।"

"হিরণদা কোথায় গেলেন, তাও বুঝতে পারলাম না। হিরণদাকে নেবার জন্যে হাতি পাঠিয়েছিলাম কাল রাত্রে। এখনও পর্যন্ত হাতিও ফেরে নি, হিরণদারও পাত্তা নেই। সকালে একটা লোক গিয়ে খবর দিয়ে এল—হিরণবাবু সবাইকে ফিরে আসতে বললেন, দাঙ্গা আর হবে না। তিনি হাতি নিয়ে বাইরে যাচ্ছেন, বিকেল নাগাদ ফিরবেন। কোথায় যাচ্ছেন, কি বৃত্তান্ত—কিছুই সে বলতে পারল না। এখানে এসে কুঞ্জর মুখে শুনলাম, খুব ভোরে হিরণদা বেরিয়েছেন সেই ভদ্রমহিলাটিকে সঙ্গে নিয়ে।"

"কোন ভদ্রমহিলাটিকে?"

"কাল যিনি এখানে বসেছিলেন, তুঙ্গশ্রী না কি নাম যেন।"

"তুঙ্গশ্রীকে নিয়ে হাতিতে করে বেরিয়েছে? বল কি! হীরা বাইজীর মুখে যা শুনছি ভয়ঙ্কর মেয়েমানুষ ও! আমাদের যুগলগঞ্জ মিলে স্ট্রাইক করাবার চেষ্টায় এসেছে। কাল এক ডেঁপো ছোঁড়া এসে এই আল্‌টিমেটাম্‌ দিয়ে গেছে, এই দেখ।"

আল্‌টিমেটাম্‌খানা মন্মথর হাতে দিলেন। মন্মথ ভ্রূকুঞ্চিত করে দেখতে লাগলেন।

"খেয়ে উঠেই আবার ছুটতে হবে সেখানে দেখছি।"

"সর্বরঞ্জনকে পাঠিয়েছি। সে ঘুরে আসুক। তুমি ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করে নাও। হ্যাঁ, আর একটা বিষয়েও পরামর্শ করবার আছে। শেয়ারমার্কেটের ঘোষাল এখনই ফোন করেছিল। সেদিন ওই লোকটার পাল্লায় পড়ে অতগুলো টাকার শেয়ার কিনলাম, হু হু করে তার দর পড়ে যাচ্ছে নাকি! কেরোসিন তেল আর কয়লার দুর্ভিক্ষ দেখে ভেবেছিলুম যে, মোমবাতিব চাহিদাটা বুঝি বাড়বে, কিন্তু ঠিক উলটো হল দেখছি। তোমাকে আর দাঁড় করিয়ে রাখব না, চল, আমিই না হয় ভেতরে যাই। লাঠিটা দাও তো, হ্যাঁ, একটু ধর আমাকে—এই ঠিক হয়েছে—"

মন্মথর কাঁধে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মেঘসুন্দর।

তারপর হীরা বাইজীর দিকে চেয়ে করুণ হেসে বললেন—"এ বেলা ঝামেলার পর ঝামেলা জুটছে ক্রমাগত, এ বেলা আর জমবে না। ও-বেলা চেষ্টা করা যাবে। যাও তুমি পুজো সেরে খাওয়া-দাওয়া করগে।"

মন্মথর কাঁধে হাত দিয়ে লাঠি ধরে ধরে অস্ফুট কাতরোক্তি করতে করতে অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসব হলেন মেঘসুন্দর।

পাঁচ

তুঙ্গশ্রী-হিরণ্যগর্ভ সংবাদ নিম্নলিখিতরূপ।

ভোরবেলা প্রস্তুত হয়ে বেরিয়েই তুঙ্গশ্রী দেখলেন, বিরাট এক হাতির পিঠে বিরাট এক হাওদা। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। ইতিপূর্বে তিনি কখনও হাতিতে চড়েন নি। চড়তে অবশ্য কষ্ট হল না কিছু। সিঁড়ি ছিল। হাওদাতে বিছানাও ছিল বেশ। তুঙ্গশ্রী চড়বার পর হিরণ্যগর্ভ চড়লেন। হাতি চলতে শুরু করল গজেন্দ্রগমনে। কিছুক্ষণ নীরবেই বসে বইলেন দুজনে। হিরণ্যগর্ভ প্রত্যাশা করছিলেন, দাঙ্গার কথাই তুলবেন বোধ হয় তুঙ্গশ্রী। কিন্তু তুঙ্গশ্রী হঠাৎ অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন করলেন একটা—"আচ্ছা, কেশববাবু তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ করেছেন কেন বলতে পারেন।"

"সে বড় শোচনীয় ঘটনা। ওর স্ত্রীর লেপ্রসি হয়েছে।"

"লেপ্রসি? কুষ্ঠ?"

"হ্যাঁ।"

"স্ত্রীকে উনি খেতে পরতেও দেন না?"

"এত সব কথা কে বললে আপনাকে?"

"যেই বলুক, সত্যি কি না বলুন না।"

"দেয় না। ওর ধারণা, সুষমার বাবা— কেশবের স্ত্রীর নাম সুষমা—সব জেনেশুনে লেপ্রসির ব্যাপারটা লুকিয়ে ওর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে, আর এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে আমিও আছি।"

"আপনি আছেন—এ মনে করবার কারণ?"

"কারণ সম্বন্ধটা আমিই করেছিলাম।"

"আপনি করেছিলেন না কি?"

"হ্যাঁ, করেছিলাম। শিখরিণীর সঙ্গে যখন ওর বিয়ে হল না, তখন ও ক্ষেপে গেল যেন। সাত দিন খায় নি, স্নান করে নি, একটা ঘরে খিল দিয়ে চুপ করে পড়েছিল। তারপর হঠাৎ চলে গেল কলকাতা। শুনলাম, বিষয়ের খানিকটা বাঁধা দিয়ে পাঁচ লাখ টাকা ধার করেছে এক মাড়োয়ারীর কাছ থেকে। সেই টাকা নিয়ে ফিরে এল এখানে, এসে যথেচ্ছাচার আরম্ভ করে দিলে দিনকতক নিজের জমিদারিতে। গেরস্ত-ঘরের ঝি-বউরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। আমি অবশ্য বুঝতে পারছিলাম, কেন করছে!"

"কেন?"—প্রশ্ন করলেন তুঙ্গশ্রী।

"লোকে ডিলিরিয়ামে প্রলাপ বকে যে জন্যে। ক্ষ্যাপা কুকুর সবাইকে কামড়ে বেড়ায় যে জন্যে।"

"তারপর?"

একটু হেসে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"আমার কিন্তু এসব কথা আপনাকে বলা ঠিক হচ্ছে না বোধ হয়, কি দরকার পরচর্চা করে? আপনি দেশের উন্নতির জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন—আপনাকে অন্য অনেক কথা বলবার আছে আমার। আমি যে সব স্কীম করেছি তার জন্যে লোক পাচ্ছি না ভালো, আপনারা অনেক রকম খোঁজ রাখেন, হয়তো ভালো লোক যোগাড়ও করে দিতে পারেন, তা ছাড়া আমার ওপর যে শত্রুতাবোধটা জেগেছে সেটাও হয়তো কেটে যাবে আমার কথা শুনলে। বুঝতে পারবেন যে, আসলে আমরা একজাতেরই লোক, একসঙ্গেই কাজ করা উচিত, শুধু শুধু—"

"কেশববাবুর কথাটা শেষ করে ফেলুন আগে। ওঁর স্বরূপটা আমার আগে জানা দরকার, কারণ ওঁকে কেন্দ্র করেই দেশের কাজ আরম্ভ করেছি আমি। ওঁর সঙ্গে মতেরও মিল আছে আমার—"

একটু হেসে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"দেখুন, কারো স্বরূপ ঠিকমতো জানতে হলে তাকে ভালোবাসতে হবে। তার সম্বন্ধে কয়েকটা ঘটনা শুনলেই তার স্বরূপ জানা যাবে না। আমি তার বাল্যবন্ধু, তাকে ভালোবাসি, তাই তার সম্বন্ধে কতকগুলো কটু সংবাদ আপনাকে দিতে ইচ্ছে করছে না, আপনি হয়তো ভুল বুঝবেন তাকে।"

"আপনি তার স্বরূপটা চিনেছেন তো?"

"চিনেছি।"

"সেইটেই কি বলুন?"

"ও অসুস্থ।"

তুঙ্গশ্রী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—"বন্ধুকে অসুস্থ জেনেও তার বিয়ের সম্বন্ধ করতে গেলেন যে হঠাৎ?"

"ভেবেছিলাম, বিয়েটা হয়ে গেলে ও সুস্থ হবে। অবশ্য বিয়ের কথা আমার মনেই হতো না, যদি না কেশব সুষমাকে চিঠি লিখে বসত। সুষমার বাবা নবীনবাবু কেশবদেরই স্বজাতি।

সুষমা মেয়েটি রূপসী, কিন্তু গরিব বলে বিয়ে হচ্ছিল না। তাকে কেশব একদিন এক কুৎসিত প্রস্তাব করে চিঠি লিখে বসল। এতেই বুঝতে পারছেন, ওর মাথা কতটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নবীনবাবু আমাদের প্রজা, তিনি কাঁদতে কাঁদতে এবং কাঁপতে কাঁপতে চিঠি নিয়ে আমার কাছে এসে হাজির হলেন।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে হেসে বললেন—"এতক্ষণে আমার স্বভাবের একটু আঁচ পেয়েছেন আশা করি। কৌশল করে কাজ হাঁসিল করতে পারলে হাঙ্গামার মধ্যে আমি ঢুকতে চাই না। আমি ভাবলাম, ঢিলটা যদি ঠিক লেগে যায় একসঙ্গে তিনটি পাখি মরবে—কেলেঙ্কারি নিবারণ হবে, দরিদ্র নবীনবাবুর কন্যাদায় উদ্ধার হবে, কেশবের মাথাও ঠিক হয়ে যাবে। নিজেই গিয়ে কেশবকে বললাম। সে রাজী হয়ে গেল। দিনকতক ভালো রইল, কিন্তু অদৃষ্ট খারাপ, মেয়েটার হল লেপ্রসি। কে কেশবের মাথায় ঢুকিয়ে দিলে যে, আমিই ষড়যন্ত্র করে নাকি ওকে ওই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত মেয়েটা গছিয়ে দিয়েছি—বাস্, আবার সব গোলমাল হয়ে গেল। তারপর থেকে সেই যে কলকাতা চলে গেছে—আর ফেরে নি।"

আবার খানিকক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন হিরণ্যগর্ভ।

তারপর বললেন—"ওর মতো ও-রকম সাহসী প্রাণবন্ত লোক খুব কম দেখেছি। শক্তি আর উৎসাহ যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে ওর মধ্যে। কিন্তু একটি দোষেই ওর সর্বনাশ হয়ে গেছে, ভয়ঙ্কর দাম্ভিক, ইংরেজীতে যাকে বলে—Passionately vainglorious"

আবার খানিকক্ষণ নীরব থেকে বললেন—"আমার মনে হয়, শিখরিণীর সঙ্গে যদি ওর বিয়ে হতো তাহলে এসব কিছুই হতো না। কাকুর গোঁয়ারতুমির জন্যেই এই সর্বনাশটা হয়েছে। এ যুগে যে ও-সব গোঁড়ামি অচল তা তিনি বুঝলেন না।"

এ সুযোগ তুঙ্গশ্রী ত্যাগ করলেন না।

"আর একটা সর্বনাশও হবার যোগাড় হয়েছে কিন্তু—"

"কি?"

বিশু আর বিনুর কাহিনীটি তখন বললেন তিনি।

হিরণ্যগর্ভ বিস্মিত হলেন। বললেন—"আমি ওই রকম কিছু একটা আশঙ্কা করছিলাম। কিন্তু কাকুকে কিছু বলবার জো নেই, উনি একেবারে পাক্কা অটোক্র্যাট একটি।"

"আমি কিন্তু আশ্বাস দিয়ে এসেছি ওদের।"

"ও!"—হিরণ্যগর্ভের চোখে বিস্মিত কৌতুক চিকমিক করতে লাগল একটা। ক্ষণকাল তুঙ্গশ্রীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন—"আপনার প্ল্যানটা কি শুনি?"

"প্ল্যান কিছুই করি নি। প্ল্যান আপনাকেই করতে হবে।"

"আমার ওপর নির্ভর করে আপনি আশ্বাস দিয়ে এলেন? বেশ তো! আমি যদি প্ল্যান না করতেই পারি?"

"বাঃ, তা কি হয়, করতেই হবে।"

এই দাবির মধ্যে এমন একটা ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার সুর ফুটে উঠল যে, তা তুঙ্গশ্রীর নিজের কাছেই অশোভন ঠেকল একটু।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"কোনও রকম কৌশল করে এ কাজ

করা যাবে না। জোর করে করতে হবে। মুশকিল হয়েছে, বিনুকে কাকাই মানুষ করেছেন কি না! ভয়ানক আঘাত পাবেন।"

"যে কোন সংস্কার করতে গেলে কতকগুলো লোক আঘাত পাবেই। তা বলে কি চুপ করে থাকতে হবে?"

হিরণ্যগর্ভ চুপ করে রইলেন। শেষরাত্রের আলো-আঁধারিতে অদ্ভুত নীরবতা ঘনিয়ে এল একটা। তিক্তকণ্ঠে তুঙ্গশ্রী সহসা বলে উঠলেন—"আপনারা—যাঁরা ভারতীয় আদর্শবাদী তাঁরা—আসল কাজের বেলায় পিছিয়ে পড়েন। কাকাকে আঘাত দিতে হবে শুনেই আপনার নিশ্চয় রামায়ণের রামের কথা মনে পড়ছে।"

একটু হেসে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"রামায়ণে শুধু রামও নেই, ভরতও আছে, পরশুরামও আছে। রামের চরিত্রটাই বা আপনার খারাপ লাগছে কেন? যে প্রিন্সিপ্‌ল্‌ অর্থাৎ সত্য রক্ষা করার জন্যে আপনি আমাকে কাকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বলেছেন, রাম তো সেই সত্য রক্ষা করার জন্যেই রাজ্যত্যাগ করেছিলেন, পত্নীত্যাগ করেছিলেন!"

"কিন্তু রামের ওই প্রিন্সিপ্‌ল্‌ কি আজকাল চলবে, না, চলা উচিত?"

"কেন উচিত নয় তা তো বুঝি না। ওর রাজ্যত্যাগের মধ্যে যে মহত্ত্ব আছে সে সম্বন্ধে আশা করি কোনও সন্দেহ নেই আপনার। পত্নীত্যাগের মধ্যে যে মহত্ত্বটা আছে তা বুঝতে হলে সেকালের সমাজবিধি জানতে হয়। সেকালে ব্রাহ্মণরাই ছিলেন আইনকর্তা, ক্ষত্রিয়দের কাজ ছিল—সেই আইন মানা এবং অপরকে মানানো। সীতা যে ভাবে রাবণের গৃহে ছিলেন, সে ভাবে একজন সাধারণ স্ত্রীলোক থাকলে স্বতই তাকে সমাজ পরিত্যাগ করত। ওই ছিল আইন। সে আইন বদলাবার ক্ষমতা রামেরও ছিল না। রাম সীতাকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু যখন কানাঘুষো উঠল যে—রাম নিজের বেলায় আইন মানছেন না, তখন রাম ভেবে দেখলেন যে, তাঁর নিজের বা সীতার ব্যক্তিগত দুঃখ যত বড়ই হোক, রাজা হিসেবে তাঁকে আইন মানতেই হবে। তিনি সীতাকে যে কত ভালোবাসতেন—এ কথা মনে রাখলে তাঁর মহত্ত্বটা বুঝতে পারবেন। সমাজে থাকতে গেলে সমাজে প্রচলিত আইন মানতেই হবে। এই আইন মানার মধ্যেই যে কত বড় প্রচণ্ড পৌরুষ আছে তা যুদ্ধক্ষেত্রে বুঝতে পারা যায়, প্রাণ তুচ্ছ করে গুলির মুখে এগিয়ে যেতে হয় যখন কেবল আইনের খাতিরে।"

"কিন্তু পত্নীত্যাগের ও-রকম আইনটা কি ঠিক?—আমার এইটেই প্রশ্ন।"

"আপনি আমি প্রশ্ন করতে পারি, কিন্তু রামের সে রকম প্রশ্ন করবারও অধিকার ছিল না। পত্নীত্যাগ তো আজকালও করছে লোকে। যে ইয়োরোপের আদর্শে আপনারা আত্মহারা, তাদের পত্নীত্যাগের আইনই কি নিখুঁত? তবু সবাই মানছে। রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডকে আইন মেনে সিংহাসন ত্যাগ করতে হল। উনি যদি সেকালে জন্মাতেন, ওঁকেও হয়তো পত্নীত্যাগই করতে হতো। কারণ তখন নিয়ম ছিল পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ। সমাজের যার যেটুকু কর্তব্য, পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তা সকলকে করতেই হবে। আজকাল লোকে দশটা পাঁচটা আপিস করে যেমন। এইবার কিন্তু আমাকে নেমে পড়তে হবে। আমরা ভৈরবপুর মাঠের কাছাকাছি এসে পড়েছি।"

"নেমে পড়বেন? কেন?"

"আমাকে হয়তো ওরা চিনে ফেলবে। আপনি একাই যান না। আপনি শুধু বসে থাকবেন। যা বলবার রহমনই বলবে, ওকে আমি সব শিখিয়ে দিয়েছি।"

মাহুত রহমন ঘাড় ফিরিয়ে বললে—"হ্যাঁ, মাইজী, আপ চুপসে বৈঠে থাকেন। যে বলবার হামি বলে দিব।"

রহমান বহুকালের প্রাচীন মাহুত। প্রায় মেঘসুন্দরের সমবয়সী।

"আপনি নেমে কোথায় যাবেন?"—জিগ্যেস করলেন তুঙ্গশ্রী।

"আমি আকাশ-বিহারে যাচ্ছি। আপনি কাজটা সেরেই চলে আসুন সেইখানেই।"

"আকাশ-বিহার মানে?"

"ওই যে, দেখুন না।"

তুঙ্গশ্রী এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নি, ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা টাওয়ারের মতো রয়েছে।

"কি ওটা?"

"আকাশ-বিহার। এলেই বুঝতে পারবেন। এইখানে হাতিটা বসাও রহমন, অত দূর আর যেতে হবে না। আমি এটুকু হেঁটেই চলে যাব।"

বিপুলকায় মাতঙ্গ যখন মাহুতের আদেশে বসছিল, তখন তুঙ্গশ্রী হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়লেন হিরণ্যগর্ভের গায়ে। অপ্রতিভ ভাবটা সামলে নিতে অবশ্য দেরি হল না তাঁর। সোজা হয়ে বসে হিরণ্যগর্ভকে বললেন—"বিশু-বিনুর কথাটা ভাবুন কিন্তু একটু।" এমনভাবে বললেন যেন কিছুই হয় নি।

"আচ্ছা।"—নামতে নামতে উত্তর দিলেন হিরণ্যগর্ভ।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভৈরবপুরের মাঠে এসে পড়লেন তুঙ্গশ্রী। প্রত্যাশিত জনতাও দেখা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। কোদাল কাঁধে করে এগিয়ে আসছে সব। হঠাৎ হাতির উপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল রহমান গ্রামোফোনের চোং মুখে লাগিয়ে—"এই, রোককে— "

ঊর্ধ্বমুখ হয়ে থেমে গেল সবাই।

"বীরা দেবী আজ বাঁধ কাটনে মনা কর্ রহি হ্যাঁয়। ফয়সালা হো গিয়া। তুমি সব ঘর যাও।"

তুঙ্গশ্রীও হাত নেড়ে তাদের ফিরে যেতে বললেন।

তারা ঊর্ধ্বমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর 'জয় বীরা দেবী কি জয়' বলে ফিরে গেল।

আকাশ-বিহারের ঠিক নীচেই হিরণ্যগর্ভ অপেক্ষা করছিলেন। তুঙ্গশ্রী হাতি থেকে নামামাত্রই তিনি রহমনকে বললেন—"রহমন, তুমি একটা কাউকে দিয়ে মন্মথবাবুর কাছে খবর পাঠিয়ে দাও যে, দাঙ্গা হবে না বলে আমরা আর গেলাম না। হাতিটা রাখো। এখনই মুরারিপুর যাব।"

"বহুত খুব।"

তুঙ্গশ্রীর দিকে ফিরে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"আসুন, ওপরে ওঠা যাক।"

ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দুজনে ওপরে উঠতে লাগলেন।

"এ ব্যাপারটা কি?"

"কিছুই নয়, উঁচু টাওয়ার একটা—সাত তলা উঁচু—প্রত্যেক তলায় একটি করে ঘর আছে। সাততলার ওপর রেলিং দিয়ে ঘেরা খোলা ছাদ। বাস্, আর কিছু নেই। লটারিতে একবার হঠাৎ কিছু টাকা পেয়ে যাই। সেই টাকা দিয়ে এটা করিয়েছিলাম।"

"কী হয় এটাতে? এমনি পড়ে থাকে।"

"আমি মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেবার জন্যে পালিয়ে আসি এখানে। একটা ছোটখাটো টেলিস্কোপও আছে আমার, সেইটে দিয়ে মাঝে মাঝে জ্যোতিষ-চর্চাও করি। আমার মুরারিপুর স্কুলের ছেলেরাও মাঝে মাঝে আসে এখানে। রাত্রে থাকে, টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশ দেখে। তাদের উৎসাহ যদি দেখেন একবার—"

চারতলা পর্যন্ত উঠে হাঁপিয়ে পড়লেন তুঙ্গশ্রী।

"এর মধ্যেই হাঁপিয়ে পড়লেন! আচ্ছা, বসুন, এই ঘরটায় ঢুকে বিশ্রাম করে নেওয়া যাক একটু। এ ঘরটায় চৌকি-টৌকি আছে বোধ হয় একখানা।"

চৌকি ছিল। তুঙ্গশ্রী কিন্তু বসলেন না। ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখতে লাগলেন। ঘরটা প্রকাণ্ড এবং সম্পূর্ণ গোল। চতুর্দিকে জানলা। বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। দুটি জানলার মাঝে মাঝে মহাপুরুষদের ছবি। মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন তুঙ্গশ্রী। সিঁড়িতে পদশব্দ শুনে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ঘাড় ফেরালেন তিনি হিরণ্যগর্ভের দিকে।

"মাস্টার মশাই আসছেন বোধ হয়। উনিই আকাশ-বিহারের ইন্-চার্জ। আমাদের স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। রিটায়ার করে এখানেই আছেন। তিনকুলে কেউ নেই—"

দ্বারপ্রান্তে দীর্ঘাকৃতি আলখাল্লা-পরিহিত একটি পুরুষ এসে দাঁড়ালেন। হাতে একগোছা ঘেঁটুফুল। মাথার চুল পাকা, বাবরির আকারে ঘাড়ে এসে পড়েছে। গোঁফ-দাড়িও পাকা। চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত একটা স্নিগ্ধতা। হিরণ্যগর্ভ এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলেন।

"অনেক দিন আস নি। তোমার স্কুলের ছেলেদের খবর পাঠাব ভাবছিলাম। শনি আজকাল সন্ধের একটু পরেই দেখা যাচ্ছে বেশ। মঙ্গলও। দুজনেই সিংহ রাশিতে এসেছেন।"

"আমি এঁকে মুরারিপুর স্কুলে নিয়ে যাব এখনি, তখন বলে আসব তাদের।"

তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে মাস্টার মশাই বললেন—"এঁকে আগে তো দেখেছি বলে মনে পড়ছে না!"

"না, ইনি আর কখনও আসেন নি।"

"তোমাদের স্কুলের গৃহস্থালীতে লক্ষ্মীর প্রয়োজন একটি। মায়েদের কাছে না শিখলে শিক্ষাটা ছেলেদের ঠিক মনের ভেতর প্রবেশ করে না। শিক্ষা ব্যাপারে এঁর ঝোঁক আছে বুঝি?"

"আছে কি না ঠিক বোঝা যায় নি এখনও।"—মৃদু হেসে হিরণ্যগর্ভ বললেন।

"ও।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে মাস্টার মশাই বললেন—"তোমরা ওপরে যাচ্ছ তো? আমি ছিলাম এতক্ষণ ওপরে। নীচে যাই এবার। সারাদিন আর কোনো কাজ নেই তো, কেবল ওপর আর নীচে, ওপর আর নীচে। সারাজীবনই মনে হচ্ছে এই করেছি কেবল"—একটু হেসে দ্বারের দিকে অগ্রসর হলেন মাস্টার মশাই।

হঠাৎ আবদারের সুরে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"একটা গান শোনাবেন মাস্টার মশাই। অনেক দিন গান শুনি নি আপনার।"

"গান?"

একটু মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন—"আচ্ছা, বেশ, শোন। গলা তো আমার তেমন মিষ্টি নয়, তোমার ভালো লাগতে পারে। এঁর লাগবে না বোধ হয়—"

"আমারও লাগবে।"— হেসে বললেন তুঙ্গশ্রী।

"না শুনেই ঠিক করলে কি করে সেটা? আচ্ছা, শোন।"

মাস্টার মশাই গান ধরে দিলেন।—

মোদের দেশে,
ওরে ভাই মোদের দেশে,—
আকাশ নেমেছে গঙ্গার কূলে
গঙ্গার ধারা সাগরে মেশে।
আঁধারে শুনিয়া আলোর ভাষণ
তুচ্ছ করে যে পাঁকের শাসন।
সেই শতদলে নিজের আসন
পাতেন মোদের বাণী যে এসে।
যে দূর্বা রহে পায়ের তলায়
পূজার ডালায় সেই তো আগে
মাটি আর খড়ে স্বপন মিশায়ে
দেবতারে গড়ি কি অনুরাগে
সহস্র রবি যে আকাশে জ্বলে
আকাশ-প্রদীপ জ্বালি তার তলে।
তুলিয়া ধরি যে মাটির মহিমা
আকাশের বুকে মোরাই হেসে।
মোদের দেশে।

গানটা শুনতে শুনতে তুঙ্গশ্রীর মনে হল, এদেশের আদর্শে সত্যিই বড় কিছু ছিল বোধ হয় একটা—যা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। পায়ের তলায় মাটি আর দূর্বাকে পূজার উপকরণ করেছিল যারা, তাদের কাছে মানুষ নিশ্চয়ই ছোট ছিল না, যতই অবনত হোক সে মানুষ। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি একটু।

"হল তো এইবার! চলি আমি।"—উঠে পড়লেন মাস্টার মশাই।

"চমৎকার লাগল গানটা। আপনারই তৈরি না কি?"

"এসব গান কোনও বিশেষ লোকের তৈরি নয়। এদেশের মাটিই এর কবি। বেদের যুগ থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সবাই এই গান গেয়েছেন কথার একটু অদল-বদল করে। আমার কি এত বড় স্পর্ধা হতে পারে যে আমি বলব, এটা আমার তৈরি!" একটু হাসলেন, তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

"চলুন ওপরে যাওয়া যাক।"

"চলুন।"

উপরে উঠতে উঠতে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"অদ্ভুত লোক মাস্টার মশাই!"

"উনি কি আপনার মুরারিপুর স্কুলের হেডমাস্টার হয়েছেন এখন নাকি?"

"না। উনি মুরারিপুর স্কুলের কেউ নন, অথচ সব। যখন খুশি যান, যতক্ষণ খুশি থাকেন। হেন বিষয় নেই যা জানেন না।"

"মাইনে কত দেন?"

"মাইনে? ওঁকে মাইনে দেবার কথা ভাবতেও পারি না; তবে ওঁর প্রয়োজন সব মিটিয়ে দিই।"

"এইখানে একলা থাকেন?"

'উনি আর ধনপৎ সিং থাকেন। ধনপৎ এখানকার রক্ষক। ওঁর রান্না-টান্নাও করে দেয়। ওঁর হাঙ্গামাও নেই বেশি। একাহারী লোক। বেশির ভাগ দিনই দুধ আর ফল খান।"

আবার কয়েক মিনিট নীরবে কাটল।

হিরণ্যগর্ভ মাস্টার মশাইয়ের কথাই বললেন—'আমার রিসার্চের প্রেরণা উনিই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—খোঁজ খোঁজ, সারাজীবন খোঁজবার সাধনাই বিজ্ঞানের সাধনা। বিলিতী ওষুধের ফেরিওলা হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিও না শুধু—"

"আচ্ছা, আপনার রিসার্চটা কী নিয়ে বলুন তো?"

"রিসার্চটা? বলছি, বসুন আগে ভাল করে।"

ছাতের উপর এসে পড়েছিলেন তাঁরা। গোল ছাতের চারিদিকে সিমেন্টের গোল বেঞ্চিও ছিল। বসবার আগে তুঙ্গশ্রী দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। এত বড় বিরাট দিক্‌চক্রবালরেখা দেখেন নি তিনি আর ইতিপূর্বে। কলকাতায় মনুমেণ্টে উঠেছিলেন একবার, কিন্তু অসংখ্য পাকা বাড়ি আর কলের চিমনির আবরণে দিগন্তের রূপটা যেন ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। যোজনবিস্তৃত রৌদ্রোদ্ভাসিত সবুজ মাঠের প্রান্তে আকাশের এমন বিরাট নীল রূপ আর কখনও দেখেন নি তিনি। হিরণ্যগর্ভের কথায় আত্মস্থ হয়ে বসলেন।

"আমার রিসার্চটা খুব যে একটা আজগুবি ব্যাপার তা নয়। আমি প্রমাণ করতে চাইছি যে, ব্যাক্‌টিরিয়ারাই রোগের আসল কারণ নয়। কাল আপনাকে বলেছিলাম, আপনার মনে আছে বোধ হয় যে, ব্যাক্‌টিরিয়ারা উদ্ভিদ। অসুস্থ মানুষের দেহে ব্যাক্‌টিরিয়া নামক উদ্ভিদ আমরা পাই বটে, কিন্তু তার থেকে এটা নিঃসংশয়ে বলা যায় না যে, ব্যাক্‌টিরিয়ারাই রোগের কারণ। অসুখের সময় মানুষের দেহের তাপও বেড়ে যায় অনেক সময়, কিন্তু সেটা তো অসুখের কারণ বলে ধরি না আমরা। ওটা অসুখের একটা লক্ষণ বলে ধরি। আমার মনে হয়, অসুস্থ দেহে ব্যাক্‌টিরিয়ার আবির্ভাবও তেমনি একটা লক্ষণ। পোড়ো বাড়ির ছাতে যেমন অশ্বত্থচারা গজায়, মেঝেতে যেমন ঘাস হয়, তেমনি অসুস্থ দেহে এই ব্যাক্‌টিরিয়ারাও জন্মায়। জলে স্থলে চতুর্দিকে ছড়ানো রয়েছে ব্যাক্‌টিরিয়ার বীজ, সকলেই আমরা প্রতি মুহূর্তে ব্যাক্‌টিরিয়া খাচ্ছি, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নিচ্ছি, কিন্তু সকলেই তো একসঙ্গে অসুখে পড়ছি না! আমাদের শাস্ত্রে অবশ্য 'ভাইটালিটি' বলে একটা জিনিসের উল্লেখ আছে। আমি চেষ্টা

করছি, রসায়নের ভাষায় ওই অস্পষ্ট কথাটাকে তর্জমা করতে। আমি বার করতে চেষ্টা করছি শরীরের কোন্ জিনিসটার ঘাটতি বা বাড়তি হলে টাইফয়েড নামক উদ্ভিদ আমাদের দেহে জন্মাবার সুযোগ পায়। আমি সুস্থ জানোয়ারটাকে টাইফয়েড খাইয়ে দেখছি তাদের কিছু হয় কি না, ওই বাঁদরটাকে খাওয়াচ্ছি। ওই সাপটাকে দুধের সঙ্গে খাইয়ে দেখেছি—কিছু হয় নি, ইন্জেক্‌শন দিয়েছি—তাও কিছু হয় নি। বাঁদরটাকেও ইন্জেক্‌শন দিয়েছি একটা। এতেও যদি ওর কিছু না হয়, আমি নিজে পিওর কালচার খেয়ে দেখব খানিকটা। অর্থাৎ কক্‌স্ পশটুলেটগলো হাতে-কলমে করে দেখছি আর কি— ”

“সাপটাকে ইন্জেক্‌শন দিচ্ছেন কেন?”

“সাপ হচ্ছে রেপ্‌টাইল। কোল্ড-ব্লাডেড অ্যানিম্যাল। যে সব ব্যাক্‌টিরিয়া আমাদের, মানে, হট্-ব্লাডেড্ অ্যানিম্যালদের অসুখের কারণ তাতে ওদের কিছু হয় কি না—এই দেখছি আর কি! কৌতূহল—”

“ব্যাক্‌টিরিয়ার কাল্‌চার আপনি নিজে খাবেন?”

“হ্যাঁ, যদি দরকার হয়।”

“দরকার কখন হবে?”

“যদি বাঁদরটার কিছু না হয়। বাঁদরটার যদি কিছু হয়, তাহলে ওর রক্ত নিয়ে দেখব যে, রক্তে কোনও জিনিসের অভাব হয়েছে কি না! বাঁদরটা যখন সুস্থ ছিল, তখন ওর রক্তের সমস্ত রকম পরীক্ষা আমি করেছি। আমার নিজের রক্তেরও করে রেখেছি। অনেক টাইফয়েড-রোগীরও রক্ত-পরীক্ষার রেকর্ড আছে আমার কাছে।”

তুঙ্গশ্রী যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। লোকটা বলে কি! টাইফয়েডের ব্যাকটিরিয়া নিজে খাবে!

“তা তো বুঝলাম। কিন্তু আপনি নিজে টাইফয়েড ব্যাক্‌টিরিয়া খাবেন? আপনার ভয় করে না?”

“আপনার মুখে তো একথা সাজে না তুঙ্গশ্রী দেবী। পুলিশের গুলির মুখে আপনি এগিয়ে গিয়েছিলেন কি করে? আপনার ভয় করে নি?”

পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল।

তারপর হিরণ্যগর্ভ বললেন—“সত্যের সন্ধানে যারা যাত্রা করেছে, অসত্যের বিরুদ্ধে যাদের অভিযান, তাদের নিজেদের সুখ-দুঃখ বা ভয়-ভাবনা থাকতে নেই।”

একটা অবর্ণনীয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল তুঙ্গশ্রীর বুক।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন—“কাল ঘি নিয়ে কী করছিলেন?”

একটু হেসে হিরণ্যগর্ভ বললেন—“যক্ষ্মার সম্বন্ধে একটা উদ্ভট ধারণা আমার মাথায় ঢুকেছে। একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিকই বোধহয় এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন একটা। সেইটেকেই আর একটু নেড়ে-চেড়ে আমি দেখছি।”

“যক্ষ্মা সম্বন্ধে? কিছু করছেন নাকি আপনি”

নিজের যক্ষ্মাগ্রস্ত ভাইটির কথা মনে পড়ে গেল তুঙ্গশ্রীর।

“না করি নি কিছু এখনও। রিসার্চের ব্যাপারে চট করে কিছু করা যায় না। কেবল

হাতড়ে বেড়াতে হয়। সত্যটা কেবলই যেন এড়িয়ে যেতে চায়। রবীন্দ্রনাথের গানের চমৎকার একটা লাইন আছে— সেটা সুন্দর খেটে যায় এ সম্বন্ধে—'সে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে'। কিছুতেই যেন ধরা যায় না।"

হাসিমুখে চেয়ে বসে রইলেন।

"তবু কী করছেন শুনি না?"

"কিছুই করি নি, কল্পনা করেছি খালি। কল্পনাটা বলতে অবশ্য আপত্তি নেই। তাহলে আমাদের খাদ্যদ্রব্য কি করে হজম হয় তা একটু বলতে হয়। আমাদের খাদ্যদ্রব্য হচ্ছে—প্রোটিন অর্থাৎ আমিষ-জাতীয়, কার্বোহাইড্রেট শ্বেতসার-জাতীয়, ফ্যাট ঘি-জাতীয়, তাছাড়া ভিটামিন, সল্ট্স্, জল—এসবও আছে। আমরা যখন খাই, তখন এক জল-টল ছাড়া প্রত্যেকটা জিনিস হজম হয়, মানে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, যাতে সেগুলো আমাদের রক্তে সহজে প্রবেশ করে দেহের কাজে লাগতে পারে। রক্তে প্রবেশ করবার বেলায় কিন্তু বেশ একটা মজা হয়। সব খাবারই লিভারের ভিতর দিয়ে যায়, কেবল এক ফ্যাট ছাড়া। ফ্যাটকে রক্তে নেবার জন্যে প্রকৃতি আলাদা একটা রাস্তা বানিয়েছেন। সেটা একটা সরু নলের মতো জিনিস, পেটের ভিতর থেকে বুকের ভিতর দিয়ে সোজা সেটা এসে আমাদের গলার কাছে ভিনাস সিস্টেমে মিশেছে। অর্থাৎ ফ্যাট এসে ভিনাস ব্লাডে পড়েছে। সেখান থেকে যাচ্ছে রাইট হার্টে, রাইট হার্ট থেকে লাংসে। সেজন্যে মনে হয় যে, লাংস্ হয়তো কেবল নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেবার যন্ত্রই নয়, হয়তো ফ্যাট হজম করারও সাহায্য কিছু কিছু করে। এখন যক্ষ্মার যে জীবাণু আমরা দেখি, তার বিশেষত্ব হচ্ছে সেটা অ্যাসিড-ফাস্ট। অর্থাৎ ফুক্সিন নামক একটা লাল রঙের সঙ্গে তাকে যদি কিছুক্ষণ গরম করা যায়, তাহলে ওর গায়ের লাল রঙের একটা ছোপ ধরে যায়। সব ব্যাক্টিরিয়ারই ধরে। কিন্তু ওর গায়ের লাল রঙটা খুব পাকা হয়ে যায়, অ্যাসিড দিয়ে ধুলেও ওঠে না, তাই ওর নাম অ্যাসিড-ফাস্ট। ওর এই অ্যাসিড-ফাস্টত্বের কারণ বৈজ্ঞানিকরা বলছেন যে, ওর গায়ে নাকি ফ্যাটের তৈরি একটা ওয়াড় পরানো থাকে— ফ্যাটি ক্যাপসুল বলেছেন তাঁরা এই ওয়াড়টাকে। আমি ভাবছি লাংস নামব পরিপাক যন্ত্রের কোন প্রকার অপটুতার জন্য যদি ফ্যাট হজম না হয়, তাহলে সেই অর্ধেক হজম-করা ফ্যাট হয়তো লাংসে থেকে যায়, খাবার হজম না হলে খাবার যেমন পেট থেকে নামতে চায় না, তেমনি ফ্যাটও হয়তো লাংসে থেকে যায় এবং সাধারণ যেসব ব্যাসিলাস লাংসে সাধারণত বাস করে তারা ওই ফ্যাটের সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকে এবং ক্রমশ তাদের গায়ে একটা ফ্যাটের ওয়াড় মানে ক্যাপসুল হয়ে যায়। যক্ষ্মার যে জীবাণু আমরা যক্ষ্মা রোগের কারণ মনে করেছি সেটা হয়তো কারণ নয়, লক্ষণ। আসলে যক্ষ্মা হয়তো ঘি-জাতীয় জিনিস পরিপাক করবার ক্ষমতার অভাব, ডায়বিটিস যেমন কার্বোহাইড্রেট পরিপাক-করবার অক্ষমতা। যক্ষ্মায় জ্বর হয়, তার কারণ সম্ভবত ওই অজীর্ণ ফ্যাট। ফ্যাট শরীরে ঢুকলে যে জ্বর হয় তার প্রমাণ আমরা পাই মিলক্ ইন্জেকশান করলে। তাছাড়া আর একটা জিনিস দেখুন, বহু প্রাচীন কাল থেকে যক্ষ্মার চিকিৎসা হচ্ছে সহজপাচ্য ফ্যাট খাওয়ানো। যক্ষ্মা হলে শরীরের চর্বির ডিপোগুলো আগে খালি হয়ে যায়। আপনার বোধ হয় বিরক্তি ধরছে, নয়? এবার চলুন ওঠা যাক। কেমন লাগল আপনার এ জায়গাটা?"

"চমৎকার! আচ্ছা, আমার এক ভাইয়ের টি. বি. হয়েছে, কী করি বলুন তো?"

"ও, তাই নাকি? স্যানাটোরিয়ামে পাঠিয়ে দিন।"

"কেশববাবু স্যানাটোরিয়ামে একটা ব্যবস্থা করবেন বলেছেন।"

"আমি খুব ভালো ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আপনার। একটা স্যানাটোরিয়ামে কিছু টাকা দিয়েছি আমি, কাকুও দিয়েছেন, সেখানে আমাদের রোগীদের বিনাখরচে যাতে চিকিৎসা হয়, সে ব্যবস্থা আছে। আমি একটা চিঠি দিয়ে দেব আপনাকে। সেইটে নিয়ে আপনার ভাইকে পাঠিয়ে দিন কারো সঙ্গে, আপনি যদি যান আরও ভালো।"

"বেশ, যাবার সময় আপনার কাছ থেকে তাহলে একটা চিঠি নিয়ে যাব।"

"চলুন, তাহলে যাওয়া যাক এবার। আমার মুরারিপুর স্কুলটা আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। স্কুল অবশ্য সবে শুরু হয়েছে, দেখাবার মতো বিশেষ কিছু হয় নি?"

"চলুন।"

হস্তিপৃষ্ঠে চড়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মুরারিপুর স্কুল পৌঁছে গেলেন তাঁরা। বাইরে থেকে অবশ্য চমকপ্রদ কিছু চোখে পড়ল না তুঙ্গশ্রীর প্রথমে। ভিতরে ঢুকে একটু হতাশই হয়ে গেলেন। সারি সারি কতকগুলো খোড়ো ঘর। এক ধারে বাইকে ঠেসানো রয়েছে কয়েকটা পুরানো পুরানো চেহারার। দূরে একটা আটচালার ভিতর ছোটখাট একটা কারখানার মতো কি যেন। লাউ কুমড়ো শশা ঢেঁড়স প্রভৃতির ছোট ছোট ক্ষেত চারিদিকে। কিছু কিছু মুরগী হাঁসও আছে। গোরুও আছে কয়েকটা। গোরুর গাড়িও আছে দুটো তিনটে।

হিরণ্যগর্ভ বললেন—"ছেলেরা এখন চরকা কাটছে বোধ হয়।"

"কজন ছাত্র থাকে এখানে?" তুঙ্গশ্রী প্রশ্ন করলেন।

"আপাতত পঁচিশ জন আছে। সকলেরই বয়স কম। কিন্তু এ যা দেখছেন সবই ওরা করেছে। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা জমি আছে। নিজের হাতে চাষ করে এসব গাছ লাগিয়েছে ওরা। এই গোরু মুরগী হাঁসের সেবা সব ওরাই করে। এমন কি দুধ দুইতে পর্যন্ত শিখেছে। মহাত্মাজীর আদর্শেই করেছি এটা। তবে বেশির মধ্যে ছোট একটা মোটরের ওয়ার্কশপও করেছি, একজন মোটরমেকানিক আছে, সে হাতে-কলমে এদের এ-কাজটাও শেখাচ্ছে। কাপড় তৈরির যাবতীয় কাজ তো শিখবেই, এটাও শিখুক। আমার ইচ্ছে আছে, আমার মিলটাকে ফের যদি চালাতে পারি, তাহলে মিলের কাজটা হাতে-কলমে এদের শেখাব।"

"লেখাপড়া কিছু করে না এরা?"

"করে বইকি। হিন্দী শেখে, বাংলা শেখে, মোটামুটি অঙ্ক শেখে। অঙ্ক শিখতেই হয় ওদের—কারণ নিজেদের দোকান আছে, নিজেদেরই সব করতে হয় সেখানে। ওদের মোটামুটি ইতিহাস-ভূগোলও শেখানো হয়। আর ওরা প্রশ্ন করে করে এতরকম জিনিস শেখে যে তার ফর্দ দেওয়া শক্ত। ছোট ছেলেদের মনে কত অসংখ্যরকম প্রশ্ন জাগে জানেন তো, এখানকার শিক্ষক তার যথাসাধ্য উত্তর দেবার চেষ্টা করেন। নিজে না পারলে বই টই খুঁজে উত্তরটা বার করতে হয়। তাছাড়া আর একটা মস্ত জিনিস, পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে পরস্পরের সাহায্য নিয়ে সমাজে কি করে বাস করতে হয়, সেটা শিখছে ওরা। নাচ গান ছবি

আঁকা—এসব শেখাবারও ইচ্ছা আছে, কিন্তু লোক পাচ্ছি না, ভালো শিক্ষকের বড্ড অভাব।"

"এই স্কুল চালাতে মাসে কত করে খরচ পড়ে আপনার?"

"আমি আপাতত দুজন শিক্ষকের মাইনে দিই। আর এই জমিটা আমি দিয়েছি। ছেলেরা নিজেরাই চালিয়ে নেয়। আমি ওদের খাবার চালটা দিচ্ছি আপাতত। কিন্তু কথা আছে, সে খরচটাও ওরা নিজেরাই তুলে নেবে। এই সব আসছে।"

তুঙ্গশ্রী দেখলেন, একটা আটচালা থেকে একদল ছেলে বেরিয়ে আসছে। পিছনে একজন শিক্ষকও আসছেন। হিরণ্যগর্ভ ও তুঙ্গশ্রীও এগিয়ে গেলেন তাদের দিকে। হিরণ্যগর্ভকে দেখে ছুটে এল ছেলের দল তাঁর দিকে।

"কি খবর? সব ভালো তো?"

তাদের হাস্যোদ্ভাসিত মুখই তাঁর এ কথার জবাব দিয়ে দিলে।

শিক্ষক জীবনবাবু এগিয়ে হেসে বললেন—"আপনি এসে গেছেন ভালো হয়েছে, একটা সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারছি না, আপনি যদি পারেন করুন।"

"কি সমস্যা?"

"কেষ্ট জিগ্যেস করছে, আকাশ নীল কেন? কারণটা আমি ঠিক জানি না। আমার সায়ান্স ছিল না তো।"

হিরণ্যগর্ভ তুঙ্গশ্রীর দিকে ফিরে বললেন—"আপনি জানেন?"

"না"— হেসে উত্তর দিলেন তুঙ্গশ্রী।

"কেষ্ট কই?"

সাত বছরের একটি ছেলে এগিয়ে এল। দেখলেই মনে হয় খুব ছটফটে দুষ্টু ছেলে; প্রশ্ন করে মাস্টার মশাইকে পর্যন্ত ঠকিয়ে দিয়েছে—এই গর্ব তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে।

"তোমার কি মনে হয়?"—তাকেই প্রশ্ন করলেন হিরণ্যগর্ভ।

"আমি তো যোগেনকে বলছিলাম; কিন্তু মাস্টার মশাই বলছেন তা নয়।"

"কি বলেছিলে যোগেনকে?"

"বল্ না।"— যোগেনের দিকে চেয়ে কেষ্ট বললে।

যোগেন একটু লাজুক-প্রকৃতির ছেলে। সে ঘাড় হেঁট করে বললে—"ও বলছিল যে আকাশে ধোপা আছে, যারা কালো মেঘগুলোকে কেচে কেচে সাদা করে দেয়, সেইজন্যে আকাশ অত নীল। নীল দিয়ে কাপড় সাফ হয় কিনা!"

সবাই হেসে উঠলেন।

হিরণ্যগর্ভ বললেন—"ও কবি হবে দেখছি। আকাশের রঙ নীল কেন তা জানতে হলে প্রথমেই জানতে হবে যে, পৃথিবীতে আমরা যত রঙ দেখছি তার কারণ সূর্যের আলো। সূর্যের আলোয় সাতটা রঙ আছে, আমি একদিন আতশী কাচ এনে দেখিয়ে দেব—সাতটা রঙ মিশে আছে বলে সাদা দেখায়। আমাদের চারিদিকে এমন সব জিনিস আছে যারা সূর্যের এক-একটা রঙকে শুষে নেয় নিজের ভেতর, সে রঙটা তখন আর দেখা যায় না, দেখা যায় বাকিগুলি। সূর্যের আলো যখন আকাশের ভিতর দিয়ে আসে তখন আকাশ নীল রঙটা ছাড়া

বাকিগুলোকে শুষে নেয়, তাই কেবল নীল রঙ দেখতে পাই আমরা। ঘাস সবুজ, তার কারণ ঘাষ সবুজ রঙ ছাড়া আর সব রঙ শুষে নিয়েছে।"

"কি কি রঙ আছে সূর্যের আলোতে?"—আর-একটি ছেলে জিগ্যেস করলে।

"বেগুনী, ঘন-নীল, নীল, সবুজ, হলদে, জরদা, লাল।"

"তাহলে যার রঙ কালো, তাকে কালো দেখায় কেন?"

"সে সূর্যের সব রঙ শুষে নেয়। কোনও রঙ যাতে নেই তাই কালো দেখায়। আর যে সব জিনিস সাদা, তারা কোনও রঙই শুষতে পারে না।"

"ও"—গম্ভীরভাবে কেষ্ট বললে।

"এক-একটা জিনিস কেমন রঙ শুষে নিতে পারে একটা যন্ত্র নিয়ে তা বেশ দেখানো যায়। দেখি, যদি সেটা যোগাড় করতে পারি, তোমাদের দেখাব এনে।"

"কবে আনবেন?"—লাজুক যোগেন উৎসুক হয়ে উঠল।

"সব জিনিস আমার কাছে নেই, কলকাতা থেকে আনাব। ইনি আজ কলকাতা ফিরে যাবেন, এঁর হাতে আনতে দেব।"

তারপর শিক্ষক জীবনবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—"আমার কাছে কতকগুলো বিজ্ঞানের সহজ বই আছে। পাঠিয়ে দেব সেগুলো। হ্যাঁ, আর একটা কথা, মাস্টার মশাই এদের নিয়ে যেতে বলেছেন একদিন, শনি আর মঙ্গল দেখাবেন। এরা এখন কি করবে?"

"এরা জমি খুঁড়বে এখন কার্পাস বীজ লাগাবার জন্যে। আমাদের কম্পাউণ্ডের চার ধারে লাগিয়ে দিচ্ছি পনেরো হাত অন্তর অন্তর কার্পাস গাছ।"

"বেশ। তোমরা তাহলে কাজ করগে যাও। আমি এঁকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই একটু।"

ছেলেরা সব চলে গেল। শিক্ষক জীবনবাবু এঁদের সঙ্গে সঙ্গেই চলতে লাগলেন।

তুঙ্গশ্রী বললেন—"আকাশের নীল রঙের এ ব্যাখ্যা জানা ছিল না আমার।"

"আকাশের নীল রঙের ব্যাখ্যা মানে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা জানা আরও জটিল। প্রফেসর রমনের স্ক্যাটারিং এফেক্ট প্রভৃতি অনেক কাণ্ড আছে। তবে ছোট ছেলেদের কৌতূহল মেটাবার জন্যে আপাতত যা বললাম তাই যথেষ্ট।"

"পড়তে হবে তো।"

"ভারি অদ্ভুত!"

কিছুক্ষণ নীরবে কাটল।

"এদের ইতিহাস ভূগোল কি বই থেকে পড়ান? তুঙ্গশ্রী জীবনবাবুকে জিগ্যেস করলেন।

"বই থেকে পড়ানো ঠিক আরম্ভ করি নি এখনও। মুখে মুখে এইখানকারই ভূগোল ইতিহাস পড়াচ্ছি প্রথমে। প্রথমে আমাদের এই বিদ্যালয়ের ভূগোল শিখেছে ওরা, ছবি এঁকেছে। তারপর এই গ্রামটার ভূগোল পড়াচ্ছি, এরও ছবি আঁকবে ওরা। ইতিহাসও ঠিক ওইভাবেই হচ্ছে। এই বিদ্যালয়ের ইতিহাস, এই গ্রামের ইতিহাস থেকে শুরু করে তারপর ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যাওয়া যাবে।

হঠাৎ দেখা গেল, সামনের একটা বটগাছ থেকে একটি ছেলে লাফিয়ে নামল।

"ও ওখানে কী করছিল?"— বিস্মিত হিরণ্যগর্ভ প্রশ্ন করলেন জীবনবাবুকে।

"ও বোধ হয় পাখির বাসা দেখতে উঠেছিল।"

ছেলেটি কাছে আসতেই জীবনবাবু জিগ্যেস করলেন—"কি হল বিনোদ?"

হতাশার সুরে বিনোদ বললে—"অনেক উঁচুতে শালিকটা বাসা বানিয়েছে দেখলাম। আমার ঝুড়িতে যায় নি।"

"কি হয়েছে?"—হিরণ্যগর্ভ জিগ্যেস করলেন।

জীবনবাবু বললেন—"গাছের ওপর ও একটা ছোট্ট ঝুড়ি বেঁধে রেখে এসেছে। ওর ইচ্ছেটা কোনও পাখি এসে তাতে বাসা বাঁধুক। একটা শালিক কাল থেকে খড়কুটো নিয়ে যাচ্ছে ওখানে, তাই ও দেখতে গিয়েছিল, কোথায় বাসা বাঁধছে।"

"আমার ঝুড়িতে বাঁধছে না কেন? কি বোকা শালিকটা!"

"তোমার ঝুড়ি পছন্দ হচ্ছে না বোধহয় ওর!"—হিরণ্যগর্ভ হেসে বললেন।

"কেন, বেশ চমৎকার ঝুড়ি তো—"

"তোমার কাছে চমৎকার মনে হচ্ছে। ওর কাছে চমৎকার নয় হয়তো!"

"আসলে বোকা বড্ড।"

মুচকি হেসে একছুটে চলে গেল বিনোদ।

হিরণ্যগর্ভ ঘুরে ঘুরে সব দেখালেন তুঙ্গশ্রীকে। ছোট যে ডিস্‌পেন্সারিটি আছে সেখানেও নিয়ে গেলেন। একটি বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডার আপাতত সেখানকার কাজ করে। ছেলেরাই সাহায্য করে তাঁকে। ছোটখাট অসুখের চিকিৎসা এঁর সাহায্য নিয়েই করে সবাই। কারও অসুখ বাড়াবাড়ি হলে হিরণ্যগর্ভের ডাক পড়ে। তিনি মাসে দুবার করে এসে স্বাস্থ্যতত্ত্বও পড়ান, নানারকম রঙিন ছবি আর ম্যাজিক লণ্ঠনে স্লাইড দেখিয়ে।

...ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তুঙ্গশ্রী। রাত্রেও ঘুম হয় নি ভালো। চোখে মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ক্লান্তির ছাপ। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি যেন স্বপ্নের ঘোরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এসব যেন বাস্তব নয়, অলীক! একটু পরে স্বপ্ন ভেঙে যাবে।

"কোন্ ট্রেনে আপনি যাবেন?"

"এগারোটার সময় ট্রেন আছে না একটা?"

"আছে। সেটাতে যদি যেতে চান তাহলে এখানে আর দেরি করা ঠিক হবে না।"

"চলুন। যাওয়া যাক তাহলে।"

"চলুন। হাতিতে করেই আপনাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি একবার। বাড়িতে একবার নামতে হবে। আপনার জিনিসগুলো আছে। খেয়েও নেবেন একটু কিছু। আপনাকে স্যানাটোরিয়ামের সেই চিঠিটাও দিয়ে দেব। আর সায়েন্স কলেজে আমার একজন বন্ধু আছে, তাকে একটা চিঠি দিয়ে দেব। যদি একটা স্পেকট্রোস্কোপ যোগাড় করে পাঠাতে পারে, ছেলেদের তাহলে দেখাব। কাকুর সঙ্গে দেখা করবেন কি?"

"না, দরকার নেই। বাইরে বাইরেই আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিন। খাওয়া দাওয়ার হাঙ্গামা আর না-ই করলেন। রাস্তায় কোথাও কিছু খেয়ে নেব এখন।"

"আমি আসবার সময় কুকারে রান্না চড়িয়ে এসেছি। ভাতে ভাত। দুধ আছে অবশ্য। পেয়ারাও দিতে পারি গোটা কতক। পেয়ারা ভালোবাসেন নিশ্চয়।"

হিরণ্যগর্ভের চোখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল, যেন তিনি বালক, সঙ্গীকে পেয়ারার কথা বলে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করছেন।

"পেয়ারা বিশ্রী লাগে আমার।"—ঠোঁট উলটে বললেন তুঙ্গশ্রী।

"কলা? গোটা চারেক আছে বোধ হয় আমার বেতের বাক্সটায়।"

"আমার খাবার জন্যে এত ভাবছেন কেন?"

হাতঘড়িটা দেখে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"নটা পনেরো, যেতে চান তো পা চালিয়ে চলুন একটু।"

তুঙ্গশ্রীর হঠাৎ মনে হল, তাঁকে তাড়াতে পারলেই যেন বাঁচেন হিরণ্যগর্ভ। মনে হওয়ামাত্র মনটা বিষাদে ভরে উঠল। প্রচ্ছন্ন অভিমানও হল একটু।

ছয়

কেশব সামন্ত নিবিষ্টচিত্তে তাঁর গুম্ফপ্রান্তে কস্‌মেটিক লাগাচ্ছিলেন। সত্যিই দেখবার মতো গোঁফজোড়া তাঁর। পুরুষোচিত। যখনই তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন তখনই তিনি গুম্ফপ্রান্তে মনোনিবেশ করেন। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর করবার চেষ্টা করেন সে দুটোকে। তিন-তিনজন লোক পাঠিয়েছেন তিনি, একজনও এখনও ফিরল না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিনজনেরই ফেরার কথা। অথচ সকলেই বিশ্বাসযোগ্য। কথাটা মনে হওয়া মাত্র ভুরু কুঁচকে গেল। পৃথিবীতে কেউ বিশ্বাসযোগ্য আছে না কি? শিখরিণীকেই যখন বিশ্বাস করতে পারা গেল না, তখন ও-প্রশ্নের সঠিক উত্তর তো বহুকাল আগেই পাওয়া গেছে। না, বিশ্বাসযোগ্য কেউ নেই পৃথিবীতে। সকলের সঙ্গে স্বার্থের সম্পর্ক। শিখরিণীর সঙ্গেও যদি স্বার্থের সম্পর্ক থাকত, কুকুরের মতো লেজ নেড়ে নেড়ে ঘুরে বেড়াত তাঁর পিছু পিছু, পায়ে ধরে সাধ্যসাধনা করত—ওগো দয়া করে বকল্‌সটা আমার গলায় পরিয়ে দাও। গুম্ফপ্রান্তে আরও দুবার পাক দিলেন। না, একমাত্র ভরসার কথা, যাদের তিনি খেলাচ্ছেন তাদের স্বার্থের আঠাটা এত বেশি রকম চটচটে যে যোগাযোগটা সহজে বিচ্ছিন্ন হবে না। নগদ টাকার সম্পর্ক। যে তিনটি মেয়ে তাঁকে কেন্দ্র করে ঘুরছে তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের মানসলোকে যে নীহারিকা সৃষ্টি করেছে এবং তার মধ্যে যে-সব সূর্য-তারার সম্ভাবনা প্রত্যাশা করছে তার আকর্ষণও কম নয়।

আবার ভুরু কুঁচকে গেল কেশব সামন্তের। প্রত্যেকের সম্বন্ধেই কি এ কথা খাটে? ওই জেল-ফেরত অভাবগ্রস্ত বুভুক্ষু তুঙ্গশ্রীর সম্বন্ধে নিশ্চয়ই খাটে, বি. এ. পাশ-করা নমঃশূদ্রের মেয়ে বীরা দেবীর সম্বন্ধেও খাটে বোধ হয়—ঠিক, বলা যায় না, মেয়েটা কেমন একটু কাঠখোট্টা-গোছের। কিন্তু চপলা? ওই পতিতাটাও কি তাঁর সম্বন্ধে মোহ পোষণ করে না কি? কেশব সামন্ত তার কাছেও অভিনয়ের ত্রুটি করেন না যদিও, কিন্তু এরকম বহু অভিনয় দেখে বারংবার প্রতারিত হয়ে চোখ ফোটে নি কি ওর? ফোটা তো উচিত। চপলাকে প্রেম-বিহ্বলরূপ কল্পনা করে একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

চপলার সঙ্গে তিনি সম্পর্ক রেখেছেন গান শোনবার জন্যে নয়, চপলা-জাতীয় মেয়েদের সঙ্গে লোকে সাধারণত যেজন্যে সম্পর্ক রাখে সেজন্যেও নয়—ও-সব দিকে আর লক্ষ্যই নেই তাঁর আজকাল—তাঁর জীবনের একটি মাত্র লক্ষ্য এখন মেঘসুন্দর আর হিরণ্যগর্ভকে

ধ্বংস করা। সেইজন্যেই চপলার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয়েছে। অনেক গুণ্ডা ওর হাতে আছে। গুণ্ডার সাহায্য এখনও নিতে হয় নি তাঁকে যদিও, কিন্তু দরকার হলে তিনি নেবেন। আপাতত প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলে, মিলের শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে তুলে, হিরণ্যগর্ভের বড় সাধের আদর্শ মিলকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করবেন একটা। তারপর দরকার হলে প্রজাদের উত্তেজিত করবেন যাতে কেউ খাজনা না দেয়। আজকাল অভাবের দিনে এসব উত্তেজনা সৃষ্টি করতে বেগ পেতে হয় না,—বারুদ হয়ে আছে সবাই, স্ফুলিঙ্গ একটা ফেললেই হল। আর ওই ভুঙ্গশ্রী আর বীরা দেবীরা আর কিছু না পারুন কথার চকমকি ঠুকে স্ফুলিঙ্গ ছড়াতে পারবেন এনতার। যে চিন্তাটা মাঝে মাঝে তাঁর মনে বিদ্যুৎঝলকের মতো হানা দিয়ে যায় সেইটে আবার হানা দিয়ে গেল একবার। ভ্রূকুঞ্চিত করে গোঁফের ডগায় আবার পাক দিলেন বার দুই। সাম্যের এত বড় আদর্শটাকে এমনভাবে মুখোশের মতো ব্যবহার করা কি ঠিক হচ্ছে? তখনই আবার মনে হল, ঠিক নয়ই বা কেন! জীবন মানে যদি যুদ্ধ হয়, তাহলে যেন-তেন-প্রকারেণ জয়লাভ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। মুখোশ কে না ব্যবহার করছে? মহাত্মা গান্ধীর নাম করে ঘুরে বেড়াচ্ছে না খদ্দরধারী চোরের দল? ধর্মের মুখোশ পরে শিষ্যলোলুপ গুরুর দল আসর জমাচ্ছে না? হিরণ্যগর্ভের ওই আদর্শবাদটাও একটা মুখোশ, একটা 'পোজ'। মেঘসুন্দরের মুখোশও নেই, অনাবৃত পিশাচ একটা। তাঁকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছিল। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়ে গেল কেশব সামন্তর, স্বভাবত-লাল টানা টানা চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়বার মতো হল। ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল বার দুই। নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন তিনি খানিকক্ষণ। তারপর উঠে পড়লেন। উঠে তেতলার সেই ঘরটায় গেলেন, যে ঘরে কাউকে ঢুকতে দেন না তিনি। প্রথমে সিঁড়িতে তারপর ঘরে খিল বন্ধ করে দিলেন।

ঘরে একটা ক্যামেরা ছিল, ফোটো এন্‌লার্জ করবার ক্যামেরা। সেইটের দিকে নিস্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, মাতাল যেমন ভাবে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে মদের বোতলের দিকে চেয়ে থাকে। পাশেই ডার্ক-রুম। সন্তর্পণে ঢুকলেন সেখানে। লাল আলো জ্বালালেন একটা। যে নেগেটিভ তিনখানা ট্রেতে ভিজিয়ে রেখে গিয়েছিলেন, তুলে দেখলেন সে তিনটেকে। তারপর প্রিন্ট করতে দিলেন সেগুলোকে। একটা ড্রয়ার টেনে আর তিনটে ফোটো বার করলেন। এগুলো তৈরি রয়েছে। এইবার ব্যবহার করা যেতে পারে। ডার্ক-রুম থেকে বেরিয়ে এসে ফোটো তিনখানা বেশ মজবুত করে টাঙালেন দেওয়ালে সারি সারি। একটা হিরণ্যগর্ভের, একটা মেঘসুন্দরের আর একটা শিখরিণীর। ফোটো তিনটের দিকে চেয়ে রইলেন নির্নিমেষে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল বাঘের চোখের মতো। তারপর হঠাৎ পা থেকে চটি-জুতো খুলে মেঘসুন্দরের মুখে বসিয়ে দিলেন এক ঘা। হিরণগর্ভের মুখেও। তারপর পাগলের মতো ক্রমাগত মারতে লাগলেন। দেওয়াল থেকে পড়ে গেল ছবিগুলো। আবার তুলে টাঙালেন। তারপর আলমারী থেকে একটা রিভল্‌বার বার করে উপর্যুপরি গুলি বর্ষণ করলেন ছবি দুটির উপর। রিভল্‌ভারের সব কটা গুলি যখন শেষ হয়ে গেল, তখন একটা চেয়ারের উপর বসে হাঁপাতে লাগলেন তিনি। ছবিগুলোর দিয়ে চেয়ে দেখলেন আবার। হ্যাঁ, ঠিক লক্ষ্যভেদ করেছে। মাথায় বুকে মুখে তিন জায়গাতেই লেগেছে।

তারপর শিখরিণীর ছবিটার কাছে এসে বললেন—"তোমাকে গুলি করব না, তোমাকে আমার চাই। মন্মথকে সরিয়ে দিয়ে তোমাকে আমি অধিকার করব। মন্মথ নির্দোষ জানি, কিন্তু হি ইজ এ ট্রেস্‌পাসার। তাকে সরতে হবে। যে সিঁদুর সে তোমার মাথায় পরিয়ে দিয়েছে, সে সিঁদুর মুছে দেব আমি। নিজের রক্ত দিয়ে নতুন করে সিঁদুর পরিয়ে দেব তোমাকে।"

এই বলে পাশের টেবিল থেকে একটা ছুঁচ তুলে নিয়ে নিজের আঙুলে ফুটিয়ে দিলেন সেটাকে। টিপে রক্ত বার করলেন। সেই রক্তের টিপ পরিয়ে দিলেন শিখরিণীর কপালে। নির্নিমেষে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল গড়িয়ে পড়ল দু ফোঁটা। খানিকটা শান্তি পেলেন যেন। এই তাঁর নিত্যকর্ম। দিনের পর দিন তিনখানা ফোটো এন্‌লার্জ করে এই করছেন তিনি। অদ্ভুত নেশার মতো হয়ে গেছে একটা। রিভল্‌বারটায় নূতন টোটা পুরে আবার সেটা আলমারিতে পুরে রাখলেন। তারপর টেবিলের ধারে এসে বসলেন চুপ করে দুই হাতের উপর মাথা রেখে। যে অশ্রুধারা একটু আগে ঝরে পড়েছিল তা শুকিয়ে গেল ক্রমশ। মুখভাব কঠিন হয়ে উঠল আবার। ঈর্ষার ফুটন্ত আবর্তে সমস্ত মন আবর্তিত হতে লাগল। ক্রোধে ক্ষোভে পুড়ে যেতে লাগল যেন সর্বাঙ্গ। কলিং বেলের ঝনৎকারে হঠাৎ চমকে উঠলেন। নীচে নিশ্চয় এসেছে কেউ। হয় নগেন না হয় তুঙ্গশ্রী। বীরা দেবী এখানে আসবে না, কারণ এখানকার ঠিকানা তার জানা নেই। তার জন্যে একটা আলাদা বাড়ি ভাড়া করেছেন কেশব। বেলটা আবার বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি নেবে গেলেন তিনি। কপাটটা বন্ধ করতে ভুলে গেলেন। নীচে গিয়ে দেখলেন, নগেন এসেছে। নগেনই মিলে স্ট্রাইক করাবার জন্যে গিয়েছিল. একেই মেঘসুন্দর অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

"কি হল?"—হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন কেশব।

"আল্‌টিমেটাম্ দিয়ে এসেছি। আমাদের দাবি যদি না মেটান, স্ট্রাইক হবে।"

"তুমি নিজে গিয়ে আল্‌টিমেটাম্ দিয়ে এসেছ? বাঃ, ব্রেভো।"

"হ্যাঁ। মেঘসুন্দরবাবুর হাতে দিয়ে এসেছি।"

"কি বললেন তিনি?"

"কি আবার বলবেন, ক্ষেপে গেলেন আর ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো তেড়ে এলেন আমাকে।"

"তেড়ে এলেন? কি রকম?"

"দারোয়ান ডেকে মারধোর করে তাড়িয়ে দিলেন।"

"দারোয়ান ডেকে মারধোর করলেন? বল কি!"

"ও তো ওঁরা করবেনই। ওই দারোয়ানই তো ওঁদের সম্বল। তাকিয়া ঠেস দিয়ে বাইজীর গান শুনছিলেন, আমি গিয়ে পড়াতে রসভঙ্গ হয়ে গেল একটু। চটবেন না?"

"বস বস। আস্পর্ধা তো কম নয়, দারোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দিলে—"

নিজের পূর্বস্মৃতিটা হঠাৎ আবার মনে জেগে উঠল তাঁর। ক্রোধে লাল হয়ে উঠল সমস্ত মুখটা।

নগেন একটা চেয়ারে বসে বললে—"তাতে কি হয়েছে! ভালো কাজ করতে গেলে লাঞ্ছনা তো সহ্য করতেই হবে। দরকার হয়তো আবার আমি যাব। ওসব আমি গ্রাহ্য করি না।"

মৃদু হেসে নির্ভীক দৃষ্টি তুলে সে চাইলে কেশবের মুখের দিকে। আদর্শবাদী কলেজের ছেলে। আদর্শের জন্যে দরকার হলে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে সে। সরল চোখ দুটিতে উৎসাহের আলো ঝলমল করে উঠল নিমেষে।

"তোমাকে যেতেই হবে আবার। স্ট্রাইকটা করিয়ে আসতে হবে। হয়তো ভয় দেখিয়ে বা ভাঁওতা দিয়ে ওরা স্ট্রাইকটা হতে দেবে না।"

"বেশ, যাব আবার। আজই যাব?"

"বেশ তো। ওদের মধ্যেই থাক গিয়ে। কিছু টাকা না হয় দিয়ে দিচ্ছি তোমায়। কারণ স্ট্রাইকের সময় ওদের খাওয়া-দাওয়ার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো!"

"বেশ।"

"আচ্ছা, তুঙ্গশ্রী দেবীর কোনও খবর জান?"

"তিনি তো দেখলাম আসরে বসে বাইজীর গান শুনছেন।"

"বাইজীর গান শুনছেন?"

"তাই তো দেখলাম!"

"মেঘুবাবুর আসরে বসে?"

"হ্যাঁ। আমাকে যখন দারোয়নটা অপমান করে তাড়িয়ে দিচ্ছিল তখন সেখানেই বসেছিলেন। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলেন না।"

কেশব সামন্ত গোঁফের অগ্রভাগে পাক দিলেন দু-একবার অন্যমনস্কভাবে। তারপর নগেনের দিকে চেয়ে বললেন—"তোমাকে তো চেনেন না উনি। তাই হয়তো কিছু বলেন নি।"

"বাঃ, আমাকে না চিনলেও আমি যে শ্রমিকদের জন্যেই লাঞ্ছনা সহ্য করেছি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন উনি। সেখানে যারা ছিল সবাই বুঝতে পেরেছিল। উনি একটা প্রতিবাদও করতে পারতেন অন্তত। কিচ্ছু করলেন না।"

"কেন যে করেন নি, সেটা ওঁর সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারছি না। হয়তো এমন কোন ব্যাপার ছিল যার জন্যে সেখানে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে।"

নগেন চুপ করে রইল। কিন্তু তার মুখ চোখ দেখে বেশ মনে হতে লাগল যে, তুঙ্গশ্রীর ব্যবহারে মোটেই সে খুশি হয়নি। কেশব সামন্ত আড়চোখে চেয়ে দেখলেন এবার তার দিকে। নিজের দলের লোকেদের মধ্যে ঝগড়া যাতে না হয় সে বিষয়ে সর্বদা তিনি সচেষ্ট। তিনি জানেন, এই আত্মকলহই সব পণ্ড করে দেয় শেষে। তিনি আর এ বিষয়ে অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করে দেওয়াল-আলমারিটা খুললেন এবং একশো টাকার পাঁচখানা নোট নগেনের হাতে দিয়ে বললেন—"তুমি চলে যাও। যদি বোঝ যে কোনও বিষয়ে আমার পরামর্শ নেওয়া দরকার তাহলে চলে এস। তা না হলে যতদিন স্ট্রাইক চলে ততদিন ওখানে থেকো। আরও টাকার দরকার যদি বোঝ খবর দিও, পাঠাবার ব্যবস্থা করব।"

নগেন এই চাইছিল। এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজের একটা ভার পেয়ে সে যেন ধন্য হয়ে গেল। সোৎসাহে বেরিয়ে গেল টাকা নিয়ে।

কেশব সামন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ করে; শঙ্কা, চিন্তা, অনিশ্চয়তার অস্পষ্ট অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন খানিকক্ষণের জন্যে। কিছু একটা করতে হবে অবিলম্বে, মনের নিরালম্ব অবস্থা সহ্য করা অসম্ভব তাঁর পক্ষে। আবার তিনখানা ছবি নিয়ে পড়বেন? ছবি

তৈরি নেই এখন, যেগুলো প্রিন্ট করতে দিয়ে এসেছেন, সেগুলো হয়েছে কি? উপরের ঘরে যাবার সিঁড়ির দিকে দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন খানিকটা। আর একটা কথা মনে পড়াতে থেমে গেলেন হঠাৎ। বীরা ফিরেছে কি না খবর নিয়ে নিলে কেমন হয়? ট্যাক্সি করে যেতে কতক্ষণই বা লাগবে? ভ্রূকুঞ্চিত করে ডান দিকে গোঁফের ডগাটায় পাক দিলেন দুবার। কিন্তু তুঙ্গশ্রী যদি এসে উপস্থিত হয়? এসে তার ভাইকে দেখতে না পেয়ে সে আবার বেরিয়ে যাবে হয়তো। তার ভাইকে তিনি এখানকার একটা হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছেন তার অনুপস্থিতিতে। ও-রকম একটা টি.বি রোগী বাড়িতে রাখা ঠিক নয়। এর জন্যে তুঙ্গশ্রীর মানসিক বিপর্যয়টা সামলাবার জন্যে তাঁর নিজের থাকা দরকার। তা ছাড়া আর কেউ শোনবার পূর্বে ওখানে কি হল তা তিনিই প্রথমে শুনতে চান তুঙ্গশ্রীর মুখ থেকে। সে হয়তো কাউকে দেখতে না পেয়ে ওর পার্টির কারও বাড়িতে চলে যাবে। ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে গেল কেশবের। যদিও ওই পার্টির খবর তিনিই বহন করছেন, কিন্তু পার্টির ছোঁড়াগুলোকে তিনি পছন্দ করেন না তেমন। তুঙ্গশ্রীকে হাতে রাখবার জন্যেই ওই চার-পাঁচটা বখাটে ছোঁড়ার খরচ জুগিয়ে যেতে হচ্ছে তাঁকে। নগেনের পার্টির ছেলেরা এদের চেয়ে ঢের ভালো। না, থাকাই স্থির করলেন তিনি বাড়িতে। কিন্তু কি করা যায়? চুপ করে বসে থাকতে হবে? সে তো অসম্ভব। গ্রামোফোন রেকর্ড দেওয়া যাক দু-একখানা। বিলিতী নাচের অনেক রেকর্ড আছে তাঁর। উদ্দাম নৃত্যের সঙ্গে উদ্দাম বাজনা দিলেন একখানা। এর সঙ্গে আর একটা জিনিসও করে থাকেন তিনি। প্রাইমাস স্টোভটাও জ্বেলে দেন এর সঙ্গে। প্রাইমাস স্টোভের হু-হু শব্দের সঙ্গে জ্যাজ্ আর ক্যাকোফোনের কর্কশ সঙ্গীত যে আবহাওয়া সৃষ্টি করে তোলে, তাতে অদ্ভুত একটা আনন্দ পান কেশব সামন্ত। রেকর্ডটা দিয়ে স্টোভটা জ্বাললেন। তারপর ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সারা ঘরময়। একটা রেকর্ড শেষ হয়ে গেল, আর একটা রেকর্ড দিলেন, তাবপর আর একটা। কিছুক্ষণ পরে এ-ও ভালো লাগল না আর। একটা বই নিয়ে বসলেন। ডিটেকটিভের গল্প আর অপরাধীদের জীবনচরিত ছাড়া আর কিছু পড়েন না তিনি। বিখ্যাত ফরাসী খুনে ল্যানড্রুর জীবনচরিত থেকেই প্রথমে তিনি নারীচরিত্রের চিরন্তন দুর্বলতার আভাস পান। ল্যানড্রু বুঝেছিল যে, বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে ও-দেশের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েদের অতি সহজে আয়ত্তের মধ্যে আনা যায়। তিনিও ঠিক ওই ধরনের কৌশল অবলম্বন করে তুঙ্গশ্রী আর বীরাকে আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের ঠিক বিবাহের প্রলোভন দেখান নি, আকারে ইঙ্গিতে বিবাহের সম্ভাবনাটা ফুটিয়ে তুলেছেন কেবল। তাতেই কাজ হয়েছে। তুঙ্গশ্রী এবং বীরার মতো মেয়ে অপরিহার্য তাঁর পক্ষে। ওরা শক্তির জাত, ওদের তেজ আছে, ইচ্ছে করলে ওরাই আগুন জ্বালাতে পারে।

হিরণ্যগর্ভ আর মেঘসুন্দরের প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলতে ওরাই পারবে। সাম্যবাদের প্রতি ওদের প্রগাঢ় নিষ্ঠা। আদর্শের জন্যে যে-কোনও বিপদের মুখে ওরা এগিয়ে যেতে প্রস্তুত। ওদের একটিমাত্র দুর্বলতা, ওরা পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়, শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে চায়, এবং হৃদয়ও আকর্ষণ করতে চায় সম্ভবত। ওদের এই দুর্বলতার রন্ধ্রপথে প্রবেশ করেছেন কেশব সামন্ত।...অস্ট্রিয়ার ক্রাউন প্রিন্স রুডল্‌ফের নিদারুণ প্রণয়কাহিনীটাই আবার নিবিষ্টচিত্তে পড়তে লাগলেন তিনি। অনেকবার পড়েছেন, তবু আবার পড়তে লাগলেন। গল্পটা তাঁর ভারি ভালো লাগে। হতভাগ্য ওই রাজকুমারের বাসনাতপ্ত ক্ষুব্ধ জীবনের সঙ্গে তাঁর জীবনের সুর

যেন মেলে খানিকটা। রুডলফও সুখী ছিল না জীবন। যে রাজপরিবারের মেয়েকে সে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল তাকে একটুও পছন্দ হয় নি তাঁর। পড়তে পড়তে নিজের কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রীকে মনে পড়ল। যদিও তাঁর বিবাহের কারণ পরম্পরার সঙ্গে রুডলফের বিবাহের কারণ-পরম্পরার কোনও মিল নেই, তবু রোষে ক্ষোভে ঘৃণায় ঈর্ষায় সমস্ত মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল কেশব সামন্তর। হিরণ্যগর্ভের প্রতি মনটা নতুন করে বিরূপ হয়ে উঠল। হিরণ্যগর্ভই ষড়যন্ত্র করে এ সর্বনাশটা করেছে তাঁর। রুডল্‌ফ যেমন প্রণয়িনী মেরী ভেটসেরাকে নিয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যু আলিঙ্গন করেছিল, সেও কি তা পারবে? নিশ্চয় পারবে? শিখরিণী যদি আসে, নিশ্চয়ই পারবে। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন কেশব সামন্ত। শিখরিণীকে আসতে লিখলে সে কি আসবে না? যদি লেখা যায় যে, তাঁর জীবন বিপন্ন—মৃত্যুকালে তাকে একটিবার চোখের দেখা শুধু দেখতে চায়? তিনি জানেন, শিখরিণী তাঁকে ভালবাসে। হয়তো আসতে পারে, হয়তো সব বাধা তুচ্ছ করে চলে আসবে সে। ক্ষতি কি একখানা চিঠি লিখতে! হয়তো চিঠি পাবেন না, হয়তো মন্মথ বা মেঘসুন্দরের হাতে পড়বে চিঠিখানা। হয়তো তাকে দেবেই না। ছিঁড়ে ফেলে দেবে ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে। এসব সম্ভাবনা যে আছে তা জানেন তিনি। কিন্তু যদি পেয়ে যায়? পেয়ে যেতেও পারে। শিখরিণী ছাড়া আর কারও হাতে যদি চিঠিটা পড়ে, তাতে নতুন কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই তেমন, কারণ শিখরিণীর প্রতি তাঁর মনোভাবটা যে কি তা তো আর অবিদিত নেই কারও। শিখরিণীর কোন নূতন বিপদ হতে পারে এতে? ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবলেন খানিকক্ষণ। চিঠিখানা এমনভাবে লেখা যেতে পারে যাতে শিখরিণীর দিকে থেকে যে কোনও দোষ নেই, তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। উত্তেজনা ভরে কাগজ আর কলম টেনে নিলেন কেশব সামন্ত। লিখলেন—

"শিখরিণী, আজ পর্যন্ত কোনও খবর পাই নি তোমার কাছ থেকে। তুমি হয়তো আমাকে ভুলেছ, আমি কিন্তু তোমাকে ভুলি নি। আজ আমি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেবার আগে শুধু একবার মাত্র চোখের দেখা দেখতে চাই। এসো। ইতি কেশব।"

চিঠিখানা লিখে খামে পুরে ঘণ্টা টিপলেন। চাকরটা এসে দাঁড়াল।

"তুঙ্গশ্রী ফেরে নি এখনও?"

"না বাবু।"

"এই চিঠিটা।—আচ্ছা থাক্, আমিই যাচ্ছি। তুঙ্গশ্রী এলে অপেক্ষা করতে বলিস, আমি আসছি এখুনি।"

চাকরের হাতে চিঠি পোস্ট করতে দিতে ভরসা হল না। নিজেই দ্রুতপদে নেবে গেলেন। একবার ইচ্ছে হল রেজেস্ট্রি করে দেন, কিন্তু তখনই মনে হল রেজেস্ট্রি চিঠি নির্ঘাত মেঘসুন্দর বা মন্মথর হাতে পড়বে। এমনই পাঠাতে হবে। কিছুদূরে গিয়ে রাস্তায় মোড়ে পোস্টবাক্স দেখতে পেলেন একটা, থমকে দাঁড়ালেন সেটার সামনে। তারপর ঠিক করলেন পোস্ট অফিসে ফেলবেন—একেবারে বড় পোস্ট অফিসে।

"এই ট্যাক্সি—"

ধাবমান ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে পড়ল। উঠে পড়লেন তাতে কেশব সামন্ত।

"চলো জেনারেল পোস্ট অফিস।"

চলতে শুরু করল ট্যাক্সি। কেশব সামন্তের কেবলই মনে হচ্ছিল, যদি চিঠিটা পেয়ে যায়—যদি এসে পড়ে!...উনপঞ্চাশ বায়ুর তরঙ্গে তরঙ্গে মন ভেসে চলেছিল তাঁর। এলোমেলো একটা ঝড়ো হাওয়াও বইছিল, রাস্তার খড়কুটো কাগজের টুকরো উড়িয়ে।

তুঙ্গশ্রী এসে দেখলেন, নীচে কেউ নেই। নীচের যে ঘরটায় তাঁকে থাকতে দিয়েছিলেন কেশব সামন্ত, সে ঘরটায় তালা বন্ধ। তুঙ্গশ্রীর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল ক্ষণকালের জন্যে। কেশববাবু সব কথা টের পেয়ে গেছেন না কি? তাড়িয়ে দিয়েছেন নাকি খোকনকে? এ ঘরে তালাবন্ধ কেন? খোকন তো কখনও বাইরে যায় না, বাইরের যাবার ক্ষমতাই নেই তার। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। উপরে গিয়ে কেশব সামন্তর খোঁজ করবেন কি না ভাবছিলেন এমন সময় চাকরটা হাজির হল। সে পাশের গলিতে বিড়ি কিনতে গিয়েছিল। কুলিটা তাঁর জিনিসপত্র নামিয়ে পয়সা নিয়ে চলে গেল।

"দিদিমণি, আপনি এসেছেন? আপনাকে বাবু ওপরের ঘরে অপেক্ষা করতে বলেছেন. তিনি একটু বাইরে বেরিয়েছেন। জিনিসগুলো এখানেই থাক, আমি আছি।"

"খোকন কথা?'

"তাঁকে বাবু কাল হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"হাসপাতালে, কোন্ হাসপাতালে?"

"তা তো জানি না। জ্বর বেশি হয়েছিল, তাই বাবু হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন।"

"ও।"—ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থেকে উপরে উঠে গেলেন তুঙ্গশ্রী।

উপরে গিয়ে দেখলেন সামনের টেবিলে চিঠি লেখবার প্যাড রয়েছে একটা। নেড়ে-চেড়ে দেখলেন সেটাকে একবার। সেদিনের খবরের কাগজটা পাশেই ছিল। সেইটা তুলে দেখতে লাগলেন উলটে উলটে। হঠাৎ রাস্তার এলোমেলো দমকা হাওয়াটা ঘরে ঢুকল। উপরের ঘরের খোলা কপাটটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল, আবার খুলল, আবার বন্ধ হয়ে গেল। তুঙ্গশ্রী বেরিয়ে তেতলার সিঁড়িটার দিকে চেয়ে দেখলেন। দেখলেন তেতলার ঘরটা খোলা রয়েছে। একটা গন্ধ পেলেন। ভ্রূ-কুঞ্চিত হয়ে গেল তাঁর। বারুদের গন্ধ কি করে এল এখানে? সিঁড়ি বেয়ে তেতলার ঘরে উঠলেন তিনি। ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলেন। চারিদিকে রিভলবারের টোটা ছড়ানো। শিখরিণীর ছবিটা টাঙানো ছিল। তার কপালে লাল টিপ একটা। প্রথমে চোখে পড়ল সেইটেই, কিন্তু পরমুহূর্তেই হিরণ্যগর্ভ ও মেঘসুন্দরের গুলি বিদীর্ণ ফোটো দুটোও দেখতে পেলেন। নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপব ঘাড় ফিরিয়ে ক্যামেরাটা দেখলেন। সমস্ত ব্যাপারটা যেন জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে গেল তাঁর কাছে। নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলেন যে হিরণ্যগর্ভ কেশব সামন্তর সম্বন্ধে যা যা বলেছেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য। কথাটা বুঝতে পারা মাত্র তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটিটা যেন সরে গেল। হঠাৎ নিজেকে নিতান্ত নিঃসহায় নিঃসম্বল মনে হতে লাগল।

এর পর তো আর এখানে থাকে সম্ভব নয়, কিন্তু যাবেন কোথা? এই বিশাল কলকাতা শহরে কে আশ্রয় দেবে তাঁকে? ধীরে ধীরে নেমে এলেন নীচে। একবার ইচ্ছে হল সোজা নেমে বেরিয়ে চলে যান। কেশব সামন্তর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকে যাক এইখানেই। কিন্তু

যাবেন কোথায়? আবার মনে হল কথাটা! না, যাবার মতো কোনও স্থান নেই আপাতত। যে দেশের জন্যে তিনি জীবন পর্যন্ত পণ করেছেন সে দেশের এমন একজনও কেউ নেই যে, তাঁর সত্য পরিচয় শুনে আশ্রয় দিতে পারে। দেশ কি দেশপ্রেমের মূল্য দেয় কোনও? দেশের জন্যে প্রাণবিসর্জন দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করল যেসব বীর, তাদের সকলের নামও মনে নেই আজ দেশবাসীর। তাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় নি কেউ। উদ্বুদ্ধ হয়েছে কেবল চতুর ব্যবসায়ীরা, তারাই তাদের ছবি আর জীবনচরিতের পসরা সাজিয়ে টাকা রোজগার করছে। দেশপ্রেমের আদর্শকে কাজে লাগাচ্ছে কেশব সামন্তের দল নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের তাগিদে।

নীচে নেমে এসে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়লেন তিনি অবসন্ন হয়ে। পরমুহূর্তেই আবার সোজা হয়ে উঠে বসলেন। না, শঠের সঙ্গে ভদ্রতা করে কোনও লাভ নেই। যতক্ষণ নিজের নিরাপদ আশ্রয় একটা খুঁজে বার করতে না পারছেন, ততক্ষণ এইখানেই থাকতে হবে ভণ্ডামির মুখোশ পরে। খোকনকে স্যানাটোরিয়ামে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে অবিলম্বে। তাঁর এক দূর-সম্পর্কের কাকা আছেন এখানে—মাধবকাকা—তিনি যদি খোকনকে নিয়ে যেতে রাজী হন, ভালো হয়। কারণ তিনি কিছুকাল মাদ্রাজে ছিলেন। ও-অঞ্চলের পথঘাট চেনা তাঁর। তুঙ্গশ্রী নিজেই যাবেন ঠিক করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে এখন নতুন আশ্রয় খুঁজতে হবে একটা। তা ছাড়া যে ব্যাপারে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন সেইটেই চুম্বকের মতো টেনে রাখতে চাইছে তাঁকে এই কলকাতা শহরে। অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে একটা উপন্যাসের কৌতূহলজনক পরিচ্ছেদে আটকে পড়েছেন তিনি যেন।

সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল।

সোজা হয়ে উঠে বসলেন তুঙ্গশ্রী। কেশব সামন্ত প্রবেশ করলেন এসে।

"ও, আপনি ফিরেছেন? তারপর কি হল? আপনার জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম আমি।"

"হল না।"

"হল না মানে?"

"ধরা পড়ে গেলুম।"

"কি রকম?"

"প্ল্যানটা নিয়ে ফিরছিলাম, এমন সময় স্টেশনে হঠাৎ হিরণবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি সোজা এসে বললেন—মাপ করবেন, আপনার জিনিসপত্র সার্চ না করে আপনাকে আমি যেতে দেব না। যদি বাধা দেন, পুলিশ ডাকব।"

"তার পর?"

"তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে ট্রেনটা ছেড়ে গেল। দেখলাম, রাত্রে যখন ওখানে থাকতেই হবে তখন ওঁর সঙ্গে ঝগড়া করে কোনও লাভ নেই। ফিরে এলাম তাঁর সঙ্গে তাঁরই গাড়িতে।"

"জিনিসপত্র সার্চ করলে আপনার।"

"আমি নিজেই বার করে দিলুম। তারপর ব্যাপারটাকে হালকা করে দেবার জন্যে হেসে বললুম—ডিনামাইট দিয়ে ওড়াবার যে কথা আপনি বলছেন তা ভুল। কেশববাবু আপনার এই

মিলের প্ল্যান অনুসারে নিজে একটা মিল করাবেন, তাই আমাকে পাঠিয়েছিলেন প্ল্যানটা আনতে।"

"ডিনামাইটের কথা ও শুনেছে না কি?"

"সব শুনেছে। আমাদের দলের মধ্যে ওর গুপ্তচর আছে কে।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইলেন কেশব সামন্ত।

"আপনার ওই বানানো গল্পটা বিশ্বাস করলে হিরণ?"

"বিশ্বাস করেন নি বোধ হয়। তবে ও-সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনাও করেন নি। একটু চাপা-গোছের লোক মনে হল। বিশেষ কথাবার্তা আর বলেন নি আমার সঙ্গে। তবে অভদ্রতাও করেন নি তেমন কিছু।"

"কাল মেঘুবাবুর আসরে বসে বাইজীর গান শুনেছেন খবর পেলাম।"

"ও পেয়েছেন না কি!"—খুব সপ্রতিভ হাসি হেসে বললেন তুঙ্গশ্রী—"কে বললে আপনাকে?"

"নগেন। কাল সে মেঘুবাবুর কাছে আল্‌টিমেটাম্‌ নিয়ে গিয়েছিল একটা।"

"ও, হ্যাঁ, সে সময়ে আমি ছিলুম। হিরণবাবু আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন সেখানে, কি করি বলুন? মোগলের হাতে পড়েছিলুম তো, তাই খানাও খেতে হয়েছে একটু-আধটু। খোকনকে হাসপাতালে দিয়েছেন না কি?"

"একটা নার্সিং হোমে দিয়েছি আপাতত। আমার চেনাশোনা একজন ডাক্তারের নার্সিং হোম। ভালোই থাকবে সেখানে।"

"ঠিকানাটা কি? দেখে আসি তাকে একটু।"

"এই যে। ঠিকানা-লেখা কার্ডই আছে একখানা।"

ড্রয়ার খুলে কার্ডটি দিলেন তাঁকে।

"আমার ঘরের চাবিটা দিন। জিনিসপত্র বাইরে পড়ে আছে সব।"

"ও, হ্যাঁ। এই যে।"

চাবিটা নিয়ে তুঙ্গশ্রী বললেন—"আমি খোকনকে দেখে আসি একটু। ফিরতে হয়তো আমার রাত হয়ে যাবে। আমার জন্যে আপনি অপেক্ষা করবেন না যেন।"—হেসে বেরিয়ে গেলেন তুঙ্গশ্রী।

গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কেশব সামন্ত। নগেনকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে মেঘসুন্দর, আর তুঙ্গশ্রীর কাছ থেকে মিলের প্ল্যান ছিনিয়ে নিয়েছে হিরণ্যগর্ভ। গোঁফের সূক্ষ্ম ডগাকে সূক্ষ্মতর করতে করতে চিন্তা করতে লাগলেন তিনি—এখন কি কর্তব্য? ঠিক করলেন বীরার খবর নিতে হবে। বাঁধের ব্যাপারটা কতদূর কি হল দেখতে হবে। ঘণ্টা টিপলেন। চাকরটা আসতেই বললেন—"চা দে আমায় তাড়াতাড়ি। আমাকে এখনি বেরুতে হবে।"

চাকর চা করতে চলে গেল।

কেশব সামন্ত আর একটি বিলিতী অর্কেস্ট্রার রেকর্ড চড়ালেন গ্রামোফোনে।

ডাক্তার সেনগুপ্ত (যাঁর নার্সিং হোমে খোকনকে পাঠিয়েছিলেন কেশববাবু) তুঙ্গশ্রীর সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করলেন। গোলগাল নাদুসনুদুস ফরসা ভদ্রলোকটি। হেসে হেসে অনেক গল্প

করলেন। নিজের সমস্ত রোগীর কাছে নিয়ে গেলেন তাঁকে। খোকনের কাছেও নিয়ে গেলেন। দিদিকে দেখে খুশি হল খোকন। তার রোগা মুখে প্রদীপ্ত চোখ দুটি আরও প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। এতগুলি যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীকে একসঙ্গে দেখে কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন তুঙ্গশ্রী। তিনি আরও বিমর্ষ হয়ে পড়লেন যখন ডাক্তার সেনগুপ্ত বললেন যে, প্রতি বৎসর কোটি কোটি লোক মারা যাচ্ছে এই রোগে। দেশের স্বাধীনতা ভোগ করবার জন্যে বেঁচে থাকবে তাহলে কে? তাঁর মনে হল ডাক্তাররাই দেশের সেবক। হিরণ্যগর্ভের কথাও মনে পড়ল।

"একটা অবান্তর কথা জিগ্যেস করছি ডক্টর সেনগুপ্ত, কেউ যদি টাইফয়েড কালচার খেয়ে ফেলে তার কি হবে?"

প্রশ্নটা শুনে ডাক্তারবাবু বিস্মিত হয়ে গেলেন একটু।

"টাইফয়েড কাল্‌চার খাবেন? কেন?"

"যদি কেউ খায়, তাহলে কি হবে জানতে চাইছি।"

"খুব সম্ভবত টাইফয়েড হবে।"

"টাইফয়েড তো খুব সাংঘাতিক অসুখ, নয়?"

"খুব সাংঘাতিক। সে কথা আবার বলতে।"

চুপ করে রইলেন তুঙ্গশ্রী। ডাক্তারবাবুও চুপ করে রইলেন।

"আমার ভাইকে স্যানাটোরিয়ামে পাঠানোই ভালো তাহলে?"

"নিশ্চয়।"

"আচ্ছা, দেখুন তো, এটা কি রকম স্যানাটোরিয়াম?'

পকেট থেকে হিরণ্যগর্ভের চিঠিটা বার করে দেখালেন।

"এটা খুব ভালো। এখানে যদি ফ্রী সীট পান সে তো ভাগ্যের কথা। এঁরা কি ডোনার সেখানকার?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে যত শীঘ্র সম্ভব সেইখানেই নিয়ে যান।"

"আচ্ছা সেই ব্যবস্থাই করি তাহলে।"

হাসপাতাল থেকে তুঙ্গশ্রী চলে গেলেন তাঁর মাধবকাকার কাছে।

বীরা দেবী একটু বলিষ্ঠ প্রকৃতির মহিলা। যদিও ফরসা তবু হঠাৎ দেখলে সাঁওতালনী মনে হয়। দেহের গঠন বেশ আঁটসাঁট। ঠোঁট বেশ পুরু, ভ্রূযুগলও বেশ চওড়া, চোখের দৃষ্টি শুধু নির্ভীক নয়, একটু উদ্ধতও। তিনিও একটু আগেই ফিরেছিলেন। তিনি সোজা ট্যাক্সিতে গিয়েছিলেন এবং ট্যাক্সিতে ফিরেছেন। তিনি ট্রেনে যেতে রাজী হন নি। তাঁর মতে ট্রেনে অযথা সময় বেশি লাগে। বলা বাহুল্য, সমস্ত খরচই কেশব সামন্তর। অস্পৃশ্য এবং অত্যাচারিতদের উদ্ধারসাধনকল্পে যে ছোট বাড়িটি কেশব সামন্ত ভাড়া করে দিয়েছিলেন বীরা দেবীকে, সে বাড়িতে বীরা দেবী এবং বীরা দেবীর একটি ভাই থাকেন। ভাইটি কলেজে পড়ে। বাইরের ছোট ঘরটি অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অফিসের জন্য যে পিওনটা কেশব সামন্ত রেখেছেন সে বীরা দেবীর ঘরের কাজকর্মও করে। ট্যাক্সি থেকে কেশববাবু যখন নামলেন, তখন এই পিওনটি বাইরের ঘরে বসে ভজন গাইছিল। কেশববাবুকে দেখে সে ভজন থামিয়ে উঠে দাঁড়াল।

"মাইজী ফিরেছেন?"

"হাঁ বাবু, একটু আগেই ফিরেছেন।"

"খবর দাও।"

চাকর একটু ইতস্তত করতে লাগল।—মাইজী বলেছেন যে, ছোটদাদাবাবু বাড়িতে না থাকলে বাইরের কোনও লোকের সঙ্গে দেখা করবেন না।"

কেশববাবু ধমকে উঠলেন।

"তুমি বলগে যাও— কেশববাবু এসেছেন। তোমাকে ডেঁপোমি করতে হবে না।"

ধমক খেয়ে চাকরটা চলে গেল। কেশববাবু বাইরের ঘরের চেয়ারটায় বসলেন গিয়ে। অনেকক্ষণ বসে থাকতে হল তাঁকে। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে বীরা দেবী এলেন।

"আপনি অনর্থক শিবুকে বকলেন কেন? ব্রাহ্মণ কাঁদছে। সত্যিই আমি চাই না যে, নিখিল যখন থাকবে না তখন বাইরের কেউ আসুক।'

বীরা দেবী ইচ্ছে করেই বেশী মাইনে দিয়ে একজন ব্রাহ্মণ চাকর রেখেছেন। তাকে দিয়ে জুতো পরিষ্কার পর্যন্ত করান। যে কুসংস্কার এতদিন তাঁর পিতামাতা ও পূর্বপুরুষদের অস্পৃশ্য করে রেখেছিল, তার বিরুদ্ধে এই সফল প্রতিবাদ করতে পেরে প্রতি মুহূর্তেই তিনি আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেন। কিন্তু তাই বলে তিনি শিবুর প্রতি নিষ্ঠুর নন। বরং একটু অধিক মাত্রায় সদয়। অভাবের তাড়নায় বেশি বেতনের লোভে শিবুকে এই অস্পৃশ্যার সেবা করতে হচ্ছে বলেই তার মনটা বেশি স্পর্শকাতর সম্ভবত। একটু ধমকালেই তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ে। তার চোখে জল দেখে বীরা দেবী একটু বিচলিত হয়েছিলেন এবং একটু রুষ্ট হয়েই বেরিয়ে এসেছিলেন।

"আমি আসি, এটাও আপনি চান না?"—কেশববাবু বললেন বিস্মিত কণ্ঠে।

'না।"—দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন বীরা দেবী।

নির্বাক হয়ে রইলেন কেশব সামন্ত। এর উত্তরে কি যে বলবেন তা মাথাতেই এল না তাঁর। কোনও যুবতী যদি একা কারও সঙ্গে দেখা করতে অনিচ্ছুক হয়, তাহলে কি-ই বা বলবার থাকতে পারে? ক্রোধপ্রকাশ না করাটাই এখন আত্মসম্মান বজায় রাখবার একমাত্র উপায়। কিন্তু তাঁর চোখে-মুখে প্রকাশ হয়ে পড়ল সেটা।

একটু তিক্ত হাসি হেসে এবং গোঁফের ডগায় একবার পাক দিয়ে কেশব বললেন—"বাঁধের ব্যাপারটা কি হল তাই জানতেই আমি এসেছি। এমন সময় আপনার সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাৎ করার আর কোনও উদ্দেশ্য নেই আমার।"

শেষে এই অংশটুকু না বললেও পারতেন। তাহলে বীরা দেবীর মুখ দিয়ে নিরানন্দজনক উত্তরটাও এত রূঢ়ভাবে হয়তো নির্গত হতো না।

"বাঁধ কাটলে জেলেদের যা লাভ হতো, তার চেয়ে ঢের বেশি লাভের বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন তাদের হিরণবাবু। সেইজন্যে বাঁধ কাটা হয় নি।"

একটা তপ্ত লৌহ-শলাকা কেউ যেন বিঁধিয়ে দিলে কেশব সামন্তর ব্রহ্মরন্ধ্রে।—"হিরণবাবু জেলেদের বেশি লাভের কি বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন তা জানতে তো আপনাকে পাঠাই নি ওখানে এত খরচ করে। আপনাকে পাঠিয়েছিলাম জেলেদের নিয়ে গিয়ে বাঁধটা কাটিয়ে দিতে। তার কি করেছেন, সেইটেই জানতে চাই।"

মৃদু হেসে বীরা দেবী বললেন—"একটা কথা মনে রাখবেন কেশববাবু, আমি আপনার চাকর নই। আমার জীবনের ব্রত অস্পৃশ্যদের সেবা করা। আপনারও সেই একই উদ্দেশ্য বলেই আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। আপনি এ কাজে সাহায্য করেছেন অর্থ দিয়ে, আমি করছি সামর্থ্য দিয়ে। আমরা সহকর্মী, আমাদের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক নয়। আমি বাঁধ কাটবার সমস্ত বন্দোবস্ত করে মহিমগঞ্জে চলে গিয়েছিলাম একটা হরিজনদের সভায় বক্তৃতা দিতে। এসে শুনলাম. যা শুনলাম, তাতে একটু আশ্চর্য লাগল—"

বীরা দেবীর কথার সুরে যদিও কেশব সামন্তর সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল, তবু তিনি আত্মসংবরণ করে বলেন—"কী শুনলেন?"

"শুনলাম, হিরণবাবুদের হাতিতে চড়ে ঠিক আমার মতো পোশাক-পরা একটি মেয়ে ভৈরবপুরের মাঠে এসে জেলেদের নাকি ফিরে যেতে বলেছে। তাঁরা বাঁধ কাটতেই আসছিল।"

"আপনার মতো পোশাক-পরা মেয়ে, হাতিতে চড়ে? তারপর?"

"আমি ফিরে এসে শুনলাম। শুনে দলবল নিয়ে আবার বাঁধ কাটাবার আয়োজন করছিলাম। এমন সময় হিরণবাবুর চিঠি নিয়ে একটি লোকে এসে হাজির হল। এই দেখুন চিঠি— "

বীরা দেবী উঠে গিয়ে একটি চিঠি এনে দিলেন। কেশব সামন্ত পড়তে লাগলেন রুদ্ধশ্বাসে—

"সুচরিতাসু,—

বীরা দেবী. আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। গরিব জেলেদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্যে যে আপনি এত কষ্ট স্বীকার করে এবং প্রাণ তুচ্ছ করে এত দূরে এসেছেন, সেজন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদও গ্রহণ করুন। জেলেদের দাবি যে ন্যায্য, তা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু বাঁধটা কেটে দেওয়ার একটু অসুবিধা আছে। বাঁধটা কেটে দিলে অনেকগুলি চাষীর ফসল ডুবে যাবে। আবার কতকগুলি গরিব লোক অসুবিধায় পড়ে যাবে। এই উভয় সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে আমি তাই একটা মতলব করেছি। আমার নিজের জমিদারিতে মাছপোখরা বলে যে বড় বিলটা আছে. সেইটে ওই ক্ষতিগ্রস্ত জেলেদের এ বছরের জন্যে দিতে রাজী আছি। কেশববাবুকে ওরা যে সেলামি দিত. সেই সেলামি পেলেই আমি সন্তুষ্ট থাকব। এ বছরের সেলামি ওরা কেশববাবুকে যদি দিয়ে ফেলে থাকে তাতেও আমার আপত্তি নেই। আমার বিলে ওরা বিনা সেলামিতেই এ বছর মাছ ধরুক। দাঙ্গা-হাঙ্গামাজনিত অশান্তির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে এ মূল্য আমি দিতে রাজী আছি। আশা করি, আমার এ প্রস্তাব আপনি মঞ্জুর করবেন। আজ সকালে ভৈরবপুরের মাঠে ক্রুদ্ধ জেলেদের নিবৃত্ত করবার জন্যে সামান্য যে কৌশলটুকু অবলম্বন করেছিলাম তার জন্যে ক্ষমা চাইছি। আপনার অবর্তমানে দাঙ্গা থামানোর আর কোনও উপায় আমার বুদ্ধিতে এল না। আশা করি, কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে উৎসুক আছি। দেশ স্বাধীন হয়েছে, দেশকে এখন গড়ে তুলতে হবে। আপনাদের মতো কর্মীরই এখন প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশের কর্মপন্থা একটু বিশিষ্ট ধরনের। পূর্বদিগন্তের বাণী আলোকের বাণী, আশার বাণী। ভালোবাসা, বিশ্বাস, সাম্য— এই সব আমাদের পাথেয়। ঝগড়া মারামারি হিংসা-দ্বেষ নয়। যদি কখনও আপনার

সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য হয়, তাহলে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আপাতত বিদায় নিচ্ছি। নমস্কার। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীহিরণ্যগর্ভ বর্মন"

"মহৎ ব্যক্তিটির সঙ্গে আলাপ করে এসেছেন নাকি?"

"না, সময় পেলাম না। এখানে কাল সকালে একটা মীটিং আছে আমাদের। লোকটিকে কিন্তু সত্যিই মহৎ বলে মনে হল। আপনার জমিদারিতেও দেখলাম সবাই ওঁকে খাতির করে।"

"হ্যাঁ, তা করে। লোক ভালো। আচ্ছা, তবে উঠি।"

কেশব সামন্ত উঠে দাঁড়ালেন। আর বসে থাকতে পারছিলেন না তিনি। সারাজীবন প্রতিপদে যে লোকটার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে, তারই হাতে আবার নতুন মার খেয়ে তাঁর রক্ত টগবগ করে ফুটছিল। সমস্ত মুখখানা পাংশুবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তবু যাবাব সময় দেঁতো হাসি হেসে তাঁকে বলতে হল—"দাঙ্গা-টাঙ্গা যে হয়নি, তা ভালোই হয়েছে এক পক্ষে। বিনাযুদ্ধে যদি কাজ হাঁসিল হয়ে যায়, তাহলে দাঙ্গা করবার দরকারই বা কি?"

"তা তো বটেই।"

"আচ্ছ, নমস্কার—"

"নমস্কার ।"

কেশব সামন্ত বেরিয়ে গেলেন।

সাত

হীরা বাইজী মল্লারের যে নূতন গানটি বিনুকে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন সেইটিই গাইছিল বিনু মেঘসুন্দরের কাছে বসে। মেঘসুন্দরের হাঁটুর ব্যথা অনেক কম, বাঁধ কাটা নিয়ে যে অনর্থক একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে পড়তে হয় নি এর জন্যে মনও বেশ প্রফুল্ল। হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধির খুব তারিফ করেছেন তিনি। মনে মনে প্রায় সঙ্কল্প করে ফেলেছেন যে, হিরণ্যগর্ভকে উত্তরাধিকাবী করে যাবেন। তাঁকে বঞ্চিত করবার যে বাসনা মাঝে মাঝে তাঁর মনে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, সেটা আপাতত চাপা পড়ে গেছে। তাঁর মিলে স্ট্রাইক শুরু হয়েছে। হিরণ্যগর্ভকেই সেখানে পাঠিয়েছেন মন্মথর সঙ্গে। আশা করছেন, সেখানেও একটা মিটমাট করে ফেলতে পারবে সে। আকাশ মেঘ-মেদুর। ভিজে হাওয়ায় কদমফুলের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। তাঁর বুড়ো তবল্‌চী তমিজ মিঞা কাওয়ালি চমৎকার বাজাচ্ছে। গান জমে উঠেছে খুব। বিনু দু-একদিন ভয়ে ভয়ে ছিল। কিন্তু তুঙ্গশ্রী চলে যাওয়ার পরও যখন কোনও গোলমাল হল না তখন সে বুঝতে পারলে যে, ভদ্রমহিলার সত্যিই কথার ঠিক আছে। এবং এই সূত্র ধরে ক্রমশ তার মনে গোপনে গোপনে যে দুরাশা জেগে উঠেছিল, তারই মাধুর্য মদির করে তুলেছিল তার চিত্তকে। ভাবছিল, উনি যখন কথা দিয়ে গেছেন তখন অসম্ভব হয়তো সম্ভব হবে। যতই ভাবছিল, ততই রঙিন হয়ে উঠছিল তার কল্পনা। সমস্ত প্রাণ ঢেলে সে গাইছিল—

নিশি দিন বরষণ লাগে
উমড়ি ঘুমড়ি ঘন আএ

দাদুর ঘোর ঘন গরজ, গরজ দামিনী
চমকত ডর লাএ।

গান যখন খুব জমে উঠেছে, মেঘসুন্দরের মন যখন মহানন্দে সুরলোকে পাখা মেলে বেড়াচ্ছে, মর্ত্যের সমস্ত বন্ধন-গ্লানি থেকে ছাড়া পেয়ে মুক্তির আনন্দে যখন তিনি মশগুল, তখন সহসা রসভঙ্গ হল হিরণ্যগর্ভ প্রবেশ করাতে।

"কি হল?"—একটু বিরক্ত কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন মেঘসুন্দর।

"মিটমাট করে ফেললুম। ওদের দাবি মোটামুটি মেনেই নিলুম আপাতত।"

"মেনে নিলে! তাহলে তো পথে বসতে হবে আমাকে।"

"তা হবে না। তবে লাভ কিছু কম থাকবে। আজকাল প্রত্যেক জিনিসই দুর্মূল্য, আগেকার দামের চেয়ে তিন গুণ, ওদের মজুরি বাড়িয়ে না দিলে ওরা বাঁচবে কি করে?"

"কিন্তু আমি ব্যবসা করতে বসেছি, দানছত্র তো খুলি নি।"

মন্মথও প্রবেশ করেছিলেন হিরণ্যগর্ভের পিছু পিছু। তিনিও আড়চোখে একবার চাইলেন হিরণ্যগর্ভের দিকে। ভাবটা—আমি তখনই বলেছিলাম, চটে যাবেন উনি।

হিরণ্যগর্ভ একটু মৃদু হেসে উত্তর দিলেন—"দানছত্র খুললে তো লাভের কোনও প্রশ্নই থাকত না। এতে লাভ থাকবে আপনার। কিন্তু কিছু কম থাকবে।"

"তিন গুণ মাইনে দিলে লাভ থাকবে?"

"তিন গুণ থেকে কমিয়ে দ্বিগুণ করেছি। আর একটা শর্তও করেছি। ব্যাপারটা শুনুন তাহলে ভালো করে।"

গতিক সুবিধার নয় দেখে বিনু উঠে ভিতরে চলে গেল। বিনুকে উঠে যেতে দেখে মেঘসুন্দর তবলচী তমিজ মিঞাকে বললেন—"তুমিও যাও এখন তমিজ। এখন আর জমবে না, দঁকে পড়ে গেছি।"

হিরণ্যগর্ভ বললেন—"ওদের আমি বলেছি যে, মিলটা তোমরাই চালাও। ওর হিসেবপত্তর তোমরাই কর। এক বছর আমরা তোমাদের দাবি অনুসারে দ্বিগুণ মাইনে দিচ্ছি, কিন্তু পরের বছর থেকে অর্থাৎ মিলের ভার যখন থেকে তোমরা নেবে, তখন থেকে আর মাইনের কোনও দায়িত্ব আমাদের থাকবে না। কত মাইনে তোমাদের নেওয়া উচিত সেটা তোমরাই ঠিক করে নিও। আমাদের বছরে শতকরা দশ টাকা দিয়ে যেতে হবে আমরা যত টাকা ইনভেস্ট করেছি তার ওপর। মিল বাড়াবার জন্যে যদি টাকার দরকার হয় সে টাকাও আমরাই দেব এবং ওই হারে সুদ নোব। এতে ওরা রাজী আছে।"

"তার মানে, আমার মিলটা তুমি ওদের সঁপে দিয়ে এলে?" আর্তনাদ করে উঠলেন যেন মেঘসুন্দর।

"না, মিলের ওপর পুরো কনট্রোল আমাদেরই থাকবে। মিল চালাচ্ছে যারা, তারা শুধু ন্যায্য লাভের ন্যায্য অংশীদার হবে। আপনি টাকা দিয়েছেন বলে আপনি শতকরা দশ টাকা করে পাবেন। সেটা কি কম হল?"

"কম নয়? হানড্রেড্ পার্সেন্ট টু হানড্রেড্ পারসেন্ট লাভ করছে মাড়োয়ারীরা, সে খবর রাখ?'

"ও জিনিস বেশি দিন আর চলবে না।"

"যতদিন চলে ততদিন চালাতে হবে। ব্যাঙ্কে টাকা না থাকলে হাঁড়ীর দুর্দশা হবে যে!"

হিরণ্যগর্ভ চুপ করে রইলেন।

"লক্ষ্মীছাড়া উড়নচণ্ডে কোথাকার—"

হিরণ্যগর্ভ তবু কোনও উত্তর দিলেন না।

"পূর্বপুরুষের বিষয়-সম্পত্তিগুলো উড়িয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিলে সব!"

হিরণ্যগর্ভ তবু নীরব! মন্মথ সিং উসখুস করে কান চুলকুলেন দু-একবার, তারপর ভিতরের দিকে চলে যাচ্ছিলেন, হিরণ্যগর্ভ তাঁকে বললেন—"কনট্রাক্টটা কোথা?"

"ছোট সুটকেসটাতে আছে রহমনের কাছে। আচ্ছা, আমি ডাকাচ্ছি তাকে।"

একটা ছুতো পেয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি হনহন করে।

"কিসের কনট্র্যাক্ট?"

"ওদের সঙ্গে যেটা করেছি, তাতে আপনাকে সই করতে হবে।"

"আমি সই করব না।"

ফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি রিসিভারটা তুলে ধরলেন।—"হ্যালো, হ্যাঁ, আমি মেঘসুন্দর। অ্যাঁ, ক্যাণ্ডেলের দাম আরও নেমেছে? আচ্ছা, জানাচ্ছি একটু পরে।"

রিসিভারটা নামিয়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি—"আমাকে মেরে ফেল, মেরে ফেল তোমরা। মন্মথর কথায় ধরে রাখলুম শেয়ারগুলো, দাম হু-হু করে পড়ে যাচ্ছে।"

হিরণ্যগর্ভ কোনও জবাব দিলেন না। দেওয়ালে একটা সেতার টাঙানো ছিল, সেইটের তারগুলোয় আঙুল দিয়ে মৃদু মৃদু আওয়াজ করতে লাগলেন পিছন ফিরে।

"ওটার দফা নিকেশ করবার চেষ্টা করছ কেন আবার?"

বৃদ্ধ মাহুত রহমান ছোট একটা সুটকেস নিয়ে প্রবেশ করল।

হিরণ্যগর্ভ এগিয়ে গিয়ে সুটকেসটা খুলে কনট্রাক্টটা বার করলেন তারপর মেঘসুন্দরের কাছে এগিয়ে গেলেন।

"সই করে দিন। আমি আপনার হয়ে তাদের কথা দিয়ে এসেছি।"

মেঘসুন্দর অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি তুলে তার দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর সই করে দিলেন খচখচ করে। হিরণ্যগর্ভ সেটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু দূরে গিয়ে ফিরলেন আবার।

"আপনার হাঁটুর ব্যথাটা কেমন আছে?"

"সে খোঁজে তোমার দরকার কি?"

"গাউটের ভালো একটা ওষুধ এসেছে আমার কাছে। খেয়ে দেখবেন?"

"না।"

মুচকি হেসে আবার বেরিয়ে গেলেন হিরণ্যগর্ভ। কাকুর 'না' মানেই যে শেষ পর্যন্ত 'হ্যাঁ' তা ভালো করেই জানেন তিনি। ঠিক করলেন, ওষুধটা এখনই এনে নিজে হাতে এক দাগ খাইয়ে যাবেন। সত্যি বড় দুঃখ হয় তাঁর কাকুর জন্যে। স্নেহের কাঙাল, সুরের কাঙাল, কেবল বিষয়ের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে উপভোগ করতে পারেন না জীবনকে। ক্রমাগতই সব জট পাকিয়ে যায় যেন।

মাহুত রহমান কিন্তু গেল না। সে প্রায় মেঘসুন্দরেরই সমবয়সী। যদিও ভৃত্য, কিন্তু

আযৌবন সহচর বলে বন্ধুত্বের দাবিও তার আছে একটু। বাবু আজকাল হাতিতে চড়েন না, রহমনের সঙ্গে দেখাও হয় না আজকাল। তাই এ সুযোগ সে ছাড়বে না ঠিক করলে। সেদিন হাতিতে তুঙ্গশ্রী ও হিরণ্যগর্ভের কথোপকথন থেকে বিনু-বিশু সম্পর্কে যে সাংঘাতিক সংবাদটুকু সে সংগ্রহ করেছিল, সেটা মেঘসুন্দরকে জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য বলে মনে হল তার। না জানালে নিমকহারামি হবে। সেলাম করে দাঁড়াল সে এসে মেঘসুন্দরের সামনে।

"কি রহমন, ভালো আছ তো? অনেকদিন তোমায় দেখি নি।"

"হুজুরের দোয়াসে চলে যাচ্ছে কোই সুরতসে।"

"তারপর কি খবর আর?"

"চুপসে একঠো বাত কহনে চাহতে হেঁ হুজুরকা পাস।"

"কি বাত?"

রহমন উবু হয়ে বসল এসে মেঘসুন্দরের কাছে এবং চোখ-মুখ রহস্যময় করে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে গেল।

মেঘসুন্দর নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যেন। সমস্ত শুনে গুম হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন—"আচ্ছা, তুমি বিশুকে ডেকে দিয়ে যাও।"

"হ্যাঁ, একটু সমঝিয়ে শাসন করে দিন।"

রহমন চলে গেল। অস্থির হয়ে উঠলেন মেঘসুন্দর। অস্থিরভাবে উঠে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরের চারিদিকে। তারপর হঠাৎ বেহালাটা তুলে বাজাতে আরম্ভ করে দিলেন পাগলের মতো। সারঙের একটি গতে আগুন ছুটতে লাগল যেন। খানিকক্ষণ বেহালা বাজাবার পর মনটা যেন শান্ত হল। চুপ করে বসে রইলেন চোখ বুজে। তারপর পায়ের পাতা নাচাতে নাচাতে গুনগুন গান ধরলেন। খুট করে শব্দ হতেই চেয়ে দেখলেন বিশু এসেছে।

"আপনি কি ডেকেছেন আমাকে?"

"হ্যাঁ। এস।"

"কেন?"

"জুতিয়ে তোমার পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে ফেলব বলে।"

স্তম্ভিত বিশু দাঁড়িয়ে রইল বজ্রাহতবৎ।

"এদিকে সরে এস।"

বিশু এগিয়ে এল আর একটু।

"বিনুকে বিয়ে করবে ঠিক করেছ না কি? খবরটা শুনে কৃতার্থ হয়ে গেছি একেবারে। ইচ্ছে করছে গান গাই—" বলেই কীর্তনের সুরে ধরে দিলেন—

এস এস নাগর প্রেম-সওদাগর
ঘুড়িতে ছেড়েছ নাকি সুতো,
ধরেছি ছাড়িব না তো এস এস পিঠ পাতো
খুলিয়া রেখেছি চটিজুতো।

আগুন ছুটতে লাগল তাঁর চোখ দিয়ে। বিশু নীরব।

"কথার জবাব দিচ্ছ না যে? যা শুনলাম তা কি সত্যি?"— গর্জন করে উঠলেন

মেঘসুন্দর। আমতা আমতা করে বিশু বললে, "সত্যি, বিনুকে আমি ভালোবাসি। বিনুও আমাকে ভালোবাসে।"

"বলতে লজ্জা করল না তোমার—পাজি নচ্ছার শুয়ার হারামজাদা? বামন হয়ে চাঁদে হাত! ছুতোরের ছেলে হয়ে আমাদের বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করবে তুমি? বেরিয়ে যাও আমার এলাকা থেকে এই মুহূর্তে। বেরিয়ে যাও—"

চটিজুতোটা তুলে ছুঁড়ে মারলেন, লাগল গিয়ে সেটা বিশুর কপালে।

ঠিক সেই মুহূর্তে হিরণ্যগর্ভ প্রবেশ করলেন পিছনের দ্বার দিয়ে ওষুধের শিশিটা হাতে নিয়ে।

"কী হল!"—থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি।

"বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে।"—পুনরায় গর্জন করে উঠলেন মেঘসুন্দর। বিশু ধীরে ধীরে বেরিয়ে চলে গেল।

"কি হয়েছে তা তো তুমিও জান। তোমারই উচিত ছিল শোনামাত্র ওকে ঘাড় ধরে দূর করে দেওয়া জমিদারি থেকে। সব শুনে চুপ করে আছ কি করে তাই তো মাথায় আসছে না আমার।"

হিরণ্যগর্ভ চুপ করে রইলেন। কি উত্তর দেওয়া উচিত সহসা ঠিক করতে পারলেন না।

"চুপ করে আছ যে?"

গলাটা একটু পরিষ্কার করে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"আমি আজই আপনাকে বলব ভাবছিলাম যে, ওদের বিয়ে দিয়ে দিন।"

"বিয়ে দিয়ে দেব?"

"হ্যাঁ। তাই উচিত। কেশবের বেলাতে এটা করেন নি বলেই চারদিকে এমন অশান্তির আগুন জ্বলছে।"

"এ নিয়ে আর তর্ক করবার ইচ্ছে নেই তোমার সঙ্গে। অনেক তর্ক করেছি। আমার বাড়িতে আমার মত আঁকড়ে থাকবার স্বাধীনতা দাও আমাকে। দোহাই তোমাদের!"

"আপনার বাড়িতে আপনার মত আঁকড়ে আপনি থাকুন। আমার বাড়ি থেকে ওদের বিয়ে হোক।"

"ওদের বিয়ে হবে না। অসম্ভব। এ নিয়ে আমাকে আর একটি কথা বোলো না বলছি।"

"ওরা যদি পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে, কি করবেন আপনি?"

"বিশুকে চাবকে দূর করে দেব আমার জমিদারি থেকে, আর বিনুকে তালা বন্ধ করে রেখে দেব। এই গণপৎ সিং—"

দারোয়ান গণপৎ সিং দাঁড়াল এসে।

"মন্মথবাবুকে ডাক একবার।"

গণপৎ সিং চলে গেল।

মেঘসুন্দর বললে—"মন্মথকে এখনই বলছি চাবি বন্ধ করে রাখুক ওকে।"

হিরণ্যগর্ভ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল, তারপর বেরিয়ে গেলেন। মেঘসুন্দর উঠে দাঁড়ালেন আবার। আবার অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। সারা ঘরময়। উঃ, কি কালভুজঙ্গিনী! একেই দুধকলা খাইয়ে পুষেছেন তিনি ছেলেবেলা থেকে। বিনুর মুখটা মনে

পড়ল হঠাৎ। সত্যিই ভালোবাসার মতো চেহারা। কিন্তু ও কি বলে প্রশ্রয় দিতে গেল ওই ছুতোরের ছেলেটাকে? একবার ইচ্ছে হল, ডেকে জিগ্যেস করেন ওকে। কিন্তু কেমন যেন ভয় হল। মনে হল, ও যদি দাবি করে এসে তাহলে হয়তো কিছু বলতে পারবেন না তিনি। সব গুলিয়ে যাবে। না, না,—এ কিছুতে হতে দিতে পারেন না, এ অসম্ভব। ওকে আটকে রাখতে হবে। যেমন করে হোক বাধা দিতে হবে। কিছুদিন ছাড়াছাড়ি হলেই ভুলে যাবে। শিখরিণী তো ভুলেছে। ভুলেছে কি? দ্বারপ্রান্তে শব্দ হতেই ফিরে দেখলেন, শিখরিণী দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে তাঁর দিকে চেয়ে। ফলের রস এনেছে তাঁর জন্যে।

আট

সাত দিন অবিশ্রান্ত ঘুরেও তুঙ্গশ্রী একটা আশ্রয় যোগাড় করতে পারলেন না কোথাও। কলকাতায় এসে যে রাজনৈতিক দলটি তিনি গড়ে তুলেছেন তার মধ্যে এক কেশব সামন্ত ছাড়া এমন আর কেউ নেই যার আর্থিক সঙ্গতি আছে। অধিকাংশই পরনির্ভরশীল কিংবা দরিদ্র। কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, বেকার যুবক-যুবতী, স্বল্পবিত্ত মিলের কর্মী, কলেজের দু-একজন তরুণ অধ্যাপক এরাই সে দলের সভ্য। নিয়মমতো পার্টি-ফাণ্ডে কিছু কিছু টাকা প্রত্যেকেই দেন বটে, কিন্তু সে কেবল নিয়ম রক্ষা করবার জন্যে। দু-একজন চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করেও সে নিয়ম পালন করছেন—এ খবর তুঙ্গশ্রী নিজে জানেন। কিন্তু সে চৌর্যবৃত্তির মধ্যে হীনতা ছিল না—এও তিনি জানেন। দরিদ্রের যদি ধনীদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে হয় তাহলে সেকেলে নীতি-কথার মানদণ্ড আঁকড়ে থাকার অর্থ নেই কোনও। বাঁচতে হবে এবং যেমন করে হোক—এই চিরন্তন নীতিই এখন একমাত্রা নির্ভরযোগ্য নীতি। এই 'যেমন করে হোক বাঁচবার'—নীতি অবলম্বন করেই কেশব সামন্তকে দলে নিয়েছিলেন তিনি তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোনও খোঁজ-খবর না করেই। তাঁর বক্তৃতা বা আদর্শবাদের জন্যে নয়, আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁর অর্থ-সামর্থ্য দেখে। এখন হঠাৎ আবার পরিত্যাগ করতে চাইছেন তাঁকে কোন্ নীতি অনুসারে? তিনি তো এখনও অকুণ্ঠিতভাবে অর্থ দিতে প্রস্তুত আছেন, দিচ্ছেনও। কেশব সামন্তর যে উদ্দেশ্যই থাক। তাঁদের উদ্দেশ্য তো সফল হচ্ছে ওঁর সহায়তায়। যেমন করে হোক কাজ হাঁসিল করতে হবে—এই নীতি অবলম্বন করলে তুঙ্গশ্রীর অন্য আশ্রয় খোঁজ করার তো প্রয়োজন নেই। যতদূর সম্ভব ওই লোকটাকে ভুলিয়ে ওর ঈর্ষাক্লিষ্ট মনের সুযোগ নিয়ে ওকে দোহন করাই তো উচিত। চাচা-আপন-বাঁচা নীতি অনুসরণ করতে পারছেন না কেন তিনি তবে? কিন্তু পারছেন না। কার্যক্ষেত্রে নেমে সত্যের সম্মুখীন হয়ে অনুভব করছেন তিনি—স্বার্থ নয়, মহত্ত্বই উদ্বুদ্ধ করে মনকে...

না, কেশব সামন্তর টাকার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না তিনি, তাঁর সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে তাঁর সব।.... বাস্তবের সঙ্গে আদর্শ মিলছে না বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে যে আদর্শ খাড়া করছেন তাতেও মন ভরছে না। না, আদর্শকেই আঁকড়ে থাকতে হবে যত কষ্টই হোক। অন্য আশ্রয় একটা যোগাড় করতেই হবে। কিন্তু কোথায়, কেমন করে সম্ভব হবে তা? একটু আগেই জিতেনবাবুর কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর বাইরের একটা ঘর খালি আছে নাকি! তিনি অনেক সহানুভূতি প্রকাশ করে বললেন—"দিতে পারলে খুবই সুখী হতাম, কিন্তু ও-ঘরটায় আমার একজন আত্মীয় এসে থাকবেন পাকিস্তান

থেকে। কেন, কেশববাবুর ওখানে কি হল?" এর কোনও সদুত্তর দিতে পারেন নি তিনি। কয়েকদিন আগে যে কেশববাবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, হঠাৎ তাঁর বিরুদ্ধে বলতে পারলেন না কিছু। আমতা-আমতা করে সরে পড়তে হল সেখান থেকে। হোটেলে থাকবার পয়সা নেই। নিজেদের দলের আরও কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নি। তাঁকে আশ্রয় দেবার মতো সঙ্গতি কারও নেই। আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করলেন এই সর্বপ্রথম। কেশব সামন্ত তাঁর প্রতি একটু বেশি প্রসন্ন বলে, তাঁকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন বলে অনেকে যেন ঈর্ষান্বিতও একটু তাঁর প্রতি। অনেকের বাঁকা হাসি, জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আর ছদ্মবেশী বিস্ময় থেকে এই তথ্যটি আবিষ্কার করে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন তিনি যে, ও আশ্রয় ত্যাগ করতেই হবে। কিন্তু কেমন করে করবেন? একটা খালি বাড়ির সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলেন সেটা দেখতে। এঁদো গলির মধ্যে আলো-বাতাসহীন দুখানি ঘর। তারই ভাড়া চাইছে মাসে পঞ্চাশ টাকা। শুধু তাই নয় সেলামি দিতে হবে দু'হাজার টাকা। যাঁর বাড়ি, তিনি মিলের কেরানী একজন। মুনাফাখোর পুঁজিবাদী মিলওয়ালার বিরুদ্ধে ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন ইনিই তুঙ্গশ্রীর নেতৃত্বে। চক্ষুলজ্জাবশত নিজে তুঙ্গশ্রীর সঙ্গে দেখা করলেন না। একজন আত্মীয়ের মারফত ভাড়া আর সেলামির বার্তাটা জানিয়েছেন। এ লোকটার সঙ্গে ওই মুনাফাখোরটার তফাত কি? দুজনেরই মনোবৃত্তি এক। একজন লাভ করবার সুযোগ পাচ্ছে, আর একজন পাচ্ছে না। হিরণ্যগর্ভের কথাটা মনে পড়ল, আজকালকার শ্রমিক আর ধনিক—একই জিনিসের এ-পিঠ ও-পিঠ। সমাজ ব্যবস্থা বদলে ফেললেই কি সুফল ফলবে? অভাব ঘুচলেও লোভ কি ঘুচবে? ন্যায়পরায়ণ হবে কি সবাই? একটা চাকরির খবর পেয়ে একজনের কাছে একটু আগে গিয়েছিলেন। ইনি কিছুকাল পূর্বে নামজাদা দেশনেতা ছিলেন একজন। এখন তাঁর হাতে অনেক চাকরি আছে, অনেকের চাকরি করেও দিয়েছেন। তুঙ্গশ্রীর কিন্তু সে চাকরি হল না। প্রধান কারণ তুঙ্গশ্রী তাঁর আত্মীয়া নন। দেশে যদি আজ সোভিয়েট ব্যবস্থা হয়ে যায়, এসব কি ঘুচবে? কালক্রমে ঘুচবে হয়তো, যখন অভাব থাকবে না কারও। কিন্তু অভাব না থাকলেই কি লোভ ঘোচে? আবার প্রশ্নটা মনে জাগল তাঁর। ধনীদের তো কোনও অভাব নেই, কিন্তু তারাই তো সবচেয়ে বেশি লোভী। কাজ করলেই গ্রাসাচ্ছাদন এবং আশ্রয় পাওয়া যাবে যে ব্যবস্থায়, সে ব্যবস্থাতেও কার্যনিয়ন্ত্রণ করবেন যে মানুষ—তিনি যদি পক্ষপাতহীন না হন তাহলে সে কাজ শাস্তি হয়ে উঠবে। নির্লোভ পক্ষপাতহীন ন্যায়পরায়ণ মানুষই দরকার সকলের আগে।...

নানারকম এলোমেলো চিন্তা করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তুঙ্গশ্রী ক্রমাগত। বালিগঞ্জ থেকে শ্যামবাজার, শিয়ালদা থেকে হাওড়া—কখনও বাসে, কখনও ট্রামে, কখনও হেঁটে। আশ্রয় পাবার সামান্যতম সম্ভাবনা আছে যেখানে সেখানেই গেছেন। কোথাও আশ্রয় মেলেনি। আর একটা মুশকিলেও পড়েছিলেন তিনি। ভাইকে স্যানাটোরিয়ামে নিয়ে যেতে তাঁর মাধবকাকা রাজী হয়েছেন। কিন্তু তাঁকে গাড়িভাড়া দিতে হবে। সবশুদ্ধ প্রায় দুশো টাকা দরকার। যতদিন ভাইকে স্যানাটোরিয়ামে না পাঠাতে পারছেন, ততদিন নার্সিং-হোমে দৈনিক দশ টাকা হিসাবে লাগবে। এ টাকাটা কেশব সামন্ত দেবেন কি না ঠিক নেই। তুঙ্গশ্রী চাইলে তিনি দেবেন, ওই দুশো টাকাও হয়তো দেবেন, কিন্তু তুঙ্গশ্রী চাইবেন না। তাছাড়া ওই দুশো টাকা চাওয়ার পথ আর এক দিক দিয়েও বন্ধ হয়েছে। কেশববাবু নিজেই খোকনকে

স্যানাটোরিয়ামে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন বলেছিলেন; এখন তুঙ্গশ্রী কি করে তাঁকে বলবেন যে, হিরণ্যগর্ভের সহায়তায় সে বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন তিনি? অন্য কোথা থেকে টাকা যোগাড় করে ফেলতে হবে। কিন্তু কি করে যে ফেলবেন তাও অনিশ্চিত। চেনাশোনা কয়েকজনের কাছেই ধারের প্রস্তাব করেছেন, কিন্তু সকলেই একটা না একটা ছুতোয় এড়িয়ে গেছে ব্যাপারটি। সহায়-সম্বল-হীনা তাঁকে ধার দেবেই বা কেন লোকে? উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পথে পথে ঘুরছিলেন তিনি। কেশব সামন্তর বাড়ি দুবেলা দুটি খেতে যান শুধু। গভীর রাত্রে গিয়ে শুয়ে পড়েন, ভোরেই উঠে বেরিয়ে যান। মাধবকাকাকে হিরণ্যগর্ভের চিঠিখানা দিয়ে এসেছেন। খোকনের জিনিসপত্রও নিয়ে গিয়ে রাখতে বলেছেন তাঁর বাসায়। টাকাটা যোগাড় হলেই হয় এখন। হাওড়ায় তাঁর এক মাসতুতো ভাই আছে। তারই ঠিকানাটা যোগাড় করে চলেছিলেন তিনি তাঁর কাছে। সে যদি দয়া করে টাকাটা দেয়! যে ভগবানকে কোন দিন ডাকেন নি, মনে মনে তাঁকেই ডাকতে লাগলেন আজ।

মোড়টা ঘুরতেই পিওনের সঙ্গে দেখা হল। চেনা পিওন।

একটু হেসে সে বললে—"আপনার খোঁজে দু'দিন গিয়ে আমি ঘুরে এসেছি। আপনার নামে ইন্‌সিওর এসেছে একটা। নোটিশটা নিয়ে নিন, তারপর পোস্ট আপিসে গিয়ে ছাড়িয়ে নেবেন। না হয় আমার সঙ্গে চলুন, একেবারে দিয়েই দেব। আমি পোস্ট আপিসেই যাচ্ছি—"

"ইন্‌সিওর? আমার নামে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ; এই যে—শ্রীমতী তুঙ্গশ্রী দেবী, কেয়ার অফ কেশব সামন্ত।"

নোটিশটা বার দেখালে সে। নোটিশ দেখে তুঙ্গশ্রী অবাক হয়ে গেলেন। পাঠিয়েছে অলকা। এক হাজার টাকা।

পিওনের সঙ্গে পোস্ট আপিসের দিকে স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ এগিয়ে চললেন তিনি।.... খামটা হাতে করেও খানিকক্ষণ স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন। পিওনটাই এগিয়ে এসে বললেন—"খুলবেন? কাঁচি দেব?"

"দাও।"

খুলে হাজার টাকার নোট পেলেন, আর পেলেন ছোট একখানা চিঠি।—

"ভাই মিনতি,

ছেলেবেলার বন্ধুত্বের দাবিতে আজ সামান্য কিছু পাঠাতে সাহস করলাম। গ্রহণ করলে খুশী হব। যদি কলকাতা যাই দেখা করব তোর সঙ্গে। আশা করি, ভালো আছিস। তোর ভাইটি কেমন আছে? ভালো করে চিকিৎসা করা। তারপর সবই ভগবানের ইচ্ছা। টাকার দরকার হলে আমাকে লিখতে সঙ্কোচ করিস না। আমার আন্তরিক ভালবাসা নে। ইতি অলকা।"

আঁকাবাঁকা বিশ্রী হাতের লেখাটার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তুঙ্গশ্রী।

নয়

"ওখানেও সব মিটমাট হয়ে গেল?"

ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠেই কেশব প্রশ্নটা করলেন নগেনকে। নগেন একটু বিস্মিত হল, সে আশা করেছিল খবরটা পেয়ে কেশববাবু খুশী হবেন।

"মিটমাট হয়ে যাবে না? আমাদের সব দাবিই তো ওঁরা মেনে নিলেন। মাইনে আমরা

তিনগুণ করতে বলেছিলাম, তার বদলে ওঁরা দ্বিগুণ দিতে রাজী হয়েছেন এক বছরের জন্যে। কিন্তু পরের বছর থেকে সমস্ত মিলটাই যে শ্রমিকদের হাতে এসে যাচ্ছে! মেঘসুন্দরবাবু মাত্র দশ পারসেণ্ট পাবেন। এটা একটা মস্ত লাভ নয়? অবশ্য হিরণবাবু না থাকলে এতটা হতো কি না সন্দেহ। কাকার সঙ্গে ওঁর এ নিয়ে ঝগড়াই একটা হয়ে গেছে শুনলাম।"

কেশব সামন্তর যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল, চোখ দুটো ঠিক্‌রে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম করছিল, অন্যমনস্কভাবে গোঁফ পাকিয়ে যাচ্ছিলেন কেবল তিনি। নগেন থেমে যেতে তাঁর মুখের দিকে চাইলেন তিনি। ক্ষণকাল অর্থহীনভাবে চেয়ে থেকে বললেন—"ও তাই নাকি!"

"হ্যাঁ, খুব একচোট হয়ে গেছে শুনলাম।" সোৎসাহে বলে উঠল নগেন—"নরেন আমার বন্ধু কিনা, তার মুখেই খবর পেলাম। হিরণবাবু অতি চমৎকার লোক। আর একটা ব্যাপার নিয়েও নাকি তাঁর লাগব-লাগব হয়েছে মেঘুবাবুর সঙ্গে।"

"কি ব্যাপার?"

"একটা বিয়ে নিয়ে। বিনোদিনী বলে ওঁর এক নাতনী আছে, সে নাকি গানের মাস্টারকে বিয়ে করতে চায়। জাতে মিলছে না বলে মেঘুবাবু ঘোর আপত্তি করছেন। হিরণবাবু বলছেন, এ বিয়ে হবেই। এই মাসের বিশ তারিখে দিন ঠিকও করে ফেলেছেন তিনি নাকি। নরেন বলছিল— সেদিন খুড়ো-ভাইপোতে মারপিট না হয়ে যায়! খুবই টেন্‌স সিচুয়েশন।"

সামনের দিকে কিছুক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন কেশব সামন্ত। তারপর নগেনের দিকে ফিরে বললেন—"আচ্ছা, যাও তুমি এখন। আমি বেরুব।"

"টাকা দিয়ে যাই তাহলে?"

"কোন্ টাকা?"

"ওই যে পাঁচশো টাকা আমাকে দিয়েছিলেন, কিছুই খরচ হয়নি তাব থেকে।"

"তোমার ভাড়া লাগে নি?"

একমুখ হেসে নগেন বললে—"না, লাগে নি। যাবার সময় একজন চেনাশোনা চাকরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, সে টিকিট করতে দিলে না। ফেরবার সময়ও দেখি, সে-ই ফিরছে আবার। আর ওখানে তো নরেনের বাসাতে ছিলাম, কিছু খরচ হয় নি! স্ট্রাইক তো হয়ই নি।"

সমস্ত টাকাটা ফেরত দিয়ে চলে গেল নগেন।

নগেন চলে যাবার পর কেশব সামন্ত উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় চাকরটা এসে খবর দিল যে, মাধববাবু বলে এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান।

"মাধববাবু? কে সে?"

"বললে—দিদিমণির কাকা হয়।"

"তুঙ্গশ্রীর?"

"তাই তো বলছেন।"

"আচ্ছা, ডেকে নিয়ে আয়।"

তুঙ্গশ্রীর মাধবকাকা প্রবেশ করলেন। একটু আস্ফালনপ্রিয় লোক।

"কি চান আপনি?"

"আমি আমাদের খোকনের বাক্স-বিছানা নিতে এসেছি। মিনু আমাকে কদিন আগেই নিয়ে যেতে বলেছিল, কিন্তু সময় করে উঠতে পারি নি আমি।"

"মিনু কে?"

"ওই আপনারা যাকে 'তুঙ্গশ্রী' বলে ডাকেন। তার আসল নাম মিনতি তো! তার ভাই খোকনকে নিয়ে আমি স্যানাটোরিয়ামে রেখে আসতে যাব কিনা, তাই জিনিসপত্তরগুলো নিতে এসেছি। স্যানাটোরিয়ামে না নিয়ে গেলে আর চলছে না।"

"স্যানাটোরিয়ামে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে না কি? কে ব্যবস্থা করলে?"

"ওই যে হিরণবাবু না কে একজন বন্ধু আছে তার। সে-ই চিঠি দিয়েছে। এই যে দেখুন না চিঠি।"

সাড়ম্বরে চিঠিটা বার করে দিলেন তিনি। চিঠিটা পড়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ কেশব সামন্ত। তারপর বললেন—"আচ্ছা, নিয়ে যান আপনি জিনিসপত্র। তুঙ্গশ্রী কোথা?"

"কি জানি, তার সঙ্গে আমাব দেখাই হয় নি দুদিন।"

কেশব সামন্ত চাকরকে ডেকে জিনিসপত্র দিয়ে দিতে বললেন।

চাকরের সঙ্গে নেমে গেলেন মাধবকাকা নীচে। কেশব সামন্ত বসে রইলেন চুপ করে। মনে হল, সব দিক দিয়েই হেরে গেলেন তিনি। তুঙ্গশ্রীর ভাইকে স্যানাটোরিয়ামে পাঠিয়ে তুঙ্গশ্রীর কাছে যে মহত্ত্বটা আস্ফালন করবেন ভেবেছিলেন, তাও ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে গেল হিরণ্যগর্ভ। চোখ দুটো জ্বলে উঠল, বিস্ফারিত হয়ে গেল নাসারন্ধ্র। উঠে জ্বেলে ফেললেন স্টোভটা। তারপর চড়িয়ে দিলেন গ্রামোফোনের রেকর্ড। অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ঘরের চারিদিকে। হঠাৎ রেকর্ডটা থামিয়ে দিলেন আবার, নিবিয়ে দিলে স্টোভটা। তারপর দ্রুতপদে নেমে গেলেন নীচে। রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগলেন উন্মাদের মতো। নিজে যেতে হবে এবার..

'ট্যাক্সি—'

দাঁড়িয়ে পড়ল ট্যাক্সিটা। উঠে বসলেন কেশব সামন্ত।

"জোরে হাঁকাও— সিধা চল।"

দশ

যে প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ ছুটোছুটি করে বেড়ায়, তা মিটে গেলে কিছুকালের জন্য যে শূন্যতাব সৃষ্টি হয়, সেই শূন্যলোকে মানুষ আর একটা প্রয়োজনকেই খুঁজে বেড়ায় আবার। প্রয়োজনের অবলম্বন না থাকলে জীবন অর্থহীন। ভাই যখন স্যানাটোরিয়ামে চলে গেল, সমস্ত কলকাতা শহর চষে ফেলে যখন তিনি নিঃসংশয় হলেন যে বাড়ি বা আশ্রয় পাওয়া যাবে না, নিজের আদর্শকে রূপ দেবাব জন্যে যে দলের তিনি সৃষ্টি করেছিলেন সেই দলের প্রধান পাণ্ডা কেশব সামন্তের ওপর শ্রদ্ধা যখন আর কিছুতেই রাখা গেল না, তখন তুঙ্গশ্রীর মন অবলম্বনহীন হয়ে অস্থির হয়ে পড়ল। টাকা পাওয়ার পর থেকে কেশব সামন্তের বাড়িতে খেতে-শুতেও আর যেতেন না তিনি। তাঁর জিনিসপত্রগুলো সেইখানে পড়ে ছিল, কিন্তু তিনি দিন কাটাচ্ছিলেন একটা হোটেলে। মনে মনে তিনি যে শুধু নূতন একটা অবলম্বন খুঁজছিলেন তাই নয়, পুরাতন যে অবলম্বনটাকে এতদিন আঁকড়ে ধরে ছিলেন, তার স্বপক্ষে নানারকম যুক্তিও আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছিলেন তিনি প্রাণপণে। কেশব সামন্তর সম্বন্ধে মোহ কিছুতেই কাটতে চায় না যেন। অমন একটা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যদি ঈর্ষার প্ররোচনাতেই এত সব

কাণ্ড করে থাকে, তাহলে তা কি অস্বাভাবিক কিছু? শিখরিণীর মতো মেয়েকে সে ভালোবেসেছিল—এটা তো অন্যায় কিছু নয়; শিখরিণীকে সে যদি বিয়ে করবার সুযোগ পেত, তাহলে তার জীবন অন্য রকম হতো হয়তো। হিরণবাবুর কথাগুলো মনে পড়ল—ও অসুস্থ, ওকে যদি ঠিকমতো বুঝতে চান, ওকে ভালোবাসতে হবে। তিনি কি পারবেন না? মিথ্যা অভিমানের তুচ্ছ অহঙ্কারকে আঁকড়ে থাকা কি তাঁর সাজে? তাঁর কি উচিত নয় হিরণ্যগর্ভ আর কেশব সামন্তর মতো দুটো বিরাট ব্যক্তিত্বকে মিলিয়ে দেশের কাজে নিযুক্ত করা? হিরণ্যগর্ভের আদর্শের সঙ্গে তাঁদের আদর্শের তফাত তো নেই বিশেষ। অন্তরের নিভৃত প্রদেশে আর একটি যুক্তিও তাঁকে আশ্বস্ত করেছিল—শিখরিণীকে দেখবার আগে তো তিনি তাঁকে দেখেন নি। তাঁর সঙ্গে আগে দেখা হলেও হয়তো কেশব সামন্তর জীবন অন্য রকম হতে পারত। এখনও কি তা করা অসম্ভব? কেশব সামন্তর সমস্ত চিত্ত এখন শিখরিণীর দিকেই উন্মুখ হয়ে আছে, কিন্তু তা কি থাকবে চিরকাল? বীরা দেবী সম্পর্কে তাঁর যে সন্দেহটা জেগেছিল, সেটা কি অমূলক, তা হঠাৎ টের পেয়ে গেছেন তিনি। তাঁদের দলেরই একজন কর্মী হরিবাবুর সঙ্গে কাল যখন দেখা হয়েছিল রাস্তায়, তখন আর একজন ভদ্রলোকও ছিলেন তাঁর সঙ্গে। হরিবাবু পরিচয় প্রসঙ্গে বললেন—"ইনি একজন অধ্যাপক। হরিজনদের একটি স্কুল খোলবার জন্যে এসেছেন এখানে। হরিজনদের নেত্রী বীরা দেবীর সঙ্গে এঁর বিয়েও হবে শিগ্‌গির।" সুতরাং বীরা দেবীর সঙ্গে কেশববাবুর সে রকম কোনও সম্পর্ক নেই নিশ্চয়। হোটেলে নিজের ঘরে বসে বসে তিনি ভাবছিলেন। হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়াতে সোজা হয়ে বসলেন। বিশুকে তিনি যে কথা দিয়ে এসেছেন, সে কথা রাখবার কি ব্যবস্থা করেছেন তিনি? হিরণ্যগর্ভকে বলে এসেছেন অবশ্য। কিন্তু তাই কি যথেষ্ট? এখন তো কোনও কাজ নেই। সেখানে গেলে হয় এখন। ব্যাপারটা কেশববাবুকে বললে কেমন হয়? অদম্য পৌরুষের জোরে তিনি হয়ত কিছু করতে পারেন। হঠাৎ ঠিক করে ফেললেন যে, কেশব সামন্তর সঙ্গে অকারণে ঝগড়া করবেন না।

কেশববাবু তো এখনও পর্যন্ত কোনও অসদ্ব্যবহার করেননি তাঁর সঙ্গে। তিনিই বা শুধু শুধু করতে যাবেন কেন? না, আজই ফিরে যাবেন তিনি কেশব সামন্তর বাড়িতে। উঠতে যাবেন, এমন সময় দ্বারে মৃদু করাঘাত করলে কে যেন। কে করেছে, তা তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন। কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগলেন। হোটেলে ঠিক পাশের ঘরেই যে ভদ্রলোকটি থাকেন, তিনি কয়েক দিন থেকে একটু বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছেন তাঁর প্রতি। তিনি সকালে যে প্রস্তাবটি করেছেন, যুক্তির দিক থেকে তাতে আপত্তি না থাকলেও রুচির দিক থেকে তাঁর বাধছিল। বার্নার্ড শ'র 'মিসেস ওয়ারেন্‌স্ প্রফেশন' বইখানা তাঁকে পড়তে দেখেই আলোচনাটা তুলেছিলেন ভদ্রলোক। বলেছিলেন—"এ দেশেও মিসেস ওয়ারেন কম নেই। এদেশেও সুশ্রী বুদ্ধিমতী মেয়েরা পাপের পথে পা বাড়িয়েছে, সৎপথে ভদ্রভাবে থাকতে পায় নি বলে। আপনার মতো মনের জোর সকলের নেই। তাছাড়া আর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে আপনার, চমৎকার বোঝাতে পারেন আপনি। আপনি যদি পতিতাদের মধ্যে কাজ করেন, তাহলে দেশের মস্ত কাজ হয় একটা। ওদের যদি নিজের দলে টানতে পারেন, তাহলে দেশের সমস্ত সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন। একটি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ আছে, আপনি যদি চান, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারি। মেয়েটি বুদ্ধিমতী। আলাপ

করলে সুখী হবেন।" তুঙ্গশ্রী আপত্তি করতে পারেন নি। যদিও মনের ভিতরে খুঁতখুঁত করছিল একটু, কিন্তু যে সংস্কারমুক্ত যুক্তির স্তরে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিলেন তিনি, সেখানে দাঁড়িয়ে বলা যায় না যে, তিনি পতিতার সঙ্গে আলাপ করতে কুণ্ঠিত। কিন্তু ভদ্রলোকের ভাবভঙ্গী কেমন যেন ভালো লাগে নি তাঁর। তাঁর যেচে এসে আলাপ করার মধ্যে, তাঁর ওই ভদ্রতার আতিশয্যের অন্তরালে কি যেন একটা ছিল যা মনোরম নয় মোটেই। ভদ্রলোকের পড়াশুনো আছে, চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর হাসির ধরনে, চোখের চাহনিতে যা তাঁর অজ্ঞাতসারে আত্মপ্রকাশ করছিল, তা মনকে মোটেই মুগ্ধ করে না।

...কপাট খুলেই তুঙ্গশ্রী দেখলেন, সেই ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছেন।

"সকালে আপনার সঙ্গে কথা কওয়ার পর আমি ফোন করেছিলাম সে মেয়েটিকে। মেয়েটি বললে—আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পেলে সে খুবই খুশী হবে। চলুন। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি—ট্যাক্সি ডেকেছি।"

তুঙ্গশ্রী আপত্তি করতে পারলেন না—"চলুন।"

খানিকক্ষণ পরে যে বাড়িটির সামনে গাড়ি এসে দাঁড়াল, তা ঠিক খোলার ঘর নয়। গেটে দারোয়ান আছে এবং গাড়িটা দাঁড়াবামাত্র ভিতর থেকে যে কুকুরটি ডেকে উঠল সে যে অভিজাতবংশীয় তা স্বর থেকেই বোঝা যায়।

ভদ্রলোক নেমে বললেন—"আসুন।"

তুঙ্গশ্রী নেমেই যে কথাটি প্রথম জিজ্ঞাসা করলেন সেইটেই সবচেয়ে বিস্মিত করেছিল তাঁকে—"এত বড় বাড়িটা ওঁরই নাকি?"

"না এদিককার অংশটা মাধবীর। ওদিকে আর একজন থাকেন।"

অলকার কথা মনে পড়ছিল তাঁর। অলকাও কি ঠিক এই শ্রেণীর? তার তো টাকার অভাব নেই। তারপর সহসা মনে হল, সে যে শ্রেণীরই হোক তার কাছে তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু কৃতজ্ঞতা স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় অন্তর থেকে উৎসারিত হচ্ছে না কেন ভাবতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি। অন্যমনস্ক ভাবেই ভদ্রলোকের অনুসরণ করে ভিতরে ঢুকলেন।

"আসুন।"—হাসিমুখে এসে অভ্যর্থনা করলে মাধবী। মাধবীকে দেখে মনে হয় না যে, সে পতিতা। তার চেহারায় কথায় ভাবভাবে এমন কিছু নেই যা দৃষ্টিকটু, যা ভদ্রসমাজে অচল। বসবার ঘরটি বেশ চমৎকার সাজানো, দেখলেই মনে হয় মার্জিতরুচি মেয়েটি। টেবিলের পাশেই বইয়ের যে শেল্‌ফ্‌টি আছে তাতে যে সব বই চোখে পড়ল, তা অনেক ভদ্রগৃহেও চোখে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ, শ, জোয়াড্‌, গল্‌স্‌ওয়ার্দি, রোঁলা তো আছেই, কমিউনিজমেরও অনেক ভালো ভালো বই আছে। এক কোণে একটা অর্গানিও রয়েছে।

"আপনার নাম শুনেছি। অনেক দিন থেকেই আলাপ করবার ইচ্ছে আপনার সঙ্গে। কমলদার কাছে হঠাৎ শুনলাম যে, আপনি ওঁর পাশের ঘরেই আছেন। কতদিন এসেছেন কলকাতায়? জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন কবে?

"ছাড়া পেয়েছি তা বেশ কিছুদিন হল। কলকাতাতেও মাস তিনেক হয়ে গেল।"

"মাস তিনেক আপনি ওই হোটেলেই আছেন?"—কমলবাবু প্রশ্ন করলেন।

"আমি অবশ্য দিন দশেক মাত্র ওখানে। আমার পাশের ঘরে তো প্রথমে আর একটি ভদ্রলোক ছিলেন। আপনি তেতলায় ছিলেন না কি?"

218

"না, আমি ওই হোটেলে ছিলাম না, অন্য জায়গায় ছিলাম। দিন তিনেক এসেছি হোটেলে।"

"একটু চা হোক, কী বলেন?"—মাধবী মৃদু হেসে প্রশ্ন করল।

"নিশ্চয়।"— সোৎসাহে সায় দিলেন কমলবাবু।

চায়ের ফরমাশ দিয়ে ফিরে আসতেই কমলবাবু বললেন—"তুমি আগে একটা গান শুনিয়ে দাও এঁকে। তারপর আলাপটা জমবে।"

"কমলদা সবাইকে আমার গান শোনাবার জন্যেই ব্যস্ত কেবল। অথচ গলা আমার মোটে ভালো না, জানেন, তা ছাড়া টন্‌সিল দুটো এমন বিশ্রী হয়ে আছে—"

তুঙ্গশ্রীর মনে হল, ভদ্রঘরের মেয়েরাও গান গাইতে বললে ঠিক এই ধরনের কথাই বলে। বিশেষ কোনও তফাত নেই। মাধবী মুখে মুচকি হাসি ফুটিয়ে ঘাড় হেঁট করে বসে রইল ক্ষণকাল। তারপর হঠাৎ উঠে অর্গানের সামনে গিয়ে বসল। রবীন্দ্রনাথের একটি গান ধরল। গলাটা সত্যিই মিষ্টি। তুঙ্গশ্রীর আরও ভালো লাগল গানটি নির্বাচন দেখে। মেয়েটির রসবোধের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। বার বার করে গোড়ার চারটি কলিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে লাগল সে—

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না
শুকনো ধুলো যত?
কে জানিত আসবে তুমি গো
অনাহূতের মতো?

শুধু তাই নয়, তুঙ্গশ্রীর মনে হতে লাগল, গানের ভিতর দিয়ে সে যেন আবেদন জানাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের জবানিতে নিজের কথাই বলছে যেন। বলছে যেন— ওগো, যে বেদনায় তুমি কাতর, 'ঐ বেদনা আমার বুকে বেজেছিল গোপন দুখে,' তুমি আমাকে অবহেলা করে চলে যেও না, আমাকে জান, বোঝ।

গানটা শেষ হবার পরও একটা সুরের রেশ ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগল যেন ঘরের ভিতর। নিভৃততম সত্তার গূঢ়তম কান্নায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল যেন চতুর্দিক। চা এল। চা খাওয়া শেষ হল প্রায় নীরবেই।

"আর একখানা হোক।"—কমলবাবু ফরমাশ করলেন।

মাধবী ক্ষণকাল চুপ করে থেকে শুরু করল—

দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল

তুঙ্গশ্রী স্তব্ধ হয়ে বসে বসে শুনতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগল, এই যে এত সব আয়োজন, এত জেলখাটা, এত কমিউনিজমের বক্তৃতা, স্বাধীনতার জন্য এত প্রাণপণ—সবই বৃথা যদি বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ এসে না থামে। সেই রথের চক্রধ্বনির জন্যেই তো আজীবন উৎকর্ণ হয়ে আছেন তিনি মনে মনে। দুঃখের বরষায় চক্ষের জলও তো প্রচুর নেমেছে; কিন্তু বন্ধুর রথ কই? কেশব সামন্তর মুখটা মনে পড়ল হঠাৎ। বিচ্ছেদে বেদনায় পূর্ণ মিলনের পাত্রটি কি তাঁরই হাতে তুলে দিতে হবে? যে স্বপ্ন তিনি দেখছেন ছেলেবেলা থেকে; বহুদিনবঞ্চিত অন্তরের সঞ্চিত সে আশা সফল হবে কি ওঁরই মধ্যে?....হঠাৎ রসভঙ্গ হল।

উন্মত্ত একটা হা-হা হাসি ভেসে এল খোলা জানলাটা দিয়ে। চমকে উঠলেন তুঙ্গশ্রী। চেনা গলা, চেনা হাসি। মাধবীও থেমে গিয়েছিল ভ্রূকুঞ্চিত করে।

কমলবাবু বললেন—"এ বাড়িটা ছাড় তুমি মাধবী। তোমার প্রতিবেশিনীটি মোটেই সুবিধের নয়।"

"চপলার দোষ নেই তত। কেশববাবু এলেই হুল্লোড়টা হয় কেবল। এসেছেন বোধ হয় ভদ্রলোক। ওঁর আবার দেশকর্মী হবারও 'পোজ' আছে শুনেছি। টাকার জোরে অনেক সমিতির পেট্রন হয়েছেন নাকি।"

তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে মাধবী হাসল। তুঙ্গশ্রীর মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তবুও তিনি হাসবার চেষ্টা করলেন একটু। "কলকাতায় এসে আমারও এক কেশববাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে— কেশব সামন্ত—ইনি তিনিই নাকি?"

"হ্যাঁ তিনি। আমার তেতলার ঘরটা থেকে ওদের বসবার ঘরটা দেখা যায় বেশ। ইচ্ছে করেন তো স্বচক্ষে দেখতেও পারেন ভদ্রলোককে।"

"চলুন তো দেখি।"

মাধবীর সঙ্গে উঠে গেলেন তিনি তেতলার ঘরে। খোলা জনালা দিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর সমস্ত স্বপ্ন দাউ দাউ করে পুড়ে গেল যেন এক নিমেষে। বিশ্রী অঙ্গভঙ্গী করে চপলা নাচছে আর হা-হা করে হাসছেন কেশব সামন্ত। উন্মত্ত চোখের দৃষ্টি। হঠাৎ নাচটা থেমে গেল। সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন কেশব—"কেয়াবত কেয়াবাত! কিন্তু আসল কথাটা ভুলো না যেন মানিক, গুণ্ডা আমার চাই—অন্তত গোটা বারো। বন্দুক ছোরা কুড়ুল কাটারি নিয়ে নিজেই যাব আমি এবার—"

তুঙ্গশ্রী আর শুনতে পারলেন না। নেমে এলেন।

মাধবীর গান আর জমল না। আবার আসবেন বলে বিদায় নিলেন তুঙ্গশ্রী প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। হোটেলে ফিরেই তিনি গেলেন কেশব সামন্তর বাসায়। নিজের ঘরটা খুলে দেখলেন অলকার একখানা চিঠি এসেছে। লিখেছে, তিন-চার দিনের মধ্যেই কলকাতা আসবে সে। তার কলকাতার বাড়ির ঠিকানাটাও দিয়েছে একটা। তুঙ্গশ্রী চাকরটাকে জিগ্যেস করে জানলে, কেশব সামন্ত তখনও ফেরেন নি। নিজের সমস্ত জিনিসপত্র ট্যাক্সিতে তুলে তাকে বললেন—"বাবু এলে বলে দিও—আমি চললাম। এই নাও।" চাকরটাকে পাঁচ টাকা বকশিশ দিয়ে ট্যাক্সিতে চড়লেন তিনি। কেশব সামন্তর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকে গেল।

এগার

হিরণ্যগর্ভের ল্যাবরেটারির সামনে মুরারিপুর স্কুলের ছাত্ররা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। সকলেরই কাপড় ভিজে, হাতে পায়ে কাদা, মাথায় জামাতে শেওলা লেগে আছে। হিরণ্যগর্ভ একটি রোরুদ্যমান বালকের পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছেন। তারও কাপড়-চোপড় ভিজে এবং পায়ে কাদা। পাশে একটি ট্রেতে তুলো আয়োডিন প্রভৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নরেন। ভিড় ঠেলে প্রবেশ করলেন মন্মথ সিং।

"এ কি হচ্ছে?"

"বিমল পুকুরে নেমেছিল। ওর পা-টা কেটে গেছে। জলের নীচে কাচ ছিল বোধ হয়।"

"পুকুরে নামতে গেল কেন এখন?"

"আমরা সবাই নেমেছিলুম।"—ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে হাসিমুখে ঘাড় ফিরিয়ে উত্তর দিলেন হিরণ্যগর্ভ।

"হঠাৎ এ খেয়াল?"

"ডাক্তার পৃথ্বীশ রায়ের টোপাপানার এক্সপেরিমেণ্টটা আমাদের গ্রামেও করে দেখছি।"

"ডাক্তার পৃথ্বীশ রায় আবার কে?"

"মুর্শিদাবাদের হেল্‌থ্ অফিসার ছিলেন। মারা গেছেন ভদ্রলোক। তিনি আমরণ ওই একটি কাজই করে গেছেন— কি করে সহজ উপায়ে আমাদের দেশ থেকে ম্যালেরিয়া তাড়ানো যায়! কিন্তু হাতে-কলমেও দেখিয়ে গেছেন যে, গ্রামের সমস্ত পুকুর থেকে যদি টোপাপানা তুলে ফেলা দেওয়া যায়, তাহলে ম্যালেরিয়া অনেক কমে যাবে। রামপাড়া, চক, ভবতপুর, মুনিগ্রাম, খোসবাসপুর প্রভৃতি গ্রামে নিজহাতে কাজ করে তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন এটা। আমিও আমাদের নসীবপুরে করিয়েছি, ফল হয়েছে। এখানেও তাই শুরু করেছি আমরা—গত বছরের পীলের ফিগারগুলো রেখেছি আমরা। ফিগারগুলো ঠিক আছে তো নরেন?"

নরেন চোখ মিটমিট করে বললেন—"আছে বোধ হয়।"

"বোধ হয় মানে? একটি ফিগার যদি হারায় তোমায় খেয়ে ফেলব আমি, জান?"

"আছে এই ড্রয়ারের মধ্যে।"

"এখুনি দেখে ঠিক করে রেখো।"

"আচ্ছা।"

মন্মথ সিং আর এ ব্যাপারে কৌতূহল বোধ করলেন না। ঘরের দিকে অগ্রসর হতে হতে তিনি বললেন—"কাজ সেরে এস, তোমার সঙ্গে কথা আছে একটা।"

"আমার হয়ে গেছে, এখুনি আসছি।"

মন্মথ সিং ঘরের মধ্যে ঢুকলেন গিয়ে।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। রোরুদ্যমান বালকটির দিকে চেয়ে হিরণ্যগর্ভ বললেন— "আরে, ছিঃ ছিঃ, এখনও কাঁদছ তুমি! এঃ, কী বলবে সবাই?"

"আমি ফিরে যাব কি করে?"— ঠোঁট ফুলিয়ে বলল ছেলেটি।

"এসেছিলে কি করে তোমরা?"—জিগ্যেস করলেন হিরণ্যগর্ভ।

"আমরা গোরুর গাড়িতে এসেছিলাম।"

"আমি নিজে হাঁকিয়ে এনেছিলাম।"—একটি ছেলে বললে সগর্বে।

"সকলের এঁটেছিল তিনখানা গাড়িতে?"

"চারজন বাইকে এসেছি আমরা।"—উত্তর দিল আর একটি ছেলে।

"বিমল তাহলে যাবে কি করে? আচ্ছা, আমার ফিটনটা ওকে পৌঁছে দিয়ে আসুক। টগবগ টগবগ টগবগ করে চলে যাবে বিমলবাবু।"

হাসি ফুটে উঠল বিমলের মুখে।

কিন্তু পর-মুহূর্তেই সে বললে—"আমি আকাশ-বিহারে উঠব কি করে? আজ যে মাস্টার মশাই আমাদের নক্ষত্র দেখাবেন!"

"ও, আজ তোমাদের আকাশ-বিহারে যাবার কথা বুঝি? আচ্ছা, আমি কোচোয়ানকে বলে দিচ্ছি, সে তোমাকে কোলে করে পৌঁছে দেবে ওপরে।"

"আমিও বয়ে নিয়ে যেতে পারি ওকে। ও আর কত ভারি হবে।" বারো-তেরো বছরের একটি ছেলে এগিয়ে এসে বললে মুরুব্বির মতো।

"চল তোমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দি।"

ছেলেদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি।

ছেলেদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে ভিতরে এসে ঢুকলেন হিরণ্যগর্ভ।

মন্মথ সিং গম্ভীরভাবে বসে পা নাচাচ্ছিলেন।

"কি, ব্যাপার কি?"—হিরণ্যগর্ভ জিগ্যেস করলেন।

"সংক্ষেপে একটা কথার উত্তর দাও। বিনুর সঙ্গে বিশুর বিয়ে কি সত্যিই দেবে ঠিক করেছ না কি?"

"হ্যাঁ।"

"হ্যাঁ মানে?"

"মানে, দেব।"

"বিশু কোথায় আছে?"

"আকাশ-বিহারে মাস্টার মশায়ের কাছে।"

"বিনুকে পাবে কি করে? তাকে তো কাকামণি তালা-চাবির মধ্যে রেখেছেন।"

"চাবি কোথায়?"

"চাবি তাঁর নিজের কাছে। সেদিক দিয়ে সুবিধে হবে না। তবে বিনু ওপরে যে ঘরটায় আছে, সে ঘরে জানলায় গরাদ নেই। সিঁড়ি-টিঁড়ি দিয়ে যদি কোন রকমে নামিয়ে নিতে পার। কিন্তু এত বড় প্রকাণ্ড সিঁড়ি লাগানো কি সম্ভব হবে লুকিয়ে?"

"দড়ির সিঁড়ি লাগানো যেতে পারে।"

"কিন্তু তাই বা পাচ্ছ কোথায় এখানে?"

"কলকাতায় লোক পাঠিয়ে আনাতে হবে।"

"কিন্তু দড়ির সিঁড়ি দিয়ে অতখানি উঁচু থেকে বিনু কি নামতে পারবে? পড়ে টড়ে গিয়ে হাত-পা যদি ভাঙে, সে আর এক কাণ্ড হবে।"

হিরণ্যগর্ভ ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইলেন চুপ করে।

মন্মথ সিং আড়চোখে তাঁর দিকে একবার চেয়ে গলা-খাঁকারি দিয়ে বলেন—

"আমার একটা কথা শুনবে?"

"কি বল?"

"ও-সবের মধ্যে তুমি যদি না থাক কেমন হয়? কি দরকার এই সব বাজে ঝামেলা জুটিয়ে? কাকু ক্ষেপে আছেন একেবারে। বিয়েটা যদি হয়ে যায় তাহলে কুরুক্ষেত্রে কাণ্ড করবেন একটা। তার চেয়ে বিশুকে সরিয়ে দাও এখান থেকে। দিনকতক কলকাতায় বা কাশীতে গা-ঢাকা দিয়ে থাকুক। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"তা হয় না মন্মথ। যে স্বাধীন ভারত আমরা চাই, তাতে এ রকম জাতিভেদ থাকবে না। সমাজের এ রকম জবরদস্তির স্থান নেই সেখানে। যেটা অন্যায় বলে বুঝেছি, তাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া চলতে পারে না। শিখরিণীর সব ব্যাপার তো তুমি জান, ওর মনের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না জানি না।"

"হয়েছে, আমি 'ওয়াচ' করে যাচ্ছি।"

"ও হয়তো সামলে যাবে, কিন্তু কেশবের জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল।"

উভয়েই চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ।

"তুমি হঠাৎ এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ যে?" হিরণ্যগর্ভ প্রশ্ন করলেন হঠাৎ।

"আমি ঘামাই নি, শিখরিণী ঘামাচ্ছে।"—হেসে উত্তর দিলেন মন্মথ সিং।

"ও।"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। কেশব সামন্ত যে চিঠিটা শিখরিণীকে লিখেছিলেন, সেটা হিরণ্যগর্ভের হাতে পড়েছিল। কিছুক্ষণ ভেবে সেটা মন্মথকে না দেখানোই স্থির করলেন তিনি।

"ওই তাহলে ঠিক?"—মন্মথ সিং এই বলে উঠে দাঁড়ালেন।

"হ্যাঁ, ঠিক।"

"কাকুর মনে অত বড় আঘাতটা দেবে?"

"উপায় কি তা ছাড়া? কাকুর মনে আঘাতের বেদনা বেশিদিন থাকে না। ভুলেও যান উনি খুব শিগগির।"

"তাই বলি গিয়ে তাহলে শিখুকে।"

বলিষ্ঠকায় মন্মথ সিং চলে গেলেন। গোলমালে বা সাতেপাঁচে থাকতে চান না ভদ্রলোক; কিন্তু এদের বাড়ির কাণ্ডকারখানা এমন গোলমেলে যে, বার বার নানারকম জালে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে তাঁকে। শিখরিণীর হৃদয় জয় করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, সেইজন্যে জালটা মাঝে মাঝে বড় বেশি জটিল হয়ে যাচ্ছে। শিখরিণীকে বুঝতে পারেন না ঠিক যেন তিনি। বড্ড বেশি চুপ করে থাকে। অত্যন্ত শান্ত, অত্যন্ত ভালো, অথচ কেমন যেন!...সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে...নানাকরম চিন্তা করতে করতে মন্মথ সিং বাগানটা পার হতে লাগলেন। কাকুরই বা কি দরকার ছিল ওই ছুতোরের ছেলেটাকে গানের মাস্টার রাখবার। অত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হলে হবেই তো এসব...অথচ....। কোনও বলিষ্ঠ বয়স্ক ব্যক্তি শিশুদের ছেলেমানুষি যে ভাবে সহ্য করেন, অনেকটা সেইভাবে মন্মথ সিং এদের সহ্য করছেন। তিনি একজন ভালো হকি খেলোয়াড়। তার মনোভাবটা স্পোর্টস্ম্যানের মতো। সব জেনে-শুনে তিনি শিখরিণীকে বিয়ে করেছিলেন, কারণ তিনি ভালো জিনিসের সমঝদার। পছন্দসই ভালো হকিস্টিক পেলে সেকেণ্ডহ্যাণ্ডও কিনতে আপত্তি করেন না কখনও। সব জেনে-শুনেও তিনি এই খামখেয়ালী পরিবারের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন। কারণ এদের ভালো লেগেছে। অদ্ভুত ধরনের লোক প্রত্যেকেই এবং সেইজন্যেই চমৎকার। খেলার মাঠে প্রত্যেক স্পোর্টস্ম্যান উন্মুখ হয়ে থাকে যে মনোভাব নিয়ে জীবনের খেলার মাঠে ইনিও উন্মুখ হয়ে আছেন অনেকটা সেই মনোভাব নিয়েই। খেলার আইন-কানুন বাঁচিয়ে জিততে হবে শেষ পর্যন্ত। শিখরিণীর হৃদয় জয় করতেই হবে। নানারকম বাধাবিঘ্ন আছে বলেই ব্যাপারটা আরও মনোরম।

ইলেকট্রিক বাতি জ্বেলে হিরণ্যগর্ভ নিবিষ্টমনে বসে রক্ত পরীক্ষা করছিলেন মাইক্রোসকোপে। পাড়ার মুন্সী মিস্ত্রির টাইফয়েড হয়েছে, তারই রক্ত। ডিফারেনশ্যাল কাউণ্ট (Differentıal count) করছিলেন। লিম্‌ফোসাইটগুলো (Lymphocytes) বেড়েছে। টাইফয়েডের প্রথম দিকে বাড়ে ওগুলো। যক্ষ্মাতেও বাড়ে, কালাজ্বরেও বাড়ে। এই তিনটে বিভিন্ন ধরনের রোগে শরীরে সাড়া এক রকমের কেন? এই তিনটে রোগের মধ্যে নিগূঢ় মিল আছে কোথাও নাকি? চিন্তা করতে করতে ডিফারেনশ্যাল কাউণ্ট করে চলেছিলেন তিনি। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। কোঁক কোঁক কোঁক শব্দ হচ্ছে মাঝে মাঝে। সাপটাকে ব্যাঙ খেতে দিয়েছেন। মুমূর্ষু ব্যাঙটা শব্দ করছে। টাইফয়েড ইন্‌জেকশন করে এখনও কিছু হয় নি সাপটার। কথায় কথায় এখনও ফণা তুলছে। বাঁদরটারও কিছু হয় নি।.... ডিফারেনশ্যাল কাউণ্ট শেষ হয়ে গেল, উঠতে যাবেন এমন সময় দ্বারে মৃদু করাঘাত করলে কে যেন।

" কে? নরেন? ভেতরে এস। ওই টেস্টটিউব দুটো রেখে দাও রেফ্রিজারেটারে। ভিডাল (Wıdal) কাল করব।"

কপাট খুলে প্রবেশ করলেন নরেন নয়, তুঙ্গশ্রী।

"এ কি, আপনি এমন সময় হঠাৎ। আসুন, আসুন।"

যে অজুহাতটাকে সম্বল করে এসেছিলেন, সেইটেই প্রকাশ করলেন তিনি।

"বিশু আর বিনুর বিয়ের কতদূর কি হল জানতে এলুম।"

"আপনি যাবার পর অনেক কাণ্ড হয়ে গেছে। আসুন আমার খাবার ঘরে। চা খেতে খেতে গল্প করা যাক। চা খাবেন, না কফি? আপনি তো সোজা স্টেশন থেকেই আসছেন, না? তাহলে তো ক্ষিদে পাওয়ার কথা। কুঞ্জ— ও কুঞ্জ—"

ছেলেমানুষের মতো ব্যস্ত হয়ে পড়লেন হিরণ্যগর্ভ।

"চলুন, জলটা চড়িয়ে দিই ও-ঘরে।"

কুঞ্জ এসে দাঁড়াল দ্বারপ্রান্তে।

খরিণীকে খবর দাও গিয়ে যে, তুঙ্গশ্রী দেবী এসেছেন। রাত্রে থাকবেন। তাঁর খাওয়ার শোয়ার সব ব্যবস্থা যেন হয়। আর কর্তা যেন কথাটা না জানতে পারেন।"

"আচ্ছা।"

কুঞ্জ চলে গেল।

"চলুন, ও-ঘরে যাওয়া যাক এবার। আমার কাজকর্ম সব হয়ে গেছে। অনেক গল্প করা যাবে।"

"ও-শব্দটা হচ্ছে কিসের?"

"সাপে ব্যাঙ ধরছে। ভয় নেই, বন্ধ আছে বাক্সের মধ্যে। চলুন ও-ঘরে।"

"আপনি ব্যাঙ ধরে দেন ওকে?"

"আমি ধরি না। চেথরু মেথর ধরে। আসুন।"

চা খেতে খেতে বিশু-বিনুর সমস্ত ঘটনাটা বললেন তিনি তুঙ্গশ্রীকে।

"বিনুকে এখন উদ্ধার করতে পারলেই বিয়ে হয়ে যায়। আর সব ঠিক করে রেখেছি আমি। এমন কি পুরোহিত পর্যন্ত।"

"কে পুরোহিত হবেন?"

"মাস্টারমশাই।"

"আপনার কাকা কিছু গোলমাল করবেন না?"

"গোলমাল তো করছেনই। তাঁর ক্ষমতায় যতটুকু আছে ততটুকু করছেন। শুনলাম, উইল করে আমাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করেছেন। বিনুকে তালা বন্ধ করে আটক রেখেছেন, গালাগালি দিয়ে বিশুর চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছেন। ভাগ্যে বিশুর পরিবারে কেউ বেঁচে নেই; থাকলে তাদের দূর করে দিতেন হয়তো। রামচন্দ্র ডাক্তারকে উঠতে বসতে গালাগাল দিচ্ছেন। এই সব করছেন আর কি। কোথায় বিয়ে হবে তা জানতে পারলে হয়তো সেখানেও সিপাহী পাঠিয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু সেটা জানতে দেব না তাঁকে। বিয়ে হয়ে যাবার পর জানাব যে, বিয়ে হয়ে গেছে।"

স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন হিরণ্যগর্ভ।

তারপর বললেন—"বিনুকে উদ্ধার করাটাই এখন প্রধান সমস্যা। আপনি বরং এক কাজ করুন, কাল কলকাতায় গিয়ে ভালো দেখে দড়ির সিঁড়ি যোগাড় করে পাঠিয়ে দিন একটা। সিঁড়িটা যদি বিনুর ঘরে ফেলে দেওয়া যায়—তা দেওয়া সম্ভব—তাহলে তারই সাহায্যে ও হয়তো নেমে পড়তে পারবে।"

"বেশ, আমি কালই গিয়ে পাঠিয়ে দেব।"

কিছুক্ষণ নিরবতার পর হিরণ্যগর্ভ হেসে প্রশ্ন করলেন—"আপনার বন্ধু কেশব সামন্তর খবর কি? আপনার এখানকার ব্যর্থ অভিযানের কাহিনী সব বলেছিলেন তাকে খুলে নাকি?"

তুঙ্গশ্রী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—"ওঁর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি আমি। ওঁর সঙ্গে কাজ করতে পারব না। ওঁর আসল পরিচয় জানতাম না বলেই এতদিন ছিলাম ওঁর দলে।"

সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন হিরণ্যগর্ভ ক্ষণকাল।

তারপর বললেন—"তাহলে?"

"কিছু ঠিক করি নি এখনও। দেশের কাজই করতে হবে। কিন্তু কি ভাবে করব, তা ঠিক করতে পারি নি।"

"আমাদের এখানে আসবেন?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তুঙ্গশ্রী বললেন—"আমাকে নেবেন কি আপনারা?"

"আমাদের তো কাউকে বাদ দিলে চলবে না। সবাইকে মিলতে হবে এই আমাদের স্বপ্ন।"

"দেখুন, ওই সব বড় বড় বুলিকে আমি বড় ভয় পাই। ওগুলো মুখোশ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে টেররিস্ট হয়েছিলাম। জেল থেকে বেরিয়ে দেখছি, অন্যায় তেমনি আছে। ক্যাপিটালিস্টদের অত্যাচারে দেশের জনসাধারণ মরে যাচ্ছে, তাই তাদের উচ্ছেদ করবার কাজে লেগেছিলাম আপনার বন্ধুর সাহায্য নিয়ে। এখন দেখছি, আপনার বন্ধুর উদ্দেশ্য ক্যাপিটালিস্টদের উচ্ছেদ করা নয়, আপনাদের উচ্ছেদ করা এবং সেটার প্রেরণা কমিউনিজম নয়, তাঁর ব্যক্তিগত প্রণয়কলহ। তাই ওর মধ্যে থাকতে পারলাম না। কিন্তু মত আমার বদলায় নি, এখনও আমি মনে করি—ক্যাপিটালিস্টরাই দেশের শত্রু, ওদের উচ্ছেদ করতেই হবে। এই আমার পথ, এই পথে যদি আমাকে কোন কাজ দিতে পারেন আমি আসতে পারি।"

আপনার মতের সঙ্গে আমার মতেরও অমিল নেই। যে ধরনের সামাজিক স্বার্থলোলুপ নাস্তিক্যবুদ্ধিচালিত ক্যাপিটালিজম প্রচলিত হয়েছে পৃথিবীতে, এমন কি আপনাদের সোভিয়েট রাশিয়াতেও যে ধরনের স্টেট-ক্যাপিটালিজম আছে, আমি তার বিরোধী। আমিও তার উচ্ছেদ কামনা করি। কিন্তু দু-চারটে মশা মেরে যেমন দেশ থেকে ম্যালেরিয়া তাড়ানো যায় না, ম্যালেরিয়া তাড়াতে হলে যেমন মশা যাতে জন্মাতে না পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়, লোকের জীবনী-শক্তি বাড়াবার চেষ্টা করতে হয়, তেমনি দু-চারটে ক্যাপিটালিস্টকে উচ্ছেদ করেও ক্যাপিটালিজম তাড়ানো যাবে না, ব্যাপকভাবে চেষ্টা করতে হবে যাতে এ ধরনের ক্যাপিট্যালিস্ট মনোবৃত্তিই লোকের না হয়। তাই আমাদের আসল কর্মক্ষেত্র এখন বিদ্যালয়ে, আমাদের ভবিষ্যৎ-বশধররা যেখানে মানুষ হচ্ছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাব আওতায় মানুষ হয়ে যারা পচে গেছে, তাদের নিয়ে বেশি মাতামাতি করে সময় এবং শান্তি নষ্ট করা এখন উচিত নয়। তারা যতদিন আছে তাদের মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে, বুজিয়ে-সুজিয়ে ফাঁকি দিয়ে স্তোক দিয়ে তাদের সাহায্যেই আমাদের নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিতে হবে। দেশকে গড়ে তোলাই এখন আমাদের প্রধান কাজ। আর প্রধানতম কাজ হচ্ছে দেশের ছেলেমেয়েদের গড়ে তোলা। তারা যাতে অলস না হয়, পরনির্ভরশীল না হয়, আদর্শবাদী হয়, তারা যাতে রাবণকে রাজা না ভেবে রাক্ষস বলে ভাবতে শেখে, ধৃতরাষ্ট্রের চেয়ে বিদুর যাতে বড় হয় তাদের কাছে, 'তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে'—এটা যাতে সত্যিই প্রাণের কথা হয় তাদের, তারই চেষ্টা করতে হবে। এসব যদি আমরা করতে পারি, দেখবেন এ ধরনের ক্যাপিটালিজম আপনিই উঠে যাবে দেশ থেকে। আসুন, আপনি আমার মুরারিপুর স্কুলের ছেলেদের ভার নিন। সত্যিই যদি দেশ থেকে ক্যাপিটালিজম উচ্ছেদ করতে চান, তাহলে তার জন্যে আসল সৈন্যবাহিনী তৈরী করুন—দু-চারটে মিলে স্ট্রাইক করিয়ে এক অশান্তি ছাড়া আর কী লাভ হবে বলুন?"

হিরণ্যগর্ভের চোখ দুটো উৎসাহে উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছিল।

তুঙ্গশ্রী জিগ্যেস করলেন—"সোভিয়েট রাশিয়ার কর্মপদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধা নেই আপনার?"

"কে বললে নেই, খুব আছে। তারা হাতে-কলমে কাজ করে দেখিয়ে দিয়েছে, কি করে বিরুদ্ধ শক্তির প্রচণ্ডতাকে জয় করা যায়! এস্‌কিমোদেরও আমি শ্রদ্ধা করি—বরফের দেশে বরফেরই ঘর বানিয়ে সীল মাছের মাংস খেয়ে অদ্ভুত রকম পোশাক পরে তারাও জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে আছে ওই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে। কিন্তু আমি এস্‌কিমোদের নকল করতে যাব না, সোভিয়েটদেরও না। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য আছে, সংস্কৃতি আছে, আমাদের সাম্যবাদ ঢের বেশি বনিয়াদি, আমরা পরের নকল করে মরব কেন? বিদেশের ভালো জিনিস গ্রহণ করেও আমরা নিজেদের ভিত্তির উপর নির্মাণ করব নিজেদের ভবিষৎ নিজের মতো করে। আমাদের পরমতসহিষ্ণুতা, আমাদের নিষ্কাম কর্মযোগ্য এক কথায়—আমাদের ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী কিছুতেই ত্যাগ করব না আমরা। ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি। সে ধর্ম কোনও বিশেষ 'ইজম্' মাত্র নয়, তা উদার মনুষ্যত্ব, এ থেকে নড়ব না আমরা কিছুতেই—"

কুঞ্জ দ্বারপ্রান্তে এসে খবর দিলে—"দিদিমণি বললেন, সব ঠিক আছে।"

"আচ্ছা, তুমি কোচোয়ানকে বলে রেখো ভোরে গাড়ি যেন ঠিক রাখে। ইনি হয়তো সকালের ট্রেনেই ফিরবেন।"

কুঞ্জ চলে গেল।

"তালটা কেমন যেন কেটে গেল। আসবেন মুরারিপুরে?"

"এখন বলতে পারছি না ঠিক।"—একটু হেসে জবাব দিলেন তুঙ্গশ্রী। সত্যই তুঙ্গশ্রী ঠিক করতে পারছিলেন না কিছু। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল, কথার আতসবাজি দেখিয়ে কেশব সামন্তও তো তাঁকে মুগ্ধ করেছিল! না, কেবলমাত্র কথাতেই আর তিনি ভুলবেন না।

"ওহো, ভালো মনে পড়ে গেছে কথাটা। আমি স্পেক্‌ট্রোস্কোপের জন্যে যে চিঠিটা দিয়েছিলাম আপনার হাতে, সেটা দিয়েছিলেন কি?"

"না, আমি ভুলে গেছি একেবারে।"

"ছেলেরা আমাকে তাগাদা পাঠিয়েছে। দেবেন এবার গিয়ে। জিনিসটা চাই আমার।"

"আচ্ছা, এবার গিয়ে দেব। নিশ্চয় দেব।"

"চলুন তাহলে যাওয়া যাক। শিখরিণী হয়তো বসে থাকবে।"

"চলুন।"

যে ঘরে তুঙ্গশ্রী প্রথম দিন এসেছিলেন, সেই ঘরেই আবার এসে ঢুকলেন তাঁরা। শিখরিণী কিন্তু ছিল না। অপেক্ষা করছিল একজন চাকর এবং একজন ঠাকুর। তারা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল এবং বললে যে, পাশের ঘরে খাবার জায়গা করা হয়েছে।

"আচ্ছা, খাবার দাও তোমরা।"

চাকর ঠাকুর চলে গেল।

হিরণ্যগর্ভ হেসে বললেন—"শিখু বোধ হয় লজ্জায় আসে নি। বোধ হয় টের পেয়ে গেছে যে, কেশবের সঙ্গে তার ব্যাপারটা আপনিও জেনে ফেলেছেন। আচ্ছা, কেশবের শরীর খারাপ নাকি?"

"না। রীতিমতো সুস্থ রয়েছেন দেখে এলাম।"

হিরণ্যগর্ভ হাসলেন একটু।

"হাসছেন কেন?"

"ও, পাগল হয়ে গেছে বোধ হয়। শিখুকে একটা চিঠি লিখেছে আজ—ভাগ্যে চিঠিটা আমার হাতে পড়েছিল—চিঠিটা বোধহয় ওখানেই ফেলে এলাম—না, এই যে রয়েছে পকেটেই—মাথা খারাপ না হলে এরকম চিঠি লিখতে পারে কেউ?"

চিঠিটা দিলেন তিনি তুঙ্গশ্রীকে।

তুঙ্গশ্রী পড়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন ক্ষণকাল।

চাকরটা পাশের ঘরের দরজা থেকে বললে—"খাবার দেওয়া হয়েছে।"

"চলুন।"

একজনের মতোই খাবার দেওয়া হয়েছিল।

"আপনি খাবেন না?"

"আমি তো স্বপাক খাই। গিয়ে খাব'খন। আমার সব ঠিক করাই আছে। আপনি বসুন।"

তুঙ্গশ্রী খেতে শুরু করলেন।

হিরণ্যগর্ভ বললেন—"এবার আঁচলে গেরো বেঁধে রাখনু—দুটো গেরো। একটা দড়ির

মইয়ের জন্যে, আর একটা স্পেক্‌ট্রোস্কোপের জন্যে। আর একটা ব্যাপারেও যদি সাহায্য করতে পারেন ভালো হয়। কিন্তু পারবেন কি?"

"কি বলুন?"

"আপনার বান্ধবী হীরা বাইজীকে আনাতে পারেন এখন কোনরকমে?"

"অলকা তো দু-একদিনের মধ্যেই কলকাতায় আসবে—আমাকে চিঠি লিখেছে।"

"তাই নাকি?"—হিরণ্যগর্ভের চোখ দুটো প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

"কেন, তাকে কি দরকার?"

"এদের বিয়েটা হয়ে গেলে কাকু যে কাণ্ডটা করবেন তো সামলাতে পারেন এক ওই হীরা বাইজী। কাকু যদি একবার গানে তন্ময় হয়ে যান, তাহলে আর কিছু হবে না। তাঁকে পাঠিয়ে দিতে পারেন এখানে?"

"চেষ্টা করব।"

"হ্যাঁ করবেন, নিশ্চয় করবেন।"

"আচ্ছা।"

আহারাদি শেষ করে তুঙ্গশ্রী শুয়ে পড়লেন।

হিরণ্যগর্ভ বেরিয়েই দেখতে পেলেন, অ্যালসেশিয়ন কুকুরটা দাঁড়িয়ে রয়েছে মাঠে। সহসা তাঁর কৈশোর ফিরে এল যেন। ছুটোছুটি করে খেলা করতে লাগলেন তার সঙ্গে। আনন্দের হিল্লোল উথলে উঠল যেন মনে, উৎসাহের আবেগ সঞ্চারিত হতে লাগল দেহের শিরায় উপশিরায়।

বারো

সন্ধে থেকেই সপ্তমে চড়ে বসেছিলেন মেঘসুন্দর। কেউ আসে নি। এমন কি সর্বরঞ্জন দামোদর পর্যন্ত না। মন্মথ জমিদারি পরিদর্শন করবার অজুহাতে চলে গেছে দূরের একটা মহালে। পনের কুড়ি দিনের আগে ফেরবার আশা নেই। শিখরিণী এত চুপচাপ যে ওর সঙ্গে কথা কওয়া আর দেওয়ালের সঙ্গে কথা কওয়া একই ব্যাপার। মনের বিরুদ্ধে উত্তাপ জমে জমে তিনি নষ্ট-সেফটি-ভালভ্‌ বয়লারের মতো হয়ে বসেছিলেন। কারো সঙ্গে কথা কইতে পেলে—হিরণ, বিশু, বিনু, তুঙ্গশ্রী, কেশব, আজকালকার প্রগতিওলা ওই ছোঁড়াছুঁড়ীগুলোকে প্রাণভরে গাল দিতে পারলে মনের ভার অনেকটা লাঘব হতো হয়তো—কিন্তু কাকে বলবেন? কেউ আসে নি। গণপৎ সিং কেবল সঙ্গিন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দিনরাত। দু বেলা খেতে যায় কেবল। ও ছাড়া আর সবাই পরিত্যাগ করেছে তাঁকে। শিখরিণীর মারফত বিনুর সঙ্গে আবার ভাব করবার চেষ্টা করেছিলেন, চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে। বিনু বলে পাঠিয়েছে যে, সে মরে যাবে তবু বিশুকে ভুলতে পারবে না, ওকে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করতে পারবে না। মরুক তবে। হারামজাদী! নিজের বেহালাটা নিয়েই তিনি একটা গৎ বাজিয়ে চিত্তবিনোদনের ব্যর্থ প্রয়াস করছিলেন। হাঁটুর ব্যথাটা বেড়েছে আবার, নড়তে চড়তে কষ্ট হচ্ছে বেশ। ফোনটা বেজে উঠল। ভ্রূকুঞ্চিত করে চাইলেন সেটার দিকে। যেন শত্রু একটা। তারপর বেহালাটা নামিয়ে তুললেন রিসিভারটা। শেয়ার গছাতে চাইছে একজন। আঃ! "না, আমি আর কিনব না

এখন।"—কি মুশকিল, তবু ছাড়ে না—"না না, না, নেব না আমি, নেব না, নেব না, নেব না"—দুম করে নামিয়ে দিলেন রিসিভারটা। যত সব পাপ এসে জোটে। আবার তুলে নিলেন বেহালাটা। অর্ধসমাপ্ত কেদারার গৎটাকে আবার শুরু করলেন গোড়া থেকে। হঠাৎ জমে উঠল। তমিজের অভাবটা অনুভব করলেন, ডুগি-তবলা থাকলে আরও জমত। চোখ বুজে বাজিয়ে যেতে লাগলেন তন্ময় হয়ে। খট করে শব্দ হতেই চোখ খুলে দেখলেন, দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন ডাক্তার রামচন্দ্র। হাতে ব্যাগ, মুখে মুচকি হাসি। শরীরের সমস্ত রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল তাঁর। ইন্‌জেক্‌শন দিতে এসেছে আবার।

"কি—"

হাতঘড়ি দেখে ডাক্তার রামচন্দ্র বললেন—"ইনজেক্‌শন দেবার সময় হয়েছে এবার।"

"লজ্জা করে না তোমার! ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে দিয়ে 'পিন-কুশন' করে ফেললে, তবু ব্যথা এতটুকু কমাতে পারলে না! সকালেই তো ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে গেলে, এখন আবার কি?"

"সিভিল সার্জনকে কন্‌সালট্‌ করেছিলাম, তিনি বললেন—ভিটামিন-বি আর পেনিসিলিন দিতে, সকালে একটা, সন্ধ্যাবেলা একটা—"

বোমার মত ফেটে পড়লেন মেঘসুন্দর।

"বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। যত হাতুড়ে গণ্ডমূর্খ জুটেছে দেশে। ভিটামিন-বি আর পেনিসিলিন! সিভিল সার্জন! পয়সা লোটবার ফিকির খালি! বেরোও, বেরোও, বেরিয়ে যাও—"

হাতের বেহালাটা সবেগে ছুঁড়ে দিলেন তিনি ডাক্তারের দিকে। সেটা একটা চেয়ারের হাতলে লেগে চুরমার হয়ে গেল। রামচন্দ্র স্মিতমুখে আরও মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেলেন। বাইরের ঘরে বসে ব্রোমাইড মিকশ্চারের একটা প্রেস্‌ক্রিপশন লিখে সন্তর্পণে দিয়ে গেলেন সেটা গণপৎ সিংকে, আর বলে গেলেন, "শিখুদিদিকে বোলো এটা যেন ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাবুকে খাইয়ে দেয় আজ রাত্রেই। বাবুর তবিয়ত খুবই খারাপ।"

ডাক্তার চলে গেলে মেঘসুন্দর পাগলের মতো নিজের চুল ছিঁড়তে লাগলেন। পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যের মধ্যে বসে অসহায় আতুরের মতো কাঁদতে লাগলেন একা।

গভীর রাত্রি।...

মেঘসুন্দরের অন্তঃপুরের দালানটা অদ্ভুত রকম দেখাচ্ছে। স্তিমিত আলোকে দেওয়ালে টাঙানো দেব-দেবীর ছবিগুলো আর ছবি নেই যেন, জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রখর আলোকে রেখা ও রঙের কারাগারে বন্দী ছিল যারা, তারা যেন মুক্তি পেয়েছে গভীর আলো-আঁধারিতে। বিশেষ করে দালানের একপ্রান্তে বিলম্বিত অম্বিকাসুন্দরীর ছবিখানা কথা কইছে যেন নীরব ভাষায়। তাঁর মুখের মৃদু হাসিটা শাণিত তরবারির মতো চকমক করছে। অম্বিকাসুন্দরী মেঘসুন্দরের প্রপিতামহী। স্বেচ্ছায় সহমৃতা হয়েছিলেন। চিত্রটি তাঁর যৌবনকালের। যে চিত্রকর এঁকেছিলেন, তিনি এঁর চোখে-মুখে যে মৃদু আভাটি ফুটিয়ে রেখে গেছেন তা অনবদ্য। ব্যঙ্গ এবং স্নিগ্ধতা, শালীনতা এবং মহিমা মূর্ত হয়ে উঠেছে যেন হাসিটিতে। স্বল্পালোকে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেটা। পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে অস্তগামী শুক্লা একাদশীর চন্দ্রকে। কালো মেঘের স্তূপকে রজতধারায় অভিষিক্ত করে দিগন্তরেখায় অবতরণ করছেন তিনি। মৃদু হাওয়ায়

পরদা নড়ছে একটা, তার সঙ্গে সঙ্গে নড়ছে অদ্ভুত একটা কালো ছায়া, মনে হচ্ছে ছায়াময়ী কোন রমণী যেন উঁকি দিচ্ছে আর সরে যাচ্ছে। জগদ্ধাত্রীর সিংহের চোখ দুটো জ্বলছে। মহাকালীর মুণ্ডমালার প্রত্যেক মুণ্ডটি হাসছে। শ্রীদুর্গার পদতলে বল্লমবিদ্ধ মহিষাসুর চিৎকার করছে নীরব ভাষায়—"আমি মরি নি, আমি মরব না।"... দেয়াল-ঘড়ির পেণ্ডুলামটা টক টক টক শব্দে দুলে চলছে অবিরাম...বিচিত্রপক্ষ একটা প্রজাপতি পক্ষ বিস্তার করে বসে আছে নীরবে ঘড়ির ডায়ালটার উপর। আকাশের চন্দ্র থেকে আরম্ভ করে ওই প্রজাপতিটা পর্যন্ত নীরবে যোগ দিয়েছে যেন কোন গোপন ষড়যন্ত্রে। দালানের এক প্রান্তে বিনুর ঘর। প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে দ্বারে। বিনুর চাপা কান্না ভেসে আসছে মাঝে মাঝে খোলা জানালাটা দিয়ে।

...খুট করে একটা শব্দ হল। দালানের অপর প্রান্তে একটা ঘরের কপাট খুলে গেল। নিঃশব্দ চরণে বেরিয়ে এল শিখরিণী। নিস্তব্ধ হয়ে বিনুর চাপা কান্নাটা সে শুনতে লাগল উৎকর্ণ হয়ে। তার মনে হল, এ শুধু বিনুর কান্না নয়, অনেকের কান্না মিশে আছে এর সঙ্গে, তার নিজেরও। অনাদিকাল থেকে ভেসে আসছে মর্মান্তিক এই রোদন। যাকে চাই তাকে পেলাম না, পেলাম না, কিছুতেই পেলাম না। যুগ-যুগান্তর থেকে বয়ে চলেছে এই কান্নার ফল্গু অন্ধকারের তলায় তলায়। অম্বিকাসুন্দরীর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ল শিখরিণীর। নির্নিমেষে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল সেই ছবিটার দিকে। তারপর সন্তর্পণে বেরিয়ে গেল দালান থেকে।

ব্রোমাইডের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন মেঘসুন্দর। তবু তাঁর মনে হল, কে যেন তাঁর শিয়রের কাছে কী যেন করছে!

"কে?"

"আমি শিখু।"

"কী করছিস এত রাত্রে?"

"তোমার মশারিটা গুঁজে দিচ্ছি ভালো করে। খুলে গেছে এ দিকটা।"

মেঘসুন্দর আর কিছু না বলে পাশ ফিরে শুলেন। মেঘসুন্দরের মাথার শিয়র থেকে চাবির গোছাটা বার করে নিয়ে দালানে এসে আবার দাঁড়াল শিখরিণী। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল বিনুর ঘরের দিকে।

...বিনু কাঁদছিল শুয়ে শুয়ে। শিখরিণীকে দেখে উঠে বসল সে বিছানায়। শিখরিণী তাকে নাইয়ে খাইয়ে যায় রোজ, কিন্তু এ সময়ে কোনদিন তো আসে না!

"তোর শাড়িগুলো কোথা?"—শিখরিণী জিগ্যেস করলে নিম্নকণ্ঠে। তারপর নিজেই এগিয়ে গেল আলনাটার দিকে। চার-পাঁচখানা শাড়ি ছিল আলনায়। নিজেই সেগুলোকে পেড়ে গাঁট বেঁধে বেঁধে লম্বা দড়ির মতো করলে একটা, তারপর ঝুলিয়ে দিলে সেটাকে জানলায় বেঁধে বাইরের দিকে।

"আয় আমার সঙ্গে।"

"কোথা?"

"আয় না।"

তুঙ্গশ্রীর ঘুম হয় নি ভালো। এ-পাশ ও-পাশ করছিলেন তিনি বিছানায় শুয়ে। বাইরে এক পেচক-দম্পতির কর্কশ প্রেমালাপ তাঁর তন্দ্রাকে বিঘ্নিত করছিল বার বার। হঠাৎ একযোগে

পাখিগুলো ডেকে উঠল একবার চতুর্দিকে। সমস্ত নিস্তব্ধ হয়ে গেল আবার। অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা ডেকে উঠল তারপর। আবার চুপচাপ হয়ে গেল সব। কেশব সামন্তর শেষ কীর্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণটা যেন মূর্তি ধরে ঘুরে বেড়াতে লাগল তাঁর মুদিত নয়নের সামনে—'তুমি হয়তো আমাকে ভুলেছ, আমি কিন্তু তোমাকে ভুলি নি। এসো।' পর মুহূর্তেই ফুটে উঠল—চপলার সেই নৃত্য হিল্লোলিত রূপটা আর তার সামনে গদগদ কেশব সামন্তর ছবিটা। দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে শুয়ে রইলেন তিনি। স্বপ্ন দেখলেন, যেন মাস্টার সূর্য সেন এসেছেন। তাঁকে যেন বলছেন—"ভয় কি? সত্যকে আশ্রয় করে থাক, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াও, মৃত্যুভয় যখন তুচ্ছ করতে পেরেছ তখন আবার কিসের ভয় তোমার?"

"ভিতরে আসতে পারি কি?"—মৃদুকণ্ঠে কে যেন প্রশ্ন করল।

তন্দ্রাটা ভেঙে গেল। চোখ খুলে দেখলেন, দুয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কে যেন। বেড-সুইচটা জ্বালতেই দেখতে পেলেন শিখরিণী আর বিনুকে। বিছানা থেকে বেরিয়ে এলেন তাড়াতাড়ি।

শিখরিণী এগিয়ে এসে শান্তকণ্ঠে বললে—"বিনুকে আপনার কাছে রেখে গেলাম। দাদার কাছে পৌঁছে দিন একে। আমি পৌঁছে দিতুম, কিন্তু ফরসা হয়ে গেছে, আমাকে যদি কেউ দেখে ফেলে এর সঙ্গে, আমি একটু মুশকিলে পড়ে যাব। আমি চললুম।"

পর-মুহূর্তেই চলে গেল সে। নিঃশব্দচরণে চলে গেল।

বিনুকে নিয়ে ফিটনে করে যখন হিরণ্যগর্ভ আর তুঙ্গশ্রী আকাশ-বিহারে পৌঁছলেন তখন ভোর হচ্ছে। পূর্বাকাশ অরুণরাগরঞ্জিত। ছাতে গিয়ে তাঁর দেখলেন, মাস্টার মশায় ছেলেদেব নিয়ে প্রভাত-বন্দনা করছেন পূর্বাচলের দিকে চেয়ে। সারি সারি হাত জোড় করে বসে আছে ছেলেরা। বিশুও বসে আছে এক পাশে। মাস্টাার মশায়ের উদাত্ত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সবাই গান ধরেছে—

অন্ধকার হর অন্ধকার হর
জয় জয় জয় জয় হে সূর্য-শঙ্কর
দূর কর ভয় হে
মৃত্যুঞ্জয় হে
উদ্ভাসিত কর বিবর্ণ অম্বর
হে সূর্য-শঙ্কর
অন্ধকার হর।
কণ্টক-কুণ্ঠিত জীবনের পন্থা
বিঘ্ন-বিহীন কর সঙ্কট-হন্তা
বল বল বল হে
আলোকোজ্জ্বল হে
চির-অপরাজিত যৌবন নির্জর।
হে সূর্য-শঙ্কর
অন্ধকর হর।

অন্ধ চিত্ত জুড়ি কবন্ধ শঙ্কা
নির্মূল কর কর দাও জয়-ডঙ্কা
নির্মল কর হে
বৈশ্বানর হে
সুন্দর পবিত্র মঙ্গল কর কর।
হে সূর্য-শঙ্কর
অন্ধকার হর।

সেই দিনই ফিরে গেলেন তুঙ্গশ্রী।

তাঁকে ট্রেনে তুলে দিতে গিয়েছিলেন হিরণ্যগর্ভ। ট্রেনটা যখন ছেড়ে গেল, তখন তিনি আর একবার মনে করিয়ে দিলেন—"হীরা বাইজীকে গিয়েই পাঠিয়ে দেবেন। আর আসবার সময় স্পেক্‌ট্রোস্কোপটা নিয়ে আসবেন। আর আপনি চেষ্টা করবেন বিয়ের দিন আসতে।"

চলন্ত ট্রেনের জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে তুঙ্গশ্রী বললেন—"আচ্ছা।"

তেরো

নির্দিষ্ট দিনে গোধূলি-লগ্নে বিয়ে হয়ে গেল বিনুর সঙ্গে বিশুর। আকাশ বিহারের ছাতে নহবত বসেছিল। ইমন-কল্যাণের সুর উতলা করে তুলছিল সন্ধ্যার আকাশকে।

তেতলার ঘরটায় বসে কথা কইছিলেন তুঙ্গশ্রী আর হিরণ্যগর্ভ।

"আপনার বান্ধবী হীরা বাইজী কলকাতায় কি জন্যে এসেছিলেন?"

"এমনিই এসেছিল বোধহয়। তার নিজের বাড়ি আছে একটা, সেখানে এসে মাঝে মাঝে থাকে।"

"আপনি কি বলে ওকে নিয়ে এলেন?"

"সব খুলে বললাম। শুনেই রাজী হয়ে গেল।"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর তুঙ্গশ্রী বললেন—"আপনার মুরারিপুর স্কুলের যে ছাত্রটি হরপার্বতীর মূর্তি আজ উপহার দিয়ে গেল, সেটা কি ওর নিজের হাতের গড়া?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"—একটু থেমে হিরণ্যগর্ভ সোচ্ছ্বাসে আবার বলে উঠলেন—"বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্যই তো ওই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে স্রষ্টা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছেন, তাঁকেই প্রকট করে তোলা। সৃষ্টির আনন্দে মশগুল হয়ে যেতে না পারলে জীবনই বৃথা। একটা বৃহৎ কিছুতে মেতে না থাকতে পারলে মনুষ্যজীবনের স্বাদই পাওয়া যায় না..."

"আমি তো দেশপ্রেম নিয়ে মেতেছিলুম, কিন্তু জীবন আমার বিস্বাদ হয়ে গেল কেন তা বলতে পারেন?"

"বিস্বাদ হয়ে গেল? হতেই পারে না। তাহলে আপনি মাততে পারেন নি ভালো করে। কিংবা মেতেছিলেন একটা ছোট জিনিস নিয়ে বা একটা মতবাদ নিয়ে। তাই সেটা ফুরিয়ে গেল চট করে।"

"সবই কি ফুরিয়ে যায় না শেষ পর্যন্ত? ওই যে এক্‌স্‌পেরিমেন্ট নিয়ে মেতে আছেন, তাও কি ফুরিয়ে যাবে না একদিন? ওটাও কি একটা থিয়োরি নিয়ে পরীক্ষা নয়?"

"কিন্তু থিয়োরিটাই ওর সব নয়, থিয়োরিটা সত্যের নাগাল পাওয়ার একটা কাল্পনিক পথ মাত্র। আমার আসল উদ্দেশ্য—সত্যকে পাওয়া। আমি কল্পনায় একটা রাস্তা ঠিক করলাম এবং সেই রাস্তায় শেষ পর্যন্ত গিয়ে দেখলাম, সত্যকে যদি পাওয়া গেল ভালোই, না যদি পাওয়া যায় আর-একটা রাস্তা ঠিক করব ভেবে, নূতন রাস্তা সৃষ্টি করবার অভিনব আনন্দে মেতে উঠব আবার। ওর কি শেষ আছে কোনও?"

"আচ্ছা, আপনি যে এই এক্স্পেরিমেন্ট করছেন, তা কতদিন চলবে?"

"গত পাঁচ বৎসর থেকে অনেক রকম পরীক্ষা করে দেখেছি, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ সব বিবরণ লেখা আছে আমার কাছে, সেগুলো মিলিয়ে হিসেব করে দেখতে হবে। বাঁদরটার ওপর যে এক্স্পেরিমেন্টটা করছি, দেখি সেটা কি রকম দাঁড়ায়। এখনও পর্যন্ত তো কিচ্ছু হয় নি ওর।"

"আচ্ছা, ওই সব এক্স্পেরিমেন্ট করতে আপনার খুব ভালো লাগে?"

"ভালো না লাগলে করতে পারি কখনও? আমার ল্যাবরেটারির আলমারিতে আমার এক্স্পেরিমেন্টের যে সব রেকর্ড আছে, তাতে আছে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলির পরিচয়। ওতে যে কী আনন্দ পাই—তা আপনাকে বোঝাতে পারব না ঠিক।"—একটু থেমে তারপর বললেন—"আপনি কি আজই ফিরে যাবেন?"

"হ্যাঁ বিয়ে তো হয়ে গেল, থেকে কী করব?"

"কলকাতায় কোথায় আছেন এখন? কেশবের বাড়ি থেকে তো চলে এসেছেন বলছেন।"

"আমি এখন অলকার বাসায় আছি।"

"ওঃ। এই ট্রেনেই যদি যেতে চান তাহলে উঠতে হয় এখন।"

"চলুন।"

ফিটনে চড়ে আসছিলেন দুজনে।

রাস্তায় দেখা হল নরেনের সঙ্গে। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাইকে চড়ে আসছিল। সে যা খবর দিলে, তা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি ভয়ানক। একদল লোক মোটরে চড়ে এসে হঠাৎ নাকি হিরণ্যগর্ভের ল্যাবরেটারি আক্রমণ করেছিল একটু আগে। কুড়ুল দিয়ে চেলিয়ে কপাট ভেঙে ল্যাবরেটারির জিনিসপত্র ভেঙে পুড়িয়ে তছনচ করে দিয়ে চলে গেছে। সে দলের মধ্যে নরেন নাকি কেশব সামন্তকেও দেখেছে। তুঙ্গশ্রীর চোখের সামনে ফুটে উঠল চপলার বাড়িতে নাচের সেই দৃশ্যটা, আরও মনে পড়ল কেশব সামন্তর সেই কথাগুলো—"গুণ্ডা চাই আমার, বন্দুক, ছোরা, কুড়ুল, কাটারি নিয়ে নিজেই যাব আমি এবার!"

কিন্তু তিনি কিছু বললেন না, নির্বাক হয়ে রইলেন। তাঁর চোখ দুটো জ্বলতে লাগল কেবল।

চোদ্দ

উপর্য্যুপরি কয়েকটা দ্রুত আঘাতে এমন মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন মেঘসুন্দর যে, বিশু-বিনুর বিয়ের খবরটা যখন তিনি পেলেন তখন তাঁর আর রাগ করবার শক্তি নেই। খবরটা পেলেন তিনি একটা চিঠির মারফত। আগের দিনই চিঠিটা লিখে ডাকে দিয়েছিলেন হিরণ্যগর্ভ, যাতে তিনি ঠিক বিয়ের পরদিন চিঠিটা পান। খুব সংক্ষিপ্ত চিঠি।

শ্রীচরণেষু,

বিশু আর বিনুর বিয়ে দিয়ে দিলাম। যা অনিবার্য তাকে নিবারণ করতে পারেন নি বলে মনে গ্লানি রাখবেন না। ওরা দুজনেই আপনাকে ভক্তি করে।

ওদের আশীর্বাদ করুন। ওরা আকাশ-বিহারে আছে। আমি একান্ত মনে আশা করে রইলাম যে, আপনি আমাদের বিরাট বংশমর্যাদার মান রাখবেন ইতি— প্রণত

হিরণ

এই চিঠি পেয়ে মেঘসুন্দর হয়তো বোমার মতো ফেটে পড়তেন, কিন্তু তাঁর আর শক্তি ছিল না। সকালে উঠে শিখরিণীর মুখে যখন তিনি শুনলেন যে, বিনু জানলার সঙ্গে শাড়ি বেঁধে তারই সাহায্যে নেমে পালিয়েছে তখন হতভম্ব হয়ে গেলেন তিনি। বিনুর উপর তাঁর যে জোর ছিল বলে তিনি বিশ্বাস করতেন, যে জোরের অহঙ্কারে তিনি তাকে তার অন্যায় আচরণের জন্যে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, সহসা আবিষ্কার করলেন তার উপর সে জোর তাঁর নেই। সে তাঁকে অনায়াসে ছেড়ে চলে গেছে। অহঙ্কারের স্ফীত রবারের বেলুনটা চুপসে গেল যেন সহসা পিনের খোঁচা খেয়ে। সমস্ত দিন তিনি একটি কথা বলেন নি, কিছু খানও নি। চুপ করে বসেছিলেন। শিখরিণী নিঃশব্দে এসে নিঃশব্দে ফিরে গেছে কয়েকবার। কথা বলতে সাহস করে নি। তার পরদিন সকালবেলা অপ্রত্যাশিতভাবে হীরা বাইজী এসে পড়াতে আরও বিমর্ষ হয়ে গেলেন তিনি, একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন যেন। মনে হল, আন্তরিক আনন্দ-সহকারে তাঁকে অভ্যর্থনা করার শক্তিও যেন নেই তাঁর, ভিতরটা হঠাৎ ফোপরা হয়ে গেছে, বাইরে ব্যর্থ আড়ম্বরটা পড়ে আছে শুধু। এতদিনের সঙ্গী বেহালাটাও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল হঠাৎ। হীরা বাইজী তাঁর আগমনের যে কারণটা বলেছেন এসে, তাতে আরও লজ্জিত হয়ে পড়েছেন তিনি। হীরা বাইজী বললেন যে, কলকাতায় এসে তিনি নূতন যে কয়েকটা বাংলা গান শিখেছেন তাই তাঁকে শুনিয়ে যাবেন বলে এসেছেন, কারণ তাঁর মতো সমঝদার গুণীকে গান শোনাতে পারা একটা সৌভাগ্য বলে মনে করেন তিনি। শুনে লজ্জায় মাথা নত হয়ে গেছে তাঁর, বুকের ভিতরটা 'হায় হায়' করে উঠেছে। তিনি সারা জীবন ওই গান নিয়েই আছেন, কিন্তু কিছু পান নি। সারা জীবন হাতড়ে বেরিয়েছেন শুধু। পিপাসিত লোক জলের সন্ধানে ছুটে বেড়ায় যেমন তেমনি ছুটে বেরিয়েছেন শুধু। আকুল হয়ে ছুটতে ছুটতে হোঁচট খেয়েছেন বারংবার, মুখ থুবড়ে পড়ে গেছেন কিন্তু জল পান নি। ছোটাই সার হয়েছে শুধু। বাইরের লোক তাঁকে ঘিরে যতই বাহবা বাহবা করুক, তিনি নিজে জানেন কত বড় সঙ্গীতবিশারদ তিনি। বাইরের লোকের বাহবাকে তিনি গ্রাহ্য করেন না, কারণ তিনি জানেন যে ওই অপদার্থ পারিষদগুলোর বাহবা দেবার প্রেরণা তাঁর সঙ্গীত-বিদ্যা নয়, তাঁর ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স। কিন্তু হীরা বাইজীর মুখে এ কথা শুনে তিনি সত্যিই লজ্জিত হয়েছেন। হীরা বাইজী তাঁর পারিষদ নন, সত্যিই গানের উপর অসাধারণ দখল আছে তাঁর, তিনি এ কথা বললেন কেন? তবে কি তাঁকেও ঠকিয়েছেন তিনি তাঁর ঐশ্বর্যের চাকচিক্যে? তাঁর মুখোশটা কি এমন বেমালুম মিশে গেছে তাঁর মুখের সঙ্গে যে, তাঁর স্বরূপ চিনতে হীরা বাইজীরও ক্ষমতায় কুলোচ্ছে না। সত্যিই কেমন যেন লজ্জিত হয়ে পড়লেন তিনি।

হীরা বাইজী কিন্তু জমিয়ে তুললেন ক্রমশ। তোড়ী, ভৈরবী, আশাবরী, গৌরসারং, পিলু,

পূরবী, মূলতান, ইমন-কল্যাণ গেয়ে গেলেন পর পর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। সুরসপ্তকের বিভিন্ন বিচিত্র ধারায় অবগাহন করে মেঘসুন্দরের মন ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ হল যেন। একটা উদার ঔদাসীন্য ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ করে তুলল তাঁর হৃদয়কে, গানের দোলায় দুলতে দুলতে তিনি ক্রমশ আবার নিজের আত্মমর্যাদালোকে গিয়ে হাজির হলেন, খুঁজে পেলেন যেন নিজেকে।

...ইমন-কল্যাণের গুরুগম্ভীর আলাপ চলছিল, এমন সময় খবর এল, হিরণ্যগর্ভের ল্যাবরেটাবিতে ডাকাত পড়েছে—হিরণ্যগর্ভ বাড়িতে নেই। অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন মেঘসুন্দর। তাঁর নিজের গোটা দশেক বন্দুক ছিল। অবিলম্বে দশজন সিপাই নিয়ে গণপৎ সিং ডাকাতের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে দিলে। তিনি নিজেও খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠলেন ছাতে নিজের রাইফেলটা নিয়ে এবং গুলি চালাতে লাগলেন। এককালে খুব ভালো শিকারী ছিলেন তিনি। ডাকাতের দল পালাল। মেঘসুন্দরের সিপাহীরা গিয়ে না পড়লে সমস্ত ল্যাবরেটারিটাই ধ্বংস করে দিত তারা। সিপাহীরা গিয়ে পড়াতে তবু কিছুটা বেঁচেছে।

...এর পর আর গান জমল না। হিরণ্যগর্ভের খোঁজে থানাতে লোক পাঠালেন তিনি। তারপর অস্থির হয়ে ঘু'রে বেড়াতে লাগলেন ঘরের চারিদিকে। শিখরিণী নীরবে দাঁড়িয়ে সব শুনলে, তারপর নীরবে বেরিয়ে চলে গেল। তাতে আরও অস্থির হয়ে পড়লেন মেঘসুন্দর। কিছু বলছে না কেন ও? ও-রকমভাবে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে যাবার মানে কি? মন্মথও কোথায় গিয়ে বসে রইল এই সময়ে? একটু পরে কম্‌প্রেস নিয়ে এল শিখরিণী। বোঝা গেল, খুব বেশী আতর ঢেলেছে। নিমেষের মধ্যেই ঘরটা গোলাপী আতরের গন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

"কাকু, তুমি বস, সেঁকটা দিয়ে দিই।"

মেঘসুন্দর কৃতার্থ হয়ে গেলেন যেন। এই রকম কিছু একটার জন্যে যেন মনে মনে তৃষিত হয়েছিলেন। বাধ্য বালকের মতো বসলেন।

"কি কাণ্ড! খুব দুর্বৎসর এবার। লোকে খেতে পাচ্ছে না, ডাকাতি তো হবেই।"

শিখরিণী কোনও উত্তর না দিয়ে সেঁক দিয়ে যেতে লাগল নীরবে।

"কোনও কথা বলছিস না কেন তুই?"

আরও কিছুক্ষণ নীরব থেকে মৃদু হেসে শিখরিণী বললে—"কী বলব আমি?"

মেঘসুন্দরেরও মনে হল, তাই তো, এ বিষয়ে শিখরিণীর আর কি বক্তব্য থাকতে পারে?

"হিরণের কোনও পাত্তা পাওয়া যায় নি?"

"কি জানি।"

"সে ওই ছুতোর ছোঁড়াটাকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছে? এদিকে তার নিজের বিষয়সম্পত্তি যে উড়ে-পুড়ে শেষ হয়ে গেল, সেদিকে খেয়াল নেই!"

এ কথারও কোনো জবাব দিলে না শিখরিণী। নীরবে সেঁক দেওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল।

"রাত্রে কি খাবে তুমি কাকু?"

"কিছু খাব না।"

"ডিমের পুর দিয়ে কচুরি কয়েকটা—"

"না, না, আমার জন্যে কিছু করতে হবে না।"—অধীরভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন মেঘসুন্দর।

"তোমার জন্যে করতে যাচ্ছি না, আমি করেছি, তুমি যদি খাও আনি তাহলে।"

"থাক, দরকার নেই।"

শিখরিণী চলে গেল। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন মেঘসুন্দর। এলোমেলো চিন্তার বিক্ষুব্ধ স্রোতে ছেড়ে দিলেন মনটাকে। অতীতের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল দাদাকে—পণ্ডিত বিশুদ্ধসুন্দরকে। নামের মর্যাদা তিনি রেখেছিলেন। বিশুদ্ধ এবং সুন্দর জীবনই যাপন করে গেছেন। লেখাপড়া নিয়েই কাটিয়ে গেছেন সারাজীবন। উপনিষদ্ নিয়ে যখন মেতেছিলেন, তখন হিরণের জন্ম হয়, তাই ওর নাম রেখেছিলেন হিরণ্যগর্ভ। বলেছিলেন—ও কেবল আমাদের নয়, ও সকলের। ওর জন্ম আজই হয়নি, ও চিরন্তন। পঞ্চভূতে মিশে আছে ও অনাদিকাল থেকে ও হিরণ্যগর্ভ। হঠাৎ মেঘসুন্দরের মনে হল, পিতার ভবিষ্যদ্বাণী সফল করেছে হিরণ। সত্যিই ও কারও নয়, অথচ সকলের। নিজের বলে ওর কিছু নেই, সব বিলিয়ে দিচ্ছে, এমন কি নিজেকেও বিলিয়ে দিচ্ছে গানের সুরের মতো। একটা গানের উপমা মনে এল সহসা। একজন বড় ওস্তাদ যেমন একটা যন্ত্রকে অবলম্বন করে নিজের মনের সুর বাজায়, হিরণও তেমনি ওই ল্যাবরেটারি অবলম্বন করে নিজেকেই বাজাচ্ছে। আসলে ও সুরশিল্পী একজন। কথাটা মনে হওয়ামাত্র মনটা প্রসন্ন হল তাঁর। হবে না? তাঁদের বংশে সবাই যে সুরের সমঝদার ছিলেন তাঁদের পূর্বপুরুষ বসন্তসুন্দরের নাম আজও অভিজাত ওস্তাদরা মনে করে রেখেছে। অনেকে বলে, বসন্ত সুরের তিনিই নাকি স্রষ্টা। এ কথাটা অবশ্য বিশ্বাস করেন না মেঘসুন্দর, কারণ প্রাচীন শাস্ত্রেও এ সুরের নাম রয়েছে। টাকার লোভে খোশামোদ করে কেউ রটিয়েছে বোধ হয় কথাটা। হঠাৎ মেঘসুন্দরের মনে হল আশ্চর্য জিনিস এই টাকা; ও না হলে চলে না, অথচ থাকলেও নানা ঝঞ্ঝাট। নানা ফন্দি করে কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে সবাই। খোশামোদ করে, শেয়ার বিক্রয় করে, স্ট্রাইক করে, শেষ পর্যন্ত ডাকাতি করে। হিরণের ল্যাবরেটারিটা তো ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেল—এখন কী করবে ও, কী করে বাঁচাবে নিজেকে? হঠাৎ মনে পড়ল, তাঁর বেহালাটাও ভেঙে গেছে। মনে হল, হিরণ যেন তাঁর অতি কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। লুণ্ঠিত বিধ্বস্ত বিক্ষত হিরণ। ও কি আবার ওর ল্যাবরেটারি গড়তে পারবে? তিনি হয়তো আবার একটা বেহালা কিনতে পারবেন, কিন্তু ও কি পারবে আবার একটা ল্যাবরেটারি করতে? পেটেন্ট ওষুধের ফরমুলা বেচে যে টাকাটা পেয়েছিল, তা নিশ্চয়ই উড়িয়ে দিয়েছে এতদিন। নিজের জমিদারি থেকে একটি পয়সা তো ও নেবে না। হঠাৎ উত্তেজনাভরে উঠে দাঁড়ালেন। সেঁক দিয়ে হাঁটু র ব্যথাটা অনেক কমে গেছে মনে হচ্ছে। খচ করে লাগল না তো! এগিয়ে গেলেন তিনি একটা দেওয়াল-আলমারির কাছে। সেদিন রেগে হিরণকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে যে উইলটা করেছিলেন, সেটা বার করলেন: ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ সেটার দিকে, তারপর কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ভারি আনন্দ হল। ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ঘরের চারিদিকে। নিজের অজ্ঞাতসারেই গুনগুন করতে লাগলেন একটা গানের কলি—"ভঁওরা ঘুর ঘুর যাতি হায়।

তারপর হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন—"ওরে, কে আছিস—"

একটি চাকরানী আধঘোমটা দিয়ে দাঁড়াল দ্বারপ্রান্তে।

"শিখুকে ডেকে দে।"

শিখরিণী আসতেই ধমকে উঠলেন তিনি—"কই, কোথায় তোর কচুরি, আনলি না?'

তিনি নিজেই যে খাবেন না বলেছিলেন, সে কথার উল্লেখমাত্র করলে না শিখরিণী। মৃদু হেসে শুধু বললে—"আনছি।" বলেই চলে গেল।

...অনেকগুলো কচুরি খেলেন মেঘসুন্দর। বেশ তৃপ্তি করেই খেলেন। রাত্রে বেশ ভালো ঘুমও হল তাঁর। এমন সুনিদ্রা বহুকাল হয় নি।

সকালে পিওন যখন চিঠিটা দিয়ে গেল, তখন হীরা বাইজী উদাত্ত সুরে একটা বাংলা গান গাইছিলেন—

হে মহাসুন্দর হে সঙ্কাশ,
সবার ঊর্ধ্বে তুমি বিরাজ
হে মহারাজ, হে মহাকাশ।
তোমারে ঘিরিয়া করে আনন্দ
লক্ষ তপন তারকা চন্দ্র
পাখি পতঙ্গ জলদমন্দ্র
তোমারি মাঝারে হয় বিকাশ।
বিশ্বের বিষ হরণ করিয়া
যোগীশ্বর হে নীলকণ্ঠ,
হে মহানিঃস্ব, হে মহাঋদ্ধ,
সবারে সুধা যে তুমিই বণ্ট।

তব মাঝে কত গিরি কত সমুদ্র
হে মহাশান্ত, হে মহারুদ্র,
ছোট ধূলিকণা অতীব ক্ষুদ্র
তারও আছে ঠাঁই তব সকাশ।

চিঠিখানা আর একবার পড়লেন মেঘসুন্দর।—"ওদের আশীর্বাদ করুন। ওরা আকাশ-বিহারে আছে। আমি একান্ত মনে আশা করে রইলাম যে, আপনি আমাদের বিরাট বংশমর্যাদার মান রাখবেন।"..হীরা বাইজীর কণ্ঠে উদাত্ত সুরে ধ্বনিত হচ্ছিল—সবার ঊর্ধ্বে তুমি বিরাজ, হে মহারাজ, হে মহাকাশ।

মেঘসুন্দর ঠিক করে ফেললেন, আকাশ-বিহারে গিয়ে ওদের আশীর্বাদ করবেন। গানটা শেষ হতেই গণপৎ সিংকে বললেন, হিরণবাবুকে ডেকে আনতে। গণপৎ সিংয়ের সঙ্গে এল নরেন।

"হিরণদা আকাশ-বিহারে আছেন।"

"তাকে খবর পাঠাও যে, আমি ওদের আশীর্বাদ করতে যাব আজ বিকেলে।"

নরেন চলে যাচ্ছিল, মেঘসুন্দর আবার ডাকলেন।

"শোনো। ল্যাবরেটারির কতটা পুড়েছে?"

"টাইফয়েডের কালচারগুলো নষ্ট হয় নি, আর সবই প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে।"

"ও, আচ্ছা। খবর পাঠিয়ে দাও এক্ষুণি।"

"আমি নিজেই যাচ্ছি।"

নরেন চলে গেল।

হীরা বাইজী ভজন ধরলেন একটা।

পনেরো

কেশব সামন্তর তেতলার ঘরেও ঐকতান জমে উঠেছিল খুব। হু-হু করে জ্বলছিল স্টোভটা, বেজে চলেছিল বিলিতি অর্কেস্ট্রা, স্যাক্সোফোনটা খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসছিল যেন প্রেতিনীর মতো। কেশব সামন্ত নিজে বাজাচ্ছিলেন একটা ঝাঁঝর ঝম-ঝম করে। চতুর্দিকে ছড়ানো পড়েছিল হিরণ্যগর্ভের আর মেঘসুন্দরের গুলিবিদীর্ণ ফোটোগুলো, শিখরিণীর ফোটোটার কপালে আর একটা তাজা রক্তের ফোঁটা জ্বলজ্বল করছিল। মাঝে মাঝে হা-হা-হা-হা করে অট্টহাসি হাসছিলেন কেশব সামন্ত। হঠাৎ নীচে ইলেক্ট্রিক বেলটা বেজে উঠল। গ্রামোফোনের রেকর্ডটাও থেমে গেল। বাজনা থামিয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ কেশব সামন্ত। তারপর স্টোভটা নিবিয়ে নীচে নেমে গেলেন তিনি। বিশেষ কিছু নয়, পিওন দাঁড়িয়ে ছিল একটা রেজেস্ট্রি চিঠি নিয়ে। চিঠিটা সই করে নিলেন তিনি। পিওন চলে গেল। অপরিচিত হস্তাক্ষরের চিঠি খুলেই বুকটা কেঁপে উঠল। শিখরিণীর চিঠি। লিখেছে —"তোমার চিঠি পেয়েছি। আমি এসেছি কলকাতায়, উপরের ঠিকানায় আছি। তোমার বাড়িতে যাওয়া অসম্ভব, কারণ উনি সঙ্গে আছেন। তুমি যদি কোনও রকমে উপরের ঠিকানায় আসতে পার দেখা হবে। ইতি"—নাম নেই। হাতের লেখাও শিখরিণীর নয়। ভ্রূকুঞ্চিত করে গোঁফ পাকাতে লাগলেন কেশব সামন্ত।

ষোল

মেঘসুন্দর উঠছিলেন আকাশ-বিহারে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করবার জন্যে। পিছনে আসছিল পুরোহিত এবং অনুচরের দল আশীর্বাদের উপকরণ ও উপহারের সম্ভার বহন করে। হিরণ্যগর্ভও সঙ্গে ছিলেন। সকলের পিছনে আসছিল শিখরিণী শাঁখ বাজাতে বাজাতে। তেতলা পর্যন্ত উঠে হাঁফ ধরতে লাগল মেঘসুন্দরের। সেইখানেই থেমে গেলে পারতেন, কিন্তু থামলেন না। তাঁর কেমন যেন রোখ চড়ে গেল, সাততলার উপরেই উঠবেন। ওদের বাসরঘরে গিয়েই আশীর্বাদ করবেন। নিজের কষ্টের কথা কাউকে কিছু বললেন না। সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন। সাততলার সিঁড়িতে যখন উঠছেন, তখন বুকের ভিতর যেন হাতুড়ি পিটছে তাঁর। হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল। তারপর — চোখের সামনে অন্ধকার—মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন তিনি। নূতন যুগের বাসরঘরের দ্বারে মৃত্যু হল প্রাচীন আভিজাত্যের।

আর একটা মৃত্যুও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটল, কলকাতায় হীরা বাইজীর বাড়িতে। তুঙ্গশ্রীর গুলিতে মারা গেলেন কেশব সামন্ত।

সতেরো

হিরণ্যগর্ভ নিজের ল্যাবরেটারিতেই বসেছিলেন কম্বলের উপর। বই পড়ছিলেন একটা। পরিধানে সাদা থান, সাদা উত্তরীয়। মাথার চুল উস্কখুস্ক। ছ দিন না-কামানোর ফলে খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি উঠেছে। কাকার মৃত্যুতে অশৌচ পালন করছেন।

...তুঙ্গশ্রী এসে প্রবেশ করলেন।

"আসুন।"—সুমিষ্ট হাসি হেসে অভ্যর্থনা করলেন হিরণ্যগর্ভ, যেন কিছুই হয় নি। তাঁর হাসি দেখে বিস্মিত হলেন তুঙ্গশ্রী।

"কাকা মারা গেছেন—"

"সব শুনলাম আমি এখনই নরেনের কাছে। কেশববাবুও মারা গেলেন, শোনেন নি বোধহয়?"

"তাই না কি! না, শুনি নি তো! কী করে মারা গেল?—আহা!"

"তুঙ্গশ্রীর গুলিতে।"

পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

"অন্যায় করেছেন।"—হিরণ্যগর্ভ বললেন শেষে।

"ন্যায় অন্যায় জানি না। আমি আমার বিবেকের আদেশ পালন করেছি শুধু।"

আবার খানিকক্ষণ নীরব হয়ে বসে রইলেন।

"আপনার ল্যাবরেটারি তো ভেঙে গেল। এইবার কী করবেন?"

"আবার গড়ব। যন্ত্রপাতি সব বাজারে পাওয়া যাবে। কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে আমার এতদিনের রেকর্ডগুলো পুড়ে গিয়ে। বাঁদরটা ভাগো ও-বাড়িতে ছিল। বাঁদরটার এখনও কিছু হয় নি। ওর যদি কিছু না হয় তাহলে আমার শেষ এক্‌স্‌পেরিমেণ্টটা আমি করব অশৌচটা শেষ হয়ে গেলে।"

"টাইফয়েড কাল্‌চার খাবেন?"

"হ্যাঁ।"

কিন্তু কলকাতায় একজন ডাক্তারকে জিগ্যেস করেছিলাম, তিনি বললেন—টাইফয়েড কাল্‌চার খেলে নিশ্চয়ই টাইফয়েড হবে।"

"হলই বা, যদি মরেই যাই তাতেই বা ক্ষতি কি?"

অত্যন্ত শান্তভাবে কথাগুলি বললেন হিরণ্যগর্ভ।

তারপর একটু হেসে বললেন—"একটা কথা শুধু মনে হচ্ছে মাঝে মাঝে। আমি যদি মারা যাই, আমার মুরারিপুর স্কুলটা হয়তো উঠে যাবে। আপনি ভার নিন না আমার স্কুলটার। মাস্টার মশাই তো আছেন, আপনিও যদি থাকেন—"

"আমার মতো খুনে মেয়েকে বিশ্বাস হয় আপনার?"

কিছুক্ষণ নির্নিমেষে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"হয়।"

জানলার দিকে চেয়ে চুপ করে রইলেন তুঙ্গশ্রী অনেকক্ষণ।

তারপর বললেন—"আপনিই এখানকার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। আপনি যদি না থাকেন তাহলে—"

"আমি? আমি কে? দেশের কাজই যদি সবচেয়ে বড় আকর্ষণ না হয় আপনার, তাহলে আপনাকে আসতে হবে না।"

আবার নীরবে বসে রইলেন দুজনে।

তারপর হিরণ্যগর্ভ বললেন—"আমি আকাশ-বিহারে যাচ্ছি এখনই। এ ক'দিন সেখানেই থাকব। আপনি শিখুর কাছে থাকুন। আপনি যে স্পেক্‌ট্রোস্কোপটা দিয়ে গিয়েছিলেন, সেইটে দিয়ে ছেলেদের দেখাব আজ সূর্যালোকে কেমন চমৎকার সাতটা রঙ আছে। তারা আসবে

আজ সেখানে, সেইজন্যেই এই ফিজিক্‌সের বইটা পড়ছিলাম বসে। আপনি বরং বাড়িতে যান। কুঞ্জ—"

তুঙ্গশ্রী একটু আহত হলেন মনে মনে । তাঁর সম্বন্ধে কিছুমাত্র মোহ নেই ভদ্রলোকের। একেবারে নির্বিকার। সমস্ত মনটা মুচড়ে উঠল যেন। কিন্তু মুখের একটি পেশীও বিচলিত হল না। অন্তরের অন্তস্তলে যে বঞ্চিতা অভাগিনী নিঃশব্দ উপুড় হয়ে পড়েছিল, তার দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন তিনি। কুঞ্জ আসতেই উঠে দাঁড়ালেন।

"আচ্ছা, তাহলে উঠি এখন। দু-এক দিনের মধ্যেই চলে যাব আমি বোধ হয়।"

"ও, আচ্ছা। নমস্কার।"

"নমস্কার।"

আঠারো

আকাশ-বিহারের ছাতে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন হিরণ্যগর্ভ একটা বাইনাকুলার নিয়ে। বিরাট আকাশের পটভূমিকায় বিশাল দিগবলয়ের দিকে চেয়ে সমস্ত ক্ষতি, সমস্ত শোক, সমস্ত গ্লানি ঘুচে গিয়েছিল তাঁর। তাঁর মনে হচ্ছিল, ভারতবর্ষের শাশ্বত রূপ যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে চারদিকে। কোথাও কোন নীচতা নেই, দীনতা নেই, সঙ্কীর্ণতা নেই। সবুজ মাঠের উপর নেমে এসেছে শুভ্র সূর্যালোক নির্মল নীল আকাশ থেকে— যে সূর্যালোক অন্ধকারকে হরণ করে, যে সূর্যালোক সপ্তবর্ণের সমন্বয় এবং সেইজন্যেই যা সর্বপাপঘ্ন।

বাইনাকুলার দিয়ে দেখতে লাগলেন ঘুরে ঘুরে চারদিক। হঠাৎ দেখতে পেলেন তুঙ্গশ্রী আসছেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন দ্রুতবেগে। হিরণ্যগর্ভও নামতে লাগলেন। মধ্যপথে দেখা হল।

তুঙ্গশ্রীর বুকের ভিতরটা কাঁপছিল। মুখটা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

"কি খবর? আসুন।"— হেসে অভ্যর্থনা করলেন হিরণ্যগর্ভ।

"আপনার বাঁদরটার অসুখ করেছে। চুপ করে শুয়ে আছে, কিছু খাচ্ছে না।"

"আপনাকে কে বললে?"

"আমি গিয়েছিলাম সেটাকে দেখতে।"

"ও। তাহলে বোধ হয় হয়েছে কিছু।"

"তাহলে তো আপনার ওই এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করবার দরকার হবে না?"

"না, ওর যদি টাইফয়েড্‌ হয় তাহলে তো আমার এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট শেষ হয়ে গেল।"

তুঙ্গশ্রীর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"চলুন, ওপরে যাওয়া যাক। ছেলেরা আসে নি এখনও?'

"না। এইবার আসবে।"

"চলুন, ওপরে যাই, আপনার স্পেক্‌ট্রোস্কোপের এক্‌স্‌পেরিমেণ্টটা আমিও দেখব।"

দুজনে উপরে উঠতে লাগলেন।

ভীমপলশ্রী

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
(বনফুল)

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

241

প্রকাশক :

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি. এ.

৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

মূল্য চার টাকা আট আনা

দ্বিতীয় সংস্করণ

চৈত্র, ১৩৫৭

মুদ্রাকর :

শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.

কে. পি. বসু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌,

১১নং মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত আশু দে
(প্রখ্যাত 'অ্যাসিউড্')
করকমলে—

২০।১১।৪৮
ভাগলপুর

ভূমিকা

সুবিখ্যাত হাস্যরসিক 'Ben Travers'এর বিখ্যাত পুস্তক 'A Cuckoo in the Nest'এর রসবস্তুকে আমি বাংলায় রূপান্তরিত করবার প্রয়াস পেয়েছি এই গ্রন্থে। আখ্যানটিকে যথাসম্ভব বাঙালী রূপ দেবার জন্যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তনও করেছি মাঝে মাঝে।

২০।১১।৪৮ 'বনফুল"

ভাগলপুর

ভীমপলশ্রী

(১)

প্রথমেই জেনে রাখা ভাল যে কাহিনীটি বিবৃত করতে উদ্যত হয়েছি তার স্থানকাল পাত্রপাত্রী সমস্তই কাল্পনিক। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সাময়িক কোন রকম ফাঁদে পা দেবার ইচ্ছে নেই। স্থান অবশ্য আমাদেরই দেশ, কালও বর্ত্তমান—হোটেল, মোটর, ফোন, রেডিও, রেলগাড়ি, সবই আছে—পাত্র-পাত্রীও বাঙালী। তরুণ-তরুণী, সেকেলে, দুই-কালের-সীমা-রেখায়-দণ্ডায়মান সব রকম ব্যক্তিই আছেন।

সুশোভন গল্পের নায়ক। সার্থক-নামা ব্যক্তি। কোথাও কখনও অশোভন হয় নি। কান্তি অনিন্দ্য, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সও অনিন্দ্য। ভবিষ্যতও নিন্দনীয় নয়। কারণ বাপ মা ভাই বোন প্রভৃতি কোনও রকম ঝামেলা নেই। মাত্র কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় স-সম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে; একটি সুনির্ব্বাচিত সুহৃদ-গোষ্ঠী আছে। চাকরি কিম্বা ব্যবসা করে' অর্থোপার্জ্জন করবার প্রয়োজন হয় না। এ অবস্থায় সুতরাং যা অনিবার্য্য তাই তিনি হয়েছিলেন—'কমরেড্'। সুদের টাকা উপভোগ করতে করতে ক্যাপিট্যালিজমের নিন্দে করে' তিনি অবসর এবং চিত্তবিনোদন করতেন। কমরেড্ বান্ধবীও জুটেছিল কয়েকটি। বিয়ের সামাজিক বাজার মন্দা আজকাল। বুদ্ধিমতী বাঙালী মেয়েরা রাজনৈতিক বাজারে ভীড় করেছেন সুতরাং তর্ক, গান, গল্প, গুজব, থিয়েটার, সিনেমা, সাহিত্য, দেশোদ্ধার প্রভৃতি নিয়ে সুশোভনের দিন ভালই কাটছিল। এমন সময় হঠাৎ—ঠিক হঠাৎ না—কমরেড্ অনীতার সঙ্গে আলাপ অনেক দিন আগেই হয়েছিল—তবে অভিনব অনুভূতিটা হঠাতই উথলে উঠল একদিন এবং শেষ পর্য্যন্ত সামলানো

গেল না। বিয়েই করতে হল। অনীতার মা শ্রীযুক্তা স্বয়ম্প্রভা সরকারের ঘোর আপত্তি ছিল বিয়েতে। কিন্তু উভয়েই যখন কমরেড্, তখন আটকাল না কিছু।

শ্রীযুক্তা স্বয়ম্প্রভা সরকারকে বরবর্ণিনী বললে ব্যাকরণ ভুল তো হবেই না, অত্যুক্তিও হবে না। কিন্তু একটু বিস্তৃততর পরিচয় না দিলে সাধারণ পাঠক-পাঠিকারা তাঁর স্বরূপটি ঠিক ধরতে পারবেন না হয়তো। আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান না হলেও স্বয়ম্প্রভা সরকার সত্যিই অসাধারণ মহিলা। ঘাড়ে-গর্দ্দানে বেঁটে মোটা বলিষ্ঠ-চোয়াল, ছোট চুল, ঘন-ভুরু তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি যে রমণীটি বর্ত্তমানে পাড়ার সকলের অন্তরে অবিমিশ্র ভীতি ছাড়া অন্য কোন ভাব উৎপাদন করতে ইচ্ছুক নন তিনিই যে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কুমারী স্বয়ম্প্রভা মিত্র ছিলেন এবং বেণী দুলিয়ে জিতু সরকারের হৃদয়-হরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন তা অকুণ্ঠিত-চিত্তে না পারলেও জিতু সরকারকে স্বীকার করতে হবে বই কি। স্বয়ম্প্রভা মিত্রের বাবা যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন—তখন তা নিয়ে খুবই হৈ চৈ হয়েছিল, কিন্তু তার কিছুদিন পরেই যখন তাঁর মাইনার-পাস আলোক-প্রাপ্ত দুহিতাটি গোঁড়া হিন্দু পরিবারের নিরীহ যুবক জিতেন্দ্রনাথকে কবলস্থ করলেন তখন যে আন্দোলন, হট্টগোল, দলাদলি, চীৎকার প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছিল সংযুক্তা-পৃথ্বীরাজ সম্পর্কেও ঠিক ততটা হয়েছিল কিনা সন্দেহ। বলা বাহুল্য জিতেন্দ্রনাথের বাবা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করলেন। পিতৃবিত্ত বঞ্চিত জিতেন্দ্রনাথ স্বকীয় পুরুষকার বলে কি করে' অকূল সমুদ্রে পাড়ি জমাতে পেরেছিলেন তা এ কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা শুধু বলা যেতে পারে। যে আলোক-প্রাপ্ত সমাজে স্থান পাবেন আশা করে' স্বয়ম্প্রভা বেণী দুলিয়েছিলেন এবং জিতু সরকার সমাজ ত্যাগ করেছিলেন সে আলোক-প্রাপ্ত সমাজে তাঁরা ঢুকতেই পারেন নি। কারণ প্রথম জীবনে সে সমাজে ঢোকবার চাবিই সংগ্রহ করতে পারেন নি তাঁরা। জিতু সরকার টাকা রোজগার করেছিলেন শেষ বয়সে। সুতরাং প্রায় সারাজীবন স্বয়ম্প্রভাকে রূপকথা-বর্ণিত আঙুর-লুব্ধ শৃগালের ভূমিকায় অভিনয় করে' যেতে

হয়েছে। এবং তার ফলে যা হয়েছে তা মনস্তাত্ত্বিকদের মর্ম্মরোচক হলেও জিতু সরকারের পক্ষে হয়েছিল মর্ম্মান্তিক। অনীতা ও সুশোভনের পক্ষেও তা সুখকর হয় নি।

আর একটি ব্রাহ্ম দম্পতীও এই কাহিনীটিকে অলঙ্কৃত করেছেন। তাঁদেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় আগে থাকতে জেনে রাখা ভাল। শ্রীযুক্ত দিগ্বিজয় সিংহরায় অভিজাতবংশীয় জমিদার। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমবয়সী না হলেও সমসাময়িক ছিলেন। এখনকার শিক্ষিত সমাজে আধুনিক হতে হলে যেমন 'কমরেড্' হতে হয় তখনকার শিক্ষিত সমাজে তেমনি ব্রাহ্ম হতে হত। মদ খাওয়াটাও আধুনিকতার আর একটা লক্ষণ ছিল। দিগ্বিজয়ের পিতা জগদ্বিজয় নিজের ইয়ার-বক্‌শি মহলে ছিলেন অত্যাধুনিক। সুতরাং তিনি ব্রাহ্মও হয়েছিলেন, মদও খেতেন। তাঁর কীর্ত্তিকলাপ তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা অনেকেই এখন গতাসু হয়েছেন, সে কীর্ত্তিকাহিনীও এখন অবলুপ্ত-প্রায়। তবু এখনও কিছু কিছু শোনা যায় মাঝে মাঝে। তিনি যেদিন বাগান বাড়ি করতেন সেদিন না কি—যাক্, সে সব কথা অবান্তর এ গল্পের পক্ষে। বাধ্য পুত্রের মত দিগ্বিজয় পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন কিছুদিন। কিন্তু পারলেন না। তিনি ছিলেন অন্য চরিত্রের লোক। হাল্লা হুল্লোড় বরদাস্তই করতে পারতেন না। কোলকাতা শহরের কোলাহলই অতিষ্ঠ করে' তুলল তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত। বিশেষতঃ যখন অলিগলিতে ট্যাক্সির দৌরাত্ম্য সুরু হল তখন তিনি পত্নী সুরেশ্বরীকে নিয়ে সরে' পড়লেন দেহাতে নিজেদের জমিদারিতে। কোলকাতায় কচিৎ আসতেন। খবরের কাগজের মারফত কোলকাতার যে সব খবর পেতেন তাতে আসবার প্রবৃত্তিও আর হত না। সুরেশ্বরী দেবীও অভিজাত-বংশীয় আলোক-প্রাপ্ত মহিলা। তবে আলোকটা সেকেলে আলোক। হাব-ভাব-পোষাকে তখনকার দিনের ঠাকুর বাড়ির মেয়েরাই তাঁর আদর্শ ছিল। হঠাৎ দেখলে স্বর্ণলতা দেবী বলে' ভুল হত। এই নিঃসন্তান দম্পতী পরস্পরকে নিয়ে দেহাতে নিজেদের জমিদারিতে সুখেই থাকতেন।

এক-ঘেয়ে সুখও বেশী দিন ভাল লাগে না। সুরেশ্বরীর আগ্রহাতিশয্যে দিগ্বিজয়কে তাই বাইরের জগতের সঙ্গে যোগ-স্থাপন করতে হত মাঝে মাঝে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করতেন সুযোগ পেলেই। দিগ্বিজয় মোটরকার পছন্দ করতেন না, কিন্তু সুরেশ্বরীর জন্যে কিনতে হয়েছিল একটা। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্যে সেটা চড়ে শাল গায়ে দিয়ে বেরুতেনও তিনি মাঝে মাঝে। কিন্তু তা কদাচিৎ।

আর একটি অসাধারণ ব্যক্তির পরিচয়ও আগে থাকতে করা উচিত। স্বয়ম্প্রভা দেবীর দূর সম্পর্কের আত্মীয় সদারঙ্গবিহারীলালের নামটি শুধু নয় প্রকৃতিও অসাধারণ। বিবাহ করেন নি ভদ্রলোক। তিন কুলে কেউ নেইও। সামান্য কিছু জমিজমা আছে, তার থেকেই গ্রাসাচ্ছাদন চলে যায়। গ্রাসাচ্ছাদনের বেশী ইনি কামনাও করেন না কিছু। অত্যুৎসাহী আদর্শবাদী এই লোকটি পরোপকারকেই জীবনের ব্রত বলে' গ্রহণ করেছেন। বাড়িতে স্থবিরা পাঁচির মা এবং রাস্তায় ভাঙা একটি মোটর বাইক এঁর ভার বহন করে। অহোরাত্র ইনি পরোপকার করে' বেড়ান। কারণ-অকারণ সুযোগ-দুর্যোগ ভাল-মন্দ উচ্চ-নীচ কোন কিছুরই তোয়াক্কা করেন না ইনি। সকলেই এঁর পরিচিত, সকলের সঙ্গেই আত্মীয়তা, সকলের উপকার করবার জন্য ইনি সর্ব্বদা প্রস্তুত। কোন বাছবিচার নেই। মাঝে মাঝে জটিলতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সদারঙ্গবিহারীলাল অকুতোভয় অদম্য ব্যক্তি, তাঁর গতি-রোধ করবার সাধ্য তাঁর নিজেরই নেই বোধ হয়, অন্যে পরে কা কথা।

(২)

সুশোভনের যা স্বভাব, চা ঠাণ্ডা হচ্ছিল সেদিকে খেয়াল নেই, সদ্য-আগত ডাক নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। অনীতারও চিঠিও এসেছিল একখানা। মায়ের চিঠি। স্বয়ম্প্রভা দেবীর মেজাজে আর যা-ই থাক, রসোজ্জ্বলতা নেই। চিঠিতে তিনি যে ধরণের কাটা কাটা ভাষা ব্যবহার করেন তাতে কারও চিত্ত

প্রফুল্লিত হয় না। অনীতারও হচ্ছিল না। সুশোভন একখানা খামের চিঠি খুলে পড়ছিল, আর হাসছিল মুচকি মুচকি।

"কার চিঠি ওটা"

"দিগ্বিজয় সিংহরায়ের"

"সে আবার কে"

"রায় বাহাদুর দিগ্বিজয় সিংহরায়"

"সিংহরায়? বিয়ের সময় কে একজন সিংহরায় আমাকে ঝকমকে বেনারসী শাড়ি দিয়েছিল একখানা। তাঁরাই না কি?"

সুশোভন পড়তে পড়তে জবাব দিল—"হ্যাঁ, তাঁরাই"

"খুব বড় লোক, নয়?"

"হ্যাঁ, কিন্তু কি মুশকিল, ছি ছি—। ঠিক এই সময় মোটরটা বিগড়ে বসে' আছে"

"কেন, কি লিখেছেন"

"নিমন্ত্রণ করেছেন"

"হঠাৎ?"

"কি জানি। এই শোন না"

সুশোভন পড়তে লাগল।

কল্যাণীয়েষু,—

তোমার পিতার সহিত আমাদের এত আত্মীয়তা ছিল অথচ তোমার সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। তোমাকে সেই একবার ছেলেবেলায় দেখিয়াছিলাম। তোমার বিবাহে আমরা সস্ত্রীক যাইব মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার কাকীমাতার গ্রন্থি-বাত প্রবল হওয়াতে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। আমাদের মতো মফঃস্বলবাসী ব্যক্তিদের পক্ষে কলিকাতা যাওয়াই বিপদ। পথে অজস্র ভীড়, তাহার উপর গাড়ি ঘোড়া ট্রাম ট্যাক্সি চীৎকার গোলমালে খেই হারাইয়া যায়। খেই—Slo—"

"খেহি সিক্ মানে ?"

"মানে খেহিই লিখেছেন। ভদ্রলোকের ধারণা বোধ হয় খেই শব্দের শুদ্ধ হচ্ছে 'খেহি'। বেচারা! শোন তারপর—"

"তোমার বিবাহের পর তোমাকে নিমন্ত্রণ করিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু এমন বর্ষা নামিল যে ফাঁক পাইলাম না। এখন শীত পড়িয়াছে, পথ ঘাট শুকাইয়াছে। শিকার করিবার জন্ত দুই একজনকে আসিতে বলিয়াছি। তুমিও যদি বধূমাতাকে লইয়া আসিতে পার সুখী হইব। শুনিয়াছি বধূমাতা একজন আধুনিকা। যাঁহারা আসিতেছেন তাঁহারাও হাল-ফ্যাশানের, কোনও অসুবিধা হইবে না। আগামী বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১৮ই মাঘ শিকার পার্টির আয়োজন করিয়াছি। শুনিয়াছি তুমি একজন ভাল শিকারী। তোমার বাবাও খুব ভাল শিকার করিতেন। যদি আসিতে পার আমরা খুবই আনন্দিত হইব। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ লও। ইতি আশীর্ব্বাদক শ্রীদিগ্বিজয় সিংহরায়।"

অনীতা 'কমরেড্' হলেও মনে মনে রায়বাহাদুর জাতীয় লোকদের সম্বন্ধে তার কিঞ্চিৎ সম্ভ্রমই ছিল। মুখে সে যতই শ্রমিকদের দুঃখে বিগলিত হোক, বেনারসী শাড়িখানার ঝলকে সেদিন তার চোখ ঝলসে গিয়েছিল। যে রায়বাহাদুর সেই শাড়ি তাকে দিতে পারেন তাঁকে ক্যাপিটালিস্ট বলে' তাচ্ছিল্য করবার মতো মনের জোর তার নেই—মুখে যতই সে সাম্যবাদ নিয়ে আস্ফালন করুক।

"বেশ তো, চল না যাওয়া যাক্, কতদূর এখান থেকে"

"প্রায় দেড়শ' মাইল"

"হাসছ যে"

"খেহিটা ভুলতে পারছি না"

সুশোভন হো হো করে' হেসে উঠল।

"একে গ্রন্থি-বাত—তার উপর খেহি! যেতেই হবে সেখানে। কিন্তু গাড়ি যে গ্যারেজে, ব্যাটারা বলেছে একমাসের আগে হবে না। কি মুশকিল বল তো"

"মোটর নিয়ে যাবে! ট্রেণে যাওয়া যায় না?"

"যায়। কিন্তু তার চেয়ে হেঁটে যাওয়া ভাল। একে প্যাসেঞ্জার গাড়ি, তার উপর চেঞ্জ আছে। অবশ্য ট্যাক্সি একটা নেওয়া যেতে পারে অনায়াসে"

"দেড়শ' মাইল ট্যাক্সি করে' যাবে!"

অনীতা বিস্ফারিত চক্ষে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সুশোভনের দিকে। বলে কি লোকটা! সে ট্রামে বাসে ঝুলে ঝুলে শিক্ষয়িত্রীগিরি করে' কাটিয়েছে কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত। এ ধরনের অমিতব্যয়িতা তার কল্পনাতীত।

"ট্রেণে টিকিস্ টিকিস্ করে' যাওয়ার চাইতে—"

"বেশ তাই যেও। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে খেয়ে নাও আগে"

চেয়ার ঠেলে অনীতা উঠে দাঁড়াল। ট্যাক্সিতে ধাবমান সুশোভনের কিছুদিন আগেকার একটা চিত্র চকিতে ফুটে উঠল মানসপটে। লিলুয়ার একটা শ্রমিক সভায় যাচ্ছিল সবাই। সুশোভনেব একপাশে ছিল কমরেড্ মণিকা, আর এক পাশে সে নিজে। সেদিন সুশোভনের সঙ্গে মণিকার প্রগলভ আলাপ—কমিউনিজম নিয়েই আলাপ—সর্ব্বাঙ্গে তাব জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল যেন। রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে কেঁদেছিল সে।

ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে অনীতার দিকে আড়চোখে চেয়ে সুশোভন বললে—"তুমি যাবে না? দিগ্বিজয় নাম শুনে ভয় পেও না, শুনেছি লিক-লিকে রোগা লোকট—"

অনীতা কোন উত্তর না দিয়ে আর এক পেয়ালা চা ঢালতে লাগল টি-পট থেকে। ভয় যে তার হয় নি তা নয়, কিন্তু তার কারণ দিগ্বিজয় নামটা নয়। অন্য আর এক কারণে এই রায়বাহাদুর জমিদারের নিমন্ত্রণ তাকে যুগপৎ প্রলুব্ধ ও ভীত করে' তুলেছিল। যাঁর কোলকাতা শহরে পদে পদে 'খেই' হারিয়ে যায় তাঁর চোখের সামনে সর্ব্বদা নিজেকে প্রকট রেখে সম্ভাব্য সমালোচনার খোরাক জোগানো একটু ভীতিকর তো বটেই। আধুনিক যুগের আপটুডেট্ 'কমরেড্' হলেও সমালোচনা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য অর্জ্জন করতে পারে নি সে এখনও। অথচ যেতে লোভও হচ্ছিল বেশ। হঠাৎ তার মনে হল কিসের এত ভয়! যত

বড় লোকই হোক, অসঙ্কোচে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে সে! শাড়ি সেমিজ সায়া ব্লাউস কি তার নেই। রূপও আছে যৎকিঞ্চিৎ। বুদ্ধিও। মা যদি শোনেন যে অত বড় একটা রায়বাহাদুর জমিদার নিমন্ত্রণ করে' নিয়ে গেছেন খুশিই হবেন।

"দু'জনেই যাই চল, বুঝলে—"

"বেশ চল, ছাড়বে না যখন। ট্রেণে যাব কিন্তু।"

"ওই অতগুলো চেঞ্জ করে'। খানিকটা বাসেও যেতে হয় শুনেছি—"

অনীতা কোন উত্তর না দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

সুশোভন বুঝলে ট্রেণেই যেতে হবে।

মাত্র তিন মাস বিয়ে হয়েছে তার। এর মধ্যেই 'প্রেমের নিগড়', 'প্রেমের ফাঁস', 'প্রেমের ফাঁদ' প্রভৃতি প্রচলিত বাক্যগুলির রূপক-বর্জ্জিত প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হচ্ছে তাকে বার বার। প্রেমে পড়ে' অনীতাকে বিয়ে করে' সে যে ভুল করেছে, একথা কারও কাছে স্বীকার করে নি সে—এমন কি নিজের কাছেও না। কিন্তু কেমন যেন প্রতিপদেই খটকা লাগছে। তার যা ভাল লাগে অনীতার ঠিক তাতেই যেন আপত্তি। বাধা-হীন স্বাধীনতা-চর্চ্চার সুযোগ আছে বলেই সে কমিউনিষ্ট, অনীতাও সেই জাতের লোক এই তার ধারণা ছিল। কিন্তু বিয়ের পর দেখা যাচ্ছে অনীতার ভাবগতিক ঘোরতর ইম্‌পিরিয়ালিষ্টিক গোছের! একাধিপত্য চায়! সুশোভনকে সর্ব্বপ্রকারে নিজের শাসনাধীন রাখাই তার একমাত্র লক্ষ্য। আর সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় যে তার শাসনাধীন থাকতে মন্দ লাগে না! বিদ্রোহ্ করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু তা পুনরায় শাসিত হয়ে আনন্দলাভের জন্য। ভারী আশ্চর্য্য কাণ্ড! একদিন কিন্তু সত্যই দুঃখ হয়েছিল তার। যে অনীতার আর্টের প্রতি এত অনুরাগ, তার কাছে এ ব্যবহার মোটেই প্রত্যাশা করে নি সে।

সেদিন ধীরেনের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ। বিয়ের পর বন্ধুরা তাকে এক রকম ত্যাগ করেছে বললেই হয়। নাগালই পায় না। তবু

আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায় এখনও কেউ কেউ। নাগাল পেলেই ছোঁ মেরে ধরে নিয়ে যায়।

ধীরেন বললে—"তোর কাছেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু আজ নগেনকে চা খাওয়াচ্ছে প্রাজাতে"

"সত্যি ?"

"তোকে নিয়ে যেতে বলেছে। চল"

সিনেমা-গগনের উদীয়মান জ্যোতিষ্কটিকে সামান্য একটু সঙ্গদান করে' অভিনন্দিত করা এমন কিছু নিন্দনীয় কাজ নয়। কিন্তু বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেল। ফিরেও জমল না।

"কোথা ছিলে এতক্ষণ ?"

স্থশোভন সোচ্ছ্বাসে বর্ণনা করে গেল।

"নগেন আবার কে! যত সব বাজে লোকের সঙ্গে আড্ডা দিতে ভালও লাগে তোমার—"

"নগেন মানে নগেন্দ্রমোহিনী। শ্রমিক থিয়েটারে 'ঝি'য়ের পার্টে প্রথম নাম করলে যে, মনে নেই ?"

অনীতার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল।

বাঁকা হাসি হেসে বললে, "তোমার যে নগেন্দ্রমোহিনীর সঙ্গে এত ভাব ছিল তাতো জানতুম না"

"কোন কালে ভাব ছিল না। আজই প্রথম আলাপ"

অনীতা স্মেলিং সল্টের শিশিটা বার দুই শুঁকে একটা অ্যাসপিরিনের বড়ি খেয়ে ফেললে।

"সন্ধ্যে থেকে মাথার যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি—"

স্থশোভন এটা প্রত্যাশা করে নি। এই অনীতাই বিয়ের আগে এই নগেন্দ্রমোহিনীর সম্বন্ধে কি উচ্ছ্বাসই না প্রকাশ করেছিল। সেইদিন রাত্রেই প্রতিজ্ঞা করতে হল যে ওই জাতীয় স্ত্রীলোকের আর ছায়া মাড়াবে না সে।

প্রতিজ্ঞা করবার পর কেমন একটা অদ্ভুত ধরনের আনন্দও অনুভব করতে লাগল। আশ্চর্য্য! অনীতার মোহিনীশক্তি প্রভুত্বশক্তিসহযোগে খাদসংযুক্ত স্বর্ণের মতো আরও বেশী যেন মুগ্ধ করে।

সত্যিই পরস্পরকে ভালবেসেছিল তারা। অনেকেই অনীতাকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপেছিল। কিন্তু অনীতা এক সুশোভনকে ছাড়া আর কাউকে আমোল দেয় নি। সুশোভনকে সাধ্যসাধনাও করতে হয়নি বেশী। সুশোভনের প্রাগবিবাহ প্রণয়লীলাকে সংক্ষিপ্ত বললে কিছুই বলা হয় না। 'সংক্ষিপ্র' বললে তবু খানিকটা বোঝান যায়। স্বয়ংপ্রভা দেবীর অনিচ্ছা-ব্যূহ ভেদ করে' ঝড়ের বেগে অনীতাকে উড়িয়ে এনেছিল সুশোভন।

স্বয়ংপ্রভা সরকার তাঁর একমাত্র সন্তানটির জন্যে ঠিক কি জাতীয় রাজপুত্র যে কামনা করেছিলেন তা খুলে বলেন নি কাউকে কোনদিন। সুশোভন সোমও পাত্র হিসেবে নিন্দনীয় নয়। প্রথম প্রথম তার দামী মোটরখানা দেখে বিচলিতও হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কিছুদিন মেলামেশার পর তিনি বুঝলেন সুশোভন 'আজকালকার' ছেলে। চটে গেলেন। কিন্তু অনীতাও আজকালকার মেয়ে এবং ওই মায়েরই মেয়ে। সে-ও জিদ ধরে' বসল সুশোভন ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। অনীতার বাবার যদিও বিশেষ কিছু কর্তৃত্ব ছিল না মেয়ের উপর, কিন্তু যতটুকু ছিল তাও তিনি ব্যবহার করলেন না। অনীতারই জয় হল শেষ পর্য্যন্ত। জিতুবাবু মনে মনে খুশিই হলেন। যদিও বাইরে আনন্দ প্রকাশ করবার মতো বুকের পাটা ছিল না ভদ্রলোকের। তাছাড়া জীবনে নানারকম ঘা খেয়ে এইটুকু তিনি সার বুঝেছিলেন যে অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই। যা হবার তা হবেই। পাঁচজনের কাছে খামখা আনন্দ বা উত্তেজনা প্রকাশ করলে অকারণ জটিলতা সৃষ্টি করা হয় মাত্র। কোন লাভ হয় না।

বাপ যখন ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন তখন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁকে বাল্যবন্ধু ইয়াসিন মিঞার শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। বড়বাজারের এক গলির মধ্যে ইয়াসিন মিঞার লোহা-লক্কড়ের ছোট একখানা দোকান ছিল। তাতেই ক্রমশঃ

নিজেকে সংশ্লিষ্ট করেছিলেন জিতুবাবু। ইয়াসিন বললে একদিন, কি হবে পাঁচ-জায়গায় ঘোরাঘুরি করে'। তিনি আর আপত্তি করলেন না। বিনা আয়াসে যা পাওয়া যাচ্ছে তাই ভাল এ বাজারে। কোন রকম অসন্তোষ প্রকাশ করলেন না, নীরবে লেগে রইলেন কেবল। স্বয়ম্প্রভা দেবী অবশ্য তাঁকে আলোক-প্রাপ্ত সমাজের উপযোগী ভদ্রতর একটা চাকরি নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে কসুর করেন নি। এই প্রসঙ্গে যে সব বাক্যাবলী তিনি ব্যবহার করেছিলেন তা সাধারণ-ধৈর্য্য-বিশিষ্ট যে কোন লোককে পাগল করে' দিত। কিন্তু জিতুবাবুর কিচ্ছু হয় নি। তিনি অদৃষ্টকে মেনে নিয়ে লোহা-লক্কড়ের দোকানে লেগে রইলেন। আত্মরক্ষার দু'টি উপায় তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। সাধ্যপক্ষে বাড়ি আসতেন না এবং যখন আসতেন পারতপক্ষে স্বয়ম্প্রভার কোনও কথার প্রত্যুত্তর দিতেন না। শেষ বয়সে অদৃষ্ট হঠাৎ সুপ্রসন্ন হল তাঁর উপর। যুদ্ধ বাধল। লোহার দাম হুহু করে' বাড়তে লাগল। স্বয়ম্প্রভা তো গুৎ পেতে ছিলেনই অনীতাও দেখতে দেখতে নৃত্য-গীত-পটীয়সী 'কমরেড্' হয়ে পড়ল। আলোক-প্রাপ্ত সমাজের যে দ্বার এতদিন রুদ্ধ ছিল তা হঠাৎ যেন খুলে গেল খানিকটা। তারপর এল সুশোভন। জিতুবাবু ইয়াসিন মিঞাকে যেমন মেনে নিয়েছিলেন সুশোভনকেও তেমনি মেনে নিলেন। সুশোভনের ডিগ্রি, চেহারা, মোটর, কোলকাতায় বাড়ি প্রভৃতি দেখে স্বয়ম্প্রভাও পুলকিত হয়েছিলেন প্রথমটা। যে সভ্য সমাজে তিনি মিশতে চেয়েছিলেন কিন্তু মেশবার সুযোগ পান নি, সুশোভনের হাতে সেই কাম্যলোকে ঢোকবার চাবিকাঠিটি দেখে বড় আশায় আশান্বিত হয়েছিলেন তিনি! সুশোভনের মোটর আছে, পয়সা আছে, অনেক বড় বড় পরিবারের সঙ্গে হৃদ্যতাও আছে। ইচ্ছে করলে অনায়াসে পারত সে। কিন্তু কিছুতেই নিয়ে গেল না তাঁকে। সাজিয়ে গুছিয়ে অনীতাকে নিয়ে গেল বারবার, তাঁকে একবার ডাকলেও না। আর না ডাকলে নিজে সেধে তার মোটরে যাবেনই বা কেন তিনি। সুশোভনের না নিয়ে যাবার সঙ্গত কারণ ছিল একটা অবশ্য। সুশোভনের পরিচিত মহলের কেউ প্রত্যাশাই

করতে পারে নি যে স্থশোভনের মতো ছেলে জিতু সরকারের মেয়েকে বিয়ে করে বসবে। অনীতা যে স্ত্রী-রত্ন তাতে কারও সন্দেহ ছিল না কিন্তু একালে দুষ্কুলাদপি তা আহরণ করাটা ভব্য সমাজে স্থরুচিসঙ্গত নয়—অন্ততঃ স্থশোভন যে সমাজে ঘোরা-ফেরা করে সে সমাজে নয়—সকলেরই মানসিক নাসা ঈষৎ কুঞ্চিত হয়েছিল। স্থশোভন তাই নানা কৌশলে স্বয়স্প্রভা দেবীকে এড়িয়ে চলত। স্বয়স্প্রভাও বেশ বুঝতে পারলেন স্থশোভন তাঁকে এড়িয়ে চলছে। ক্রমশঃ তাঁর সমস্ত মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে' উঠল। এতদিন যা তিনি সন্দেহ করতেন ক্রমশঃ তা বিশ্বাস করতে লাগলেন। স্বার্থপর ছোটলোক চরিত্রহীন সব! ওদের পার্টি, সিনেমা, সভা সমিতি সম্মিলন সব যথেচ্ছাচারের নামান্তর মাত্র। কোন ভদ্রমহিলাকে তাই নিয়ে যেতে সাহস করে না ওরা। কোনও ভদ্রমহিলার যাওয়াও উচিত নয় ওদের সঙ্গে। জিতুবাবুকে এসব কথা বললেনও একদিন তিনি সালঙ্কারে। জিতুবাবু টুঁ শব্দটি করলেন না। চুপ করে' রইলেন। জিতুবাবুকে কিন্তু স্থশোভন নিমন্ত্রণ করে' নিয়ে গিয়েছিল একদিন। নিমন্ত্রণ সেরে রাত্রে ফিরে এসে জিতুবাবু এমন অস্বাভাবিক রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে লাগলেন যে স্বয়স্প্রভার কেমন যেন সন্দেহ হল। খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে' চেয়ে রইলেন। লোহার দালাল এই নিরীহ ভদ্রলোকটিকে এত উচ্ছ্বসিত হতে তিনি ইতিপূর্ব্বে দেখেছেন বলে মনে পড়ল না। মদটদ খাইয়ে দেয় নি তো! সব পারে ওরা। স্থশোভনের উপর রাগ আরও বেড়ে গেল। কিন্তু কন্যারও অনুরাগ বাড়ছিল এবং সে 'কমরেড্', স্থতরাং বিয়ে আটকাল না।

(৩)

গার্ড হুইস্‌ল দিয়ে সবুজ নিশান নাড়তে লাগলেন।

"উঠে এসে বস না। কি যে তোমাদের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা ফ্যাশান। ট্রেণ ছাড়ছে যে—"

প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে গলা বাড়িয়ে অনীতা বললে।

"এই যে যাচ্ছি"

বেশ কায়দা করে' সিগারেটটি ধরিয়ে দেশলাই কাঠিটি নেড়ে নেড়ে নিবিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হাসিমুখে চেয়ে রইল সুশোভন। কমরেড্ অনীতার এই ভীতু-ভাবটা বেশ উপভোগ করছিল সে। আর একবার হুইস্‌ল পড়ল। গার্ডের দিকে চাইতে গিয়েই কিন্তু অঘটন ঘটে গেল।

"আরে—আরে—আহা—এ কি—"

ছুটল সুশোভন সেদিকে।

নিঃশব্দ গতিতে ট্রেণটি ছেড়ে দিলে। প্রথমটা মনে হল ছাড়েই নি। অনীতা বুঝতেই পারে নি প্রথম। কিন্তু বুঝতে পারামাত্রই দাঁড়িয়ে উঠল এবং জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে অঙ্গভঙ্গীসহকারে যা করতে লাগল তাতে একটি ফল হল শুধু, প্ল্যাটফর্মে দণ্ডায়মান স্থূলকায় একটি মাড়োয়ারি বণিকের প্রাণে রস-সঞ্চার হল! গদগদ হয়ে হলদে রঙের একঝুড়ি দাঁত বার করে' হেসেই ফেললে সে। অনীতা ভীড়ের মধ্যে আবছাভাবে সুশোভনকে দেখতে পেলে একবার। একটি মেয়ের দু'হাত ধরে' দাঁড়িয়ে আছে সে। মনে হল মেয়েটির রং ধপধপে ফরসা।...

ট্রেণের গতি-বেগ বাড়ল।

মেয়েটিকে তুলেই সুশোভন পুলকিত হয়ে উঠল। কমরেড্ সান্ত্বনা! খুব মাথামাখি ছিল কিছুদিন আগে।

"আরে, সান্ত্বনা যে! হঠাৎ পড়ে' গেলে কি করে—"

"কলার খোসা বোধহয়। অনেক ধন্যবাদ"

সান্ত্বনা ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগল পিছন দিকের শাড়িটা নষ্ট হয়েছে কিনা।

"না, শাড়ির কিছু হয় নি, ঠিক আছে। আরে, মাথায় সিঁদুর দেখছি যে—বিয়ে হল কবে"

"মাস তিনেক"—মুচকি হেসে জবাব দিলে সান্ত্বনা।

"কোথায়"

"বরিশালে। তবে উনি এখন কোলকাতাতেই আছেন"

"কি করেন"

"প্রফেসারি। আপনারও বিয়ে হয়েছে শুনেছি। আপনার স্ত্রী কোথায় এখন"

"এস না, আলাপ করিয়ে দিই—ওই যে বসে আছে—"

ঘাড় ফিরিয়েই সুশোভন থেমে গেল এবং অপসৃয়মান গার্ড গাড়িটার দিকে চেয়ে হাঁ করে' দাঁড়িয়ে রইল।

"যাচ্ছলে"

"কি হল।"

"আমার স্ত্রী ওই গাড়িতে চলে গেল"

"আপনারা এই গাড়িতেই যাচ্ছিলেন নাকি"

"হ্যাঁ"

"কোথায়"

"দিগ্বিজয়বাবুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে"

"ওমা আমিও যে সেইখানেই যাচ্ছি—আমাদেরও নিমন্ত্রণ আছে—"

"একমাত্র ট্রেণটিতো চলে গেল। এখন উপায়"

পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল।

"মাসীমা ভাববেন খুব"—ক্ষুণ্ণকণ্ঠে সান্ত্বনা বললে।

"তোমার মাসীমা সেখানে আছেন নাকি"

"দিগ্বিজয়বাবুর স্ত্রীকে আমি মাসীমা বলি। মায়ের খুব বন্ধু উনি। আমার ছেলেবেলাটা তো ওঁর কাছেই কেটেছে"

বাক্স বিছানা সুটকেস ট্রাঙ্ক কুঁজো পুঁটুলি এবং একটি কুকুর বাচ্ছা বহন করে' কুলীর সারি এসে দাঁড়াল।

"সব তোমার জিনিস নাকি"

"হ্যাঁ, কি করি বলুন তো এখন। কালকের আগে তো আর ট্রেণ নেই"

"না। সত্যিই কি করা যায়। অনীতা আবার তাদের কাউকে চেনে না। আজ রাত্রেই আমার যেমন করে হোক পৌঁছতে পারলে ভাল হত"

"কিন্তু তা আর কি করে সম্ভব বলুন"

"একেবারে যে অসম্ভব তা নয়, থাম—একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে। এখন কটা বেজেছে ? একটা—একটা ট্যাক্সি নিলে হয়। তা একটা ট্যাক্সিতে যেতে কত সময় লাগবে। শার্দ্দূল সিংয়ের সঙ্গে আমার খুব জানা-শোনা আছে। ফোন করলে ভাল গাড়ি দেবে, অনেক গাড়ি তার। কতক্ষণ লাগবে দেড়শো মাইল যেতে—দেড়শো ডিভাইডেড্ বাই টয়েনটি—সাত ঘণ্টা, আট ঘণ্টাই ধর —নটার মধ্যে নির্ঘাত পৌঁছে যেতে পারি। তুমি কি এখন বাসায় ফিরবে ? অধ্যাপক মশায় কোথায় এখন"

"তিনি এখানে নেই। তিনি থাকলে তো ভাবনাই ছিল না, একসঙ্গে যেতাম। তিনি এক কংগ্রেস সভায় গেছেন রংপুরে। আজ রাত্রে ফেরার কথা। ফিরে তিনি যাবেন সেখানে। তাই অন্ততঃ কথা আছে। আমরা একসঙ্গেই যেতাম, কিন্তু তিনি আসবেন কি না ঠিক নেই, কেউ না গেলে মাসীমা দুঃখিত হবেন খুব, তাই আমি একাই যাচ্ছিলাম, উনি যদি আসেন পরে আসবেন"

"আমি ট্যাক্সি করেই যাচ্ছি। তুমি যদি যেতে চাও আসতে পার আমার সঙ্গে। আপত্তি আছে ?"

"না, আপত্তি আর কি"

সুশোভন সহসা উৎসাহিত হয়ে উঠল খুব। কুলীদের দিকে ফিরে বললে —"এই—মাইজিকো চীজ একঠো ট্যাক্সিমে চড়াও—জলদি—"

তারপর সান্ত্বনার দিকে ফিরে বললে—"আগে আমার বাসায় ফেরা যাক চল। ষ্টেশন থেকেই শার্দ্দুল সিংকে ফোন করে দিচ্ছি আমার বাড়িতে একখানা

ভাল ট্যাক্সি পাঠাতে। বাসায় গিয়ে চা খেতে খেতেই গাড়ি এসে পড়বে, তারপরই—বাস্।"

মুচকি হেসে সান্ত্বনা বললে, "আপনার স্ত্রী কি—"

"আমার স্ত্রীর সম্ভাব্য মানসিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করবার সময় নয় এখন সান্ত্বনা। যদি কিছু হয় দেখা যাবে পরে তখন—"

"না আমি জিগ্যেস করছিলাম, আপনার স্ত্রী কি সোজা দিগ্বিজয়বাবুর ওখানেই যাবেন"

"সোজা দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে যাওয়া যায় না কি। তবে শেষ পর্যন্ত সেইখানেই যাব বলে বেরিয়েছিলাম তো। টাইম টেবেলখানাও তার কাছে। আমার বাক্স বিছানা সবই তার সঙ্গে। চটছে খুব নিশ্চয়"

"আজ রাত্রেই পৌছাচ্ছেন তো! রাগ আর কতক্ষণ থাকবে"

"তা বটে। অনীতা লোক ভাল—আলাপ হলে দেখবে—ওয়াণ্ডারফুল"

সান্ত্বনা কিছু না বলে' মুচকি হাসলে একটু।

সুশোভনের বাসায় যে চাকরানিটি ছিল সে শত্রুপক্ষীয় লোক। স্বয়ম্প্র দেবীরও চাকরানি ছিল সে কিছুদিন আগে। জামাইবাবু লোকটি যে ডুবে ডুবে জল খান এ সন্দেহ স্বয়ম্প্রভাই তার মনে সঞ্চারিত করেছিলেন তখন। নিজের মুখে তাকে বলেন নি কিছু যদিও, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে এ নিয়ে যে আলা করতেন তিনি, তা নিম্নকণ্ঠে করতেন না। সুতরাং চাকরানিটি সুশোভনের সম্বন্ধে যে ধারণা করেছিল তা স্বয়ম্প্রভিক। সেই সুশোভন যখন হঠাৎ একটি রূপসী যুবতীকে নিয়ে ট্যাক্সি চড়ে' এসে হাজির হল তখন সন্দেহের আর অবকাশ রইল না। সান্ত্বনার দিকে দু'চারবার যে দৃষ্টি সে নিক্ষেপ করলে তার অর্থ পরিষ্কার। সান্ত্বনা অবশ্য বেশী বিচলিত হল না। এ জাতীয় দৃষ্টির সম্মুখীন সে বহুবার হয়েছে জীবনে। ফিটফাট রূপসী মেয়েদের ভাগ্যই এই—বিশেষতঃ তার যদি দামী গয়না শাড়ি থাকে এবং সে যদি একটু পুরুষ-ঘেঁ হয়। বিপদেও পড়তে হয় বেচারাদের। সমালোচনা তারা অগ্রাহ্য করে

পারে, কিন্তু বিপদকে এড়াতে পারে না সব সময়ে। সান্ত্বনাকে বিপদেই পড়তে হয়েছিল একবার। অনৈক লেখকের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে নিছক সাহিত্য-প্রীতি-বশতঃই সে উক্ত বিবাহিত ভদ্রলোকের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা করেছিল। সমাজহিতৈষীদের টনক নড়ে উঠল অমনি। ওঠাটাই স্বাভাবিক। প্রথমতঃ সে সুন্দরী, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষিতা, তৃতীয়তঃ কমরেড্, চতুর্থতঃ কাউকে কেয়ার করে না, পঞ্চমতঃ এক নাইট স্কুলে পড়াবার ছুতোয় রোজ সন্ধ্যেবেলা বেরিয়ে যায়, ফেরে অনেক রাত্রে, ষষ্ঠতঃ ওই লেখক ভদ্রলোকের সঙ্গে মাখামাখি করে' তার পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি করেছে। তুমুল তুফান উঠল। সান্ত্বনা কিন্তু গ্রাহ্য করলে না কিছু। সমস্ত সমালোচনা তুচ্ছ করে' নিবিষ্ট চিত্তে লেগে রইল সে তার নাইট স্কুলে। যুবকদের মধ্যে জনকয়েক ভক্তও জুটে গেল তার এজন্যে। সে কিন্তু কাউকে আমোল দিলে না। দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে আত্মগোপন করে' সে তার নাইট স্কুলেই লেগে রইল। দু'একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া আর কারও সঙ্গে মিশত না। কথা পর্য্যন্ত বলত না কারও সঙ্গে। লেখকটির সংস্রব আগেই ত্যাগ করেছিল। এই সময়েই সুশোভনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয় তার। বিরাট কোলকাতা শহর। সে-ও সুশোভনের খবর রাখেনি, সুশোভনও তার খবর পায় নি। সান্ত্বনার আপন বলতে ছিলেন এক বিধবা মা। কিন্তু তিনি থেকেও ছিলেন না। বুড়ো বয়সে টি. বি. হয়ে ধরমপুর স্যানাটোরিয়ম্ আশ্রয় করেছিলেন তিনি। সান্ত্বনা থাকত মামার বাড়িতে। কিন্তু মামা যখন দেখলেন ভাগ্নী 'কমরেড্' হয়ে উঠেছে, তখন স্পষ্ট ভাষায় নিজের সেকেলে অভিমত ব্যক্ত করলেন তিনি একদিন। ফলে, সান্ত্বনা গিয়ে এক হোটেলে উঠল। হোটেলেই হয়তো থাকতে হত তাকে, যদি না সুরেশ্বরী দেবী সে সময় কোলকাতায় এসে পড়তেন। সুরেশ্বরী দেবী এসেই সান্ত্বনার কলঙ্ককাহিনীর সালঙ্কার বর্ণনা শুনলেন। শুনেই চটে গেলেন তিনি। সান্ত্বনার মা তাঁর বাল্যসখী, সান্ত্বনাকে এতটুকু বয়স থেকে দেখেছেন তিনি, সান্ত্বনার সম্বন্ধে এসব কথা বিশ্বাসযোগ্যই মনে হল না তাঁর! সান্ত্বনা ওরকম কিছু করতেই পারে না। বাজে

কথা সব। সান্ত্বনাকে নিয়ে চলে গেলেন তিনি দেহাতে নিজেদের জমিদারিতে। সান্ত্বনা ফিরে এল অবশ্য কিছুদিন পরে। তখন ঝড়টা থেমে গেছে। তার কিছুদিন পরেই অধ্যাপক ব্রজেশ্বরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরীতে আর যায় নি সে। মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরীই দিগ্বিজয়বাবুর জমিদারি। সুরেশ্বরী ব্রজেশ্বরকে দেখেন নি, তাই নিমন্ত্রণ করেছিলেন যাবার জন্যে।

শার্দ্দুল সিংহ প্রেরিত বিরাট ট্যাক্সিখানা সুশোভনের বাড়ির সামনে এসে হর্ন দিয়ে দাঁড়াল। ড্রাইভারটি বাঙালী কিন্তু বলিষ্ঠ। কাইজারি ছাঁদের গোঁফ। হর্ন শুনে চাকরানিটি কপাট খুলে মুখ বাড়াল।

"সুশোভনবাবুর কি এই বাড়ি"

"হ্যাঁ"

"খবর দাও যে শার্দ্দূল সিং গাড়ি পাঠিয়েছেন"

"ট্যাক্সি করে' কোথা যাবে আবার এখন। এই তো এল"

"অনেক দূর যেতে হবে, তুমি খবর দাও না"

"তোমাকে ডাকলে কে"

"ফোনে খবর দিয়েছিলেন বাবু"

"ফোনে? কোথা থেকে?"

"আরে খবর দাও না তুমি"

মুক্ত দ্বারপথে সান্ত্বনার জিনিসপত্র ড্রাইভারের নয়নগোচর হল।

"ওই সব মাল যাবে নাকি"

"ওঁরা যদি যান, মালও যাবে বই কি"

ড্রাইভার নেমে এসে মালগুলি পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগল।

"শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন নাকি"

"কোথা যাবেন তা কেমন করে' বলব"

চাকরানি খবর দিতে উপরে চলে গেল। ড্রাইভার জিনিসপত্র তুলতে লাগল ট্যাক্সিতে। একটু পরেই স্বশোভন নেবে এল সান্ত্বনাকে নিয়ে। ড্রাইভারের দিকে চেয়ে স্বশোভন বললে, "তোমাকে চিনি বলে' তো মনে হচ্ছে না। শার্দ্দুল সিংয়ের প্রায় সব ড্রাইভারের সঙ্গেই আলাপ আছে আমার"

"আমি নতুন বাহাল হয়েছি সার"

"তোমার নাম কি"

"গণেশ সরকার"

"জোর হাঁকাতে পারবে তো"

"পারব না কেন সার। কিন্তু ধরুন যদি কোন অ্যাক্সিডেণ্ট হয়ে যায় তার খেসারত দেবে কে"

"সে ঝুঁকি আমার"

গণেশ গোঁফজোড়া একবার চুমরে নিয়ে বললে "বেশ! পৌছবার পর গরীবকে ভুলে যাবেন না যেন সার"

"শার্দ্দুল সিংয়ের পুরোনো কোন ড্রাইভার এলে একথা ব'লতো না। তারা চেনে আমাকে"

"বেশ"

স্বশোভন সান্ত্বনা উঠে বসল।

গণেশ আর একবার গোঁফ চুমরে গাড়িতে স্টার্ট দিলে।

(৪)

বিবেকানুমোদিত সৎকর্ম্ম সুসম্পন্ন করবার পর যে জাতীয় সুনিদ্রা হওয়া উচিত সদারঙ্গবিহারীলালের নিদ্রা তার চেয়েও গাঢ়তর এবং দীর্ঘতরই হয়েছিল, কারণ বেচারাকে পরিশ্রমও করতে হয়েছিল যথেষ্ট। সমস্ত দিন মোটরবাইকে টো টো করে' ঘুরে বেড়ানো কম ক্লান্তিজনক নয়। কিন্তু কোন কাজ ক্লান্তিজনক বলেই তার থেকে নিবৃত্তি হবেন এমন লোক সদারঙ্গবিহারীলাল নন। উমেশ চৌবে যেই

তাঁকে এসে ধরলেন যে তাঁর হয়ে ভোট ক্যানভাস করতে হবে—অমনি রাজি হয়ে গেলেন তিনি।

…পাঁচির মায়ের ঠেলাঠেলিতে নিদ্রাভঙ্গ হল।

"জনার্দ্দনবাবু ডাকছেন যে তোমাকে। কতক্ষণ আর ঘুমুবে, রোদে কাঠ ফাটছে যে চারিদিকে—"

"ও। রোদ উঠে গেছে নাকি! অ্যাঁ—ছি—ছি—"

অপ্রস্তুতমুখে সদারঙ্গবিহারীলাল বিছানায় উঠে বসলেন এবং বালিশের তলা থেকে চশমাটি বার করে' পরিধান করলেন।

"বড্ড বেলা হয়ে গেছে—অ্যাঁ—ছি—ছি—"

হাসিমুখে পাঁচির মায়ের দিকে চাইলেন একবার। চশমার পুরু লেন্স থেকে আলো ঠিকরে পড়ল।

"জনার্দ্দনবাবু বাইরে অনেকক্ষণ থেকে ডাকাডাকি করছেন"

"জনার্দ্দনবাবু? অনেকক্ষণ থেকে? ও—"

তাড়াতাড়ি চটিটা পরে' সদারঙ্গবিহারীলাল বাইরে যেতে উদ্যত হলেন চোখে মুখে জল না দিয়েই।

"কালকের মতো না খেয়ে বেরিও নি যেন। চায়ের জল চড়িয়েছি, বেশী দেরী কোরো নি যেন বাইরে"

"চায়ের জল? ও—হ্যাঁ—না—আসছি এখুনি"

বেরিয়ে গেলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"জনার্দ্দনবাবু যে! বাঃ—চা খাবেন তো নিশ্চয়ই—সিঙাড়া—"

হঠাৎ থেমে যেতে হল তাঁকে। জনার্দ্দনের মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল, চক্ষু অগ্নিবর্ষী। অপ্রস্তুত সদারঙ্গবিহারীলালও দমে' গেলেন ক্ষণকালের জন্য। এ কি হল!

"উমেশবাবুর জন্য ক্যানভাস করে' বেড়িয়েছেন শুনলাম"

প্রত্যেকটি কথা ছররার মতো নির্গত হল জনার্দ্দনের মুখ থেকে।

"হ্যাঁ—"

"লজ্জা করে না আপনার"

"লজ্জা ? লজ্জা করবার কিছু আছে নাকি, জানি না তো, ভদ্রলোক ধরলেন এসে"

"উমেশলাল ভদ্রলোক ? ভদ্রলোক কি পরের খাসি চুরি করে' খায় ?"

"খাসি ? না—না—কি যে বলেন আপনি—বি.এ., বি.এল.—গড় !"

"গ্রামের প্রত্যেকটি খাসি ওর পেটে গেছে। তাছাড়া' মিউনিসিপাল কাউন্সিলার হবার কি যোগ্যতা দেখলেন ওর। যার নিজের বিষয় দেনার দায়ে বিকিয়ে যাচ্ছে সে মিউনিসিপালিটি সামলাবে !"

জনার্দ্দন চক্ষু দু'টি অত্যন্ত ছোট করে' নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তাঁর চোখের দিকে। সদারঙ্গবিহারীলাল অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। চোখের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন, কানে কড়ে' আঙুল ঢুকিয়ে সজোরে কানটা চুলকুলেন, কাসলেন একবার। কিন্তু নাঃ—কোনও লাভ হল না। জনার্দ্দন নির্নিমেষ।

"ভদ্রলোক ধরলেন এসে সকালবেলা—"

"ওই হনুমানটা যদি ধরে এসে আপনাকে, ক্যানভাস করবেন তার হয়ে ?"

নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে উপবিষ্ট হনুমানটিকে দেখিয়ে জনার্দ্দন পুনরায় প্রশ্ন করলেন।

সদারঙ্গবিহারীলাল আড়চোখে হনুমানটির দিকে চাইলেন একবার।

"বলুন—"

"হনুমানের কথা বলছেন ? আরে নাঃ—কি যে বলেন—ছি ছি—"

নিজের ক্ষুদ্রায়িত চক্ষুকে স্বাভাবিক আকৃতি দান করে, জনার্দ্দন বললেন—"শুনুন, যা করবার তা তো করেইছেন। এখন ভুল সংশোধন করতে হবে।

"তার মানে ? ভুল—মানে—"

"মানে প্রত্যেক লোককে গিয়ে আবার বলে' আসতে হবে যে আমি আসল খবর জানতাম না—তাই উমেশ চৌবের হয়ে ক্যানভাস করেছি। এখন তাঁর কীর্ত্তিকলাপ শোনবার পর তোমাদের আবার মানা করতে এসেছি তাকে একটি ভোট দিও না কেউ। সমস্ত ভোট বৈজুপ্রসাদকে দেবে"

"বৈজুপ্রসাদ ? ঘিয়ে সাপের চর্ব্বি অনর্গল মেশায় শুনেছি লোকটা"

"তা মেশাক। কিন্তু ওকে যদি তোমরা কমিশনার করে' দিতে পার ও একটা গার্লস্কুল করে' দেবে বলেছে নিজের খরচে। উমেশ চৌবে পারবে ?"

"দেবে বলেছে নাকি"

সদারঙ্গবিহারীলালের মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

"না বললে অমনি আপনার কাছে এসেছি"

"এত বড় ভাল কাজ যদি একটা হয় তাহলে আমি—"

"করতেই হবে"

"বেশ"

সদারঙ্গবিহারীলাল চিরকালই স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারের পক্ষপাতী।

আলো ঠিকরে পড়ল তাঁর চশমার লেন্স থেকে।

(৫)

ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরের নাম বাইরের লোকের কাছে অজ্ঞাত হলেও স্থানটি নগণ্য নয়। অন্য কোন কারণে না হোক, গোঁসাইজির হরিমটর নিরামিষ হিন্দু পান্থ-নিবাসের জন্যই ও অঞ্চলে ফাৎনাফিরিঙ্গিপুর বিখ্যাত। হোটেলের নামের সঙ্গে হরিমটর শব্দটি যে অশোভন সে জ্ঞান যে গোঁসাইজির নেই তা নয়। কিন্তু হরিহর গোস্বামী ধর্ম্মবুদ্ধি-সম্পন্ন লোক। প্রিয়বন্ধু মটর বৈরাগীর টাকা নিয়ে তিনি হোটেলটি সুরু করেছিলেন। তখন হোটেলটির নাম ছিল 'নিরামিষ হিন্দু পান্থনিবাস'। এখন মটর বৈরাগী গত হয়েছেন। বিশেষ করে' সেইজন্যই বন্ধুর স্মৃতি-রক্ষাকল্পে হোটেলটির নূতন নামকরণ করেছেন তিনি। নিজের নামটিও অবশ্য সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। টাকা মটর বৈরাগীর, কিন্তু পান্থনিবাসের আসল স্রষ্টা তো তিনিই। হরিমটর শব্দটির এই ইতিহাস। নামটি লিখে প্রকাণ্ড একটি সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছেন সামনেই। কারও দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

অর্থ উপার্জ্জন করবার জন্য গোঁসাইজি হোটেল খুলে অন্ন-বিক্রয় করছেন এ কথা যাঁরা মনে করেন তাঁরা শ্রীযুক্ত হরিহর গোস্বামীকে ঠিক চেনেন না। অতিশয় নিষ্ঠাবান আস্তিক্যবুদ্ধি-সম্পন্ন শ্লীলমনা নিষ্কাম ব্যক্তি ইনি। গীতার উপদেশ অনুসারেই কর্ম্মযোগ অবলম্বন করেছেন কেবল। পয়সার চেয়ে নীতির দিকেই এঁর লক্ষ্য বেশী। মাছ মাংস ডিম পেঁয়াজ হোটেলের ত্রিসীমানায় ঢুকতে পায় না। হোটেলে রাত্রিবাস করবার জন্যে যদি কেউ আসে, তাহলে পয়সা ফেললেই রাত্রিবাস করবার অধিকার লাভ করে না সে। তার চালচলন কথাবার্ত্তায় গোস্বামী মশায় ঘুণাক্ষরে যদি সন্দেহজনক কিছু আবিষ্কার করেন, তাহলে আর স্থান হয় না তার হোটেলে। রাত্রিবাস করবার জন্যে দ্বিতলে দু'খানি ঘর আছে। ত্রিতলের ঘরটিতে গোঁসাইজি নিজে শয়ন করেন। বর্ত্তমানে দ্বিতলের দু'খানি ঘরই অধিকৃত। একটিতে শয্যাশায়ী বৈষ্ণবী রোগিণী আছেন একজন। ইনি গোস্বামী মহাশয়ের গুরুভগ্নী। গুরুভ্রাতার সঙ্গে দেখা করতে এসে গুরুতর অসুখে পড়ে গেছেন। দ্বিতীয় ঘরখানিতে আছেন এক শিক্ষক-দম্পতি। ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরের মাইনর স্কুলের হেডমাষ্টার যোগজীবন বণিকও সজ্জন ব্যক্তি। উপর্য্যুপরি দু'টি ঘটনা যুগপৎ ঘটায় ভদ্রলোক বিপন্ন হয়েছেন সম্প্রতি। তাঁর বাসাটি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের। তার বার্ষিক জীর্ণ-সংস্কার সুরু হয়েছে। একটি ঘরের খাপরা নামানো হয়েছে, দ্বিতীয় ঘরটি তিনি ব্যবহার করছিলেন। দিন দুই আগে তাঁর মা হঠাৎ এসে পড়েছেন কোনও খবর না দিয়ে। যোগজীবনবাবু সজ্জন লোক। মায়ের সঙ্গে এক ঘরে স-স্ত্রীক শুতে পারেন না তিনি। এই শীতে বারান্দায় শোওয়াও অসম্ভব। মুস্কিলে পড়েছিলেন। গোস্বামী মশায় আশ্রয় দিয়েছেন তাঁকে দ্বিতীয় ঘরটিতে।

রাস্তার ধারে হোটেলটির একটি আপিসও আছে। গোঁসাইজি খুঁত রাখেন নি কিছু। আপিসে আপিসোচিত সমস্ত কিছুই বর্ত্তমান। পাঁজি, ক্যালেণ্ডার, হিসাবের খাতা, লেখবার সরঞ্জাম, লাল-কালো দুরকম কালি এবং কলম, হাতবাক্স একটি, টেবিল চেয়ার কোনও জিনিসের ত্রুটি ছিল না। কিছুদিন থেকে গোঁসাইজি নূতন একটি খাতা খুলেছেন। অ্যাডমিশন রেজিস্টার। ইংরেজি নাম দেবার ইচ্ছা

ছিল না। কেবল 'অ্যাডমিশন' শব্দটির লোভে ম্লেচ্ছ ভাষার শরণাপন্ন হতে হল তাঁকে। 'অ্যাডমিশন' শব্দটি দ্ব্যর্থক। 'স্বীকৃতি' এবং 'প্রবেশ' দুই অর্থ ই করা যায় এর। এক-ঢিলে-দু পাখী-মারা-যায় এ রকম বাংলা বা সংস্কৃত শব্দ গোঁসাইজির জানা ছিল না। তাঁর হোটেলের উক্ত ঘর দু'টিতে প্রবেশকারীকে স্বহস্তে নিজের পূর্ণ পরিচয় এই খাতায় লিখিতে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে গোঁসাইজি এক নিরীহ-আকৃতির ছোকরাকে আশ্রয় দিয়ে বিপদে পড়েছিলেন। ছোকরা চলে' যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ এসে হাজির। ছোকরা নাকি এক ফেরারি অ্যানার্কিষ্ট! ভাগ্যে দারোগার সঙ্গে জানাশোনা ছিল তাই রক্ষা পেয়ে গেলেন। তারপর থেকেই গোঁসাইজি সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

গোঁসাইজির আপিসের জানলা কাচ-দেওয়া। কিন্তু ধূলায় ধোঁয়ায় কাচের স্বচ্ছতা নষ্ট হয়ে গেছে। রাস্তার দিকের ঘর বলে' সেটিকে মনোহর করবার চেষ্টা করেছিলেন গোঁসাইজি যথাসাধ্য। কাচ দিয়েছিলেন, চৌকাটের ফ্রেমে সবুজ রঙও লাগিয়েছিলেন। কিন্তু দেশের জলহাওয়া এমন বদ যে সবুজ ক্রমশঃ ধূসর হয়ে অবশেষে এমন একটি রঙে পরিণত হয়েছে যা বর্ণনা করা কঠিন। শুধু তাই নয়, জানলার কপাটগুলো এমন 'যাম্' হয়ে গেছে যে খোলেই না সহজে। খোলবার বিশেষ চেষ্টাও করেন না গোঁসাইজি। যা ধূলো, বন্ধ থাকাই ভাল।

···সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। শীতের কনকনে বাতাস উঠেছে একটা। নিজের আপিস ঘরে মঙ্কিক্যাপ পরে' হ্যারিকেন লণ্ঠন জেলে গোঁসাইজি তন্ময় চিত্তে দৈনিক হিসাব লিখছিলেন। জানলাটি বন্ধ। সুতরাং সুশোভন-সান্ত্বনার আগমন বা কথোপকথন টের পেলেন না তিনি।

"যাক্"—

সুশোভন বসে উঠল। আর পারছিল না বেচারা। দুহাতে সান্ত্বনার দুটো ভারী স্যুটকেশ। অপেক্ষাকৃত ছোটটি রাস্তায় নামিয়ে রেখে সে উর্দ্ধ-মুখে সাইন-বোর্ডটা পড়তে লাগল।

"বলি নি তোমাকে, কাছে-পিঠে ঠিক একটা হোটেল আছে? এই দেখ—

হরিমটর নিরামিষ হিন্দু পান্থনিবাস। স্বত্বাধিকারী বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীহরিহর গোস্বামী—"

"এর নাম কাছে-পিঠে? অন্ততঃ চার মাইল হেঁটেছি"

"যাক্ এসে তো পড়া গেছে! নিরামিষ হিন্দু-হোটেল—তা হোক্"

"হরিমটর কথাটার তাৎপর্য্য কি"

"কি জানি"

"যাই হোক চলুন, ঢোকা তো যাক্"

সান্ত্বনা এগিয়ে গিয়ে কপাটটা ঠেলতেই খুলে গেল সেটা। সুশোভন রাস্তা থেকে স্যুটকেশ দুটো তুলে নিলে আবার। বেশ ভারী! কি এনেছে সান্ত্বনা। আপিসের জানলার অস্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়ে যৎসামান্য আলো প্রবেশ করছিল বাইরের ঘরটিতে।

"যাক্ শেষ পর্য্যন্ত—" কথা অসমাপ্ত রেখে সুশোভন স্যুটকেশ দু'টি মেজেতে নামিয়ে ফেললে।

"উফ্—সর্ব্বাঙ্গ ধূলোয় ভরে' গেছে একেবারে। কথা বলছ না যে"

"বড় ক্লান্ত লাগছে"

"ক্ষিদে পায় নি?"

"খুব পেয়েছে। আপনার?"

"আমার! ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরের এই হোটেলের খবর না জানলে তোমার ঝুনুকেই গিলে ফেলতাম রাস্তায় আমি। যাক্, আর কোন চিন্তা নেই। এসে যখন পড়া গেছে, তখন রাত্রের মতন আহার বাসস্থান জুটে যাবেই যা হোক্ করে'। সকাল নাগাদ গণেশ এসে পড়বে—কি বল—অ্যাঁ—"

চেষ্টা সত্ত্বেও সুশোভনের কণ্ঠস্বরে আশার সুর ঠিক বাজল না যেন। চার মাইল দু' দুটো ভারী স্যুটকেশ বয়ে কেমন যেন দমে' গিয়েছিল বেচারা। উঁচু-নীচু মেঠো রাস্তা, সূচীভেদ্য অন্ধকার, তার উপর কনকনে পূবে হাওয়া। সান্ত্বনা বেচারাও বেশ কাবু হয়ে পড়েছিল। যে সপ্রতিভতা তার চোখে মুখে সর্ব্বদা দেদীপ্যমান

থাকে তা নিবে গিয়েছিল যেন। যাবারই কথা। শখ করে' মেঠো রাস্তায় হেঁটে বেড়ানো এক, আর হঠাৎ পথের মাঝখানে মোটর বিগড়ে হাঁটতে বাধ্য হওয়া—আকাশপাতাল তফাত যে। আর এ কি যে সে মাঠ। তেপান্তর ছেলেমানুষ এর কাছে। সুশোভন প্রথমটা দমে নি। "এতে আর কি হয়েছে, মোটরে অমন হয়েই থাকে, এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে সব" গোছের একটা ভাব দেখিয়ে হালকা হাসি হেসে হাঁটতে সুরু করেছিল সে। কিন্তু ক্রমেই গম্ভীর হয়ে পড়তে লাগল। বেশ ভারী স্যুটকেশ দুটো। সান্ত্বনা ঝুনুকে বুকে করে' নিয়েছিল।

খানিকক্ষণ হেঁটে সে বলল—"চলুন, ওই মোটরেই ফেরা যাক। অন্ধকারে কোথা যাচ্ছেন"।

সুশোভন বললে, "শুনলে না, ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরে গোঁসাইজির ভাল হোটেল আছে। রাত্রে মাঠের মাঝখানে থাকা ঠিক নয়"

হোটেল যে আছে হরিমটর নিরামিষ পান্থনিবাসে প্রবেশ করবার পর তা আর অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সেজন্যে সুশোভনকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রবৃত্তি হল না সান্ত্বনার।

তরকারি রান্নার গন্ধ ভেসে আসছিল একটা। কলের তেলের দুর্গন্ধ! নিশ্চয় গোয়াল কিম্বা আস্তাবলও আছে কাছে কোথাও। তেলে গোবরের গন্ধ ছাড়বে কি করে'। সান্ত্বনা বসে' পড়ল একটা স্যুটকেশের উপর।

"দাঁড়িয়ে আছেন কেন, যাহোক একটা ঠিক করে' ফেলুন এবার। চারটি খেয়ে শুতে পারলে বাঁচি"

"যা বলেছ"

সুশোভন এগিয়ে গিয়ে একটু ঝুঁকে জানলার কাচের ভিতর দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে।

"কিছু দেখতে পাচ্ছেন"

"কালো মতন কি যেন একটা"

"ডাকুন"

বাঁ হাতটি মুখের উপর রেখে ছোট্ট একটি হাই তুললে সান্ত্বনা। সুশোভন বার দুই ডেকে কোন সাড়া না পেয়ে ধাক্কা দিলে জানলায় শেষে।

"কে—"

বেরিয়ে এলেন গোঁসাইজি।

"আপনিই কি গোঁসাইজি—"

মঙ্কি-ক্যাপ দেখে সুশোভনের সন্দেহ হচ্ছিল একটু।

"হ্যাঁ"

"নমস্কার। রাত্রের জন্য আমরা দু'জন—"

"ক্ষমা করবেন। আপনাদের সংকার করতে অক্ষম আমি আপাতত"

গোঁসাইজি যথাসাধ্য শুদ্ধ কথা ব্যবহার করে' থাকেন।

"অক্ষম! কেন?"

"স্থানাভাব। আমার দু'টি ঘরেই অতিথি রয়েছেন"

"একটু জায়গা হবে না কোথাও?"

"না"

গোঁসাইজি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন।

"কচু খেলে যা—" অর্দ্ধস্বগত উক্তিটা বেরিয়ে পড়ল সুশোভনের মুখ থেকে।

"খাবার কিছু পাওয়া যাবে অন্ততঃ আশা করি"

গোঁসাইজি কটমট দৃষ্টিতে সুশোভনের দিকে চেয়েছিলেন।

"ওই ধরনের অশ্লীল কথা ফের যদি উচ্চারণ করেন, তাহলে খাবারও পাওয়া যাবে না"

"মাপ করবেন, আপনাকে শুনিয়ে কথাটা বলি নি—মানে—"

"ভগবান কিন্তু শুনেছেন"

"কি করে' জানলেন আপনি?"

মেজাজ আর ঠিক রাখতে পারছিল না সুশোভন।

গোঁসাইজি সান্ত্বনার দিকে ফিরে বললেন—"ভদ্রলোকের মুখ থেকে আমি এ রকম কুৎসিত ভাষা প্রত্যাশা করি নি"

"খুব অন্যায় হয়েছে ওঁর। খাবার কি পাওয়া যাবে"—সান্ত্বনা জবাব দিলে।

গোঁসাইজি সুশোভনের দিকে চেয়ে বললেন, "কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। খাতায় ঠিক ঠিক টোকা থাকে সব"

"কিছু খাবার কি পাওয়া যাবে"

পুনরায় বললে সান্ত্বনা।

"দেখি। সাধারণতঃ বাড়তি খাবার থাকে না আমার। আর তাছাড়া আর একটি কথা শুনে রাখুন গোড়াতেই। হোটেল আমার, মনোমত লোক ছাড়া ঢুকতে দিই না আমি কাউকে এখানে"

সুশোভন বলে ফেললে—"তবু এখানে স্থানাভাব! আশ্চর্য্য কাণ্ড!"

গোঁসাইজির ভ্রূ কুঞ্চিত হল। সান্ত্বনারও হল।

"বড় ক্লান্ত আমরা, ক্ষিদেও পেয়েছে, কিছু খাবার যদি থাকে।···শোবার জায়গা কোথায় যে আবার জোগাড় হবে এত রাত্রে"

একটু কাতর কণ্ঠেই বললে সান্ত্বনা।

"এখানে টেলিফোন করবার ব্যবস্থা আছে কোন"—সুশোভন জিগ্যেস করলে।

"না"

"কাছাকাছি কোথা থেকে টেলিফোন করা সম্ভব"

"কোথাও থেকে নয়। হ্যাঁ হতে পারে—পাঁচ মাইল দূরে একটা পোষ্ট-অফিস আছে সেখান থেকে হতে পারে"

"পাঁচ মাইল। রামচন্দ্র!"—বলেই সামলে নিলে সুশোভন।

"রামচন্দ্র বলে আমার চেনা শোনা লোক আছে একজন, তাকে টেলিফোন করব ভাবছিলাম। কিন্তু তার তো কোনও উপায় নেই আপাতত। গাড়িটাড়ি পাওয়া যেতে পারে?"

"না"

"এখানে ঘোড়ারগাড়ি গরুরগাড়ি কিছু পাওয়া যায় না ?"

"না"

"সে হালুয়া—ও মানে—হালুয়াগঞ্জে যাবার কোনও উপায় নেই তাহলে"

গোঁসাইজির ভ্রূর কুঞ্চন ভয়াবহ হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ।

"হালুয়াগঞ্জ বলে' কোন স্থানের নাম তো শুনি নি"

"আপনি শোনেন নি হয় তো, কিন্তু আছে"

সান্ত্বনা অধীর হয়ে উঠল।

"ওসব বাজে কথা থাক এখন। আমাদের খাবার ব্যবস্থাটা করে' দিন দয়া করে"

গোঁসাইজি সান্ত্বনার দিকে ফিরে চাইলেন। ছোঁড়াটা যদিও অসভ্য, মেয়েটি কিন্তু শ্রীমতী। দ্বারের দিকে চেয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন—"ফদ্‌কা—"

তারপর সান্ত্বনার দিকে ফিরে বললেন—"আপনার মুখ চেয়েই আমি খাবারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি" তারপর সুশোভনের দিকে চেয়ে বললেন—"আপনার স্বামী যদি একা আসতেন, খেতে পেতেন না আমার হোটেলে। যেন তেন প্রকারেণ পয়সা লোটাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য নয়"

"শুনুন এই মহিলাটি"—সংশোধন করতে গিয়ে সুশোভন থেমে গেলেন। সান্ত্বনা চোখের ইঙ্গিতে বারণ করলে তাকে।

"এই মহিলাটি কি—"

"এই মহিলাটি আজ রাত্রে আর হাঁটতে পারবেন না। রাত্রের মতো কোনও ব্যবস্থা কি—"

দ্বার খুলে গোঁসাইজির ভৃত্য ফদকা প্রবেশ করল। তাকে দেখবামাত্রই গোঁসাইজি তেড়ে গেলেন।

" 'হলে' আলো জালিস নি কেন এখনও ? বাঁদর কোথাকার"

"আলো জালছিলাম। আনছি—"

ফদকা বেড়িয়ে যাচ্ছিল গোঁসাইজি বললেন—"আর শোন, ঠাকুরকে বলে দে আরও ছ'জন খাবে। চাল ডাল বার করে' নিয়ে যাক্—তরকারি যা আছে ওতেই হবে—"

ফদকা চলে গেল। স্ত্রীকে 'মহিলা' বলে উল্লেখ করাতে গোঁসাইজি আরও চটেছিলেন। সুশোভনের দিকে ফিরে বললেন "মহিলাটির কষ্ট হবে বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করি বলুন, যাঁরা রয়েছেন তাঁদের তো তাড়িয়ে দিতে পারি না"

ফদকা একটা ভাঙা হ্যারিকেন নিয়ে প্রবেশ করল।

গোঁসাইজিও আর অধিক বাঙ্নিষ্পত্তি না করে' বেরিয়ে গেলেন।

(৬)

কলাইয়ের ডাল এবং চচ্চড়ি সহযোগে খানিকটা কড়কড়ে ভাত গলাধঃকরণ করার পর সান্ত্বনার প্রসন্নতা অনেকটা ফিরে এল যেন। সুশোভনের দিকে ফিরে সে বললে—"হয়তো রূঢ় ব্যবহার করেছি ক্ষমা করবেন। সত্যিই বড্ড ক্ষিদে পেয়েছিল। কিছু মনে করেন নি তো"

"এতে মনে করাকরির কি আছে। ক্ষিদে কি আমারই কম পেয়েছিল? তুমি আবার রূঢ় ব্যবহার করলে কখন, মনে পড়ছে না তো! বরং বেফাঁস কথাবার্তা বলে আমিই সব মাটি করেছিলাম আর একটু হলে"

"বিশেষ করে' আপনি যখন বলতে যাচ্ছিলেন যে মহিলাটি আমার স্ত্রী নয়। উনি যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারতেন যে আমরা স্বামী-স্ত্রী নই, তাহলে আস্তাবলে শোয়ার অনুমতিও বোধ হয় দিতেন না"

"যাক্ সে কথা। এখন শোয়ার কি করা যায় বলতো। তোমার পরামর্শ অনুসারে আমরা এখন যদি চলে যাই এখান থেকে, গণেশ আমাদের খুঁজে পাবে না সকালে—"

"কিন্তু পোষ্টাপিস থেকে আমরা ফোন করতে পারতাম মাসীমাকে"

"মাসীমার ফোন আছে ?"

"আছে। মাসীমার অসুখের সময় অনেক খরচ করে ফোন কানেকশন্ করা হয়েছিল"

"কিন্তু এখন পাঁচ মাইল হাঁটতে পারবে তুমি? পুঁইশাকের চচ্চড়ির সাংঘাতিক ক্ষমতা দেখছি"

চারটি ভাত পেটে পড়ার পর সান্ত্বনার স্ফূর্তি সত্যিই ফিরে এসেছিল যেন। সত্যিই তার মনে হচ্ছিল এত দমে' যাবার কি হেতু ঘটেছে। 'আউটিং' করতে গেলে এমন মটোর-অ্যাক্সিডেন্ট তো হয়েই থাকে। তারা জলেও পড়ে নি। না-হয় দু'জন গল্প করেই কাটিয়ে দেবে রাতটা। না হয় হাঁটবে। চিন্তার কি আছে……। হঠাৎ সুশোভনের দিকে ফিরে সে বললে—"সত্যি ভারী স্বার্থপর আমি। আমার চিন্তার কোন কারণই নেই, কিন্তু আপনার আছে"

"কি"

"আপনার স্ত্রী"

সুশোভন গম্ভীরভাবে বললে—"সত্যি, ভয়ানক চিন্তা হচ্ছে।"

বলেই হেসে ফেললে।

"এখন হাসছেন, কিন্তু আজ রাত্রে পৌঁছবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে নিজেই তো ট্যাক্সি করলেন—তা নাহলে কাল ট্রেণে এলেই চলত"

"বড় বিপজ্জনক প্রসঙ্গ আরম্ভ করেছ। চুপ চুপ, ঠাকুর আসছে বোধ হয়"

মৈথিল ঠাকুরটি আরও চারটি করে' ভাত এবং আর একটু তরকারি দিয়ে গেল।

সান্ত্বনা হেসে বললে, "ভয় নেই, আমি সাক্ষী দেব যে আপনি মহদুদ্দেশ্যেই ট্যাক্সি নিয়েছিলেন"

" আলোচনা থাক্ এখন। যদি শুনতে পেয়ে যায় তাহলে—"

দু'জনে নীরবে খেতে লাগল। অনীতার কথা উঠে পড়াতে সুশোভন একটু দমে গিয়েছিল। সান্ত্বনা সহাস্যদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললে "আচ্ছা সত্যি করে' বলুন তো, বিবাহিত জীবনটা কেমন লাগছে"

গোঁফের প্রান্ত বাঁ হাত দিয়ে পাকাতে পাকাতে সুশোভন বললে "অনেকটা যেন ধৌতি গোছের"

"ধৌতি? সে আবার কি!"

"বিশুদ্ধীকরণ"

"মানে?

"মানে বিশুদ্ধ হওয়া। অর্থাৎ বিয়ের আগে যে সব জিনিস মস্ত বড় বলে' মনে হয়, বিয়ের পর দিব্যদৃষ্টি লাভ করে' দেখা যায় সে সমস্তই বাজে। বিবাহ করবার পর মানুষ খাঁটি হয়, খাঁটি চেনে। বিয়ের আগে যা সোনা ছিল বিয়ের পর দেখা যায় সমস্তই ভ্রম—তা তামাও নয়, পাঁক—সেরেফ খাদ! কেমন কবিত্বপূর্ণ হল না জবাবটা?"

মৃদু হেসে সান্ত্বনা বললে—"খুব"

"অনীতার মনন শক্তি (চিৎশক্তিও বলতে পার) আমার চেয়ে বেশী। এখন আমাকে যা করতে হচ্ছে, বিয়ের আগে যদি জানতাম যে তা করতে হবে—তাহলে বিয়েই করতাম না বোধ হয়। কিন্তু ওর মধ্যে একটু মজা আছে; এখন যা করছি তা যে বাধ্য হয়ে করছি তা-ও নয়, তা করতে ইচ্ছেও হচ্ছে। ধরতে পারলে কথাটা"

"খুব পেরেছি। যে বিয়ে করেছে সেই পারবে"

"বিয়ের আগে যা ভাল লাগত তাই করতাম, এখন যা করি তাই ভাল লাগে"

"আপনার স্ত্রীরও লাগে?"

"লাগা উচিত। অনীতার ভাবগতিক ঠিক বোঝা যায় না যদিও। তোমার কিন্তু যায়। তোমাকে দেখলেই মনে হয় যে তুমি সুখী। তোমার চোখে মুখে সে কথা লেখা রয়েছে"

"বহু ধন্যবাদ—"

ঠাট্টার স্বরে বললেও অকৃত্রিম আনন্দে সান্ত্বনার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"অনীতাও সুখী হয়েছে আশা করি"—একটু ইতস্ততঃ করে' বলেই লজ্জিত হয়ে পড়ল যেন সুশোভন।

সান্ত্বনা হেসে বলল—"সুখী না হবার কোন কারণ তো নেই—"

"চুপ চুপ, পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মৈথিল আসছে"

"খট্টা লিবেন ?"

"নিশ্চয় লিব। চারটি ভাতও আন"

•"আমার আর ভাত চাই না—" সান্ত্বনা বললে।

বড়ির টক দিয়ে সুশোভন আর এক প্রস্থ সুরু করতে যাচ্ছিল, সান্ত্বনা হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল।

"শুনতে পাচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ। ঘোড়ার গাড়ি"

"যান, থামান ওটাকে"

"এখানেই থামবে হয়তো"

"আর 'হয়তো'র দরকার নেই—যান যেমন করে' পারেন থামান ওটাকে"

"বেশ"

উঠতে হল সুশোভনকে। দ্বার পর্য্যন্ত গিয়ে বললে—"কিন্তু এঁটো হাতে একটা ঘোড়ার গাড়ির পিছনে পিছনে দৌড়নোটা কি একটু—"

"যান যান শিগগির যান—চলে গেল। না, থামল বোধ হয়"

"বাঁচা গেল ! ভগবান আছেন"

"ও কি, আবার বসলেন যে এসে"

"অম্বলটুকু শেষ করে নি"

"ছি, ছি, কি আপনি !"

অম্বল শেষ করে' সুশোভন বেরিয়ে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এসে বললে—"ভগবান আছেন সত্যিই"

"ঠিক করে' ফেললেন গাড়িটা?"

"তার আর দরকার হবে না। আর একটু অম্বল আনতে বলি বরং। বেড়ে হয়েছে টকটা"

"কি হল বলুন না"

"ওপরের একটা ঘর খালি হয়ে যাচ্ছে এক্ষুণি"

"কি করে?"

"ওপরে কে একজন হেডমাস্টার আছেন, তাঁর মায়ের ভয়ানক হাঁপানি উঠেছে। তাঁকে নিতেই এসেছে গাড়ি"

"হেডমাস্টার এখানে ছিলেন?"

"হ্যাঁ, স-স্ত্রীক"

"কি রকম?"

"কি রকম আবার! স-স্ত্রীক ছিলেন, চলে যাচ্ছেন। এই খবরটুকুই যথেষ্ট আনন্দজনক আপাতত, আর অধিক জানবার প্রয়োজন কি? অম্বলটা ফেলে রাখছ কেন, খাও, ভাল হয়েছে"

অম্বলের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে' সান্ত্বনা বললে—"কিন্তু তাতে আমাদের কি সুবিধে হল"

"সুবিধে হল না? তিন মিনিটের মধ্যে একটা ঘর খালি হয়ে যাচ্ছে এক্ষুণি"

"কিন্তু মাত্র একটা ঘর খালি হলে কি সুবিধে হবে তাতে"

ব্যাপারটা এতক্ষণে স্পষ্ট হল সুশোভনের কাছে।

"ও, আচ্ছা বেশ, আমার ঘর চাই না, আমি বাইরে কাটিয়ে দেব কোথাও রাতটা। এই গুরু-ভোজনের পর স্যুটকেস হাতে ঝুলিয়ে যে পাঁচ মাইল হাঁটতে হল না, তাই যথেষ্ট আমার পক্ষে"

মৃদু হেসে সান্ত্বনা বললে, "আমার স্যুটকেস দুটো বয়ে আনতে আপনার

খুবই কষ্ট হয়েছে বুঝতে পারছি, কিন্তু কি করি বলুন। অত গয়না কাপড় মোটরে ফেলে রেখে আসাটা কি ঠিক হত”

“কিছুমাত্র কষ্ট হয় নি আমার। তোমার কষ্টের কথাই ভাবছি। তোমার একটা শোবার ব্যবস্থা হয়ে গেল বাঁচলুম”

“বাইরে আপনার অসুবিধে হবে খুব”

“কিছুমাত্র না। এরা চলে গেলে গোঁসাইজির সঙ্গে দেখা করে সব ঠিক করে ফেলছি দেখ না”

বলেই সুশোভন থেমে গেল। পরস্পরের দৃষ্টিবিনিময় হয়ে গেল একটা।

“গোঁসাইজির সঙ্গে কিন্তু সাবধানে কথাবার্তা কইতে হবে”

“নিশ্চয়, উনি যদি কোনক্রমে টের পেয়ে যান যে আমরা স্বামী-স্ত্রী নই, তাহলে—”

“তাহলে আর এখানে স্থান হবে না রাত্রে”

“উপায় ?”

খানিকক্ষণ ভেবে সুশোভন বললে—“ভাই বোন বলে' পরিচয় দিলে ক্ষতি কি—”

“গোড়ায় ওঁকে সে কথা তো বলা হয় নি, উনি ধারণা করে' নিয়েছেন যে আমরা স্বামী-স্ত্রী। এখন যদি আবার—”

“বেশ দেখা যাক্, কি হয়”

“না না, ঠিক করে' ভেবে দেখুন। আমরা যদি স্বামী-স্ত্রী হই, আপনি বাইরে শোবেন কি ওজুহাতে”

“বেশ, ওজুহাত যদি না খাড়া করতে পারা যায় এক ঘরেই শোয়া যাবে। কি হয়েছে তাতে। তোমার আপত্তি না থাকলেই হল। কিম্বা তোমার যদি আপত্তি থাকে, গোঁসাইজির সামনে আমরা দু'জনে ঘরটায় একসঙ্গে ঢুকব—গোঁসাইজি আমাদের সমস্ত রাত পাহারা দেবেন না নিশ্চয়ই—তার পর উনি গিয়ে শুলেই আমি বেরিয়ে আসব। তার পর তুমি শুয়ে পোড়ো—আমি বারান্দায় থাকব”

"তার পর সকালে ?"

"সকালে আবার কি। ভোরে তোমাকে উঠিয়ে দু'জনে একসঙ্গে নেবে আসব। তার পরই তো গণেশ এসে পড়বে"

সান্ত্বনা চুপ করে' রইল। বিয়ের আগে সেই লেখক ভদ্রলোকের সঙ্গে মিছিমিছি তার নাম জড়িয়ে সবাই যে কলঙ্ক রটিয়েছিল তার গ্লানিকর স্মৃতি আজও তার মন থেকে মোছে নি। আবার না কিছু হয়। হঠাৎ সে মন-স্থির করে' ফেললে—"বেশ তাই হবে। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই যখন। কিন্তু একথা গল্পচ্ছলেও কাউকে বলবেন না যেন কখনও"

"পাগল নাকি !"

শিক্ষক-দম্পতির ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস, বিছানা প্রভৃতি নামতে লাগল উপর থেকে। তাঁরাও নামলেন এবং অযথা বিলম্ব না করে' চলে গেলেন। তাঁদের বিদায় দেবার জন্য গোঁসাইজিও নির্গত হলেন নিজের ঘর থেকে। তাঁরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার গিয়ে ঢুকলেন অবশ্য।

সুশোভন সান্ত্বনাকে বললে "এবার যাও, বুঝলে, গোঁসাইজিকে একটু চোমরাও গিয়ে"

"আপনি যাবেন না ?"

"আমার চেয়ে তুমি গেলে বেশী কাজ হবে।"

একটু মুচকি হেসে সান্ত্বনা বেরিয়ে গেল।

মঙ্কি-ক্যাপটি খুলে ফেলে গোঁসাইজি তাঁর আপিস ঘরের চেয়ারে বসে' ক্যালেণ্ডারে অঙ্কিত ওঁ-বিজড়িত রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তিকে প্রণাম করছিলেন। প্রতিদিন শয়নের পূর্ব্বে তিনি এই পুণ্য কাজটি করে থাকেন। প্রণামান্তে মুখ তুলে দেখতে পেলেন সান্ত্বনা শ্রদ্ধা-গদগদ মুখে তাঁর দিকে চেয়ে আছে।

"কি চমৎকার যে খেলাম আপনার এখানে। এমন চমৎকার রান্না অনেক দিন খাই নি"

"গোড়াতেই তো বলেছি, পয়সা রোজকার করবার জন্তে আমি হোটেল খুলি নি"

স্নেহভরে সান্ত্বনার মুখের দিকে চাইলেন তিনি।

"আপনাদের ওপরের একটা ঘর খালি হয়ে গেল নাকি এখুনি"

"হ্যাঁ, ইচ্ছে করেন তো নিতে পারেন ঘরখানা"

এত সহজে হয়ে যাবে সান্ত্বনা আশা করে নি।

গোঁসাইজি সান্ত্বনার মুখের দিকে চেয়েই ছিলেন। বেশ একটা লক্ষ্মী-শ্রী আছে মেয়েটির, অথচ পড়েছে একটা অসভ্যের হাতে। অদৃষ্ট!

সহসা প্রশ্ন করলেন—"বিয়ে কতদিন হয়েছে"

"তিনমাস"

"ও। আচ্ছা, বেশ ওপরের ঘরটা নিন আপনারা। আমি ফদকাকে বলে' দিচ্ছি—"

ঘর থেকে বেরিয়েই 'হল' ঘরে সুশোভনকে দেখতে পেলেন। ভ্রূ কুঞ্চিত করে' একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তার দিকে। তারপর বললেন "অ্যাডমিশন খাতায় আপনাদের পরিচয় লিখে দিতে হবে"

অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে সুশোভন বলল "বেশ তো, দেব, চলুন"

"ভিতরে আসতে পারি"

বাইরে থেকে অপরিচিত কার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বেশ পরুষ কণ্ঠস্বর। দ্বার খুলতেই সদারঙ্গবিহারীলাল প্রবেশ করলেন।

"আশা করি বিরক্ত করলাম না। একটু মোবিল হবে কি আপনাদের কাছে"

সদারঙ্গবিহারীলালের আপাদমস্তক ধূলোয় পরিপূর্ণ। কিন্তু সেদিকে তাঁর মোটে ভ্রূক্ষেপ নেই। আবেগে উৎসাহে চোখের দৃষ্টি জ্বলজ্বল করছে।

"একটু তেল হবে—সামান্য একটু—"

"না"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে' গোঁসাইজি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন। আপিস ঘর থেকে সান্ত্বনা বেরিয়ে এল।

"আরে সান্ত্বনা দেবী যে—অ্যাঁ—একেবারে অপ্রত্যাশিত—ছি ছি—বাঃ। বিয়ের খবর পেয়েছিলাম, কিন্তু যেতে পারলাম না কিছুতে। অধ্যাপক মশায়ের নামটি কি যেন, দেবী চৌধুরাণীতে আছে—হ্যাঁ, গট ইট—ব্রজেশ্বর—ব্রজেশ্বর দে। প্রবন্ধ পড়লাম তাঁর একটা সেদিন—খাসা লেখা। ভারী খুশি হলাম আপনাকে দেখে। চমৎকার চমৎকার—বাঃ—"

তাঁর পুরু লেন্সের চশমা থেকে অজস্র রশ্মি-রেখা বিচ্ছুরিত হতে লাগল। বিরক্তিকে বিস্ময়ে রূপান্তরিত করে' সান্ত্বনা বললে—"আপনার সঙ্গে যে এখানে দেখা হয়ে যাবে তা ভাবি নি সত্যি। এখানে কোথায় এসেছেন—"

"বৈজুপ্রসাদের জন্য ভোট ক্যানভাস করছি—লোকটি ডিজার্ভিং ক্যাণ্ডিডেট—আমি প্রথমটা ধরতে পারি নি, উমেশ চৌবের জন্যে প্রথমটা—ছি ছি—যাক সে লম্বা কাহিনী—আপনি এখানে কি করে' এলেন"

"এসে পড়া গেছে এ অঞ্চলে। রাতটা কাটাচ্ছি এখানে"

"আমার কাছে মোবিল নেই"—গোঁসাইজি আবার বললেন। কিন্তু তাঁর কথা শুনবে কে। সদারঙ্গবিহারীলাল সান্ত্বনার দিকে চেয়ে বলে' চলেছেন—"এ অঞ্চলে এসে পড়েছেন যখন রাউতপুরের হিস্টরিক্যাল রিমেন্‌সগুলো দেখে যাবেন, যদি না দেখে থাকেন। দু' একদিনের মধ্যে আমারও যাবার কথা আছে। একাই এসেছেন ? ও—আই সি—সো সরি"

"আমার এখানে তেল নেই মশাই, শুনছেন"

সদারঙ্গবিহারীলালের তখন শোনবার মতো অবস্থা নয়। উচ্ছ্বাস অনুতাপ আনন্দ বিস্ময় প্রভৃতি বিবিধভাবে তাঁর চিত্ত আলোড়িত হয়ে উঠেছিল সুশোভনকে দেখে। চশমায় আলোর ফুলঝুরি কাটছিল।

"আরে রাম রাম—আমার ভাবাই উচিত ছিল—মানে—বাঃ যাক্। খুব খুশি হলাম—খুব। নামই শুনেছিলাম শুধু—লেখাও পড়েছি একটা—চমৎকার—

রাঁউতপুরে যান যদি—যাওয়া উচিত—মানে ওঁরাও-দের সম্বন্ধে নতুন ক্লু পাওয়া যেতে পারে—আপনি আমার চেয়ে ভাল বুঝবেন অবশ্য। মোবিল অয়েলের খোঁজে এসে—হঠাৎ এখানে—অ্যাঁ—ছি ছি—দেখুন দিকি—বাঃ—বাঃ—"

(৭)

অনীতা প্রথমটা বিব্রত হয়ে পড়লেও শেষ পর্য্যন্ত মাথা ঠিক রাখতে পেরেছিল। চেন টানবার কথা একবার মনে হয়েছিল অবশ্য, কিন্তু পঞ্চাশ টাকা জরিমানার কথাটা চোখে পড়াতে সে চেষ্টা আর করে নি সে। তাছাড়া ট্রেণ থামিয়েই বা কি হবে। সুশোভনকে তুলে নেবার জন্যে গার্ড ট্রেণ ব্যাক করে' নিয়ে যাবে না নিশ্চয়। তাছাড়া সুশোভনই কি ষ্টেশনে থাকবে? বিশেষতঃ একটা মেয়ের সঙ্গ পেয়েছে যখন। সমস্ত ছাপিয়ে ওই একটা কথাই মনে কাঁটার মতো খচখচ করছিল। আঃ—।

ট্রেণ চলতে লাগল। বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে' বসে' রইল অনীতা। কঠিন সংযম-সহকারে বসে' রইল, বসে' বসে' তেজ সংগ্রহ করতে লাগল। সাধারণ যে কোনও মেয়ে হয় চেন টানত, না হয় চলন্ত ট্রেণ থেকে লাফিয়ে নামবার চেষ্টা করত, কিন্তু স্বর্ণপ্রভার কন্যা কোন রকম আত্মসম্মান-হানিকর ইতরামির মধ্যে গেল না। নীরবে বসে' বসে' শক্তি সংগ্রহ করতে লাগল কেবল। যদিও সে এই কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত একজন উৎসাহী 'কমরেড্' ছিল, সোভিয়েট রাশিয়ার বন্ধন-বিদ্রোহী বিবাহের যুক্তিগুলো এখনও কণ্ঠস্থ আছে তার, কিন্তু বিবাহের তিনমাস পরেই তার স্বামী যে আর একজনের পাল্লায় পড়ে' বেহাত হয়ে যাবে স্বাধীনতা-নামধেয় এ যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেবে না সে কিছুতেই। অতটা আলট্রা মডার্ণ হবার প্রবৃত্তি নেই তার। পরের ষ্টেশনে নেমেই সুশোভনকে টেলিগ্রাম করতে হবে যে সে ফিরে যাচ্ছে। টেলিগ্রামটা পেয়ে আর কিছু না করুক—মেয়েটাকে অন্ততঃ সরিয়ে রাখবে সে। বাড়ি ফিরে গিয়ে যদি দেখতে হয় যে আর একটি সুন্দরী মেয়ে তার টেবিলে বসে' চা খাচ্ছে, আর সুশোভন হেসে

হেসে গল্প করছে তার সঙ্গে—উঃ, তার চেয়ে মরণ ভাল। তাছাড়া সুশোভনকে একলা নিজের এক্তিয়ারের মধ্যে পেলেই যা খুশি করা সম্ভব। আর একজনের সামনে কি বলবে সে। সুশোভনের বক্তব্যটা ধীরভাবে শুনবে সে প্রথমে, তারপর যথাকর্ত্তব্য করবে। দরকার হলে মা-কেও খবর দিতে হবে। হ্যাঁ, মাকে খবর দিতে হবে বই কি। নিজের শক্তি-সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সোজা হয়ে বসল সে।

পরদিন সন্ধ্যায় ট্যাক্সি থেকে নেমে অনীতা দেখলে বাড়িতে কেউ নেই। এমন কি চাকরানিটা পর্য্যন্ত অনুপস্থিত। ড্রাইভারের সাহায্যে জিনিষপত্রগুলো নামিয়ে রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত ঠায় বসে' রইল সে সিঁড়ির উপর। ঘরে তালা বন্ধ। চাবি চাকরানির কাছে। ঘরদ্বার পরিষ্কার করবে বলে' চাবিটা তার কাছে রেখে যেতে হয়েছিল। মায়ের কাছে গেল না, কারণ সুশোভনের মুখ থেকে সব কথা শোনবার আগে মাকে সে কিছু জানাবে না। সুশোভনের উপর কোনও অবিচার করবে না সে। খুব ক্ষিধে পেয়েছিল, খুব ক্লান্ত লাগছিল, সমস্ত দেহমন ভেঙে পড়েছিল তার যেন। একটুও ভালবাসে না সুশোভন তাকে—একটুও না। এই তো সবে তিনমাস বিয়ে হয়েছে···এর মধ্যেই সে···। ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি অভিমান সত্ত্বেও সে বারবার আবৃত্তি করছিল মনে মনে—না, না, আমারই ভুল হচ্ছে হয় তো, সুশোভনের দেখা পেলেই বোঝা যাবে কেন সে অমন করে' ছুটে চলে গেল—মেয়েটি কে···এখনও আসছে না কেন—সুশোভন···কোথা গেল। পরিচিত পদশব্দের আশায় উৎকর্ণ হয়ে বসে রইল সে। গাল বেয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। মশা ছেঁকে ধরল। অন্ধকার ঘনিয়ে এল চতুর্দ্দিকে।

···সুশোভন কিন্তু এল না। অশ্রু শুষ্ক হল। হৃদয়ও শুষ্ক হতে লাগল ক্রমশঃ। সে যা সন্দেহ করেছে তাহলে তাই ঠিক। চাকরানিটা ফিরে এল এগারোটার সময় এবং দিদিমণিকে তদবস্থ দেখে অবাক হয়ে গেল।

নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন হল।

"উনি কখন গেলেন ?"

"বেলা আড়াইটের সময়"

"একাই গেছেন ?"

হাসি গোপন করে' চাকরানি বললে, "না সঙ্গে আর একজন ছিলেন"

"একটি মেয়ে কি ?"

"হ্যাঁ"

"ফরসা গোছের ?"

"হ্যাঁ। একটা কুকুরও ছিল তার সঙ্গে। আমি কুকুরটাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে চাই নি, কিন্তু জামাইবাবু মানলেন না—সব একাক্কার করেছে"

"মেয়েটির সঙ্গে জিনিসপত্র ছিল ?"

"অনেক। সব বোঝাই করে' নিয়ে গেছে মোটরে"

"নিজেদের মোটর ?"

"না, ট্যাক্সি। শার্দ্দূল সিং না কে পাঠিয়েছিল বললে"

"কপাট খোল। আমার টেলিগ্রামটা লেটার বক্সে রয়েছে দেখছি"

"একটু চা কর দিকি। মীট সেফে কয়েকটা ডিম ছিল, ভাজ সেগুলো। বিস্কুটগুলো বার কর। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে"

"ঘরে কিছু নেই। সব ওনারা খেয়ে গেছেন।"

অনীতার সমস্ত মুখ অন্ধকার হয়ে গেল।

"বাজার থেকে কিছু খাবার আন তাহলে। এত রাত্রে পাওয়া যাবে কি কিছু"

"মোড়ের দোকানটা খোলা আছে"

চাকরানি কপাট খুলে' খাবার আনতে গেল। অনীতার মনে সন্দেহের আর কোন অবকাশ রইল না। মেয়েটাকে নিয়ে এইখানে এসেছিল! আমার শোবার ঘরে! লজ্জা করল না একটু।...তিনকাপ চা, গোটা চারেক রসগোল্লা, ছ'টা সিঙাড়া এবং গোটা পাঁচেক হিংয়ের কচুরি খাবার পর অনীতার ম্রিয়মাণ হৃদয় কথঞ্চিৎ সঞ্জীবিত হল। মনে হল আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়। অবিলম্বে কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত।

মাকে ফোন করল সে।

অনেকক্ষণ বকবক করে' স্বয়ম্প্রভা দেবী সবে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। জিতুবাবু তাঁর পাশে চোখ বুজে পড়েছিলেন এবং আশা করছিলেন যে এইবার ঘুমুল বোধ হয়! তাঁরও একটু তন্দ্রা আসছিল। কিন্তু হঠাৎ পেটে কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে তড়াক করে' উঠে বসতে হল আবার তাঁকে।

"কি"

"ফোন শুনতে পাচ্ছ না?"

"ফোন?"

আবার বেজে উঠল ফোনটা। বিছানা ছেড়ে উঠলেন জিতুবাবু। ফোন নীচের ঘরে।

"ফোনে তোমাকে ডাকছে"

জিতুবাবু ফিরে এসে বললেন। প্রতিহিংসার একটা চাপা হাসি তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে মনে হল।

"আমাকে? এত রাত্রে কে ডাকছে আমাকে"

"অনীতা"

"অনীতা! সে তো দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে গেছে"

"হয় তো সেখান থেকেই ফোন করছে"

"তাই বললে?"

"না, জিগ্যেস করি নি"

"যাও জিগ্যেস করে' এস। আমি ততক্ষণ গায়ে একটা জড়িয়ে নি কিছু"

"তুমিই যা জিগ্যেস করবার কর না গিয়ে। তোমাকেই চাইছে সে"

"বেশ, আমিই যাচ্ছি। কিন্তু তুমি শুয়ো না যেন"

"আমি কি করব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে"

"তোমাকেও দরকার হতে পারে হয় তো"

"আমাকে এত রাত্রে কি দরকার হতে পারে"

"কেন ফোন করছে জানি না তো। নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছে। তা না হলে এত রাত্রে ফোন করবে কেন! শুয়ো না তুমি"

"ছি ছি কাপড়টা ভাল করে' পর। চাকররা দেখতে পেলে ভাববে কি"

"চাকররা ঘুমিয়েছে। আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত শুয়ো না"

স্বয়ম্প্রভা দেবী চলে গেলেন। ফিরলেন বেশ কিছুক্ষণ পরে এবং জিতুবাবুর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে' বললেন, "আমি জানতাম"

"এই শীতে মেজেতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় নাকি" বিছানার ভিতর থেকে করুণ কণ্ঠে বললেন জিতুবাবু।

"সে-কথা বলছি না। এ আমি গোড়া থেকেই জানতাম। যাও তাড়াতাড়ি কাপড়জামা পরে নাও, আর এক মুহূর্ত্ত দেরি করা চলবে না। করছ কি তুমি, ওঠ না। এ রকমটা যে হবে, গোড়া থেকেই বুঝেছিলাম আমি"

"কি বুঝেছিলে? কি হবে? কাপড়জামা পরব, মানে! ব্যাপারটা কি খুলেই বল না"

স্বয়ম্প্রভা গায়ের র‍্যাপারটা বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে আলনা থেকে একটা গরম ব্লাউস তুলে নিলেন এবং তার সরু লম্বা হাতায় নিজের বলিষ্ঠ বাহুটি প্রবেশ করাতে করাতে বলিলেন—"অনীতাকে হাওড়া ষ্টেশনে ফেলে তার স্বামী পালিয়েছে। আগেই আমি জানতাম। উঠছ না এখনও? এ শুনেও শুয়ে আছ কি করে' তুমি? উঠে তাড়াতাড়ি ওভার কোটটা পরে' নাও, বেশী কিছু পরবার দরকার নেই এখন। সময়ও নেই। ওঠ, ওঠ, ওঠ না—শুয়ে থাকতে পারছও তো এসব শোনবার পর"

"কবে পালিয়েছে"

"আজ। উঠবে, না শুয়েই থাকবে লেপের তলায়"

"কোথায় পালিয়েছে"

"বললাম না, হাওড়া ষ্টেশনে। আমার হয়ে গেছে—নাও তুমি"

"অনীতা কোথায়? দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে?"

"রসিকতা করছ নাকি"

নিজেই তিনি জিতুবাবুর ওভারকোটটা এনে দিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে যে অবস্থায় তাঁরা গিয়ে কন্যাকে দেখলেন তাতে অতি-আধুনিকতার কোন চিহ্নই ছিল না। সেই সনাতন আলুলায়িত কেশ, দর-বিগলিত অশ্রু, বুক-ফাটা হা-হুতাশ। হৃদয়বিদারক লজ্জাকর কাহিনীটা বিবৃত করতে করতে কণ্ঠস্বরও অবরুদ্ধ হয়ে আসছিল অনীতার মাঝে মাঝে। ওষ্ঠাধর দৃঢ় নিবদ্ধ করে' স্বয়ম্প্রভা দেবী নীরবে সব শুনে যাচ্ছিলেন এবং মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে যা প্রকাশ করতে চাইছিলেন তার সরল অর্থ—ঠিক এই আমি ভেবেছিলাম।

"কুসুম আর কি কি বললে"

কুসুম চাকরানিটার নাম।

রুমাল দিয়ে চোখ মুছে অনীতা বললে, "সবই তো বললুম"

"ট্যাক্সির নম্বরটা দেখেছিলে?"

"না। শার্দ্দূল সিং ট্যাক্সি দিয়েছিল শুনলাম"

"শার্দ্দূল সিং? সে তো আমাদের চেনা লোক। দিন সাতেক আগে মনে হচ্ছে তারই একটা ভাঙা মোটরের লোহাগুলো আমরা কিনলাম। শার্দ্দূল সিংই তার নাম, না?"

স্বয়ম্প্রভা দেবী জিতুবাবুর দিকে চাইতেই সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন তিনি। নেড়েই অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু স্বয়ম্প্রভা রেহাই দিলেন না।

"কি করছ এখন"

"কি"

"হ্যা—কি—কি"

"কি মুসকিল! আমি কি—"

"এক কথা বার বার আউড়ে লাভ হবে না কোন। অনীতা যা বললে শুনলে তো। এখন কি করতে চাও"

"চাইব ? চেয়েই তো আছি"

সত্যি জিতুবাবুর ঘুমের ঘোর কাটে নি তখনও।

"তুমি মানুষ না পাথর ? এ সব শুনেও কিছু করবে না ?"

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন স্বর্ণপ্রভা দেবী।

"কি করব বল। তাই তো জানতে চাইছি—কি করব"

"পুলিশে খবর দাও"

"পুলিশে! মাথা খারাপ নাকি। এই রাত্রে পুলিশ! পুলিশ কি বস্তু তা চেন ?"

"যেমন করে' হোক ওকে ধরতে হবে। যেমন করে' হোক। এ অপমান কিছুতেই সহ্য করব না আমি"

জিতুবাবু তাঁর কেশবিরল মস্তকে ধীরে ধীরে হস্তসঞ্চালন করছিলেন। ঈষৎ কেসে তিনি বললেন ; "কিন্তু তার অপরাধের অকাট্য কোনও প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি না আমি এখনও"

মাতা-পুত্রী উভয়েই সমস্বরে বলে উঠল, "এখনও প্রমাণ দেখতে পাচ্ছ না!"

আর একটু কেসে জিতুবাবু উত্তর দিলেন, "ট্রেণ ধরতে না পেরে সে বাড়ি ফিরে এসেছিল, ফিরে এসে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে গেছে। সাধারণ বুদ্ধিতে তো মনে হয় অনীতার উদ্দেশ্যেই গেছে"

অনীতা ক্রোধভরে ঘাড়টা ফিরিয়ে নিলে। বাবার সরলতা সীমা অতিক্রম করছে যেন!

স্বর্ণপ্রভা দেবী জিতুবাবুর মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে হাত নেড়ে বললেন, "আহা, কি বুদ্ধি! মরি মরি"

"আর একটি মেয়ের কথা যা বলছ, তারও হয়তো ওই পথে যাওয়ার দরকার ছিল, হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে হয়তো ষ্টেশনে—কিম্বা—"

"তুমি থাম বাবা"—অভিমান-অনুযোগ-ভরা কণ্ঠে অনীতা বললে।

স্বয়ম্প্রভা বললেন, "লোহার কারবার ছেড়ে ব্যারিস্টারি কর গে যাও তুমি সেই তোমার মানাবে ভাল"

"আমি বাজি রাখতে পারি"—হঠাৎ চটে গিয়ে জিতুবাবু বলে উঠলেন—"আমি বাজি রাখতে পারি, সুশোভন এতক্ষণে দিগিন্দ্র না দিকপাল সেই ভদ্রলোকের ওখানে পৌঁছে গেছে, আর অনীতাকে সেখানে দেখতে না পেয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে। সকালেই আমি টেলিগ্রাম করব সেখানে"

স্বয়ম্প্রভা বললেন, "তাহলে তো সোনায় সোহাগা হবে। ঢি ঢি পড়ে যাবে চারদিকে"

"যাই হোক্ সমস্ত রাত এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোনো লাভ হবে না এখন। বাড়ি চল। আমি পা-জামা পরেই চলে এসেছি। আমার বিশ্বাস সকাল নাগাদ সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর এখন করবারই বা কি আছে"

"আমি অনীতার কাছে থাকব"

"বেশ থাক। ভালই তো"

"না, মা তুমি যাও। আমার কোনও কষ্ট হবে না"

"কেন, থাকি না"

"না"

জিতুবাবু অধীর হয়ে উঠলেন।

"আঃ, যা হয় ঠিক করে' ফেল একটা। ঘুম পাচ্ছে আমার"—তারপর অনীতার দিকে ফিরে বললেন, "মিছি মিছি ভাবছিস, কিছু হয় নি। তাছাড়া আর একটা কথাও মনে রাখা উচিত আমাদের। সুশোভন ঠিক আমাদের মতো নয় তো, সে যে সমাজে মানুষ সে সমাজে স্ত্রীলোক নিয়ে অত শুচিবাই নেই, কারও সঙ্গে একবার ট্যাক্সিতে উঠলেই যে চারিদিকে ঢি ঢি পড়ে যাবে এ কথা ভাবতেই পারে না সে হয়তো"

"এই ঘুমের জন্যে অস্থির হচ্ছিলে, আবার বক্তৃতা সুরু করলে কেন। কত রঙ্গই যে জান—"

"কাল সকালেই টেলিগ্রাম করব আমি। রায় বাহাদুর দিগিন্দ্রমোহন ?"

"দিগ্বিজয় সিংহ রায়—মুচুকন্দ-কুণ্ডলেশ্বরী"

"আচ্ছা। টুকে দে আমায় একটা কাগজে, ভুলে যেতে পারি"

উভয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। ফিরে এসেই স্বয়ম্প্রভা দেবী ফোন ডাইরেক্টারী খুঁজে শার্দূল সিংকে ফোন করলেন। কোন জবাব পেলেন না। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল তাঁকে। না, সে ট্যাক্সি এখনও ফেরে নি। কোনও খবরও আসে নি এখনও। না, কোথায় গেছে তা জানেন না তাঁরা ঠিক। সুশোভনবাবু শুধু বলেছিলেন অনেক দূর যেতে হবে, সুশোভনবাবু চেনাশোনা লোক, তাই তাঁরা নির্ভয়ে তাঁর হাতে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছিলেন—বিশেষ খোঁজ খবর করেন নি। ড্রাইভারের নাম গণেশ, যদিও নূতন লোক কিন্তু নির্ভরযোগ্য। গণেশ ফিরে এলে তাকে মিসেস সোমের কাছে পাঠিয়ে দেবে তারা।

জিতুবাবু আপিসে পৌঁছে টেলিগ্রাম করবার ফর্ম চাইলেন এবং বেশ কায়দা করে' চেয়ার টেনে বসলেন। ব্যবসায় সংক্রান্ত চিঠিপত্র লিখতে আটকায় না তাঁর, কিন্তু এ ধরণের সূক্ষ্ম সামাজিক লিপিকুশলতা তাঁর ধাতে নেই। ব্যাপারটা একটু ঘোরালো গোছেরও। টেলিগ্রাফিক ভাষায় সংক্ষেপে লিখতে হবে। উপর্য্যুপরি গোটা ছয়েক ফর্ম নষ্ট করবার পর ভ্রূকুঞ্চিত করে' বসে রইলেন তিনি কিছুক্ষণ। অনুচ্চকণ্ঠে একবার বললেন, "বেশ বেগ দেবে দেখছি।" বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলেন।

প্রথমতঃ জানা দরকার সুশোভন সেখানে গেছে কিনা। দ্বিতীয়তঃ জানানো দরকার অনীতা কেন যায় নি, তৃতীয়তঃ সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা সংক্ষিপ্ত অথচ ভদ্র চেহারা দিতে হবে। ভদ্র চেহারা দিতেই হবে, কারণ ওই দিকপাল ভদ্র-বনেদী ঘরের ছেলে—দারুণ ইয়ে—। সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিতে এটি জানানও দরকার যে অনীতা সামান্য একটু চিন্তিত হয়েছে বটে কিন্তু আতঙ্কিত হয় নি।

পেন্সিল দিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে মুখবিকৃতিসহকারে তিনি মনে মনে ভাঁজতে লাগলেন—ক্যান ইউ কাইণ্ডলি সেন্‌ড্ নিউজ সুশোভন থিঙ্ক সাম মিস্টেক—ওয়াইফ্ কট্ ট্রেণ হি মিস্‌ড্ সো রিটার্ণড। পছন্দ হল না। আবার

ভাঙতে লাগলেন—ইজ স্থশোভন উইথ্ ইউ ওয়াইফ্ মিস্‌ড্ হিম্ ষ্টার্টেড্ টু হোম বাট্ মিস্‌ড্ হিম্ সো রিটার্ণড্ হোম্ বাট্ মিস্‌ড্—

তাঁর আপিস ঘরের বাইরে কয়েকজন কর্ম্মচারী জরুরি ফাইলপত্র নিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং অধীরতাসূচক যে সব শব্দ করছিল তাতে আরও গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল যেন সব। অবশেষে বিরক্তিভরে অর্দ্ধলিখিত আর একগোছা টেলিগ্রাম ফর্ম ছিঁড়ে কুঁচোকুঁচি করে' ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিলেন। দুপুর পর্য্যন্ত যদি কোন খবর না আসে তখন দেখা যাবে।

"আস্থন আপনারা—"

(৮)

অত্যুচ্ছ্বসিত সদারঙ্গবিহারীলালের নমস্কারের প্রত্যুত্তরে স্থশোভনকে প্রতিনমস্কার করতে হল, কিন্তু মনে মনে বিব্রত হয়ে পড়ল সে। সদারঙ্গবিহারীলাল? নামটা শোনা-শোনা ঠেকছে। অনীতারই সম্পর্কে কোথায় যেন শুনেছে। ঠিক মনে পড়ল না।

"আপনার বিয়েতে যেতে পারি নি। সেটা আমার দুর্ভাগ্য। আমার 'তার'টা পেয়েছিলেন তো?"

স্থশোভনের আবছাভাবে মনে পড়ল বিয়ের সময় অনীতাদের বাড়ীতেই এ নামটা সে শুনেছিল যেন। কে যেন বলেছিল সদারঙ্গবিহারীলাল আসতে পারবে না।

"হ্যাঁ, আপনার 'তার' পেয়েছিলাম বই কি"—সান্ত্বনা জবাব দিলে।

"হ্যাঁ, পেয়েছিলাম" সায় দিতে হল স্থশোভনকেও। স্থশোভনের দিকে চেয়ে সদারঙ্গবিহারীলাল স্থরু করলেন তখন।

"আপনার কথা অনেক শুনেছি"

"আমার কথা? আমার স্ত্রীর কাছ থেকে বুঝি"

"হ্যাঁ, আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে তো বটেই, আরও অনেক জায়গা থেকে। আপনাদের মতো লোক কি লুকিয়ে থাকতে পারে কখনও—হেঁ হেঁ হেঁ—"

এ কথা শুনে বেশ একটু ঘাবড়ে গেল সুশোভন। একটু ইতস্ততঃ করে' চুপ করে' রইল, আড়চোখে সান্ত্বনার দিকে চাইলে একবার।

"আপনাদের বিয়ের আগে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একবার নাইট স্কুলে দেখা হয়েছিল, কেমন না?"

প্রশ্নের ভঙ্গীতে সান্ত্বনার দিকে চেয়ে সোচ্ছ্বাসে ভুরু নাচালেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"ও, নাইটস্কুলে"—ক্ষীণভাবে প্রতিধ্বনি করলে সুশোভন।

"হ্যাঁ, নাইট স্কুলে। আপনারও সেখানে আসবার কথা ছিল, কিন্তু কি একটা ব্যাপারের জন্য আপনার আসা হয় নি। সম্ভবতঃ কোনও জরুরি মিটিংএ আটকে পড়েছিলেন।"

সদারঙ্গবিহারীলাল এমনভাবে চাইলেন সুশোভনের দিকে, যেন কোন দেবমূর্ত্ত ব্যক্তিকে দর্শন করছেন তিনি।

বিদ্যুৎ-চমক-বৎ সুশোভনের হঠাৎ মনে পড়ল এঁদের চক্ষে সে অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে (যিনি সম্প্রতি উৎসাহী কংগ্রেসকর্মী হয়ে উঠেছেন)—অনীতার সঙ্গে তার বিয়ে হয় নি, হয়েছে সান্ত্বনার সঙ্গে! অপ্রত্যাশিত নেপথ্যলোকে সহসা পরকীয়া লাভ করে' সুশোভনের অবচেতন মানসে বেশ একটু পুলক সঞ্চার হল। মন্দ কি! উৎসাহী কংগ্রেসকর্মী অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে হবার শখ নেই তার, কিন্তু সান্ত্বনার স্বামী হওয়াটা—অদ্ভুতগোছের ঠেকলেও—লোভনীয়। বেশ, অভিনয় যদি করতেই হয় ভালভাবেই করতে হবে। বিব্রতভাবটা ঝেড়ে ফেলে বেশ সপ্রতিভ হয়ে উঠল সুশোভন।

সদারঙ্গবিহারীলাল মিনিট দশেকের বেশী ছিলেন না। কিন্তু সেই দশ মিনিটেই তিনি জটটি বেশ পাকিয়ে গেলেন। গোঁসাইজি বুঝলেন যে তাঁর নবাগত অতিথিটির নাম অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে, কথাবার্ত্তা থেকে এ-ও বুঝলেন যে ইনি একজন কংগ্রেস-

কর্ম্মী। অনেকদিন থেকে সদারঙ্গবিহারীলালের একটি বদ্ধ ধারণা ছিল যে মহাত্মা গান্ধীর পাল্লায় পড়ে যদিও অধিকাংশ কংগ্রেসকর্ম্মী অহিংসাকেই স্বদেশ-উদ্ধারের পন্থা বলে ঘোষণা করে' বেড়াচ্ছেন কিন্তু সত্যি সত্যি কেউ অহিংসায় আস্থাবান নন। সুযোগ পেলেই সবাই আস্তিন গুটিয়ে ঘুঁসি তুলতে প্রস্তুত অর্থাৎ মনে মনে সবাই হিংস্র। তাই যদিও রাত অনেক হয়েছিল এবং তাঁর মোটর বাইকে 'মোবিল' ছিল না তবু এমন একটা সুযোগ ছাড়তে পারলেন না তিনি। এমন একজন নামজাদা কংগ্রেসকর্ম্মীকে এত ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়া গেছে যখন, তখন এ সন্দেহের একটা নিরসন না করে' কি ছাড়া যায়? প্রশ্ন সুরু করলেন। প্রশ্নের ধরন থেকেই কি উত্তর তিনি প্রত্যাশা করেন তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল অবশ্য। বিশেষ বেগ পেতে হল না সুশোভনকে।

"আচ্ছা, সত্যিই কি আপনি অহিংস-পন্থায় বিশ্বাস করেন নাকি? মানে, রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে বলছি। কাগজে অবশ্য আপনাদের পোষাকী বক্তৃতা অনেক পড়েছি, কিন্তু কাজ হাঁসিল করার জন্যে বক্তৃতায় অনেক সময় অনেক কথাই বলতে হয়—অ্যাঁ, কি বলেন—কিন্তু সত্যি কি আপনি বিশ্বাস করেন যে নিছক অহিংসাতেই আমাদের দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে?"

"মোটেই না"—একটু হেসে সুশোভন উত্তর দিল—"কিন্তু ও কথা বলা ছাড়া আমাদের এখন গত্যন্তর কি আছে বলুন"

"দ্যাট্‌স্ ইট্! আপনাদের অহিংস মুখোসের তলায় তাহলে—কিছু মনে করবেন না উপমাটায়—মানে—"

"না, মনে করবার কি আছে"

"আপনাদের অধিকাংশ দক্ষিণপন্থীদের আসল মনোভাব তাহলে ওই"

"আমার তো তাই বিশ্বাস"

"সত্যি? বা! আমিও বরাবর ঠিক এই কথা ভেবে এসেছি। প্রকাশ্যে আপনারা অবশ্য স্বীকার করবেন না, করতে পারেন না—"

"তা পারি কি"

"চমৎকার, চমৎকার। যাক্ সন্দেহটা মিটে গেল। অবশ্য ব্যাপারটার মধ্যে বেশ খানিকটা ইয়ে আছে, মানে ভণ্ডামিই বলতে হবে—প্লীজ একস্‌কিউজ্ মি—ঠিক জুৎসই কথাটা মনে আসছে না। মানে, বুঝতে পেরেছেন আশাকরি আমার মনের ভাবটা"

সুশোভন স্মিতমুখে চুপ করে রইল। কথা বাড়াবার ইচ্ছে আর তার ছিল না।

সদারঙ্গবিহারীলাল গলার স্বর খুব খাটো করে' হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, সুভাষবাবুর সম্বন্ধে মহাত্মাজির আসল মনোভাবটা কি বলুন তো"

"আমি—আমি ঠিক জানি না"

"আপনি জানেন না? বিশ্বাস করলাম না। অবশ্য বলতে বাধা থাকতে পারে। আছে নাকি"

"তা আছে একটু, মাপ করবেন আমাকে"

"না, না, তাহলে জোর করতে চাই না। সার্‌টেন্‌লি—"

সদারঙ্গবিহারীলাল উদ্ভাসিত মুখে সান্ত্বনার দিকে চাইলেন—চশমার লেন্স থেকে আনন্দ ঠিকরে পড়ছিল যেন।

"সত্যি ভারী আনন্দ পেলাম আপনার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করে'। আমাদের মতো লোকের সঙ্গে এমন সরলভাবে আলাপ করবেন তা কল্পনাতীত ছিল। বাঃ—বাঃ—ভারী আনন্দ হচ্ছে। সব দক্ষিণপন্থীই তাহলে মনে মনে বামপন্থী—বাঃ চমৎকার। রাগ করলেন নাকি?"

"না, রাগ করবার কি আছে এতে—ঠিকই তো বলেছেন"

"বাঃ বাঃ, ভারী খুশি হলাম। অচ্ছা এবার চলা যাক্। গোঁসাইজি সত্যি তেল নেই আপনার? একটু হলেই হবে"

"সর্ষের তেল হলে হবে?"

"সর্ষের? রাম কহো। তা কি হয়? লুব্রিকেটিং অয়েল চাই"

"আজ্ঞে না আমরা গেঁয়ো লোক, ওসব রাখি না"

সান্ত্বনার দিকে চেয়ে করুণকণ্ঠে সদারঙ্গবিহারীলাল বললেন, "বিপদে যে পড়তে হবে তা বুঝেছিলাম, বুঝলেন। কিন্তু বিপদ যে এমন ঘনীভূত হয়ে উঠবে তা ভাবি নি। একটু মোবিল না পেলে মারা যাব যে একেবারে। মাইল খানেক হেঁটে আসছি। বেশ গরম হয়ে উঠেছিল গাড়িটা। দুর্গতি যাকে বলে। পিস্টন থেকে এমন সব অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে বুঝলেন, মোটেই সুবিধাজনক নয়—শেষকালে কি —এইখানেই রাতটা—"

"আপনার হাজার অসুবিধা হলেও এখানে তো রাত্রে জায়গা দিতে পারব না আপনাকে"—একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে গোঁসাইজি বললেন—"আপনার সংকাব করতে অক্ষম আমি আপাতত। একটিমাত্র ঘর ছিল সেটি ব্রজেশ্বরবাবুরা নিয়েছেন"

সুশোভন অস্বস্তিবোধ করল একটু।

"আপনি যাবেন কোথা"—সান্ত্বনা জিগ্যেস করলে।

"ছিপছররামারি। ছিপছররামারিতেই থাকি আমি। ওই যে বললাম না, ক্যানভাস করতে বেরিয়েছি। উমেশ চৌবে লোকটা সুভাষ বোসের খুব প্রশংসা করত তাই ভেবেছিলাম লোকটা খুব ভাল, তারই হয়ে ক্যানভাস করেছিলাম প্রথমে। তারপর জনার্দ্দনবাবু আমার চোখ খুলে দিলেন—এখন দেখছি যদিও একটু ঘুঁতঘুঁতে ধরনের তবু বৈজুপ্রসাদ লোকটাই ডিজার্ভিং ক্যাণ্ডিডেট। ভুল সংশোধন করতে বেরিয়েছি তাই। অনেক ঘুরতে হল—তা হোক্। ব্রজেশ্বরবাবু আপনারও এ অঞ্চলটা একবার ঘুরে দেখা উচিত—ঐতিহাসিক মানুষ আপনি—এদিকের ইন্টিরিয়ারে চমৎকার চমৎকার পুরোনো মন্দির আছে, কতকগুলি মূর্ত্তিও। এসেছেন কখনও এদিকে আগে? আসা মুস্কিল অবশ্য। কাছে-পিঠে কোনও ষ্টেশন নেই কিনা। আপনারা বাই রোড এসেছেন নিশ্চয়—"

"হ্যাঁ, আমাদের কারটা বিগড়ে পড়ে আছে কয়েক মাইল দূরে, আমরা হেঁটে এসেছি এখানে রাতটা কাটাবার জন্যে"

"আমাকেও আপনাদের সঙ্গী না হতে হয়, কি বিপদ দেখুন তো"

"না আপনি ঠিক পৌঁছে যাবেন" আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গীতে বলে' উঠল সান্ত্বনা।

"আমিও আপনার সৎকার করতে অক্ষম আপাতত"—গোঁসাইজি বললেন।

"তা-ও বটে, ঘর খালি নেই আপনার। যদি থাকতেই হয় বারান্দায় পড়ে থাকতে হবে হয় তো—কিম্বা বাইরে—হা-হা-হা-হা"

"হা-হা-হা-হা"—জোর করে' হেসে উঠল সুশোভন।

লোকটা সত্যি সত্যি থেকে না যায়!

গোঁসাইজি ভ্রূকুটি করলেন।

"পাঁচ মাইল তো মোটে"—সান্ত্বনা বললে।

কণ্ঠ-স্বরে প্রায়-অকৃত্রিম আন্তরিকতার সুর ফুটিয়ে উৎসাহ দিল সুশোভন—"হ্যাঁ, ঠিক পৌঁছে যাবেন আপনি"

সদারঙ্গবিহারীলাল এর পর যা বললেন তা আশ্বাসজনক।

"হ্যাঁ, মোটে পাঁচ মাইল, পৌঁছে যাওয়া উচিত তো। তাছাড়া গাড়িখানা এতক্ষণে ঠাণ্ডাও হয়েছে খানিকটা, গর্মে ছিল ভয়ানক। বেরিয়ে পড়া যাক্ তাহলে, কি বলেন"

"হ্যাঁ, রাত হয়েছে, আর দেরী করা উচিত নয়"

"আচ্ছা তাহলে নমস্কার। নমস্কার সান্ত্বনা দেবী। অপ্রত্যাশিত আনন্দ পেলাম। সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল যেন। ভাগ্যে গাড়িটা খারাপ হয়েছিল তাই দেখা হয়ে গেল আপনাদের সঙ্গে। গাড়িটা কিন্তু ঘাবড়ে দিয়েছিল বেশ। মনে হচ্ছিল ইন্‌লেট্ ভালভের স্প্রিংই গেছে বুঝি একটা। এখন বুঝতে পারছি ওভারহিটেড্ হয়েছিলাম। মিকশ্চারটা আর একটু রেগুলেট করে' নিতে হবে তার মানে। একটু 'রিচ্' হয়ে গেছি সম্ভবতঃ। আচ্ছা, নমস্কার তাহলে নমস্কার—"

ঝুল-কালি-মাখা হাত তুলে সবাইকে নমস্কার করলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"বড় আনন্দ পেলাম। আবার আলাপ আলোচনার সুযোগ ঘটবে আশা করি শিগগির। আপনাদের মতো লোকের সঙ্গে আলাপ করলে মনের রঙই বদলে যায়। চমৎকার। আচ্ছা চলি, নমস্কার। নমস্কার সান্ত্বনা দেবী"

"নারায়ণের কৃপায় পৌছে যান ভালয় ভালয়। আমার এখানে স্থান নেই মোটে"

গলা-খাঁকারি দিয়ে কথাটা মনে করিয়ে দিলেন আবার গোঁসাইজি।

"খানিকটা গিয়ে বাইক যদি ফেল করে তাহলেও দেবেন না"

"আপনার হার্ট যদি ফেল করে তাহলেও দেব না, মানে দিতে পারব না। স্থানাভাব। গোড়া থেকেই বলছি তো সৎকার করতে অক্ষম আমি আপাতত।"

"তাহলে যা থাকে কপালে বলে' বেরিয়ে পড়া যাক্ এইবার। কি বলেন! গাড়িটা ঠাণ্ডাও হয়েছে, আর বেগ দেবে না বোধ হয় আশা করি"

সদারঙ্গবিহারীলাল মরীয়া হয়ে অগ্রসর হলেন দ্বারের দিকে। একটু এগিয়েই ফিরলেন আবার।

"আচ্ছা তাহলে নমস্কার সান্ত্বনা দেবী, নমস্কার ব্রজেশ্বরবাবু। বাঃ বাঃ চমৎকার কুকুরটি তো—খাসা। কি সুন্দর লোম। আপনার কুকুর বুঝি সান্ত্বনা দেবী—বাঃ"

সান্ত্বনা মাথা নেড়ে জানালে যে ঝুমু তারই কুকুর।

"বাঃ—"

সদারঙ্গবিহারীলাল একটু ঝুঁকে ঝুমুকে আদর করলেন। ঝুমু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে মনিবের দিকে তাকালে একবার। তারপর হাঁচলে।

"বাঃ, সুন্দর কুকুরটি। আচ্ছা, চলি তাহলে এবার, নমস্কার। ঝুমু, চলি বুঝলে, নমস্কার"

গোঁসাইজি গলা-খাঁকারি দিয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন এবং দরজাটা খুলে দিলেন ভাল করে'।

"এতক্ষণে গাড়িটা ঠাণ্ডা হয়েছে আশা করি। হওয়া উচিত অন্ততঃ, আচ্ছা চলি এবার, নমস্কার তাহলে"

গোঁসাইজির রগের শিরাগুলো ফুলে উঠেছিল। একটি কথা না বলে নীরবে তিনি তাঁর অনুগমন করলেন। সুশোভন সান্ত্বনার দিকে চেয়ে ম্লান হাসি হাসলে একটু। ভোজকাজের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া চুকে যাবার পর বাড়ির গিন্নির যে রকম মুখভাব হয় সান্ত্বনার মুখভাব অনেকটা সেই রকম হয়ে উঠেছিল। দড়াম করে, সদর দরজা বন্ধ হবার শব্দ পাওয়া গেল। গোঁসাইজি ফিরে এলেন। তাঁর দুই ভ্রূর মাঝখানে গভীর দু'টি রেখা ফুটে উঠেছে।

."আপনি তাহলে কংগ্রেসের লোক একজন"

সুশোভন রুমালটা বার করে' নাক ঝাড়তে লাগল। সান্ত্বনাই জবাব দিলে।

"হ্যাঁ, আমার স্বামী একজন কংগ্রেসকর্মী"

"ও, আমি ধরতে পারি নি ঠিক। আপনি কোন দিকে ?"

"কিসের কোন দিকে—মানে আপনি যে দিকে—মানে"

"আপনি অফিস অ্যাক্‌সেপ্‌টান্সের স্বপক্ষে না বিপক্ষে"

সুশোভন ভ্রূকুঞ্চিত করে' গোঁসাইজির দিকে চকিতে দৃষ্টিপাত করলে একবার। তার মনে হল গোঁসাইজির মতো লোকের অফিস অ্যাক্‌সেপ্‌টান্সের স্বপক্ষে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

"আমি স্বপক্ষে"

"ও, স্বপক্ষে! বটে—"

ওষ্ঠ দ্বারা অধরকে নিষ্পিষ্ট করে' গুম হয়ে গেলেন গোঁসাইজি। তাঁর চক্ষুর দৃষ্টি থেকে যা বিচ্ছুরিত হতে লাগল তা ক্রোধ ও ব্যঙ্গের এক অস্বস্তিজনক সমন্বয়।

"সিংহাসনে সবাই বসতে চায়। চাওয়াটাই স্বাভাবিক" এইটুকু বলে' একটু থেমে "হ্যাঃ" বলে' গোঁসাইজি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। তার পর কি মনে হল

হঠাৎ ঘুরে বললেন—"সিংহাসনে বসছেন বসুন, কিন্তু ঘুস নেওয়াটি বন্ধ করতে পারবেন ? এই যে আপাদমস্তক সবাই চোর, দিনদুপুরে পুকুর চুরি করছে তার হিল্লে করতে পারেন যদি তাহলেও বুঝব কাজ করলেন একটা"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক ওই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি ঢুকতে চাই"

"ভাল। আমার অ্যাডমিশন রেজিস্টারে যখন নাম লিখবেন তখন নিজের পরিচয়টাও লিখে দেবেন দয়া করে। একজন বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী আমার হোটেলে পদার্পণ করেছিলেন এ নজির পাঁচজনকে দেখাবার মতো"

পুনরায় অধর দিয়ে ওষ্ঠকে চাপলেন। সুশোভন সান্ত্বনার দিকে চেয়ে মুখে একটা প্রশংসা-সঙ্কুচিত হাসি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু পারলে না ঠিক।

সান্ত্বনার দিকে চেয়ে গোঁসাইজি বললেন, "আপনারা শোবেন কখন। আমাদের এখানে সকাল সকাল শোওয়াই নিয়ম"

"বেশ তো, বলেন তো এখনি যেতে পারি"

সান্ত্বনা ঝুঁকে ঝুমুকে কোলে তুলে নিলে। গোঁসাইজি শিউরে উঠলেন।

"ও কি, কুকুর নিয়ে যাচ্ছেন কোথা"

"শুতে"

"ও আপনার সঙ্গে শোবে !"

"হ্যাঁ, কেন"

"এক বিছানায় ?"

গোঁসাইজির কণ্ঠস্বরের গ্রাম দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল।

"তাই তো শোয় বরাবর"

"আপনি ব্রজেশ্বরবাবু আর কুকুরটা সবাই এক বিছানায় শোয় বরাবর !"

"নিশ্চয়। এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন। আপনার আপত্তি আছে নাকি"

"আপত্তি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করছেন !"

তার পর সুশোভনের দিকে প্রায় চীৎকার করে' জিজ্ঞাসা করলেন—"এই কুকুরটার সঙ্গে শোন আপনি !"

"আমি—মানে হ্যাঁ, তা শুই বই কি। বাচ্চা বেলা থেকে পুষেছি কিনা—"

গোঁসাইজির দৃষ্টি থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুল। অষ্টধাতু-অঙ্গুরীশোভিত তর্জ্জনী তুলে বললেন—"এখানে শোবার ঘরে কুকুর নিয়ে যাওয়া চলবে না। এ খৃষ্টান হোটেল নয়, হিন্দু পান্থনিবাস। কোন ভদ্রলোক যে কুকুর নিয়ে এক বিছানায় শুতে পারেন তা ধারণারই অতীত ছিল আমার—"

সুশোভনের ধৈর্য্যরক্ষা করা এমনিতেই কঠিন হয়ে উঠেছিল, এ কথা শুনে সে ঈষৎ চটেই উঠল।

বলে উঠল—"আপনার ধারণার সীমা সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল নেই আমাদের। আমাদের কুকুর নিয়ে শোয়াই অভ্যাস"

"অভ্যাস ? এই ম্লেচ্ছ অভ্যাসের কথা জোর গলায় বলছেন আবার ! আপনি একজন কংগ্রেসকর্ম্মী না ? ও কথা বলতে লজ্জা করে না আপনার"

"কেন, কংগ্রেসকর্ম্মীর কুকুর নিয়ে শুতে বাধা কি"

"এই কি স্বদেশী আচরণ ? যাই হোক আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না, আমার ঘরে আমি কুকুর ঢুকতে দেব না, সোজা কথা"

"অদ্ভুত হোটেল আপনার !"

"এটা হোটেল নয়, হিন্দু পান্থনিবাস—দয়া করে' মনে রাখবেন সেটা"

বেগতিক দেখে সান্ত্বনা বলল—"বেশ তো এত আপত্তি যখন, আপনার ঘরে না হয় না-ই নিয়ে গেলাম। কিন্তু ঝুমসোনার শোবার ব্যবস্থা করে দিন একটু"

"ঝুমসোনা। ওই কুকুরের নাম নাকি"

"হ্যাঁ। রাত্রে কোথায় রাখি একে"

"পিছনে একটা পোড়ো গোয়াল আছে তাতেই থাকতে পারবে স্বচ্ছন্দে"

"বেচারা !"

ঝুমুর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে' গোঁসাইজি বললেন, "গোয়ালের কোনে খড়ও আছে কিছু। খাসা থাকবে। আপনাদের বিছানায় ঢুকে গুঁতো-গুঁতি করার চেয়ে আরামে থাকবে। কি আপদ"

ঝুমুর লোমে হাত বুলিয়ে একটু আবদারের সুরে সান্ত্বনা শেষ চেষ্টা করলে আর একবার।

"একা থাকা অভ্যেস নেই, কাঁদবে হয়তো"

"কাঁদুক। গোয়ালঘর থেকে ওর কান্না শোনা যাবে না"

"আমাদের ঘরের মেঝেতে যদি শোয়াই ?"

"না, শোবার ঘরে আমি কুকুর ঢুকতে দেব না। ফদকাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে ওটাকে গোয়ালঘরে রেখে আসুক গিয়ে। আর আপনি অ্যাডমিশন রেজিস্টারে নাম সই করে' তবে শুতে যাবেন"

কমানো বাতিটা উসকে দিয়ে সুশোভনের দিকে চেয়ে গোঁসাইজি ফদকাকে ডাকতে গেলেন।

"দেখ সান্ত্বনা, বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। তোমার স্বামীর নাম আমি জাল করতে পারব না। সীমা অতিক্রম করছে"

"বেশ, আমিই লিখে দিচ্ছি। অর্দ্ধাঙ্গিনীর আশা করি স্বামীর নামে নিজেকে চালাবার অধিকার আছে, অর্দ্ধেক অধিকার অন্ততঃ থাকা উচিত আইনত"

"নিশ্চয়"

"খাতাটা কোথা—"

"এই যে। তবে আমি আর এক কাজ করলেও পারি। এমনভাবে হিজিবিজি করে' লিখে দিতে পারি যে কাউকে আর তা পড়তে হবে না"

"দরকার নেই, আমিই লিখে দিচ্ছি"

খাতাটা খুলে সান্ত্বনা লিখতে লাগল।

"ব্রজেশ্বর দে। তারিখ ১৮ই সেপ্টেম্বর—বাস্"

"নামের পর উইদিন ব্রাকেট লেখ কংগ্রেসকর্মী। না লিখলে ভয়ানক কাণ্ড করবে"

সান্ত্বনা মুচকি হেসে তাও লিখে দিলে।

"রুম নম্বরের ঘরে কি লিখি? নম্বর তো জানি না"

"চেপে যাও"

চেপে যাওয়ার কিন্তু উপায় রইল না। কলমটি রাখার সঙ্গে সঙ্গে গোঁসাইজি এসে প্রবেশ করলেন এবং প্রবেশ করেই ঝুঁকে অ্যাডমিশন রেজিস্টারটি পর্য্যবেক্ষণ করলেন। তার পর স্থশোভনের দিকে ফিরে বললেন, "এই ঘরে লিখুন—টু। আপনাদের রুম নম্বর টু"

স্থশোভন কলমটি তুলে ভালমানুষের মতো 'টু' লিখলে, তারপর সান্ত্বনার দিকে ফিরে সলজ্জভাবে হাসলে একটু।

"ওরে ফদকা, কোথা গেলি আবার, কুকুরটাকে গোয়ালে রেখে আয়। কামড়াবে না তো"

"না, ঝুমু ভারী লক্ষ্মী। আহা বেচারীকে কোথায় পাঠাচ্ছেন নির্ব্বাসনে"

বলা বাহুল্য সান্ত্বনার ঈষৎ অনুনাসিক আবদারমাখা এই অনুযোগে গোঁসাইজি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না।

ফদকা এসে ঝুমুকে নিয়ে চলে গেল। গোঁসাইজি ধূমাঙ্কিত হ্যারিকেনটি স্থশোভনের দিকে তুলে ধরে' বললেন, "এবার তাহলে শুয়ে পড়ুন আপনারা। এটা নিয়ে যান, কমিয়ে রেখে দেবেন, তেল বেশী নেই। আপনারা ওঠেন ক'টায়?"

"আজ বোধহয় দেরি হবে উঠতে। সমস্ত দিন পরিশ্রান্ত আছি কিনা"

"শুয়ে পড়ুন তাহলে, আর দেরি করবেন না"

হরিমটর হিন্দু পান্থনিবাসের রুম নম্বর 'টু'টি গঠনশিল্পের একটি অদ্ভুত নিদর্শন বলে' মনে হল স্থশোভনের। দ্বারটি সঙ্কীর্ণ। এত সঙ্কীর্ণ যে দু'জন লোকের পক্ষে পাশাপাশি ঢোকা অসম্ভব। জানালাগুলি চতুষ্কোণ ঘুলঘুলি বিশেষ। কিন্তু কোনও

অজ্ঞাত এবং অদ্ভুত উপায়ে এই ঘরের মধ্যেই বৃহদাকৃতি এত আসবাবপত্র সমাবিষ্ট হয়েছে যে মেজে বলে' কোনও কিছু আর অবশিষ্ট নেই। যা আছে তা খাট, আলমারি, ড্রেসিং-টেবল প্রভৃতির মাঝে মাঝে গলির মতো জায়গা সম্ভবতঃ আসবাবপত্রগুলি খণ্ডীকৃত অবস্থায় ঘরে ঢুকিয়ে তারপর ফিট করা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলির নিরেট চেহারা দেখলে সে সম্ভাবনার কথাও মন থেকে তিরোহিত হয়ে যায়। মেজের অধিকাংশ স্থানই দখল করে' আছে জগদ্দল একটি ছাপ্পর খাট। মজবুত কাঁটাল কাঠের তৈরি। খাটের উপর একটি গদি, গদির উপর একটি পাংশুবর্ণের চাদর। গদিটির প্রকৃত অবস্থা যে কি তা চাদর না তুলেই স্থানে স্থানে উটের পিঠের মতো উঁচুউঁচু ঢিবিগুলি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল বেশ। দেওয়ালে ছবি ছিল। ক্যালেণ্ডার থেকে কেটে নেওয়া দেব-দেবী মূর্ত্তি। বিছানার শিয়রের দিকে মজবুত-ফ্রেমে-বাঁধানো অন্য আর একটি বেশ বড় ছবিও ছিল অবশ্য—রুদ্রমূর্ত্তি দুর্ব্বাসা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিচ্ছেন।

সুশোভন এবং সান্ত্বনা পরস্পরের দিকে নীরবে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর একসঙ্গে হেসে উঠল দু'জনেই। সুশোভন ব'লে উঠল—"বাপস্‌, শুতে এসেও নিস্তার নেই, শিয়রের কাছে ওই দুর্ব্বাসা তর্জ্জনী তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে। কি সর্ব্বনাশ"

"শুনুন" সান্ত্বনা বললে, গোঁসাইজি শুয়ে পড়লেই আপনি নেমে যান আস্তে আস্তে। যে ঘরটায় আমরা খেলাম সেই ঘরেই রাতটা কাটিয়ে দিন কোনক্রমে। আশা করি আপনার খুব বেশী কষ্ট হবে না"

"তোমারও হবে না আশা করি। কিন্তু দেখ সান্ত্বনা, আমার খুব ভাল ঠেকছে না। ব্যাপার যদি গড়ায়, অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াবে কিন্তু"

"কি যে বলেন! এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে আসছেই বা কে, আর এলেও এই হোটেলের খাতা উলটে দেখতেই বা যাচ্ছে কে। আর দেখলেই বা কি, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে এখানে একরাত্রি কাটিয়ে গেছি এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে"

"কিন্তু ব্রজেশ্বরবাবু জানতে পারলে কি ভাববেন"

"কি আবার ভাববেন, আমাদের কাণ্ড শুনে বড় জোর হাসবেন একটু"

"দেখ ঠিক তো"

"এটা ঠিক যে আপনি যা ভয় করছেন সে রকম কিছু তিনি মনে করবেন না। ব্যাপারটা বুঝবেন"

সান্ত্বনা ঘাড়টা একদিকে হেলিয়ে সুশোভনের দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করে' গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, "আশা করি অনীতা দেবীও বুঝবেন"

"অনীতা? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, বাঃ নিশ্চয়ই সমস্ত শোনবার পর বুঝবেন বই কি"

"ব্যাস তবে তো মিটেই গেল। ব্যাপাব গড়ালেই বা"

সুশোভন তবু যেন কেমন নিশ্চিন্ত হল না।

"কিন্তু ওই দুর্দ্দমনীয় ব্যক্তিটি—ওই জগঝম্প না কি নাম ভদ্রলোকের—"

"সদারঙ্গবাবু? ওর জন্যে ভাবনা নেই। এর পর দেখা হলে সব খুলে বলব ওঁকে। খুশী হবেন, ভাবী আমুদে লোক—"

"আমার কিন্তু দেখে মনে হল, উনি ঠিক সেই জাতীয় বেকুব অথচ মহাপুরুষ লোক যাঁরা অস্থানে অকারণে অকার্য্য করে' অঘটন ঘটিয়ে বেড়ান। অর্থাৎ 'অ' এর অনুপ্রাস আরও অনুসরণ করলে বলতে হয় আস্ত একটি অজ। তাছাড়া আমার আর একটা সন্দেহ হচ্ছে, উনি অনীতা এবং অনীতার বাপের বাড়ীর লোকেদের চেনেন। মনে হচ্ছে…"

"অনীতার বাপের বাড়ীর লোকদের?"

সান্ত্বনার অধরে মৃদু একটা হাসির ঢেউ উঠেই মিলিয়ে গেল।

"তা চিনলেই বা ক্ষতি কি। ওর জন্যে আপনার চিন্তা নেই। সদারঙ্গবাবুকে সব খুলে বললে তিনি কি বুঝবেন না? সে ভার আমার উপর রইল"

"তোমার জন্যেই আমার চিন্তা" সুশোভন বললে।

"চিন্তা করবার দরকার নেই তাহলে"—হেসে জবাব দিলে সান্ত্বনা—"আপনি বরং আস্তে আস্তে বেরিয়ে দেখুন একটু গোঁসাইজি শুলেন কি না। আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না, একটু হাত পা ছড়াতে পারলে বাঁচি"

কেবল সুশোভন এবং সান্ত্বনাই যে সদারঙ্গবিহারীলালের সম্বন্ধে চিন্তা করছিল তা নয়, গোঁসাইজিও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বাইরের কপাটে তালা লাগিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি ক্ষণকাল। কি মনে হওয়াতে তালাটা খুললেন আবার। কপাট খুলে গলা বাড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে রইলেন। না, মোটরবাইকের কোনও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। গোয়ালঘর থেকে ঝুনুর করুণ কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোনও শব্দ কানে এল না। কপাট বন্ধ করে' পুনরায় তালা লাগালেন এবং সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ নিরাপদ হবার জন্য বৈঠকখানা ঘরটাতেও তালা লাগিয়ে, তালাটা টেনে দেখে চাবির গোছাটা নিয়ে উপরে উঠে গেলেন নিজের শোবার ঘরে।

(৯)

সুশোভন সন্তর্পণে বাইরে এসে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খড়মের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। গোঁসাইজি উপরে উঠছেন। ঘরে ঢুকে কপাট বন্ধ করলেন। খিল দেওয়ার শব্দও পাওয়া গেল।

"ভদ্রলোক শুলেন বোধ হয় এবার, বুঝলে"—কপাটের বাইরে দাঁড়িয়ে নিম্নকণ্ঠে এইটুকু জানিয়ে সুশোভন নীচে নেমে গেল।

সান্ত্বনা ইতিমধ্যে অন্য ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিল। কাপড় চোপড় না ছেড়ে শুলে ঘুমই হয় না তার। যে সুটকেসটি সুশোভন বয়ে এনেছিল সেটি ফদকা দিয়ে গিয়েছিল শোবার ঘরে। তার থেকে কাপড় ব্লাউজ প্রভৃতি বার করে' পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনের প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলি অর্থাৎ সেমিজের বোতাম-খোলা-জাতীয় কাজগুলি সবে শেষ করেছে, এমন সময় কপাটের কাছে খুট করে শব্দ হল। এক লাফে সে একটা আলমারির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

"কে, সুশোভনবাবু"

হ্যাঁ। আসব ভিতরে ?"

"না। আসবেন মানে ?"

"গত্যন্তর নেই"

"থামুন একটু তাহলে"

"বেশ"

"গত্যন্তর নেই মানে ? বুঝতে পারলাম না"

"যে ঘরে আমরা খেয়েছিলাম সে ঘরে শোয়া যাবে না"

"কি যে বলেন"···সান্ত্বনার কণ্ঠস্বরে একটু উত্তাপ সঞ্চারিত হল যেন ·· "এর মধ্যেই কি করে' বুঝলেন যে শোয়া যাবে না। মিনিট তিনেকও তো হয় নি এখনও। চেষ্টা করে' দেখুন ঠিক ঘুমুতে পারবেন"

"হয়তো পারতাম। কিন্তু চেষ্টা করবার 'স্কোপ' নেই। গোঁসাইজি সে ঘরটিতে তালা লাগিয়ে চাবিটি নিয়ে শুতে গেছেন। সে চাবি এতক্ষণ বোধ হয় তাঁর বালিশের তলায়"

"ওমা, তাই নাকি ? মুসকিল হল তো। কোথায় শোবেন তাহলে"

"তাই তো ভাবছি"

"করতেই হবে যা হোক্ একটা ব্যবস্থা। এ ঘরে তো আসা চলবে না"

"কপাটটা খুলি একটু ? একটু···"

"না"

"কথা কইবার সুবিধা হত। আর কিছু নয়"

"কথা ক'য়ে কাটাবেন নাকি সারারাত"

"একটু খুলি কি বল। চোখ বুজে থাকছি না হয়। সামান্য একটু। খুলতে আপত্তি কি"

"না না, যতক্ষণ না বলি খুলবেন না। দাঁড়ান না একটু। আমি কাপড় ছাড়ছি"

"উঃ কি যন্ত্রণা"

অস্ফুট কণ্ঠে বললে সুশোভন।

"সিঁড়ির উপরে গিয়ে একটু বসুন না, দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হয় যদি"

"কতক্ষণ"

"মিনিট পাঁচেক"

"ঠিক করব কি করে", আমার হাতঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে"

"তাহলে এক থেকে পাঁচশ' পর্য্যন্ত গুনুন বসে বসে"

"বল কি। ছেলেবেলায় উদ্দালকের গল্প শুনেছিলাম, তাই করলে দেখছি শেষ পর্য্যন্ত"

"কি যে ছেলেমানুষি করছেন। বিপদের সময় মাথা ঠিক রাখুন"

"মাথা আমার ঠিকই আছে, তার জন্যে ভাবনা নেই"

"তাহলে অমন করছেন কেন, সিঁড়িতে বসুন গিয়ে"

"কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে জোরে"

"সিঁড়ির উপরই কাটাতে হবে হয়তো আজ রাতটা। তবে ভিতরে এসে গল্প করতে পারেন একটু। একটু থামুন, আমি কাপড়টা ছেড়ে বিছানায় উঠে পড়ি তারপর আসবেন"

"গোঁসাইজি যদি হঠাৎ বেরিয়ে এসে দেখেন আমি সিঁড়ির উপর গুঁড়ি মেরে বসে' এক দুই গুণে যাচ্ছি, কি ভাববেন তিনি"

"ঢেউ দেখেই নৌকা ডোবাচ্ছেন কেন আগে থাকতে"

"নৌকোডুবির ব্যাপার যাতে না ঘটে, সেই চেষ্টাই তো করছি সকাল থেকে"

বিরক্ত হয়ে সুশোভন সিঁড়ির উপর গিয়ে বসল। সিঁড়ির উপর বসে' একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বেচারা। নৈশ-সমীরণ বাহিত হয়ে এই দীর্ঘনিশ্বাসটি যদি পূর্ব্বদিকে ভেসে যেত তাহলে আর একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে হয়তো দেখা হত তার। কোলকাতায় তার বাড়ীর সিঁড়িতে বসে' অনীতাও ঠিক এই সময় দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করছিল।

……সিঁড়িতে বসে' বসে' সুশোভনের বাঁ পাটায় থাল ধরে' গেল। একটু চটেই উঠে দাঁড়াল সে। এতক্ষণেও শোয়া হয় নি? হোক্ মেয়েমানুষ…… বিছানায় শুতে এত দেরি হবে……আশ্চর্য্য কাণ্ড! উঠে গিয়ে দুয়ারে নখ দিয়ে আঁচড়ালে। কড়া নাড়তে এমন কি টোকা মারতেও ভয় করছিল। গোঁসাইজি যদি উঠে পড়েন। সান্ত্বনার কোনও সাড়াই পাওয়া গেল না। তারপর কপাটটা একটু ফাঁক করতেই…

"থামুন, হয় নি এখনও। বসুন না গিয়ে আর একটু—"

"আমি এইখানেই অপেক্ষা করছি, তোমার যখন হবে বোলো"

"অত শব্দ কিসের"—পরমুহূর্ত্তেই প্রশ্ন করলে সে… "কি হল"

"আমি বিছানায় উঠছি। স্প্রিং দেওয়া গদি, তারই শব্দ"

"বাসন্তী শব্দ? বাবা।"

"বাসন্তী শব্দ মানে"

"বি-এ পাশ করেছ, স্প্রিং মানে বসন্ত জান না!"

"আসুন আপনি"

সান্ত্বনা বিছানার উপর বসে ছিল। চুলটি আঁচড়ে শাদা শান্তিপুরে শাড়িটি পরে' বেশ দেখাচ্ছিল তাকে। একটু সানুকম্প হাসি হেসে ডাগর চোখের দৃষ্টি তুলে সুশোভনের দিকে চেয়ে দেখলে সে। সুশোভনের দৃষ্টি থেকে বিচ্ছুরিত হল শিল্প-সমালোচকের কৌতূহল। বিছানার একপ্রান্তে অনাহূতই বসল গিয়ে সে।

"কাপড় ছেড়ে বেশ দেখাচ্ছে তোমাকে,"

"তা হয় তো দেখাচ্ছে, কিন্তু এই কথা বলতেই আসেন নি আশা করি"

"না, না, কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সত্যিই তোমায় মানিয়েছে ভালো। তোমার প্রসাধন-রুচি সরল হলেও শিল্পীজনোচিত—"

"সমস্ত দিনের এত দুর্গতির পরও আপনার রসবোধ অক্লান্ত আছে দেখছি। আমার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে"

"বেশ তো ঘুমোও না, মানা করছে কে। সাদা শাড়িটা হঠাৎ ভাল লেগে গেল তাই বললাম। অনীতা কখ্‌খনো শাদা শাড়ি পরে না, ডগমগে রঙ ছাড়া পছন্দই হয় না তার। সেদিন একখানা শাড়ি কিনেছে মেরুন রঙের সোনালি জরির পাড়-বসানো। জমকালো ব্যাপার। বললে বিশ্বাস করবে না, দিগ্বিজয়-বাবুর ওখানে যাবে বলে ছ'খানা শাড়ি নিয়েছে সবগুলোই রঙীন, আর কোনটাই ফিকে রঙ নয়—"

সান্ত্বনা ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে' ঘাড়টা কাত করলে একটু।

"একটা কথা আপনার মনে রাখা উচিত। অনীতা যা করে, আপনাকে খুশি করবার জন্যেই করে। তার এত মাথা-ঘামিয়ে শাড়ি পছন্দ করা যে এমন ভাবে মাঠে মারা গেছে তা বোধহয় বেচারি ঘুণাক্ষরেও জানে না"

সুশোভনের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। উসখুস করে' নড়ে' চড়ে' বসল সে।

"আমাকে কি তাহলে গোয়াল ঘরে গিয়ে ঝুমুর সঙ্গে শুতে হবে?"

"তাই যান তবে। এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি আছে—"

সুশোভন নিজের ডান কানটা টানতে টানতে অভিনিবেশ সহকারে সান্ত্বনার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"আচ্ছা, ঘণ্টা খানেক কি ঘণ্টা দুই এই ঘরের মেজেতে যদি একটু গড়িয়ে নি—"

"কি যে বলেন—"

"আচ্ছা, এ কি কুসংস্কার তোমাদের! আমি তোমাকে 'কারে' 'লিফ্‌ট্' দিলে দোষ হয় না, তোমার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেলে দোষ হয় না, তোমার সঙ্গে এক বিছানায় বসতেও দোষ নেই। কেবল এই মেজেতে শুলেই চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে! আশ্চর্য্য! তোমার খাটের উপর পা তুলব না, সত্যি বলছি খাটের ত্রিসীমানায় যাব না"

"যা হয় না—হতে পারে না—তা নিয়ে কেন বৃথা সময় নষ্ট করছেন"

"কমরেডদের মধ্যেও হয় না? রাশিয়ায় তো হয় শুনেছি"

"এটা রাশিয়া নয়, বাংলা দেশ"

"ও"

সুশোভন নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সান্ত্বনার দিকে। মাথার কাপড় সরে' গেছে খোঁপাটা এলিয়ে পড়েছে। লণ্ঠনের মৃদু আলোতে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। মনে হচ্ছিল একটা নিষ্ঠুর আনন্দে চোখ দুটো জলজল করছে তার। সত্যি ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল।

"আচ্ছা, চললাম তাহলে—"

"বিশ্বাস করুন, আপনার জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে আমার—"

"হ্যাঁ, তোমার মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে বটে—"

"কি করব বলুন উপায় নেই। সমাজে বাস করি যখন, লোকাচার মেনে চলতেই হবে"

"এখন এই ঘরে সমাজ কোথায়। ঘণ্টা খানেক বড় জোর ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করলেই আমার—"

"না মাপ করুন সুশোভনবাবু। একবার এই করতে গিয়ে কি বিপদে পড়েছিলাম মনে নেই। আপনার তো মনে থাকা উচিত"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ছে। বুঝেছি। আচ্ছা যাচ্ছি আমি। হ্যাঁ···ঠিক। কি বিপদ—আচ্ছা চলি—"

দ্বার পর্য্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়াল সে আবার। তারপর হেসে বললে—"তখন আর এখনে কিন্তু তফাত আছে অনেক। এখন আমি তুমি এবং ব্রজেশ্বরবাবু ছাড়া এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কারও অধিকার নেই"

"কেন অনীতার?"

"হ্যাঁ অনীতারও অবশ্য আছে"

"দেখুন যুক্তি দিয়ে এসব ব্যাপারের মীমাংসা হয় না। আপনি যুক্তির অবতারণা করে' স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন আমি যদি শুধু সেমিজ পরে হ্যারিসন

রোড দিয়ে হেঁটে যাই কার কি বলবার থাকতে পারে। কিন্তু পাঁচজনের মুখ বন্ধ হবে না তাতে”

“সত্যি যদি সাহস করে’ যাও, আমার মনে হয় না এ নিয়ে খুব একটা আন্দোলন করবে লোকে—”

সান্ত্বনা মুচকি হেসে বললে—“আপনার শোবার কষ্ট হল তার জন্যে খুবই দুঃখিত আমি। আর ওই মেজেতে শুলেই কি আরাম পাবেন আপনি? ওর চেয়ে গোয়াল ঘরে শোয়া ঢের ভাল।”

সুশোভন ঘরের চার দিকে চেয়ে দেখলে একবার।

“আমার বিশ্বাস এখানে শুলে একটু ঘুম হত। একটা ‘রাগ’ আর একটা বালিশ পেলে বেশ একঘুম দিয়ে নিতে পারতাম ওই কোণের দিকটায়”

“‘রাগ’ আর বালিশ দিচ্ছি আপনাকে। ওগুলো নিয়ে আপনি গোয়ালেই যান, সেখানেও বেশ ঘুমুতে পারবেন”

“অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু শব্দটব্দ শুনে গোঁসাইজি যদি উঠে আসেন, তাহলে বালিশ-বগলে আমাকে ঝুনুর কাছে দেখে ভাববেন কি”

“কি আবার ভাববেন”

“একটা কথা ভুলে যাচ্ছ কেন যে গোঁসাইজির চক্ষে আমরা স্বামী-স্ত্রী। যদি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে আমরা তাঁর সঙ্গে চাতুরী খেলছি তাহলে দু’জনকেই এই রাত্রে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। কিছু শুনবে না লোকটা। অ্যাডমিশন রেজিস্টারে আমরা স্বামী-স্ত্রী বলে’ নাম সই করেছি। আর সেই ভদ্রলোক—গুম্ফ গোবিন্দ না কি যেন—”

“সদারঙ্গবিহারীলাল?”

“হ্যাঁ, তিনি আমাদের স্বামী-স্ত্রী বলে’ জেনে গেছেন। জানাজানি হয়ে গেলে তোমার স্বামীর কাছে যে এর কি জবাবদিহি করব জানি না”

“সে আমি করব। আপনাকে করতে হবে অনীতা দেবীর কাছে”

সুশোভনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল একটা।

"ব্রজেশ্বরবাবু আর অনীতা এ দু'জনের সম্বন্ধে যদি আমাদের চিন্তা না থাকে তাহলে আর কে কি মনে করবে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি। আর এতক্ষণ আমরা যা করেছি তাতে ওরা যদি কিছু মনে না করে তাহলে আমার মেজেতে শোয়াটাও ওরা আশা করি অনুমোদন করবে। ওরা অমানুষ নয় তো। নিতান্ত বাধ্য হয়ে যে একাজ করেছি তা বোঝবার মতো সহৃদয়তা ওদের নেই? ওই ড্রেসিং টেবিলের তলায় মাথা গুঁজে আর ছাপ্পর খাটের তলায় পা চালিয়ে শোয়াটা যে আরামের নয় তা কি ওরা বুঝবে না? নিতান্ত বাধ্য হয়েই শুতে হচ্ছে। স্বপ্নের ঘোরে জখমও হয়ে পড়তে পারি; হাসছ কি, খুবই সম্ভব সেটা।"

সান্ত্বনা মুচকি মুচকি হাসছিল।

"উনি অবশ্য কিছু মনে করবেন না।"

"বাস তাহলে তো হয়েই গেল। আমার স্ত্রীর ঝক্কি আমি সামলাব।"

"উনিও মোটেই কানপাতলা লোক নন। তাছাড়া আমার যাতে কষ্ট হতে পারে এমন কোন কাজ মরে গেলেও করবেন না উনি। আড়ালেও আমার সম্বন্ধে কখনও কোন কটু মন্তব্য করেন না।"

"আমিও করি না। অনীতাকে আমি যত ভালবাসি এত বোধহয় কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বাসে না। সত্যি বলছি বড্ড ভালবাসি। যাক্ বালিশ আর 'রাগ' দাও তাহলে, চেষ্টা করে' দেখি ঘুম হয় কিনা—"

"কপাটে খিল দিন"

খিল দিতে গিয়ে সুশোভন আবিষ্কার করলে যে খিলটি ভাঙা।

"ভালই হয়েছে এক হিসেবে"

মুচকি হেসে সান্ত্বনা পাশ ফিরে শুল।

* * * * * *

"সুশোভনবাবু"

"অ্যাঁ—কি"

"ঘুমুচ্ছেন ?"

"কেন"

ড্রেসিং টেবিলের তলা থেকে সন্দিগ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল সুশোভন।

"কিছু মনে করবেন না, জানালাটা যদি খুলে দেন দয়া করে'। আমি শোবার সময় খুলতে ভুলে গেছি"

"জানালা খুলে কি হবে! হু হু করে' হিম ঢুকবে যে ঘরে। আমাকে মেরে ফেলতে চাও নাকি"

"সব জানালা বন্ধ। বাইরের হাওয়া একটু ঢোকা দরকার"

"ঘরে যা হাওয়া আছে তাই তো যথেষ্ট মনে হচ্ছে আমার। আবার বাইরের হাওয়া কেন"

"জানালা খুলে না শুলে সকালে মাথা ধরে থাকে আমার। খুলে দিন লক্ষ্মীটি"

"ও। আচ্ছা দিচ্ছি তাহলে। দাঁড়াও উঠি আগে। রীতিমত কসরৎ করতে হবে। এই ড্রেসিং টেবিলের তলা থেকে মাথাটা বার করাই মুস্কিল, তারপর আলমারির তলা থেকে হাতটা—"

জানালা খুলে মিনিট দুই পরে সুশোভন আবার মেঝের উপর এসে বসল, অস্ফুটস্বরে গজগজ করতে করতে হাত থেকে ধুলা ঝাড়লে, তারপর নিজের ওভারকোটটি গায়ে দিয়ে ড্রেসিং টেবিলের তলায় মাথা গলিয়ে শুয়ে পড়ল আবার। মনে হল সান্ত্বনা নিদ্রাজড়িতকণ্ঠে 'ধন্যবাদ' না কি একটা বললে। তারপর নীরবতা ঘনিয়ে এল আবার, সান্ত্বনার মৃদু নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। হঠাৎ নৈশ নীরবতা বিদীর্ণ করে' ঝুন্নুর করুণ আর্ত্তনাদ শোনা গেল। ওই আবার! থামছে না—চলেইছে একটানা—।

"সুশোভনবাবু"

"কি"

"শুনতে পাচ্ছেন? মরে যাই মাণিক আমার"

"আমাকে বলছ?"

"ঝুন্থুর ডাক শুনতে পাচ্ছেন না? আহা বেচারি"

"কই না"

"পাচ্ছেন না? ওই যে"

"ও প্যাঁচা ডাকছে"

"কি যে বলেন। ঝুন্থু কাঁদছে। আহা, কি যে করি"

"জানালাটা বন্ধ করে' দেওয়া ছাড়া আর কি করা যেতে পারে"

"না, না। বেচারী সমস্ত রাত ওই রকম করে' কাঁদবে, আর আমরা চুপচাপ শুয়ে থাকব এখানে—"

সুশোভন উঠে বসল।

"ওর কান্না বন্ধ করবে কি করে' বল। ও চেঁচাবেই। কুকুরের স্বভাবই ওই"

তারপর অস্ফুটকণ্ঠে বললে "লক্ষীছাড়া কুকুর"

"উনি হলে ঠিক উঠে গিয়ে নিয়ে অসেতেন"

"আমি 'উনি' হলে এই ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে আমার শিরদাঁড়া এমন জখম হত না"

"সুশোভনবাবু, উঠুন, যান লক্ষীটি"

"যেতাম। কিন্তু যাবার উপায় নেই"

"কেন, এই একটু আগেই তো আপনি ওখানে শুতে যেতে চাইছিলেন"

"চাইছিলাম কিন্তু পারতাম না। আমি হলপ করে' বলতে পারি এখন ওই খিড়কি দুয়ার পেরিয়ে গোয়ালঘরে যাওয়া যাদুকর পি. সি. সরকারের পক্ষেও অসম্ভব"

"কেন, বড়জোর খিল দেওয়া আছে—"

"দেখ যে লোক বৈঠকখানায় ডবল তালা লাগাতে পারে সে নিশ্চয় খিড়কিতে এলার্ম লাগিয়েছে"

"শুনুন, আহা কি কান্নাটাই কাঁদছে বেচারি। ছি, ছি, এত নিষ্ঠুর আপনি। বোবা জানোয়ারের প্রতি দয়া হচ্ছে না একটু—"

"ওর নাম বোবা জানোয়ার!"

"আপনি যদি না যান আমাকে উঠতে হবে। ওর কান্না শুনে স্থির থাকতে পারব না"

সুশোভনকে উঠতে হল। জুতো পরে জামা গায়ে দিযে বারান্দা থেকে কমানো লণ্ঠনটি তুলে নিয়ে নেবে গেল সে। নাবতে নাবতে তার মনে হল—অনীতার কুকুরের শখ নেই, আর যাই থাক! উঃ—!

(১০)

খিড়কির দরজার সামনে সুশোভন এসে দাঁড়াল। লণ্ঠন তুলে দেখলে একটা নয় দুটো ছিটকিনি। উপরে একটা, নীচে একটা। লোহার ছিটকিনি। নীচেরটা হল-হলে গোছের, একটা আঙুল দিয়েই তোলা গেল। কিন্তু এত বেশী হল-হলে যে একটুতেই পড়ে যাচ্ছে, আর এমন একটা খড়-খড় আওয়াজ করছে যে বিরক্তিকর। শুধু বিরক্তিকর নয়, আশঙ্কাজনকও। গোঁসাইজির ঘুম ভেঙে যেতে পারে। উপরের ছিটকিনিটি আবার ঠিক বিপরীত, এমন আঁট যে মনে হচ্ছে রিপিট করা আছে। সুশোভনের বাঁ হাতে লণ্ঠন ছিল, ডান হাত দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করেও সে ছিটকিনিটিকে এক চুলও সরাতে পারলে না। তখন লণ্ঠনটা মাটিতে রেখে এক হাত দিয়ে কপাটটা চেপে ধরে' দাঁতে দাঁত দিয়ে খুব জোরে হ্যাঁচকা টান মারলে একটা। ক্যাঁ···চ্ করে' বিরাট একটা আওয়াজ হল কিন্তু খুলল না। অর্দ্ধেকটা খুলে থেকে গেল। আলোটাও নিবে গেল দপদপ করে'। সুশোভন আলোটা তুলে নেড়ে দেখলে তেল নেই। তারপর উপরে তেতালার দিকে চেয়ে দেখলে কারও ঘুম ভেঙেছে কিনা। না, ভাঙে নি। পকেটে দেশলাই ছিল তাই বার করে জ্বাললে। বাঁ হাতে জ্বলন্ত কাঠিটা নিয়ে আর একবার টান দিলে ছিটকিনিটাতে। নড়বার কোনও লক্ষণ নেই, মনে হল 'জাম' হয়ে এঁটে বসেছে আরও। বাঁ হাতের আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতেই ফেলে দিতে

হল দেশলাই কাঠিটা। আঙুলে ফুঁ দিতে দিতে ভাবতে লাগল কি করা যায়। কুকুরের একটা হিল্লে না করে' সান্ত্বনার কাছে ফেরা যাবে না। ছিটকিনি খুলতেই হবে যেমন করে' হোক্। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। পকেট থেকে রুমাল বার করে' রুমালটা ছিটকিনিতে বেঁধে ঝুলে পড়ল সেটা ধরে' সে। ক্যাঁ···চ্ খটাং···ভীষণ শব্দ করে' খুলে গেল। যাক্ উপরের দিকে আবার চেয়ে দেখলে। না, গোঁসাইজির নিদ্রাভঙ্গ হয় নি। কপাটটা খুলে বেরিয়েই সুশোভনের পা পড়ল ন্যাতার মতো একটা জিনিসের উপর। দেশলাই জেলে দেখলে জায়গাটা আঁস্তাকুড় গোছের। ভাঙা টিন, তরকারির খোসা, কাগজের টুকরো, গোবর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। রান্নাঘরের জলও বোধহয় পড়ে এইখানে। স্যাঁৎস্যাঁৎ করছে চতুর্দ্দিক। আবার একটা দেশলাই কাঠি জেলে সেটা তুলে ধরে' সুশোভন দেখলে···সর্ব্বনাশ, সামনে আর একটা দেওয়াল এবং তাতে আর একটা কপাট। মনে হল এইটেই বোধহয় আসল খিড়কি। এটা পার হতে পারলে তবে গোয়ালঘরে পৌঁছনো যাবে। ভাগ্যক্রমে এ কপাটের ছিটকিনি সহজে খোলা গেল। বিশেষ বেগ পেতে হল না। কপাট খুলে বেরিয়েই গোয়ালটা পেলে। ঝুমুর আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। বৃষ্টি সুরু হল ঝির ঝির করে'। কনকনে হাওয়া তো ছিলই। রুমালটা মাথায় দিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালতে জ্বালতে গোয়ালটার দিকে অগ্রসর হল সুশোভন। ছাপ্পর-খাট-শায়িতা কম্বলাবৃতা সান্ত্বনার ছবিটা অনিবার্য্যভাবে ফুটে উঠল মনের উপর। কি অদ্ভুত মেয়ে। একটু আগে তার শয্যাপ্রান্তে বসে' তার ছিমছাম ঘরোয়া মূর্ত্তি দেখে একটু অভিভূত সে যে হয় নি তা নয়। বিলাসী, জেদি, 'খর্চে' অনীতার সঙ্গে তুলনা করে' সান্ত্বনার সাদাসিধে ভাবটা ভালই লেগেছিল তার। কিন্তু সুশোভনের মনে পড়ল সান্ত্বনাও এককালে কম করে নি। সেই দৈবক-ঘটিত ঘটনাটা ঘটে যাবার পর থেকেই ও বদলে গেছে এবং তারপর বোধহয় আবিষ্কার করেছে যে সাদাসিধে চাল-চলনই ভাল। একটু আগে—সত্যি কথা বলতে কি—সান্ত্বনার ধীর স্থির শান্ত গার্হস্থ্য লক্ষ্মীশ্রী দেখে এবং অনীতার উদ্দাম

প্রকৃতির সঙ্গে তার তুলনা করে' সুশোভনের মনটা সান্ত্বনার দিকেই ঝুঁকেছিল একটু। কিন্তু এখন সে দ্রুত হৃদয়ঙ্গম করছিল এইসব লক্ষ্মী-শ্রী-মার্কা স্ত্রীদের স্বামী হওয়া কি সঙ্গীন ব্যাপার। তাকে স্বেচ্ছায়, শুধু স্বেচ্ছায় নয়, সানন্দে, এই ঠাণ্ডায় অন্ধকার রাত্রে বৃষ্টি মাথায় করে' লক্ষ্মীছাড়া একটা কুকুরের সন্ধানে বেরুতে হবে! কি রকম দাম্পত্য-জীবন এদের? ভদ্রহাসি-মাখানো শাস্ত্রীয় মাধুর্য্যের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কি! না, তার অনীতা ঢের ভাল এর চেয়ে। উদ্দাম জেদি আবদেরে বদরাগী কিন্তু প্রাণ আছে, বৈচিত্র্য আছে—আর এতটা অবুঝ স্বার্থপরও নয়। অনীতা কখনও তাকে এমনভাবে কুকুর আনতে পাঠাতো না। কখনও না।

কিন্তু সান্ত্বনার সঙ্গে—সেই সেকালের কমরেড সান্ত্বনার সঙ্গে—একরাত্রি কাটানোর অভিজ্ঞতা নিতান্ত মন্দও লাগিল না সুশোভনের। বেচারি! কি বদনামটাই রটিয়েছিল সবাই ওর নামে। তারই চাপে বোধহয় গৃহলক্ষ্মীটি হয়ে গেছে একেবারে। এরকম আরও দেখেছে সে। বিয়ের আগে যে সব মেয়েরা খুব বেশী প্রগতিশীলা থাকে বিয়ের পর আর চেনা যায় না তাদের। একেবারে সটান তুলসীতলা আশ্রয় করে তারা। সান্ত্বনার উপর কেমন যেন একটা সহানুভূতি হচ্ছিল তার।

এইবার ঝুনুর খোঁজ করা যাক্।

ঝুনুর কান্না শোনা যাচ্ছিল, তার কারণ গোয়ালের কপাটটা খোলা ছিল। সুশোভন কপাটের কাছে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলে একটু। কিছু দেখা গেল না। খড়ের খড়-খড় শব্দ আর ঝুনুর আর্ত্তনাদ ছাড়া শোনাও গেল না কিছু। সুশোভন ভিতরে ঢুকে দেশলাই জ্বাললে। সুশোভনকে দেখে ঝুনু হাহাকারের সঙ্গে সম্বর্দ্ধনাসূচক একটা হর্ষোচ্ছ্বাস মিশিয়ে অদ্ভুত ধরনের শব্দ করতে করতে এগিয়ে এল। সুশোভন হাতটা বাড়িয়ে দিতে চাটলে দু' একবার ভয়ে ভয়ে। আহা, আপাদমস্তক থর থর করে' কাঁপছে। লোমগুলো পর্য্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছে। বেঁড়ে ল্যাজের কাছটায় খুব জোরে জোরে অদ্ভুত ধরনে নড়ছে। করুণ দৃষ্টি তুলে

সুশোভনের দিকে একবার চেয়ে তারপর সভয়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগল। চীৎকার বন্ধ করেছিল, কিন্তু তার বদলে এমন একটা অনুনাসিক কোঁতানি আরম্ভ করলে যা অতিশয় শ্রুতিকটু।

"চুপ কর"

"কুঁই-কুঁই কুঁক-কুঁক"

ভয়ে ভয়ে চাইতে লাগল এদিক ওদিক। সুশোভনকে বিশ্বাস করতে পারছিল না ঠিক।

"চুপ কর"

সুশোভন ডান হাত দিয়ে আস্তে আস্তে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল তার। কুকুর যে এ রকম ছিঁচকাঁদুনে হতে পারে তা সুশোভনের ধারণার অতীত ছিল। হঠাৎ ভেউ ভেউ করে' কেঁদে উঠল ঝুমু।

"চুপ কর বলছি, মারব না হলে—"

সুশোভন যে-ই একটু হাত তুলেছে ঝুমু "কেঁউ" করে' বেরিয়ে গেল একছুটে অন্ধকারের মধ্যে।

"আরে, এ কি হল"

কপাটের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল সুশোভন।

"আঃ আঃ চু চু চু"

টুসকি দিতে লাগল। কোন ফল হল না। বেরুতে হ'ল গোয়াল থেকে। বৃষ্টিও নামল বেশ জোরে।

"আয় আয় ঝুমু—আঃ—আঃ…"

নাতি-উচ্চ কণ্ঠে ডাকতে ডাকতে অন্ধকারে এগুচ্ছিল, হুড়মুড় করে' হোঁচট খেলে। একটা প্রকাণ্ড গামলা গোছের কি ছিল, গরুর জাবখাওয়াবার ডাবা বোধ হয়।

"ঝুমু ঝুমু, আয় বলছি। এস লক্ষ্মীটি। মারব না, কিছু বলব না, আঃ

আঃ। আয় না—উঃ কি লক্ষ্মীছাড়া কুকুর বাবা—ধরতে পারি যদি একবার।
ঝুমু—ঝুমু"

দূরে বহুদূরে সর্ষে-ক্ষেতের ভিতর ছুটতে ছুটতে একটা খেজুর গাছের গুড়িতে ধাক্কা খেয়ে 'কেঁউ' করে' উঠল ঝুমু। সেইদিকে ঘাড় ফিরিয়ে সুশোভন চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। আপাদমস্তক রি-রি করে' উঠল রাগে। কিন্তু করবারই বা কি আছে! এগুতে হল। শব্দটা যে দিক থেকে এল সেই দিকেই অগ্রসর হতে লাগল সে হন-হন করে'। আবার হোঁচট খেয়ে পড়ল কিসের উপর একটা। তলপেটে গুঁতো লাগল। টিউব ওয়েলের পাম্প নাকি এটা! আর একটু গিয়ে আবার হোঁচট—আর একটা পিপে। ঝন ঝন শব্দ করে' টিনও পড়ে গেল একটা। সমস্ত জায়গাটা জব জবে ভিজে পা বসে যাচ্ছে। সেখানটা অতিক্রম করতে গিয়ে আর একবার ঠোক্কর খেতে হল, শান-বাঁধানো জায়গা ছিল একটা সামনেই। বোধহয় স্নান করবার জায়গা। একটা ঝাঁটা পায়ে ঠেকল, লাথি মেরে সরিয়ে দিলে সেটাকে। তারপর সে দাঁড়াল একটু। এ কোথায় এসে পড়ল। আর তো কোন শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। চতুর্দ্দিক অন্ধকার। একটা গাছের ডাল থেকে ফোঁটা কয়েক জল পড়ল টপ টপ করে' নাকের ডগায়। সরে' দাঁড়াতে হল।

"উঃ কি ফ্যাসাদে পড়লাম। এর পর যদি কুকুরটাকে ধরতেও পারি, কি যে হবে তা দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। ওই ভিজে কুকুরকে সান্ত্বনা কিছুতেই বিছানায় উঠতে দেবে না, আমাকেই ওকে নিয়ে মেজেয় শুতে হবে, শুয়ে ঘুম পাড়াতে হবে। ধরতে পারলে হয়, জন্মের মতো ঘুম পাড়িয়ে দেব একেবারে। "ঝুমু—আঃ—আঃ—ঝুমু-ঝুমু-ঝুমু-ঝুমু-ঝুমু-ঝুমু—"

কোনও সাড়াশব্দ নেই। আর একটু এগিয়ে সুশোভন দেখলে একটা বেড়া রয়েছে। তারের বেড়া। এর ওপারেই মাঠ। মাঠে পুঞ্জীভূত অন্ধকার। বেড়াটায় ভর দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর শব্দ নেই।

বেড়াটায় ঠেস দিয়ে সুশোভনের মনে হল আর পারছে না সে। সীমা অতিক্রম করেছে এবার। এর চেয়ে দুরবস্থা আর হতে পারে না, হওয়া সম্ভবই নয়। ওই গোয়ালে ঢুকেই শুয়ে পড়া যাক। থাকুক গোবরের গন্ধ, ওই খড়ের গাদায় শুয়ে রাতটা কেটে যাবে কোনক্রমে। ভাবলে বটে কিন্তু যেতে পারলে না। দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে'। কোলকাতায় তার নিজের বিছানার কথা মনে পড়ল, ধপধপে সাদা চাদর, ঝালর-দেওয়া বালিশ, নেটের মশারিটি ফেলে অনীতা শুয়ে আছে। কল্পনা করেও যেন আরাম হল একটু। কিন্তু একটা কথা সহসা হৃদয়ঙ্গম করে' একটু দমেও গেল সে। এ সমস্তের জন্যে সে ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়। রাগ পড়ে' গেল। একটা শূন্য বিমর্ষভাব খাঁ-খাঁ করতে লাগল সারা বুক জুড়ে। ঘুমও পাচ্ছিল খুব…। বেড়াটা পেরিয়ে খুঁজে দেখবে নাকি আর একটু? কিন্তু আর পারছিল না সে। আর এতে লজ্জারই বা কি আছে। ফিরে গিয়ে সত্যি কথাটা বললেই চুকে যাবে। ঘুম না হয় নাই হবে। ঘুম হবেই না বা কেন, নিশ্চয় হবে, সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছে ক্লান্তিতে।

কিন্তু না, তার মনের অন্তরতম প্রদেশে আর একটা কি যেন খচখচ করছিল। কি সেটা? সে এমন কিছুই করেনি এখনও পর্য্যন্ত যা অন্যায়, যাতে অনীতার ন্যায়ত রাগ হতে পারে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে অনীতা বুঝবেই নিশ্চয় শেষ পর্য্যন্ত। কিছুই তো করে নি সে। কিন্তু তার মনের এই বিমর্ষভাবের সঙ্গে অনীতাই যে নিগূঢ়ভাবে জড়িত এ ধারণাটাও সে ত্যাগ করতে পারছিল না কিছুতে…।

"ঠিক"—হঠাৎ মনে হল তার—"আসলে অনীতার জন্যে মন কেমন করছে। মানে বিরহ"

"হ্যাঁ, বিরহই। নিজের বান্ধবীদের কাছে যে অনীতার বুদ্ধি সম্বন্ধে নানা সমালোচনায় সে পঞ্চমুখ সেই অনীতাকে বিয়ের পর এক রাত্রিও ছেড়ে থাকে নি সে। নিজের বুদ্ধিতে চলতে গিয়ে তো এই হয়েছে—পরের স্ত্রীর কুকুরের পিছু পিছু ছুটে একটা হতভাগা হোটেলের পিছনে মাঠে দাঁড়িয়ে ভিজতে হচ্ছে

রাত দুপুরে। অনীতার সম্বন্ধে সে আবার সমালোচনা করতে গেছে সান্ত্বনার কাছে!

অনীতার মেজাজটা অবশ্য একটু কড়া। কিন্তু ওই অনীতাকেই তো সে ভালবেসেছিল। ওই অম্লমধুর অনমনীয়াকেই তো সে জয় করেছিল একদিন। আহা, তার এই মুহূর্ত্তের বিগলিত মনোভাবের খবরটা যদি অনীতা পেত কোনক্রমে—একরাত্রি তাকে ছেড়ে কি রকম মন কেমন করেছিল তার—তাহলে তার কড়া মেজাজ নরম হয়ে যেত ঠিক।

সান্ত্বনা বড্ড বেশী নরম—একটা কুকুরের জন্যেই হেদিয়ে মরছে। চুলোয় যাক্ তার কুকুর। হোটেলের দিকে ফিরল সে মরীয়া হয়ে। পত্নী-নিষ্ঠা, স্বামীর নিষ্কলুষ চরিত্র-মাধুর্য্য প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের ভাবে তার সমস্ত চিত্ত তখন পরিপূর্ণ। যথাসম্ভব কম শব্দ করে' দু'টি দুয়ারের ছিটকিনি বন্ধ করলে, বলাবাহুল্য প্রথম দুয়ারের উপরের ছিটকিনি স্পর্শ পর্য্যন্ত করলে না। লণ্ঠনটি তুলে নিয়ে অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। কাঠের সিঁড়ি—ক্যাঁচ্-কোঁচ্ একটু আধটু শব্দ নিবারণ করা গেল না কিছুতে। উপরে উঠে সিঁড়ির উপর বসে' ভিজে জুতো দুটো খুলে ফেললে সে সর্ব্বাগ্রে। ইস্, জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে একেবারে। জুতো খুলে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল সে একটু। এইবারই তো—। উপরের ঘরে (মানে গোঁসাইজির ঘরে) খুটখাট শব্দ শোনা গেল দু' একবার। চকিতে উপরের দিকে একবার চেয়ে নিঃশব্দে কপাট ঠেলে ঢুকে পড়ল সে ভিতরে। সান্ত্বনার কোনও সাড়াশব্দ নেই। দেশলাই জ্বাললে, তবু সান্ত্বনার কোনও সাড়া নেই। হঠাৎ নজরে পড়ল একটা তাকের এককোণে মোমবাতি রয়েছে একটা। হেডমাস্টারের সম্পত্তি, বোধহয় তাড়াতাড়িতে ফেলে গেছেন ভদ্রলোক। চট্ করে' মোমবাতিটা তুলে জ্বেলে ফেললে সে।

বালিশে মাথাটি রেখে সান্ত্বনা ঘুমুচ্ছে—বেশ আরামেই ঘুমুচ্ছে বলে' মনে হল—অধরে শান্ত প্রসন্ন হাসি। মাথাটা একদিকে সামান্য কাত হয়ে থাকাতে গণ্ডের

ও গ্রীবায়(এমন একটা লোভনীয় ভাব প্রকাশ হয়েছে যা শুধু মনোহর বললেই সবটা বলা হয় না। স্বশোভন হাত দিয়ে আলোটা আড়াল করে' ঝুঁকে দেখতে লাগল।)

সামান্য একটু নড়ে চড়ে উঠল সান্ত্বনা, (বাঁ হাতখানা বুকের উপর ছিল নেমে এল কয়েক ইঞ্চি।) অনামিকায় বিয়ের আংটিটা ছিল, আলো পড়াতে চকমক করে উঠল তার পাথরখানা। স্বশোভন সোজা হয়ে দাঁড়াল, চোখের দৃষ্টি গম্ভীর হয়ে এল। অনীতার কথা মনে পড়ল তার। সে বেচারীও বোধহয় একা একা শুয়ে ঘুমুচ্ছে এখন। কিম্বা সে হয় তো জেগে আছে, তারই কথা ভাবছে··· 'বিয়ের পর এই প্রথম বিচ্ছেদ···একটা অভূতপূর্ব্ব বেদনা আকুল করে' তুলেছে হয় তো। স্বশোভনের শীত করছিল, জামাটা ভিজে সপসপ করছে। অসহায়ভাবে চারিদিকে তাকাল সে একবার। না, সে শোবে না এখানে। সান্ত্বনা, সান্ত্বনার স্বামী এবং সমস্ত শোনবার পর অনীতাও তার এখানে শোওয়ার সমর্থন করবে সে জানে, কিন্তু তবু তার মনে হল শোয়াটা উচিত নয়, সিঁড়িতে কিম্বা ওই গোয়াল ঘরেই রাতটা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করা উচিত। কেন উচিত তা বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা ছিল না তার। ক্ষমতা হয় তো ছিল, উৎসাহ ছিল না। ঘুমে ক্লান্তিতে চোখ দুটো জড়িয়ে আসছিল। তার কেমন যেন আবছাভাবে মনে হচ্ছিল সান্ত্বনার খাটের নীচে পা ঢুকিয়ে শুলে অনীতার সঙ্গে আত্মিকযোগ ছিন্ন হয়ে যাবে। ঘুমন্ত সান্ত্বনার দিকে আর একবার চেয়ে দেখলে সে। না, রূপসী বটে। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তখনই মনে হল সেইজন্য আরও চলে যাওয়া উচিত। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

"উঃ কি সাংঘাতিক প্যাঁচেই যে পড়েছি। ভিজে জামা, ভিজে কাপড়, ঘুম পাচ্ছে, মন ছুঁকছুঁক করছে, বিবেক দংশন, রাম রাম! কি যে করি এখন ঘোড়ার ডিম"···স্বগতোক্তিটা জোরেই হয়ে গেল একটু।

"কে, ও আপনি, কি বলছেন"—জেগে উঠল সান্ত্বনা।

"বলছি, কি করি এখন"

"কি আবার করবেন, শুয়ে পড়ুন, ঝুন্থ কই"

"ঝুন্থ এল না। বাইরে খেলা করছে, কিছুতেই আসতে চাইছে না। থাক না বেশ আছে, বাইরে আরামে থাকবে"

"খেলা করছে! না, না, সুশোভনবাবু নিয়ে আসুন তাকে; ঠাণ্ডায় অসুখ করে' যাবে"

"কিচ্ছু হবে না। বেশ খেলা করছে। তাছাড়া বাইরে গিয়ে এখন ধরাই যাবে না তাকে"

"কেন"

"যা অন্ধকার। সূচীভেদ্য বললে কিছুই বলা হয় না। আলকাতরার মতো বললে তবু খানিকটা—"

"ঝুন্থ কোথায়"

"শেষবার তার যে সাড়া পেয়েছি তার থেকে অনুমান করছি সর্ষে ক্ষেতে ঢুকেছে"

"সর্ষে ক্ষেতে, বলেন কি! ওমা, আপনি যে ভিজে গেছেন একেবারে দেখছি"

সান্ত্বনা বিছানায় উঠে বসল এবং তার সিক্ত কোটের দিকে শুভ্র বাহুটি প্রসারিত করে বলল—"ছি, ছি, জামার দশা কি হয়েছে আপনার"

"তাতে কি হয়েছে"—ঔদাসীন্যভরে সুশোভন জবাব দিলে—"বেশী ভেজে নি, সামান্য একটু"

"সামান্য একটু কি! ভিজে সপসপ করছেন, এর নাম সামান্য একটু? এত ভিজলেন কি করে? বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে নাকি?"

"আজ্ঞে না। পুকুরে ডুব দিয়ে এলাম"

"কাপড় জামা ছেড়ে ফেলুন এক্ষুণি। অসুখ করে' যাবে না হলে। কিন্তু ছাড়বেনই বা কি করে'—আপনার স্যুটকেস তো আসে নি—সে তো অনীতার সঙ্গে চলে গেছে। মুশকিল হল দেখছি, কি করা যায়"

সান্ত্বনা তাড়াতাড়ি এলো, খোঁপাটা ঠিক করে' নিলে, তারপর সোৎসাহে বললে, "হয়েছে। এক কাজ করুন। আলোটা নিবিয়ে দিন। তারপর কাপড় জামা ছেড়ে সেগুলো শুকুতে দিন চেয়ারের উপর। আমি একটা কম্বল দিচ্ছি সেইটে জড়িয়ে মড়িয়ে শুয়ে থাকুন—ওগুলো শুকুক ততক্ষণ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শুকিয়ে যাবে।"

"যা বলছ তাতে মনে হচ্ছে না যে আমরা ঘুমোবার আয়োজন করছি। মনে হচ্ছে 'মগ্নতরী' বা ওই গোছের কোনও ছায়াচিত্রে অবতীর্ণ হবার আয়োজন করছি"

"যা বলছি শুনুন। কোটটা খুলে ফেলুন আগে। কিন্তু তার আগে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিন দয়া করে'। ওটা পেলেন কোথা"

সুশোভন কাতর দৃষ্টিতে বিছানার দিকে চাইলে একবার। তারপর ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিলে। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। কোটটা খুলে ফেললে। তারপর একটু ঝুঁকে হাত দিয়ে দেখলে মোজাও ভিজেছে, খুলতে হবে। এক পায়ে দাঁড়িয়ে খুলতে গিয়ে টাল সামলাতে পারলে না, পড়ে গেল। হাতের কাছে যা পেল তাই ধরতে গিয়ে ভীষণ কাণ্ড করে বসল একটা। ড্রেসিং টেবিলের উপর চীনে মাটির প্রকাণ্ড ফুলদানি ছিল, সেইটে ঝনঝন করে' পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

"কি করছেন আপনি সুশোভনবাবু"—চাপা কণ্ঠে চীৎকার করে' উঠল সান্ত্বনা।

'কিছু না, কিছু না। হাত লেগে কি যেন পড়ে' গেল। হয় নি কিছু"

"ভীষণ শব্দ হল যে"

"ভীষণ শোনাল। ভীষণ কিছু হয় নি"

"ভেঙে গেছে ?"

"দেখতে পাচ্ছি না। ভাঙলেও একটু আধটু কোণ টোন হয় তো ভেঙেছে"

"যাক যা হবার হয়েছে এবার শুয়ে পড়ুন। কম্বলটা জড়িয়ে নিন। খাটের রেলিঙয়ে ঝুলছে কম্বলটা। জড়িয়ে শুয়ে পড়ুন মেজের উপর। আর দেরি করবেন না"

"চুপ চুপ"—সুশোভন রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল—"শুনতে পাচ্ছ ?"

হ্যাঁ, শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল বেশ। খড়মের শব্দ। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। দুয়ারের সামনে এসে দাঁড়াল। অজ্ঞাতসারে সুশোভনের মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল। কপাটের ফাঁক দিয়ে আলো দেখা গেল। রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইল সুশোভন। এই পরিস্থিতিতে এই বেশে এত রাত্রে গোঁসাইজির সম্মুখীন হওয়ার 'তাগত' তার আর ছিল না। সে গুঁড়ি মেরে সন্তর্পণে বিছানার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল। গোঁসাইজি কড়া নাড়লেন। আর দ্বিধা না করে' সুশোভন হুড়মুড় করে' বিছানায় উঠে সটান শুয়ে পড়ল সান্ত্বনার পাশে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে। সান্ত্বনাও চুপ করে' রইল। টুঁ শব্দটি করলে না। গোঁসাইজি আরও দু'বার কড়া নাড়লেন। কোন সাড়া পেলেন না।

"ঘুমের ভান কর" চুপি চুপি বললে সুশোভন। চতুর্থবার কড়া নেড়েও যখন কোন সাড়া পাওয়া গেল না তখন গোঁসাইজি কপাটটা একটু ঠেলে মুণ্ডটি ঢোকালেন কপাটের ফাঁক দিয়ে। জোরে জোরে নিশ্বাস নেওয়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কপাট আর একটু ফাঁক করে' আর একটু ভিতরে ঢুকে' লণ্ঠনটি তুলে' দেখলেন। দেখতে পেলেন যে তাঁর অতিথি দু'জন শুয়ে ঘুমুচ্ছে। পাশাপাশি মাথা দুটো বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। কংগ্রেসকর্ম্মী ব্রজেশ্বরবাবু আগাগোড়া ঢাকা দিয়েছেন, মুখ দেখা যাচ্ছে না। তাঁর স্ত্রীর মুখটা বেশ দেখা যাচ্ছে। অধরে যেন ঈষৎ হাসির আভাসও দেখতে পেলেন মনে হল।

তাঁর পিছু পিছু ফদকাও উঠে এসেছিল। সে-ও উঁকি দিয়ে দেখলে সব। অত্যধিক আগ্রহবশতঃ নিজেকে স্থির রাখতে পারছিল না সে সম্ভবতঃ, কনুইটা কড়ায় লেগে বেশ শব্দ হল আবার। গোঁসাইজি চাপা-কণ্ঠে তর্জ্জন করে' উঠলেন।

"তুই ফোঁপরদালালি করতে এলি কেন এখানে। শুগে যা। এখানে কিছু হয় নি। ফের যদি আওয়াজ হয় ঠাকুরকে উঠিয়ে নীচেটা দেখতে হবে ভাল করে"

"বোধ হয় বেরাল"

"বেরাল না হাতী ! ফাজিল কোথাকার—"

ফদকা নীচে চলে গেল। গোঁসাইজি কপাটটা সন্তর্পণে বন্ধ করে' দিলেন। তারপর আলোটা একটু তুলে' নীরবে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন বাইরের বারান্দায়। ওধারের যে ঘরটায় তাঁর গুরু-ভগ্নী আছেন সেদিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। না, ওধারে কিছু হয় নি। বাইরে থেকেই নাক-ডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। স্ত্রীলোকের এত জোরে নাক-ডাকা একটা দুর্লক্ষণ। তাঁর গুরু-ভগ্নী পুণ্যবতী নারী······ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইলেন গোঁসাইজি চিন্তামগ্ন হয়ে। তারপর তাঁর মনে হল ওটা রোগের জন্য সম্ভবতঃ। আরও আধ মিনিট দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখলেন। না, সন্দেহজনক কিছু দেখা গেল না। নিজের শয়নঘরের দিকে অগ্রসর হলেন। সিঁড়িতে ওঠার শব্দ পাওয়া গেল। ঘরে ঢুকে খিল দিলেন তা-ও শোনা গেল স্পষ্ট।

"সুশোভনবাবু নীচে যান। শিগগির যান বলছি—"

"হায় ভগবান ! প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যেতেই হবে ?"

"কি যে ছেলেমানুষি করেন, উঠুন, কি করছেন, উঠুন না"

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, খোঁচা মেরোনা দোহাই তোমার"

"কম্বলটা বেশ করে' জড়িয়ে শুয়ে পড়ুন নীচে"

"বেশ"

"দেরি কচ্ছেন কেন"

"নাবছি তো। অত চেঁচিয়ো না, চেঁচামেচি শুনলে ও ব্যাটা এক্ষুনি নেবে আসবে আবার। আঃ, ঠেলছ কেন, পা ঝুলিয়ে মোজাটা খুঁজছি—ঘুমটা বেশ এসে গিয়েছিল"

"মেজেতেও এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়বেন"

"কাল সকালে কি হবে বল দিকি। ভোর না হতে হতেই ওই ফদকা এসে হাজির হবে ঝাড়ু দিতে। ড্রেসিং টেবিলের নীচে মাথা গলিয়ে আমি কম্বল জড়িয়ে পড়ে' আছি দেখলে কি ভাববে বলতো। কি জবাবদিহি করব তার কাছে"

"করবেন যা হোক কিছু। বুদ্ধির তো অভাব নেই আপনার। বলবেন মোজা খুঁজছি ওর তলায়···"

"মোজা তো আমার পায়ে"

"এক পাটি খুলে তাহলে ঢুকিয়ে দিন এখন থেকে"

"কি যে তোমার ইয়ে সান্ত্বনা—মানে এরকম—"

"কথা বলে' সময় নষ্ট করছেন কেন বৃথা। আমাকে চেঁচাতে মানা করে' নিজে তো চেঁচিয়ে চলেছেন দিব্যি। বেশ গুটিয়ে সুটিয়ে আরাম করে' শুয়ে পড়ুন না। হ্যাঁ, দেখুন—"

"কি আবার—দাঁড়াও—দুত্তোর—এক মিনিট—হ্যাঁ কি বল—"

"ওই ফুলদানি ভাঙার উপর শোবেন না যেন, হাত দিয়ে সরিয়ে নিন টুকরোগুলো কেমন ?—"

(১১)

বৃষ্টিটা থেমেছিল কিন্তু মেঘ কাটে নি। মনে হচ্ছিল যে-কোনও মুহূর্তে সুরু হতে পারে আবার। প্রকৃতি দেবী কান্নাটা থামিয়েছেন বটে—সম্ভবতঃ মানবজাতির শোচনীয় অধঃপতনে ব্যথিত হয়েই বিগলিত হয়েছিলেন তিনি—কিন্তু সমস্ত মুখ থম থম করছে এখনও। বিশাল বিশাল মেঘ ঘুরে' বেড়াচ্ছে আকাশে। সূর্য্য-কিরণের প্রসন্ন হাসি সুদূরপরাহত মনে হচ্ছে। চতুর্দ্দিকে বেশ ঘন-ঘোর এখনও।

একজন কিন্তু বেশ পুলকিত হয়ে উঠেছেন। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন "রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে দেখছি—বাঃ—চমৎকার। দরকার ছিল, রাস্তায় যা ধূলো। বেশ মেঘলা মেঘলা আছে, রাস্তায় বাইক করতে কোনও কষ্ট হবে না। রোদ নেই—খাসা! আজ হনুমানপুরটা সেরে' ফেলব তাহলে রামতারণবাবু, বুঝলেন। জলখাবার প্রস্তুত বলছেন? এর মধ্যেই? ছোলা গুড়? খুব ভালবাসি। অতিপুষ্টিকর খাদ্য। নারকেল? বলেন কি! নারকেল নাড়ু? তাহলে তো আরও চমৎকার—তোফা! কোথা? পাশের ঘরে—ও চলুন—ঠিক—"

রামতারণ ত্রিবেদী নরসিংহপুর গ্রামের আপার প্রাইমারি স্কুলের পণ্ডিত। সদারঙ্গবিহারীলাল এ অঞ্চলে এলে এঁরই আতিথ্য গ্রহণ করেন। অতিশয় সজ্জন লোক। শুধু তাই নয় খুব নিরীহ। ভদ্রলোকের সদা-সন্তুষ্ট ভাব অথচ ব্যস্তবাগীশ। নিজের চারিদিকে একটা স্নিগ্ধ আবহাওয়া বজায় রাখবার জন্য সর্ব্বদাই আগ্রহান্বিত তিনি। কোন কিছু উগ্র অমসৃণ এলোমেলো বরদাস্ত করিতে পারেন না—তাড়াতাড়ি সমস্ত শান্ত না করা পর্য্যন্ত শান্তি পান না কিছুতে। বেঁটে পরিপুষ্ট লোকটি সর্ব্বদা সব সামলাতে ব্যস্ত যেন। ছোট ছোট বেঁটে হাত দু'টি দিয়ে হয় কোঁচকানো বিছানার চাদর ঠিক করছেন, না হয় টেবিলে বই গুছিয়ে রাখছেন। অভাবে নিজের কোটের সম্মুখ ভাগটার উপরই হাত বুলিয়ে বুলিয়ে মসৃণতর করবার চেষ্টায় আছেন সেটা। ভারী মিষ্টি স্বভাব। তাছাড়া নিরপেক্ষ নির্ব্বিবাদী লোক। ঝগড়া তর্কের সীমানায় থাকেন না কখনও।

সদারঙ্গবিহারীলাল ত্রিবেদী মহাশয়ের আহ্বানে সোৎসাহে পাশের ঘরে ঢুকলেন। ত্রিবেদী মশায় সরে' দাঁড়িয়ে পথ দিলেন তাঁকে, তারপর সন্তর্পণে গোঁফে হাত বুলুতে বুলুতে অনুসরণ করলেন। টেবিলের উপর খাবার ছিল। সদারঙ্গবিহারীলাল চেয়ার টেনে বসলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে করতালি দিলেন একবার।

"বাঃ—তোফা—"

রামতারণ ধীরকণ্ঠে বললেন—"আপনি কিছু সঙ্গে নিয়ে যাবেন কি, ছোট একটা বিস্কুটের টিনে পুরে যদি দি—ওখানে কতক্ষণ থাকবেন স্থিরতা নেই তো, ওখানে খাদ্যদ্রব্য কি পাওয়া যায় তারও স্থিরতা নেই—যদিই বা যায়, কি মূল্যে পাওয়া যাবে স্থিরতা নেই—"

সদারঙ্গবিহারীলাল অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। তিনবার 'স্থিরতা' শুনে ভাবছিলেন যে পণ্ডিতের শব্দের সঞ্চয় এত কম সে কি করে' ছেলেদের ভাষা শিক্ষা দিতে পারে—ছেলেরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ—তাদের যদি ভাষাজ্ঞান ঠিকমতো না হয় তাহলে তো শিক্ষার ভিত্তিই অমজবুত হয়ে যাবে—অথচ লোকটা ভাল—

"কিছু নিয়ে যাওয়াই ভাল, কি বলেন"

"ও—হ্যাঁ—নিশ্চয়ই। এ তো খুবই সুযুক্তি"—নাড়কেল নাড়ু দাঁতে আটকে গিয়েছিল সেটা ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"বেশ তো, কি দিচ্ছেন সঙ্গে"

"নারকেল নাড়ু"

"আবার নারকেল নাড়ু! বেশী খেলে আবার—মানে—নারকেল অবশ্য খুবই ভালবাসি আমি, ডাক্তাররা বলেন খুবই পুষ্টিকর—কিন্তু আপনাদের সব নাড়ুগুলো আমিই যদি খেয়ে ফেলি—"

"নারকেল নাড়ু প্রচুর আছে। কলাও দিচ্ছি গোটা চারেক"

"কলা? বলেন কি, খাসা হবে"

"একটু মোহনভোগও করিয়ে দিতে পারি যদি বলেন"

ইতিপূর্ব্বে মোহনভোগ খাইয়েছেন তাঁকে রামতারণ ত্রিবেদী। কালো চটচটে আঠার মতো বস্তুটির ছবি মানসপটে ফুটে উঠল সদারঙ্গবিহারীলালের।

"কি দরকার মোহনভোগের। কলাই যথেষ্ট"

"ক'টার সময় আপনি বেরুবেন বলুন না"

"বেরুবো? দাঁড়ান তাহলে—সর্ব্বাগ্রে ওই সাইকেলওয়ালা মিঠ্ঠুর কাছে যাওয়া দরকার। সে একবার গাড়িটা ঠিক করে' দিয়েছিল। বেরুবার আগে ভাল ক'রে তেল টেল দিয়ে নিতে হবে আজ। কাল একটু লুব্রিকেটিং তেলের অভাবে —উফ্! মিঠ্ঠু কারবুরেটার খুলে সাফ করতে চাইবে নিশ্চয়। প্লাগও বদলাতে পারে। হ্যাঁ দশটাই ধরুন—তার আগে বেরোনো যাবে না"

"মোহনভোগ হয়ে যাবে তার মধ্যে"

কোটের সম্মুখভাগে হাত বুলোতে বুলোতে রামতারণ স্থিরকণ্ঠে বললেন কথা-ক'টি। চকিতে রামতারণের দিকে একবার চেয়ে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে' ছোলাগুলি চিবোতে লাগলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

প্রায় সওয়া দশটা নাগাদ রওনা হয়ে গেলেন তিনি। সাইকেলের পিছনে স-মোহনভোগ বিস্কুটের টিনটি বেঁধে দিয়েছিলেন ত্রিবেদী মশায়। মিঠ্ঠুও নিখুঁতভাবে ঠিক করে' দিয়েছিল সাইকেলটি। ফট্ ফট্ ফট্ ফট্ শব্দে চতুর্দ্দিক্ সচকিত করে' প্রধাবিত হল মোটর-বাইক। যদিও মেঘলা দিন, তবু কোথা থেকে একটু আলো লুকিয়ে এসে ঝিলিক তুলেছিল তাঁর চশমার লেন্সে। হরিমটর পান্থনিবাসের সামনের রাস্তা দিয়েই হনুমানপুরে যেতে হয়। পান্থনিবাসের সামনাসামনি এসে গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে হোটেলের দিকে চাইতেই দেখতে পেলেন প্রচুর গলাখাঁকারি দিয়ে উপরের জানলা থেকে গোঁসাইজি নিষ্ঠিবন ত্যাগ করছেন। হোটেলের জানলা কপাট সব খোলা, কিন্তু সান্ত্বনা দেবী বা আর কাউকে দেখা গেল না। সদারঙ্গবিহারীলাল ভাবলেন নিশ্চয় তাঁরা চলে গেছেন। গাড়ির বেগ বাড়িয়ে দিলেন আবার। এই সুখী দম্পতির কথাই ভাবতে ভাবতে ভীমবেগে চলেছিলেন তিনি। যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী। অত বড় অধ্যাপক, অমন নামজাদা কংগ্রেসকর্ম্মী—কিন্তু এতটুকু অহঙ্কার নেই··· সান্ত্বনাও ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। মণি-কাঞ্চন। দেখতে দেখতে এক মাইল পার হয়ে গেল···সান্ত্বনার শুধু রূপ নয় গুণও আছে···অনেক গুণ। সামনে রাস্তাটা বেঁকেছে···ঘুরেই কি কাণ্ড!—সজোরে ব্রেকটা চেপে ধরলেন···গাড়িটা টাল খেয়ে পড়েই যেত হয় তো পাশের খানায়—যদি না বাঁ পা-টা রাস্তার পাশের একটা ঝোপে ঢুকিয়ে সামলে নিতেন তিনি কোনক্রমে। ছোঁড়া রাস্তার ঠিক মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে আছে! এখনও দাঁড়িয়ে আছে—দাঁত বার করে' হাসছে আবার।

ঝোপ থেকে পা বার করে' নিলেন তিনি। একটু মচকেছে বোধহয়। পকেট থেকে রুমাল বার করে' কপালটা মুছলেন, চশমাটা ঠিক করে' নিলেন। তারপর ছেলেটার দিকে চেয়ে অনুকম্পা হল একটু—এরা এমনিভাবেই বেঘোরে মারা যায়—আর একটু হলে গেছল। বেঁটে গোছের ছেলেটা। পরণে ময়লা খাকী হাফপ্যান্ট, গায়ে ছেঁড়া সোয়েটার, হলদে রঙের দাঁত। হাসছে—হাসি দেখে

মনে হয় বিচ্ছু। শহর থেকে আমদানী সম্ভবতঃ, পাড়াগেঁয়ে ভীতুভাব মোটেই নেই।

"এই ছোকরা, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এখনি চাপা পড়তে যে—"

ছোঁড়া দাঁত বার করে' হাসল আবার।

"হাসছ কি, সাবধান না হলে মারা যাবে একদিন। আরে—"

ছোঁড়া সরে পড়বার উপক্রম করছিল। তার ডান হাতে একটা দড়ি ছিল, সেটা আর এক পাক দিয়ে জড়িয়ে নিলে সে ভাল করে'—সঙ্গে সঙ্গে তার পিছন দিক থেকে আর্ত্ত কেঁউ কেঁউ ধ্বনিত হয়ে উঠল। কুকুর—হ্যাঁ কুকুরই তো—ছোট কুকুরের বাচ্চা একটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। ছোঁড়াটা তার গলায় দড়ি বেঁধে হিঁচড়ে টেনে' নিয়ে চলেছে সেটাকে। ভ্রূকুঞ্চিত করে' সদারঙ্গবিহারীলাল দৃশ্যটা নিরীক্ষণ করলেন একটু ঝুঁকে'। বাচ্চাটা কিছুতে যাবে না, ছোঁড়াও ছাড়বে না, হিঁচড়ে টেনে নিয়ে' যাচ্ছে।

"এই থাম থাম"—আদেশের ভঙ্গিতে বললেন সদারঙ্গবিহারীলাল—"আরে এ কুকুর যে চেনা। এ তো তোমার কুকুর নয়। এ তো চেনা কুকুর"

"চীনা নেই, বিলেইতি"

সদারঙ্গবিহারীলাল অবিলম্বে বুঝলেন ছোঁড়া বিহারী। শুধু তাই নয়, কুকুরের জাতও চেনে।

"চীনা নেই বোলতা, চেনা চেনা"

"নেই বিলেইতি"

ভারী ডেঁপো তো!

"আরে বাবা তাই সই। কুত্তা কাঁহা পায়া"

ছোঁড়া সদারঙ্গবাবুর দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে কুকুরটার দিকে চাইলে। কুকুর যেন মানুষের মতো এড়িয়ে গেল তার দৃষ্টিকে। ভয়ে কাঁপছিল বেচারি।

"ই কুত্তা কো কাল রাতমেই হাম আদর কিয়া হ্যায়, গায়ে হাত বুলায়া হ্যায়, ইস কো মালিককে সাথ বহুক্ষণ গল্প-সল্প কিয়া হ্যায়। ই কুত্তা কাঁহা মিলা"

"ই কুত্তা নেহি হ্যায়"

"নিশ্চয় কুত্তা হ্যায়। ইসকো ল্যাজ নেহি দেখকে তুম হয়তো ভাবতা হ্যায় ই কুত্তা নেহি হ্যায়। কিন্তু ই কুত্তাই হ্যায়—ল্যাজ কাট দিয়া। কাঁহা পায়া ই কুত্তা—"

"ই কুত্তা নেহি হ্যায়"

"আরে বলে কি! কুত্তা নয় তো কি বিল্লি? বোলো কাঁহা পায়া ই কুত্তা"

"ই কুত্তা নেহি হ্যায়"

"আরে! তুম্ কি হামরা সে বেশী জানতা হ্যায়। বোকাকা মাফিক তর্ক করকে ফল কি। ইস কুত্তাকে হাম চিনতা হ্যায়, ইসকো মালিককো ভি হাম চিনতা হ্যায়, আজ সে নেই, অনেক দিন সে"

"অগর আপ জবরদস্তী ইসকো কুত্তা বনাইয়ে তো ম্যয় নাচার হুঁ। মগর ই কুত্তা নেহি হ্যায়"

"আরে তুমরা মাফিক এইসা ডেঁপো ছোকরাকে পাল্লামে ইতিপূর্ব্বে পড়া বোলকে তো ইয়াদ নেহি হোতা হ্যায়! কুত্তা নেই তো ই কি হ্যায়"

"কুত্তী হ্যায় হুজুর। দেখিয়ে—"

চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হয়ে গেল সদারঙ্গবিহারীলালের। এটা প্রত্যাশাই করেন নি তিনি। অপ্রস্তুত ভাবটা সামলে নিয়ে বললেন—"তা হো সেকতা হ্যায় অবিশ্যি। কাঁহা পায়া"

"রাস্তে মে"

"কি করে গা ইসকো লেকে"

"পোষেঙ্গে। শিখাওয়েঙ্গে—"

"উসকো শিখানে কো কুছ দরকার নেই হ্যায়। যথেষ্ট শিক্ষা হ্যায় উসকো—"

"কুছ নেই জানতি। দেখিয়ে না ঠিক সে চল ভি নেহি সক্‌তি—"

"বাজে বক বক মত্‌ করো—ই কুত্তা হামকো দেও"

"ফির আপ কুত্তীকো কুত্তা কহতে হেঁ"

"সাধারণ কথাবার্তায় হামলোগ ওতনা লিঙ্গ বিচার নেহি করতা হ্যায়। আসল কথা হাম ইসকো লে যায়গা, লে করকে আসল মালিক কো ঘুরায় দেগা, বুঝা ?"

"কুছ বখশিশ মিলনা চাহিয়ে"

"বখশিশ ? কাহে ? দোসরা আদমিকো কুত্তা লেকে ভাগতা হ্যায়, থানামে খবর দেনেসে কি হোগা জানতা হ্যায় ?"

"দিজিয়ে তব থানে মে খবর"

"আরে—এ তো ভারী ত্যাঁদড় ছোঁড়া দেখছি !"

সদারঙ্গবিহারীলালের মাথায় চকিতের মধ্যে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন—"দেখো, বখশিশ ফকশিশ নেই দেগা, তবে একঠো চিজ দে সেকতা হ্যায়"

"ক্যা—"

"নাড়ু"

"নাড়ু ?"

"হাঁ। ঘরকা তৈরি নারকেলকা নাড়ু"

"দেখলাইয়ে তো"

সদারঙ্গবিহারীলাল বাইকের পিছন থেকে বিস্কুটের টিনটি খুলে একটি নাড়ু বার করে' দিলেন তাকে। ছেলেটি একটু কামড়ে' আগে পরখ করে' দেখলে, তারপর সবটা মুখে পুরে' ফেললে।

"আওর একঠো হুজুর"

আর একটি নাড়ু দিলেন। ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে ছোঁড়াকে উপদেশও দিলেন কিছু। ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা কইতে হয়, যখন তখন অমন দাঁত বার করে' হাসাটা অভদ্রতা, দাঁত মাজাও উচিত প্রত্যহ, অমন ছেতো-পড়া

হলদে দাঁত দেখতে বিশ্রী নয় কী? সব শুনে ছোঁড়া দাঁত বের করে' বললে—"আউর একঠো লাড্ডু দিজিয়ে হুজুর—"

তৃতীয় নাড়ুটি দিয়ে ঝুহুকে উদ্ধার করলেন তিনি। ভুরু কুঁচকে ভাবলেন একটু। সমস্যা, কি করে' নিয়ে যাওয়া যায় এখন। পরমুহুর্ত্তেই কিন্তু মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। হয়েছে! গায়ে একটা ঢিলে গোছের কোট পরেছিলেন তিনি। বুকের বোতামগুলো খুলে ফেললেন এবং ঝুহুর আপত্তি সত্ত্বেও কোটের ভিতর পুরে নিলেন তাকে, পুরে বোতাম এঁটে দিলেন। এ ছাড়া গত্যন্তরও ছিল না। সোৎসাহে মোটর বাইকে সওয়ার হলেন সদারঙ্গবিহারীলাল এবং সবেগে ধাবিত হতে লাগলেন হরিমটর হোটেলের উদ্দেশে।

(১২)

শার্দ্দূল সিংহের ম্যানেজার প্রীতম্ সিং ফোন ধরেছিলেন। পাঞ্জাবী হলেও বাংলা ভাষায় বেশ কথাবার্ত্তা বলতে পারেন ভদ্রলোক। গণেশের টুকরো টুকরো কথা থেকে তিনি মোটামুটি একটা ধারণা খাড়া করেছিলেন গণেশ ছিপসরকারী থেকে কথা বলছে, কিছুক্ষণ পরে পোস্টমাস্টারের সঙ্গে কথা কয়ে বুঝলেন, ছিপসরকারী নয় ছিপছরামারী। লাইনটা কোথায় যেন লীক করছে। সুশোভনবাবুরা রাত্রে যে হোটেলে ছিলেন তার নাম—প্রীতম্ সিং প্রথমে শুনলেন হরমটর পান্থনিবাস।

"জায়গাটার নামগুলো একটু অদ্ভুত গোছের, নয়"—প্রীতম্ সিং বললেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ অদ্ভুতই। মান্ধাতার আমলের ব্যাপার"

গণেশ তখন পোস্টমাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলে, যে জায়গাটা তারা ছেড়ে এল তার নাম কি।

পোস্টমাস্টার প্রবীণ লোক। মাথার একটি চুলও কালো নেই। তার উপর এক-চক্ষু। অনেকদিন চাকরী করে' ঘাগি হয়েছেন, চট করে' কথার জবাব দেন না, বেফাঁস বা বেমক্কা হয়ে যেতে পারে। যা বলেন ভেবে চিন্তে ধীরে সুস্থে

বলেন। এই যে সব মোটরে চড়ে' শহর থেকে বাবুরা আসেন, ফড়ফড় করে' যা তা জিগ্যেস করেন, এদের উপর মনে মনে হাড়ে-চটা তিনি। যত সব ফক্কর দালাল জ্বালাতে আসে খালি। সকালে ওই ভদ্রমহিলাটি বেশ জ্বালিয়েছেন এক চোট। টেলিফোন ডাইরেকটারিখানাকে তচ-নচ করে' তবে ঠিক করলেন যে দিগ্বিজয় সিংহরায়ের ফোন নেই। তিনি গেছেন, এবার ইনি এসেছেন!

"যেখান থেকে আপনারা এলেন সে জায়গাটার নাম জিগ্যেস করছেন?"—সংযত কণ্ঠেই প্রশ্নটা করলেন।

"হ্যাঁ"—মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে জবাব দিলে গণেশ।

"কোন রাস্তা দিয়ে এলেন আপনারা?"

"এই যে এই রাস্তায় এক্ষুনি এলাম।"

পোস্টমাস্টারের একচক্ষুর দৃষ্টিটি নিবদ্ধ হল গণেশের মুখের উপর।

"এই রাস্তায় মেলা গ্রাম আছে, একটা নয়, মেলা। আপনি কোথা থেকে এলেন, তা আমি কি করে' বলব? যেখান থেকে এলেন সে জায়গার নাম আপনি যদি না জানেন আমি কি করে' জানব? একটা নয় মেলা গ্রাম আছে এ রাস্তায়, মেলা—মেলার চেয়েও বেশী—"

"ধরে থাকুন", গণেশ বললে প্রীতম্ সিংকে—"আমি মান্ধাতাকে জিগ্যেস করেছি। দেখছি স্বয়ং তিনিই এখানে আছেন।"

"লোকে যদি আফিসে ঢুকে ক্রমাগত জিগ্যেস করে' আমি এই রাস্তা দিয়ে যেখান থেকে এলাম তার নাম কি—তাহলে কি করে' জবাব দিই বলুন। সেকথা তাদের নিজেদেরই তো জানা উচিত। তারাই সেখান থেকে এসেছে, আমি আসিনি। আপনি যেখান থেকে এলেন কি রকম সে জায়গাটা—"

পোস্টমাস্টার বকে' চলেছিলেন।

অনেক ধস্তাধস্তির পর প্রীতম্ সিং যে সংবাদটি সংগ্রহ করলেন তা এই যে, সুশোভনবাবুরা যে হোটেলে রাত্রিবাস করেছিলেন তার নাম হরিমাটি এবং হোটেলটি যে গ্রামে অবস্থিত তার নাম ফতিমারঙ্গপুর। এর পর তাঁরা কোথা

যাবেন তা গণেশ কিছুতে বলতে পারলে না। মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরীর নাম কিছুতেই মনে এল না তার।

"আমাদের আপিসে যে ম্যাপটা আছে সেটা দেখলে নামটা পাবেন বোধ হয়। চমৎকারকুণ্ড বা ওই গোছের কিছু একটা—মচকানকাণ্ডও হতে পারে। দেখবেন, ম্যাপে থাকা সম্ভব। ম্যাপেই ওই ধরনের নাম থাকে। এখান থেকে খুব দূর নয় এইটুকুই শুনেছি—এর বেশী কিছু জানি না। ফিরতে কত দেরী হবে তা বলতে পারি না। ফোন কি করে' পেলাম? এ রকম অজ পাড়াগাঁয়ে ফোন পাব আশাই করি নি। শুনলুম এদিকে মিলিটারির একটা ছাউনি ছিল, তারাই নাকি পোস্টাপিসে ফোনটা বসিয়েছিল। হ্যাঁ, আপনারা ভাববেন তাই ফোনটা করে' দিলাম—"

"ভাবনা অবশ্য ঘুচল না"—উত্তর দিলেন প্রীতম্ সিং।

"তা কি করব বলুন সার। ভাল বুঝলাম তাই করলাম—"

একদিকে পোস্টমাস্টার, অন্য দিকে ম্যানেজার—গণেশের মেজাজ ক্রমেই চড়ে' উঠছিল।

"মিছামিছি ফোন করে' অতগুলো পয়সা নষ্ট না করলেও পারতে—"

"খবর না দিলে বলতেন, ফোন করবার যখন সুবিধে ছিল একটু খবর দিলেই পারতে। ফোন করেছি—এখন বলছেন অনর্থক পয়সা খরচ করছ কেন আপনাদের অন্ত পাওয়া ভার"

"যাক্ তাড়াতাড়ি ফিরে এস"

ফোনে কথাবার্তা শেষ হল।

এক হিসেবে এই অবশ্য যথেষ্ট হল। যতটুকু খবর পেলেন প্রীতম্ সিং, তা পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্বয়ম্প্রভা দেবীকে জানিয়ে দিলেন। সুতরাং লোহার দালাল জিতু সরকার লৌহসংক্রান্ত ব্যাপারে যদিও তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন তাঁর তন্ময়তা বাধাপ্রাপ্ত হল। একটি কেরানী এসে চুপি চুপি খবর দিয়ে গেল যে মিসেস সরকার ফোনে ডাকছেন।

"ডাকছেন ? আমাকে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

জিতুবাবুর মুখের বিপন্ন ভাবটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

"ওকে ফোনটা ধরে' থাকতে বল। আর ওই টেলিগ্রাফের ফর্মগুলো দাও তো—"

ফর্ম দিয়ে কেরানী চলে গেল।

জিতুবাবুর মাথায় চুল বেশী ছিল না, যা ছিল তাই তিনি মুঠো করে' ধরে' রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর মরীয়া হয়ে সুরু করে' দিলেন—"সুশোভন কট্ ট্রেণ, বাট মিস্ড্, ওয়াইফ, কট্ বাট্ রিটার্ণড্"

কেরানী পুনঃপ্রবেশ করে' বলে গেল মিসেস সরকার আপনার ফোনেই কথা বলছেন। জিতুবাবুর নিজের প্রাইভেট ফোনটা পাশেই ছিল, পরমুহূর্ত্তেই ঝনঝন করে' বেজে উঠল সেটা। জিতুবাবু ধীরে সুস্থে রিসিভারটা তুলেই বুঝলেন স্বয়ম্প্রভা ইতিমধ্যে অনেক কিছু বলে' ফেলেছেন।

"তুমি শুনছো ?"—হঠাৎ থেমে প্রশ্ন করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"শুনছি বই কি"

"সাড়া দিচ্ছ না কেন তাহলে। টেলিগ্রাফ করেছ ?"

"নিশ্চয়"

"তাহলে বেকুবি করেছ। তখনই তোমাকে পই পই করে' মানা করলাম যে টেলিগ্রাফটা কোরোনা, করা বৃথা"—

"বল ত এখনও বন্ধ করে' দিতে পারি"

"ও, পাঠাও নি এখনও ! বহুক্ষণ আগেই ত পাঠাবার কথা—"

"তোমার ইচ্ছেটা কি তা-ই বল না। টেলিগ্রাফ করব, কি করব না"

"কি—"

"করব, না করব না"

"কি—"

"টেলিগ্রাফ গো"

"টেলিগ্রাফ করে' আর কি হবে। এখনও কর নি তাহলে ?"

"মানে, যদি চাও বন্ধ করে দিতে পারি এখনও"

"বন্ধ করবে কি করে ! কখন পাঠিয়েছ ?"

"চেষ্টা করে' দেখতে পারি। টেলিগ্রাফ করতে মানা করছ কেন"

"কেন ? কারণ, আমি বলছি সে সেখানে নেই। কোথায় আছে তাও জেনেছি আমি। বুঝলে ? শুনছ ?"

"কোথায় আছে, বল না"

"সে সেই মাগীকে নিয়ে একটা হোটেলে গিয়ে বাস করছে—"

"বল কি ! হোটেলে ? বাস করেছ ? বাস করছে মানে কি—মোটে কালই তো গেছে—"

"মানে, কাল রাত্রে তারা দুজনে সেখানে বাস করেছিল"

"কি বলছ যা তা"

"কি ?"

"কি বলছ যা তা"

"অ্যাঁ কি ? শুনতে পাচ্ছি না কিচ্ছু। ব্যাপারটা বোঝ একবার ! হোটেলে গিয়ে বাস করছে !"

"কি যা তা বলছ, সম্পূ—"

"অসম্পূ ? অসম্পূ কি ! অসম্ভব বলছ ? কি অসম্ভব ?"

"এই হোটেলে বাস করা। মানে, সম্পূ—"

"যা বলছ, স্পষ্ট করে' উচ্চারণ কর না। মুখটা ফোনের কাছে এগিয়ে আন—"

"আমি বলছি সম্পূর্ণ বাজে কথা এটা"

"খোকামি না করে' বাড়ি চলে এস। বেরুতে হবে এক্ষুনি—"

"যাব না। একটি কথা বিশ্বাস হচ্ছে না আমার"

"মুখে কিছু পুরেছ নাকি, সুপুরি টুপুরি ?"

"না। শোন—"

"শুনব কি করে' যা ফোন তোমার। আপিসের ফোনটাও ঠিক করে' রাখতে পার না ? কিছু শোনা যাচ্ছে না ; বানান কর—বানান করে' বল—"

"কি"

"বাড়ি চলে এস"

"এখন যাওয়া অসম্ভব। কেন ঘাবড়াচ্ছ, আমি বলছি তেমন কিছু হয় নি। সে হোটেল কোথায়—"

"মফঃস্বলে। হরিকোটর না কোথা—"

"তার মানে অনীতার খোঁজেই গেছে। বলি নি আমি ?"

"অনীতার খোঁজে ? কি বুদ্ধি তোমার মরি মরি ! অনীতাকে ফেলে পালিয়েছে সে কথাটা ভুলে যাচ্ছ—"

"ইচ্ছে করে' তো পালায় নি। ট্রেণ ছেড়ে গেল, কি করবে বেচারা—"

"খুব হয়েছে ! লোহার ব্যবসা ছেড়ে ওকালতি কর গিয়ে।"

"না না, জিনিসটা ভেবে দেখ আগে"

"আমি বলছি ওই মাগীর খপ্পরে ও পড়েছে। ও রকম লোক পড়েই থাকে"

"না পড়ে নি। যেটুকু শোনা গেছে, তার থেকে ও কথা বলা যায় না"

"যায়, খুব যায়। আমি চিনি ওদের। আমি যা বলছি ভদ্রভাষায় এর চেয়ে বেশী আর বলা যায় না"

"কি প্রমাণ আছে তোমার ?"

"ওরা দু'জনে মফঃস্বলের একটা হোটেলে কাল একসঙ্গে রাত্রিবাস করেছে এ প্রমাণ আমার আছে। এই যথেষ্ট মনে করি আমি। পুরুষদের চিনতে আর বাকী নেই। তোমাকে আর ওকালতি করতে হবে না ওর হয়ে। বাড়ি চলে এস। ওই মাগীর সঙ্গে ও যে বাস করছে, তাতে আর সন্দেহ নেই—"

"কিন্তু ছি ছি সম্পু—এমনভাবে একজন ভদ্রসন্তানের নামে"—এখানে বলা প্রয়োজন, স্বয়ম্প্রভাকে জিতু সরকার আদর করে' 'সম্পু' বলে ডাকেন।

"কি ? স্পষ্ট করে' বল না, কি বলছ"

"বলছি সুশোভন অনীতার উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছে ট্যাক্সি করে'। সে তো আর জানে না যে অনীতা পরের ষ্টেশনে নেবে ফিরে এসেছে। তাছাড়া অনীতার সঙ্গে ওর সব জিনিস রয়েছে যে"

"জিনিস ?"

"হ্যাঁ"

"কি জিনিস"

"কাপড়-চোপড়, এই সব জিনিস"

"কি ?"

"কাপড়-চোপড় এই সব জিনিস। জিনিস—জিনিস। সুশোভনের জিনিস। বুঝতে পারছ না ?"

"কি কি জিনিস"

"আরে, কি বিপদ, তার সমস্ত জিনিস। যা যা নিয়ে সে বেরিয়েছিল। হোটেলটা কি সিংহরায়েদের বাড়ির কাছাকাছি ?"

"তোমার কথা কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। তোমাকে যা বলছি ভাল করে' শোন। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে সুশোভন ওই মাগীর সঙ্গে একটা হোটেলে গিয়ে বাস করছে—"

"ছি—ছি—সম্পু—যা বলছ তা ভদ্রতাবিরুদ্ধ—ভদ্রতাবিরুদ্ধ। ভুল হচ্ছে তোমাদের। সে অনীতাকেই খুঁজতে বেরিয়েছে। সে মনে করেছে যে অনীতা সিংহরায়বাবুদের ওখানেই গেছে—"

"তাহলে সিংহরায়বাবুদের ওখানে না গিয়ে হোটেলে গেল কেন"

"হয়তো কিছু—"

"এবং একটি যুবতীকে সঙ্গে নিয়ে ?"

"মানে হয়ত কিছু—"

"বাড়ি চলে এস। আপিস বন্ধ করে' দাও"

পোস্টাফিসে টেলিফোন-গাইডটি রেখে সান্ত্বনা সেলুনের দিকে অগ্রসর হ'ল। ভিতরে ঢোকবার আগেই কানে এল অনেকগুলি লোক একসঙ্গে কথা কইছে। দ্বারের কাছে গিয়ে দেখতে পেল সুশোভনের দাড়ি অর্দ্ধেক কামানো হয়েছে, বাকি অর্দ্ধেকটায় তখনও সাবানের ফ্যানা লেগে রয়েছে, নাপিতটি ক্ষুর হাতে করে' দাঁড়িয়ে আছে। পিলে-রোগা একটি ছোকরা এক হাতে কাঁচি এবং আর এক হাতে আয়না নিয়ে নিকটস্থ টুলটির উপর বসে নিজেই তার হিটলারি গোঁফ জোড়াকে আরও হিটলারি করবার চেষ্টা করছে, কোণের দিকে টেবিলে আর একটি নাপিত ভুঁড়ি-ওলা এক স্থূলকায় ব্যক্তির বগল কামাচ্ছে—এবং সকলে মিলে যুগপৎ কথা কইছে। সুশোভনও। বস্তুতঃ সুশোভনই আলোচনাটা সুরু করেছিল। অন্য কিছু নয় মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরী যাবার কোন শর্টকাট আছে কিনা—।

সান্ত্বনা বুঝলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা বৃথা। তার চেয়ে ইতিমধ্যে বরং আর একটা কাজ সেরে ফেলা যাক। সদারঙ্গবিহারীবাবু এইখানেই যেন থাকেন কোথাও, তাঁর সঙ্গে দেখা করে' কালকের রাত্রির ঘটনাটা খুলে বলা যাক। সান্ত্বনার মনে হতে লাগল অবিলম্বে এটা করা দরকার। আর এই ফাঁকেই সেটা সেরে ফেলা ভাল। সদারঙ্গবিহারীলালের ঠিকানা জোগাড় করতে বেগ পেতে হল না বিশেষ। মোটররাইকবিহারী সদারঙ্গবিহারীকে এ অঞ্চলে আবাল-বৃদ্ধবনিতা সবাই চেনে। খোঁজ করতেই একজন বললে যে আজ সকালে তিনি নরসিংহপুরে ত্রিবেদী পণ্ডিতের বাড়িতে এসেছেন। নরসিংহপুর বেশী দূরে নয় সোজা কিছুদূর গিয়েই বাঁ-হাতি।

বড় রাস্তাটা ধরেই সোজা হাঁটতে লাগল সে এবং বলাবাহুল্য অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ একটি দৃশ্য হয়ে উঠল। মফঃস্বলের রাস্তায় একটি লম্বা ফরসা যুবতী জুতো পরে' ফার-কোট গায়ে দিয়ে অসঙ্কোচে খটখটিয়ে হেঁটে যাচ্ছে—এ অতি

চমকপ্রদ দৃশ্য ! সান্ত্বনা নিজেও সেটা বুঝতে পারছিল। তার ঘাড়ের কাছে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল যেন। দরিদ্রনারায়ণ, পল্লী-উন্নয়ন, নৈশ-বিদ্যালয়, শিশুমঙ্গল প্রভৃতি ব্যাপারে বরাবরই উৎসাহ তার—কিন্তু এখন রাস্তার দু'ধারে সারি সারি দণ্ডায়মান ব্যাদিত আনন দরিদ্রনারায়ণদের দেখে মনে মনে বেশ একটু নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ল বেচারি। তাকে দেখে কি ভাবছে এরা কে জানে।

জনমতকে চিরকালই ভয় তার। জনমত-ভীমরুলের দংশন একবার সহ্য করতে হয়েছে তাকে। অবশ্য কাল রাত্রে যা ঘটেছে তার কৌতুকজনক বিবরণ জনসাধারণের গোচর হবার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়, কে আর অত খোঁজ করতে যাচ্ছে। কিন্তু কোনক্রমে এটা যদি প্রচার হয়ে যায় যে কালরাত্রে সে সুশোভনবাবুকে স্বামী বলে' চালিয়েছে এবং হরিমটর পান্থনিবাসে একঘরে রাত্রিবাস করেছে—তাহলে যা হবে তা আর কহতব্য নয়। তা ছাড়া অপরে যা-ই বলুক, তার নিজের মনের ভিতরই খচ-খচ করছিল যে! কি যে কাণ্ড হল।

অবশ্য স্বামীর সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত ছিল। উদার গম্ভীর শান্ত মিতভাষী ব্রজেশ্বরের মুখখানা মনের উপর ভেসে উঠল—না, ও কিছু মনে করবে না। স্ত্রীকে সন্দেহ করবার মতো নীচতা ওর নেই। কিন্তু তা না থাকলেও উনি একজন কংগ্রেস-কর্ম্মী, জন-নায়ক। সেদিক থেকে ভেবে দেখলে জনমতকে মোটেই অগ্রাহ্য করা যায় না। এ কথা যদি রটে' যায় যে কংগ্রেস-কর্ম্মী অধ্যাপক ব্রজেশ্বরের যুবতী পত্নী সুশোভন সরকারকে স্বামী বলে' পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে এক হোটেলে এক ঘরে রাত্রিবাস করেছিল, তাহলে তো ঢি ঢি পড়ে' যাবে। এমনিতেই তো কংগ্রেস পার্টিতে শত্রুর অভাব নেই, এ খবর পেলে তো নেচে উঠবে তারা! কাল এই হতভাগা হোটেলটা দেখে প্রথমে কি আনন্দই হয়েছিল তার। না এলেই হ'ত। বেশ কেটে যেত মোটরে। মোটর ড্রাইভার ছিল, সন্দেহের কোন কারণই ঘটত না। ভারী অন্যায় হয়ে গেছে—ছি, ছি—

সদারঙ্গবিহারীলালের (অর্থাৎ ত্রিবেদী মশায়ের) বাড়ির কাছাকাছি এসে অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত বোধ করতে লাগল সে। ওই হড়বড়ে বাক্যবাগীশ

লোকটার মুখ বন্ধ করতে পারলে আর কোনও ভয় থাকবে না। তার স্বামীর বিরুদ্ধপক্ষীয়দের ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরে হরিমটর হোটেলে আসবার সম্ভাবনা নেই। আর যদিই বা আসেন কেউ, গোঁসাইজির কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করার সম্ভাবনা আরও কম। গোঁসাইজির কাছে আমল পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। সান্ত্বনার ভয় এই অদূরদর্শিতার ফলে তার অমন স্বামীর সুনাম পাছে নষ্ট হয়। মিতবাক খদ্দরধারী ব্যক্তিটির মূর্তি আর একবার ফুটে উঠল মনে।

বেশ সপ্রতিভভাবেই সে বন্ধ দরজার কড়াটা নাড়তে লাগল। ভাবটা যেন যাবার আগে দেখা করতে এসেছে, প্রসঙ্গতঃ শুধু বলে যাবে—কাল রাত্রে কি বিপদেই পড়েছিল তারা। অতদূর হেঁটে ওই হোটেলে এসে তারা গোঁসাইজির ভাব-ভঙ্গী দেখে বুঝল যে স্বামী-স্ত্রী বলে' নিজেদের পরিচয় না দিলে নিষ্ঠাবান গোঁসাইজি নির্ঘাত বলে' বসবেন—'সৎকার করতে অক্ষম'। সুতরাং তাই পরিচয় দিতে হয়েছিল। সদারঙ্গবিহারীলাল এসে অজ্ঞাতসারে তাতে বাস্তবতার এক পোঁচ রঙ চড়িয়ে দেওয়াতে তাদের সুবিধেই হয়ে গেল—সেজন্যও ধন্যবাদ দেবে সে। আর বেশী কিছু বলবার দরকার নেই। ওইটুকুতেই যথেষ্ট হবে।

ত্রিবেদী মশায় গামছা পরে' সর্ষপ তৈল-যোগে নিজের অঙ্গমর্দ্দন করছিলেন। নিজের গাল দুটিতে হাত বুলুতে বুলুতে এসে ধীরে সুস্থে কপাট খুললেন এবং খুলেই সান্ত্বনাকে দেখে একটু হকচকিয়ে গেলেন। বুঝলেন সাবধানে কথা বলতে হবে। হ্যাঁ, সদারঙ্গবিহারীবাবু ছিলেন, কিন্তু বেরিয়ে গেছেন। তা প্রায় ঘণ্টাখানেক হবে।

সান্ত্বনা ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইল ক্ষণকাল।

"কখন ফিরবেন বলতে পারেন"

"সে বিষয়ে সঠিক কিছু বলতে সাহস পাচ্ছি না"

হাতের চেটো দুটো উভয় গণ্ডে আর একবার বুলিয়ে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় এমনভাবে দাঁড়িয়ে আড়চোখে চাইতে লাগলেন ত্রিবেদী মশায় যে সান্ত্বনার পক্ষে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা আর সম্ভব হল না।

ধীরে ধীরে ফিরে এল বেচারী। ফিরে এসে মোটরে বসে' সুশোভনের অপেক্ষা করতে লাগল। মনটা কেমন যেন খারাপ লাগছিল। নানা কথা মনে হচ্ছিল। কাল রাত্রে সদারঙ্গবিহারীলালের কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল সে। এখন নানারকম বিপজ্জনক সম্ভাবনার কথা মনে হত লাগল। যা বাক্যবাগীশ লোক, কি বলতে কোথায় যে কি বলে' বসবে! কোলকাতার কারও যদি কানে ওঠে, তবেই তো হয়েছে!

সুশোভনের মেজাজও ক্রমশঃ খারাপ হয়ে আসছিল। সেলুনে মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরী সম্পর্কে যে ভৌগোলিক আলোচনা চলছিল, তা শুনে ক্রমেই যেন ঘাবড়ে যাচ্ছিল সে। ভাবছিল, সান্ত্বনার মুখও গোমড়া হয়ে আসছে ক্রমশঃ। কাল যখন মোটরে উঠল কি হাসি-হাসি মুখ, ভাসা-ভাসা চোখে কি উদ্ভাসিত দৃষ্টি। এখন যেন একেবারে আলাদা লোক। নারী চরিত্র! দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যা! কিন্তু তার অনীতা এ রকম ভেতর-বুঝে' নয়, আর যা-ই হোক্। এ রকম ক্ষণে ক্ষণে বদলায় না সে। তাকে বুঝিয়ে দিতে পারলেই হল যে সুশোভন এক চুল টলে নি, টলতে পারে না, বাস্ তাহলেই মিটে যাবে। এ বিষয়ে সুশোভনের সন্দেহ ছিল না। আর তো ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে, তখন দেখা যাবে। আগে থাকতে ভেবে লাভই বা কি। তার বিশ্বাস অনীতা বুঝবে।

নাপিত গলায় তোয়ালে জড়িয়ে গালে ক্ষুর চালাতে লাগল। সুশোভন ভাবতে লাগল অনীতার সঙ্গে দেখা হলে কি বলে' সুরু করবে।

(১৩)

মাঠের মাঝখানে একটা বটগাছের ছায়ায় সদারঙ্গবিহারীলাল তাঁর মোটরবাইক থেকে অবতরণ করলেন, রুমাল দিয়ে কপালটা মুছে চারিদিকে চাইলেন একবার। রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গেছে, কোনটা ধরবেন ঠিক করতে পারছিলেন না। মনে হল কাছাকাছি এসে গেছেন এইবার, এ সব সম্ভবতঃ দিগ্বিজয়বাবুরই জমিদারি।

তবু একটু খোঁজ করতে হবে। ঝুমু ভাবলে তার বিলম্বিত-হলেও-অনিবার্য্য মৃত্যু এবার আসন্ন হয়ে এসেছে—হঠাৎ কোটের ফাঁক থেকে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে সে একবার প্রাণপণে—পারলে না। সদারঙ্গবাবু দেখলেন অদূরে আর একটি বটগাছের নীচে একটি গরুর গাড়ি রয়েছে এবং তাতে একটি বৃদ্ধ বসে আছেন। ভদ্রলোক বলেই মনে হল। এগিয়ে গেলেন সেদিকে। বৃদ্ধের দৃষ্টিশক্তি তাদৃশ প্রখর নয়, সদারঙ্গবিহারীলাল যে তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তা তিনি বুঝতে পারছেন বলে' মনে হল না। আপন মনেই কি যেন বলছিলেন তিনি এবং মাথা নাড়ছিলেন। সদারঙ্গবিহারীলাল তাঁর কাছে এসে দাঁড়াতে তিনি মুখ তুলে চাইলেন। প্রথমেই চোখে পড়ল ঝুমুর মুখটা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিলেন অন্যদিকে। দাড়ি-গোঁফওয়ালা একটা জানোয়ার একজন ভদ্রলোকের কোটের ফাঁক থেকে উঁকি দিচ্ছে এ দৃশ্য অপ্রত্যাশিত এবং অস্বস্তিকর। এ আবার কি বিপদ জুটল এসে! নিজের জ্বালাতেই তিনি অস্থির হয়ে আছেন—এ আবার—

"নমস্কার। আচ্ছা, একটা খবর বলতে পারেন—"

"খবর? একটিমাত্র খবরই এখন মস্ত হয়ে রয়েছে আমার কাছে, সেটা যদি শুনতে চান বলতে পারি"

সদারঙ্গবিহারীলালের পরোপকার-চিকীর্ষু অন্তঃকরণ কৌতূহলী হয়ে উঠল, মনে হল ভদ্রলোক বিপদে পড়েছেন হয়তো।

"নিশ্চয় শুনব, কি বলুন"

"ধানের চেষ্টায় বেরিয়েছিলাম, দাম শুনে চক্ষু কপালে উঠেছে। খালি বোরাগুলি নিয়ে মানে মানে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তা-ও যেতে পারছি না। জল খেয়ে আসি বলে' গাড়োয়ান ব্যাটা সেই যে কোথায় সরেছে এখনও তার পাত্তা নেই"

"ও। তাহলে তো মুস্কিলে পড়েছেন আপনি"

"সারাজীবনই এক-নাগাড়ে মুস্কিল চলেছে মশাই। এই করেই সত্তরটা বছর

কাটিয়ে দিলাম, আরও যে ক'টা দিন কর্মভোগ আছে করতে হবে। কিন্তু ধানের অবস্থা যদি এই দাঁড়ায়, তাহলে লোকে বাঁচবে কি করে' বলতে পারেন"

সদারঙ্গবিহারীলাল বুঝতে পারলেন এ ব্যক্তির উপকার করা তাঁর সাধ্যাতীত। ধানের দর কমাতে তিনি পারবেন না।

"আচ্ছা, একটা খবর—"

"খবরই তো বলছি মশাই, শুনুন না। এই খবরই তো আসল খবর। আপনারা শহুরে বাবু, এ সব খবরের ধার ধারেন না হয়তো, কিন্তু ধানের খবরই আসল খবর। ধানের এই অবস্থা হলে জান বাঁচবে না কারও তা বলে' দিচ্ছি—বাইশ টাকা মণেও দিতে চাইলে না মশাই—"

"ও, তাই নাকি। তাহলে চালের দর আরও চড়বে? বার্মা-রাইস না আসাতেই এ রকম হচ্ছে—"

"ওই এক ধুয়ো তুলেছেন আপনারা। বার্মা-রাইস না-ই এল, বিষ্টুমোড়লের গোলায় ধান ঠাসা রয়েছে দেখে এলাম, বদমাইসি করে' ছাড়বে না। আমি দেখব কেমন খদ্দের জোটে ওর। লক্ষ্মণ ব্যাপারীকে চেনেন নি বাছাধন এখনও—"

আপন মনেই আর একবার মাথা নাড়লেন। সদারঙ্গবিহারীলালের হঠাৎ একবার মনে হল, বার্মা-রাইসের সঙ্গে বিষ্টুমোড়লের গোলার ধানের অর্থনৈতিক যোগাযোগটা কোথায় তা চট করে' ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দিলে মন্দ হয় না।

"সেদিনকার ছোঁড়া বিনে—এখন বিষ্টুমোড়ল হয়েছেন। তার বাপকে চরিয়েছি, ঠাকুরদাকে চরিয়েছি—সে ওপরটপকা চাল মারবে আমার ওপর—"

সদারঙ্গবিহারীলালের উপস্থিতিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে' বৃদ্ধ নিজের মাথার টাকে হাত বুলোতে বুলোতে উল্লিখিত অর্দ্ধ-স্বগতোক্তি করাতে সদারঙ্গবাবু থমকে গেলেন একটু। তাঁর রসনায় যে অর্থনৈতিক বক্তৃতাটা উদ্যত হয়ে উঠেছিল তা বাধ্য হয়ে সংযত করে' ফেলতে হল তাঁকে।

"আচ্ছা, একটা খবর বলতে পারেন। মুচুকু—"

"এই বলে দিলাম আপনাকে ওই বিনেকে গলবস্ত্র হয়ে পৌনে একুশ টাকায় ছাড়তে হবে—না যদি হয় নাক কেটে ফেলব আমি—"

বলে' ভদ্রলোক নিজের নাকে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে সদারঙ্গবিহারীলালের দিকে চাইলেন। সদারঙ্গবিহারীলাল আড়চোখে একবার তাঁর নাকের দিকে চেয়ে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিলেন অন্য দিকে।

"তোর ধান তুলসী-মঞ্জরীও নয়, রূপশালীও নয়—"

"মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরী এখান থেকে কতদূর বলতে পারেন"

"পারি বই কি। সেখানে যাওয়া হচ্ছে কেন"

"এই কুকুরটাকে পৌঁছে দিতে হবে"

"ওটা কি কুকুর নাকি"

"হ্যাঁ, কুকুর বই কি। বিলিতি-কুকুর"

"তাই বলুন বিলিতি-কুকুর। বিলিতি-কুকুর কুকুর নয়, বিলিতি-কুকুর। বিলিতি-বেগুন যেমন বেগুন নয়, বিলিতি-বেগুন। মাল নিয়ে কেনা-বেচা করি আমি, আমার কাছে বেফাঁস কথা চলবে না"

সদারঙ্গবাবু অবাক হলেন। ভদ্রলোক শুধু অর্থ নৈতিক নয় প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান নেই। আশ্চর্য্য! এঁর মনে আলোকপাত করা কর্ত্তব্য। অন্ততঃ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য—নিশ্চয়ই!

"কুকুব বলতে আপনি কি বোঝেন"

"ওতে আবার বোঝাবুঝি কি আছে। আপনি যা বোঝেন আমিও তাই বুঝি"

"তবু শুনি না আপনার ধারণাটা কি রকম"

"আপনার ধারণা যে রকম"

"আমি যদি বলি আমার ধারণা এটাও কুকুর"

সদারঙ্গবাবু ঝুমুকে দেখিয়ে হাসলেন একটু।

"তাহলে আমি বলব আপনার ধারণা ভুল। ওটা বিলিতি-কুকুর"

"বিলিতি-কুকুর কি কুকুর নয়?"

"আপনিই আগে বলুন বিলিতি-আমড়া কি আমড়া? বিলিতি-দুধ কি দুধ? বিলিতি-রুটি কি রুটি?"

সদারঙ্গবিহারীলাল উপলব্ধি করলেন এ ব্যক্তির মনে আলোকপাত করতে হলে অনেক ধৈর্য্য এবং সময়ের প্রয়োজন। ধৈর্য্য তাঁর আছে, কিন্তু সময় আপাতত নেই। অন্য সময়ে চেষ্টা করা যাবে—করতেই হবে—ভদ্রলোকের বাড়িটা কোথা জেনে নেওয়া যাক।

"আচ্ছা, এ বিষয়ে পরে আলোচনা করবার ইচ্ছে রইল। আপনার নিবাস কোথা?"

"কেন"

"সুবিধে পাই তো গিয়ে পড়ব একদিন"

সদারঙ্গবিহারীলালের চক্ষু প্রদীপ্ত এবং হাসি আকর্ণ হয়ে উঠল।

"আমার বাড়ি কাঁটকে"

"সে কোন দিকে"

"কাঁটকের নাম শোনেন নি! শালিকপুর কাঁটকে"

"এখান থেকে কতদূর"

"এখান থেকে বার ক্রোশ হবে। সোজা উত্তর দিকে গিয়ে ভগবানগঞ্জের কাছ বরাবর পশ্চিমে বেঁকতে হবে। মাঝে নদী আছে গোটা দুই। বৈত্তি আর চাঁকা—"

"মহাশয়ের নাম কি"

"লক্ষ্মণচন্দ্র কুণ্ডু"

"আচ্ছা, যেতে চেষ্টা করব একদিন"

নোটবুক বার করে' সব টুকে নিলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"আচ্ছা, মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরী কতদূর এখান থেকে"

"গরুর গাড়িতে গেলে ঘণ্টা দুই লাগবে—তাও অবশ্য নির্ভর করবে গরু কেমন তার উপর, শুধু তাই নয়—গাড়োয়ান কেমন হাঁকায় তার উপরও। আমার

ভাগ্যে যেমন জুটেছে এইরকম পক্ষিরাজ গরু আর সুমন্ত্র গাড়োয়ান যদি হয় তাহলে—"

"কোন দিকের রাস্তাটায় যাব"

"সোজা চলে যান না"

"বাঁ-দিকে, না ডান-দিকে"

"ডান-দিকের রাস্তাটা কি সোজা? বেঁকে গেছে দেখছেন না?"

সদারঙ্গবিহারীলাল আর অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করে' বাইকে সওয়ার হলেন।

আর মিনিট পাঁচেক আগে যদি তিনি পৌঁছতে পারতেন তাহলে দিগ্বিজয়-দম্পতির সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। সুশোভন এবং ব্রজেশ্বরবাবুদের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে' অবশেষে তাঁরা যে ক'জন এসে পৌঁছেছিলেন তাঁদের নিয়েই বেরিয়ে পড়েছিলেন শিকার-অভিযানে। সুরেশ্বরী দেবী গিয়েছিলেন নানাবিধ আহারের সরঞ্জাম নিয়ে। তিনি তাঁবুতে থাকবেন।

সুশোভন এবং ব্রজেশ্বরবাবুরা না আসাতে দিগ্বিজয় ভাবছিলেন তিনিই বোধহয় গোলমাল করে' ফেলেছেন সব। কোনও কারণে না আসতে পারলে তারা একটা খবর দিত নিশ্চয়। দু'জনে দু'জায়গা থেকে আসবে, দু'জনেই যখন আসে নি এবং কোনও খবর দেয় নি, তখন তিনিই গোলমাল করে' ফেলেছেন নিশ্চয়।

"বুঝলে তারিখের গোলমাল করে' ফেলেছি সম্ভবতঃ। দু'জনকেই একসঙ্গে চিঠি লিখেছিলাম তো, দু'জনকেই ভুল তারিখ জানিয়েছি, মানে দু'দু'বার ভুল করেছি। তারা বেরোয় নি। হঠাৎ কবে এসে পড়বে কে জানে! তারা ভাববে তাদের প্রত্যাশায় আছি, আমি যে তারিখ ভুল করেছি তাতো জানবে না তারা—"

সুরেশ্বরী দেবীর কণ্ঠে হাসির জল-তরঙ্গ বেজে উঠল।

দিগ্বিজয় বললেন—"কিন্তু তাদের চিঠি এসেছিল তো। তাতে লেখাও ছিল কোন তারিখে কোন ট্রেনে আসছে তারা। চিঠি দু'খানা তোমাকেই দিলাম সেদিন?"

"হ্যাঁ, দিলে তো"

সুরেশ্বরী টেবিলে, 'তাকে' এবং অন্যান্য সম্ভাব্য স্থানে খুঁজলেন। পাওয়া গেল না।

"পেলে ?"

"কই না। টেবিল থেকে মেজেতে পড়ে গিয়েছিল বোধহয়। চাকরটা হয়তো পাঁশ-গাদায় ফেলে দিয়েছে"

"কোথায় ?"

"পাঁশ-গাদায়—ওই যে বাগানের ওধারে ছেঁড়া কাগজপত্তর ওঁচলা ফেলে দেয় যেখানে"

"ও, ছাই গাদায়"

"ছাই গাদাও বলতে পার। পাঁশ-গাদা বললেও ভুল হয় না বোধহয়। আমি তো বরাবর পাঁশ-গাদাই বলি। আমার বাপের বাড়িতেও পাঁশ-গাদাই বলে"

সুরেশ্বরীর কণ্ঠে অভিমানের সুর ধ্বনিত হ'য়ে উঠল। পত্নীর দিকে চকিত দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দিগ্বিজয় বললেন—"ও, তাই নাকি"

"আমরা মুখ্য মানুষ, যা শুনে এসেছি বরাবর, তাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে"

দিগ্বিজয় প্রমাদ গণলেন মনে মনে।

"তাতে আর হয়েছে কি। পাঁশ-গাদাও বলে তো অনেকে। ওইটেই সম্ভবতঃ বেশী শুদ্ধ, পাংশু কথার অপভ্রংশ—"

"তা হোক, পাঁশ পাড়া-গেঁয়ে কথা। ছাইটাই শুদ্ধ বাংলা"

"যাক ও নিয়ে তর্কাতর্কি করে' আর কি হবে। অনর্থক সময় নষ্ট শুধু। তবে এটা আমি ঠিক জানি পাঁশ অশুদ্ধ নয়। সে যাক গে, এখন কি করা যায়—"

সুরেশ্বরী দেবী বললেন—"নিজে দাঁড়িয়ে পাঁশ-গাদাটা—মানে, ছাই-গাদাটা—একবার খোঁজাই না হয় ভাল করে'। যদি পাওয়া যায় চিঠি দুটো—"

"না, তার দরকার নেই। চিঠি পেলেও তারা তো আর আসছে না। আমি তারিখেই গোলমাল করেছি ঠিক। কিন্তু কি করে' যে গোলমাল করলাম!

ছকুবাবু আর গোবর্দ্ধনবাবু, এঁরা দু'জন তো ঠিক এসেছেন। এঁদেরও তো আমিই লিখেছিলাম—"

ছকুবাবু এবং গোবর্দ্ধনবাবু দু'জনেই সুরেশ্বরী দেবীর বাপের বাড়ির সম্পর্কিত লোক। অনেকদিন থেকে আসতে চেয়েছিলেন বলে' এঁদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

সুরেশ্বরী বললেন, "কিন্তু তুমি তো সাধারণতঃ ভুল কর না এ রকম। আমারই বরং ভুলো মন—"

"না, না, কি যে বল সুরো। তোমার আবার ভুলো-মন হল কবে থেকে। ভুলো-মন আমার—"

"কেন বাড়িয়ে বলছ মিছিমিছি। কোথায় কোন পেরেকটি কুড়িয়ে রাখ তা মনে থাকে তোমার—তুমি ভুল করবে তারিখ"

সুরেশ্বরীর কণ্ঠস্বরে ঈষৎ ঝাঁজের আমেজ পাওয়া গেল। বাইরের কোন লোক উপরোক্ত কথোপকথন শুনলে ভাববে যে ভুলো-মন হওয়াটা যেন একটা লোভনীয় গুণ এবং তা না হতে পেরে সুরেশ্বরী দেবী যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

দিগ্বিজয় বললেন—"আমার স্বভাবই গোলমাল করে' ফেলা। তুমি ঠিক মতো সামলে নাও বলেই গোলমাল হয় না"

"কি যে বাজে কথা বল! আমি আবার কখন সামলাতে যাই তোমাকে? তোমার কোন কাজটায় আমি হাত দিতে চাই? দেবার দরকারই হয় না, দিলেই বোধহয় গোলমাল হ'ত। এমনিতে তো কখনও কোন বিষয়ে গোলমাল হতে দেখিনি তোমার—"

দৃঢ়কণ্ঠে দিগ্বিজয় বললেন, "একটা কারণে মনে হচ্ছে যে চিঠিতে ভুল তারিখ দিই নি। চিঠি খামে ঢোকাবার আগে তোমাকে দেখিয়েছিলাম যে। ভুল থাকলে নিশ্চয় চোখে পড়ত তোমার"

"মোটেই না। তোমার চিঠি শোধরাবার দরকার হবে একথা ভাবতেই পারি না—"

"যাই বল, গোলমালটা আমিই করেছি। ট্রেন ফেল করলে সান্ত্বনা অন্ততঃ টেলিগ্রাম করত একটা। সুশোভন ছোকরার সঙ্গে তেমন আলাপ নেই অবশ্য, কিন্তু ওর বাপকে চিনতাম তো, ট্রেন ফেল করে' চুপচাপ থাকবে এ কথা তার সম্বন্ধেও ভাবা যায় না। তারিখেই গোলমাল করে' ফেলেছি আমি—"

(১৪)

রায় বাহাদুর দিগ্বিজয় সিংহরায় লোকটি ক্ষীণকায়,খর্ব্বাকৃতি। গায়ের রঙ ঘোর কালো, এত কালো যে তাঁর পাকা গোঁফ ও ভুরুকে অস্বাভাবিক দেখায়, মনে হয় তুলো দিয়ে তৈরি করে' জুড়ে দেওয়া হয়েছে বুঝি। মাথায় টাক, পালিশ-করা আবলুস কাঠের মতো চকচকে। ঘাড়ের ধারে ধারে এবং কানের পাশে পাশেও অল্প-স্বল্প তুলোর সারি আছে। ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি। নিজের রঙ কালো বলেই সাদা জিনিসের দিকে সম্ভবতঃ বেশী ঝোঁক। পায়ের চটিটা পর্য্যন্ত সাদা চামড়ার এবং সমস্তই নিখুঁত রকম নির্ম্মল। সুরেশ্বরী দেবী যৌবনে সুন্দরী ছিলেন। এখন বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনও গাল দু'টি টুকটুক করছে। এখনও একটু সাজগোজ করতে ভালবাসেন।

দিগ্বিজয় সিংহরায় বরাবর মফঃস্বলেই বাস করছেন। নিজের ক্ষুদ্র জমিদারির গণ্ডী ছেড়ে কদাচিৎ বাইরে গেছেন তিনি। সেই যে বহুকাল আগে কোলকাতায় একবার ট্যাক্‌সি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিলেন, তারপর থেকে আর শহরমুখো হন নি। ট্যাক্সি অবশ্য চাপা দেয় নি তাঁকে, তিনি যে পড়ে' গিয়েছিলেন তা-ও নয়। কোন রকম অঙ্গচ্যুতি বা পদচ্যুতি না ঘটলেও আর একটা অভূতপূর্ব্ব দুর্ঘটনা ঘটেছিল যা তাঁর তেষট্টি বছরের জীবনে আর কখনও ঘটে নি। তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হয়েছিলেন।

দিগ্বিজয় সিংহরায়ের একটা সন্দেহ কিন্তু মাঝে মাঝে জাগে এবং জাগলেই ব্যাকুল হয়ে পড়েন তিনি। তাঁর সন্দেহ পত্নী সুরেশ্বরীকে। সুরেশ্বরী বরাবর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে' আসছেন যে তাঁরও নাকি শহরের প্রতি ঘোর বিতৃষ্ণা।

কিন্তু ওই মোটর দুর্ঘটনা হওয়ার ফলে শহরের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরীতে এসে বসবাস করতে আসার আগে যখন তিনি কোলকাতায় ছিলেন তখনকার সুরেশ্বরীর মুখচ্ছবিটা মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে দিগ্বিজয়ের মানসপটে। তখনকার সেই উদ্ভাসিত চোখমুখ, উচ্ছ্বসিত কথাবার্ত্তা থেকে অনুমান করা শক্ত যে সুরেশ্বরী সত্যিসত্যিই উচ্ছৃঙ্খল নাগরিক-জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছিলেন। দিগ্বিজয়ের সন্দেহ যে সুরেশ্বরীর বিতৃষ্ণা আসলে বোধ হয় আত্মত্যাগমূলক স্বামি-ভক্তির নিদর্শন। তা যদি হয়, তাহলে ভয়ানক ব্যাপার। ছোটবড় অনেক ব্যাপারেই দিগ্বিজয়ের সন্দেহ হয় যে সুরেশ্বরীর আচরণ সব সময়ে অকৃত্রিম নয়। উদাহরণস্বরূপ সিমের ব্যাপারটাই ধরা যেতে পারে। সিম জিনিসটা দিগ্বিজয় দু'চক্ষে দেখতে পারেন না এবং কোনও এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে বহুকাল আগে বিবাহের ঠিক অব্যবহিত পরেই কথাটা তিনি সুরেশ্বরীকে বলে' ফেলেছিলেন। ফলে, সুরেশ্বরীও সিম বর্জ্জন করলেন, শুধু তাই নয়—বলে' বেড়াতে লাগলেন কোনও তরকারিতে সামান্য একটু সিম থাকলেও তাঁর গা গুলিয়ে ওঠে। দশ বৎসর এইভাবে কাটল। তারপর একদিন কোনও কারণে দিগ্বিজয়কে একবার দু'দিনের জন্য বাইরে যেতে হয়েছিল। ফেরবার সময় খবর দিতে পারেন নি। হঠাৎ দুপুরে বাড়ি ফিরে অবাক হয়ে গেলেন। সুরেশ্বরী ভাত খেতে বসেছেন—পাতে থরে থরে সাজানো সিম-ভাতে, সিম-ভাজা, সিমের চচ্চড়ি, সিমের শুক্তো। সিম সীমা অতিক্রম করেছে। সীমন্তিনীর এবম্বিধ ব্যবহারে 'থ' হয়ে গেলেন দিগ্বিজয়। সেইদিন থেকে সুরেশ্বরীকে আর বিশ্বাস করেন না তিনি। যে স্ত্রীলোক সামান্য একটা সিমের ব্যাপারে এতটা করতে পারে তার অসাধ্য কিছু নেই। হয়তো তার মনে কত বাসনা গোপনে ক্ষুধিত হয়ে রয়েছে, তিনি কিছুই জানতে পারছেন না, জানবার উপায় নেই মোটে। শহরের থিয়েটার, সিনেমা, পাড়া-বেড়ানো প্রভৃতি সম্বন্ধে সুরেশ্বরীর আসল মনোভাব যে কি তা কে বলতে পারে? ফলে এই হয়েছে—কোনও বিষয়ে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করলেই দিগ্বিজয় তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা দেখতে পান। সুতরাং সুরেশ্বরী যখন একদিন বললেন যে তিনি তাঁদের পুরোনো 'কম্পাস'

গাড়ি বাতিল করে' দিয়ে কিছুতেই মোটর কিনবেন না, তখন দিগ্বিজয় বুঝলেন সুরেশ্বরী মনে মনে মোটর কেনবার জন্যে লোলুপ। নিজের আন্তরিক মোটর-বিতৃষ্ণাকে দমন করে' তাই তাঁকে প্রকাশ্যে মোটরের জন্য লালায়িত হয়ে উঠতে হল। এ ছাড়া সুরেশ্বরীর শখ মেটাবার আর অন্য উপায় ছিল না। বহু অর্থব্যয় করে' মোটর কিনলেন একখানা। সুরেশ্বরীর চোখে জল এসে পড়েছিল। দিগ্বিজয়ের মনে হল এ আনন্দাশ্রু। কিন্তু সুরেশ্বরী বাইরে প্রকাশ করলেন রাগ। কেন, কি দরকার ছিল মোটর কেনবার? 'কম্পাস' গাড়িই ভাল লাগে তাঁর। তাঁদের অনাবিল দাম্পত্য-কৌমুদী মেঘাবৃত হয়ে উঠেছিল ক্ষণিকের জন্য। অবশ্য তা ক্ষণিকের জন্যই এবং একবারমাত্র। তখন থেকেই এঁরা পরস্পরের নিঃস্বার্থপরতার প্রকোপ থেকে পরস্পর বাঁচবার চেষ্টা করছেন সুকৌশলে। নেপথ্যে দু'জনের মধ্যে অদ্ভুত একটা দ্বন্দ্ব চলেছে নিরন্তর। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই আটত্রিশ বৎসর-ব্যাপী দাম্পত্য-জীবনে নিঃস্বার্থপরতার এই অনমনীয় দ্বন্দ্বে একটি দিনের জন্য মনোমালিন্য হয় নি দু'জনের মধ্যে। একটি রূঢ় কথা কেউ কাউকে বলেন নি। কোনও নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আশু মীমাংসা করা অপরিহার্য্য হয়ে পড়লে—যেমন কোনও দুঃস্থ প্রতিবেশী বা বন্ধুকে সাহায্য করা সম্পর্কে উপায় নির্দ্ধারণ বা ওই জাতীয় কিছু—তখন জটিলতা না বাড়িয়ে দিগ্বিজয় সটান সুরেশ্বরীর মত সমর্থন করেন। এ ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু এ-ও খুব সহজে হ'ত না। সুরেশ্বরী চাইতেন দিগ্বিজয়ের কথায় সায় দিতে। এমন ভাব প্রকাশ করতেন যে দিগ্বিজয় যদি সুরেশ্বরীকে তাঁর মতে (দিগ্বিজয়ের মতে) সায় দিতে দেন, তাহলে সুরেশ্বরী যেন চরিতার্থ হয়ে যাবেন। কিন্তু দিগ্বিজয় আত্মত্যাগের দুর্গে অবিচলিত থেকে সুরেশ্বরীর মতটাকেই সমর্থন করতেন, সুরেশ্বরীকে শেষ পর্য্যন্ত আত্মমত-বিসর্জ্জনের সুখ থেকে বঞ্চিত হ'তে হত। ব্যাপারটা সহজে মিটে যেত।

বন্ধুবান্ধবদের তাঁরা খুব যে একটা নিমন্ত্রণ করতেন, তা নয়। সুরেশ্বরী তাঁর দু'চারজন অন্তরঙ্গকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করতে পেলে খুশী হতেন, কিন্তু তাঁর সন্দেহ হ'ত হয়তো তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা দিগ্বিজয়ের বিরক্তির কারণ হবে। তিনি

এ-ও জানতেন দিগ্বিজয় কিছুতেই সে কথা স্বীকার করবেন না। নিজের মনের টুঁটি চেপে ধরে' মেরে ফেলবেন তবু স্বীকার করবেন না। দিগ্বিজয়ও শিকারপার্টি আহ্বান করতে ইতস্ততঃ করতেন, কারণ তাঁর ধারণা সুরেশ্বরী জীবহত্যা-ব্যাপারে কষ্ট পান মনে মনে। বলা বাহুল্য সুরেশ্বরী কখনও বলেন নি একথা। বলেন নি —তার কারণ সুরেশ্বরীর ধারণা দিগ্বিজয় শিকারে আনন্দ পান, যদিও দিগ্বিজয় তাঁকে লক্ষবার বলেছেন, শিকার-টিকার মোটেই ভাল লাগে না তাঁর। উচ্চ উচ্চতর উচ্চতম কণ্ঠে বলেছেন। সুরেশ্বরী বিশ্বাস করেন নি। পতি-পরায়ণা আত্মত্যাগ-শীলা রমণীর স্বামী হওয়া যে কি দুর্ভোগ তা দিগ্বিজয়কে হাড়ে হাড়ে বুঝতে হয়েছে। সুখের বিষয়, দিগ্বিজয় সুরেশ্বরীকে বেশী ভালবাসেন, না সুরেশ্বরী দিগ্বিজয়কে বেশী ভালবাসেন এ প্রশ্ন একদিনও ওঠে নি। উঠলে জটিলতম সমস্যার সৃষ্টি হত।

…সেদিনকার শিকার পার্টিতে তিনজন শিকারী যোগদান করেন নি। সুশোভন এবং ব্রজেশ্বরবাবুর যোগ না দেবার কারণ অজ্ঞাত থাকলেও ছকুবাবুর যোগ না দেবার কারণটা জেনে ফেলেছিলেন সবাই। ছকুবাবু সুরেশ্বরীর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। যৌবনকালে তিনি ইন্‌কিলাবপুরের স্বনামধন্য বিহারী জমিদার পোখমন সিংহের অন্তরঙ্গ পারিষদ ছিলেন। তিনি গিয়েছিলেন সেখানকার স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক হিসেবে, কিন্তু হয়ে পড়েছিলেন পারিষদ। তাঁর যকৃত, পায়ের গাঁটগুলি এবং ভাষা এখনও সে অন্তরঙ্গতার পরিচয় বহন করছে। ভাষার মধ্যে ঢুকেছে অদ্ভুত ধরনের বিহারী বুকনি, লিভারে প্রায়ই ব্যথা হয়, হাঁটুটি ফুলে ওঠে মাঝে মাঝে। সেদিন সকালেই তিনি সকলকে জানিয়েছিলেন বাতটা আবার 'উখড়েছে'। শিকারে যেতে পারবেন না। আসলে হয়েছিল লিভারে ব্যথা—এ কথাটা সকলকে সব সময়ে জানাতে চাইতেন না তিনি।

তিন তিনজন শিকারী অনুপস্থিত হওয়াতে 'পার্টি' জমল না মোটে। তবু দিগ্বিজয় দমলেন না। গ্রাম থেকে আরও দু'জন জোগাড় করলেন। গোবর্দ্ধনবাবু সম্বন্ধে কিন্তু খুব আশা পোষণ করতে পারছিলেন না তিনি। বড্ড বেশী গোবর-গণেশ গোছের লোকটা। ও কি শিকারে সুবিধে করতে পারবে?

সুরেশ্বরী দেবীও খাবার টাবার সঙ্গে নিয়ে যাবেন। সহধর্ম্মিণীত্ব রক্ষা করা হবে তাছাড়া আর একটা গোপন উদ্দেশ্যও ছিল তাঁর। ওঁরা যে অঞ্চলে শিকার করতে যাচ্ছেন সেখানে মাধব গোমস্তার বাড়ি। মাধবের একটি ছেলে হয়েছে ক'দিন হল। সুরেশ্বরী ঠিক করেছিলেন ওঁরা যখন হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকবেন তখন তিনি গিয়ে মাধবের ছেলেটিকে দেখে আসবেন।

যারা আসে নি তারা যে খবর না দিয়েও এসে পড়তে পারে, এ কথা মনেই হল না সুরেশ্বরীর।...

বাইরে গেটের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দিগ্বিজয় এবং গোবর্দ্ধন গাড়ির কাছে অপেক্ষা করছেন সুরেশ্বরী দেবীর জন্য। অসুস্থ ছকুবাবুর যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় সুরেশ্বরী তার নানারকম ব্যবস্থা করে দিলেন; যাবার আগে আর একবার সব নিজে তদারক করছিলেন।

ছকুবাবু লোকটিকে দেখলেই শুকনো বাসী তেলেভাজা খাবারের কথা মনে পড়ে যায়। শীর্ণ চেহারা। চোখের শাদা অংশে হলদে রঙের ছোপ। গালের হাড়গুলি উঁচু। চোখের দৃষ্টি লুব্ধ। সমস্ত মুখে কেমন যেন একটা মার্জ্জার-ভাব। গোঁফগুলি ঈষৎ কটা এবং অনেকটা বিড়ালের গোঁফের মতই। ছকুবাবু লাঠি ধরে' ধরে' সুরেশ্বরীর পিছু পিছু দ্বার পর্য্যন্ত এলেন। শিকার-প্রসঙ্গে দিগ্বিজয়ের মুখে এতক্ষণ তুবড়ি ফুটছিল। আসন্ন শিকারের কাল্পনিক উল্লাসে নিজেকে এবং গোবর্দ্ধনকে এতক্ষণ চাঙ্গা করে' তোলবার চেষ্টা করছিলেন তিনি বক্তৃতার চোটে। হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে বলে' উঠলেন—"শিকার জিনিসটাই কিন্তু ভাল লাগে না আমার মোটেই।" গোবর্দ্ধন বিস্মিত হয়ে আড়চোখে চাইলেন একবার তাঁর দিকে। সুরেশ্বরী দ্বারপ্রান্তে এসে ঘাড় ফিরিয়ে ছকুবাবুকে বললেন, "বাড়ি নিয়ে আপনি থাকুন তাহলে, আমরা ঘুরে আসি। খাবার খাবেন কিন্তু, রেখে গেলুম সব"

"খাবার! না, ও বাত আর বোলো না, দোহাই মহাবীরজির! খেতে আর পারব না"

"না, না, চেষ্টা করবেন তবু। আপনার জন্যেই বিশেষ করে' কম মশলার

তরকারি করলাম। দেখবেন একটু চেখে। তিনটে নাগাদ নিশ্চয় খিদে পেয়ে যাবে। সকালে তো খান নি তেমন কিছু"

"খিদে এখনই পেয়েছে। ভুকের কিছু কমি নেই, কিন্তু ডর লাগছে। এর পর যদি পেটের বাইও উখড়ে যায় খতম হয়ে যাব"

"না, না, কি যে বলেন—কিচ্ছু হবে না। পায়ের উপর হট্ ব্যাগটা চাপিয়ে একটু ঘুমুন দেখি। এখানে কেউ বিরক্ত করবে না আপনাকে। শেক দিয়ে একটু যদি ঘুমুতে পারেন ব্যথাটা কমে যাবে, ভাল লাগবে তখন"

"সেটা মুশ্‌কিন্ বটে। দেখি, কিন্তু তোমার যে মেজমানরা আসে নি, তারা হুড়মুড় করে এসে অগর পৌঁছে যায়"

"তা সম্ভব নয়। এখন ট্রেন নেই তো। এলে কালই আসত"

"হল তোমার"—দিগ্বিজয় তাগাদা দিলেন—"শিকারে যদি যেতেই হয় একটু তাড়াতাড়ি করাই ভাল"

"এই যে"

খাবারের ঝুড়ি, টিফিন-কেরিয়র প্রভৃতি সমভিব্যাহারে গাড়ির কাছে এগিয়ে এলেন সুরেশ্বরী।

"চল যাওয়া যাক এইবার। ছকুদা ভয় পাচ্ছেন যে ওরা যদি আবার সব এসে পড়ে কি করবেন উনি। আমার মনে হয় না কেউ আসবে। বড় জোর একটা টেলিগ্রাফ আসতে পারে। যদি আসে রেখে দেবেন, জবাব দেবার থাকে যদি কিছু জবাব দিয়ে দিবেন যা হয় একটা—"

শিক্ষক ছকুবাবুর ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত হল।

"টেলিগ্রাফ আবার কি? টেলিগ্রাম মীন করছ নিশ্চয়। টেলিগ্রাফ গলৎ হ্যায়—"

"তাই যদি বলতে চান বলুন"—সুরেশ্বরী দেবী গাড়িতে উঠে কম্বলের বিচিত্র আবেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে স্থাপিত করে' বললেন—"আমরা মুখ্যুসুখ্যু লোক, আমরা টেলিগ্রাফই বলি। ওতে খুব বেশী দোষ হয় না বোধহয়"

"কিছু দোষ হয় না"—বলে' উঠলেন দিগ্বিজয়। তিনি আর ধৈর্য্য ধরতে পারছিলেন না। এই নূতন ঝামেলা সৃষ্টি করার জন্তে ছকুবাবুর দিকে একটা রোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে' তিনি বললেন—"আমার তো মনে হয় টেলিগ্রাফটাই বেশী শুদ্ধ। টেলিগ্রামটা হচ্ছে—ওই যে সংস্কৃতে কি বলে যেন—নামধাতু—না না—প্রক্ষিপ্ত? উহুঁ কথাটা ঠিক মনে পড়ছে না, যোগরূঢ়ও নয়—যাক গে—সোজায় এই দেখুন না আমরা খাতায় যা সই করি তার নাম অটোগ্রাফ, অটোগ্রাম নয়"

"রাম কহো, রাম কহো, রাম কহো"—খ্যাক খ্যাক করে' হেসে ফেললেন ছকুবাবু—"মহাবীরজিকি ভালা হো। আরে মশাই, টেলিগ্রাফ হল যন্ত্রটার নাম। বিশেষণরূপেও ওর ব্যবহার হতে পারে—যেমন টেলিগ্রাফ লাইন"

"মরুক গে"—ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলেন দিগ্বিজয়—"আমরা অভিধানও লিখছি না, পরীক্ষাও দিচ্ছি না। চিরকাল টেলিগ্রাফ করে' এসেছি, চিরকাল টেলিগ্রাফ করবও, কি বলেন গোবর্দ্ধনবাবু—অ্যাঁ?"

গোবর্দ্ধনবাবু গাড়িতে চড়বার জন্তে কসরৎ করছিলেন। দিগ্বিজয়ের ঘোড়ার গাড়িটি একটু অসাধারণ গোছের। পা-দানিটা বেশ একটু উঁচুতে। দিগ্বিজয়ের কথা শুনে নিরীহ গোবর্দ্ধন বললেন—"তা বই কি। ও সব হল কথার মার প্যাঁচ—ওতে কি আসে যায়—"

"আগে বাঁ পা-টা দিন তারপর হাতলটা ধরুন। হ্যাঁ—"

ছকুবাবুর পীতাভ চক্ষু দু'টি ব্যঙ্গ-দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি বললেন, "অত হাঙ্গামা না করে' 'তার' বললেই মিটে যায়। তার যদি আসে তাহলে খুলব সেটা। কিন্তু কি জবাব দিতে হবে তাতো মালুম নেই"

সুমিষ্ট হাসি হেসে সুরেশ্বরী বললেন—"দেবেন না তাহলে। আমরা এসে যা হয় করব। তোমরা সব বসেছ তো ঠিক করে'? চল আর দেরি কর্‌বা নয়—ই: শিকারের কথা ভেবে যা আনন্দ হচ্ছে"

"থাম, থাম, এক লহমা। শোন—"

ছকুবাবু গাড়ি থামালেন আবার।

"আপনার যে মেজমানদের আসবার কথা, তাদের মধ্যে যেটি বলিয়া জেলায় গিয়েছিলেন তাঁর নামটি কি"

"বলেছি তো আপনাকে। ব্রজেশ্বর—সান্ত্বনার স্বামী"

"ব্রজেশ্বর। আচ্ছা, আর রুকব না তোমাদের। দিগ্বিজয়—দিগ্বিজয় করে' এস তাহলে। রাম রাম"

"শিকার টিকার ভালই লাগে না আমার"—দিগ্বিজয় আর একবার বললেন সুরেশ্বরীর দিকে চেয়ে।

গাড়ি বেরিয়ে গেল। ছকুবাবুর বাতও সেরে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দিগ্বিজয় যে হুইস্কির বোতলটি দিয়েছিলেন তাঁকে এবং যার প্রায় সবটাই শেষ হয়ে এসেছিল সেইটি বার করে' লিভারের চিকিৎসা সুরু করলেন তিনি। একটু পরেই কিন্তু চমকে উঠতে হল তাঁকে। এ কি, গেটের সামনে 'মেশিন গান' দাগছে কে! অস্ফুটকণ্ঠে একটা অশ্লীল বিহারী গাল উচ্চারণ করে' উঠলেন তিনি, জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন। দেখেই চেয়ারে এসে বসলেন আবার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ভৃত্য পরেশ এসে দেখলে, ছকুবাবু যুগপৎ ভীত এবং কুপিত হয়ে বসে আছেন। পরেশ বাঙালী চাকর, বেশ কায়দা-দুরস্ত।

"বাইরে একজন বাবু একটা কুকুর নিয়ে এসেছেন। আপনি তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করবেন কি? নিয়ে আসব এখানে?"

"আমি? ওয়াস্তে?"

'ওয়াস্তে' কথার তাৎপর্য্য পরেশ ঠিক বুঝতে পারলে না। 'ওয়াস্তে' কথার অর্থ 'হেতু'।

"তিনি বললেন খুঁজে পেয়েছেন"

"কি খুঁজে পেয়েছেন?"

"কুকুরটা"

"বুঝলাম। কিন্তু আমি তার সঙ্গে মোলাকাৎ করি, এ তুমি চাইছ কেন"

"উনি চাইছেন। উনি ব্রজেশ্বরবাবুর স্ত্রীর খোঁজে এসেছেন বললেন, কিন্তু তিনি এখানে—"

"কার স্ত্রীর খোঁজে? ব্রজেশ্বরবাবুর? ও, হ্যাঁ ব্রজেশ্বরবাবু। তাঁর স্ত্রীর খোঁজে এসেছেন? তারপর?"

"ব্রজেশ্বরবাবুর স্ত্রী এখানে নেই শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। তারপর আমি যখন বললাম মা বাবু দু'জনেই বেরিয়ে গেছেন, তখন তিনি জিগ্যেস করলেন যে বাড়িতে আর কেউ আছে কিনা। আমি আপনার নাম করাতে উনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন"

"যিনি এক্ষুণি ঝড়ঝড়ে মোটরবাইকে চড়ে এলেন তিনি? চেন তুমি ওঁকে?"

ছকুবাবু অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে দক্ষিণ নাসারন্ধ্রটি চেপে রেখে বাম রন্ধ্র দিয়ে ভীষণ জোরে নাক ঝাড়লেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সদারঙ্গবাবু"

"আচ্ছা, ডাক। কুত্তা এনেছে একটা? হে ভগবান"

একটু পরেই দ্বারপ্রান্তে সদারঙ্গবিহারীলাল আবির্ভূত হলেন। আপাদমস্তক ধূলোয় ঢাকা, বগলে কুকুর, চোখেমুখে আনন্দ এবং উৎসাহ ঝলমল করছে। চশমাটা ঠিক করে' নিয়ে তিনি ছকুবাবুর দিকে চাইলেন।

"বকুবাবু?"

"ছকু"

"ও, ছকু, মাপ করবেন, ঠিক ধরতে পারি নি তাহলে। আমার নাম সদারঙ্গবিহারীলাল"

"আসুন, বসুন। ওটা আপনার 'চাইনীজ্-পুড্‌ল্' দেখছি"

"বাঃ, আপনি তো কুকুর চেনেন! হ্যাঁ, 'চাইনীজ-পুড্‌ল্'ই"

"চিনি বই কি। পোখমনবাবুর ছিল যে একটা—"

"পোখমনবাবু কোথায় থাকেন"

"বিহারে"

"ও, বিহারে। পোথমন? ও বিহারী, স্যাচরালি! বিহারী ভদ্রলোকের নাম পোথমন তো হবেই। ঠিক। পোথমন—"

ছকুবাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল হঠাৎ।

"মনে হচ্ছে এরপর বলবেন রামায়ণের নায়কের নাম তো রামচন্দ্র হবেই, ন্যাচরালি"

ঘাবড়ে গেলেন সদারঙ্গবিহারীলাল। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। চশমায় আলোক-রশ্মি বিকিরণ করে' আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসি হাসলেন একটা।

ছকুবাবু বললেন—"মাপ করবেন, মেজাজটা ভাল নেই। লিভার—মানে—বাতে বড় কষ্ট পাচ্ছি। আপনি বিহারে কখনও যাননি মনে হচ্ছে"

"না, যাই নি। তবে যাবার ইচ্ছে আছে। খুব। শুনেছি চমৎকার জায়গা"

"মোটেই চমৎকার জায়গা নয়, ভয়ানক ধুলো! চমৎকার জায়গায় একবার জীবনে গিয়েছিলাম, ওই পোথমনবাবুর সঙ্গেই"

"দার্জিলিং কিম্বা কাশ্মীর নিশ্চয়"

"না, সিঙ্গাপুর। গেছেন কখনও"

"না, তবে যাবার ইচ্ছে আছে। ক্লাইমেটটা খারাপ শুনেছি"

"মোটেই খারাপ নয়"

"ও, নয়?"

"চমৎকার ক্লাইমেট। এসব দেশের ক্লাইমেট কি ক্লাইমেট? মাতাহারির কি জানেন আপনি?"

"আজ্ঞে?"

"বলছি, মাতাহারির বিষয় কিছু জানেন?"

"মাতাহারি? একজন বিখ্যাত স্পাই শুনেছি। একটা ফিল্মেরও ওই নাম আছে—ওই স্পাইয়ের গল্প নিয়েই লেখা সম্ভবতঃ। দেখি নি, আন্দাজ করছি"

"মাতাহারি মানে সূর্য্য। মালয় ভাষা"

"ও, তাই না কি। বাঃ!"

"হুবহু অনুবাদ করলে হয় 'দিনের চোখ'। মাতা—চোখ, হারি—দিন। মাতাহারি—দিনের চোখ—সূর্য্য"

"বাঃ! দিনের চোখ! চমৎকার—পোয়েটিক্—"

"তাই বলছি এ হতভাগা দেশে সূর্য্যের কতটুকু পরিচয় পান আপনারা"

"ও, হ্যাঁ—তা বটে। হা—হা—হা। তবে এখানেও গরম খুব"

"একে গরম বলেন? আপনার সিঙ্গাপুরে যাওয়া উচিত"

"যাবার ইচ্ছে আছে"

"যাবেন একবার। এখন আপনার দরকারটা কি বলুন। 'স্টিংগাহ্' চলবে একটা?"

"আজ্ঞে?"

"এক 'পেগ' দেব? সিঙ্গাপুরে ড্রিঙ্ককে স্টিংগাহ্ বলে। এই যে—"

নিজের গ্লাসটা দেখালেন।

"ও! না, ধন্যবাদ—"

"পোখমনবাবুর স্মৃতি এটি"—এই বলে' ছকুবাবু গ্লাসটি তুলে আর এক ঢোঁক খেলেন।

"এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে এ ছাড়া একটি দিন চলবার উপায় নেই"

"ঠিক। বিহারে যেতে হবে একবার। সিঙ্গাপুরেও। এখন এই কুকুরটাকে এনেছি। রাস্তায় কুড়িয়ে পেলাম এটাকে"

"পুষুন। আমার দরকার নেই। আমি নিজের জ্বালাতেই অস্থির, আমি ও-নিয়ে কি করব"

"না—না—ঠিকই তো। তা নয়—মানে এ কুকুরটা আমার চেনা কুকুর—হঠাৎ রাস্তায় দেখতে পেলাম। অদ্ভুত ঠেকছে, নয়? কি হয়েছে তাহলে শুনুন সব"

পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করে' সব বললেন তিনি। ছকুবাবু ব্রজেশ্বর-দম্পতীর নৈশ-অভিযানের কাহিনী শুনে বিস্মিত তো হলেনই না, উপরন্তু তারা যে কোনও মুহূর্তে এসে পড়তে পারে জেনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

"সীয়ারাম, সীয়ারাম—তারা তো তাহলে এলো বলে—অ্যাঁ"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই তো আশা করছি। আসবেন নিশ্চয়ই। তাঁদের এখানে দেখতে পাব আশা করেই তো এসেছিলাম আমি—"

কিন্তু আমি তো তাহলে মহামুশকিলে পড়ে যাব দেখছি। তাঁদের কোন ঘরে থাকতে দেব কি করব আমার তো কিছুই জানা নেই। সুরো হয়তো চাবি নিয়েই চলে গেছে। হনুমানজি বোম বখেড়ায় ফেলে দিলে দেখছি ঝড়াক্সে"

ছকুবাবু চেয়ার থেকে উঠে অস্থির ভাবে ঘরের চারিদিকটা পরিক্রমণ করে' নিলেন একবার।

"এতে ভাবনার কি আছে"—সদারঙ্গবাবু বললেন—'চাকরটা নিশ্চয় জানে সব। জানা উচিত অন্ততঃ। নিশ্চয়। ডাকব?"

"ডাকুন, ডাকুন। কিছু করুন একটা। অপরিচিত লোক সব হুড়মুড় করে' এসে পড়লে দিল্ ঘাবড়ে যায় আমার। ওই ঘণ্টাটা টিপুন। আচ্ছা, আপনি বাইক করে' গিয়ে সুরেশ্বরীকে ডেকে আনতে পারেন?"

"শুনুন, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। এদের জানি, অতি অমায়িক লোক ওরা। এসেই ঘরের লোকের মতো হয়ে যাবে দেখবেন। কিছু বেগ দেবে না। এসেই খুব সম্ভবতঃ শিকারে চলে যাবে"

"তা' হতে পারে। যাক্, ব্রজেশ্বরবাবু আসছেন তবু ভাল। উনি বলিয়া জেলায় ছিলেন কিছুদিন শুনেছি। ধরবার ছোঁবার মতো কিছু পাব আশা করি। খাঁটি কলকাতিয়া লোককে বড় ভয় করি। কেমন যেন ফসকে ফসকে যায়—"

"উনি বলিয়া জেলায় গিয়েছিলেন না কি? হিষ্ট্রির রিসার্চের জন্যে, না কংগ্রেস ক্যাম্পেন্?

"মালুম নেই"

পরেশ এসে প্রবেশ করল।

সদারঙ্গবিহারী তার দিকে চেয়ে বললেন—"ব্রজেশ্বরবাবুরা যদি এসে পড়েন—আসবেনই—তাহলে তাঁরা কোন ঘরে থাকবেন, তাঁদের জন্যে কি কি ব্যবস্থা করতে হবে—তুমি জান তো সব ?"

"জানি"

পরেশ মিতবাক্ ব্যক্তি। বহুকাল থেকে সে সুরেশ্বরী দেবীর কাছে আছে। তার এই ছোট্ট 'জানি'র মধ্যে সে কতখানি যে প্রকাশ করলে তা' বাইরের লোকের বোঝবার উপায় নেই। সদারঙ্গবিহারীলালের দিকে সে যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার প্রাঞ্জল অর্থ—আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারের মধ্যে আপনি ফোড়ন কাটছেন কেন মশাই।

"জান ? ও, তাহলে তো মিটেই গেল। বাস্—"

গলা খাঁকারি দিয়ে সদারঙ্গবিহারীলাল আড়চোখে একবার ছকুবাবুর দিকে চাইলেন। তাঁর মনে হল ছকুবাবুর অন্তরে সাহস সঞ্চার করতে হলে ব্যাপারটা আর একটু বিশদ করা দরকার বোধহয়। পরেশের দিকে চাইলেন তিনি।

"তাঁদের খাবার বসবার শোবার হাতমুখ ধোবার ইত্যাদি ইত্যাদির সব ব্যবস্থা করতে পারবে তাহলে ?"

"পারব। ইত্যাদি ইত্যাদিটা কি বুঝলাম না—"

"না, ও কিছু নয়। মানে, তারা আসছে—মানে আই মীন, পথে আছে—একটু ইয়ে তো হবেই নিশ্চয়। তবে লোক খুব ভাল। দু'জনেই। আমি তাদের সঙ্গে কাল রাতটা কাটিয়েছি কি না—ঠিক পুরোরাত নয়, খানিকটা, তবু ধাতটা জানা হয়ে গেছে—বিশেষ বেগ পেতে হবে না,—সাদাসিধে একদম। তোমাকে তো বলেইছি গোড়ায় সব। কেবল বকুবাবু—ও ছকুবাবু—তোমাকে ডাকতে বললেন কিনা তাই—"

"চুপ করুন"—ছকুবাবু বলেন—"আপনি সমস্ত গোলমাল করে' দেবেন দেখছি। 'শোন পরেশ, ব্রজেশ্বরবাবুরা আসছেন সব ঠিক করে' রাখ। আমাকে কোনও ঝামেলা যেন পোহাতে না হয়। বাস্। অত বক্তৃতা করবার দরকার কি—"

সদারঙ্গবিহারীলালের দিকে ভ্রূকুটি করে' চেয়ে রইলেন তিনি।

"সব ঠিক আছে"

পরেশও ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলন করে' চাইলে সদারঙ্গবিহারীর দিকে।

সদারঙ্গবিহারী একবার ছকুবাবুর দিকে একবার পরেশের দিকে চেয়ে অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। হাসলেন। পরেশের দিকে চশমার লেন্স থেকে এক ঝলক আলো ফেললেন। হাত দুটো ঘসলেন।

"যাক্ সব ঠিক থাক্‌লেই হল। চমৎকার ব্যবস্থা আছে তাহলে। থাকাটাই স্বাভাবিক। বাঃ—খাসা। এইবার আমাকে উঠতে হবে কিন্তু। ওঠা উচিত। যেতে হবে অনেকদূরে কিনা, হনুমানপুর। বৃষ্টিও নামবে মনে হচ্ছে। যাচ্ছে তাই কাণ্ড। কিন্তু উপায় নেই, যেতেই হবে। একটু দেরী হয়ে গেল—তা হোক —এখানে এসে সব ব্যবস্থা যে করে' দিয়ে যেতে পারলাম তাতে ভারী আনন্দ হচ্ছে। খুব। আচ্ছা, এবার চলি তাহলে—নমস্কার বকুবাবু। এ কুকুরটা—"

ছকুবাবু বললেন—"পরেশকে দিন। পরেশ কুকুরটা নাও"

"ও—হ্যাঁ—পরেশ—তোমার নাম পরেশ বুঝি। এই যে নাও, ধর ভাল করে'। না, কামড়াবে না। হ্যাঁ—। আচ্ছা, চলি তাহলে এবার, নমস্কার ছকুবাবু—"

কম্পমান ঝুনুকে পরেশের হাতে সমর্পণ করে' চলে গেলেন সদারঙ্গবিহারীলাল। যাবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে ছকুবাবুর দিকে চেয়ে আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসি হাসলেন আর একবার। তিনি চলে যেতেই ছকুবাবু হাত উলটে মন্তব্য করলেন—"আজব দুনিয়া!"

পরেশ মৃদু হেসে বললে—"উনি বরাবরই একটু কিম্ভূত গোছের"

"কিম্ভূত নয়, বুদ্ধু। দিল্ ঘাবড়ে দিয়েছে একদম। আর একটা স্টিংগাহ্ বানাও। সোডাটা একটু সমঝে দিও,—বুঝলে"

"আজ্ঞে"

স্টিংগাহ্ শব্দটা কোন দেশীয় তা ঠিক না জানলেও পরেশ এটুকু বুঝেছিল যে 'স্টিংগাহ্ বানাও' মানে 'মদ ঢাল'।

ঢালতে লাগল।

(১৫)

দু'দিনের মধ্যেই অনীতাকে আবার ট্রেনে চড়তে হল। এবার সঙ্গে মা বাবা। স্বয়ম্প্রভা দেবী একটি কোণে গিয়ে বসেছিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ-চোয়াল-নিবদ্ধ মাংসপেশীগুলির কুঞ্চন-প্রসারণ দেখে মনে হচ্ছিল অদূর ভবিষ্যতে তাঁকে যে সব বক্তৃতা করতে হবে তারই মহলা দিচ্ছেন যেন তিনি.মনে মনে। অনীতার বাবা জিতুবাবু গাড়ির আর এক প্রান্তে বসেছিলেন। সুখের বিষয় গাড়িতে আর কেউ ছিল না। সঙ্গে জিনিসপত্রও ছিল না বিশেষ। স্বয়ম্প্রভা একটি মাত্র বড় ব্যাগ এনেছিলেন। ব্যাগটি তাঁর এবং অনীতার শাড়ি-ব্লাউস-সায়া-সেমিজেই ভরে উঠেছিল প্রায়। জিতুবাবুর একটি কাপড় এবং গেঞ্জিও ছিল অবশ্য তার মধ্যে। কোট কামিজ ছিল না। এক-কোটে এবং এক-কামিজেই তিনি চালিয়ে দিতে পারবেন এই সম্ভবতঃ স্বয়ম্প্রভা প্রত্যাশা করেছিলেন। জিতুবাবু কিছুই আনতে চান নি, এমন কি নিজেকেও না। তাঁকে জোর করে' টেনে এনেছেন স্বয়ম্প্রভা। গাড়ির এক কোণে চুপ করে' বসেছিলেন তিনি বাইরের দিকে চেয়ে। বর্ষাকালে নির্জ্জন মাঠে গাছতলায় একক গাধাকে ভিজতে দেখেছেন কখনও? জিতুবাবুর অবস্থা অনেকটা সেই রকম।

অনীতাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। কালো চোখের জলন্ত দৃষ্টি মর্ম্মভেদিনী হয়ে উঠেছিল যেন। মেজাজ সপ্তমে চড়ে' ছিল তার। সমস্ত পৃথিবীর উপরই চটেছিল সে। সব চেয়ে বেশী রাগ হচ্ছিল নিজের উপর। এত কেলেঙ্কারি কেন করতে গেল সে! রাগ হচ্ছিল খাওার মায়ের উপর। মা যেন তার এই দুর্দ্দশাটা উপভোগ করছে মনে মনে! ক্ষেপে বসেছিল সে। সুশোভনের উপর প্রথমে তার যে রাগটা হয়েছিল তা রূপান্তরিত হয়ে অন্য রকম হয়ে দাঁড়িয়েছিল এখন। অর্থাৎ তার হৃদয়নাট্যমঞ্চে যে নিদারুণ নাটক অভিনীত হচ্ছিল সে নাটকে সুশোভনই এখন একমাত্র পাষণ্ড নয়। সুশোভনের বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নি প্রথমটা প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল তার শিখা অনেকটা কমে এসেছে এখন। প্রদাহও নেই আর তেমন। এখন আর একটি সূক্ষ্মতর এবং অধিকতর

মর্মান্তিক জ্বালায় তার সমস্ত বুকটা পুড়ে যাচ্ছিল। এতক্ষণ এ বিষয়ে সে তেমন সচেতনও ছিল না। স্বয়ম্প্রভার কুঞ্চিত চোখের নিষ্পলক দৃষ্টি এবং চোয়াল-চিবুকের নীরব সঞ্চালন দেখে হঠাৎ সে ব্যাপারটা উপলব্ধি করলে। করবামাত্রই সমস্ত চিত্ত তিক্ত হয়ে উঠল নিমেষে, স্কন্ধযুগল আপনিই উঠে পড়ল কানের দিকে। সুশোভন? হ্যাঁ সুশোভন তো তাকে দাগা দিয়েইছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, যদিও মনে মনে সে এখনও সঙ্গোপনে আশা করছে যে হয়তো সন্দেহটা অমূলক, হয়তো তার ব্যবহারের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে একটা। কিন্তু মায়ের এ কি ব্যবহার? সুশোভনের দোষ ধরতে পেরে এবং বিনা প্রমাণে সে বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে বিজয়োল্লাসে তাকে শাস্তি দিতে যাওয়ার আগ্রহে মায়ের চোখে যে দৃষ্টি ফুটে উঠেছে তা ঠিক যেন জাল-বদ্ধ পশুকে দেখে প্রলুব্ধ শিকারীর দৃষ্টির মতো। হিংস্র!……অনীতা অজ্ঞাতসারে কখন যে তার দোষী স্বামীর পক্ষ অবলম্বন করেছে মনে মনে তা সে নিজেও টের পায় নি প্রথমে। ছি, ছি, এমন বোকামি সে করতে গেল কেন! রাগের মাথায় কেন সে সব কথা বলতে গেল মাকে? ওই বলিষ্ঠ নীতিবাগীশ নির্মম মহিলাটিকে সে কি চেনে না? না, সুশোভনের উপর আর রাগ ছিল না তার। ঈর্ষ্যার একটা কাঁটা খচখচ করছিল যদিও মনের ভিতর কিন্তু রাগ আর ছিল না তার। বরং সমস্ত ব্যাপারটাকে অবিশ্বাস করে' ক্ষমা করবার জন্যেই উন্মুখ হয়ে উঠেছিল সে ভিতরে ভিতরে। মায়ের এই 'কর্ত্তাত্তি' করতে যাওয়ার মানে কি? সুশোভনের বিরুদ্ধে যদি কিছু করতেই হয় সে নিজেই করবে। সুশোভনের নাগাল পেলে মা তাকে থুড়বে, ধুনবে, নাস্তানাবুদ করে' ফেলবে সকলের সামনে। তার বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল—না, যা করবার সে নিজেই করবে। পাঁচজনে মিলে তার স্বামীকে সকলের সামনে অপমান করবে—এ কিছুতেই হতে দেবে না সে। সুশোভনকে সে চায় আবার, তাকে সে ভালবাসে এখনও, তার সব দোষ সত্ত্বেও।

"মা—"

অনীতার কণ্ঠস্বর এত তীক্ষ্ণ শোনাল যে স্বয়ম্প্রভা চমকে উঠলেন। গাড়ির অপর প্রান্ত থেকে জিতুবাবুও ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন।

"কি? হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলি কেন আচম্কা! হল কি" স্বয়ম্প্রভা প্রশ্ন করলেন।

অনীতা মায়ের দিকে একটু ঝুঁকে জলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে। সে দৃষ্টিতে কেবল রাগ নয় গভীরতর আর একটা কি যেন প্রতিভাত হচ্ছিল। আত্মসম্বরণ করবার চেষ্টা করছিল সে প্রাণপণে, কিন্তু পারছিল না। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধ'রে চেষ্টা করছিল তবু।

"মনে হচ্ছে এতে তুমি যেন খুশীই হয়েছ"

"কি বলছিস বুঝতে পারছি না ভাল। কি একটা ভাবছিলাম তোর চীৎকারে গুলিয়ে গেল সব। খুশী? মানে?"

"উনি যে এই কাণ্ড করেছেন তাতে যেন আনন্দই হয়েছে তোমার মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা তুমি যেন উপভোগ করছ বেশ"

স্বয়ম্প্রভা ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে' বাতায়ন-পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তাঁর নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হল। তারপর হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে বললেন—"তোমার মাথার ঠিক নেই, কথা বোলো না বেশী। এত বড় আঘাতের পর মাথা ঠিক রাখা কঠিন। তবু চেষ্টা কর। নিজের জামাই বাস্তুঘুঘু এ আবিষ্কার করে' খুশী হয় না কেউ। আমিও হই নি। তবে আশ্চর্য্যও হই নি। এ আমি গোড়া থেকেই জানতাম—"

"কি—"

জিতুবাবু ওদিক থেকে সরে' এলেন একটু।

"তুমি ওদিকেই থাক না। তোমাকে কিছু বলছি না—"

অনীতা বললে, "গোড়া থেকেই যদি জানতে তাহলে বিয়ের সময় আপত্তি কর নি কেন। তখন তো খুশীই হয়েছিলে—"

স্বয়ম্প্রভার মুখে তিক্ত হাসি ফুটে উঠল একটা। গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন তিনি।

"একটি দিনের তরেও খুশী হই নি। গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছি। গোড়া থেকেই আমোল দিতে চাই নি—"

অনীতা এবার ফেটে পড়ল।

"মিছে কথা। এখন তুমি ওঁর শত দোষ দেখছ কিন্তু গোড়ায় গোড়ায় প্রথম যখন উনি আমাকে বিয়ে করতে চাইলেন তখন তুমি কিছু বল নি। বরং যখন জানা গেল যে ওঁদের অবস্থা বেশ সচ্ছল, ব্যাঙ্কে বেশ টাকা আছে, কোলকাতায় বাড়ি আছে, মরিস 'কার' আছে, বড় বড় লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে তখন তো তুমি থল-থল করে' উঠেছিলে আনন্দে, গলে পড়েছিলে—"

"মুখ সামলে কথা বল্। ভদ্রভাবে কথা বলতেও শিখিস নি? আমি গলে' পড়েছিলাম? থল-থল!"

"কি ব্যাপার কি—"

জিতুবাবু আর একবার এদিকে আসবার প্রয়াস পেলেন। কিন্তু স্বয়ম্প্রভার উত্তেজিত তর্জ্জনীর নিষেধাত্মক আন্দোলনে থেমে যেতে হল তাঁকে আবার।

অনীতা বলিল—"উনি সত্যি খারাপ এ সন্দেহ থাকলে কিছুতেই বিয়েতে রাজি হতে না তুমি। সে সন্দেহ তোমার ঘুণাক্ষরে ছিল না। আর উনি যে সত্যিই খারাপ তা এখনও প্রমাণিত হয় নি—"

"এই যদি তোমার বুদ্ধি হয় মা তাহলে বুঝতে হবে অনেক দুঃখ নাচছে তোমার কপালে। এ দেশের ঘরে ঘরে যে সব সতী সাধ্বীরা অপমানিত হয়েও স্বামীদের অধঃপতনে বাধা দেয় না তোমাকেও শেষ পর্য্যন্ত তাদের দলে গিয়ে হায় হায় করতে হবে সারাজীবন—"

"না, হবে না। তুমি যা ভাবছ তা নয়। ওঁর কোনও অধঃপতন হয় নি। বাবা যেমন নিষ্কলঙ্ক আমার বিশ্বাস উনিও তেমনি—"

"দেখ মা পুরুষমাত্রেই উড়তে চায়। সে উড়বে কিনা তা নির্ভর করে তার স্ত্রীর উপর। সব ঘোড়ার চালই বদচাল তাকে ঠিক চালে চালাতে পারে ভালো সওয়ার—" বলিষ্ঠ গর্দ্দান ফিরিয়ে স্বামীর দিকে চাইলেন একবার।

"বিশ্বাস করি না ওসব কথা আমি। উনি যা করেছেন তার কারণ আছে নিশ্চয়ই একটা। গেলেই বোঝা যাবে"

"যেমন বাপ তেমনি মেয়ে! একটা মাগীকে নিয়ে হোটেলে গিয়ে পড়ে' আছে তবু বলে কিনা—"

"বিশ্বাস করি না আমি"—চীৎকারও করে' উঠল অনীতা—"হয়তো ভুলিয়ে নিয়ে গেছে—কিম্বা—"

"ভুলিয়ে নিয়ে গেছে! আগে থাকতে সড় করে' ষ্টেশনে এসেছে, বলে কিনা ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। কচি খোকা! মোয়া দেখে ভুলে গেলেন!"

"সে যাই হোক, তুমি এ নিয়ে মাতামাতি করছ কেন"

"কর্ত্তব্য করছি। মাতামাতিটা কোনখানে দেখলি তুই"

"যখন থেকে ব্যাপারটা শুনেছ তখন থেকে তো উন্মত্ত হয়ে উঠেছ। তোমার জামাই দুশ্চরিত্র এটা আবিষ্কার করে' দিগ্বিজয় করে' ফেলেছ যেন একটা—"

"মুখ সামলে কথা বল্ অনি। ছোট মুখে বড় কথা মানায় না। চুপ করে' বসে থাক একধারে।"

"এ সব থিয়েটারি কাণ্ড ভাল লাগে না আমার"

"থিয়েটারি কাণ্ড করছে কে—আমি না তুই"

"বাবাকে নিয়ে এই যে তুমি ছুটছ এর কোন মানে হয়?"

"এ সব কথা শোনবার পর কি ঘরে' বসে' থাকা সম্ভব?"

"আমার একা এলেই যথেষ্ট হত। আমি একাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই"

"ও! একা দেখা করতে চাও?"—স্বয়ম্প্রভার বলিষ্ঠ চিবুকের পেশীগুলি কুঞ্চিত হল—"একা দেখা করে' তার বানান গল্পগুলি বিশ্বাস করতে চাও? এমনি করেই তো আরম্ভ হয়। একবার যদি ওদের বানানো গল্প বিশ্বাস করতে আরম্ভ কর—বাস্ তাহলেই হয়ে গেল—জন্মের মতো হয়ে গেল। বেশী দিন লাগবে না, ছ'মাস"—হঠাৎ স্বয়ম্প্রভা বামকরপল্লবটি বিস্ফারিত এবং দক্ষিণ

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি উত্তোলন করে' চীৎকার করে' উঠলেন—"ছ'মাসের মধ্যেই ডুব মারবে। টিকিটি দেখতে পাবে না আর"

"আমার স্বামীর সঙ্গে আমি নিজের মতো করে' বোঝাপড়া করব। তাও করতে দেবে না আমাকে? এ কি জবরদস্তি তোমার"

"যারা অসুস্থ তাদের জবরদস্তি করেই ওষুধ গেলাতে হয়। এ জবরদস্তি নয়, বাঁচাবার উপায়। তোমার নিজের মতো করে' করতে গেলেই হয়েছে। তোমার চোখে ধূলো দিতে কতক্ষণ?"

"কিন্তু এরকম কেলেঙ্কারি করার কি দরকার ছিল? গুষ্টিশুদ্ধ মিলে—"

"কেলেঙ্কারি যাতে বেশী দূর না গড়ায় তারই ব্যবস্থা হচ্ছে। এখন থেকে ব্যবস্থা না করলে—ঢিটি পড়ে' যাবে। লোকসমাজে আর মুখ দেখানো যাবে না তখন—"

"কি ব্যাপার কি"—জিতুবাবু আবার বললেন।

"তোমার আর শুনে কাজ নেই। ওইখানে থাক তুমি"

"তাই তো আছি"

"তাই থাক"

জিতুবাবু মেয়ের দিকে চাইলেন। তাঁর দৃষ্টি থেকে যেন সহানুভূতি উপচে পড়ছিল। অনীতাও আড়চোখে একবার চাইলে বাবার দিকে। জিতুবাবুর মনে হল সে যেন নীরবে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছে। স্ত্রীর দিকে চেয়ে কিন্তু জিতুবাবু কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়লেন।

"কি নিয়ে এত বকাবকি করছ তোমরা"—একটু ইতস্ততঃ করে' আর একবার বললেন তিনি। একটু সরেও এলেন।

"তুমি আবার আসছ এদিকে! ওই দিকে থাক না যেমন আছ—আরও সরে' যাও বরং কোণের দিকে। আমাদের কথায় ফোড়ন দিতে হবে না তোমাকে"

"তোমাদের কাছে বসতেও দেবে না নাকি। সমস্ত পথটা একা একা আমাকে বসে' থাকতে হবে ওই কোণে!"

"সারাটা জীবনই তো আমাদের কাছে বসে আছ। কিছুক্ষণ দূরেই থাক না। সিগরেট খাও না"

"আমাকে সঙ্গে করে' আনবার কি দরকার ছিল"

হঠাৎ দু'হাত তুলে বলে উঠলেন জিতুবাবু।

অনীতা মায়ের দিকে চেয়ে বললে, "কেন, বাবা আমাদের কাছে এসে বসলে ক্ষতি কি"

"মেয়ে হয়ে তুমি মাকে যে সব কথা বলছ তা যাতে ওঁর কানে না যায় তাই ওকে দূরে থাকতে বলছি—"

"এমন কিছুই বলা হয় নি তোমাকে। সব কথা শুনলে বাবা আমার দিকেই সায় দিবেন"

"কি কথা—"

আর একটু এগিয়ে এলেন জিতুবাবু।

"বাড়িতে সিগরেট ফুঁকতে পেলে তো আর কিছু চাও না। ইঞ্জিনের মতো ফস ফস করে' ধোঁয়া ছাড় খালি। তখন তো বকেও থামানো যায় না তোমাকে। এখন সুযোগ পেয়েছ তাই করগে যাও না"

অনীতা বাবার দিকে চেয়ে বললে—"আমি মাকে বলছি ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দাও তোমরা। তোমরা এর মধ্যে মাথা গলাতে যাচ্ছ কেন"

"ঠিকই তো"—জিতুবাবু মৃদুকণ্ঠে বললেন।

স্বয়ম্প্রভার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়ে উঠল। দাঁতের ভিতর দিয়ে একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস টেনে বসে রইলেন তিনি গুম হয়ে।

অনীতা বলতে লাগল—"মা বলছে যে একা তার সঙ্গে দেখা করলে আমি নাকি কিছু বলব না। যদি দেখি সত্যিই তেমন কিছু নয় বলব কেন, কি বল"

তার কালো চোখের দৃষ্টিতে এক ঝলক আলো চকমক করে' উঠল।

"সত্যি সত্যি তার কোনও দোষ আছে কিনা সেইটেই তো সর্ব্বাগ্রে নির্ণয় করা দরকার। আমার মনে হয় ও কিছু নয়"

"ও!"

ফোঁস করে' উঠলেন স্বয়ম্প্রভা। তারপর উঠে দাঁড়ালেন, ট্রেনের ঝাঁকানি সত্ত্বেও নিজের ভারসাম্য এবং গাম্ভীর্য্য রক্ষা করে' বললেন—"তাহলে আমিই ওদিকে গিয়ে বসি। তোমরা বাপ বেটিতে ব'সে পরামর্শ কর। কিন্তু আমার একটা কথা লিখে রাখ—দুর্দ্দশা চরমে পৌঁছবে, ঢিঢিক্কার পড়ে' যাবে চতুর্দ্দিকে···"

পরের বড় জংসনটাতে নাবলেন তাঁরা। আগে থাকতেই এই প্ল্যান ছিল। অবশ্য স্বয়ম্প্রভা দেবীর প্ল্যান। তাঁর আর তর সইছিল না যেন। চলতি ট্রেন থেকেই লাফিয়ে নাবলেন তিনি। তাঁর গালের চিবুকের এবং শরীরের অন্যান্য চর্ব্বিবহুল অংশের স্পন্দন দেখে মনে হল লাফিয়ে নাবতে গিয়ে সমস্ত দেহে বেশ একটু নাড়া খেয়েছেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু তাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। নেবেই একটা কুলিকে এক ধমক দিলেন তিনি। সে বেচারা ছুটে এসে তাঁর পতনোন্মুখ দেহকে জাপটে ধরতে গিয়েছিল।

অনীতা চুপ করেছিল। তার কেমন যেন অবসন্ন মনে হচ্ছিল। জিতুবাবুর কানের ডগাটা লাল হয়ে' উঠেছিল। ফাঁকি ধরা পড়ে' যাবার পর বড়বাবুর কাছে বকুনি খেয়ে ফাঁকিবাজ কেরাণীর যেমন মুখভাব হয়, জিতুবাবুর মুখভাব সেই রকম দেখাচ্ছিল অনেকটা।

"আমরা এইখান থেকেই মোটর নেব, বুঝলে"—স্বয়ম্প্রভা বললেন—"তুমি আগেই ট্যাক্সি ঠিক করে' ফেল একটা। পরে হয়তো না-ও পাওয়া যেতে পারে। আমরা ষ্টেশনের ধারের ওই হোটেলটায় খেয়ে নি, তুমি ততক্ষণ একটা মোটর দেখ। কাছাটা ঠিক করে' দাও"

"কি"—ট্রেন থেকে নাবতে নাবতে জিগ্যেস করলেন জিতুবাবু। ভীড়ে গোলমালে ভাল করে' সব কথা শুনতেই পান নি তিনি।

স্বয়ম্প্রভা আবার সব বললেন।

"আঃ, চেঁচিও না অত। লোকে চেয়ে দেখছে"

"দেখছে তোমাকে। কাছাটা ঠিক করে' দাও"

"দোহাই তোমার, থাম। ইস্—কি বিশ্রী ষ্টেশনটা। এখানে হোটেল কোথা? ষ্টেশনে তো মোটর দেখছি না একটাও, সব ছ্যাক্ড়া গাড়ি—"

"একটু দূরে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড আছে, আমি খবর নিয়েছি"

"কোথায় সে স্ট্যাণ্ড, জানব কি করে'। তাছাড়া কোথায় আমরা যাচ্ছি তাই তো জানি না। ট্যাক্সিওয়ালাকে বলতে হবে তো জায়গাটার নাম। কি বলব তাকে"

"কাকে"

"তাকে। ট্যাক্সিওয়ালাকে"

"ডেকে আন না। কোথায় যেতে হবে আমি তাকে বুঝিয়ে বলে' দেব"

"কিন্তু ট্যাক্সি ডাকলে তক্ষুণি জানতে চাইবে কোথা যেতে হবে"

"সে আমি বলব তাকে"

"কিন্তু তুমি তো থাকবে হোটেলে। আমি তাকে হোটেলে ডেকে নিয়ে আসব? সে হয় তো আসতেই চাইবে না, ড্রাইভারগুলো প্রায়ই তেরিয়া মেজাজের লোক হয়"

"সামান্ত একটা ড্রাইভারের ভয়ে তুমি যদি অস্থির হও পুরুষমানুষ হয়ে, তাহলে আমার আর—"

"মোটেই না। কিন্তু একটা কথা আমি জানতে চাই—আগে থাকতেই ট্যাক্সি ডাকবার দরকার কি। চল না আমিও হোটেলে গিয়ে খেয়ে নি, তারপর ট্যাক্সি ডাকলেই হবে। আমারও ক্ষিদে পেয়েছে।"

"সমস্ত লুচিগুলি তো রাস্তায় একা তুমিই খেলে। এর মধ্যেই ক্ষিদে পেয়ে গেল?"

"দেড়টা বাজে, ক্ষিদে পাবে না? খেয়ে নিয়ে ট্যাক্সি খুঁজলেই হবে। এতে আপত্তি কি তোমার?"

"খাবার পর ট্যাক্সি খুঁজতে গেলে ট্যাক্সি পাবে না। এ তো আর কোলকাতা নয়। দুটো চারটে ট্যাক্সি হয় তো আছে, ভাড়া হয়ে যাবে"

"তার মানে ট্যাক্সি খুঁজে না আনা পর্য্যন্ত খেতে পাব না আমি—"

"তুচ্ছ খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে চেঁচামেচি করতে লজ্জা করে না তোমার বুড়ো বয়সে! সবাই চেয়ে চেয়ে দেখছে যে। আমরা হোটেলে যতক্ষণ খাব, ততক্ষণে তুমি যদি একটা ট্যাক্সি ডেকে আনতে পার এক-ঢিলে দুই পাখী মারা হবে"

"তুমি দেখছি আমাকেই মারতে চাও। আমি তা হলে খাব না?"

"ট্যাক্সিটা ডেকে এনেই খেও। খুব যদি ক্ষিদে পেয়ে থাকে রাস্তায় কেক বা সন্দেশ যা পাও কিনে নিয়ে খেতে খেতে যাও"

"সেটা কি—"

"এই কুলি হোটেলে চল। আমরা হোটেলে চললুম, বুঝলে। তুমি ট্যাক্সি দেখ একটা"

ঈষৎ চিন্তার পর জিতুবাবু উপলব্ধি করলেন গত্যন্তর নেই। হোটেলের দিকেই অগ্রসর হলেন তাঁরা। অনীতা একটু পিছিয়ে রইল। এসব কোন কিছুর মধ্যে থাকবে না সে। থাকতে ভাল লাগছিল না।

জিতুবাবু বেরিয়েই গোটা চারেক কেক কিনে নিলেন এবং স্বয়ম্প্রভাব অগোচরে অনীতাকে দুটো দিতে এলেন।

"আমি খাব না বাবা"

"দেখ না চেখে"

অগত্যা অনীতাকে নিতে হল।

"ট্যাক্সিওয়ালা যদি জানতে চায় কোথায় যেতে হবে, কি বলব। জানতে চাইবেই"

"বোলো ফতিমারং যাব"

"ফতিমারং? ফতিমারং কোনও জায়গার নাম হতে পারে না"

"রংপুর যদি হতে পারে ফতিমারং হতে বাধা কি"

"রংপুর আর ফতিমারং আকাশ-পাতাল তফাত।"

"যাক্ সে আমি তাকে বুঝিয়ে বলব এখন। ওই দিকে গেলেই নামটা জানা যাবে। ফতিমারং কিম্বা ফাংনারজ—ওই ধরনেরই নাম সে গ্রামের। ওদিকে গেলেই জানা যাবে"

"কোন দিকে যেতে হবে তাও হয় তো সে জানতে চাইবে"

"কেন"

"কি কেন"

"কেন তাই তো আমি জানতে চাইছি। আমি তাকে নিয়ে যাব, তার আগে থাকতে জানবার দরকার কি"

"না জেনে সে যদি না আসতে চায়"

"দেখ কুঁড়ে লোকেরাই 'যদি' 'হয় তো'—এই সবের আশ্রয় নেয়। তুমি গিয়েই দেখ না"

"জায়গাটা কত দূর হবে এখান থেকে"

"ঠিক জানি না। তবে কাছেই। বেশী দূর হতে পারে না"

"হবার বাধা কি"

"হলে কোলকাতা থেকে ওরা মোটরে করে' গিয়ে সেখানে রাত্রিবাস করছে কি করে'? ঘটে কি একেবারে কিছু নেই!"

"কি বললে"

"কিছু নয়। যাও তুমি। এমন তর্ক করা স্বভাব হয়েছে—"

জিতুবাবু গেলেন। ফিরে আসতে বেশ একটু সময় লাগল। ফিরে দেখলেন স্বয়ম্প্রভা মারমূখী হয়ে বসে আছেন। হোটেলওয়ালা, হোটেলের চাকর-চাকরাণী, হোটেলের ঠাকুর সকলের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধিয়েছেন। প্রায় ফৌজদারি কাণ্ড। অনীতা চুপ করে' বসে আছে একধারে। চারিদিকে নোংরা, মাছি ভনভন করছে, সমস্ত গা ঘিনঘিন করছিল তার। জিতুবাবু কিন্তু বেশ উল্লসিত এবং উদ্দীপ্ত হয়ে ফিরেছেন মনে হল।

"চলে এস! ট্যাক্সি পেয়েছি—"

"উঃ একটা গাড়ি ডাকতে যে কারও এতক্ষণ লাগতে পারে তা ধারণার অতীত ছিল"

"কেউ আসতে চায় না। জিগ্যেস করে' করে' বার করলাম গ্রামটার নাম। ফাৎনা ফিরিজিপুর। কেউ যেতে চায় না। অনেক কষ্টে এই লোকটাকে রাজি করেছি। জায়গাটা বেশ দূর, ভাড়াতে ফতুর করে' দেবে। যাক্ চল—যেতেই যখন হবে"

"ডিভোর্স করতে হলে উকীলের ফী যা লাগবে ট্যাক্সিভাড়া তার চেয়ে বেশী হবে না আশা করি"

"মা"—ফোঁস করে' উঠল অনীতা।

"থাক। তুমি আবার সুরু কোরো না। কোথায় মোটর"

"বাইরে। তুমি কি আশা করেছিলে মোটর এসে একেবারে রান্না ঘরে ঢুকে পড়বে?"

জিতুবাবু বেরিয়ে গেলেন। অনীতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ম্প্রভাও বেরিয়ে এলেন। জিতুবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে দু'একবার নাক কুঁচকে নিশ্বাস নিয়ে স্বয়ম্প্রভা অবশেষে তাঁর মুখের দিকে চাইলেন।

"মদ খেয়েছ নাকি"

"খেয়েছি। মানে, খেতে বাধ্য হয়েছি। শরীর আর বইছে না। আমি উট নই, মানুষ"

"খাওয়ার ইচ্ছে যদি ছিল ষ্টেশনের কেলনারে ঢুকে ভদ্রভাবে খেলেই হ'ত। আমাদের হোটেলে বসিয়ে রেখে একটা বাজে তাড়িখানায় ঢুকে ধাঙড়ের মতো তাড়ি না গিললে চলছিল না"

"তাড়িখানা নয়, ভাল দোকান। 'বিয়ার' পেয়ে গেলাম"

"কতটা খেয়েছ? মাতলামি করবে নাকি রাস্তায়"

"কোয়ার্টখানেক খেয়েছি। ওতে নেশা হয় না। ভাল বোধ করছি বরং"

"আমরা নোংরা হোটেলে এক ঝাঁক মাছির মধ্যে বসে' একদল অসভ্য লোকের সঙ্গে বকাবকি করছি, আর তুমি গিয়ে ওদিকে মদ মারছ। লজ্জা করে না তোমার ?"

"না"—মরীয়া হয়ে বলে উঠলেন জিতুবাবু—"আমার সঙ্গ যদি তোমার পছন্দ না হয় বল এক্ষুণি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি"

"ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বস। তোমার পাশে বসতে পারব না। গন্ধে বমি আসছে"

"বল তো বাড়ি ফিরে যাই"

"যা বলছি কর"

(১৬)

ছকুবাবু পিছনে হাত দিয়ে লাইব্রেরি ঘরে উত্তেজিতভাবে পদচারণ করছিলেন। ব্রজেশ্বরবাবুদের কি ভাবে অভ্যর্থনা করবেন তারই নানা রকম মক্‌সো করছিলেন তিনি মনে মনে। কি এক ফ্যাসাদ এসে জুটল, রাম কহো! অভ্যর্থনা। এসে পড়লে করতেই হবে, উপায় নেই এবং যদি করতে হয় এক-হাত দেখিয়ে দেবেন তিনি। সুচারুরূপে সংক্ষেপে এবং অভিনবত্ব সহকারে যাকে বলে! মাঝে মাঝে থেমে ঝাঁকড়া ভ্রূ কুঞ্চিত করে' গেটের দিকে চাইছিলেন। এখনই আসবে! ওই বোধহয়! অনতিবিলম্বেই একটা মোটরকার সশব্দে এসে দাঁড়াল। ছকুবাবুও এক নিমেষে গ্লাসে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সেটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং যে সাদর সম্ভাষণ করবেন ঠিক করেছিলেন সেটা আওড়ালেন আর একবার মনে মনে।

মোটরের ভিতরও রিহার্সাল চলছিল একটা। ভিন্ন রকমের। নেবেই প্রথম আলাপের মোহড়ায় কতটা প্রকাশ করা উচিত এবং কতটা চেপে যাওয়া উচিত—তারই আলোচনা চলছিল দু'জনের মধ্যে। দু'জনেই বেশ একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। সান্ত্বনা অবশ্য চোখে মুখে খুব একটা সহজ ভাব ফুটিয়ে

রেখেছিল, রাখবার চেষ্টা করছিল অন্তত। মুখে খুব একটা সপ্রতিভ হাসি ফুটিয়ে জানলা দিয়ে ঝুঁকে চেয়ে দেখছিল সে বাড়ির সামনেটা।

সুশোভন ঝোঁকে নি। একটা সিগারেট ধরিয়ে সে গাড়ির এককোণে সেঁটে বসেছিল—চোখে মুখে একটা বে-পরোয়া ভাব ফুটিয়ে।

রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তে উইংসের ধারে দণ্ডায়মান নূতন অভিনেতাদের যে মনোভাব—এদের উভয়েরই মনোভাব অনেকটা সেই রকম হয়ে উঠেছিল প্রায়।

"প্রথম ঝোঁকটা তুমিই সামলে নাও, বুঝলে সান্ত্বনা, যা কৈফিয়ত টৈফিয়ত দেবার দিয়ে 'ফেল তুমিই প্রথমে। 'উঃ, কি বিপদে যে পড়েছিলাম' গোছের একটা কিছু—বুঝলে। বারান্দাটা দেখতে পাচ্ছ ?"

"হ্যাঁ"

"কেউ দাঁড়িয়ে আছে নাকি"

"না। সামনের দরজাটা তো বন্ধ"

"বাঁচা গেল। অনীতা দাঁড়িয়ে থাকলেই হয়েছিল আর কি ! একটু দম না নিয়ে অনীতার সামনা-সামনি দাঁড়াতে পারব বলে' তো মনে হয় না। কিন্তু দেখো, ঠিক তার সঙ্গেই আগে দেখা হয়ে যাবে ! যা কপাল—"

"সে যা হয় হবে। আচ্ছা, আমিই আগে নাবি। আপনি ভিতরেই থাকুন এখন। আমি আগে দেখে আসি—হাওয়া কি ভাবে কোন দিকে বইছে"

"বেশ। তাই যাও। গুছিয়ে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলে' দিও আগে, বুঝলে। তারপর আমাকে এসে টেনে বার কর—'এই যে সুশোভনবাবু এখানে রয়েছেন' —এই গোছের কিছু একটা, বুঝলে। সব নির্ভর করছে অনীতা কোথা আছে তার উপর। প্রথমেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে কেলেঙ্কারি—"

মোটর এসে বারান্দার সামনে দাঁড়াল। গণেশ একটা আড়িমুড়ি ভেঙে স্টিয়ারিং ছেড়ে নাবল নীচে।

সান্ত্বনা নাববার আগেই বারান্দার দরজাটা খুলে গেল। বেরিয়ে এল পরেশ। পরেশ ঘাড় ফিরিয়ে কাকে যেন হেঁকে বললে—"ছটু—এই ছটু—ব্রজেশ্বরবাবুরা এসে গেছেন, খবর দাও ভিতরে"—বলে নিজেই চলে গেল আবার ভিতরে।

একটা অজানা আতঙ্কে দু'জনেরই বুক কেঁপে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আতঙ্কের সঙ্গে মিশল বিস্ময়। কপাট খুলতে না খুলতেই ঝুমু বেরিয়ে এল। তখনও থর থর করে' কাঁপছে। কান দুটো খাড়া। বারান্দায় একটু দাঁড়িয়েই এক ছুটে নেবে এল নীচে। আনন্দে কৃতজ্ঞতায় আবদারে গদগদ একেবারে। কি যে করবে ভেবে পেল না বেচারি, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে অস্থির হয়ে উঠল।

"ওমা, ঝুমু যে"—বলে' উঠল সান্ত্বনা।

"ও আবার জুটল কি করে"—গলা বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করলে সুশোভন।

"আপনাদের সেই কুকুরটা দেখছি যে"—গণেশ বলল—

"কেউ কুড়িয়ে দিয়ে গেছে বোধ হয়"

"হ্যা। জিনিসপত্রগুলো নাবিয়ে ফেল"

সুশোভনের দিকে চেয়ে সান্ত্বনা বললে—"কেউ এসেছিল এখানে তাহলে"

"হ্যা এবং সব ফাঁস করে' দিয়েছে হয় তো।"

"কে হতে পারে"

সুশোভন গম্ভীরভাবে তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে গোঁফ জোড়ার উপর তা দিতে লাগল।

"ওই চাকরটাকে জিগ্যেস করলে হয় না। উঁকি মেরেই সরে পড়ল কোথায় লোকটা"

"আমি যাই। আপনি অপেক্ষা করুন"

পরেশ আবার বেরিয়ে এল। ঠোঁটে মধুর একটি হাসি ফুটিয়ে সান্ত্বনা এগিয়ে গেল তার দিকে।

বিনীত নমস্কার করে' পরেশ বলল—"আপনারা যে এ সময়ে এসে পড়বেন তা আমরা আন্দাজ করতে পারি নি। ওঁরা তাই শিকারে বেরিয়ে গেছেন

সবাই। গিন্নিমাও সঙ্গে গেছেন। আপনারা আসবেন জানলে উনি অন্তত থাকতেন”

“তাতে কি হয়েছে। বরং ভালই হয়েছে এক হিসেবে। আমাদের আসবার খবর পেলে হয়তো শিকার পার্টিটাই মাটি হয়ে-যেত। ট্রেন ফেল করে' আসতে পারি নি আমরা। ঝুনুকে কে দিয়ে গেল। কাল রাত্রে হারিয়ে গিয়েছিল। সে কি মুশকিল”

পরেশ স-স্নেহে চাইলে একবার ঝুনুর দিকে।

“সব শুনেছি আমরা। একটু আগেই এ অঞ্চলের একজন ভদ্রলোক দিয়ে গেলেন ওকে। তিনি আপনাদেরও চেনেন। কাল রাত্রের সব খবরও বললেন। তাঁর কাছে খবর পেয়ে আমরা বুঝলাম ব্যাপারটা—তখন গিন্নিমা চলে গেছেন—”

“কে বল তো ভদ্রলোকটি”

“সদারঙ্গবিহারীবাবু”

“ও”—সান্ত্বনা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল একটু, তারপর তাড়াতাড়ি বললে—“জিনিসপত্রগুলো নাবিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা কর তাহলে”

“হ্যাঁ, এই যে”

“সুশোভনবাবুর স্ত্রীও শিকারে গেছেন নাকি”

“তাঁরা তো আসেনই নি। কোনও খবরও আসে নি”

সান্ত্বনা মোটরের দিকে এগিয়ে গেল ধীরে ধীরে। বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে একটু ইশারা করতেই সুশোভন মুণ্ড টেনে নিলে গাড়ির ভিতর। সে অধীর হয়ে উঁকি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছিল ব্যাপার কতদূর গড়াল।

“আচ্ছা”—সান্ত্বনা আবার পরেশকে জিজ্ঞাসা করলে—“সদারঙ্গবাবু আসবার আগেই মেসোমশায়রা শিকারে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, নয়? আমাদের খবর ওঁরা তাহলে কিছুই পান নি”

“না। পেলে কি আর বেরিয়ে যেতেন! ছকুবাবু আর আমি ছাড়া কেউ জানে না”

"ছকুবাবু?"

"হ্যাঁ। গিন্নিমার দূর সম্পর্কের কে যেন হন। বেড়াতে এসেছেন।"

"ও। ছকুবাবুর সঙ্গে সদারঙ্গবাবুর দেখা হয়েছে তাহলে"

"হ্যাঁ। অনেকক্ষণ বসে' গল্প-সল্প করলেন দু'জনে"

"ও। আচ্ছা, জিনিসগুলো নাবিয়ে ফেল"

গণেশ ও পরেশ দু'জনে মিলে জিনিসগুলো সামনের 'হলে' রাখতে লাগল। সান্ত্বনা এগিয়ে গেল মোটরের দিকে।

"সুশোভনবাবু, আপনার নাবা চলবে না, শুধু তাই নয়, চাকরটা যেন আপনাকে দেখতে না পায়"

"অদৃশ্য হব কি করে! যাদুবিদ্যা তো জানা নেই। কেন কি হ'ল?"

"পরেশ হরিমটর হিন্দু-পান্থ নিবাসের সমস্ত কথা শুনেছে"

"সমস্ত?"

"কতটা ঠিক জানি না। কিন্তু সদারঙ্গবিহারীবাবু যখন ঝুনুকে এনেছিলেন তখন—"

"সেই ব্যাটাচ্ছেলে বাক্যবাগীশ এখান পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছিল? অ্যাঁ, বল কি? আর অনীতার খবর কি?"

"অনীতা এখানে নেই"

"যাক্, এটা সুখবর। কোথা সে এখন? শিকারে—"

"সে আসেই নি"

"আসেই নি? বল কি? আসেই নি? কোথা গেল সে তবে?"

"তা এরা কি করে' জানবে। পরেশ বলছে, আপনাদের আসবার কথা ছিল কিন্তু আপনারা কেউ আসেন নি"

"কি হল অনীতার তাহলে! কি হতে পারে?"

অতিশয় বিচলিত চিত্তে গাড়ির মধ্যেই উঠে দাঁড়াল সুশোভন।

"সে হয়তো আর একটা হোটেলে আর কারও সঙ্গে রাত কাটিয়ে আসছে একটু পরে"

অতিশয় স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা ক'টি বলে' নির্ব্বিকারভাবে চেয়ে রইল সান্ত্বনা।

"না, রসিকতা ভাল লাগছে না সান্ত্বনা। ব্যাপার মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না। আচ্ছা, সে কি ফিরে গেল নাকি? তা'হলে তো—আমি বরং চলে যাই, বুঝলে"

"আমিও তো তাই বলছি। পরেশের দৃষ্টি থেকে সরে' থাকতেও বলছি সেই জন্যে। হিন্দু-পান্থনিবাসের কীর্ত্তি ওঁরা যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুনে থাকেন তাহলে আপনার আত্মগোপন করে' এই মোটরেই সরে' পড়া উচিত। আমি বলব বিশেষ একটা জরুরি দরকারের জন্য আমার স্বামীকে এই মোটরেই ফিরে যেতে হল—"

"এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্বামী হয়তো হাজির হয়ে যাবেন পরের ট্রেনে"

"কালকের আগে তাঁর আসবার সম্ভাবনা নেই"

"কিন্তু শোন, আমরা সত্য কথাটা অকপটে বলব বলেই তো প্রস্তুত হয়ে এসেছি। তাই করি না কেন। কি দরকার এই লুকোচুরির? এক হোটেলে দু'জন রাত্রিবাস করলেই চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে এমন কোন কথা নেই। সে কথা যদি কেউ ভাবে, তাহলে নিতান্ত ইয়ে বলতে হবে তাকে—"

"কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখুন"—সান্ত্বনা শান্তভাবে বোঝাতে লাগল—"ঝুনুকে সদারঞ্জবাবু এখানে যখন দিয়ে গেছেন তখন এখানকার ঠিকানা সংগ্রহ করতে হয়েছে তাঁকে গোঁসাইজির কাছে। গোঁসাইজি তাঁকে কতটা কি বলেছেন তাতো জানা নেই—তার ওপরই সব নির্ভর করছে"

"পরেশকে জিগ্যেস করেছিলে কিছু এ বিষয়ে?"

"নিশ্চয় না। তা কি করা যায়?"

"ধর যদি গোঁসাইজি সদারঞ্জবাবুকে সব কথা বলেই থাকেন যে আমরা একঘরে দু'জনে শুয়েছিলাম, তাহলে সে কথা কি গাড়োলটা এখানে এসে চাকরদের কাছে গল্প করবে—এও কি সম্ভব নাকি"

"ইচ্ছে করে' না করলেও কথায় কথায় বেরিয়ে পড়তে পারে বই কি। বলা যায় কি কিছু! ঝুনুকে নিয়ে কম কাণ্ড তো হয় নি, ঝুনুর গল্প করতে করতেই হয়তো বেরিয়ে পড়েছে সব। আমি আমার স্বামীর সঙ্গে হোটেলে ছিলাম, এর বেশী অন্য লোককে জানতে দেবার দরকারই বা কি। আপনি যদি এখন ফিরে যান লুকিয়ে, মানে, কেউ যদি আপনাকে দেখে না ফেলে, তাহলে আমি স্বচ্ছন্দে এখানে প্রচার করতে পারি যে আমি আমার স্বামীর সঙ্গে হিন্দু-পান্থনিবাসে ছিলাম, সকালে এখানে মোটরে করে' এসেছিলাম, হঠাৎ একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে' যাওয়াতে আমার স্বামীকে ফিরে যেতে হল, কাল নাগাদ আবার হয়তো তিনি এসে পড়বেন। তার পর কাল যদি উনি সত্যি সত্যি আসেন তখন আমি ওঁকে খুলে বলব সব। তারপর আপনারা স-স্ত্রীক এসে পড়ুন, কেউ ঘুণাক্ষরে কিছু জানতে পারবে না"

"তুমি দেখছি পাকা মিথ্যুক একটি। ওফ—! বেশ, ব্যাপারটা যদি এইভাবে দাঁড় করাতে পার মন্দ হবে না নিতান্ত"

সান্ত্বনা হেসে বললে, "এ সব ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলায় দোষ নেই। সব দিক যাতে রক্ষা পায় তাই করাই ভালো নয় কি"

"বেশ। কিন্তু ভেবে দেখ আমি চলে গেলেই সব দিক রক্ষে হবে তো! ফাঁকি ধরা পড়া গিয়ে শেষকালে আরও জটিল কিছু না হয়ে পড়ে"

"না, তা হবে না। অনীতার খবর নেবার জন্যে আপনি তো যেতেই চাইছেন। আমি কেবল বলছি এখানে আত্মপ্রকাশ করবেন না। লুকিয়ে চলে যান আমি সব ঠিক করে' নিতে পারব"

"তা পারবে। যদি না ওই সরগরমবাবু হুড়মুড় করে' এসে আবার—"

"সে তখন দেখা যাবে। কিন্তু আপনি আর দেরি করবেন না। পরেশ আসছে এ দিকে, ডাকতেই আসছে বোধ হয় আমাদের। তাহলে ঠিক হল, কি বলব আমি এখানে"

"যা তোমার খুশী। কিন্তু আমি যদি অনীতাকে নিয়ে ফিরি আবার, কি করে' জানব তুমি কি বলেছ"

"আমি কি বলব, সেটা নির্ভর করছে এরা কতটা কি জেনেছে তার উপর। এখানে পরেশ ছাড়া আর একজন ভদ্রলোক আছেন কিনা"

"আবার কে"

সান্ত্বনাকে আর বুঝিয়ে বলতে হল না। অতিশয় নাটকীয় ভাবে ছকুবাবু স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করলেন! হঠাৎ বারান্দায় বেরিয়ে এসে সামনের দিকে দুই হাত প্রসারিত করে' তিনি বলে উঠলেন—"আঁই, আঁই রেঁায়া আঁয়ি আঁয়ি—এতানা দেরি কাহে ভইল—আঁয়ি, উপর পাধারি—"

হাস্যোদ্ভাসিত মুখ তাঁর। খোঁচা খোঁচা গোঁফগুলো পর্য্যন্ত হর্ষ-কণ্টকিত।

"সর্ব্বনাশ, ও কি!"

সান্ত্বনাও সবিস্ময়ে ফিরে তাকিয়েছিল।

"বেহারের ভাষা বোধ হয়। উনি বলিয়া জেলায় ছিলেন, কিছুদিন ওঁর মুখে এই ধরনের কথা শুনেছি"

"যাব কিনা একটু দ্বিধা হচ্ছিল, কিন্তু এ ভাষা শোনার পর আর দ্বিধা নেই। বুঝলে, আমি চললাম। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। গণেশ"

"এই যে"—

"আঁয়ি, আঁয়ি, রেঁায়া, আঁয়ি—"

সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে রইল স্মিতমুখে।

গণেশ দ্রুত হস্তে 'গিয়ার' বদলে গাড়ি স্টার্ট করে' দিলে এবং স্টিয়ারিং ধরে' সেঁা করে' গাড়িটা ঘুরিয়ে একেবারে পঁচিশ মাইল বেগে সুরু করলে চালাতে। গাড়িটা বৃত্তির বাইরে বেরিয়ে যেতেই সান্ত্বনা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল বারান্দায়। পরেশের দিকে চেয়ে বললে—"একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়াতে উনি ফিরে গেলেন এই গাড়িতে"

"ও"

"কালই ফিরবেন সম্ভবতঃ"

অনৈকা মহিলার সান্নিধ্য সত্ত্বেও ছকুবাবু আত্মসংবরণ করতে পারলেন না। তাঁর ভাষা বদলে গেল। তিনি বলে ফেললেন—"আরে মোলো, এ যে চোঁচা দৌড় দিলে! তাজ্জব কি বাত!"

তারপর সান্ত্বনার নমস্কারের উত্তরে প্রতিনমস্কার করে' ছকুবাবু বললেন—"ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না তো। আসুন, ভিতরে আসুন"

শুনে দমে' গেলেন ছকুবাবু। চলে' গেলেন ভদ্রলোক। আফশোষ কি বাত!

"আপনি বলিয়া জেলার ভাষা বোঝেন?"

"না, আমি বুঝি না"

ভদ্রমহিলার সঙ্গে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় আলাপ করে' যেতে হবে না কি ক্রমাগত! সর্ব্বনাশ। তাহলে তো শক্তি-সংগ্রহ করা দরকার। শক্তি-সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে তিনি লাইব্রেরির দিকে যাচ্ছিলেন—এমন সময় সান্ত্বনা কথা কয়ে উঠল।

"আমাদের বন্ধু সদারঙ্গবাবু খুব বিরক্ত করে' গেছেন নিশ্চয় আপনাকে"

"না, না বিরক্ত আর কি। আপনার কুকুরটা যে পাওয়া গেছে এতে খুশীই হয়েছি বরং"

"হ্যাঁ কুকুরটার জন্যে আমরা—বিশেষ করে' আমি—বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। সব শুনেছেন নিশ্চয়"

"নিশ্চয়। শুনতে বাকি নেই আর। সব শুনেছি। ভদ্রলোক শুনিয়ে তবে ছেড়েছেন"

সান্ত্বনা একটু ইতস্তত করতে লাগল, তারপর ছকুবাবুর দিকে মাথা নেড়ে এমন একটা প্রত্যাশাসূচক ভঙ্গী করে' রইল যার অর্থ—যা শুনেছেন বলুন না সব।

"উঃ কি রাতই কেটেছে আপনাদের কাল"—মুচকি হেসে বললেন ছকুবাবু।

ঈষৎ অনুনাসিক আবদার-তরল-কণ্ঠে সান্ত্বনা বললে, "আপনি হাসছেন কিন্তু সে রাত্রে কি বিপদেই যে পড়েছিলাম আমরা"—

"বহুবচনটা কি গৌরবে ব্যবহার করছেন ? বিপদে তো পড়েছিলেন আপনার স্বামী ভদ্রলোক। শীতকালে রাতদুপুরে বিছানা ছেড়ে কুকুর আনতে দৌড়ানো অ্যাঁ ? হা হা হা"—

"হা—হা—হা"—কলকণ্ঠে সান্ত্বনাও হেসে উঠল—"হ্যাঁ তা দৌড়েছিলেন বটে। কুকুরটা এত কাঁদছিল আমরা ঘুমুতেই পারছিলাম না যে"

"তাই ভদ্রলোক বিছানা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। সমঝেছি। আমারও এ অভিজ্ঞতা হয়েছিল একবার। কিন্তু কুকুরের জন্য নয়, শেরের, মানে বাঘের জন্য। দিল ধাবড়ে দিয়েছিল একেবারে"

"ও"—সান্ত্বনার চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

"পোশমনবাবুর সঙ্গে শিকারে যেতে হয় কিনা। বাঘের সে কি আবাজ—ভর রাত বসে কাটাতে হয়েছে—ডরে দিল কাঁপছে। আপনার স্বামী এতটা বিপদে পড়েন নি। কুকুরটাকে খুলে দিয়ে এসে বিছানায় আবার এসে তখখুনি শুলেন তো—দু'চার লহমার ব্যাপার—"

চোখ মটকে আবার হাসলেন ছকুবাবু।

আপনাদের কাণ্ড সব শুনেছি, কি ভাবছেন, সব জানি ! হা-হা-হা—"

মুখে স্মিত হাসি ফুটিয়ে আনত নয়নে বসে রইল সান্ত্বনা। ছকুবাবু সোৎসাহে লাইব্রেরির দিকে চলে গেলেন।

খাশা মেয়ে। অচেনা এক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে বিকেলটা কেমনভাবে কাটবে ভাবনায় পড়েছিলেন ছকুবাবু। এখন মনে হচ্ছে—খাশা কাটবে। চোঁ চোঁ করে' তিনি সান্ত্বনার স্বাস্থ্য পান করে' ফেললেন খানিকটা।

···একটু পরে তিনি দেখলেন সান্ত্বনা কাপড়চোপড় বদলে একটি বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে লনের দিকে মুখ করে' বারান্দায় এসে বসল। বেশ ছিমছাম মেয়েটি। ছকুবাবু তর্জনীটি নাকের উপর লঘুভাবে রেখে লাইব্রেরির জানলা থেকে সান্ত্বনার গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন। সান্ত্বনাও যেন বুঝতে পারছিল আড়াল থেকে কেউ

তাকে লক্ষ্য করছে। আড়ষ্টতাটা কিছুতেই সে যেন কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করতে গিয়ে আরও যেন অস্বাভাবিক হয়ে উঠছিল।

…আকাশটা কেমন যেন ঘোলাটে গোছের। বাতাসে ইউক্যালিপটাস্ গাছের ডালপালাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে। চীৎকার করে' চলেছে একদল দাঁড়কাক। সান্ত্বনার কিন্তু প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ করার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না। জটিল পরিস্থিতিটার কথাই সে ভাবছিল লনের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে কি জটই না সে পাকিয়ে তুলেছে। কি করে যে এখন ছাড়ানো যায়! ভ্রূকুঞ্চিত করে' নিবিষ্টচিত্তে ভাবছিল সে। মনে হচ্ছিল সে যেন কোন অদৃশ্য দাবার ছকের দিকে চেয়ে চাল ভাবছে। দিগ্বিজয়বাবুর পল্লীভবনের নিবিড় শান্তি কিন্তু ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে প্রভাব বিস্তার করছিল তার মনে। অর্দ্ধ-বিস্মৃত রূপকথালোকের স্নিগ্ধ মায়া চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণার জ্বালাকে জুড়িয়ে দিচ্ছে যেন। সান্ত্বনার ছেলেবেলার খানিকটা এখানে কেটেছে। কোলকাতার অত্যুগ্র কোলাহলের পর এখানকার শান্তি যে কি মধুর তা অজানা নেই তার। চুপ করে' বসে রইল সে। গাছের মর্ম্মর আর পাখীর ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। অনেক দূরে একটা মালী ফুলের গামলাগুলো নিয়ে কি যেন করছে। আরও দূরে একটা ছোটবাছুর মনের উল্লাসে ছুটে বেড়াচ্ছে লেজ তুলে। নানা রকম দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে চোখ বুজে এল সান্ত্বনার। পল্লীপ্রকৃতির স্নেহ-ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করল সে ধীরে ধীরে।

…এখানে কেউ ছল চাতুরি করবে কেন? কিসের প্রয়োজন? কুকুর হারিয়ে গিয়েছিল—একজন বন্ধু সেটা পেয়ে ফেরত দিয়ে গেলেন—এ আর এমন কি একটা ঘটনা, যার জন্যে তার গত চব্বিশ ঘণ্টার গতিবিধির তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করা প্রয়োজন? ভাবনা কি! তাকে কেউ জেরা করতেও আসছে না। মাসীমাকে সমস্ত ঘটনাটা খুলেই বলবে সে লুকিয়ে। আর বাকি সকলের জন্য অত মিথ্যে'র জাল বোনবার দরকারই বা কি!

…নিজের স্বামীর উপর আস্থা আছে। মনে মনে ছবিটা কল্পনা করছিল সে।

সবিস্ময়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে' শুনবে, তারপর ছোট্টহাসির আভায় মিলিয়ে যাবে সমস্ত ভ্রূকুটি।

...গোঁসাইজির সঙ্গে জীবনে আর দেখাই হবে না হয় তো।

...সদারঙ্গবিহারীলাল? হ্যাঁ, ও ভদ্রলোককে সামলাতে হবে। মোটরবাইকে চড়ে' আর অধিক দূর অগ্রসর হবার পূর্ব্বেই ওকে রুকতে হবে। ওঁকে সঙ্গে করে' নিয়ে গেলেই হবে না হয় তাঁর বাড়িতে একদিন। এখান থেকে কত দূরই বা। কিন্তু না, একটু সাবধানতার প্রয়োজন আছে। গোঁসাইজির হিন্দু পান্থনিবাসে অবস্থিত সেই অতিকায় ছাপ্পর খাটে যে রহস্য নিহিত আছে তার খবরটা ভদ্রলোক জানেন যে। একটু সাবধানতার প্রয়োজন আছে বই কি। যিনি তাঁদের এক খাটে প্যাশাপাশি শুয়ে থাকতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি ছাড়া সদারঙ্গবিহারীলালই এক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভয়ঙ্কর সাক্ষী। পরেশ কিম্বা ছকুবাবু তার সাজানো-স্বামীটিকে চাক্ষুষ করেন নি বটে, কিন্তু সদারঙ্গবিহারীলাল রীতিমত গল্প করেছেন তার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে' উচ্ছ্বসিত হয়ে। গোঁসাইজি নিশ্চয় তাঁর কাছে তাদের পাশাপাশি শুয়ে থাকার গল্পটাও করেছেন। গোঁসাইজি যে রকম নিখুঁত প্রকৃতির লোক—নিজের গল্পকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য সদারঙ্গবিহারীলালকে উপরে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে ছাপ্পর খাটটা দেখিয়েছেনও হয়তো। মোট কথা, যা জানবার সবই তিনি জেনেছেন এবং যে রকম উর্ব্বরমস্তিষ্ক উৎসাহী লোক, হয় তো অনেক কিছু রংও চড়িয়েছেন তাতে কল্পনা থেকে। না, সদারঙ্গবিহারীলাল সম্বন্ধে সাবধানতার খুবই প্রয়োজন আছে।

......সুশোভনের সম্বন্ধেও। ওই স্বল্পবুদ্ধি দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকটিকে রীতিমত তামিল না দিয়ে অমন হুড়মুড় করে' পাঠানোটা ঠিক হয় নি মোটেই। কোন অবস্থায় কি বলতে হবে, তা অন্তত বলে' দেওয়া উচিত ছিল। অনীতার কাছে সাফাই গাইবার জন্য উলটো-পালটা যা-তা বলে' বসবে হয় তো।

......ইউক্যালিপটাস্ গাছগুলোর মাথায় আকাশটা ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়ে এল বেশ। দাঁড়কাকগুলো আরও জোরে চীৎকার করছে। মালীটা ঘাড় তুলে চেয়ে দেখলে

একবার, তারপর টবটা মাটিতে নাবিয়ে ছুটল তার ঘরের দিকে। বাছুরটাও ছুটে পালাল। বৃষ্টি এল। মানুষের বহুবিধ ভ্রান্তির জন্য রোষে ক্ষোভে দুঃখে প্রকৃতি যেন কেঁদে ফেললেন।

সান্ত্বনা উঠে ভিতরে গেল। তার চিত্ত তখন রীতিমত বিচলিত।...

পরেশ এসে সসম্ভ্রমে খবর দিলে খাবার দেওয়া হয়েছে। সান্ত্বনা গিয়ে দেখলে ছকুবাবুও চায়ের টেবিলে সমাসীন। সান্ত্বনার হাব-ভাব দেখে দমে' গেলেন কিন্তু ছকুবাবু। যে রকম উচ্ছলতা তিনি আশা করেছিলেন তাতো মোটেই নেই। মিইয়ে গেল কেন হঠাৎ! তবু তিনি হাল ছাড়লেন না। নানাপ্রসঙ্গ উত্থাপন করে' ভাব জমাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ছোট ছেলের সঙ্গে ভাব করবার জন্যে লোকে যেমন নানা উপায় উদ্ভাবন করে, ব্যাপারটা অনেকটা সেই গোছের দাঁড়াল। কিন্তু তেমন জুত করতে পারলেন না। তিনি। তাঁর মনে হতে লাগল একটা অদৃশ্য যবনিকা যেন সান্ত্বনার মনকে তাঁর রসিকতা-কিরণ থেকে আড়াল করে' রাখছে। মনে মনে চটতে লাগলেন খুব, অথচ মুখে দেঁতো হাসি হেসে নানা রকম রসিকতাও করে' যেতে লাগলেন। সান্ত্বনাও গম্ভীরভাবে শুনে যেতে লাগল। খাদ্যপ্রসঙ্গে অবতীর্ণ হলেন শেষে ছকুবাবু। কোনও দিক থেকে সুবিধে করতে না পেরে মনের নেপথ্যলোকে রাগটা জমে' উঠেছিল বেশ। ঝালটা ঝাড়লেন ডালের উপর। লুচির সঙ্গে ঘন বুটের ডাল ছিল খানিকটা।

"ডালটা ভাল লাগছে আপনার? রাম কহো, এর নাম কি ডাল! এরা কি ডালের মর্ম্ম বোঝে! বুটের ডাল বলে' চেনবার উপায় আছে! ঘেঁটেঘুঁটে লেই বানিয়েছে একটা। আমার 'খাওয়াশ'টা যদি থাকত, ডাল কাকে বলে দেখিয়ে দিতাম আপনাদের। আপনাদের 'খাওয়াশ' কি বাঙালী? 'খাওয়াশ' আছে নিশ্চয়"

"না বোধহয়। 'খাওয়াশ' জিনিসটা কি"

"সীয়ারাম, আপনি বুঝি বাইরে এক ডেগও যান নি। 'খাওয়াশ' মানে চাকর"

"ও। না, বাংলার বাইরে আমি যাই নি কখনও"

"তাহলে ডালের মর্ম্মই বোঝেন নি। ওদেশের বুটের ডাল, বুটের হালুয়া, পুদিনার চাটনি, লিট্টি, ডালরুটি, তিলুয়া, ঠেকুয়া, সিদ্ধির সরবৎ—অপূর্ব্ব জিনিস সব। আবার ওদেশে ফিরতে হবে দেখছি। ডালই আমাকে তাড়াবে এ দেশ থেকে"—

"ওদেশের ডাল খুব ভাল বুঝি"

"বেশক্"

"শুনে আমারও যেতে লোভ হচ্ছে"

মুচকি হেসে বললে বটে সান্ত্বনা, কিন্তু তার একটুও ভাল লাগছিল না। একটু আগে সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ারটিতে একা বসে তার মনে যে শান্ত স্নিগ্ধ ভাবটি এসেছিল তা যেন খিঁচড়ে গেল। একটা অজানা আশঙ্কা তার মনের শান্তিকে বিঘ্নিত করছিল, এই ছকুবাবু লোকটির অসহ্য আস্ফালনও নষ্ট করছিল এখানকার নির্জ্জন স্নিগ্ধতাকে। মনে হচ্ছিল একটা বাঁদর যেন এসে মন্দিরে ঢুকেছে।

আহারান্তে ছকুবাবু উঠলেন এবং দাঁড়ালেন গিয়ে জানলার ধারে। বৃষ্টিটা থেমেছে। একটু-আধটু রোদও দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতির মেজাজটা একটু যেন প্রসন্ন হয়েছে মনে হল। ছকুবাবুর মেজাজও প্রসন্ন হয়েছিল। সে কথা বললেনও তিনি। এমন কি বৈকালিক ভ্রমণের ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন। বললেন—দেখে আসি ওরা কোনদিকে গেল। আপনি যাবেন? চলুন না"। সান্ত্বনা ভদ্রভাবে অসম্মতিজ্ঞাপন করাতে একাই বেরিয়ে পড়লেন তিনি।…বারান্দায় সূর্য্যালোক এসে পড়ল আবার। মালীটা তার ঘর থেকে বেরিয়ে আবার গামলাগুলো পরিষ্কার করতে লাগল। সুরেশ্বরী দেবীর বুড়ো স্প্যানিয়েলটা থাবার উপর মুখ রেখে শুয়েছিল গম্ভীরভাবে। ঝুমু তার চারদিকে লাফালাফি করে' তাকে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু উৎসাহের কোনও

লক্ষণ প্রকাশ করল না সে। প্রবীণ দাদামশাই দামাল নাতনীর দুরন্তপনা সহ্য করেন যেমনভাবে—তেমনি একটা মুখভাব করে' সে থাবার উপর মুখ রেখেই শুয়ে রইল। সাইকেল দেখা গেল দূরে একটা। টেলিগ্রাফ পিওন। সুরেশ্বরী দেবীর নামে টেলিগ্রাম। সান্ত্বনাই সই করে' নিলে। হলদে খামটার দিকে চেয়ে রইল সে খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে'। কার টেলিগ্রাম হতে পারে? খুলবে? না, সেটা উচিত হবে না। ভিতরে গিয়ে পরেশের হাতে দিয়ে দিলে সেটা। পরেশ সুরেশ্বরী দেবীর চিঠি লেখার টেবিলে এমনভাবে সেটা রেখে দিলে—যাতে এসেই তিনি দেখতে পান।

মৃত্যুর সম্বন্ধে যেমন ঝড়বৃষ্টির সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি। প্রত্যেক মানুষের ধারণা আমি ঠিক বেঁচে যাব। বৃষ্টিটা অপ্রত্যাশিতভাবে মোটেই আসে নি। আকাশ অনেকক্ষণ থেকেই ঘনঘোর হয়েছিল। তবু কিন্তু অনেকগুলি লোক ভিজে গেলেন এতে। রায় বাহাদুর দিগ্বিজয় একজন। সুরেশ্বরী দেবী আর একজন। মাধব গোমস্তার বাড়ি থেকে বেরিয়েই বৃষ্টিটা পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি ফিরলেন না, কারণ একটু-আধটু বৃষ্টিতে ভিজলে তাঁর কিছু হয় না, এই তাঁর ধারণা। দ্বিতীয় কারণ শিকারীদের জন্যে যে খাবার তিনি এনেছেন তিনি না গেলে সেগুলো অভুক্তই পড়ে থাকবে। গ্রামের আরও যে দু'জন লোক শিকারে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরাও ভিজেছিলেন বেশ। গোবর্দ্ধনবাবু ভিজে ন্যাতা হয়ে গিয়েছিলেন বললেই হয়। শিকারের উৎসাহ-বহ্নিতেও জল পড়েছিল প্রচুর। প্যাচপেচে কাদায় ছপ ছপ করতে করতে একটা বড় গাছতলায় সবাই সমবেত হলেন এসে!

"যাচ্ছেতাই কাণ্ড"—দিগ্বিজয় বললেন সুরেশ্বরীর দিকে চেয়ে···"এঃ—বড্ড ভিজে গেলে যে তুমি। আর শিকারে কাজ নেই, চল বাড়ি ফেরা যাক"

"আমি? আমি কিচ্ছু ভিজি নি। কিন্তু আমার মনে হয় ফেরাই ভাল; তুমি বড্ড ভিজেছ—এঁরাও—"

"কি যে বল, আমি একটুও ভিজিনি"

"তোমার গা থেকে টপ টপ করে' জল পড়ছে দেখতে পাচ্ছি, আর তুমি বলছ ভিজিনি !

"টপ টপ করে' জল পড়ছে ওয়াটার-প্রুফ বেয়ে। ভাগ্যে ওটা সঙ্গে এনেছিলাম। ভিতরে কিছু ভেজেনি আমার। শোন, গাড়ি ক'রে তুমি বরং ফিরে যাও, তোমার শাড়ি ভিজে সপসপ করছে"

সুরেশ্বরী দেবী চুপ করে' রইলেন।

"সত্যি, তোমাদের শিকারটা মাটি হল"

"বিশ্রী দিন আজ ! কিচ্ছু ভাল্লো লাগছে না আমার"

এ সুযোগ সুরেশ্বরী দেবী উপেক্ষা করলেন না। দিগ্বিজয় নিজমুখে স্বীকার করেছেন তাঁর কিছু ভাল লাগছে না !

"চল তবে ফেরাই যাক"

তাঁর কণ্ঠস্বরে বিজয়িনীসুলভ সুর বেজে উঠল।

অন্যান্য পথিকরাও ভিজেছিলেন এ বৃষ্টিতে। একটা বুড়ো চাষা ভিজতে ভিজতে ছুটছিল। শুধু ছুটছিল না, চীৎকারও করছিল প্রাণপণে।

গণেশ খুব ভেজেনি। তার গাড়ির রেডিয়েটার আবার খারাপ হয়েছিল। ঝুঁকে তারই তদারক করছিল সে, এমন সময় বৃষ্টিটা এল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িব ভিতর ঢুকে সে জানলার কাচগুলো তুলে দিলে—আর বিরক্ত মুখে ভাবতে লাগল কি অশুভক্ষণেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল।

সুশোভন বেশ ভিজেছিল। কিন্তু নিজের চিন্তাতেই এত তন্ময় ছিল সে যে বৃষ্টি নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না তার। সে হাঁটছিল। দ্রুতবেগে হাঁটছিল ফাংনাক্ষিরিঙ্গিপুর অভিমুখে। আর মনে মনে ভাববার চেষ্টা করছিল কোন ট্রেন কখন পাওয়া যাবে, কাকে কি টেলিগ্রাম করবে, আর ফোন করবার সুযোগ যদি পাওয়া যায় কি বলবে ফোনে।

স্বয়ম্প্রভা দেবী যে ট্রেনটায় আসছিলেন সেটাও ভিজেছিল বৃষ্টিতে। জিতুবাবু সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে স্বয়ম্প্রভা বললেন, "তুমি বাজে কথা বলে' অন্যদিকে আমার মন ফেরাবার চেষ্টা করছ বুঝতে পারছি। কিন্তু অন্য কোনও কথা ভাবব না আমি এখন। ভাবতে চাই না"—জিতু সরকার আর কিছু না বলে' বাতায়ন পথে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। সেই একই ট্রেনে—ঠিক তিনটি কামরা পরে—অধ্যাপক ব্রজেশ্বরবাবুও ছিলেন। তিনি এককোণে বসে' সেদিনকার কাগজটা পড়ছিলেন নিবিষ্টচিত্তে। কাচের জানলাটা বন্ধ ছিল। বৃষ্টির শব্দে বাইরের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে' চাইলেন তিনি একবার, তারপর আবার কাগজে মন দিলেন।

বাইক-বিহারী সদারঙ্গবিহারীলালেরই সব চেয়ে বেশী ভেজা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি উর্দ্ধশ্বাসে বাইক চালিয়ে হনুমানপুরে পৌঁছে গিয়েছিলেন ঠিক। বিশেষ ভেজেন নি।

যাঁর ভেজবার কথা নয়, যিনি কখনও কোনও উচ্ছৃঙ্খল ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চান না, সেই গোঁসাইজি ভীষণভাবে পড়ে গেলেন এই উচ্ছৃঙ্খল ঝড়-বৃষ্টির খামখেয়ালী খপ্পরে। গোঁসাইজি কদাচিৎ বাড়ি থেকে বের হন। কিন্তু সেদিন প্রিয়বন্ধু নিতাই বৈরাগী নিমন্ত্রণ করেছিল তাঁকে। বাড়িটা একটু দূরে হওয়াতে যাবেন কি না ইতস্তত করছিলেন—কিন্তু জনৈক সহৃদয় গাড়োয়ান বিনা ভাড়ায় নিজের গরুর গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে যেতে রাজি হয়ে গেল যখন, তখন আর দ্বিধা রইল না। ফিরতি মুখে গাড়োয়ান নিয়েও আসবে তাঁকে। তিনি ফদকা এবং পার্শ্ববর্তী তাড়ির দোকানের চাকর গোকুলের হাতে তাঁর হিন্দু পান্থনিবাস ও অসুস্থ গুরুভগ্নীর ভার দিয়ে নিতাই বৈরাগীর সঙ্গসুখ লাভ করতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। একটি ছাতাও ছিল তাঁর—রেলিব্রাদার্সের বৃহত্তম ছাতা, উপরে শাদা কাপড়ের মলাট দেওয়া—তবু কিন্তু তিনি রক্ষা পেলেন না। ঝড়-বৃষ্টির সমস্ত তোড়টা তাঁর উপর পড়ল এসে।

(১৮)

সদারঙ্গবিহারীলাল যে ঐতিহাসিক মন্দির ও মূর্তিগুলির উল্লেখ সুশোভনের কাছে করেছিলেন সেগুলি দেখতে হলে যে ষ্টেশনে নাবা দরকার সেই ষ্টেশনে নেবেই মুচুকুন্দকুণ্ডলেশ্বরীর জন্যও গাড়ি বদল করতে হয়। সুতরাং অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে সেই ষ্টেশনে নেবেছিলেন। নেবে নিজের খদ্দরী ঝোলা থেকে কিছু ফলমূল বের করে' এবং ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী দোকানটা থেকে কিছু লুচি ভাজিয়ে নিয়ে আহারটা সমাধা করে' নিলেন তিনি প্রথমে। তারপর হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলেন। ট্রেনের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে এখনও। ষ্টেশনের দেওয়ালে টাঙানো টাইম-টেবিলটা দেখলেন আর একবার। হ্যাঁ, এখনও অনেক দেরী আছে ট্রেনের। ষ্টেশন মাস্টারের কাছে গেলেন। তাঁর কাছে নিজের খদ্দরের ঝোলাটি এবং স্যুটকেসটি গচ্ছিত রেখে বেরিয়ে পড়লেন তিনি ষ্টেশন থেকে। বেশ দ্রুত পদক্ষেপেই বেরিয়ে পড়লেন। অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে আস্তে হাঁটেন না কখনও। ঐতিহাসিক মানুষ তিনি। রাউতপুরের উক্ত প্রাচীন মন্দির ও মূর্ত্তিগুলির কথা তিনিও শুনেছিলেন। এ সুযোগ ত্যাগ করা অনুচিত হবে তাঁর মনে হল। একটু দূর গিয়ে স্থানীয় একটি লোকের সঙ্গে দেখা হল তাঁর। লোকটি তাঁকে সোজা একটি রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বললে—"এ রাস্তা দিয়ে গেলে ঘুর হবে একটু, মাঠামাঠি গেলে শিগ্‌গির পৌঁছবেন।" অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে মাঠে নেবে পড়লেন।

...মন্দিরের কাছে পৌঁছে হাতঘড়িটার দিকে চাইলেন একবার। তারপর চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলেন। আর একবার হাতঘড়িটা দেখলেন। অবাক হলেন একটু! মোটে তিন মিনিট কাটল। হঠাৎ তাঁর মনে হল সুবিশাল মন্দিরটা যেন আধুনিকতার সমস্ত হৈ চৈ হুড়োমুড়িকে অগ্রাহ্য করে' অচঞ্চল গাম্ভীর্য্যসহকারে সময়ের গতিরোধ করে' দাঁড়িয়ে আছে। কথাটা মনে হতেই তাঁর ডানদিকের ভ্রূর শেষ প্রান্তটা তড়াক করে' উপরের দিকে উঠে গেল খানিকটা। তারপর

সচেতন হলেন তিনি—সময় নষ্ট হচ্ছে—কবিত্ব করে' সময় নষ্ট না করে' মন্দিরটাকে দেখা উচিত আগে ভাল করে' নানাদিক থেকে।

একটু এগিয়ে একটা কোণ ঘুরেই থমকে দাঁড়াতে হল তাঁকে। যা চোখে পড়ল তা অপ্রত্যাশিত। সামনেই একটা মোটর বাইক স্ট্যাণ্ডের উপর দাঁড় করানো রয়েছে। তার সামনেই মন্দিরের একটা সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশেই প্রকাণ্ড একটা সুড়ঙ্গ-গোছের, মাটির নীচে চলে গেছে। তার ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকেছেন কে একজন। তাঁর দেহের নিম্নার্দ্ধ—বিশেষ করে' পশ্চাদভাগটা—দেখা যাচ্ছে কেবল। এই সুযোগে একটা ছোঁড়া পা দিয়ে তার মোটর-বাইকটা ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। ব্রজেশ্বরবাবুর বুঝতে দেরি হল না যে মোটর-বাইক ওই ভদ্রলোকের, ছোঁড়াটা দুষ্টুমি করবার চেষ্টায় আছে। বাইকটা পড়ে' গেলে জখম হতে পারে। পরুষ কণ্ঠে ধমকে উঠলেন তিনি—"এই কি হচ্ছে—"

ছোঁড়াটা ছুটে পালাল এবং নানা রকম কসরৎ করে' সুড়ঙ্গ থেকে নিজের দেহকে অতি কষ্টে মুক্ত করে' বেরিয়ে এলেন সদারঙ্গবিহারীলাল। হাতে টর্চ।

"কি! বলছেন কি! সুড়ঙ্গের ভিতরও খানিকটা কারুকার্য্য আছে কি না আমি সেইটে দেখছিলাম। মানে, আশা করি অন্যায় হয় নি তাতে কিছু। আপনি কি প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কেউ?"

"না। আমি—"

"এই মন্দিরের কারুকার্য্য সম্বন্ধে কিছু লেখবার ইচ্ছে আছে আমার। আপনি যদি প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কেউ না হন তাহলে হঠাৎ অমন ধমকে উঠলেন যে! মাথাটা এমন ঠুকে গেছে আমার। উঃ—"

মাথার পিছন দিকে হাত বুলোতে লাগলেন তিনি।

"আমি আপনাকে কিছুই বলি নি। এ মোটর-বাইক কি আপনার?"

"হ্যাঁ, আমারই। কিন্তু এ কথাই বা জিগ্যেস করছেন কেন তাও তো বুঝতে পারছি না। আমি এ নিয়ে চটাচটি করতে চাই না, কিন্তু অমন আচমকা চীৎকার করবার সত্যি কি কোনও দরকার ছিল? আমার মোটর-বাইক নিশ্চয়

আপনার কোনও ক্ষতি করে নি। আশেপাশে প্রচুর জায়গা রয়েছে, স্বচ্ছন্দে আপনি চলে' যেতে পারতেন। কিছু মনে করবেন না, কিন্তু ওখানে মোটর-বাইক আমি কেন রাখতে পাব না তা আমি বুঝতে পারছি না। বিশেষ আপনি যখন প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কেউ নন তখন অমন করে' চেঁচাবার—"

"মশাই, আমার কথাটা শুনুন আগে শেষ পর্য্যন্ত। শুনলে হয় তো আপনার রাগ আর থাকবে না—"

"না, না, রাগ আমার হয় নি, রাগের প্রশ্নই উঠছে না। আপনার চীৎকারে আমি এমন চমকে উঠেছি যে মাথাটা ঠুকে গেছে। সুড়ঙ্গের ভিতর সব পাথর কিনা—"

"একটা ছোঁড়া আপনার বাইকটা ফেলে দেবার চেষ্টা করছিল, আমি তাকেই একটা ধমক দিয়েছিলাম"

"ও, তাই না কি! আরে বাঃ—সো সরি, কিছু মনে করবেন না মশাই, ক্ষমা করুন, মানে করতেই হবে। ছি ছি ধারণার অতীত ছিল—ঠিক—মানে, আচমকা মাথা ঠুকে গেলে মানসিক অবস্থাটা একটু—বুঝতেই পারছেন। ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ, অসংখ্য"

এগিয়ে এসে বাইকটা নেড়ে চেড়ে দেখলেন একবার। ব্রজেশ্বরবাবু লক্ষ্য করলেন তাঁর দু'টি হাতেই প্রচুর কাদামাটি লেগে রয়েছে। গবেষণার ফল সম্ভবতঃ। সদারঙ্গবিহারীলাল ব্রজেশ্বরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে ক্ষমা-প্রার্থনা-ব্যঞ্জক অদ্ভুত রকম ছোট্ট হাসি হাসলেন একটা। যেমন হারমোনিয়ামের একটা 'রীড'কে প্যাক করে টিপে দিলে কে একবার। ব্রজেশ্বরবাবু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন কেবল। তাঁর মুখে কোমলতার কোনও আভাস ফুটল না।

"আপনার মাথায় চোট লেগেছে অবশ্য, কিন্তু আপনার বাইকটা চোট থেকে বেঁচেছে"

"নিশ্চয়, আর কোনও ক্ষোভ নেই আমার—একদম না। ছোঁড়াটা গেল কোন দিকে? ছোঁড়া?"

ব্রজেশ্বরবাবু ঘাড় নাড়লেন।

"এ অঞ্চলের ছোঁড়া ছুঁড়ি সব পাজি। আপাদমস্তক। পরশু দিন বাইকটা রাস্তায় রেখে একজনের বাড়িতে গেছি ইতিমধ্যে একটা ছোট্ট ছুঁড়ি এসে হর্ণ টা বাজাতে সুরু করেছে। আর একটা গ্যাং বাইকটা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই দে ছুট। হা-হা-হা—"

"এটা ছোঁড়া। আমার ধমক খেয়ে ছুটে পালাল"

"পালিয়ে বুদ্ধিমানের কাজই করেছে"—পাশের ঘন ঝোপটার দিকে চেয়ে সদারঙ্গবিহারীলাল বললেন। এমনভাবে বললেন যেন ছোঁড়াটা পাশের ঝোপেই লুকিয়ে আছে এবং তাঁর কথা শুনছে।

"প্রত্নতত্ত্ববিভাগের উচিত এই সব হতভাগা ছোঁড়াদের এখানে ঢুকতে না দেওয়া। এখানে গরু চরাচ্ছে, ছাগল চরাচ্ছে—যা তা। একদিন দেখি একটা ছোঁড়া দমাদ্দম্ কাটি ঠুকছে মন্দিরের গায়ে—একটা চমৎকার বিষ্ণুমূর্তি ছিল সেখানে—বিষ্ণুর কপাল ফেটে চৌচির—দেখবেন? আসুন না। প্রত্নতত্ত্ববিভাগে লেখা উচিত। লিখব ভাবছি। একে ধর্ষণ করলে কিছু অন্যায় হয় না। হয়?"

বলা বাহুল্য সদারঙ্গবিহারীলাল একটা আলঙ্কারিক উপমা মাত্র দিয়েছিলেন। এই আগন্তুক ভদ্রলোক কিন্তু যেভাবে সেটা নিলেন তা অপ্রত্যাশিত। রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন সদারঙ্গবিহারীলাল। দ্বিতীয়বার যেন তাঁর মাথা ঠুকে গেল।

"হুম"—ব্রজেশ্বরবাবু বললেন—"আপনি যখন প্রশ্ন করলেন তখন আমাকে বলতেই হচ্ছে আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই।"

অপ্রস্তুত সদারঙ্গবিহারীলাল সবিস্ময়ে এই খদ্দরপরিহিত ব্যক্তিটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন বার দুই। আশ্চর্য্য! বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই যে আসলে ইনি এতবড় একটি কালাপাহাড়।

"মিল নেই? সত্যি? প্রত্যাশা করি নি। ভারী আশ্চর্য্য কিন্তু"

"আপনাদের মতো লোকই কেবল এসব জায়গায় আসতে পারবে, অন্য কেউ পারবে না—এটা খুব যুক্তিযুক্ত মনে হয় না আমার"

"হয় না? আশ্চর্য্য কাণ্ড। এটা নিশ্চয়ই আপনাকে মানতে হবে অতীতের এই গৌরবময় মন্দিরে এমন লোকের প্রবেশ করা উচিত নয় যারা এর মূল্য সম্বন্ধে সচেতন নয় এবং সেই জন্যেই যারা সশ্রদ্ধ নয়, মানে, এককথায় চাষার স্থান এ নয়। চাষারা এখানে এসে যে কি কাণ্ড করে—উঃ কি সাংঘাতিক জানেন? কে একজন হারাধন বসাক ছুরি দিয়ে নিজের নাম খোদাই করেছে একটা মূর্ত্তির পেটের উপর। চোয়াড়ের দল সব! স্বচ্ছন্দে সরে' থাকলেই পারে। অতীতের প্রতি যাদের শ্রদ্ধাই নেই তাদের এখানে দরকার কি—তারা আসবেই বা কেন! হারাধন বসাকের দল যখন এসবের দফা নিকেশ করে' দেবে তখন কি হবে বলুন তো? আর কি ফিরে পাওয়া যাবে? এসব কি বাজারে পাওয়া যায় যে আর একটা কিনে এনে বসিয়ে দিলেই চলবে? আমার মতে এমন কোনও বাজে লোককে এখানে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয় যারা এসবের মর্ম্ম বোঝে না, এসবকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না—"

সদারঙ্গবিহারীলালের কণ্ঠস্বরে উষ্মা যথেষ্ট ছিল, কিন্তু আসলে যে সুর তাতে বাজছিল তার উদ্দেশ্য এই অদ্ভুত প্রকৃতির আগন্তুকটিকে স্বমতে আনয়ন করা।

ব্রজেশ্বরবাবু মন্দিরের ভগ্নস্তূপের দিকে অতিশয় তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন একবার। তারপর পরিষ্কার শান্তকণ্ঠে বললেন, "মাপ করবেন, এই সব চুণ-সুরকির স্তূপকে শ্রদ্ধা করতে আমি প্রস্তুত নই"

তিনি আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বললেন না। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে চাইলেন। সদারঙ্গবিহারীলাল নাকের মাঝখানটা চুলকুলেন একবার এবং যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন হঠাৎ। নির্ব্বাক হয়ে গেলেন ক্ষণকালের জন্য। লোকটা বলে কি!

ব্রজেশ্বর পুনরায় মুখ ফেরালেন এবং নিজের দৃষ্টিকে ধীরে ধীরে পুনঃস্থাপিত করলেন সদারঙ্গবিহারীলালের রশ্মিবিকিরণশীল চশমার উপর। একটা অতি

ক্ষীণ হাসি—যা ঠিক হাসি নয়, হাসির আভাষ—তাঁর অধরে ফুটি ফুটি করেও যেন ফুটল না।

"না"—নিজের চিন্তাধারাকে আশ্রয় করে' তিনি যেন বললেন—"এমন সব মন্দির আছে যার গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত কাটতে পারে না কেউ—ধ্বংস করা দূরে থাক। কিন্তু সে সব মন্দির হাতে-তৈরি চুণ-সুরকির মন্দির নয়। বিজ্ঞানের মন্দির, সাহিত্যের মন্দির, যে সব মন্দিরে পূজারীরা জ্ঞানলাভ করে' প্রকৃত আনন্দ পান সেই সব মন্দিরই পবিত্র, সেই সব মন্দিরকেই আমি শ্রদ্ধা করি। একটা পচা পুরোণো শিবমন্দির বা বিষ্ণুমন্দির"—ভগ্নস্তূপের দিকে হস্ত প্রসারিত করলেন তিনি—"থাকল বা গেল কি এসে যায় তাতে। একটা হাত পা ভাঙা মূর্ত্তির চেয়ে জীবন্ত হারাধন বসাক ঢের বেশী শ্রদ্ধেয় আমার চোখে—"

সদারঙ্গবিহারীলাল ঈষৎ ব্যায়তআননে দাঁড়িয়ে রইলেন, কোন জবাব দিলেন না। অদ্ভুত লোক! আর একবার কৌতূহলভরে আড়চোখে চেয়ে দেখলেন দীর্ঘাকৃতি লোকটির দিকে। এদেরই কি গোঁয়ার-গোবিন্দ বলে? অসম্ভব নয়। সরু লম্বা মুখখানা। মনে হয় ছেলেবেলায় সমস্ত মুখখানা ধরে' লেবুর মতো নিংড়ে দিয়েছে কেউ যেন। ছুঁচলো থুতনিটাতে ফুটে উঠেছে ভদ্রলোকের চরিত্র —ঠিক দৃঢ়তা নয়—একগুঁয়েমি। চোখ দু'টি কিন্তু ঠিক উলটো। আশ্চর্য্য! যদিও বসা কিন্তু চোখে একগুঁয়েমি বা রুক্ষতার কোনও চিহ্ন নেই। বরং দৃষ্টি থেকে যা ক্ষরিত হচ্ছে তা স্নিগ্ধ। সদারঙ্গবিহারীলাল এ-ও লক্ষ্য করলেন ভদ্রলোক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খুব। খদ্দরের জামাকাপড় ধপধপ করছে। পোষাকে আড়ম্বর নেই, কিন্তু মার্জ্জিত রুচির পরিচয় আছে। এঁকে দেখে তো মনে হয় না যে ইনি কোনও মূর্ত্তি নষ্ট করতে পারেন বা কোনও অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের গবেষণায় বাধা দিতে পারেন। মোটেই মনে হয় না। অথচ কথাবার্ত্তা থেকে—! আশ্চর্য্য!

এ কথাটা ব্রজেশ্বরবাবুরও মনে হল সম্ভবতঃ। কারণ এর পরই তিনি বা

বললেন তার স্বর অন্যরকম। বেশ নরমই—অনেকটা ক্ষমাপ্রার্থনার মতো শোনাল।

"আমার মতামত তা বলে' জোর করে' চাপাতে চাই না আপনার ঘাড়ে। প্রত্যেকেরই নিজের মত পোষণ করবার অধিকার আছে"

"তা আছে বই কি! বাঃ। ভাল লাগল এ কথাটা—" চশমাটা ঠিক করে' নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন সদারঙ্গবিহারীলাল হাস্যোদ্ভাসিত মুখে।

ব্রজেশ্বরবাবু বল্লেন, "খাপছাড়াভাবে আমার অভিমতটা শুনে আপনার একটু বেখাপ্পা ঠেকছে বোধহয়। একটু হকচকিয়ে গেছেন মনে হচ্ছে। যদি আপত্তি না থাকে আপনাকে একটু পরিষ্কার করে' বুঝিয়ে বলি"

"আপত্তি? মোটেই না, ভারী ইন্টেরেস্টিং বরং"—

"আপনার কি ধর্ম্মবাই আছে? কারণ ও ব্যাধি আক্রমণ করেছে যাঁকে তাঁর কাছে যুক্তির অবতারণা করা বৃথা। তিনি চাইবেন সকলে তাঁর প্রলাপকে যুক্তিযুক্ত বলে' মেনে নিক"

সদারঙ্গবিহারীলালের হাসি আকর্ণবিস্তৃত হয়ে উঠল।

"বিপক্ষের যুক্তিকে সবাই প্রলাপ বলে' প্রতিপন্ন করতে চায়। সে কথা যাক্। আপনি কি বলতে চাইছেন বলুন না। বেশ লাগছে"

"দেখুন"—ধীরে ধীরে সুরু করলেন ব্রজেশ্বরবাবু—"যে আধ্যাত্মিকতা, অর্থাৎ, যে সূক্ষ্ম আত্মোপলব্ধি প্রত্যেক ধর্ম্মেরই মূলকথা, তার সঙ্গে এই পাথরের স্তূপের সম্পর্ক নির্ণয় করা একটু কঠিন নয় কি? ধর্ম্মটা হল আত্মিক ব্যাপার—আর এগুলো—পাথরের শিব-লিঙ্গই হোক বা সোনার ষাঁড়ই হোক—হাতে তৈরি স্থূল ব্যাপার—"

"এক মিনিট"—সোৎসাহে বলে' উঠলেন সদারঙ্গবিহারী—"থামুন—বাঃ চমৎকার জমবে মনে হচ্ছে। কিন্তু গোড়াতেই একটা কথা জিগ্যেস করে নি। আপনার এবং আমার ধর্ম্মমত কি এক"

"হওয়া সম্ভব বলে' মনে হয় না"

"ব্রাহ্ম না কি আপনি"

ব্রজেশ্বর ঘাড় নাড়লেন।

সদারঙ্গবাবু তাঁর মুখের দিকে ক্ষণকাল নির্নিমেষে চেয়ে থেকে আবার যেন সঞ্জীবিত হয়ে উঠলেন।

"তা হোক্। হিন্দু বলে' পরিচয় দেন নিশ্চয় নিজেকে"

"নিশ্চয়"

"ভারতীয় বলেও"

"অবশ্য"

"তাহলে, মানে, শুনুন আপনার কাছ থেকেও এরকম আচরণ তো প্রত্যাশা করা যায় না। সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার তর্ক তুলব না—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পড়ে দেখুন গিয়ে—তুললে অনেক সময় নষ্ট হবে। আমি শুধু এই কথা বলছি যে এটা প্রত্যাশা করা যায় না আপনার কাছ থেকেও যে হিন্দু হয়ে আপনি হিন্দুত্বের গায়ে কাদা ছিটিয়ে বেড়াবেন, ভারতীয় হয়ে ভারতের গৌরব সম্বন্ধে উদাসীন থাকবেন। হারাধন বসাককে আপনি অলরেডি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখছেন, যে ছোঁড়াটা আমার বাইক ফেলে দেবার চেষ্টা করছিল তাকেও দলে টানবেন না কি!"

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সদারঙ্গবিহারীলালের মুখ। চোখ দুটো বুজে গেল।

ব্রজেশ্বরবাবু উত্তর দিলেন, "টানতে আপত্তি নেই। আমি যদি বুঝতে পারতাম যে আপনি ওই সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকে ভারতীয় হিন্দুত্বের পরিচয় দেবার চেষ্টা করছেন, তাহলে মৃদু প্রতিবাদস্বরূপ আমি নিজেই হয়তো আপনার সাইকেলকে লাথি মেরে ফেলে দিতাম"

"দিতেন? বাঃ, চমৎকার তো! ব্যাপার কি বলুন দেখি! আপনার মনোভাবটা বুঝতে পারছি না ঠিক"

"সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই। আপনি যখন একটা ভাঙা কার্নিস বা অন্ধকার সুড়ঙ্গ নিয়ে আপনার হিন্দুশক্তি ব্যয় করেন তখন ভেবে দেখেন না যে আরও

কত দরকারি কর্ত্তব্য অকৃত রয়েছে। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, পাপের বিরুদ্ধে, তামসিকতার বিরুদ্ধে কত যুদ্ধ করতে হবে—"

"ঠিক। এ সব তো জানিই—যাঃ"—উচ্ছ্বসিত হয়ে উর্দ্দুকথা বলে' ফেললেন সদারঙ্গ—"ওসবের বিরুদ্ধেই তো আমারও জেহাদ। আমিও যোদ্ধা একজন, পলাতক নই, রোজ যুদ্ধ করছি। কিন্তু এটা হচ্ছে বিশ্রাম—অবসর বিনোদন—ইংরেজিতে যাকে 'রিল্যাক্‌সেশন' বলে"

"কিন্তু আপনার এই অবসর বিনোদন দেশের অনিষ্ট করছে তা জানেন? যা আপনি মুগ্ধনেত্রে দেখছেন তাই প্রেরণা জাগাচ্ছে আপনার শত্রুপক্ষকে—সেই শত্রুপক্ষকে যারা কুসংস্কারের বেড়াজালে ঘিরে, ধর্ম্মের ভয় দেখিয়ে, নানারকম আইন অজুহাত খাড়া করে' লক্ষ লক্ষ লোকের শ্বাসরোধ করে' মেরে ফেলছে। তাদের সংস্কার-ধর্ম্ম-আইনও এই ধ্বংসস্তুপের মতো সেকালে, কিন্তু একটু তফাত আছে—ধ্বংসস্তুপের মতো নিষ্ক্রিয় নয় সেগুলো, কারাগারের মতো ভীষণ। ভেবে দেখেছেন এসব কথা কখনও?"

সদারঙ্গবিহারীলাল কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু ব্রজেশ্বরবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে উচ্চতর কণ্ঠে বললেন, "আপনারা অতীত অতীত বলে' লাফিয়ে বেড়ান, কিন্তু ইতিহাস উল্টে দেখুন অতীতে আনন্দজনক তেমন কিছু নেই। ডাকাতদের লোমহর্ষণ কাহিনী কেবল। আমার মতে অতীতের অধিকাংশই পুঁছে ফেলা উচিত, উপড়ে ফেলা উচিত, বর্ত্তমানের জীবনযাত্রায় অতীতের ছায়া-পাত অসহ্য। অতীতের যেটুকু শ্রদ্ধেয় তার কথা আগেই বলেছি—সাহিত্য আর বিজ্ঞান। এই সব ইটের টুকরো, সুরকির গুঁড়ো, প্রথার হুমকি, কুসংস্কারের দাসত্ব—এরা প্রাণহীন মৃত এবং সেই জন্যেই অনিষ্টকর। এদের ঝেঁটিয়ে পুড়িয়ে ফেলে দিলে তবে আমাদের বর্ত্তমান জীবন হালকা ঝরঝরে হবে"

"সর্ব্বনাশ! আপনি কি সোশালিষ্ট?"

"নিশ্চয়। যদিও এই লেবেল গায়ে এঁটে দেশের সর্ব্বনাশ করে বেড়াচ্ছেন অনেকে"

"অ্যাঁ? আপনার চেয়েও বেশী ঝাঁঝালো সোশালিষ্ট আছে না কি! ও বাবা!"

মৃদু হাসি ফুটে উঠল ব্রজেশ্বরের মুখে। চোখ দুটো মিটমিট করতে লাগল।

"কোন বিষয়েই বেশী ঝাঁঝ আমি ভাল মনে করি না। আমি—"

কি একটা বলতে গিয়ে ইতস্তত করে থেমে গেলেন তিনি। নিজের কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছ বোধ হয়।

"কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলতে লোভ হচ্ছে"

"কি বলুন"

"প্রগতিশীল নামে আজকাল একটা যে দল হয়েছে আপনাকে সেই দলে ফেলতে ইচ্ছে করছে আমার। ভুল করলাম বোধ হয়, না?"

"না মারাত্মক ভুল হয় নি। তবে এটাও ঠিক, তেমন প্রগতি হয়নি আমার। বেশী প্রগতি বরদাস্তই হয় না। কাজ করার চেয়ে হাততালির লোভ যাদের বেশী তাঁদেরই প্রগতি হুহু করে' বেড়ে যায়। হাঁপিয়েও পড়েন তাঁরা চট করে'। পেছিয়ে যান শেষে—প্রগতি পশ্চাৎ-গতি হয়ে দাঁড়ায় শেষটা। সত্যি যারা কর্মী তারা হুড়োহুড়ি করে' এগিয়ে যেতে চায় না, পেছিয়েও পড়ে না। আমি কোনটাই করি নি"

"ও। যাক আপনাকে দেখে খুশী হয়েছি খুব। মানে, খুব। আমি রাজনৈতিক কর্মী নই—সে যোগ্যতাই নেই সম্ভবতঃ আমার। কিন্তু রাজনীতি বিষয়ে কৌতূহল আছে,—ভীষণ। আমি আমার ভাঙা তক্তাপোষের উপর বসেই রাজাউজির লাটবেলাট গান্ধি জহরলাল সব্বাইকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছি হরদম!"

সদারঙ্গবিহারীলালের হাসি আকর্ণবিশ্রান্ত হয়ে উঠল আবার।

"আমার মতামত কিন্তু সেকেলে—নিতান্ত সেকেলে। আমি আভিজাত্যকে শ্রদ্ধা করি, ঠাকুর দেবতা মানি, অতীতকে ঘেঁটিয়ে বিদেয় করবার পক্ষপাতী নই—

কুসংস্কারাচ্ছন্নই বলতে পারেন—হা-হা-হা—। আপনাকে দেখে খুব খুশী হয়েছি, ভারী আনন্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে তর্কটা বেশ জমবে। কিন্তু তর্ক করবার আপনার সময় নেই হয়তো—"

"দেখুন"—একটু ইতস্তত করে' লঘু হাস্যসহকারে ব্রজেশ্বরবাবু বললেন—"আমি আমার মতামত জোর করে' কারও ঘাড়ে চাপাতে চাই না। এর পর এ-ও আপনি যেন না মনে করেন যে আমি লোক দেখলেই তাড়া করে' তার সঙ্গে তর্ক করি। মোটেই তা নয়। ঘটনাচক্রে এটা হয়ে গেল—"

"না—না—বাঃ মোটেই না"—উচ্ছ্বসিত উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করলেন সদারঙ্গবিহারীলাল—"আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে বাস্তবিকই খুশী হয়েছি আমি। বাস্তবিক বলছি। অত্যন্ত। কাউকে স্বমতে আনবার চেষ্টা করা বাতুলতা, তা জানি, কিন্তু আলোচনা করে' একটা সুখ আছে, কি বলেন, অপ্রিয় হলেও বেশ লাগে। অনেকটা ঝাল খাওয়ার মতো, নয়? শিক্ষাও হয়, অনেক সময়। আলো কখন কোন ফাঁক দিয়ে এসে পড়ে কে বলতে পারে। তাছাড়া আমরা পাড়াগাঁয়ে থাকি, প্রগতিশীল লোকের নাগাল পাই না তো বড় একটা। তাঁরা কি ভাবেন তা জানবার খুব আগ্রহ আমার। প্রচণ্ড। কাগজে যা পড়ি তাতে তৃপ্তি হয় না, মনে হয় ভেজাল আছে। আজকাল ঘি থেকে আরম্ভ করে' খবর পর্য্যন্ত সব ভেজাল—হা—হা—হা—"

"এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে মতদ্বৈধ নেই আমার। আসল প্রগতিশীলদের মতবাদ শুনতে পান না আপনারা। যাঁরা প্রকৃত প্রগতিশীল তাঁরা কর্ম্মে আস্থাবান, বাক্যে নয়। তাই তাঁদের কথা শুনতে পান না। কিন্তু এটা জেনে রাখুন সত্যিকার প্রগতিশীল আছেন এবং থাকবেনও চিরকাল"

"বাঃ, চমৎকার!"

সদারঙ্গবিহারীলাল উত্তেজনাভরে চশমাটা খুলে পরলেন আবার। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। একটা মোক্ষম কুঠার তো আছে তাঁর হাতে। হ্যাঁ, ঠিক তো। কোপটি মারবার জন্যে প্রস্তুত হলেন পরমুহূর্ত্তেই।

"আপনি আশা করি দক্ষিণপন্থীদেরই প্রগতিশীল বলবেন"

"নিশ্চয়ই"

"আপনি বোধ হয় একটা কথা জানেন না যে দক্ষিণপন্থীরা আসলে সুবিধাপন্থী—যেদিকে ছাট সেইদিকে ছাতা—এই হলো তাঁদের মন্ত্র"

"কে বললে আপনাকে একথা !"

"দেখুন আপনাদের জন্যে দুঃখ হয় আমার"—বলে' চললেন সদারঙ্গবিহারীলাল —"সত্যি দুঃখ হয়। আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয় তো সাঁচ্চা লোক, কিন্তু আপনাদের নেতারা যে ক্রমাগত আপনাদের ধাপ্পা দিয়ে চলেছেন এ খবরই রাখেন না আপনারা, রাখা সম্ভবও নয়, কাগজে তো এসব খবর বেরোয় না—"

"আপনি জানলেন কি করে' ! নেতাদের মধ্যে যে এত গলদ আছে আমি তো ঘুণাক্ষরে জানি না তো"

"জানবার কথাও নয়"—ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মুচকি হেসে খুব মুরুব্বিয়ানা সহকারে বললেন সদারঙ্গবিহারীলাল—"আমি এত জোর করে' বলতে পারছি কারণ মুরগির ঠিক পেটের তলা থেকেই ডিমটি পেয়ে গেছি কিনা। পেয়ে যাবার সুযোগ হয়ে গেল হঠাৎ। আমার এক দক্ষিণপন্থী বন্ধুর সঙ্গেই কথা হচ্ছিল ; তিনি নিজে একজন নামজাদা দক্ষিণপন্থী, তিনি নিজে আমাকে বললেন—দলকে দল তাঁরা ছাতা ঘাড়ে করে' ওৎ পেতে বসে আছেন, যেদিকে ছাট আসবে সেইদিকে ছাতা খুলবেন বলে"

"বলেন কি !"—সবিস্ময়ে বলে উঠলেন ব্রজেশ্বর দে—"আমি তো কিছু জানি না। দক্ষিণপন্থীদের ভিতরের খবর আমিও রাখি কিছু কিছু। এরকম কথা তো কখনও শুনিনি। আপনার এই বন্ধুটির নাম জিগ্যেস করতে পারি কি ?"

"না, মাপ করবেন, নামটা বলা ঠিক হবে না। ক্ষতি হতে পারে তাঁর। আপনি যদি কাউন্সিলার হতেন তাহলে বুঝতে পারতেন হয় তো, মানে—"

"ও কথা যখন তুললেন তখন আমাকে পরিচয় দিতেই হচ্ছে। আমিও একজন কাউন্সিলার"

"ও!"

নির্ব্বাক বিস্ময়ে একটু মুখ ফাঁক করে' চেয়ে রইলেন সদারঙ্গবিহারী।

"দক্ষিণপন্থী ?"

"হ্যাঁ"

"ও বাবা, তাহলে এ নিয়ে বেশী কথা বলা উচিত হবে না আর"

"যতটা বলেছেন ততটা বলাও কি উচিত ছিল ?"

"তার মানে ?"

"রাগ করবেন না, কিন্তু এটা কি আপনার ভাবা উচিত ছিল না যে আপনার বন্ধুর এই খবরটি সম্পূর্ণ ভিত্তি-হীন হতে পারে"

"তিনি সাধারণ লোক হলে তাই ভাবতাম। কিন্তু তিনি একজন নামজাদা ব্যক্তি। তিনি নিজের মুখে বললেন আমি শুনলাম। স্বকর্ণে। এতে অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠতেই পারে না"

"আপনার কথা বিশ্বাস করলে এই কথাই আমাকে তাহলে বলতে হয় যে তিনি আপনার বন্ধু হতে পারেন, কিন্তু পার্টির বন্ধু নন"

"আসল কথা বোধ হয়"—বলে উঠলেন সদারঙ্গবিহারীলাল—"অনেকের চেয়ে আপনি একটু বেশী গোঁড়া। যাঁর কথা আমি বলছি, তাঁর সঙ্গে অবশ্য এই আমার প্রথম আলাপ হল। কাল রাত্রে। যদিও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বহুদিন আগে থাকতেই আলাপ ছিল। তিনি স-স্ত্রীক এইখানে একটা হোটেলে রাত কাটাচ্ছিলেন কাল। আমি হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলাম সেখানে। তাঁর স্ত্রীই আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। চমৎকার লোক, ভারী মন-খোলা, দেমাক-অহঙ্কার কিছু নেই। ঢাক ঢাক গুড়গুড়ও নেই—খাশা। অবশ্য তিনি একথাও বললেন যে প্রকাশ্যে তিনি এসব কথা স্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু তাঁর কথাবার্ত্তা থেকে যতটুকু বুঝলাম—পার্টির অধিকাংশ লোকেরই উপর আস্থা নেই তাঁর"

"ও বুঝেছি"—ব্রজেশ্বরবাবুর একটা কথা যেন মনে পড়ে গেল—"বুঝেছি। আপনাকে আর বলতে হবে না। আপনি যাঁর কথা বলেছেন তিনি শিগ্‌গিরই বোধহয় রিজাইন করবেন"

"কই সেকথা তো কিছু বললেন না"—সদারঙ্গবিহারীলালের কণ্ঠস্বরে বিস্ময় এবং ক্ষোভ দুইই ফুটে উঠল—"আশ্চর্য্য তো! তাঁর স্ত্রী অন্তত নিশ্চয় বলতেন আমাকে ও কথাটা। বলা উচিত ছিল"

"আপনি মৃন্ময় ঘোষালের কথা বলছেন তো"

"না। আচ্ছা বলছি আপনাকে তাহলে নামটা, কিন্তু দেখবেন যেন কথাটা বেশী চাউর না হয়। অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে"

ব্রজেশ্বর দের হাতে একটা লাঠি ছিল। তিনি দুহাত দিয়ে লাঠির মাথাটা চেপে ধরে' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন একটু। তারপর সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন আবার। তাঁর গম্ভীর মুখে শাণিত ইস্পাতের দীপ্তি যেন চকমক করে' উঠল, চোখের দৃষ্টিতে খেলে গেল ব্যঙ্গের বিদ্যুৎ। একটু হেসে তিনি বললেন, "কেউ আপনাকে ঠকিয়ে গেছে। এটা আমি নিশ্চিত জানি যে অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে—যিনি কাউন্সিলার—কাল রাত্রে তিনি এ অঞ্চলে ছিলেন না, থাকতে পারেন না"

"আরে কি যে বলেন মশাই আপনি। জলজ্যান্ত আমি তাঁকে দেখলাম স্বচক্ষে, ওকথা বললে শুনব কেন! আমি তাঁদের দু'জনকে—"

"সে ভদ্রলোক কেন নিজেকে ব্রজেশ্বর দে বলে' পরিচয় দিয়েছেন তা জানি না, কিন্তু এটা আমি ঠিক জানি কাল রাত্রে ব্রজেশ্বর দে কোলকাতায় ছিলেন"

"কোলকাতায় ছিলেন? বললেই মানব? মানতেই পারি না একথা"—সদারঙ্গবিহারীলালের কণ্ঠস্বরে উষ্মার উত্তাপ ফুটে উঠল একটু—"আমি আপনাকে গোড়াতেই বলেছি যে ভদ্রলোক স-স্ত্রীক ছিলেন। তাঁর স্ত্রীকে আমি চিনি বহুকাল থেকে;—তিনি যখন সান্ত্বনা পাল ছিলেন তখন থেকে। একটা নাইট স্কুলে পড়াতেন বউবাজারে। আমি এম-এ দিচ্ছি যেবার সেইবারই আলাপ—"

"এসব ঠিকই বলছেন। নাইট স্কুলে মাস্টারি করবার সময়ই তাঁর বিয়ে হয় ব্রজেশ্বর দের সঙ্গে—"

"আপনিও তো জানেন তাহলে। ওই সান্ত্বনা দেবীই কাল রাত্রে তাঁর স্বামীর সঙ্গে ফাৎনাফিরিলিপুরে হরিমটর পান্থনিবাসে ছিলেন। তাঁর স্বামীর সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে আলাপ হয় নি, কারণ বিয়ের সময় যেতে পারি নি আমি। শুনলাম তাঁরা মোটরে করে' কোলকাতা থেকে আসছিলেন। কিন্তু রাস্তায় মোটর বিগড়ে যাওয়াতে রাত্রে তাঁদের আশ্রয় নিতে হয়েছিল গোঁসাইজির হোটেলে। আজ সকালে তাঁরা মুচুকুন্দকুণ্ডলেশ্বরী গেছেন রায় বাহাদুর দিগ্বিজয় সিংহরায়ের বাড়িতে। দেখুন, এত কথা জানি আমি"

বিজয়গর্ব্বে চাহিলেন তিনি ব্রজেশ্বরবাবুর দিকে। ভদ্রলোকের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়-ভাব দেখে নিজের বিজয় সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না তাঁর।

ব্রজেশ্বরবাবুর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে গেল ক্রমশ। চোখ দুটোও ছোট হয়ে এল। মনে হল মনে মনে হিসেব করছেন তিনি যেন কিছু।

প্রতিপক্ষকে কবলে পেয়ে নিরস্ত হবার লোক সদারঙ্গবিহারীলাল নন। রাজনৈতিক তর্ক-দ্বন্দ্বে তিনি একজন দক্ষিণপন্থীকে কাবু করে' ফেলেছেন, ভাঁওতা দেবার চেষ্টা করে' লোকটা হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে, এই উপভোগ্য অনুভূতিটা সঞ্চারিত হচ্ছিল তাঁর দেহের শিরায় উপশিরায়।

বক্তব্যটা আরও জোরালো করবার জন্যে তিনি আবার বললেন, "আপনি বলছেন আপনি সান্ত্বনা দেবীকে জানেন। কিন্তু আমি যতটা জানি ততটা যদি আপনার জানা থাকে—তাহলে এটা আপনি নিশ্চয়ই মানবেন যে পর-পুরুষকে নিজের স্বামী বলে' চালাবার চেষ্টা আর যে-ই করুক, তিনি করবেন না, করতে পারেন না। আন্‌থিঙ্কেবল্‌"

"তা ঠিক। তাঁর সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই আমার"

"শুনে সুখী হলাম। তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা খুবই উচ্চ। খুবই। একবার তাঁর বদনাম রটেছিল অবশ্য, কিন্তু সে সব বাজে রটনা। মূলে ছিল বোধহয়

ঈর্ষা সে এক যাচ্ছেতাই কাণ্ড। এই সব বখেড়ায় পড়ে ভদ্রমহিলা প্রায় সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবার মতো হয়েছিলেন—কারও সঙ্গে মিশতেন না পর্যন্ত—একদিন গিয়ে দেখি 'পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেস' পড়ছেন—গোপনে গোপনে জনহিতকর কাজ করে' বেড়াতেন ক্রমাগত। এই সময়ে আমি কোলকাতা থেকে চলে আসি। তারপর 'ফরচুনেটলি' ব্রজেশ্বরবাবুর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল তাঁর। ওয়াণ্ডারফুল লোক। আশ্চর্য্যরকম ভাল লাগল কাল। গুজব শুনেছিলাম লোকটা গাধাগোছের, কিন্তু দেখলাম, না, তা নয়, দামী কাকাতুয়া—মানে জানোয়ারের উপমা যদি দিতে হয়"

আবার আকর্ণ হাসি হাসলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

আসল ব্রজেশ্বরবাবু ছড়ি দিয়ে নিজের জুতোর ডগায় টোকা মারলেন দু'একবার অধীরভাবে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন চারদিকে। মনে হল ভদ্রলোক যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন।

সদারঙ্গবিহারীলালের কিন্তু আনন্দের সীমা ছিল না। তাঁর মনে হচ্ছিল ভদ্রলোককে নিয়ে এখন যা খুশী করা যায়।

"আমি যা বললাম তাতে যদি আপনার সন্দেহ না ঘোচে তাহলে আমি আরও বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারি"—বলতে লাগলেন সদারঙ্গবিহারীলাল—"ওঁরা কাল রাত্রে ফাংনাফিরিঙ্গিপুরে যে হরিমটর পান্থনিবাসে ছিলেন আপনি সেখানে খোঁজ করতে পারেন ইচ্ছে করলে। এখান থেকে বেশী দূর নয়। সেখানে অনেক কিছু ঘটেছিল কাল ওঁদের কেন্দ্র করে'। বাস্তুপুরে ব্রজেশ্বরবাবুকে বিছানা ছেড়ে উঠতে হয়েছিল তাঁদের কুকুরটাকে খুলে দেবার জন্যে। কুকুরটা গোয়াল ঘরে বাঁধা ছিল। কাঁদছিল খুব। খুলে দেবামাত্র কুকুরটা অন্ধকারে কোথা সরে' পড়ল। রাত্রে তো পেলেনই না, সকালেও পাওয়া গেল না। একটু আগে আমি সেটাকে পেলাম রাস্তায়, নিয়ে গিয়ে দিয়েও এসেছি তাঁদের। হিন্দু-পান্থনিবাসের মালিক গোঁসাইজি রাত্রে অদ্ভুত শব্দ শুনে উঠে পড়েছিলেন—শব্দটা সম্ভবত কুকুরটাই করেছিল—শব্দ শুনে উঠে তিনি ব্রজেশ্বরবাবুদের ঘরে যান।

গিয়ে দেখেন ওরা দু'জন পাশাপাশি শুয়ে ঘুমুচ্ছেন। আপনি যখন সান্ত্বনা দেবীকে জানেন বলছেন, তখন এর বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, মনে হচ্ছে ব্রজেশ্বরবাবুকেও আপনি আমার চেয়ে ভাল করে' চেনেন। সুতরাং—"

একটু হেসে নিজের বাইসিক্লের দিকে অগ্রসর হলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

বিস্ফারিতচক্ষে চেয়ে রইলেন ব্রজেশ্বরবাবু। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে যে অমায়িকতা ছিল এতক্ষণ তা যেন 'উপে' গেল। ভ্রূকুঞ্চিত করে' চেয়ে রইলেন তিনি। তাঁর গম্ভীর মুখমণ্ডলে ক্রোধের কোনও চিহ্ন ফুটে উঠল না। বরং মুখের উপর ক্ষীণ হাসির একটা আভাষ ফুটেই মিলিয়ে গেল। মনে হল যেন তাঁর জটিল মনে কৌতুকজনক কিছু একটা জেগেছে। সদারঙ্গবিহারীলালের মনোযোগ পুনরায় আকর্ষণ করবার জন্যে তিনি হাতটা একবার তুললেন; কিন্তু তুলেই থেমে গেলেন এবং ধীরে ধীরে আবার চেপে ধরলেন লাঠির মাথাটা। সদারঙ্গবিহারীলাল ঝুঁকে বেঁকে উবু হয়ে হেঁট হয়ে নানাভাবে তাঁর বাইকটি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তাঁর দিকে নীরবে চেয়ে রইলেন ব্রজেশ্বরবাবু—লোকে যেমন নিস্পৃহভাবে তীরে দাঁড়িয়ে ভাসমান পালতোলা নৌকোর দিকে চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলেন।

"এইবার চলি তাহলে—"

"ও চললেন, আচ্ছা,"—ঘাড় ফিরিয়ে হেসে সদারঙ্গ বললেন—"আমরা পাঁয়তারাই করলুম অনেকক্ষণ ধরে' আসল তর্কটা আর হল না"

ব্রজেশ্বর মুচকি হাসলেন এবং ছড়ি ঘুরিয়ে অগ্রসর হলেন ষ্টেশনের দিকে।

"দেখবেন মশায়"—দুষ্টুমিভরাদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন সদারঙ্গবিহারী—"ব্রজেশ্বরবাবুর সঙ্গে যদি দেখা হয় এসব কথা বলবেন না যেন। আর দেখুন পলিটিক্সকে অত সিরিয়াস্‌লি নেবেন না, কেউ নেয় না। আচ্ছা, নমস্কার"

"নমস্কার"

ব্রজেশ্বরবাবু এগিয়ে গেলেন এবং স্বগতোক্তি করলেন—"স্বপ্ন দেখছি নাকি!" —তারপর সোজা হন হন করে' এগিয়ে গেলেন ষ্টেশনের দিকে। গিয়েই

পেয়ে গেলেন একটা ট্যাক্সি। আর কালবিলম্ব না করে' ষ্টেশন থেকে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সদারঙ্গবিহারীলালও হাজির হলেন ষ্টেশনে এবং ট্যাক্সি-আরূঢ় ব্রজেশ্বরকে দেখতে পেলেন। ট্যাক্সিটা তাঁর চেনা ট্যাক্সি। এ অঞ্চলের সমস্ত ট্যাক্সিওলাই তাঁর চেনা। কৌতূহল হল। কে ভদ্রলোকটি? কাউন্সিলার? গেলেন কোথায়? খোঁজ ক'রতেই যে কুলিটা তাঁর জিনিসপত্র ট্যাক্সিতে তুলে দিয়েছিল সে বলল—"নাম ঠিক জানি না বাবু"

"গেলেন কোথায়"

"ট্যাক্সিওলাকে তো বললেন ফাংনাফিরিঙ্গিপুর যেতে"

"ফাংনাফিরিঙ্গিপুর?"

"আজ্ঞে। তাই তো শোনলাম"

নিপুণভাবে একটি বিড়ি ধরিয়ে কুলিটি চলে গেল।

"ফাংনাফিরিঙ্গিপুরে কি প্রয়োজন থাকতে পারে ভদ্রলোকের? অদ্ভুত ঠেকছে তো! মতলব কি ওঁর!"

সদারঙ্গবিহারীলাল পুনরায় আরোহণ করলেন তাঁর মোটরবাইকে। স্টার্ট করতেই পিস্তলের মতো আওয়াজ হল গোটা দুই। কুণ্ডলীকৃত হয়ে একটা কুকুর কাছেই নিদ্রাসুখ উপভোগ করছিল। চমকে উঠে পালাল সে। সদারঙ্গবিহারীলাল এই অদ্ভুতপ্রকৃতির কংগ্রেসকর্ম্মীটির পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

(১৯)

ছিপছররামারি সন্নিহিত সেই পোস্টাফিসে সুশোভন হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল পুনরায়। দেখে মনে হল যেন ডাকাতে তাড়া করেছে তাকে। পোস্টমাস্টার তার দিকে এক নজর চেয়ে যখন তাকে সেই তার্কিক মেয়েটির এবং গুঁফো ড্রাইভারটির সঙ্গী বলে' চিনতে পারলেন তখন তাঁর মনোভাব বেশ একটু উষ্ণ হয়ে উঠল। মুখে কিছু বললেন না বটে, কিন্তু চোখের কোণে আগুনের ঝলক দেখা গেল।

"কোলকাতায় আমি এক্ষুনি একটা ফোন করতে চাই। কোলকাতা পেতে সাধারণত কত দেরি হয় বলুন তো—"

পোস্টমাস্টার যে আড়ময়লা খাতাটির মধ্যে টিকিট রাখেন সেটি তুলে টেবিলের ড্রয়ারে ঢোকালেন। ড্রয়ারটা বন্ধ করতে গিয়ে আটকে গেল সেটা, টানাটানি করে' আবার খুললেন, আবার ঢোকাবার চেষ্টা করলেন, আবার আটকে গেল। আবার টানাটানি করে' খুললেন। সম্পূর্ণ ড্রয়ারটাই বার করে' ফেললেন এবার। ড্রয়ারের ভিতরের প্রত্যেকটি জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখলেন, গোছালেন, তারপর টেবিলের যে ফাঁকে ড্রয়ারটা বসানো ছিল সেখানে ফুঁ দিলেন বারকয়েক। তারপর ড্রয়ারটাকে ঢোকাবার চেষ্টা করলেন। কয়েকবার চেষ্টা করে' সফলকাম হলেন অবশেষে। ঝড়াস্ করে' ড্রয়ারটা ঢুকে বসে গেল স্বস্থানে। আবার টেনে দেখলেন 'জাম্' হয়ে গেল কিনা। 'জাম্' হয়েছে। আবার টেনে বার করলেন, আবার ঢোকালেন, আবার টানলেন। বেশ সড়গড় হয়ে যাবার পর টিকিটের খাতাটি পুনরায় বার করে' টেবিলের উপর রাখলেন। তারপর চোখের কোণ থেকে আর এক ঝলক উষ্ণতা বিকিরণ করে' চাইলেন সুশোভনের দিকে।

"দেরি··· ?"

"হ্যাঁ, কোলকাতা পেতে কত দেরি হয় সাধারণত"

"কি ভাবে পেতে চান ?"

"ফোনে, মশাই। তা ছাড়া আর কি ভাবে পাব ? আপনি কি ভাবছেন আমি এখান থেকে সুড়ঙ্গ কেটে কোলকাতা যেতে চাইছি ? দোহাই আপনার, দাঁড় করিয়ে রাখবেন না আমাকে, আমার তাড়া আছে—"

পোস্টমাস্টার টিকিটের খাতাখানি ঘুরিয়ে অন্যভাবে রাখলেন আবার।

"ফোনে কোলকাতা কতক্ষণ লাগে বলছেন ?"

"হ্যাঁ মশাই। এই সোজা কথাটা আপনার বুঝতে এত দেরি হচ্ছে ?"

"বুঝেছি। ঢুকেছে মাথায়, কিন্তু কি জবাব দেব তাই ভাবছি। কত দেরি হয় তা কি বলা যায় ? কখনও সাঁৎ করে' চলে' যায় আবার কখনও যুগযুগান্ত

কাটে—। কত দেরি হবে তা কি বলা যায় ঠিক ?—যায় না। অথচ প্রত্যেকেই এসে ওই এককথা জানতে চাইবে। আমার যদি জানাবার সামর্থ্যই থাকবে—"

আর অধিক বিতণ্ডায় লিপ্ত না হয়ে সুশোভন এগিয়ে গিয়ে ফোনটা তুলে নিলে। ভয়ানক দুশ্চিন্তা হচ্ছিল তার। তার নিজের গাফিলতির জন্যে অনীতা বেচারী হয়তো কত কষ্ট পাচ্ছে, এই চিন্তাটা পাগল করে' তুলেছিল তাকে। অনীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যে সব সম্ভাব্য দুর্গতি তার কপালে নাচছে সে কথা মনেই হচ্ছিল না তার। অনীতা হয়তো তার একটি কথাও বিশ্বাস করবে না, এ কথা জেনেও সে ফোন করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। ঠিক করেছিল, তার সঙ্গে কথা না কওয়া পর্য্যন্ত এইখানেই সে দাঁড়িয়ে থাকবে। স্থানটা যদিও সুখকর নয়—তার উপর ওই পোস্টমাস্টার—সাংঘাতিক লোক—বেশীক্ষণ ওর সাহচর্য্যে থাকলে ক্ষেপে যেতে হবে, ক্ষেপে হয়তো খুনও করে' ফেলতে পারে—কিন্তু না, আত্মসম্বরণ করা দরকার। যে চিঁড়ে সে মেখেছে, তাই তোলাই দুষ্কর হয়ে উঠেছে—সেটাকে আর জটিলতর করে' লাভ নেই। পোস্টমাস্টারের কথায় কর্ণপাত না করে' সে ফোনে কর্ণ সংলগ্ন করে' দাঁড়িয়ে রইল ধৈর্য্যভরে।

ফোনে নানা রকম আওয়াজ হচ্ছে। মনে হচ্ছে কেনেরি পাখী ডাকছে—ফট ফট করে' পিস্তলের মতো আওয়াজ হ'ল বার কয়েক—সোঁ সোঁ সোঁ—আবার কেনেরি—!

অনেকক্ষণ পরে সুশোভন ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে একটা। ক্ষীণ হলেও স্পষ্ট। অনীতার সেই চাকরাণীটি। যে সব ক্ষমা-স্নিগ্ধ চরিত্র পৃথিবীতে মানব জাতির মর্য্যাদাবৃদ্ধি করেছে অনীতা দেবীর দাসী কুসুমের চরিত্র ঠিক সে ধরণের নয়। সুশোভনের সম্বন্ধে তার নিজস্ব এমন একটি ধারণা আছে যার তুলনায় স্বয়ম্প্রভা দেবীর ধারণা নিতান্ত নিষ্প্রভ। সুশোভন যে তাকে ফোন করতে পারে এ আশা কুসুম করে নি অবশ্য। কিন্তু যখন সুযোগটা পেয়ে গেছে তখন নিজের কেরামতিটুকু নিজস্ব ঝাঁঝসহযোগে জাহির করতে সে ছাড়লে না। আনাড়ী পল্লীবালা নয় সে, কোলকাতার ঘাগী ঝি। ফোন-ধরা অভ্যাস আছে।

নিজের মনোভাব সরাসরি প্রকাশ না করে' সুশোভনকে বেশ বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলে ফিরে এসে তাকে কি নিদারুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। একাকিনী ভগ্ন-হৃদয়া অনীতার হৃদয়-বিদারক প্রত্যাবর্ত্তনের করুণ কাহিনী বর্ণনা করলে সে। স্বয়ম্প্রভার আবির্ভাবের কথা জানালে সবিস্তারে। তিনি কি কি অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করেছেন তা বললে এবং পরিশেষে নিপুণভাবে বর্ণনা করলে সমস্ত পরিবারের উত্তেজিত অভিযান-কাহিনী। টেলিফোনের তার বাহিত হয়ে শ্রীমতী কুসুমের জিঘাংসা-ক্রুর কণ্ঠস্বরে যে উল্লাস উদ্বেলিত হয়ে উঠল তা অবর্ণনীয়।

সে কোথায় আছে তা স্বয়ম্প্রভা জানলেন কি করে? তিনি জানবেন না তা কে জানবে! তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে কি পার পেয়েছে কেউ আজ পর্য্যন্ত? স্বয়ম্প্রভা দেবীর মহতী বুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করার জন্য কুসুমের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ ভর্ৎসনার সুর ধ্বনিত হল যেন। কি করে' স্বয়ম্প্রভা তার গতি-পথ আবিষ্কার করেছেন তার সাড়ম্বর বর্ণনা করে' গেল সে।

টেলিফোন রেখে দিলে সুশোভন। পোস্টমাস্টারের দিকে দশটাকার একটা নোট ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ল সে পোস্টাফিস থেকে। ওরা আসছে! সর্ব্বনাশ। রাস্তার এ মোড় থেকে ও মোড় পর্য্যন্ত ছুটোছুটি করে' বেড়ালে যদি একটা ট্যাক্সি পেয়ে যায়। পাওয়া গেল না একজন খবর দিলেন, এখানে 'বাইক' ভাড়া পাওয়া যায়!

কোথায়? ওই যে দোকানটায়। ছুটল সেদিকে সুশোভন। দরদস্তুর করবার সময় ছিল না। সুশোভন এ অঞ্চলে পরিচিত ব্যক্তিও নয়। বাইকওয়ালা বেশ একটু চড়া দরই হাঁকলে। ঘণ্টা পিছু দুটাকা। বাইকের দামটাও দোকানে জমা করতে হবে। তাতেই রাজি হয়ে গেল সুশোভন। বাইকের 'সীট্'টি উষ্ট্রাকৃতি। তা হোক্, তার উপরই চড়ে বসল সে অবিলম্বে এবং ধাবিত হল হরিমটর হিন্দু-পান্থনিবাসের উদ্দেশে। ক্ষুধায় ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছিল, কিন্তু সে সব দিকে মন দেবার অবসর ছিল না তার। সে ছুটছিল যদি স্বয়ম্প্রভাকে এড়িয়ে

কোনক্রমে অনীতার দেখা পেয়ে যায় এই আশায়। স্বয়ম্প্রভার সঙ্গেই যদি যাওয়া মাত্র দেখা হয়ে যায়, তাহলে আর রক্ষে নাই। অনীতার সঙ্গে দেখা হলে তাকে বুঝিয়ে বলতে পারে, যদি বোঝান সম্ভব না হয় কাকুতিমিনতি করতে পারে। অনীতাকেই যে সে ভালবাসে, তাকে ভালবাসবার পর অপরকে ভালবাসা যে অসম্ভব, একথাটা কি অনীতা বুঝবে না? অক্ষয় অকৃত্রিম প্রেম কি কেতাবেরই বুলি কেবল? তাকে বোঝাতেই হবে যেমন করে' হোক্—। প্রাণপণে 'বাইক' চালিয়ে ছুটে চলল সুশোভন। তার মানসপটে কিন্তু স্বয়ম্প্রভার ছবিটাই ফুটে উঠতে লাগল কেবল। 'অ্যাডমিশন রেজিস্টার' পর্যবেক্ষণ শেষ করে' সিঁড়ি দিয়ে এইবার উঠছেন হয়তো শয়নকক্ষ পরিদর্শন-মানসে। কি ভয়ানক! যথাসম্ভব দ্রুতবেগে 'প্যাডল' চালাচ্ছিল সে, মাঝে মাঝে 'ফ্রি-হুইল' করছিল ক্লান্ত পদদ্বয়কে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দেবার জন্য, আবার খুব জোরে চালাচ্ছিল দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হ'য়ে। ভাগ্যে রাস্তায় ভীড় ছিল না বিশেষ। সঙ্কীর্ণ উবড়ো-খাবড়ো রাস্তা, কাদায় ভরতি, কিন্তু ভীড় ছিল না। একটু পরে সুশোভন দেখতে পেলে কে একজন আসছে যেন তার দিকে। তাকে দেখতে পেয়ে রাস্তার একধার ঘেঁসে সরে' দাঁড়াল লোকটা। দ্রুতগামী বাইক থেকে আত্মরক্ষা করবার অন্য কোন উপায় ছিল না আর। সুশোভন তাকে যখন অতিক্রম করে' গেল, তখন ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে তার দিকে চেয়ে। আরে, এ যে ফদকা! বাইক থেকে নেবে পড়ল সে।

"ফদকা নাকি—"

আসবার সময় সুশোভন প্রচুর বখশিস দিয়ে এসেছিল তাকে।

দন্তপাতি বিকশিত করে' ফদকা এগিয়ে এল।

"হাঁ বাবু"

"কোথা যাচ্ছিস"

"গোঁসাইজিকে ডাকতে"

"কেন? কোথায় তিনি"

"নিতাই বৈরাগির বাড়ি"

"তাহলে হোটেলে নেই তিনি ?"

"বললাম যে তিনি নিতাই বৈরাগির বাড়ি গেছে। তেনাকে ডাকতেই তো যাচ্ছি"

গোঁসাইজি হোটেলে নেই শুনে সুশোভন আশ্বস্ত হল খানিকটা।

"তাঁকে ডাকতে যাচ্ছিস কেন"

"বুড়ি ডাকছে"

"বুড়ি ? অ্যাঁ ?"

সুশোভন সম্মুখে প্রসারিত কর্দ্দমাক্ত রাস্তাটার দিকে চাইলে একবার সভয়ে।

"কোথায় আছে সে বুড়ি"

"ওপরে শোবার ঘরে"

"ওপরে শোবার ঘরে! সর্ব্বনাশ! গোঁসাইজিকে ডাকছে কেন? শোন ফদকা, গোঁসাইজিকে কষ্ট দিয়ে আর কি হবে আমিই তো যাচ্ছি সেখানে, বুড়িকে যা বলবার আমিই বলব এখন"

মনোভাব প্রকাশ করবার মতো মুখ যদিও ফদকার নয়, তবু তাতে যেন বিস্ময়ের একটু আভাস ফুটে উঠল।

"আজ্ঞে না বাবু, আপনাকে দিয়ে হবে না। গোঁসাইজি ছাড়া তেনাকে সামাল দিতে পারবে না কেউ। গোঁসাইজি নেই শুনে যা কাণ্ড করছে—"

"তা'তো করবেই। কিন্তু আমি দেখিই না কি করতে পারি। আমাকে দিয়েই যদি হয়ে যায়, তাহলে গোঁসাইজিকে আর কষ্ট দিবি কেন শুধু শুধু। হাজার হোক্ বুড়ো মানুষ তো। তোকেও আবার যেতে হবে এতটা। বুড়ি কি চায় আমি জানি। গোঁসাইজিকে পেলে ভয়ানক কাণ্ড করবে ও। গোঁসাইজি যে হোটেলে নেই, ভালই হয়েছে এক হিসেবে"

"আজ্ঞে না, গোঁসাইজিকে ডাকতেই হবে। আমার মনে হচ্ছে, বুড়ি হয়তো বাঁচবে না। দেখে ভয় লাগছে বাবু"

"বাঁচবে না ? যাঃ—কি বলছিস যা তা। যদিও আমি—মানে, ওকে দেখে ওই রকমই মনে হয়, মনে হয় বুঝি মাথার শিরটির ছিঁড়ে যাবে এখনই—ও কিছু নয়"

"আজ্ঞে না বাবু, গতিক সুবিধার নয়। বিড়বিড় করে' কি বকছে, চোখ দুটো ঘুরপাক খাচ্ছে"

"ওরে বাব্বা! ভয়ানক কাণ্ড করছে তো তাহলে! তোকে কিছু জিগ্যেস করেছিল ?"

"আমাকে ? না তো। কেবল বললে গোঁসাইজি কোথা, বাইরে চলে গেছে কেন, ডেকে আন এক্ষুণি গিয়ে, এক্ষুণি যাও—"

সুশোভন গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মিনিট খানেক।

"বুঝেছি। ওই রকমই করে। চিনি তো"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, যবে থেকে এসেছেন তবে থেকে ওই রকমই"

"তার আগে থেকেও। তুই সবটা তো জানিস না। অসুখ টসুখ নয়। ধরণ-ধারণই ওই রকম"

"আজ্ঞে না। অসুখ করেছে, সেটা মিথ্যে নয়। আমার ভয় মরে না যায় শেষটা"

"কি বলিস যে! মরবে কেন"

"একদিন না একদিন তো মরতে হবেই ওনাকে"

হঠাৎ দার্শনিক উত্তর দিয়ে ফেললে ফদকা।

"তাতো হবেই। কিন্তু এখন ভগবান তা কি করবেন ? ছোট ছেলেদের গল্পের বইতে ও সব হয়, বুঝলি। আজ উনি কিছুতেই মরবেন না, আমার ভাগ্যই সে রকম নয়"

"আমাকে ডাক্তার ডেকে আনতে বলছে যখন—"

"ডাক্তার ? কে ডাক্তার ডাকতে বলছে ?"

"তিনি। ওই বুড়ি"

"তিনি বললেন, তাঁর একজন ডাক্তার চাই ? তাহলে নিশ্চয় হয়েছে কিছু। অ্যাঁ, বলিস কি ? কষ্টটা কি ?"

"তা তো আমায় বললেন না। হাঁপ বোধ হয়"

"হাঁপ ? হাঁপাচ্ছে ? সর্ব্বনাশ। এসে থেকেই হাঁপাচ্ছে না আসবার পর হয়েছে ? ওঁর সঙ্গে আরও দু'জন আছে নয় ? গোঁপ-ওলা ভদ্রলোক একটি, আর মেয়েছেলে একজন—"

"না, উনি তো একাই এসেছেন, একাই আছেন। ওঁর আপন লোক কেউ নেই বোধ হয়"

"তা' না থাকাই সম্ভব। কিন্তু তাঁর স্বামী, মানে জিতুবাবু বলে' একটি ভদ্রলোক সঙ্গে নেই ?"

"না"—ফদকা সজোরে মাথা নেড়ে বললে—"কেউ নেই ওঁর সঙ্গে"

"ওঁর মেয়ে ? ওঁর মেয়ে আমার, মানে—আচ্ছা, ক'টার সময় এসেছিল বল্ তো"

ফদকা ভুরু কুঁচকে ভাববার চেষ্টা করলে একটু।

"সন্ধ্যে হয়ে গেছল। সাতটা বোধ হয়"

"কি বলছিস যা তা। সে সময়ে আসতেই পারে না"

"ঠিক মনে নেই"—দাঁত বার করে' বললে ফদকা—"অনেক দিন হয়ে গেল কিনা। তবে সন্ধ্যে—"

"অনেক দিন ? মানে ?"

"আজ্ঞে, তা মাস খানেক হবে বই কি"

"কে এসেছে মাসখানেক আগে"

"ওই দোতলায় আছেন যে মা ঠাকরুণ। আপনি যে ঘরে ছিলেন, ঠিক তার পাশের ঘরেই তো আছেন"

"ও..."

শুভশোভনের উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত ভ্রূ সেইভাবেই স্থির হয়ে রইল খানিকক্ষণ।

"তাঁর অসুখ করেছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"ও, যাক্—আর কেউ আসে নি তাহলে ?"

ফদকা মাথা নাড়লে শুধু।

"বাঁচা গেল"—বাইকের উপর চড়ে বসল আবার সুশোভন—"তুই গোঁসাইজিকে গিয়ে বেশী ঘাবড়ে দিস না যেন। গোঁসাইজি বেরিয়ে গেছেন বলেই চটেছে সম্ভবত। তিনি ধীরে সুস্থে এলেও চলবে। তুই বরং ডাক্তারকে খবর দে আগে"

ফদকা ঘাড নেড়ে চলে গেল। তার দৃঢ়বিশ্বাস, গোঁসাইজি না এসে পড়লে বুড়ি বাঁচবে না।

"যাক্—কেউ তাহলে আসেনি এখনও পর্য্যন্ত"—বাইকে ভাবতে ভাবতে চলল সুশোভন—"গোঁসাইজিও নেই। ফদকাও চলে গেল। গুড্। আমিই বোধহয় প্রথমে হাজির হব সেখানে। এক ঘরে শোওয়ার ব্যাপারটা কোনরকম যদি চাপা দিয়ে ফেলতে পারি, তাহলে বাকিটা সামলে নিতে বেগ পেতে হবে না বিশেষ। গোঁসাইজি এসে পৌছবার আগে যদি ওদের এখান থেকে বার করে' ফেলতে পারি তাহলে তো কথাই নেই। ইতিমধ্যে তাদের আবার সেই সংরক্ষবাবু নাকি—তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই তো হয়েছে। যাক আপাতত যতটা দেখা যাচ্ছে, হতাশজনক নয় খুব—"

প্রাণপণে বাইক চালাতে লাগল সে।

(২০)

হোটেলের সামনের দরজাটি আস্তে আস্তে খুলে সুশোভন খুব সন্তর্পণে ভিতরে গলাটি ঢুকিয়ে চেয়ে দেখলে। কোনও সাড়া-শব্দ নেই। ঢুকে পড়ল পা টিপে টিপে। সামনের ঘরে কেউ নেই। সিঁড়ি দিয়ে উঠল খানিকটা। উপরে একটা অস্পষ্ট আর্তধ্বনির শব্দ শোনা যাচ্ছে। হাঁপানি-রোগীর শ্বাসকষ্টের শব্দ। নেমে এসে

দেখলে ওদিকের বারান্দার বেঞ্চিতে গোকুল শুয়ে আছে। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো। চোখ চেয়ে আছে কিন্তু স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব। সুশোভনকে দেখে সে হাসল একটু, তারপর কি মনে হওয়াতে হাত তুলে নমস্কার করলে। হোটেলের কিছু দূরে যে তাড়িখানাটা আছে গোকুল সেখানকার চাকর। ঝুহুকে খোঁজবার সময় সকালে ওর সঙ্গে ভাব হয়েছিল সুশোভনের। সুশোভনের কাছ থেকে মোটা রকম বখশিস পাওয়ার পর ভাবটা বেশ গাঢ়রকমই হয়েছিল।

"গোকুল যে, এখানে কেন"

"ফদু আমায় বসিয়ে রেখ গেল"

'ফদু' শুনেই সুশোভন বুঝলে গোকুল তাড়ি খেয়েছে।

"আমি আবার ফিরে এলাম গোকুল"

"আজ্ঞে। কিন্তু ফদু যে নেই, আপনার খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে। ঠাকুর নেই, গোঁসাইজিও নেই"

"ঠাকুর কোথা গেল"

"হাটে গেছে বোধ হয়"

"খাব না এখন কিছু। দেখ গোকুল, এখানে কয়েকজনের আসবার কথা আছে। শুনছি তারা তোমাদের তাড়ির দোকান খানাতল্লাস করবার মতলবে আসছে। আমাকেও ওই সঙ্গে জড়াবার মতলব তাদের। গোঁসাইজিকেও জড়াতে চায় শুনলাম। ওরা যদি এসে তোমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করে—বোলো, আমি কিছু জানি না। বুঝলে"

"আজ্ঞে"

সুশোভন পকেট থেকে ব্যাগ বার করে' আর একটি টাকা গোকুলের হাতে দিলে। গোকুল টাকাটা নিয়ে চোখ মিটি মিটি করে' তাকাতে লাগল।

সুশোভন আবার বললে, "বলবে আমি কিছু জানি না"

"আজ্ঞে"

দূরে একটা মোটরের শব্দ শোনা গেল। আসছে বোধ হয়।

"ওই আসছে বোধ হয়, বুঝলে"

"আজ্ঞে"

"যদি কিছু জিগ্যেস করে, স্রেফ্ বলবে আমি কিছু জানি না"

"আজ্ঞে"

"শুয়ে ঘুমোও তুমি, বুঝলে"

মোটরটা এসে থামল। সুশোভন তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে জানালার কপাটটা একটু ফাঁক করে' দেখলে। বেশ দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ একটি লোক মোটর থেকে নেবেছেন। হরিমটর পান্থনিবাসের দিকে একনজর চেয়ে ড্রাইভারকে কি যেন বললেন। এগিয়ে এলেন তারপর।

"ডাক্তার এল"—সুশোভন ভাবলে—"এত শিগ্‌গির ডাক্তার এসে পড়বে তা'তো ভাবি নি। এতে জট আরও না পাকিয়ে যায়"

একটা গম্ভীর বে-পরোয়া ভাব মুখে ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। বাইরের কপাট খুলল, বন্ধ হল। তারপর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বেশ দৃঢ় পদ-ক্ষেপ। তারপর যে ঘরে সে দাঁড়িয়েছিল সেই ঘরের কপাটটা 'ঝড়াম্' করে' খুলে গেল।

"ও"—ব্রজেশ্বরবাবু বললেন। গম্ভীর ধীর স্থির প্রকৃতির লোক ব্যস্ত হলে যেরকম দেখায় ব্রজেশ্বরবাবুকে সেই রকম দেখাচ্ছিল।

"নমস্কার"—এগিয়ে এল সুশোভন।

"এই হোটেল কি আপনার"

"না"

"হোটেলের মালিক কোথায়"

"তিনি বেরিয়ে গেছেন। যে রোগীটিকে দেখতে এসেছেন তিনি আছেন ওপরে। একটু গিয়ে বাঁ ধারে সিঁড়ি। উঠে ডান হাতে একটা ঘর, তার পরের ঘরটাই। উঠলে শব্দই শুনতে পাবেন"

ব্রজেশ্বরবাবুর তাড়া ছিল যদিও—তবু ধীরভাবে দাঁড়িয়ে তিনি সুশোভনের

অনাবশ্যক কথাগুলো শুনলেন শেষ পর্য্যন্ত। সকলের সব কথা শেষ পর্য্যন্ত শোনাই তাঁর স্বভাব। সুশোভনের কিন্তু অস্বস্তি লাগছিল।

"আমি তো রোগী দেখতে আসি নি"—মৃদু হেসে বললেন ব্রজেশ্বরবাবু সব শুনে।

"ও"

"আপনি কি এই হোটেলে থাকেন"

"না, থাকি না। তবে—মানে—এসে পড়েছি—"

"এই হোটেলের বিষয়ে দু'চারটে খবর জানতে চাই। কার কাছ থেকে জানা যায় বলুন তো। কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না। কোন সাড়াশব্দও নেই"

"আর কিছুক্ষণ সবুর কর দাদা"—মনে মনে বলল সুশোভন—"সাড়া এবং শব্দ দুইই প্রচুর পরিমাণে পাবে।"

তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে হেসে বললে—"গোঁসাইজি হলেন এই হোটেলের মালিক। তিনি কার সঙ্গে যেন দেখা করতে বেরিয়েছেন। আজ বিকেলটা ছুটি নিয়েছেন আর কি। কিন্তু দোতলায় যে ভদ্রমহিলাটি থাকেন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন হঠাৎ। তাই এই হোটেলের চাকর ফদকা ছুটেছে গোঁসাইজিকে আর একজন ডাক্তারকে ডেকে আনতে। তাই আমি আপনাকে ডাক্তার ভেবেছিলাম"

ব্রজেশ্বরবাবু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন।

"গোঁসাইজি আর ফদকা ছাড়া হোটেলে আর কেউ থাকে না?"

"ঠাকুর হাটে গেছে। ওইদিকে বেঞ্চিতে শুয়ে আছে একজন। তবে সে লোকটা—"

"তাকে দিয়েই কাজ চলে যাবে আমার। ধন্যবাদ"

ব্রজেশ্বরবাবু ভিতরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

"না, শুনুন—আমার মনে হয় চলবে না। মানে, সে লোকটা একটু—"

ব্রজেশ্বরবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। বাধা পেয়ে তাঁর মুখভাবে ঈষৎ বিরক্তিও ফুটে উঠল।

"এ হোটেলের কিছু কিছু খবর আমিও বলতে পারব। কি জানতে চান বলুন না।"

"না, তার দরকার নেই। ধন্যবাদ। আমি যে খবর জানতে চাই তা একটু গোপনীয়। বাইরের লোকের কাছে বলা চলবে না। কোনদিকে লোকটি শুয়ে আছে বললেন ?"

অনিচ্ছাসহকারে সুশোভনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হল।

"এইদিক দিয়ে সোজা চলে যান। বেঞ্চিতে শুয়ে আছে। কিন্তু গোকুলের কাছ থেকে কোনও খবর জোগাড় করা কঠিন এখন। নিজেই সেটা বুঝতে পারবেন এখুনি। যান—সোজা ঢুকে পড়ুন—"

ব্রজেশ্বর ভিতরের দিকে চলে গেলেন। সুশোভনের এই উক্তিতে তাঁর মুখভাবে ঈষৎ অপ্রসন্নতা ফুটে উঠল আবার। ভাবটা যেন—আরে বাপু, আমাকে দেখতেই দাও না, তুমি ফপরদালালি করছ কেন।

"গোপনীয় খবর ?"

ঈষৎ উৎসুক হয়ে সুশোভন চলে এল বাইরে। লোকটার চাল-চলন মোটেই ভাল লাগছিল না সুশোভনের। হরিমটর পান্থনিবাসে কি গোপনীয় খবর সংগ্রহ করতে এল লোকটা! উকীল টুকীল নয় তো? না, উকীলের চেহারা এরকম হতেই পারে না। ডিটেকটিভ? সুশোভন আস্তে আস্তে আবার ভিতরের দিকে গেল। কান পেতে রইল দরজার কাছে, যদি কিছু শোনা যায়।...কিচ্ছু শোনা গেল না। আবার বাইরে চলে এল সে। জানালাটা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে। যে মোটরে ভদ্রলোক এসেছিলেন সেটি দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভারটি সিগারেট টানছে বসে' বসে'। মোটরের পিছনে ভদ্রলোকের সুটকেস বিছানাপত্র বাঁধা রয়েছে। সুশোভন সেই দিকেই এগিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

"তুমিই কি গোকুল"

ব্রজেশ্বরবাবু তাঁর ঈষৎ অনুনাসিক অথচ দৃঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

গোকুল চমকে উঠল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

ব্রজেশ্বরবাবু তাঁর ছড়িটির উপর দুহাতে ভর দিয়ে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলেন।

"হোটেলের মালিক শুনছি বাইরে গেছেন। তোমারই উপর সব ভার দিয়ে গেছেন নাকি"

গোকুল ফ্যাল ফ্যাল করে' একবার চাইলে তাঁর মুখের দিকে। স্বভাবতই চোখের দৃষ্টি তার সজল। বিস্ফারিত হওয়াতে জোলো-ভাবটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। হঠাৎ খুব কুণ্ঠিত হয়ে ঘাড় চুলকোতে লাগল সে।

"তোমারই ওপর সব ভার নাকি"

"জানি না"

"এ অঞ্চলে এটি ছাড়া আর হোটেল আছে কি"

"জানি না"

"কাল রাত্রে এখানে কে কে ছিল বলতে পার"

"জানি না"

"তোমার জ্ঞান খুব সীমাবদ্ধ দেখছি। ক'আনায় এক টাকা তা জান কি"

"জানি না—আজ্ঞে না, সেটা জানি"

ব্রজেশ্বর পকেটে হাত ঢুকিয়ে মণিব্যাগটি বার করলেন।

"বাইরে ওই যে ভদ্রলোকটি রয়েছেন উনি কে বলতে পার"

"জানি না"

ব্রজেশ্বর মণিব্যাগটি পকেটে ঢুকিয়ে ফেললেন।

"জানি না, সত্যি"

"উনি কি কাল রাত্রে ছিলেন এখানে"

"জানি না—হয় তো ঠিক মনে পড়ছে না"

"ওঁর সঙ্গে কি—"

হঠাৎ থেমে গেলেন ব্রজেশ্বর। কথাটা আটকে গেল যেন মুখে। তারপর প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করে' এগিয়ে এলেন তিনি আর একটু। অনাবশ্যক উচ্চকণ্ঠে প্রায় ধমকের সুরে প্রশ্ন করলেন—"ওঁর সঙ্গে কি কোনও মেয়েছেলে ছিল?" ইতস্তত করতে লাগল গোকুল। বোকার মতো একটু হেসে ঘাড়টা আর একবার চুলকে ব্রজেশ্বরবাবুর দৃষ্টি এড়িয়ে অন্যদিকে চাইবার চেষ্টা করতে লাগল।

"উত্তর দিচ্ছ না কেন"

"ওনাকেই আপনি জিগ্যেস করুন না"

"মেয়েলোকটি কোথায় এখন"

"তা কি করে' বলব"

"মেয়েটি দেখতে কি রকম ছিল"

"এই মেয়েরা যেমন হয়"

"ভদ্রলোকের মেয়ের মতো"

"তা বলতে হবে বই কি"

"তার সঙ্গে কি একটা কুকুর ছিল"

"আজ্ঞে—তা—"

হঠাৎ থেমে গেল গোকুল। ব্রজেশ্বরবাবুর যে হাতটি পকেটের ভিতর মণিব্যাগ ধরে' ছিল সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হল তার।

"তা ঠিক বলতে পারছি না"

ব্রজেশ্বরবাবু পকেট থেকে হাত বার করে' নিলেন। বার করে' নিজের থুতনীতে হাত বুলোতে লাগলেন। গোকুলের দৃষ্টিও তাঁর পকেট থেকে থুতনীর দিকে গেল। গোকুল মুখটা ভাল করে' দেখল এইবার। লম্বা গোঁফের মুখ। তার মনে হল মুখে রাগের ভাব তো নেই, বরং একটু চিন্তিতই যেন। হাত কিন্তু আর পকেটের দিকে নামল না।

"আজ্ঞে তা ঠিক বলতে পারছি না"

ব্রজেশ্বরবাবু আর কোনও প্রশ্ন করলেন না। গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েকমুহূর্ত। তারপর নিজের বিবেকেরই বিরুদ্ধে শক্তিসংগ্রহ করে' ফেললেন সহসা যেন সম্ভবত। পকেট থেকে ব্যাগ বার করে' গোকুলকে একটি টাকা দিয়ে তিনি বললেন, "এই হোটেলের আপিসটা কোথায় তা আমাকে দেখিয়ে দিতে পার"

"ওই যে—"

"তালাবন্ধ রয়েছে দেখছি। চাবি কোথায়"

টাকা পেয়ে গোকুল পুলকিত হয়েছিল। আপিস ঘরের চাবি যে হুকটিতে গোঁসাইজি টাঙিয়ে রাখতেন তা গোকুলের জানা ছিল। সে তাড়াতাড়ি চাবি এনে ঘর খুলে দিয়ে বললে, "এই যে, আপনি বসুন এসে। গোঁসাইজি এসে পড়বেন এখুনি। কেউ যদি এসে পড়ে তাকে বসবার জন্যই চাবি রেখে গেছেন তিনি। এখুনি এসে পড়বেন। আপনার কিছু দরকার আছে কি? জলটল—"

"কিছু না। তুমি এস আমার সঙ্গে"

ঠিক এই সময় সুশোভন বাইরে থেকে এসে ভিতরে ঢুকল। ব্রজেশ্বর সুশোভনের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে' একনজর চেয়ে দেখলেন। তারপর আপিস ঘরে ঢুকে গেলেন।

সুশোভন হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হেঁট হয়ে বাঁ পায়ের গোছটা একবার চুলকে নিলে। সে যে কি করবে তা ভেবে পাচ্ছিল না—এক কথায় যাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বলে সেই অবস্থা। তার মনে হচ্ছিল গোঁসাইজিও যদি এখন এসে পড়েন সে যেন বাঁচে। মোটরের পিছনে যে স্যুটকেসটি ছিল তাতে বেশ বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে—ব্রজেশ্বর দে। ব্রজেশ্বর দে? সান্ত্বনার স্বামী! সর্বনাশ! সে কি করবে ঠিক করতে পারছিল না প্রথমটা। হোটেলের দিকে ব্যায়ত-আননে চেয়ে ছিল খানিকক্ষণ। বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবে, না, হোটেলের দিকে এগিয়ে যাবে, না সরে পড়বে—কিছুই ঠিক করতে পারছিল না।

"গোপনীয় খবর? ব্রজেশ্বর দে গোপনীয় খবর সংগ্রহ করতে এসেছে! সারলে দেখছি! গোঁসাইজিও তো এল বলে'। আর আমিও একটা ঝড়ঝড়ে' বাইক হাঁকিয়ে ঠিক এসে পড়লাম এই সময়ে। সে হালুয়া! কি করা যায় এখন—"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইত্যাকার চিন্তা করলে সে খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ তার মনে হল গতরাত্রে সে-ই যে সান্ত্বনার সঙ্গে এখানে ছিল তা ব্রজেশ্বরবাবু টের পান নি এখনও। তার আসল নামটাও তো কেউ জানে না এখানে। ব্রজেশ্বরবাবু বড় জোর কারও মুখ থেকে (কে সেই রাসকেল?) এইটুকু শুনে থাকতে পারেন যে গতরাত্রে তাঁর স্ত্রী কোনও অজ্ঞাতনামা যুবকের সঙ্গে এই হোটেলে রাত কাটিয়ে গেছেন। সে যে সেই যুবক একথা ব্রজেশ্বর বাবু এখনও জানেন না। জানা সম্ভব নয়। এই কথাটা মনে হওয়াতে তার মনে ভরসা হল খানিকটা। মনে হল ব্রজেশ্বরবাবুর এই অনুসন্ধানে একটু সাহায্য করবার ভান করলে ব্রজেশ্বরবাবুর সন্দেহও হয়তো হবে না তার উপর। কিন্তু ব্রজেশ্বরবাবুর ভাবভঙ্গী দেখে ঘাবড়ে গেল সে। একনজর চেয়েই সুশোভন বুঝতে পেরেছিল ভদ্রলোক ব্যাপারটা জেনেছেন কিছু। কিন্তু কতটা? কি করে' জানলেন?

ব্রজেশ্বর আপিসের ভিতর ঢুকে গেলেন। সুশোভন বাইরে দাঁড়িয়ে উসখুস করতে লাগল। ভয়ঙ্কর রাসভারী লোক মনে হচ্ছে। দুষ্টুমি ধরা পড়ে গেলে দুষ্টু ছেলের শিক্ষকের সামনে যে রকম মনোভাব হয় সুশোভনের অনেকটা সেই রকম হতে লাগল। মনে হতে লাগল যেন সে ব্রজেশ্বরবাবুর চেয়ে অনেক ছোট, শুধু বয়সে নয়, উচ্চতাতেও! একটু এগিয়ে এসে জানলা দিয়ে আপিসের ভিতর আস্তে উঁকি দিয়ে দেখল সে। ব্রজেশ্বরবাবু 'অ্যাড্‌মিশন রেজিস্টার'খানা ওল্টাচ্ছেন, নামের পর নাম দেখে যাচ্ছেন। হঠাৎ এক জায়গায় আঙুল দিয়ে থেমে গেলেন তিনি। পরিচিত হস্তাক্ষর চিনতে দেরি হল না। নির্নিমেষে গম্ভীরভাবে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। মুখের একটি পেশী বিচলিত হল না।

কিন্তু। যেন জীবন্ত মানুষের মুখ নয়, মুখোস। বিরাট খাতাটা সশব্দে বন্ধ করে' অন্যদিকে চাইলেন তিনি।

সুশোভন সরে' এল জানলা থেকে। গোকুলই প্রথম আপিস থেকে বেরুল এবং বেরুবামাত্র সুশোভনের সামনে পড়ে' গেল। এই ব্যাটাই সব ফাঁস করে' দিলে না কি! বখশিস টকশিস সব মাঠে মারা গেছে সম্ভবত। গোকুলের একটা গরু-চোর-গোছ ভাব দেখে আরও সন্দেহ হল সুশোভনের।

"কাল রাত্রে আমি যে ওই মেয়েলোকটির সঙ্গে ছিলাম তা' বল নি তো ভদ্রলোককে"—ফিস ফিস করে' জিগ্যেস করলে সুশোভন।

"না"—অনুরূপ ফিসফিসে উত্তর দিলে গোকুল—"আমি বলি নি কিছু ; কিন্তু জিগ্যেস করছিল"

"উত্তরে কিছু বলেছ না কি"

"না বলিনি। কিন্তু কতবার জিগ্যেস করেছে যে"—

ঢোঁক গিলে থেমে গেল গোকুল দ্বারের দিকে চেয়ে। ব্রজেশ্বরবাবুর দীর্ঘদেহ আপিসের দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল।

সুশোভন সোজা ঢুকে পড়ল সামনের হলটায়।

(২১)

সান্ত্বনা দোতালায় ছিল শব্দ শুনে দ্রুতপদে নাবতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। সামনের হলটায় দিগ্বিজয় সিংহ রায়, সুরেশ্বরী দেবী, কতকগুলো ভিজে কাপড়, বর্ষাতি প্রভৃতি মিলে যাচ্ছেতাই কাণ্ড হচ্ছিল একটা।

"সান্ত্বনা কই, কোথায় সে"—বারবার জিজ্ঞাসা করছিলেন সুরেশ্বরী দেবী।

"ওগো, তুমি ওই কাদামাখা জুতোটা বাইরে ছেড়ে এস না। গরম জল করতে বলেছি, তোমরা স্নান করে' ফেল সব"

সকলের দিকে চেয়ে বললেন তিনি আদেশের ভঙ্গীতে।

ট্যাঁশ হিন্দিতে উত্তর দিলেন ছকুবাবু—"মরে গেলেও আমি তো অস্নান করছি না বাবা"

"যাঁরা ভিজেছেন তাঁদের বলছি। আপনাকে নয়"

"আমি একটুও ভিজিনি"—সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন দিগ্বিজয়—"ভিজেছ বরং তুমি। তোমারই আগে স্নান করা উচিত"

"গোবর্দ্ধনবাবু, আপনিও তো খুব ভিজেছেন। আপনি করবেন না?"

গোবর্দ্ধনবাবুর দিকে চেয়ে সুরেশ্বরী প্রশ্ন করলেন।

"বেশ তো, করব"—হাসিমুখে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন গোবর্দ্ধন।

"ওমা, এই যে সান্ত্বনা, ওপরে ছিলি বুঝি—"

সান্ত্বনা প্রণাম করতেই সুরেশ্বরী দেবী জড়িয়ে ধরলেন তাকে এবং সকলের সমুখেই চুম্বন করলেন।

দিগ্বিজয়কে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, "ছকুবাবুর মুখে যখন শুনলাম যে তোমরা এসেছ তখন কি যে আনন্দ হল। আমার ভয় হচ্ছিল, আমি বুঝি ভুল তারিখ জানিয়েছিলাম তোমাদের—"

"আমি কিন্তু তখনই বলেছিলাম তা জানাও নি"—ঘাড় ফিরিয়ে সুরেশ্বরী বললেন—"তোমার ভুল কখনও হয় না। তারপর, সান্ত্বনা, তুই আছিস কেমন।"

"ভুল করেছি কি না, তার অকাট্য প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি। শোভনদের তো পাত্তাই নেই কারও। সান্ত্বনা তুমি এঁদের চেনো কি—ইনি হলেন ছকুবাবু, আর ইনি হলেন গোবর্দ্ধনবাবু। দুইজনেই সম্পর্কে আমার"—সম্পর্কটা হঠাৎ গুলিয়ে ফেললেন দিগ্বিজয়বাবু—"মানে শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে আত্মীয়"

সুরেশ্বরী বললেন, "আচ্ছা, ব্রজেশ্বর এসেই চলে গেল কেন। ছকুদা বলছিলেন—এসে নাবেন নি পর্য্যন্ত। আর তোর কুকুর নিয়ে কি কাণ্ড হয়েছিল! ভাগ্যে ভদ্রলোক পেয়ে দিয়ে গেলেন। লোকটি খুব ভাল বলতে হবে। ব্রজেশ্বর আবার আসবে তো"

"আসবে বই কি, শিগ্গিরই আসবে"—সান্ত্বনা জবাব দিলে চট করে'—"খুব জরুরি একটা দরকারের জন্য চলে যেতে হল। কোথাকার একটা জরুরি খবর না কি তাঁর কাছে থেকে গিয়েছিল। সেইটে দিয়েই ফিরে আসবেন"

"দরকারি ফাইলটা না দিয়েই চলে এসেছিল! কি যে সব ভুলো মন তোমাদের হয়েছে আজকাল"—সুরেশ্বরী দেবী তারপর দিগ্বিজয়ের দিকে ফিরে বললেন—"তুমি যদি স্নান না-ও কর, কাপড়-চোপড়গুলো ছাড় অন্তত"

"ছাড়ছি। স্নান করলেও মন্দ হয় না। কিন্তু তুমি নিজে করছ কি! ভিজে সপ সপ করছে যে তোমার কাপড়—"

"কি যে বাজে কথা বল! আমি একটুও ভিজি নি। এ যা দেখেছ ওপর-ওপর। তবে এগুলো ছাড়ব, আমি। স্নানও করতে পারি—"

ছকুবাবু পাইপ ধরিয়েছিলেন, দিগ্বিজয়ও মোটা সিগার বার করলেন একটা। গোবর্দ্ধনের দিকে চেয়ে বললেন—"নেবেন না কি"

"ও কি, তোমরা স্নান করে' ফেল আগে। সিগার বার করছ যে মোটা মোটা"

"থাক তবে। স্নান সেরেই খাব"

কুণ্ঠিত গোবর্দ্ধন প্রসারিত হস্ত গুটিয়ে নিলেন।

"টেলিগ্রাম"

দ্বার প্রান্তে পিওন এসে দাঁড়াল।

দিগ্বিজয় তাড়াতাড়ি গিয়ে টেলিগ্রামটা নিলেন এবং পড়েই সান্ত্বনার দিকে চেয়ে বলে' উঠলেন—'এ কি, ব্রজেশ্বর কোলকাতা থেকে টেলিগ্রাম করছে"

"খুব চট করে' পৌঁছে গেছেন তো"—সান্ত্বনা বললে। টেলিগ্রামটা আর একবার পড়ে' দিগ্বিজয় বললেন, "টেলিগ্রাম করেছে আজ সকালে। লিখছে আজ সাড়ে চারটের ট্রেনে আসছে"

"তা কি করে' সম্ভব—" নিরীহ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে সান্ত্বনা। "তাহলে কাল বোধ হয় করেছিলেন আজ এসে পৌঁছল"

"কিন্তু টেলিগ্রামেই তো তারিখ রয়েছে। এই যে নাইনটিন্থ। আমি আবার বোধ হয় গোলমাল করে' ফেলছি। দেখ তো, এটা নাইনটিন্থই তো মনে হচ্ছে—না এইটিন্থ, দেখ তো। কিম্বা কালই বোধ হয় নাইনটিন্থ ছিল তাহলে—তা হবে—"

"নেহি"—মাথা নেড়ে ছকু বললেন—"আজই নাইন্‌টিন্‌থ্‌"

"হ্যাঁ আজই নাইনটিন্‌থ", দিগ্বিজয় বললেন আবার, "আমাদের নম্বর জন্মদিন নাইনটিন্‌থ, তাকে চিঠি লিখলাম যে আজ সকালে—"

"কাল হয় তো তার জন্মদিন ছিল", সুরেশ্বরী বললেন।

"না গো না, নাইনটিন্‌থই তার জন্মদিন"

"তা অস্বীকার করছি না, কিন্তু কাল হয়তো নাইনটিন্‌থ ছিল। কিন্তু না তুমি তো ভুল করবার লোক নও"

"না, না, থাম, আমারই ভুল হচ্ছে বোধ হয়। গোলমাল করে' ফেলছি, কালই বোধ হয় নাইন্‌টিন্‌থ ছিল—থাম, ক্যালেণ্ডার একখানা দেখলেই তো চুকে যায়—"

"চল মাসীমা, তুমি কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেলবে চল আগে। টেলিগ্রামের কি আজকাল কোনও ঠিক-ঠিকানা আছে। হয়তো কেরাণীই লেখবার সময় ভুল তারিখ বসিয়ে দিয়েছে, কিম্বা চাকরে হয়তো দেরি ক'রে দিয়েছে। উনি এলেই বোঝা যাবে সেটা। তুমি এখন ওঘরে চল"

সুরেশ্বরীকে প্রায় টানতে টানতে সান্ত্বনা পাশের ঘরে নিয়ে যাচ্ছিল।

"তোরা কোলকাতায় চাকর পেয়েছিস না কি। কোলকাতায় শুনেছি আজকাল চাকর পাওয়াই যায় না। মানুষের চিনিস ?"

"ব্যাপারটার কিন্তু একটা 'ফায়সালা' হওয়া দরকার। শুনুন সান্ত্বনা দেবী" ছকুবাবু এগিয়ে এলেন, "আপনার স্বামী আজ সাড়ে চারটের সময় পৌছুচ্ছি বলে' চাকরকে দিয়ে কি করে' টেলিগ্রাম পাঠাতে পারেন তাতো আমার মগজে ঘুসছে না। মোটর না বেগড়ালে তো আপনাদের কালই এখানে পৌছবার কথা। তা-ও ট্রেনে নয়, মোটরে—"

"সত্যি ব্যাপারটা এমন ঘোরালো গোলক ধাঁধার মতো দেখাচ্ছে যে মাথায় কিছু ঢুকছে না আমার"—একটু শুষ্ক হাসি হেসে জবাব দিলে সান্ত্বনা।

"আমারও ঢুকছে না"—দিগ্বিজয় বললেন।

"গোপাল ভাঁড়ের একটা গল্প আছে"—হেসে সুরু করলেন দিগ্বিজয়, করেই ভ্রূকুঞ্চিত করে' থেমে গেলেন আবার—"দাঁড়াও গোপাল ভাঁড়ের না বীরবলের, আবার গুলিয়ে ফেললাম—"

অপ্রস্তুত মুখে থেমে গেলেন তিনি। সুরেশ্বরীও এ নিয়ে বাদানুবাদ করবার সুযোগ পেলেন না। টেলিগ্রামটার দিকে তর্জ্জনী আস্ফালন করে' ছকুবাবু যা বলতে লাগলেন, তাতেই মনোনিবেশ করতে হল তাঁকে।

"আপনি এবং আপনার স্বামী এখানে আসবার জন্যে কাল একটা হাওয়া গাড়িতে রওয়ানা হয়েছিলেন কোলকাতা থেকে। হাওয়াগাড়ির কল বিগড়ে যাওয়াতে আপনারা কাল রাতে ধরমশালা না কোথায় রাত কাটিয়েছিলেন। এ খবর আপনার নোকরদের মালুম হ'তে পারে না। তারা এ বিষয়ে তার ভেজতেও পারে না। আপনার স্বামী আজ সমস্ত সকাল আপনার সঙ্গে মহজুদ ছিলেন, এতদূর তক্ এসেওছিলেন, তিনিও ও তার ভেজতে পারেন না। তাছাড়া তিনি লিখছেন ট্রেণে করে' আজ সাড়ে চাব বাজে পহুঁছ যাউঙ্গে। বড় তাজ্জব লাগছে আমার"

"মরুক গে, চান করে' ফেল সব একে একে। প্রথমে কে ঢুকছে বাথরুমে"

"মাফ কি জিয়ে মালকাইন"—ছকুবাবু সুরেশ্বরীর দিকে অভিবাদনের ভঙ্গীতে ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়ে সরে গেলেন।

সুরেশ্বরী দিগ্বিজয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি যাচ্ছ তো বাথরুমে এবার"

প্রকাণ্ড সিগারটার দিকে এক-নজর চেয়ে দিগ্বিজয় উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ, এই যে হয়ে গেল আমার। তুমি কিন্তু ভিজে কাপড়ে কেন যে দাঁড়িয়ে আছ এখনও, তা বুঝতে পারছি না"

"তুমি চল মাসীমা ওঘরে"—সান্ত্বনা আর একবার সুরেশ্বরীকে পাশের ঘরে নেবার চেষ্টা করলে।

"চল যাচ্ছি। ব্রজেশ্বর তাহলে সাড়ে চারটের ট্রেণে আসছে না তো? কি ঠিক হল, সেইরকম ব্যবস্থা তো করতে হবে আবার—"

ছকুবাবু বিস্ফারিত চক্ষে সান্ত্বনার দিকে চেয়ে ছিলেন। এই কথায় এগিয়ে এসে পরিষ্কার বাংলায় তিনি বললেন, "সাড়ে চারটার ট্রেণে আসা কি করে' সম্ভব তাঁর পক্ষে! ঘণ্টা দুই আগে তিনি তো এখান থেকেই মোটরে রওনা হয়েছেন কোলকাতার দিকে"

"কি জানি বুঝতে পারছি না ঠিক। সে যা হয় হবে, চল মাসীমা তুমি ওঘরে, কাপড়টা ছাড়বে চল"

সান্ত্বনা সুরেশ্বরী দেবীকে পাশের ঘরে নিয়ে চলে গেল।

অপস্রিয়মান দুটি নারীমূর্ত্তির দিকে ছকুবাবু বড় বড় চোখ করে' চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর কাঁকড়ার মতো পাশ দিয়ে সরে' সরে' ঘরের কোণের টেবিলের কাছে গিয়ে আর এক ডোজ 'ষ্টিংগাহ' পান করে' ফেললেন।

"চীজ বটে মেয়েমানুষ! উফ! বেশ একটি 'ওঝরা' পাকিয়ে ফেলেছে। কিন্তু সেদিকে কারও লক্ষ্য নেই। দিমাগই নেহি হ্যায় কিসি কো"

রায়বাহাদুর দিগ্বিজয় সিগারটি একটি অ্যাশট্রের উপর সন্তর্পণে নাবিয়ে রেখে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে স্নান করতে যাচ্ছিলেন। ছকুবাবুর শেষ কথাগুলি শুনতে পেলেন তিনি। সুদীর্ঘকাল দাম্পত্যজীবন ভোগ করার ফলে স্ত্রীর সম্বন্ধে তাঁর যে মনোভাব হয়েছিল তা ঠিক বর্ণনা করা শক্ত। অনেকটা অন্ধ বিশ্বাস গোছের। ছকুবাবুর শেষ কথাগুলি শুনতে পেলেন তিনি। পেয়ে বললেন, "ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছেন কেন। স্বর্ণোর হাতে ছেড়ে দিন, সব ঠিক হয়ে যাবে—"

উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে তাঁর এই উপদেশ সান্ত্বনারও কানে ঢুকল। শুধু কানে নয়, মরমেও। অকূল পাথারে পড়ে' সে যে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না, হঠাৎ যেন ভেলা দেখতে পেলে একটা। ঠিক! মাসীমারই শরণাপন্ন হওয়া যাক। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তো 'উনি' এসে পড়বেন। ইতিমধ্যে যাহোক একটা ব্যবস্থা করে' ফেলতেই হবে। ওই বেয়াল্-গুঁফো ছকুবাবুটি মোটেই সুবিধের লোক নয়। সমস্ত ঘটনা উনি যদি জানতে পারেন তাহলে ত্রিভুবনে আর কারও জানতে বাকী থাকবে না। 'ওঁর' সঙ্গে ষ্টেশনেই দেখা করে' আগে থাকতে সব ঘটনাটা

খুলে বলা দরকার, তা না হলে উনিই সব ফাঁস করে' দেবেন এখানে এসেই! মাসীমাকেই সব খুলে বলতে হবে, তাছাড়া উপায় নেই।

সুরেশ্বরী দেবী বাথরুমে ঢুকে গায়ের চাদরটা ছেড়ে বেরিয়ে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা খুলতে লাগলেন। একটা স্মৃতিও ভেসে উঠছিল তাঁর মানসপটে। তাঁর সখী, সান্ত্বনার মা, তাঁর চুল বেঁধে দিতে কি ভালোই না বাসত!

"মাসীমা, আসলে কি হয়েছে জানেন"

"কি"

"উনিই ওই টেলিগ্রাফ করেছেন"

"ব্রজেশ্বর? কিন্তু সে তো বলছিস একটু আগে মোটরে করে'—"

"মোটরে উনি ছিলেন না"

"কে ছিল তবে"

"সুশোভনবাবু"

"অ্যাঁ! বলিস কি"

তাঁর পিঠের উপর সাদা রেশমের মতো একরাশ চুল আলুলায়িত হয়ে পড়েছিল। ঈষৎ বেঁকে চিরুণী চালাচ্ছিলেন তিনি তাতে। সান্ত্বনার কথা শুনে চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গেল, সোজা হ'য়ে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি সান্ত্বনার দিকে।

"সব খুলে বলছি শোন না। কি যে বিপদে পড়েছি! আমাকে বাঁচাও তুমি মাসীমা"

সুরেশ্বরীর হাতের চিরুণী দ্রুততর বেগে চলতে লাগল। সান্ত্বনা বলতে লাগল সব। সুরেশ্বরী দেবী কেবল মাঝে মাঝে অস্ফুটকণ্ঠে কাতরোক্তি করে' উঠছিলেন, মনে হচ্ছিল বুঝি চুলের জটে চিরুণী আটকে গিয়ে লাগছে তাঁর। অবিরাম চিরুণী চালনায় হয় তো সত্যিই লাগছিল।

সান্ত্বনা কিছু গোপন করলে না। যা যা ঘটেছিল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করে' গেল সব। সুরেশ্বরী দেবীও ঘাড় বেঁকিয়ে চিরুণী চালাতে চালাতে সব শুনলেন।

"এই হয়েছে। এখন কি করি বল মাসীমা। আমাকে উদ্ধার কর তুমি এখন কোনও রকমে—আমি মনে করলুম আগে পৌঁছে যাব—তাই"—সান্ত্বনার গলার স্বর কেঁপে গেল।

"তোর বয়স কি কোনদিনই বাড়বে না পোড়ারমুখী, বুদ্ধি কি কোনদিন হবে না! এই সেদিনই এত কাণ্ড হয়ে গেল, আবার তুই এই করলি—"

ক্ষিপ্রহস্তে চিরুণীটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন সুরেশ্বরী। মাথার সমস্ত চুল বিস্রস্ত, চোখের দৃষ্টি জ্বলন্ত। সে এক অদ্ভুত মূর্তি হল তাঁর।

"কি হবে এখন"—ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্লেন তিনি।

"কিচ্ছু হবে না, যদি ব্যাপারটা গোপন রাখা যায়। ওই ছকুবাবুর কাছ থেকে গোপন রাখলেই হবে"

"ব্রজেশ্বর যদি শোনে কি মনে করবে সে"

"সব শুনলে কি আর মনে করবে। মেশোমশায়ের মতো লোক উনিও, মহাদেব তুল্য—"

"তা যদি হয় তাহলে ভাবনা নেই। কিন্তু আমি তোর আক্কেলের কথা ভাবছি কেবল। কি বলে' তুই সুশোভন-বাবুর সঙ্গে একা এলি! তার বউ যদি শোনে কি ভাববে। ছি, ছি, এতটুকু হুঁস নেই তোদের। একঘরে শুতে গেলিই বা কি করে'। মনে পাপ ছিল না মানলাম না হয়, কিন্তু দৃষ্টিকটু তো। ছি ছি ছি! আর ওই সুশোভনই বা কি রকম ছেলে। তারও তো ভাবা উচিত ছিল। আজকালকার ছেলেমেয়ে কি যে হচ্ছ মা তোমরা। সেদিন এত কেলেঙ্কারি হল, আবার তুই এই করলি—"

"আমি তোমার কাছে তাড়াতাড়ি এসে পড়ব বলেই তো ওঁর সঙ্গে ট্যাক্সিতে এলাম। আমি ইচ্ছে করে' তো আর কিছু করি নি, হয়ে গেল কি করব"

অভিমানে সাত্বনার গলার স্বর কেঁপে উঠল একটু। সুরেশ্বরী একনজর তার দিকে তাকালেন। মা-হারা মেয়েটা! একেবারে ছেলেমানুষ এখনও।

"তুমি ভিজে সেমিজ কাপড় ছেড়ে ফেল আগে। ঠাণ্ডা লেগে যাবে তোমার"

"আমার অত সহজে ঠাণ্ডা লাগে না। গরম বোধ হচ্ছে। তুই এখন কি করতে চাস বল"

"আমি গাড়ি করে' ষ্টেশনে যাই। আর কারও সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমার সঙ্গে ওঁর দেখা হওয়া দরকার। তারপর উনি আবার হঠাৎ এত শিগগির কি করে' ফিরে এলেন তার কারণ একটা বার করা যাবে দু'জনে মিলে"

"মিছে কথা বলবি?"

"বলব না?"

"না। মোটামুটি সত্যি কথাটাই বলতে হবে সকলকে। কিন্তু এমনভাবে বলতে হবে যাতে—ওই যে কি একটা কথা আছে—সাপও না ভাঙে—না না ঠিক উলটো বুঝি"

"সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে? কিন্তু কি করে' করবে সেটা"

"তা জানিনা মা। তারই বা দরকার কি। এখানে সবই তো ঘরের লোক"

"ছকুবাবু?"

"ওঁকে বলে' দিলে উনি কাউকে কিছু বলবেন না। উনি সম্পর্কে আমার দাদা—"

সাত্বনা মাথা নাড়লে।

"না, ওঁকে বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। আচ্ছা, ওঁকে বিকেলে কোনও রকমে সরিয়ে ফেলতে পারা যায় না বাড়ি থেকে ঘণ্টা খানেকের জন্যে?"

"তুমি কোথায় কি কাণ্ড করে' এসেছ তার জন্যে আমি ওঁকে কোথায় তাড়াই বল এখন"

"তাড়াতে বলছি না তো। সরিয়ে দিতে বলছি। তুমি কাপড় সেমিজ ছেড়ে ফেল না আগে"

আলনা থেকে একটা শুকনো সেমিজ এবং শাড়ি নিয়ে জোর করে' সুরেশ্বরীর হাতে গুঁজে দিল সে।

"এই বাড়িতেই যদি ওঁকে কোনও ঘরে অন্যমনস্ক করে' রাখতে পার তাহলেও হবে"

"চেষ্টা করব"

কাপড় এবং সেমিজ নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন সুরেশ্বরী। সেখান থেকেই কথা বলতে লাগলেন।

"ছি ছি এতটুকু বুদ্ধি কি নেই! এই সেদিন এত কেলেঙ্কারি, আবার এই! আমারই শুনে কেমন করছে! আর কারও ব্যাপার হলে বিশ্বাসই করতাম না যে এর মধ্যে কোনও কুমতলব নেই! একথা বাইরের লোক যদি শোনে তোকে কি ছেড়ে কথা কইবে এবার। চিনি তো সবাইকে। সেবার কিছুই ছিল না তাতেই অত—"

"আমার নিজের জন্যে হলে আমি কোনও তোয়াক্কাই করতাম না," এ ঘর থেকে জবাব দিলে সান্ত্বনা, "আমার খালি ভয় হচ্ছে ওঁর সুনামে যদি কোন আঁচড় লাগে। আমার জন্যে যদি ওঁর বদনাম হয় তাহলে আমি গলায় দড়ি দেব"

"হয়েছে হয়েছে, খুব হয়েছে। চুপ কর"

"তখন থেকে কেবল বকে' যাচ্ছ আমায়"

সুরেশ্বরী কোনও উত্তর দিলেন না। কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টি থেকে স্নেহ উপচে পড়তে লাগল। সেমিজ কাপড় ছেড়ে পাশের ঘর থেকে যখন বেরিয়ে এলেন তখন একেবারে আলাদা লোক।

"আচ্ছা, যা হয়েছে হয়েছে। এখন কি করা যায়—"

"তুমি যা বলবে তাই করব"

"কিন্তু কি বলব তাই যে ভেবে পাচ্ছি না। ব্রজেশ্বর আর সুশোভনের স্ত্রী যদি জিনিসটাকে ভালভাবে নেয় তাহলে ব্যাপারটা সোজা হয়ে যায়। তারপর

ওই লোকটাকে সামলাতে হবে—বজরং না কি নাম—সে বোধহয় মোটর সাইকেল ছুটিয়ে ছিপছরবামারিতে গিয়ে বক্তৃতা করছে এতক্ষণ”

তাঁর এ অনুমান মোটেই মিথ্যা নয়।

“যাক গে। এখন ওঁকে ব্যাপারটা বলা দরকার। আমিই বলি। উনি কি বলেন শোনা যাক। তারপর দু'জনে মিলে উপায় বার করতে হবে একটা। করতেই হবে”

হঠাৎ যেন একটা প্রেরণা পেলেন সুরেশ্বরী দেবী। বিপদের সময় এই ধরণের প্রেরণা পান তিনি মাঝে মাঝে। সেবার যেমন হল। এক হাঁড়ি পোলাওয়ের তলা ধরে' গেল। সবাই যখন মহা চিন্তিত কি হবে—মান্য অতিথিরা খেতে বসেছেন—তখন সুরেশ্বরীই উপায় বার করলেন। বললেন—থাক, নেড়ো না, একটা হাঁড়িতে ঘি গরম মশলা চড়িয়ে দাও—আব পোলাওটা উপর উপর থেকে ঢেলে দাও তাতে। তাই করা হল। টের পর্য্যন্ত পেল না কেউ।

সুরেশ্বরী ‘ওঁকে' বলতে গেলেন। ব্যাপারটা খুব সহজ হল না কিন্তু। দিগ্বিজয় ব্যাপারটা বুঝতে প্রথমত অনেক দেরি করলেন। বারম্বার সব গুলিয়ে যেতে লাগল তাঁর। তারপর অনেক কষ্টে যদি বুঝলেন, বিশ্বাস করতে চান না। সুরেশ্বরী যখন তাঁকে অবশেষে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে অবিশ্বাস্য হলেও ব্যাপারটা সত্য, তখন সমস্ত দোষটা সুশোভনের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করে' অনেকক্ষণ সময় নষ্ট করলেন তিনি। কিন্তু সুরেশ্বরী যেই বললেন যে তাঁর মতে সান্ত্বনার দোষও কিছু কম নয় অমনি তিনি সায় দিয়ে বললেন, “হ্যাঁ, সান্ত্বনারই তো সব দোষ!”—তখন সুরেশ্বরীকে বাধ্য হয়ে আবার সুশোভনের দোষকীর্ত্তন করে' সান্ত্বনার অপরাধ লঘু করবার প্রয়াস পেতে হল। আধ ঘণ্টার মধ্যে অবস্থা এমন দাঁড়াল, যাকে খবরের কাগজের ভাষায় ‘সঙ্কটজনক পরিস্থিতি' বলা যেতে পারে। সুরেশ্বরী প্রথম যা বলেছিলেন দিগ্বিজয় বদ্ধপরিকর হয়ে তাই সমর্থন করতে লাগলেন এবং সুরেশ্বরী নানাভাবে প্রমাণ করতে লাগলেন যে

দিগ্বিজয় প্রথমে যা বলেছিলেন তাই ঠিক, ভুল সুরেশ্বরীরই হয়েছিল। কেউ এক-ইঞ্চি হঠতে রাজি নন।

এ সমস্যা অমীমাংসিত রেখে সুরেশ্বরী তখন দ্বিতীয় প্রসঙ্গে মনোনিবেশ করলেন। ছকুবাবুর কৌতূহল কি করে' ভিন্নমুখী করা যায়। দিগ্বিজয় বললেন ছকুবাবুর কৌতূহল ভিন্নমুখী করতে হলে ওঁকে ভিন্ন স্থানে চালান করে' দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ বাড়িতে রেখে ওঁকে সামলানো অসম্ভব। এর থেকে নূতন একটা প্রেরণার উদ্ভব হল। প্রেরণাটা আসলে দিগ্বিজয়ের মনেই প্রথম উদ্ভূত হয়েছিল, কিন্তু দিগ্বিজয় কৌশলে কৃতিত্বটা সুরেশ্বরীর উপরই আরোপ করলেন। সুরেশ্বরীও মেনে নিলেন সেটা। কারণ এর সঙ্গে সামান্য একটু মিথ্যা জড়িত ছিল। স্বামীর নাম তার সঙ্গে জড়াতে ইচ্ছা হল না তাঁর এবং বুদ্ধি করে' সে কথাটা চেপে গেলেন তিনি। প্রকাশ করলে মুশকিল হ'ত। দিগ্বিজয় যদি ঘুণাক্ষরে টের পায় যে তাঁকে বাঁচাবার জন্যে সুরেশ্বরী নিজের ঘাড়ে এই মিথ্যা-দুষ্ট প্রেরণার কৃতিত্ব নিতে চাচ্ছেন তাহলে নিজেই দাবী করে' বসতেন সেটা। আর একটা সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হত।

রীতিমত একটা নাটকের অভিনয় করবার সুযোগ পেয়ে দিগ্বিজয় মনে মনে ?ই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন (যৌবনে তিনি সত্যিই ভাল অভিনেতা ছিলেন একজন) এবং এমন একটা অপ্রস্তুত-ভাব মুখে ফুটিয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন যার অকৃত্রিমতার সন্দেহ করার ক্ষমতা ছকুবাবুর অন্তত ছিল না।

"ও মশায়, ভারী একটা মুশকিলে পড়ে গেছি"

"মুশকিল? কিস্ কিসিম্‌ কি?" ভ্রূযুগল উত্তোলন করে' প্রশ্ন করলেন ছকুবাবু।

"কি হল"—ক্ষুধার্ত্ত গোবর্দ্ধনবাবু বললেন। তাঁর ভয় হল জলযোগ ব্যাপারেই গোল-যোগ হল বুঝি বা।

"আমারই দোষ। ছি ছি, কি যে করা যায় এখন"

"আরে বাতাইয়ে না জনাব ক্যা হুয়া"

"আপনার হুইস্কি আনা হয় নি"

"অ্যাঁ—"

বাংলায় চীৎকার করে' উঠলেন ছকুবাবু। তারপর দম নিয়ে বললেন, "বলেন কি।"

"একদম ভুলে গেছি। আমার নিজের তো অভ্যাস নেই। অবশ্য বীরু সার কাছে লোক পাঠালে এখনও পেয়ে যাব"

"তবে আর দেরি করছেন কেন। ভেজিয়ে, জল্‌দ্‌ ভেজ দিজিয়ে"

"কাকে পাঠাই। মুশকিল সেইখানেই। আমি নিজেই যেতাম কিন্তু আমার গোটা দুই জরুরি চিঠি লিখতে হবে এক্ষুণি। সাড়ে পাঁচটায় ডাক বেরিয়ে যায়। চিঠি লিখে যেতে গেলে বীরু সা দোকান বন্ধ করে' চলে যাবে"

"বীরু সার দোকান কতদূর"

"তা মাইল ছয়েক। বগেন্দ্রপুর। গাড়িটা নিয়ে যেতে হবে, মানে বগিটা মোটরে তেল আনতে গেছে। যোগেন সাধারণত করে এসব—কিন্তু সে বেরিয়ে গেছে পীরনগরের হাটে। কোচোয়ানটা বিয়ে করতে গেছে আজও ফিরল না। পরেশ ছাড়া বাড়িতে দ্বিতীয় চাকর নাই। তা ছাড়া পরেশ বগি হাঁকাতে পারে না"

"আরে আমি তো পারি"—বলে উঠলেন ছকুবাবু।

"না, না, আপনার শরীর খারাপ—আপনার যাওয়াটা কি ঠিক হবে"

"শরীর খারাপ! পোখমনবাবুর সঙ্গে যখন থাকতাম তখন ১০৪ জ্বর নিয়ে বুনো রাস্তা দিয়ে দশ মাইল বগি হাঁকিয়ে গেছি"

"তবু আপনার একলা যাওয়া ঠিক হবে না। তবে গোবর্দ্ধনবাবু যদি সঙ্গে যান। বগেন্দ্রপুরের রাস্তা চেনেনও উনি—"

"বেশ তো জলযোগ করে নি। যাব সঙ্গে—"

"তাহলে সমস্যাটার সমাধান হয়ে যাবে। ছকুবাবু নিজে গেলে বীরু বাজে জিনিস দিতে পারবে না"

এই কথায় ছকুবাবুর চোখে মুখে অবজ্ঞা ও ব্যঙ্গ মিশ্রিত এমন একটা হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল যার অর্থ বীরু তো ছেলে মানুষ বীরুর উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ যদি সমবেতভাবে চেষ্টা করেন তাহলেও ছকুবাবুকে বাজে জিনিস গছাতে পারবেন না।

মুখে তিনি বললেন—"আজকাল বাজারেই ভাল জিনিস নেই। সমস্ত আফ্রিকান মাল—"

"আপনার যেতে কষ্ট হবে না তো, দেখুন। আমারই উচিত ছিল আনিয়ে রাখা—ছি ছি—"

"আরে না, না—কুচ ভি নেহি—ইয়ে তো মামুলি বাত হ্যায়—"

"আপনার বাতটা বেড়েছে শুনলাম"

"বাত? না। লিভারটা গড়বড়িয়ে ছিল, কিন্তু এখন আর কিছু নেই। আর দেরি করবেন না। গোবর্দ্ধনবাবু তৈরী হন—"

"জলখাবারটা আসুক। জলযোগটা সেরেই বেরুই"

"আরে জলযোগ পরে করবেন মশাই। জলের অভাব কোনও দিন হবে না। নিন তৈরি হয়ে নিন। চটপট—"

জলখাবার এসে পড়ল।

দিগ্বিজয় বগির ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে গেলেন।

(২২)

ধীর দৃঢ় পদক্ষেপে ব্রজেশ্বরবাবুও যখন 'হল'-ঘরে প্রবেশ করলেন তখন প্রমাদ গণতে হল সুশোভনকে। কি বলবে ভগবানই জানেন। সরে পড়ারও উপায় নেই কোনও। ব্রজেশ্বর 'হলে' ঢুকেই পকেট থেকে রুমাল বের করে' হেঁট হয়ে পায়ের গোছ আর জুতো থেকে ধুলো ঝাড়লেন। তারপর স্থিরদৃষ্টিতে

সুশোভনের দিকে চাইলেন তিনি। সুশোভনের দৃষ্টি অবশ্য স্থির ছিল না মোটেই। একটা জিনিস কিন্তু তার মনে হল। ভদ্রলোকের ভাবভঙ্গী বেশ ভদ্রই, শত্রুতার কোন আভাস তো পাওয়া যাচ্ছে না। দৃষ্টি থেকে যা বিকীর্ণ হচ্ছে তা বেশ ভদ্র। বিস্মিত হল।

"মশায়ের নামটি কি জানতে পারি"—আচমকা যদিও প্রশ্নটা করলেন তিনি, কিন্তু শান্তভাবে।

যথাসম্ভব সাহস সংগ্রহ ক'রে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করলে সুশোভন, তারপর জবাব দিলে, "কেন বলুন তো"

"যতদূর মনে হচ্ছে আপনি আমার স্ত্রীর বন্ধু একজন। কৌতূহলটা সুতরাং অহেতুক নয় নিতান্ত"

"আমার নাম সুশোভন নন্দী"

"ও নমস্কার"

সুশোভন এটা প্রত্যাশা করে নি। প্রতি-নমস্কার করলে সে।

"আমার স্ত্রীর সঙ্গে কতদিন থেকে আলাপ আপনার। অনেক দিনের, নয়?"

হ্যাঁ, তা হবে বই কি"

"আমার পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই, আশা করি"

"না। আপনার নাম তো আপনার বাক্সেই লেখা রয়েছে"

"ও, ওটা আমারই বাক্স তাহলে"

ব্রজেশ্বরবাবুর বাম ভ্রূটা ঈষৎ নড়ে উঠল উপরের দিকে।

"ওটা আপনার বাক্স নয়?"

"কি জানি! হয় তো ওটাও আপনি দাবী করে' বসবেন এখনি স্বচ্ছন্দে"

পুনরায় উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হল বাম ভ্রূ।

কাছে-পিঠে অপ্রত্যাশিত গন্ধ ছাড়লে আমরা যেমনভাবে নাক কোঁচকাই, সুশোভন তেমনি করলে দু'একবার! কোনও জবাব দিলে না।

ব্রজেশ্বরবাবু বললেন, "দেখুন, গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এমন একটা কাণ্ড হয়ে গেছে যার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না আমি। আপনি হয়তো কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে পারবেন। মনে হচ্ছে—আমার স্ত্রী কাল তাঁর গন্তব্য স্থানে পৌছতে পারেন নি এবং এখানে কাল রাতটা কাটিয়ে গেছেন। আপনিও ছিলেন না কি তাঁর সঙ্গে ?"

"থাকবার বাধাটা কি"—হঠাৎ বেখাপ্পা এবং ঈষৎ অভদ্র জবাবটা বেরিয়ে পড়ল সুশোভনের মুখ থেকে।

"ছিলেন তাহলে ?"

"ছিলাম"

"ছিলেন। কেন ?"

"থাকবার বাধাটা কি"—আবার বলল সুশোভন। ব্রজেশ্বরের জ্রটা আবার নড়ে উঠল উপরের দিকে।

"বাধা কোনও নেই জানি। আমার প্রশ্নটা সে সম্পর্কে নয়। আমি শুধু জানতে চাইছি আমার স্ত্রী এবং আপনি কি করে' এই হোটেলে এসে পড়লেন একসঙ্গে"

"কারণ আমরা দুজনে একসঙ্গে একই ট্রেন ফেল করেছিলাম"

"ও, তাই বুঝি ? তারপর"

"আমরা দুজ'নে ট্রেন ফেল করলাম। কিন্তু আমার স্ত্রী করল না"

"আপনার স্ত্রী"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। আমারও স্ত্রী আছে"

"ও"

এই 'ও'টার মধ্যে সুশোভন একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুর শুনতে পেলে যেন। চটে গেল তৎক্ষণাৎ।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারও স্ত্রী আছে একটি, নেহাৎ খারাপও নয়। আশা করি আমার স্ত্রী থাকায় আপত্তি নেই আপনার"

"মোটেই না। কিন্তু ঘটনাটি কি শুনি! আপনার স্ত্রী ট্রেন ফেল করেন নি, কিন্তু আপনি করেছিলেন। আমার স্ত্রীও করেছিলেন"

"হ্যাঁ। আমরা সবাই দিগ্বিজয় সিংহরায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছিলাম। আমি ট্রেন ফেল করে' একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলাম, আপনার স্ত্রীও আসতে চাইলেন আমার সঙ্গে। এখান থেকে মাইল তুই দূরে ট্যাক্সিটা বিগড়ে গেল। তখন কি আর করি—খবর পেলুম এখানে এই হোটেলটা আছে—তুজনে এসে আশ্রয় নিলাম এখানে। মোটামুটি এই হল ব্যাপার। আব কিছু জানতে চান কি"

"বেশী কিছু না। এইটেই যদি আর একটু বিশদ করে' বলেন বাধিত হব"

ব্রজেশ্বর ভ্রূ কুঞ্চিত করে' নিজের লাঠিটার দিকে চেয়ে রইলেন। সুশোভনের মনে হল লাঠির গাঁটের মতো লোকটির ভ্রূতেও গাঁট পড়ে গেল যেন। বিশদ-ভাবে শুনতে চায় সব! মানে? সুশোভনেব বুকের ভিতরটা কেমন যেন জ্বালা করতে লাগল। আচ্ছা কাঠখোট্টা বেরসিক লোক তো! বিশদ করে' বলা যায় না কি সব! সান্ত্বনার মতো মেয়ে কি করে' এই নীরস লোকটাকে পছন্দ করে' বিয়ে করেছে! আশ্চর্য্য।

"আপনি নিজে যখন বিবাহিত"—ব্রজেশ্বর বললেন ধীরে ধীরে—"তখন আমার মনোভাব নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন। এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার ফলে আমাব স্ত্রীর কোনও অসুবিধা হয়েছিল কি না তা জানতে চাওয়াতে আশা করি আপনি রাগ করছেন না। এখানে তো দেখছি স্থানাভাব খুবই। আপনাদের শোওয়ার খাওয়ার কষ্ট হয় নি তো"

"সে আমরা ব্যবস্থা করে' নিয়েছিলাম একরকম করে' "—সুশোভন যতটা সম্ভব ভদ্রভাবে বলল।

"ব্যবস্থা করে' নিয়েছিলেন? নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখানে ঘর তো মোটেই নেই দেখছি। একটিমাত্র স্পেয়ার রুম, শোবার যায়গাও পেয়েছিলেন?"

"হাঁ"—ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়, এমনই একটি ভাব দেখিয়ে সুশোভন এগিয়ে গেল জানলার দিকে।

"পেয়েছিলেন ? আপনাকে তাহলে গোঁসাইজির সঙ্গে শুতে হয়েছে বলুন। কারণ দ্বিতীয় ঘরটিতে তো একটি অসুস্থ মহিলা রয়েছেন। তৃতীয় ঘর তো আর চোখে পড়ল না। তাহলে আপনি—"

প্রত্যুত্তরে সুশোভন বোঁ করে' ঘুরে এমন কয়েকটা কথা বলে' ফেললে যা অনুত্তেজিত অবস্থায় সে বলতো না হয় তো।

"বিশ্বাস করুন মশাই, কোনও রকম নোংরামির মধ্যে ঢুকি নি আমরা। সান্ত্বনা দেবীর মতো সতীলক্ষ্মী স্ত্রীকে আপনার যদি সন্দেহ হয়, তাহলে এ-ও আমি বলব যে আপনি ওরকম স্ত্রীর যোগ্য নন"

ব্রজেশ্বরের মুখভাবে কোনও রকম উষ্মার লক্ষণ দেখা গেল না। তাঁর শান্ত চোখ দুটি একটু প্রদীপ্ত হয়ে উঠল শুধু। মনে হল ক্ষণিকের জন্য যেন তিনি ঈষৎ অসংযত হলেন যখন এগিয়ে গিয়ে সুশোভনের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "চটবেন না—"

"কোনও রকম নোংরামি ছিল না, বিশ্বাস করুন"

"নোংরামির কথা বারবার বলছেন কেন। ও কথা তো আমি একবারও ভাবি নি। আমার স্ত্রীকে আমি চিনি ভাল করে'"

সুশোভন ক্ষণকাল হাঁ করে' চেয়ে রইল একথা শুনে।

"ভালভাবে চেনেনই যদি, তাহলে আর এত জেরা করবার মানেটা কি !"

"তাহলে আর এত সব খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজনটা কি বলুন"—না বলে' পারলে না সে।

"ব্যাপারটা কি ঘটেছে জানতে চাই। সব খুলে বলুন দিকি"

"খুলে বলবার তো কিছু নেই। আপনি অনর্থক এরকম একটা গোয়েন্দা-গোয়েন্দা ভাব নিয়েছেন কেন বুঝতে পারছি না। এরকম ঠেস দিয়ে দিয়ে কথা বলবারই বা মানে কি। আপনার স্ত্রীর যাতে কোনওরকম কষ্ট বা অসুবিধা

না হয় আমি তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। প্যাঁচেও পড়েছি তার জন্যে, বেশ কিছু ঘোল খেয়েছি, খাচ্ছি এবং আরও কিছু খেতে হবে সম্ভবত। আর এতক্ষণ পরে আপনি এসে অনুসন্ধান করছেন! আপনি কি মনে করেন যে সুবোধ বালকেরা যেমন দাঁড়িয়ে স্কুলে গড়গড় করে' পড়া বলে' যায় তেমনি করে' আমি কালকে রাত্রে যা যা ঘটেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করে' যাব? তা করলে সান্ত্বনার প্রতি একটু অবিচার করা হবে না কি?"

মাথাটি ঈষৎ ঝুঁকিয়ে ব্রজেশ্বর বললেন, "মানছি—আপনার কথা। যতটুকু খোঁজ করেছি তাতে বুঝেছি যে শোওয়ার ব্যাপার নিয়ে বিপদে পড়েছিলেন আপনারা। হয় তো আমার অজ্ঞাতসারে এমন দু' একটা কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে যা আপনার 'ঠেস' বলে' মনে হচ্ছে, মাপ করবেন সে জন্যে। আপনার অবস্থাটা বুঝতে পারছি আমি, আপনিও আমার অবস্থাটা বুঝুন। কি হয়েছিল বলুন দেখি সব খুলে"

উত্তরে সুশোভন অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে নাকের ডগাটা ধরে' কচলালে একটু। তারপর ঢোঁক গিলে বললে, "বললে আপনি বিশ্বাস করবেন কি"

"খুব যদি অবিশ্বাস্য হয়"—গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ব্রজেশ্বর—"তাহলে স্ত্রীর মুখ থেকে সমস্ত না শোনা পর্য্যন্ত খুব সম্ভব বিশ্বাস করতে পারব না। তবু শুনিই না, শুনতে তো ক্ষতি নেই"

"ছাড়বেন না যখন শুনুন"—আবার নাকটা চুলকুলে সুশোভন—"কিন্তু আগেই বলে রাখছি বিশ্বাস হবে না। মনে হবে বানিয়ে বলছি"

"বলুনই তো"

দু'জনে বসলেন দুটো চেয়ারে।

"কিন্তু দেখুন, বলবার আগে, মানে আমি আবার জিগ্যেস করতে চাই আপনাকে—সান্ত্বনার, মানে আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে যে মনোভাব আপনি এইমাত্র প্রকাশ করলেন, অর্থাৎ তাকে ভালোভাবেই চেনেন আপনি, সেটা ঠিক তো,

মানে তার চরিত্রের সম্বন্ধে আপনার কিছুমাত্র সন্দেহ যদি হ'য়ে থাকে তাহলে মশাই আমি—কারণ—"

"দেখুন অনেক বিষয়েই হয় তো আপনার সঙ্গে আমার মতের গরমিল হবে। ধরুন যেমন, শোওয়ার ব্যাপারটা সম্বন্ধে, যতদূর বুঝতে পারছি, আপনার ব্যবস্থাটা হয় তো সুবুদ্ধিসঙ্গত মনে হবে না আমার। কিন্তু যে বিষয়ে সামান্যতম মতদ্বৈধ হবার সম্ভাবনা নেই তা নিয়ে আপনি অত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন। আপনি যদি বারম্বার বলেন যে আমি আমার স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান, তা হলেই বরং আপনার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যেতে পারে আমার। আমি যখন বলেছি যে আমি আমার স্ত্রীকে ভালোভাবে চিনি তখন তাই কি যথেষ্ট নয়"

"বেশ, বলছি তবে সব। দেখুন, 'লোকতঃ ধর্ম্মতঃ' বলে' যে কথাটা আছে তার ধর্ম্মতঃ অংশটুকু ঠিক আছে, লোকতঃ অংশটুকু হয় তো নেই। ওটুকু বাঁচাতে গিয়ে যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে, তবু হয় তো বাঁচাতে পারি নি, তা আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি। এতে যদি আপনি চটে ওঠেন তাহলে—"

"আহা, আপনি সুরুই করুন না—"

সুরু করাটাই শক্ত মনে হতে লাগল সুশোভনের। তবে ব্রজেশ্বরবাবুর কথাবার্ত্তা থেকে মনে বল পেয়েছিল সে। ভদ্রলোক শত্রুভাবাপন্ন নন মোটেই। তবু কাহিনীর যে অংশটুকু ঈষৎ 'ইয়ে'-গোছের সেখানটায় সে বারম্বার হোঁচট খেতে লাগল। ব্রজেশ্বর গম্ভীরভাবে শুনে যেতে লাগলেন। মুখের একটি পেশীও বিকম্পিত হল না তাঁর। সুশোভন গোপনও করলে না কিছু, একাধিক স্থানে হোঁচট খেতে হল যদিও, তবু গোড়া থেকে সমস্ত ব্যাপারটার বিশদ বর্ণনা করে গেল সে। ব্রজেশ্বর দেওয়ালের দিকে চেয়ে নির্ব্বিকারভাবে শুনলেন সব।

সমস্ত বলবার পর সুশোভন হাত উলটে বললে, "এই হয়েছে। বিরাট জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে একটা। এর জন্যে আপনি আমাকেই যদি দায়ী করতে চান—চাইবেন নিশ্চয়ই—তাহলে তাই করুন"

ব্রজেশ্বরবাবুর চোখ দেওয়ালেই নিবদ্ধ হয়ে রইল। কেবল বিস্ফারিত হল ঈষৎ।

একটু থেমে তিনি বললেন, "হ্যাঁ। দায়ী আপনাকেই আমি করব। কিন্তু জগাখিচুড়ির চেয়ে ঢের বেশী গুরুতর জটিলতার সৃষ্টি করছেন আপনি। উপযুক্ত কথা খুঁজে পাচ্ছি না"

"খুবই দুঃখিত আমি, সত্যি বলছি"—এ ছাড়া আর অন্য কোনও কথা জোগাল না সুশোভনের মুখে।

"দেখুন, আমার পরিবার, মানে সান্ত্বনাদেবী"—ব্রজেশ্বর ধীরে ধীরে চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসলেন এবং এতক্ষণ পরে সুশোভনের দিকে চাইলেন—"অত্যন্ত সহৃদয় মহিলা। চলতি বাংলায় যাকে 'বুঝদার' বলে। তার জন্যে কারও কোনও কষ্ট বা অসুবিধা হচ্ছে এ সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। কিন্তু তার এই কোমলতার সুযোগ নেওয়াটা আপনার উচিত হয় নি"

"আমি নিই নি তো"

"নিয়েছেন বৈ কি। যাক্, আমরা দু'জনে এখনই মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরী যাচ্ছি, সান্ত্বনার সঙ্গে দেখা হলে একথা তাকে বলবেন না যেন। তার এই সদয় সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারে যে আমি আপত্তি করেছি এ কথা যেন সে না শোনে"

"আরে, গ্রাণ্ড লোক তো"—হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল সুশোভনের মুখ থেকে। তারপর সামলে নিয়ে বললে, "সত্যি, চমৎকার লোক আপনি মশাই। সাধারণতঃ, এরকমটা চোখে পড়ে না। বাঃ, গ্রাণ্ড"

সুশোভনের ভীতু-ভাবটা কেটে গেল।

"আমি ভাল লোক কিনা জানি না, তবে আমি যুক্তিকে অনুসরণ করতে ভালবাসি। যুক্তিকে অনুসরণ করতে ভালবাসি বলেই একটা অনুরোধ আপনাকে করছি, আশা করি তা আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন না।"

"নিশ্চয় না। কি বলুন"

"আপনি চলুন আমার সঙ্গে মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরীতে। আর একটা কথাও বলছি, ক্ষমা করবেন, আপনি এতক্ষণ যা বললেন তা এমনই অদ্ভুত যে আমার স্ত্রীর মুখ থেকে তার সমর্থন না পাওয়া পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছি না"

হঠাৎ ব্রজেশ্বরবাবুর মুখভাব ঈষৎ কঠিন হয়ে উঠল।

"বেশ তো"—সুশোভন হেসে উত্তর দিলে বটে, কিন্তু তার হাসিটা কাষ্ঠ-হাসির মতো দেখালো—"বেশ, চলুন যাই আপনার সঙ্গে"

"দেখুন সুশোভনবাবু, আপনি যা বললেন তার সঙ্গে সান্ত্বনাদেবীর বর্ণনা যদি না মেলে অর্থাৎ আমি যদি বুঝতে পারি যে আপনি জোর করে' তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সহৃদয়তার সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছেন, তাহলে হয়তো হঠাৎ আমি মধ্যযুগীয় হয়ে পড়ব অর্থাৎ আপনাকে নাগালের মধ্যে পেলে খুশী হব"

"ভয় নেই পালাব না আমি, কারণ একটি কথাও আমি গোপন করি নি"

"ধন্যবাদ। এ ব্যবস্থায় আপনার আপত্তি নেই জেনে সুখী হলাম"

"কিছু আপত্তি নেই। কিন্তু একটা কথা আছে। আমার স্ত্রী এবং শ্বশুর-বাড়ীর লোকদের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে আমার স্ত্রীকেও আমি তুলে নিতে পারি আমাদের সঙ্গে। আমার স্ত্রী হয় তো বেঁকে দাঁড়াবে প্রথমটা, যেতে চাইবে না, কারণ আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ নানা কথা বলে' এতক্ষণ তাকে হয় তো এমন করে' তুলেছেন যে"—

"আপনার শাশুড়ী ঠাকরুণ কি সব ঘটনা জানেন?"

"এখনও জানেন না। কিন্তু জেনে ফেলবেন"

"আমার মনে হয় যতক্ষণ না আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একা দেখা করছেন ততক্ষণ তাঁকে, মানে আপনার শাশুড়ী ঠাকরুণকে, ব্যাপারটা পুরোপুরি জানতে না দেওয়াই ভালো"

"তাতো বুঝছি। কিন্তু ঠেকাব কি করে"

"বলছি। আমি একজনের কাছ থেকে খবর পেয়ে তবে এখানে এসেছি, তা না হলে তো আমি এখানে আসতামই না। এখন বুঝতে পারছি তিনি অপর কেউ নন, তিনি আপনাদের বন্ধু সদারঙ্গবিহারীলাল"

"ও, সেই বাক্যবাগীশ লোকটা—

"আপনার স্ত্রী এবং শাশুড়ীর সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। তা যদি হয়ে থাকে তাঁরা হয়তো নানা রকম সন্দেহ করছেন আপনার সম্বন্ধে। আমাদের ধরে' নেওয়াই বোধ হয় ভালো—যে তাঁরা শুনেছেন সব এবং তদনুসারে চলা উচিত"

"কি করে'?"

"মানে, সত্যকে যদি একটু—"

"তাতে আমার আপত্তি নেই। শাশুড়ীকে ভাঁওতা দেবার জন্যে অনর্গল মিছে কথা বলতে রাজি আছি আমি। কিন্তু তাঁকে আপনি চেনেন না। একটি 'চীজ' যাকে বলে। সহজে তাঁকে বাগানো যাবে বলে' মনে হয় না। অথচ সত্যি কথাও বলা যাবে না, তাতে ভয়ানক বিপদ। আপনি যেমন ভদ্রভাবে ব্যাপারটা নিলেন, উনি তেমনভাবে নেবেনই না। আমি অবশ্য আপনাকে আমার জন্যে মিছে কথা বলতে অনুরোধ করতে পারি না, নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু মানে—"

ব্রজেশ্বরবাবু তড়াক করে' উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। তড়াক করে' ওঠাটা ব্রজেশ্বরবাবুর মতো লোকের পক্ষে বেমানান একটু। মনে হল কোন প্রয়োজনীয় ব্যাপার যেন ভুলে গিয়েছিলেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তাঁর মুখের ভাবও বদলে গেল। কণ্ঠস্বরে নূতন সুর বাজল একটা।

"দেখুন সুশোভনবাবু, অত্যন্ত ভীত হয়ে আমি এই হোটেলে ছুটে এসে-ছিলাম। মনে হয়েছিল আবার বুঝি নূতন আর একটা বিপদ ঘনিয়ে এল। সান্ত্বনার সুনামের চেয়ে প্রিয়তর আমার আর কিছু নেই। সে সুনাম ইতিপূর্ব্বে একবার বিপন্ন হয়েছিল। আপনাকে অবশ্য ধন্যবাদ দেওয়ার বিশেষ কিছু নেই যদিও আপনি আপনার দিক দিয়ে সে সুনাম রক্ষা করবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন

কিন্তু বিপদ এখনও কাটে নি এবং সেটুকু কাটাবার জন্যে যে কোনও উপায় অবলম্বন করতে আমি পশ্চাৎপদ হব না—তা সে 'সু' 'কু' যাই হোক—"

"বাঃ, চমৎকার! আমি যে জটটা পাকিয়ে ফেলেছি, বিশ্বাস করুন, তার জন্যে অত্যন্ত দুঃখিত আমি। কিন্তু এ-ও বিশ্বাস করুন সে জট ছাড়াতে প্রাণপণে সাহায্যও আমি করব আপনাকে"

ব্রজেশ্বরবাবু কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। তিনি বললেন, "বেশ, আপনি তাহলে আপনার স্ত্রীকে বুঝিয়ে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন। তাঁর সঙ্গে কে কে থাকবেন আশা করেন"

"শাশুড়ী তো থাকবেনই, শ্বশুরও হয়তো আছেন। শ্বশুর মশাই লোক ভালো, তিনি কোনও গোলমাল করবেন না, কিন্তু শাশুড়ীকে সামলানোই মুস্কিল।"

"তাঁকে আমি সামলাব"

"ও তাহলে তো বেঁচে যাই। টেলিফোনে আমি যা শুনলাম তাতে তো তাঁদের এতক্ষণ এখানে এসে পড়া উচিত ছিল। কি ভাবে 'প্রসিড্' করব তা আগে থাকতে একটু ঠিক করে' নিলে হত না?"

ব্রজেশ্বরবাবু সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন।

গম্ভীরভাবে তিনি বললেন, "একটু চায়ের চেষ্টা করা যাক আগে"

"ঠিক বলেছেন"

(২৩)

"এই সেই জায়গা"—স্বয়ম্প্রভা চেঁচিয়ে উঠলেন এবং ড্রাইভারের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে নিজের বেঁটে ছাতার বাঁট দিয়ে মোটরের জানলার কাচে আঘাত করতে লাগলেন।

"থামাও, থামাও গাড়ি, এই ড্রাইভার, শুনতে পাচ্ছে না, না কি। থামতে বল ওকে, ঘুমুচ্ছ না কি তুমি—"

জিতুবাবু ঢুলছিলেন। চমকে উঠে অপ্রস্তুত মুখে বললেন, "কতদূর এলাম আমরা, ঢুল ধরেছিল একটু"

"ফৎমোরংপুর। নাব"—বেশ ঝেঁঝে জবাব দিলেন স্বয়ম্প্রভা।

জিতুবাবু অবিশ্বাসভরে ড্রাইভারের দিকে চাইলেন।

"আমরা এসে গেলাম নাকি"

ড্রাইভারও ঠিক করতে পারছিল না কিছু। হোটেলের মতো কি একটা সে এই মাত্র অতিক্রম করে' এল। পিছন দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে সেই দিকেই চাইতে লাগল সে।

জিতুবাবু আবার জিগ্যেস করলেন, "আমরা এসে গেলাম নাকি"

"তাই তো মনে হচ্ছে"

"বেশ দূর আছে তো। সেই কখন চড়েছি—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দূর আছে বই কি। যতটা আন্দাজ করেছিলাম তার চেয়েও দূর"

"বাংলা দেশ পার হয়ে এলাম না কি"

"আজ্ঞে প্রায় তাই বটে। রাস্তাও দারুণ খারাপ"

"কি কাণ্ড"—অস্ফুট কণ্ঠে বললেন জিতুবাবু।

"তুমি নাববে কিনা"—ধমকে উঠলেন স্বয়ম্প্রভা এবং অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে চাইলেন ভর্তার দিকে।

"নাবব, কিন্তু একটু সবুর কর। ড্রাইভার গাড়ি ব্যাক করবে এখুনি। ওহে, গাড়িটা ব্যাক করে' ওই হোটেলটার সামনে নিয়ে চল। নাবছি, একটু সবুর কর না। গাড়ি ব্যাক করার সময় নাবতে গিয়ে একজনের পা ভেঙে গিয়েছিল আমি জানি।"

"তা তো জানবেই। যত সব উজবুক গাড়োলের খবরই তো রাখ তুমি"

স্বয়ম্প্রভার চোখের দৃষ্টি থেকে আর এক ঝলক আগুন নির্গত হল।

"দেখে দেখো"—জিতুবাবু ড্রাইভারকে বললেন—"আর একখানা মোটর রয়েছে। ধাক্কা মেরো না যেন"

ড্রাইভার নানা রকম কৌশল করে' অবশেষে গাড়িটা ব্রজেশ্বরবাবুর মোটরের পিছনে এনে লাগালে। স্বয়ম্প্রভা অবতরণ করলেন এবং নাক কুঁচকে এমনভাবে নিশ্বাস টানতে লাগলেন যেন তাঁকে আস্তাকুড়ের মাঝখানে নাবিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনীতাও নাবল। জিতুবাবু ড্রাইভারকে কি যেন বলছিলেন। বলতে বলতে ভীতভাবে একবার স্ত্রীর দিকে চাইলেন। ব্যাপারটা বুঝতে স্বয়ম্প্রভার দেরী হ'ল না।

"কি? থাকতে চাইছে না ও? আচ্ছা, আমি ওর সঙ্গে কথা কইছি। গাড়ি থেকে ব্যাগটা নাবিয়ে নাও, আর তুমি দয়া করে' সরে' থাক একটু"

দৃঢ় পদবিক্ষেপে স্বয়ম্প্রভা এগিয়ে গেলেন মোটরের দিকে এবং সম্মুখ সমরে আহ্বান করলেন ড্রাইভারকে।

জিতুবাবু সরে' এসে ঘাড় উঁচু করে' হোটেলের সাইনবোর্ডটা পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। অনীতা হোটেলের কপাটটা খোলা দেখে ঢুকে পড়ল ভিতরে। ভিতরে বাঁহাতি একটা ঘর, তার কপাটটাও খোলা। ঘরে ঢুকেই কিন্তু চেঁচিয়ে উঠল সে, পিছন থেকে কে যেন জড়িয়ে ধরল তাকে। ঘাড় ফিরিয়ে, দেখে সুশোভন।

"তুমি! ওঃ—" সুশোভনের ঘাড়ে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

"বস, বস, লক্ষ্মীটি—এই চেয়ারটায় বস। ক্লান্ত হয়ে পড়েছ নিশ্চয়ই, যা রাস্তা। একটু জিরিয়ে নাও আগে, তারপর সব বলছি। চা আনাব?"

"না, তুমি বস। কোথাও যেও না তুমি"

"ও, আচ্ছা—"

পিছনের দিকের কপাটটি সন্তর্পণে ঠেলে দীর্ঘাকৃতি ব্রজেশ্বরবাবু ঢুকলেন। ঢুকেই বেরিয়ে গেলেন।

"উনি কে"—চোখ বড় বড় করে' জিগ্যেস করলে অনীতা।

"ব্রজেশ্বরবাবু। আমাদের বন্ধু একজন। উনিও প্যাঁচে পড়েছেন। ওঁর স্ত্রীই তো ষ্টেশনে কলার খোলায় পা পিছলে পড়ে যান এবং তাঁকে তুলতে গিয়েই তো ট্রেনটা ছেড়ে গেল। ছি, ছি, কি কাণ্ড"—একটু থেমে—"রাগ করেছ তো খুব?—"

অনীতার রাগ আর ছিল না। মুখে বরং হাসি ফুটেছিল। যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সুশোভনকে জড়িয়ে কত কথাই না সে ভাবছিল তার স্বামীর সঙ্গে সুশোভনের বন্ধুত্বও যখন অক্ষুণ্ণ আছে তখন ভাববার কিছু নেই।

পিছনের দরজায় দু' তিনটি টোকা শোনা গেল। সুশোভন উঠে গেল এবং দরজা খুলে বললে, "আসুন না আপনি ভিতরে, অনীতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই"

"না, আমি জিগ্যেস করতে এসেছি, চা আনাব কি?"

"সে সব পরে হবে এখন ভিতরে আসুন"

ব্রজেশ্বরবাবু ভিতরে এলেন। অনীতা দাঁড়িয়ে উঠল। নমস্কার বিনিময় হল। কি বলবেন ভেবে না পেয়ে স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন ব্রজেশ্বরবাবু। বাম ভ্রূটা ঈষৎ লাফিয়ে উঠল একবার।

"ও! তুমি এখনও এখানে আছ"

স্বয়ম্প্রভা দ্বারপ্রান্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং বরবপু দিয়ে সমগ্র দ্বার-পথটা প্রায় অবরুদ্ধ ক'রে পরিস্থিতিটা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করছিলেন। মনে হচ্ছিল হাতে একটা বায়নাকুলার থাকলে আরও যেন মানাত। তাঁর গাম্ভীর্য কিন্তু অটুট রইল না, মনে হল পিছন থেকে কেউ ঠেলছে তাঁকে।

সুশোভন এগিয়ে এল তাড়াতাড়ি।

"হ্যাঁ। আপনারা আসছেন খবর পেয়ে ফিরে এলাম আবার এখানে। আপনারা এসে পড়েছেন খুব ভাল হয়েছে, এমন আনন্দ হচ্ছে আমার। আসুন পরিচয় করিয়ে দিই। ইনিই অধ্যাপক ব্রজেশ্বরবাবু—আমার একজন বন্ধু—"

স্বয়ম্প্রভা দু'পা এগিয়ে এলেন এবং গম্ভীরভাবে দায়-সারা-গোছ নমস্কার করলেন একটা।

"বাবা কোথায় গেলেন, তাঁর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দি এঁর"

"ভিতরে এস না তুমি, বাইরে কি করছ"—আদেশ করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"ঢুকতেই পারছি না যে। সর একটু"

স্বয়ম্প্রভা পথ করে' দিতে জিতুবাবু ভিতরে প্রবেশ করলেন।

"কপাট বন্ধ করে' দাও"

"দিচ্ছি দিচ্ছি"

স্বয়ম্প্রভা ব্রজেশ্বরবাবুর দিকে ফিরে বললেন—"ইনি আমার স্বামী"

ব্রজেশ্বরবাবু নমস্কার করলেন।

সুশোভন অনীতার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

"গোড়াতেই একটা কথা জানিয়ে দেওয়া দরকার"—সুশোভন বললে—"যে মহিলাটির সঙ্গে হাওড়া ষ্টেশনে আমার দেখা হয়েছিল এবং যাঁর জন্যে শেষ পর্য্যন্ত আমাকে ট্রেন ফেল করতে হল তিনি এই ভদ্রলোকটির স্ত্রী"

এই সংবাদে স্বয়ম্প্রভা একটু মুষড়ে পড়লেন যেন। কি ভাষায় সুশোভনকে তিনি আক্রমণ করবেন তা এতক্ষণ মনে মনে ভাঁজছিলেন। অনেকগুলি তীরই সুশাণিত করে' রেখেছিলেন তিনি, কিন্তু এই কথা শুনে সব যেন গুলিয়ে গেল তাঁর।

"সুশোভনবাবুর স্ত্রী যে কত অসুবিধায় পড়েছিলেন তা আমি শুনেছি। এ জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং লজ্জিত"—এই কথাগুলি উচ্চারিত হল ব্রজেশ্বরবাবুর মুখ থেকে। আড়চোখে একবার অনীতার দিকে চেয়ে একটু থেমে এবং ঈষৎ হেসে আবার বললেন তিনি—"আমার দিক দিয়ে অবশ্য খুবই সুবিধা হয়ে গিয়েছিল, উনি সান্ত্বনাকে মোটর করে' নিয়ে এসেছিলেন। সুশোভনবাবু ট্রেন ফেল করে' একটা ট্যাক্সি ভাড়া করেছিলেন—সময় মতো যাতে গিয়ে

পড়তে পারেন, মিসেস নন্দী যাতে অপরিচিত স্থানে গিয়ে অসুবিধায় না পড়েন। আমি পরে আর একটা মোটরে এঁদের অনুসরণ করি"

সুশোভন সবিস্ময়ে চেয়েছিল। এই মার্জ্জিত মিথ্যুকটি শুদ্ধ সংক্ষিপ্ত ভাষায় ব্যাপারটাকে বেশ গুছিয়ে এনেছেন তো। অনীতার চোখ মুখ দিয়েও আনন্দের আভা ফুটে বেরুচ্ছিল। জিতুবাবুও অস্ফুট ভাঙা-ভাঙা জোড়া-তালি লাগানো বাক্যাবলীর দ্বারা নিজের সন্তোষ প্রকাশ করছিলেন। স্বয়ম্প্রভা বাম হস্ত উত্তোলন করে' নীরব করে' দিলেন তাঁকে এবং ফোঁস করে' নিশ্বাস টেনে নিলেন সক্ষোভে।

"ও। কিন্তু একটা কথা আমার মাথায় ঢুকছে না। আপনার স্ত্রী আপনার সঙ্গে এলেন না কেন। তিনি তো অপেক্ষা করতে পারতেন একটু"

"নিশ্চয় পারতেন। অপেক্ষা করতে চাইছিলেনও, কিন্তু আমারই আসার ঠিক ছিল না যে। এসেম্ব্লীর ব্যাপারে আমাদের কংগ্রেসের পার্টি মিটিং হবার কথা ছিল একটা, যদিও শেষ পর্য্যন্ত হল না সেটা"

"আপনিই কি বিখ্যাত কংগ্রেসকর্ম্মী অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে!"—জিতুবাবু সসম্ভ্রমে বলে' উঠলেন।

"হ্যাঁ, উনিই"—মাথা নেড়ে সমর্থন করলেন সুশোভন।

ব্রজেশ্বরবাবু বিনীত ভাবে নমস্কার করে' বললেন—"আমি বিখ্যাত কিনা জানি না, তবে আমি কংগ্রেসের একজন কর্ম্মী বটে, অধ্যাপনাও করে থাকি"

জিতুবাবু হঠাৎ কামিজের গলার বোতামটা লাগিয়ে নিয়ে বিস্ফারিত চক্ষে দেখতে লাগলেন লোকটিকে।

স্বয়ম্প্রভার চিবুক ও স্কন্ধযুগল অস্থির হয়ে উঠেছিল। "ও, আপনি বুঝি শুনলেন তারপর—যে আমার জামাইয়ের সঙ্গে আপনার স্ত্রী চলে এসেছেন"

ঘাড়টি ঈষৎ কাৎ করে' সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন ব্রজেশ্বরবাবু।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি এ খবর পেলাম পরে যে, পথে ওঁদের মোটরে কি একটা 'অ্যাক্সিডেন্ট' হয়েছে এবং ওঁরা এই হোটেলটায় এসে আশ্রয় নিয়েছেন। শুনে আমিও চলে এলাম একটা ট্যাক্সি নিয়ে"

"ভাগ্যে এসেছেন"—মৃদুকণ্ঠে বলতে হল স্বয়ম্প্রভাকে—যদিও সুশোভনের দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তিনি। সুশোভনের মনে হল তাঁর নাকের ডগাটা কাঁপছে। ঠাণ্ডায় না রাগে গবেষণা করতে লাগল সে মনে মনে।

"কি যে সব কাণ্ড"—জিতুবাবু বললেন—"তখনই বলেছিলাম আমি। হোটেলওলা কোথা ?"

"তিনি বেরিয়ে গেছেন। হোটেলে কেউ নেই"—সুশোভন বললে।

"কে একজন যে উঁকিঝুঁকি মারছিল"

"ও গোকুল। পাশে ওর তাড়ির দোকান আছে। ওকে বসিয়ে রেখে হোটেলের চাকরটা শুদ্ধ বেরিয়ে গেছে"

"কেন, কি করবে তুমি ওকে নিয়ে"—স্বয়ম্প্রভা চোখ পাকিয়ে জিগ্যেস করলেন জিতুবাবুকে।

"না, কিছু নয়। ওকে বলব ভাবছিলাম যে আমাদের কিছু চাই না"

"কি দরকার তা বলবার"

ব্রজেশ্বরবাবুর দিকে ফিরে তারপর স্বয়ম্প্রভা বললেন, "দেখুন মেয়েকে নিয়ে আমরা এমনভাবে এসে পড়লাম এখানে, কারণ আমরা খবর পেয়েছিলাম যে সুশোভন নাকি"—একটু ইতস্তত করে' থেমে গেলেন তিনি, ঠিক কথাগুলো মুখে জোগাল না। উপরের ঠোঁট দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে চেপে সামনের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

"আমাদের সঙ্গে আছেন ?"—ব্রজেশ্বরবাবু ধীরকণ্ঠে বাক্যটা সম্পূর্ণ করবার প্রয়াস পেলেন। স্বয়ম্প্রভা তথাপি নিরুত্তর হয়েই রইলেন। তিনি ঠিক কেন যে তাঁর মেয়েকে নিয়ে এতদূর ধাওয়া করেছেন তা এই শান্ত গম্ভীর লোকটির কাছে প্রকাশ করা উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে পড়ছিল।

সুশোভন নীরবতা ভঙ্গ করলে। সে আর আত্মসম্বরণ করতে পারছিল না। "এদের সঙ্গে থাকাটা কি গর্হিত বলে' বিবেচনা করছেন আপনি ?"

স্বয়ম্প্রভার ইতস্ততঃ-ভাবটা কেটে গেল।

"না, বাবা তা মনে করছি না। কিন্তু আমরা শুনেছিলাম যে তুমি নাকি অনীতাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আর একটি মেয়ের সঙ্গে ট্যাক্সি করে' চলে এসেছ এবং এখানে নাকি রাত কাটিয়েছ। কিন্তু মনে করো না বাবা, কিন্তু তোমার বিষয়ে যে সব কানাঘুসো শুনি তাতে এই খবর শুনে আমাদের—"

"ও"—সুশোভন এর বেশী আর বলতে পারলে না কিছু।

ব্রজেশ্বরবাবু বললেন—"যাক এখন আপনাদের ভুল ধারণাটা ভেঙে গেছে আশা করি। আমি এখন দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে যেতে চাই। সুশোভনবাবু যদি সস্ত্রীক সেখানে যেতে চান আমার মোটরে আসতে পারেন"

এই শুনে অনীতা বললে, "কিন্তু আমি কাপড়-চোপড় যে কিছু আনি নি। এ অবস্থায় সেখানে যাওয়া চলে কি"

"তাতে কি হয়েছে"—সুশোভন বললে—'ফোনে বলে' দিলে কাপড়-চোপড় কালই চলে আসবে। এক রাত্রে এমন আর কি এসে যাবে। কাপড়-চোপড় আনবার জন্যে এখন কোলকাতা ফিরে যাওয়া যায় না তো"

অনীতা সুশোভনের দিকে চেয়ে দেখলে একবার ভুরু কুঁচকে। মায়ের সঙ্গে আবার কোলকাতা ফিরে যেতে তারও ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে এক কাপড়ে যাওয়া যায় কি?

"ওপরে ক'খানা শোবার ঘর আছে"—হঠাৎ জিগ্যেস করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"দু'খানা"—সুশোভন জবাব দিল।

"নীচে থেকে দেখে তো মনে হয় না। খুব ছোট ঘর বুঝি"

"খুবই ছোট। শোবার খুব কষ্ট হয়েছে আমাদের"—ব্রজেশ্বরবাবু বললেন।

"হুঁ".

ওষ্ঠ দিয়ে অধরকে পুনরায় নিষ্পিষ্ট করতে লাগলেন স্বয়ম্প্রভা।

"আমাকে এবার যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। আপনারা যাচ্ছেন না তাহলে"—একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ব্রজেশ্বর।

"না আমাদের যাওয়া হবে না। অনেক ধন্যবাদ"—মৃদু হেসে জবাব দিলে অনীতা।

"আচ্ছা আমি তাহলে ওপর থেকে ঘুরে আসি"

ব্রজেশ্বরবাবু কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে ভিতরের দিকে চলে গেলেন।

"কোথা গেলেন উনি? দোতলায় উঠলেন মনে হচ্ছে"—স্থশোভনকে প্রশ্ন করলে অনীতা।

"দোতলার ভদ্রমহিলাটি কোথাও যেতে পারবেন না এখন। কাল রাত্রে তাঁর একেবারে ঘুম হয়নি, সমস্ত রাত বসে' কেটেছে। তিনি এখনই আবার মোটরে যেতে চাচ্ছেন না। তিনি ব্রজেশ্বরবাবুকে বলছেন—মোটরে করে' দিগ্বিজয়বাবুর কাছে গিয়ে একবার ঘুরে আসতে। একেবারে না গেলে বড় খারাপ দেখাবে। তাঁরা কোনও খবর তো পাননি, ভাবছেন হয়তো। উনি আজ জিরিয়ে কাল ওখানে যাবেন ঠিক করেছেন"

"সে মাগী এখনও আছে নাকি এখানে?"—প্রশ্ন করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"আছেন"

"আর তার স্বামী তাকে এখানে ফেলে যাচ্ছে?"

"উনিই তো ব্রজেশ্বরবাবুকে জোর করে' পাঠাচ্ছেন"—স্থশোভন উত্তর দিলে নিরীহভাবে।

"তেমন কিছু অসুখ হয় নি তাহলে"—অনীতা বললে।

"অসুখ তো হয় নি। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।"

"বিছানায় শুয়ে আছে?"

"হ্যাঁ"

স্থশোভনের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল একটা।

অনীতা হঠাৎ জিগ্যেস করলে—"আচ্ছা, দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে কে কে আছে"

"বিশেষ কেউ না। আমরা আর ব্রজেশ্বরবাবুরা। কেন?"

"ভাবছি, চল না হয় চলেই যাই তোমার সঙ্গে। ছোট একটা স্যুটকেসে আছে খানকয়েক শাড়ি, তাতেই না হয় চালিয়ে নেব কোনরকমে"

হঠাৎ মত বদলে ফেললে অনীতা। রাগ দুঃখ কিছু ছিল না তার আর। সুশোভন যে তাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসে না, এর প্রমাণ সে পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রজেশ্বরবাবুর স্ত্রীর সম্বন্ধে কথা বলার সময় তার মুখে একটু হাসির আভা ছড়িয়ে পড়বার মানেটা কি! না, চোখে চোখে রাখাই উচিত। ও ডাকিনীর কাছ থেকে যত শীঘ্র সম্ভব দূরে সরে' যাওয়া যায় ততই ভালো। এখানে আর একদণ্ড থাকা নয়।

জিতুবাবুরা যে গাড়িতে এসেছিলেন সুশোভন বেরিয়ে গিয়ে সেই গাড়ির ড্রাইভারকে গোপনে বলে' এল সে যেন তাড়া দিয়ে স্বয়ম্প্রভাকে নিয়ে চলে যায় এক্ষুণি। ক্রমাগত তাড়া দেয় যেন। ড্রাইভারের নিজেরই ফেরবার তাড়া ছিল, সুশোভনের কাছ থেকে কিছু বখশিস পেয়ে সানন্দে রাজি হয়ে গেল সে।

(২৪)

স্বামী সমভিব্যাহারে স্বয়ম্প্রভা দেবী বাইরের ঘরটাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মোটরের 'গিয়ার' বদলানো হ'ল, হর্ণও শোনা গেল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন। খানিকটা ধোঁয়া এবং ধূলো ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। সুশোভন আর অনীতাকে নিয়ে ব্রজেশ্বরবাবু মোটরে চলে গেলেন। চেয়ারটায় এসে বসলেন স্বয়ম্প্রভা। গুম হয়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। পরাজয়ের গ্লানিতে সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ। গ্লানিটা আরও তিক্ত হয়ে উঠল জিতুবাবুর মুখের দিকে চেয়ে। তাঁর বিরক্ত চোখ মুখ যেন নীরব ভাষায় বলছে—তখনই বলেছিলাম।

"হাসছ ?"—হঠাৎ প্রশ্ন করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"না তো"

"হাতের নখগুলোকে কামড়াচ্ছ কেন! কি যে মুদ্রাদোষ তোমার"

"দেখ সম্পু, আর মন খারাপ করে' লাভ নেই। বরং যা হয়েছে তাতে আমাদের আনন্দিতই হওয়া উচিত"

"কে মাথা খারাপ করছে"

"সুশোভন ছেলেটি যে ভালো এ আমি বরাবরই জানি, কিন্তু তোমার ধারণা ঠিক উলটো। তোমার ধারণা যে ভুল তাতো প্রমাণ করেছি, এইবার বাড়ি চল"

"তুমি প্রমাণ করেছ? আমি না জোরে করলে কি তুমি বাড়ি থেকে নড়তে?"

"বাজে ব্যাপারে অনেকখানি সময় নষ্ট হয়েছে এবার বাড়ি চল"

"আমি একটু চা খাব"

"তাহলে তো ওই গোকুল না কে—তারই শরণাপন্ন হতে হয়। তাড়ির দোকানে চা-ও বিক্রি করে হয়তো। দেখি—"

"এই ছুতোয় তুমি গিয়ে আবার যেন তাড়ি খেও না"

"আমার একটা কিছু খাওয়ার দরকার কিন্তু। শরীর আর বইছে না। এখানে 'বিয়ার' পাওয়া যাবে কি? তাড়ি জিনিসটাও অবশ্য খারাপ নয়—"

"তুমি কি আপিসে ঘণ্টায় ঘণ্টায় 'বিয়ার' খাও নাকি!"

"জিনিসটা খারাপ নয়। প্রস্রাব সরল রাখে"

"লজ্জা করে না তোমার!"

"লজ্জার কি আছে এতে"—মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন জিতুবাবু—"দেখি, চা পাওয়া যায় কি না—"

প্রজ্বলিত-দৃষ্টি জিতুবাবু বেরিয়ে গেলেন।

স্বয়ম্প্রভা চেয়ারে ঠেস দিয়ে চোখ বুজলেন, মনে হল যেন প্রার্থনা করছেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই চোখ খুলতে হল। রাস্তায় 'মেশিন্ গান্' এর শব্দ!

"আরে তুমি"

"আরে বাঃ"

জিতুবাবু এবং সদারঙ্গবিহারীলালের কণ্ঠস্বর যুগপৎ ধ্বনিত হয়ে উঠল।

"সম্পুও পাশের ঘরে মজুত"—জিতুবাবু বলছেন স্বয়ম্প্রভা শুনতে পেলেন। 'মজুত'—আহা কথা বলবার কি শ্রী, মনে হল তাঁর। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হ'ল ঈষৎ।

"তুমি এখানে হঠাৎ। কি মনে করে'? এস ভেতরে এস" সোজা হয়ে বসে' সদারঙ্গবিহারীলালকে আহ্বান করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"আমি কিন্তু এখানে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না মশাই। যেতে হয়তো চলুন, আর আপনাদের দেরী থাকে তো ভাড়া মিটিয়ে দিন আমার"

ড্রাইভার জিতুবাবুকে বললে।

"এক্ষুণি যাব আমরা। একটু সবুর কর"—জিতুবাবু মৃদু হেসে বললেন।

"নিশ্চয় সবুর করবে। তাড়া দিতে মানা কর ওকে। আস্পর্দ্ধা তো কম নয়। ওকে আমরা ভাড়া করে' এনেছি, কাজ শেষ করে' যাব। ওয়েটিং চার্জ যা লাগে তা দেওয়া যাবে। তারপর সদারঙ্গ, তুমি এখানে এলে কোথা থেকে"

সদারঙ্গবিহারীলাল হেঁট হয়ে প্রণাম করলেন। স্বয়ম্প্রভা সম্পর্কে তাঁর দিদি হন।

"আপনিও এখানে! যাচ্চলে—বাঃ—আরে রাম রাম—কল্পনাতীত মানে—বাঃ"

"শ্‌ শ্‌—শ্‌ শ্‌—আস্তে—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই"—জিতুবাবুর গলা শোনা গেল বাইরে, ড্রাইভারকে শান্ত করছেন।

"তুমি এখানে এলে হঠাৎ যে"—পুনরায় প্রশ্ন করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"আমি? অনেকক্ষণ আগেই আসা উচিত ছিল আমার। বাইকটাই গড়বড়িয়ে দিলে! মিঠ্ঠু যে কেমন করে' সারালে তা জানি না। একটা না একটা ট্রাবল লেগেই আছে। আজকেরটা বোধহয় স্প্রোকেট্‌স্ (Sprokets) গুলোর দরুণই প্রধানত। ম্যাগ্‌নেটোর ভিতর কিছু তেলও ঢুকেছিল।

ম্যাগ্নেটোতে তেল ঢুকলেই বাস। সমস্ত খুলে সাফ করতে হল। তারপর থেকে ক্রমাগত লাফাচ্ছি। এমন এক একটা জার্ক দিচ্ছে—”

“বাইকের কথা থাক। এখানে কেন এসেছ—তাই বল”

ড্রাইভারের গলা আবার শোনা গেল।

“ভাড়া করেছেন বলে' কি সমস্ত দিন থাকতে হবে না কি। মোটর কি আপনার নিজের—”

“আরে চেঁচাচ্ছ কেন বাপু। সম্পূ আমরা কতক্ষণ আর—”

“ভেতরে এস। কপাট বন্ধ করে' দাও”

“ও কেবল জানতে চাইছে আমরা কতক্ষণ—”

“তুমি ভেতরে এস। কপাট বন্ধ করে' দাও”

“আসছি। এখুনি আসছি”—ড্রাইভারকে আশ্বাস দিয়ে জিতুবাবু ঘরে ঢুকলেন।

“দেখুন, কিন্তু একটা কথা, আমি আপনাদের আটকাচ্ছি না তো! না, না, তার দরকার নেই মোটেই—যাই হোক, আটকাতে চাই না। আমি আর একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। আপনাদের সঙ্গে দেখা হওয়াটা বিনা মেঘে বজ্রপাত গোছ—মানে, প্রায় অ্যাটম্ বম্—”

“কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে তুমি”—স্বর্ণপ্রভা জিজ্ঞেস না করে' পারলেন না।

“দেখা করতে, মানে, অকপটে বলতে গেলে খোঁজেই এসেছিলাম। একটি ভদ্রলোককে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ অদ্ভুত গোছের মনে হচ্ছে। ভদ্রলোকটির সঙ্গে রাউতপুর স্টেশনে আলাপ হল। এই হোটেলেই পরশু রাত্রে আর একজন ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী এসেছিলেন, আমার সঙ্গে তাঁদেরও আলাপ হয়েছিল। তাঁদের কথা প্রথম ভদ্রলোককে বলতেই তিনি কেমন যেন হয়ে গেলেন; তারপর চট্ করে' একটা মোটর ভাড়া করে' ঊর্দ্ধশ্বাসে এইদিক পানে বেরিয়ে এলেন। তাঁরি পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি, হয় তো

তাঁকে এমন কিছু বলে' থাকব যা হয় তো বলা উচিত ছিল না। একটু কেমন যেন গোলক ধাঁধা-গোছ লাগছে। শুনবেন ব্যাপারটা, যদি অবশ্য আপনাদের যাবার তাড়া না থাকে"

শুনব বই কি। যাবার কিছু তাড়া নেই"—স্বয়ম্প্রভার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে এসেছিল—"ওগো, তুমি ব'স না। জানলার দিকে হাত নাড়ছ কেন—"

"ড্রাইভারটা জানলার কাছে এসেছে"

স্বয়ম্প্রভার নাসারন্ধ্র থেকে ঘোঁৎ করে' একটা শব্দ বার হল। উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

"ভয়ে ভয়েই সমস্ত জীবনটা কাটল তোমার"—এই কথাগুলি বলে' ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। দু'মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলেন। ড্রাইভার নিজের সীটে গিয়ে বসতে পথ পেল না। কেঁচো হয়ে গেল একেবারে নিমেষের মধ্যে।

"এইবার বল"—স্বয়ম্প্রভা সদারঙ্গবিহারীলালকে আদেশ করলেন।

···কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই ড্রাইভারের আত্মসম্মান প্রবুদ্ধ হল আবার। লজ্জাও হল একটু। ছি, ছি, সামান্য একটা মেয়েমানুষের ধমকে ঘাবড়ে গেল সে। নেবে বুকটা একটু চিতিয়ে আবার এগিয়ে গেল সে জানলার দিকে।

···স্বয়ম্প্রভা ঈষৎ ঝুঁকে সদারঙ্গবিহারীলালের কথা শুনছিলেন। স্মিতমুখে একাগ্র দৃষ্টিতে এমনভাবে চেয়েছিলেন তিনি, মনে হচ্ছিল যেন কোন অপরূপ আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করছেন। শুধু প্রত্যক্ষ করছেন না, যেন উপভোগও করছেন সেটা।

জিতুবাবু টেবিলের এক কোণে বসে' নিরুপদ্রবে নিবিষ্টচিত্তে নখ কামড়াচ্ছিলেন। সদারঙ্গবিহারী বক্তৃতা করে' চলেছিলেন। হঠাৎ স্বয়ম্প্রভা থামিয়ে দিলেন তাঁকে।

"বুঝেছি। তুমি উপরে গিয়ে দেখে এস কেউ আছেন কি না, আর যদি থাকেন, তিনি তোমার সেই সান্ত্বনা দেবী কি না"

সদারঙ্গ একটু আমতা আমতা করে' বললেন, "একজন ভদ্রমহিলার ঘরে উঁকি দেওয়াটা কি ঠিক হবে—মানে—"

"বাজে কথা বোলো না, যা বলছি কর। যাও, দেখে এস"

সদারঙ্গ তাঁর কোটের গলার বোতামটা খুললেন, আবার লাগালেন। আবার খুললেন।

"করছ কি তুমি, যাও না"

"অন্য কোনও উপায়ে যদি"

অনন্যোপায় সদারঙ্গবিহারীকে যেতে হল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে উপরের যে ঘরটিতে গোঁসাইজির অসুস্থা গুরু-ভগ্নীটি হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন সেই ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। বন্ধদ্বারে সন্তর্পণে টোকা দিলেন একবার। ভিতর থেকে যে ধরণের শব্দ এল তাতে ভীত হয়ে পড়লেন তিনি। ভব্যতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ল তাঁর পক্ষে। জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন।

...যাবার সময় সদারঙ্গবিহারীলাল ঘরের দ্বারটি ঈষৎ খুলে রেখে গিয়েছিলেন। সেই দ্বার-পথে সাহস করে' ড্রাইভারটি এসে ঢুকল। দ্বারের দিকে পিছন ফিরে বসেছিলেন বলে স্বয়ম্প্রভা দেখতে পেলেন না। ড্রাইভারটি কথা বলিতে যাচ্ছিল এমন সময় দাম্পত্যালাপ সুরু হয়ে গেল। ড্রাইভার কথা না বলে' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল সব।

"শুনলে তো এইবার? বলেছিলাম না?"

"ও সব আমি বিশ্বাস করি না। আমি ফিরে যাচ্ছি—"

"ফিরে যাচ্ছ? আমি কিন্তু যাব না। আমি মুচুকুণ্ডতে যাব"

"পাগল নাকি! সেখানে কি এমন ভাবে যাওয়া যায়—"

"খুব যায়"

"যাও তাহলে। আমি ফিরে যাচ্ছি। সদারঙ্গ সমস্ত ব্যাপারটা জানে না, কি বুঝতে কি বুঝেছে, কি বলতে কি বলেছে, ওর মধ্যে আমি আর নেই"

"পুরুষ মানুষ হয়ে একথা বলতে লজ্জা করে না তোমার ? একটা লম্পটের হাতে নিজের মেয়েকে ফেলে পালিয়ে যাবে তুমি ? যেতে চাও যাও, আমি যাব না"

"সুশোভন যে লম্পট তা এখনও প্রমাণিত হয়নি। আর তোমার ওই সদারঙ্গবিহারীও যে অভ্রান্ত যুধিষ্ঠির একথাও মানতে রাজি নই আমি। নিশ্চয়ই কোথাও কোন গোলমাল আছে তাই ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না"

"সেই গোলমালটা যে কি—তাই জানতেই তো মুচুকুণ্ডু যেতে চাইছি"

"সে ধীরে সুস্থে পরে জানা যেতে পারে, তার জন্যে একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে হুড়মুড় করে' যাওয়ার দরকার নেই"

"আছে"

"কি যে পাগলের মতো করছ তুমি সম্পু"

"পাগল আমি নই, পাগল তুমি। শুধু পাগল নও—পাষাণ। বাপ হয়ে মেয়েকে এমন ভাবে একটা গুণ্ডার হাতে ফেলে পালাতে পার"

"ছি ছি অত চেঁচিও না, লোকে বলবে কি"

"লোকের বলার কি হয়েছে এখন। যখন ঢিঢিক্কার পড়ে যাবে তখন শুনতে পাবে"

"ছি ছি কি করছ তুমি সম্পু! আচ্ছা, এখন ওই দিগিন্দ্রবাবুর ওখানে গিয়ে কি করতে চাও তুমি শুনি"

"আমি অনীতাকে বলতে চাই যে তার স্বামী ওই ব্রজেশ্বরবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে একঘরে এক বিছানায় রাত কাটিয়েছে। আমি অনেক কিছু করতে চাই সেখানে গিয়ে। আমি সুশোভনের সঙ্গে দেখা করতে চাই, ব্রজেশ্বরবাবুর সঙ্গেও বোঝাপড়া করতে চাই। ওপরের ঘরে যিনি আছেন তিনি যদি ব্রজেশ্বরবাবুর স্ত্রী না হন—খুব সম্ভবত নন—তাহলে ব্রজেশ্বরবাবুর সঙ্গেও দেখা করতে চাই। এদের আমি বুঝিয়ে দিতে চাই যে যদিও আমরা আমাদের মেয়েকে ভুল করে' একটা পাষণ্ডের

হাতে দিয়ে ফেলেছি, কিন্তু সব কথা জানবার পর আর আমরা তাকে তার কাছে থাকতে দেব না”

“কি করে' যাবে তুমি মুচকুন্দপুরে?”

“ওই মোটরে। ওই ড্রাইভারই নিয়ে যাবে”

“না আমি যাব না”—নাটকীয়ভাবে বলে' উঠল ড্রাইভার দ্বারপ্রান্ত থেকে।

স্বয়ম্প্রভা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন এবং তড়াক্ করে উঠে দাঁড়ালেন। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হল', অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটতে লাগল চোখের দৃষ্টি থেকে।

“আমাদের কথা দাঁড়িয়ে শুনছিলে তুমি?”

“শুনছিলাম”

তারপর জিতুবাবুর দিকে ফিরে সে বললে—“আপনি যদি আমার সঙ্গে আসতে চান আসুন। আমি এখুনি ফিরে যাচ্ছি”

জিতুবাবু কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়লেন।

“সম্পু, ব্যাপারটা ভেবে দেখ, বুঝলে—”

“যাও না তুমি। যাও! ব্যাগটা রেখে চলে যাও”

“না, না, আমি যেতে চাইছি না—কিন্তু—”

“হ্যাঁ, তুমি যেতেই তো চাইছ, তাই তো বলছিলে এতক্ষণ। যাও, আমাকে ফেলে রেখে চলে' যাও”

“সম্পু, দেখ আমি—”

“আমি মোটর ষ্টার্ট করছি মশাই। এত ফৈজৎ বরদাস্ত হয় না আমার—”

হঠাৎ মনস্থির করে ফেললেন জিতুবাবু।

“বেশ, আমি চললাম তাহলে—”

দ্বারপ্রান্তে একটু ইতস্তত করলেন ভদ্রলোক। গোঁফ ঝুলে পড়েছে, সর্বাঙ্গে ধূলো, চোখে কাতর মিনতি। বড় করুণ দৃশ্য! স্বয়ম্প্রভা কিন্তু বিচলিত হলেন না। জিতুবাবুকে একাই চলে যেতে হল।

সদারঙ্গবিহারীলাল নেমে এলেন।

বললেন, "আমি যা আশঙ্কা করছিলাম তাই। বাঃ—এ যে অদ্ভুত মনে হচ্ছে—মানে"—তারপর একটু থেমে হাত দুটো ঘসে, হঠাৎ বলে উঠলেন—"ছি, ছি, যাচ্ছে-তাই"

"ওপরে কে রয়েছে দেখে এলে? সান্ত্বনাদেবী?"

"সান্ত্বনাদেবী তো নেই। একটি হাঁপানি রুগী রয়েছেন। আপনারা শুনতে ভুল করেন নি তো"

"ভুল? মোটেই না"

"ওকি, মোটরটা ষ্টার্ট করছে দেখছি। চলে যাচ্ছে নাকি"

"উনি ফিরে যাচ্ছেন"

"ও। আর আপনি?"

"আমি মুচুকুণ্ডু যাব। তোমাকেও যেতে হবে আমার সঙ্গে"

"মুচুকুণ্ডু? মানে, মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরী? দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে?"

স্বয়ম্প্রভা মাথা নাড়লেন।

সদারঙ্গ মাথা চুলকে বললেন, "কিন্তু দেখুন, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না সেখানে"

"আমারও করছে না"—দৃঢ়কণ্ঠে স্বয়ম্প্রভা বললেন—"কিন্তু মায়ের কর্ত্তব্য আমাকে করতেই হবে, তা সে যতই না কেন অপ্রিয় হোক"

"ও। কিন্তু আমাকে যদি বাদ দেন, ক্ষতি কি"

"তোমাকে যেতেই হবে। উনি তো আমাকে ফেলে চলে গেলেন। আমার প্রতি অনীতার প্রতি তোমারও তো একটা কর্ত্তব্য আছে। তা ছাড়া তোমার মুখেই খবর পেলাম যে কতবড় ধড়িবাজ ওরা। তুমিই হলে প্রধান সাক্ষী। তোমাকে যেতে হবে"

"চিঠি লিখে দিলে কিম্বা অন্য কোনও উপায়ে যদি—মানে—জনার্দ্দনবাবুকে কথা দিয়েছি ভোটগুলো জোগাড় করে দেব—হনুমানপুরটা সেরে ফেলেছি যদিও—"

"ওসব পরে কোরো। এখন যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের মুচকুন্দপুরে পৌঁছতে হবে। ওই দুটো লোক আমাকে ভাঁওতা দিয়ে অনীতাকে নিয়ে সরে পড়েছে। অনীতার বিপদ চরমে পৌঁছবার আগে আমাদের সেখানে পৌঁছতেই হবে, যেমন করে' হোক"

"পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল দেখছি। দেখুন, দিদি, মাপ করুন আমাকে, আমি, মানে, এসবে নিজেকে জড়াতে চাই না"

"এখুনি বললে ওই লোকটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আবার বলছ এসবে নিজেকে জড়াতে চাই না। বুঝলাম না ঠিক"

"ও ভদ্রলোক যে কে তা তো আমি জানতাম না। এখনও ঠিক জানি না। আমার বিশ্বাস হয় না যে সান্ত্বনা দেবী—না, এখন মনে হচ্ছে, আমি বোধ হয় আসলে সান্ত্বনাদেবীকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছিলাম। মনে হচ্ছে—"

"বুঝেছি। মেয়েটির যাদু করবার ক্ষমতা আছে দেখছি। বেশ, তাকে রক্ষা করাই যদি তোমার উদ্দেশ্য তা হলেও তো এই সুযোগ। কারণ, আমি তাকেও ছেড়ে কথা কইব না। তুমি যদি রক্ষা করতে চাও তাকে, চল আমার সঙ্গে"

সদারঙ্গবিহারীলাল গলার সাঁকিটায় হাত বুলোতে লাগলেন।

"বেশ"—তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাজি হয়ে গেলেন অবশেষে।

"তুমি কোথায় থাক এখানে"

"বেশী দূর নয়, পাঁচ মাইল হবে এখান থেকে"

"সেখানেই চল যাই আগে। সেখান থেকে একটা মটর ভাড়া করতে হবে। তারপর যাওয়া যাবে মুচুকুণ্ড"

সদারঙ্গ ঘাড় নাড়লেন। তিনি যেখানে থাকেন সেখানকার হালচাল বেশ ভালো ভাবেই জানা আছে তাঁর।

"কিন্তু অত দূরই বা আপনি যাবেন কি করে'। আমি তো হাঁটতে পারব না। একবার চেষ্টা করেছিলাম। ভয়ানক ক্লান্তিজনক। আপনি যাবেন কি করে'। হাঁটতে পারবেন কি"

"দরকার হলে আমি দৌড়তাম"—স্বয়ম্প্রভা বললেন—"কিন্তু এখন দৌড়েও যে কূল পাব না। দৌড়লেও দেরি হয়ে যাবে—"

ঘাড়টা বেঁকিয়ে রাস্তার দিকে চাইলেন তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে'—যেন শত্রুকে নিরীক্ষণ করছেন।

"তোমার পিছনে সেটা নেই ?"

"আমার পিছনে ? মানে ?"

ঘাড় ফিরিয়ে নিজের পিছন দিকটা দেখবার চেষ্টা করলেন সদারঙ্গ-বিহারীলাল।

"তোমার বাইকের পিছনে"

"ও, কেরিয়ার। হ্যাঁ, তা আছে একটা চলনসই-গোছ। আপনি তার উপর চেপে যাবেন বলছেন ? গড ! তাকি সম্ভব ? তা ছাড়া আমার বাইক মোটে, আড়াই হর্স পাওয়ার"

"তোমার বাড়ি পর্য্যন্ত যাব"

"কিন্তু সেটাও কি—"

"জিনিস-পত্র এখানেই থাক। রাত্রে এখানেই ফিরে আসব। চল। সময় নষ্ট করলে চলবে না"

"কিন্তু দিদি, শুনুন একটা কথা। সত্যি বলছি—"

"প্রতিবাদ কোরো না, যা ঠিক করে' ফেলেছি তা করবই, কথা বললে সময় নষ্ট হবে খালি। চল। বাইকে চড়। দাঁড়াও তোমার কোটটা খুলে দাও পেতে বসব তার উপর। দেরি করছ কেন, দাও"

সদারঙ্গ তাড়াতাড়ি কোটটা খুলে দিলেন।

বাইরে বাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন দুজনে।

"আমার কেরিয়ারটা তেমন বড়ও নয় তো, মানে—"

"চড়"—আদেশ করলেন স্বয়ম্প্রভা।

(২৫)

শাস্ত্রকারগণ ঠিকই ধরেছিলেন—স্ত্রীলোকেরাই শক্তি। ওঁরাই শক্তির ধারক বাহক—সব। পুরুষরা মাঝে মাঝে যে শক্তির পরিচয় দেন তা স্ত্রীলোকদের গর্ভোদ্ভূত বলেই সম্ভবত। তা না হলে পারতেন কিনা সন্দেহ। হলদিঘাটের যুদ্ধই বলুন আর ক্ষুদিরামের ফাঁসিই বলুন, আসল উৎস নারী।

স্বয়ম্প্রভা মোটর বাইকের পিছনে ঝুলতে ঝুলতে চলেছিলেন। এত কষ্ট স্বীকার করে' তিনি যে সুশোভন আর তার দলকে হাতে-নাতে ধরতে যাচ্ছিলেন তার কারণ এ নয় যে তারা ওঁকে একটু আগে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে। গোড়া থেকেই তিনি অনুমান করেছিলেন—অনুভব করেছিলেন যে সুশোভনকে বিয়ে করে অনীতা একটা গুণ্ডার ষড়যন্ত্রে পড়েছে। সেই গুণ্ডার দলকে তাড়া করে' ছত্রভঙ্গ করে' ছিন্নভিন্ন করে' উৎখাত করে' তবে তিনি থামবেন। তাদের দেখিয়ে দেবেন যে মেয়েমানুষ বলে' তিনি দুর্ব্বল নন এবং এ মুলুক মগের মুলুক নয়। সদারঙ্গবিহারীলালের মোটর বাইক মফঃস্বলের বন্ধুর রাস্তায় লাফাতে লাফাতে ছুটছিল। বাইকের ঝাঁকানিতে স্বয়ম্প্রভার বলিষ্ঠ-চোয়াল-সংলগ্ন মাংস-মেদ কাঁপছিল থল থল করে'। সমস্ত চোখে মুখে অদ্ভুত রকম ভয়ানক একটা দুর্দ্ধর্ষ শক্তির ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছিল। সদারঙ্গবিহারীর কোমরটা জাপটে ধরেছিলেন তিনি। এতে যে অসুবিধা বা অশোভনতার সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপও ছিল না তাঁর। যে কোনও মুহূর্ত্তে যে একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে সে আশঙ্কাও ছিল বলে' মনে হচ্ছিল না। একাগ্রচিত্তে একটি কথাই কেবল তিনি ভাবছিলেন—কেমন করে' কত শীঘ্র তিনি মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরীতে পৌঁছবেন। যদি কেউ

এরোপ্লেনে করে' উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে প্যারাস্থটে করে' তাঁকে সেখানে নাবিয়ে দিত, তাতেও তিনি রাজী হয়ে যেতেন সানন্দে।

···একটু আগে যে জন্তে ওরা হাত ফসকে পালিয়েছে তাতে এক হিসেবে লাভই হয়েছে বলতে হবে। ঝড়াং। ব্রজেশ্বর লোকটাকে চেনা গেল। ওদেরই দলের লোক নিশ্চয়। সান্ত্বনার স্বামী সেজে এসেছে, কিম্বা···ঝড়াং···ঝড়াং···। কিম্বা হয়তো সান্ত্বনাকে নিয়ে হাল্লা করে সবাই, আজকালকার মেয়েতো কিছুই বলা যায় না—

অনীতাকেও ওই রকম করতে চায়—ভোঁক্—ভোঁক্—উঃ ভাবা যায় না··· ঝড়াং···ভোঁ-ও-ও-ক্ ··মানুষের এত অধঃপতন হতে পারে!

হঠাৎ স্বয়ম্প্রভা উল্টে গেলেন বোঁ করে' এবং মুহূর্তের মধ্যে ডিগবাজি খেয়ে রাস্তার ধারে মাঠের মাঝখানে বসে' পড়লেন একটা ঝোপের ভিতর। কাঁটার ঝোপ। সামনে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা গরুর গাড়ি এসে পড়ায় এবং ধাক্কা বাঁচাবার চেষ্টা করায় এই কাণ্ড। গরুর গাড়িতে গোঁসাইজি, ফদকা, আর নিতাই বৈরাগী।

সদারঙ্গবিহারীলাল পড়ে' যান নি। তিনি গাড়ি থেকে নেবে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন ঝোপটার কাছে।

"ইস্! লাগেনি তো? ওই গরুর গাড়িটা, বুঝলেন। আনাড়ি গাড়োয়ান ষাঁড়ও আনকোরা সম্ভবত। লেগেছে?"

"না"

"যাক। কিন্তু ভারি দুঃখিত আমি। জোরে ব্রেক কসা ছাড়া উপায় ছিল না। দুরন্ত ষাঁড়"

"আমাকে তোল"

"কারও লেগেছে না কি গো"—গাড়ির গাড়োয়ান জিগ্যেস করলে রাস্তা থেকে।

"আমার হাতটা ধরে' নিজেকে একটু টেনে তোলবার চেষ্টা করুন। শক্ত বুঝতে পারছি, ঝোপে আটকা পড়ে' গেলে নিজেকে টেনে বার করা খুবই কঠিন। আমার অভিজ্ঞতা আছে। লাগেটাগে নি তো"

"না"—দাঁতে দাঁত চেপে স্বয়ম্প্রভা বললেন এবং নিজেকে টেনে তোলবার নিষ্ফল প্রয়াস করতে লাগলেন।

"ছি ছি—হ্যাঁ এই রকম—আবার করুন—হেঁইও—"

"জখম হল না কি কেউ গো"—গাড়োয়ান প্রশ্ন করলে আবার।

"না চোট টোট লাগেনি কারও। এইবার—হেঁইও হেঁইও—"

"না পারছি না। চুপ কর, হেঁইও হেঁইও কোরো না"

"ও আচ্ছা। সত্যি ভারি ইয়ে হ'য়ে গেল তো। ছি, ছি কি মুশকিলে পড়ে' গেলেন আপনি। একটু গুঁড়ি মেরে—হামাগুড়ি-দেওয়া-গোছ—পারবেন ?"

"না"

"কি করা যায় তাহলে। কোমরে টোমরে লাগে নি তো ? ব্যথা করছে কোথাও ? অনেক সময় প্রথমটা 'ফীল' করা যায় না। আচ্ছা এক কাজ করুন, আমার দুটো কাঁধের উপর ভর দিয়ে উঠতে পারবেন কি না দেখুন তো"

"না। দিক কোরো না আমাকে"

"ও আচ্ছা। আচমকা পড়ে গেলে অনেক সময় কিছু জোর পাওয়া যায় না —মানে নার্ভাস-গোছের হয়ে যেতে হয়—তা হয় নি তো"

"না"

"তবে ? কিছু একটা হয়েইছে নিশ্চয়। চেষ্টা করুন, পারবেন ঠিক উঠতে। উঠতে হবেই, কারণ একটা ঝোপের ভিতর আর কতক্ষণ বসে' থাকবেন। আমাকে একটু চেষ্টা করতে দিন না, আমি টেনে তুলে দি আপনাকে"

"থাম। কোথাও আটকে গেছি মনে হচ্ছে"

"আটকে ? ও, থামুন, বুঝেছি, 'জাম' হয়ে গেছে। এক মিনিট। টানাটানি করলে শাড়ি ছিঁড়ে যেতে পারে—দাঁড়ান। যন্ত্রটন্ত্র জাম হয়ে গেলে তার তলার

ঢিকটা বেশ করে' লুব্রিকেট করে' দিলে খুলে যাবে। অনেক সময়—কিন্তু আপনাকে—"

"তুমি চুপ কর। ওদিকে সরে যাও তুমি। আমি নিজেই ঠিক করে নিচ্ছি দূরে সরে' যাও। এদিকে দেখো না"

"ও, আচ্ছা, আচ্ছা। মহাবিপদে পড়া গেল তো! ছি ছি"—মুখ ঘুরিয়ে সদারঙ্গবিহারীলাল রাস্তার দিকে চাহিলেন।

"আরে গোঁসাইজি যে! নমস্কার, নমস্কার। কি কাণ্ড! আপনি এখানে"

"ওদের এখান থেকে সরে যেতে বল"—ঝোপের ভিতর থেকে নিদারুণ -কসরৎ-রতা স্বয়ম্প্রভার তর্জ্জন শোনা গেল।

"আরে, বৈরাগী মশাইও যে। নমস্কার। আপনি এ অঞ্চলে হঠাৎ যে আজ?"

"ওই লোকগুলোকে সরে' যেতে বলবে কি না!"

"মাঠাকরুণের লেগেছে না কি"

গাড়োয়ানটিও গাড়ি থেকে নেমে এসে দাঁড়াল।

"না লাগে নি। আটকে গেছেন। কিন্তু উনি চান না যে—"

"আটকে গেছেন?"

বলিষ্ঠ ষোঁতন গাড়োয়ান ঈষৎ ঝুঁকে এমন ভাবে এগিয়ে এল যেন তাকেই সমস্যার সমাধান করতে হবে। অনেক আটকানো গাড়ির চাকা তুলেছে সে জীবনে।

"আটকে গেছেন? তাতে কি হয়েছে! পাঁজাকোলে করে' টেনে তুলে দিলে মিটে যায়"

কিন্তু উনি চান না যে আমরা কোন রকম সাহায্য করি—চটে যাচ্ছেন—ঠিক করে' নেবেন এখন নিজেই বোধহয়—হয় তো একটু সময় লাগবে—কিন্তু—"

"চলে যাও এখান থেকে সব"—আবার চেঁচিয়ে উঠলেন স্বয়ম্প্রভা। নিজেকে মুক্ত করবার প্রয়াসে সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠেছিল তাঁর।

ঘোঁতন নীরবে দন্তবিকশিত করে' হাসল একবার। তারপর কোমর বেঁধে মালকোচা মারল। তারপর অগ্রসর হল ধীরে ধীরে।

"ছটফট করবেন না মাঠাকরুণ। সব ঠিক করে' দিচ্ছি। বৈরিগি মশাই একটু সরে দাঁড়ান দিকি"

ঘোঁতনের দক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল না কারও। সসম্ভ্রমে সকলেই সরে' দাঁড়ালেন। গোঁসাইজির মুখে নানা ভাবের সংমিশ্রণে বিচিত্র ছবি ফুটে উঠেছিল একটা।

"সদারঙ্গ! এই—এই গাড়োয়ান—খবরদার—খবরদার, আমার গায়ে হাত দিও না বলছি—এ কি আস্পর্দ্ধা—"

ঈষৎ ঝুঁকে ঘোঁতন খপ করে' স্বয়ম্প্রভার কোমরটা জাপটে ধরেছিল। জবাই করবার পূর্ব্বে হাঁস বা মুরগী ঘাতকের মুঠোর মধ্যে যেমন ছটফট করে, স্বয়ম্প্রভাও অনেকটা তেমনি করতে লাগলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সদারঙ্গবিহারী ঈষৎ-ব্যায়ত আননে ঘোরা ফেরা করছিলেন কেবল চঞ্চল হয়ে।

"ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও"—তারস্বরে আদেশ করতে লাগলেন স্বয়ম্প্রভা।

"ঘোঁতন ছেড়ে দাও বুঝলে—যদিও তুমি ওঁর ভালোর জন্যেই করছ—তবু বুঝলে—উনি যখন সেটা চাইছেন না তখন—বাঃ প্রায় তুলে ফেলেছিলে যে! বাঃ —আর একবার"

"সদারঙ্গ যেতে বল ওকে। তুমিও ওকে ওসকাচ্ছ? ছেড়ে দাও, ছাড় বলছি—ছাড়"

"না না করুক। আপনি বুঝছেন না দিদি। ও ঠিক টেনে তুলে ফেলবে। ঘোঁতন আর একবার"

"আমি মেয়েমানুষ, আমার গায়ে একটা পরপুরুষ হাত দিচ্ছে আর তুমি দাঁড়িয়ে দেখছ সেটা—"

"না, না ব্যাপারটা ওভাবে নেবেন না। আপনার ভালর জন্যেই ও করছে —ঝোপের মধ্যে বরাবর বসে' থাকবেন নাকি! ঘোঁতন—হ্যাঁ—ঠিক—টান। হেঁইও—ও না। হয়েছে—হয়েছে—বাঃ"

"মারো জোয়ান হেঁইও"—ঘোঁতন বলে' উঠল।

"হেঁইও"—বৈরাগী মশাইও বললেন।

"হেঁইও"—ফদ্‌কাও বললে।

"হেঁইও হেঁইও হেঁইও"—আত্মবিস্মৃত সদারঙ্গবিহারীলাল নৃত্য করতে লাগলেন দু'হাত তুলে।

চর্‌র্‌র্‌র্‌—! কাপড় ছেঁড়ার একটা শব্দ হল এবং পরমুহূর্ত্তেই স্বয়ম্প্রভা ঝোপমুক্ত হলেন। ঘোঁতন তাঁকে পাঁজাকোলা করে' তুলে এনে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে মাথার ঘাম মুছলে।

"অসভ্য বখাটে গুণ্ডা জানোয়ার"—ক্রোধে স্বয়ম্প্রভার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল —"শাড়িটা ছিঁড়ে ফ্যাতাফুঁতি করে' দিলে একেবারে—"

"শাড়ি যে আটকে গিয়েছিল মাঠাকরুণ। তলার দিকে হাত চালিয়েও বাঁচানো গেল না, ছিঁড়ে গেল কি করব, ওর কোন চারা ছিল না। শাড়ি বাঁচাবার জন্যেই তলার দিকে হাত চালিয়ে ছিলাম, কিন্তু হল না"

"সরে যাও এখান থেকে! চলে' যাও সবাই"

স্বয়ম্প্রভার চোখে জল এসে গিয়েছিল।

সদারঙ্গবিহারীলালের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' তিনি বললেন, "গাড়োল কোথাকার"

"আমি কি করব বলুন"

"তুমি ওসকাচ্ছিলে কেন? আবার বলা হচ্ছে কি করব"

"ওসকানো কথাটা ঠিক হচ্ছে না, না, না—ওসকানো—বাঃ। এক্ষেত্রে ওছাড়া উপায়ই বা কি ছিল বলুন। ঘোঁতন না এসে পড়লে সমস্ত দিন ওই ঝোপে বসে' থাকতে হ'ত—হয়ত সমস্ত রাতও। মারাত্মক আটকে পড়েছিলেন যে"

ওদের চলে যেতে বল। আমার শাড়ি একেবারে ছিঁড়ে গেছে”

“ওদের উপর চটবেন না। আমার পরিচিত লোক সব। আর প্রত্যেকটি ভালো লোক। উঁচু দরের। বৈরাগীমশাই ভক্ত লোক একজন। ইনি হচ্ছেন গোঁসাইজি, এঁরই হরিমটর হোটেল, সেইখানেই আজ রাত্রে আপনাকে থাকতে হবে হয়তো”

গোঁসাইজি ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়েছিলেন। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন “ক্ষমা করবেন, আপাততঃ আমি অতিথি সৎকার করতে অক্ষম”

“কিন্তু একটা ঘর তো খালি আছে দেখে এলাম”

“সে ঘরে আমার বন্ধু বৈরাগী মশাই থাকবেন আজ রাত্রে। আমার গুরুভগ্নী অসুস্থা। ওঁকে নিয়ে যাচ্ছি রাত্রে সেবার দরকার হতে পারে। সে বিষয়ে সিদ্ধহস্ত উনি”

“ও”

সদারঙ্গবিহারীলাল একটু থতমত খেয়ে গেলেন।

“শুনছেন দিদি, এ আবার এক প্যাঁচ হল। বেশ, উঁচু দরের প্যাঁচ—”

স্বয়ম্প্রভা সরে' গিয়ে আর একটি ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে স্বীয় শাড়ি পর্য্যবেক্ষণ করছিলেন। এই ছেঁড়া শাড়ি পরে' তাঁকে যে হোটেলে ফিরতে হবে না এ সংবাদে তিনি আশ্বস্ত হলেন কিঞ্চিৎ। এ শাড়ি পরে' ভদ্রসমাজে বেরোন অসম্ভব।

বৈরাগী মশায়ের মনে হল হোটেলের ঘরটি এঁরা যে পেলেন না সেজন্যে পরোক্ষভাবে তিনিই সম্ভবত দায়ী। সুতরাং একটু জবাবদিহি করা প্রয়োজন। এগিয়ে এসে মৃদু হেসে হাত কচলে বললেন, “দেখুন গোঁসাইজির গুরুভগ্নীটি অসুস্থ হয়ে পড়া গতিকেই আমাকে আসতে হল। গোঁসাইজির কথা ঠেলা যায় না, তাছাড়া এটা একটা সামাজিক কর্ত্তব্যও বটে—হ্যাঁ, কি বলেন। খালি ঘরও তো মাত্র একটি—তা নইলে না হয়—”

"তাতো বুঝলাম। কিন্তু আমি কি অদ্ভুত প্যাঁচে পড়লাম সেটা ভাবুন। গোঁসাইজি, কোন রকমেই কি হয় না?"

"না"—গোঁসাইজি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—"প্রকাশ্য দিবালোকে যে স্ত্রীলোক একজন পুরুষের কোমর ধরে' তার বাইসিকলের পিছনে চড়ে' আসতে পারেন তাঁকে কিছুতেই আমি স্থান দিতে পারি না, ঘর খালি থাকলেও পারি না। কেবল পয়সা পেটবার জন্মেই যে আমি হোটেল খুলি নি একথা এ অঞ্চলের সবাই জানে আমার ওটা হোটেল নয়, হিন্দু পান্থনিবাস"

ঝোপের আড়াল থেকে স্বয়ম্প্রভা বললেন, "ওখান থেকে চলে এস তুমি"··· গোঁসাইজির দল গিয়ে শকটে আরোহণ করলেন।

সদারঙ্গবিহারীলাল এগিয়ে গিয়ে নিজের বিরক্তি, অস্বস্তিজনক পরিস্থিতি মহিলার অপমান, তার অনিবার্য্য কারণ, ক্ষমা প্রার্থনা প্রভৃতি উপকরণ নিয়ে একটি লম্বা বক্তৃতা সুরু করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু স্বয়ম্প্রভার এক ধমকে থেমে যেতে হল তাঁকে।

"চুপ কর। বাইকটা ঠিক আছে তো?"

"হ্যাঁ, ওটাকে বাঁচিয়েছি কোনক্রমে। এক আধটা স্পোক সম্ভবত গেছে ব্রেকটা গোড়া থেকেই খুব ভাল নয়, তবে চলবে আপাতত"

"চল তবে"

"কিন্তু আপনি এখন যেতে পারবেন কি"

"বাজে কথা না বলে' বাইকটা আন"

"কিন্তু এই অবস্থায় যাওয়াটা সঙ্গত হবে কি, ভেবে দেখুন"

সদারঙ্গবিহারী নিজের চশমাটা ঠিক করে' নিয়ে বাইকটার দিকে এগিয়ে গেলেন। বাইকটা কাৎ হয়ে পড়েছিল একধারে। সেটা তুলে স্বয়ম্প্রভার দিকে আর একবার চাইলেন তিনি।

"দেখুন এই অ্যাক্‌সিডেন্টটা হয়তো ভগবানের ইঙ্গিত হ'তে পারে। হয়তো তাঁর ইচ্ছে নয় যে আমরা এভাবে আর অগ্রসর হই"

"ভগবানের দোহাই দিতে লজ্জা করে না তোমার! আমাকে একটা ঝোপের মধ্যে উল্টে ফেলে দিয়ে কতকগুলো অসভ্য লোক জুটিয়ে আমার অপমানের চূড়ান্ত করে' এখন ভগবানের দোহাই দিচ্ছ ?"

"না—না—বাঃ—কথাটা ওরকমভাবে নিচ্ছেন কেন"

"বাইকে চড়"

সদারঙ্গবিহারী আর আপত্তি করতে সাহস করলেন না।

পথে উল্লেখযোগ্য কোনও বিপদ হল না আর। ঝড়াং ঝড়াং করতে করতে সদারঙ্গবিহারীলাল নিজের আস্তানায় পৌছলেন শেষ পর্যন্ত। বাইকের পিছনে দোদুল্যমানা স্বয়ম্প্রভাকে দেখে গ্রামের দু'চারজন অসভ্য লোক দু'একটা মন্তব্য অবশ্য করেছিল, কিন্তু স্বয়ম্প্রভা তাতে কান দেন নি। মুখ বুজে গুম হয়ে বসেছিলেন তিনি সদারঙ্গবিহারীলালকে আঁকড়ে। নেবেই তিনি সদারঙ্গবিহারীলালকে গাড়ির খোঁজে পাঠালেন। একটা মোটর চাই-ই যেমন করে' হোক। সদারঙ্গবিহারী গেলেন (প্রতিবাদ করবার সাহস ছিল না তাঁর আর) এবং একটু পরে ফিরে এলেন। এ তল্লাটে কোনও গাড়ি নেই। কোনও রকম গাড়িই না। বেচুর একটি গরুর গাড়ি ছিল, কিন্তু একটি গরু দু'দিন আগে মারা যাওয়াতে সে গাড়িটিও অচল হয়েছে।

…অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বয়ম্প্রভা সদারঙ্গবিহারীলালের গৃহস্থালিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে' ফেললেন। ধমকের চোটে পাঁচির মায়ের প্রাচীন পিলে ঘন ঘন চমকাতে লাগল। তাকে শায়েস্তা করে' তারপর তিনি ভাল করে' দেখলেন শাড়িটা কতখানি ছিঁড়েছে। ইস্—কোনও পদার্থ নেই একেবারে। শাড়ির দিকে খানকক্ষণ চেয়ে থেকে স্বয়ম্প্রভা মতি-স্থির করে' ফেললেন।

"আমি এইখানেই থাকি, বুঝলে সদারঙ্গ। অনীতাকে আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, সেইটে নিয়ে তুমিই চলে যাও। গিয়ে অনীতাকে সঙ্গে করে' নিয়ে এস। মোটর দেবার মতো ভদ্রতা যদি ওদের না-ও হয় বাইকে চড়িয়েই নিয়ে এস। কাগজ কলম দাও"

সদারঙ্গ বিনা বাক্যব্যয়ে কাগজ কলম এনে দিলেন। চশমাটা কপালে তুলে নাক ঝাড়লেন একবার। তারপর লিপি-রচনা-নিরতা স্বয়ম্প্রভার দিকে চেয়ে রইলেন ভ্রূকুঞ্চিত করে'। তাঁর মনে হল কোনও প্রতিবাদ করলে ভয়ঙ্কর কিছু করে' বসবেন স্বয়ম্প্রভা। এখানে থাকাটাও নিরাপদ নয়। অস্বস্তিজনক তো বটেই। খুব। সরে' পড়াই ভালো। তাছাড়া তাঁর নিজেরও যাবার ইচ্ছে করছিল ভিতরে ভিতরে। সান্ত্বনা দেবীর ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় হয়ে উঠেছে, জানতে কৌতূহল হচ্ছিল বই কি! নিশ্চয়! স্বয়ম্প্রভা দেবী যা সন্দেহ করছেন তা অবশ্য বিশ্বাস করেন নি তিনি—কিন্তু ব্যাপারটা বেশ একটু ই'য়ে গোছের হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

"নাও। মনে রেখো ভদ্রসন্তান তুমি, আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছ যে এ চিঠি তুমি অনীতাকে দেবে এবং সে যদি তোমার সঙ্গে চলে না আসে তার নিজের হাতের লেখা জবাব নিয়ে আসবে"

"বেশ"—আড়চোখে চিঠিটার দিকে চেয়ে ঘাড় চুলকে উত্তর দিলেন সদারঙ্গ-বিহারীলাল।

"ইচ্ছে করতো চিঠিটা তুমি পড়তে পার"

সদারঙ্গ পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে তাঁর মুখভাব গম্ভীর হ'য়ে এল ক্রমশঃ। স্বয়ম্প্রভা সাগ্রহে তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলেন। চিঠি পড়া শেষ হতেই তিনি বললেন,

"ঠিক হয়েছে তো?"

"হয়েছে, মানে—"

চিঠিটা পকেটে পুরলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"মানে, আবার কি!"

"একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। অনীতার দাম্পত্যজীবনের সুখশান্তি নষ্ট করবার জন্যে কেন এত তোড়জোড় করছেন। মানে, আপনি যা ভাবছেন তা যদি সত্যিও হয়—"

"অনীতার সুখশান্তি নষ্ট করবার জন্যে? তার সুখশান্তি বাঁচাবার জন্যেই এত করছি। ওর স্বামীটিকে সিধে করতে হলে রীতিমত শিক্ষা দিতে হবে"

"ও"

সদারঙ্গবিহারীলালের তর্ক করবার ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু তা না করে' তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হাত দুটি ওলটালেন একবার।

"যাও আর দেরি করো না"

"কাপড় জামা ছেড়ে গেলেই ভাল হয় না?"

"কাপড় জামা ছেড়ে আর কি করবে। রাস্তায় বেরুলেই তো ধুলোয় কালিতে আবার সব একাকার হয়ে যাবে। কিছু দরকার নেই, যেমন আছ চলে যাও"

"বেশ, তাই যাচ্ছি। কিন্তু দেখুন একটা কথা মনে রাখবেন, আমি সেখানে হয় তো না-ও পৌছতে পারি। গাড়ির যা অবস্থা, হয় তো 'অয়েলড্ আপ্' হয়ে যাব, কিছুই বলা যায় না। আপনি তো পিছনে বসেছিলেন, নিশ্চয়ই শুনেছেন কি রকম 'পপ' করছিলাম, ভাল্ভের ভিতরও অদ্ভুত আওয়াজ দিচ্ছিল একটা—"

স্বয়ম্প্রভা হাত দুটো মুঠো করে' বিস্ফারিত চক্ষে এমনভাবে চাইলেন তাঁর দিকে যে সদারঙ্গ পালাবার পথ পেলেন না।

সদারঙ্গবিহারী চলে যাবার পর পাঁচির মার সাহায্যে ছুঁচ সুতো জোগাড় করে' স্বয়ম্প্রভা নিজের শাড়িটি শেলাই করতে বসলেন। সায়াটি পরে' নিবিষ্ট চিত্তে শেলাই করে' যেতে লাগলেন। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছিল, ঘাড় ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছিল ঘুমে, তবু কিন্তু তিনি থামলেন না। শাড়িটি মেরামত না করা পর্য্যন্ত থামবেন না। শেলাই চলতে লাগল। ক্রমশ কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন তিনি। নিজেরই বিগত-জীবনের স্বপ্ন সব ভীড় করে' এল মনের মধ্যে—যখন টাকা ছিল না কিন্তু শান্তি ছিল, তখন ফ্যাশান-দুরন্ত সমাজের মোহ-মরীচিকা তাঁকে প্রলুব্ধ করে' হতাশ করে নি। স্বয়ম্প্রভার চিত্ত দ্রব হয়ে এল ক্রমশ। অশ্রু টলমল করতে লাগল চোখের কোণে।

অপরাহ্ণ ক্রমশ সন্ধ্যায় পরিণত হল। জানলার ফাঁকে অস্তগামী সূর্য্যের কিরণজাল উঁকি দিয়ে অন্তর্হিত হল অবশেষে। অন্ধকার নামল, অন্ধকার গাঢ়তর হল, সদারঙ্গবিহারীলাল কিন্তু ফিরলেন না।

(২৬)

মোটরে যাবার সময় সুশোভন অনীতাকে সব কথা খুলে বলবার সুযোগ পায় নি। এ মোটরটিতে গোপন আলাপের কোন সুবিধে ছিল না। অনীতাও এমন একটা উত্তেজিত অবস্থায় ছিল যে আর বিশেষ কিছু জানবার ইচ্ছে ছিল না তার। মনে হচ্ছিল যতটুকু সে শুনেছে তাই যথেষ্ট। সুশোভন দু' একবার একটু চেষ্টা করে' থেমে গেল। ভাবলে দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে গিয়ে বললেই হবে।

সুরেশ্বরী যে-কোনও দুর্ঘটনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে' রেখেছিলেন ইতিমধ্যে। যুগল স্বামী এবং একটি স্ত্রীর এই যুগপৎ আবির্ভাবে তিনি সুতরাং ঘাবড়ে গেলেন না। স্বামী যুগলের মধ্যে মনোমালিন্যের কোনও লক্ষণ না দেখে' আশ্বস্তই হলেন বরং একটু। স্ত্রীর অনুকরণে দিগ্বিজয়ও এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন তাঁদের। সান্ত্বনাকে দেখা গেল না কোথাও। ব্রজেশ্বরবাবু নেবেই সান্ত্বনার খোঁজ করলেন এবং সে পাশের ঘরে আছে শুনে' সোজা সেখানে চলে' গেলেন। তার পর বিনা বাক্যব্যয়ে তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন বেড়াতে। অনীতা সান্ত্বনাকে দেখবার অবসরই পেলে না।

সুরেশ্বরী দেবীর অকৃত্রিম স্নেহপূর্ণ আতিথেয়তায় অনীতার শঙ্কা অপনোদিত হ'ল। কেতা-দুরস্ত বড়লোকী আড়ষ্টতা মোটে নেই। নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার যেন। সান্ত্বনা কেমন লোক জানা যায় নি যদিও এখনও—খুব সম্ভব ভাল নয়—কিন্তু তাতেও কিছু যায় আসে না অনীতার মনে হল। সুরেশ্বরী দেবীর আন্তরিকতায় এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে যে তাঁর বাড়িতে কোনও কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবার কল্পনাই করতে পারছিল না সে। তারা দু'জন কাপড় বিছানা কিছু আনে নি, কিন্তু সুরেশ্বরী দেবীর তাতে যে শুধু

ভ্রুক্ষেপ নেই তা নয়, এতে যেন আরও বেশী আনন্দিত তিনি। এইটেই যেন প্রত্যাশিত ব্যাপার তাঁর কাছে।

এক ঘণ্টা পরে।

দ্বিতলের একটি শয়নকক্ষে অনীতা বিছানার উপর বসেছিল দুই হাতের উপর নিজের মুখভার রক্ষা করে' এবং সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে। মাথায় ঘোমটা ছিল না। কপালের উপর গালের উপর দুলছিল অবিন্যস্ত কালো কুঞ্চিত অলকদাম। চোখের দৃষ্টি সপ্রশ্ন, ভ্রূযুগল কুঞ্চিত। অদ্ভুত একটা বন্যশ্রী ফুটে উঠেছিল তার মুখে। সুশোভন সামনের একটা টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

"তোমরা শুধু শুধু মিছে কথা বললে কেন বলতো"—অনীতা প্রশ্ন করছিল—"সান্ত্বনা বরাবর এখানেই ছিল, সেকথা তুমি জানতে, অথচ আমাকে এ মিছে কথা বলবার কি দরকার ছিল"

"তোমার কাছে মিছে কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল না আমার"

"স্পষ্ট বললে আর বলছ উদ্দেশ্য ছিল না"

"তোমার কাছে বলা উদ্দেশ্য ছিল না। তোমার মায়ের জন্যেই বলতে হ'ল"

"দেখ, তোমাকে অবিশ্বাস করি নি কখনও। তোমাকে বিশ্বাস করতেই চাই। কিন্তু এর পর কি করে' তা করব বল। মা অবশ্য তোমার উপর চটা, তোমাকে সন্দেহ করেন, সবই ঠিক। এজন্যে মায়ের সঙ্গে আমার ঝগড়াও হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি মিথ্যে কথা বলবে কেন। মায়ের কাছেই বা বলবে কেন! কি দরকার—"

"ছেড়ে দাও না ওকথা। দরকার ছিল বলছি—"

"কি দরকার"

"কি"

অনীতা উঠে পড়ল। মাথার এক ঝাঁকানিতে মুখের চুলগুলো সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর মেজেতে নেবে জানলার ধারে দাঁড়াল সুশোভনের

দিকে পিছন ফিরে। পরমুহূর্তেই বন্ধ দ্বারের সামনে পরেশ এসে বলে' গেল—"চা দেওয়া হয়েছে মা, আপনারা আসুন"

সুশোভন টেবিলের উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল এবং অনীতাকেই দেখতে লাগল ভুরু কুঁচকে। ভাবতে লাগল এই সামান্য ব্যাপারেই অনীতা যদি এমন বেঁকে দাঁড়ায় তাহলে শেষ পর্যন্ত তাকে সব কথা সে বলবে কি করে'। সে অকপটে সব কথা বলতেই চায় তাকে। কিন্তু—

"ওই সান্ত্বনা না কি"—হঠাৎ অনীতা জিগ্যেস করলে।

সুশোভন জানলার ধারে গিয়ে তার পাশে দাঁড়াল। দেখল সান্ত্বনা এবং ব্রজেশ্বরবাবু পাশাপাশি আসছেন মন্থর গতিতে। সান্ত্বনা হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন বলছে ব্রজেশ্বর শুনছেন। ডাক্তাররা যে রকম সহানুভূতিপূর্ণ ভদ্র মনোযোগ সহকারে রোগীর মুখ থেকে রোগের বিবরণ শোনেন ব্রজেশ্বরের মুখভাব অনেকটা সেই রকম দেখাচ্ছিল।

"হ্যাঁ, ওই সান্ত্বনা। আলাপ হলে দেখবে চমৎকার মেয়ে"

"বেশ বয়স হয়েছে তো। আমি ভেবেছিলাম বুঝি…"

"হ্যাঁ। কিন্তু আলাপ হলে দেখো লোক খুব ভাল"

"ব্রজেশ্বরবাবুও মিথ্যে কথা বললেন! আচ্ছা, তোমরা দুজনেই মিথ্যে কথা বলতে গেলে কেন বুঝতে পারছি না"

অনীতা ঘুরে দাঁড়াল এবং চোখের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে নিলে।

"সত্যি কথা বলতো। আরও কিছু কি লুকোচ্ছ আমার কাছ থেকে"

ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলন করে' ক্ষণকাল নীরব হয়ে রইল সুশোভন। তার পর বললে—"সবটা বলা হয় নি অবশ্য এখনও"

"ও"

কিছুক্ষণ নীরবতা।

"সব বল আমাকে"

"বলব বই কি। বলতেই তো চাই। কোনও অন্যায় কাজ করি নি তো। কিন্তু সবটা বুঝিয়ে বলতে একটু সময় লাগবে। তুমি চুলটা আঁচড়ে নাও। কাপড় ছাড়বে না? চা দিয়েছে যে—"

ঘরের এক কোণে ড্রেসিং টেবিল ছিল একটা। সেইটের দিকে ফিরে অনীতা বললে—"আমি চুলটা আঁচড়ে নি চট্ করে'। তুমি ততক্ষণ যতটুকু পার বল না, আঁচড়াতে আঁচড়াতেই শুনি—"

ঈষৎ বেঁকে অনীতা বেণী-রচনায় মন দিলে। সুশোভন গলা খাঁকারি দিলে একবার সাড়ম্বরে। কোনও দরকার ছিল না। আড়চোখে একবার আয়নায়-প্রতিফলিত অনীতার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। মনে হল সুবিধের নয়। চোখের দৃষ্টি চকমক করছে। যে কোনও মুহূর্তে ফেটে পড়তে পারে। বিপজ্জনক মুখভাব।

"ঠিক কোন্ জায়গাটা থেকে আরম্ভ করি বুঝতে পারছি না। ট্রেন তো ফেল করলাম, তোমার কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছবার জন্য ট্যাক্সি ভাড়া করলাম একটা, সান্ত্বনাও জুটল সঙ্গে। এ সব তো শুনেইছ—"

"হ্যাঁ। তুমি সান্ত্বনাকে নিয়ে হোটেলে এলে। সেখানে কাল সমস্ত রাত্রি ছিলে। সমস্ত রাত্রি ছিলে কি? সান্ত্বনা কখন এসেছে এখানে? এইটেই আমি জানতে চাই"

"আজ"

"কি করে"

"মোটরে করে'। যে মোটরে আমরা এসেছিলাম। সেই ট্যাক্সিটা—"

"মোটর তাহলে খারাপ হয় নি?"

"হয়েছিল। গণেশ সেটাকে ঠিক করলে"

"গণেশ? ব্রজেশ্বরবাবুর ডাকনাম?"

"গণেশ হচ্ছে সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার"

"সান্ত্বনার সঙ্গে এখানে এল কে তবে? তুমি এলে না কেন"

"আমিই এসেছিলাম"

অনীতা ঘাড় ফিরিয়ে চাইলে সুশোভনের দিকে। এক গোছা কোঁকড়ানো চুল এসে পড়ল গালের উপর। সেটা সরিয়ে দিলে অনীতা ক্ষিপ্র হস্তে।

"আবার মিছে কথা বলছ নিশ্চয়। আচ্ছা, তোমরা তখন থেকে এত মিছে কথা বলছ কেন"

"তোমার মায়ের ভয়ে"

"মাকে ভয় কি"

"এমন অমিতবিক্রমে এতদূর পর্য্যন্ত যিনি ধাওয়া করে' আসতে পারেন তাঁর উপর ভরসা করি কি করে' বল"

"যেজন্যে তিনি এসেছেন মিছে কথা বললেই সেটা মিথ্যে হয়ে যাবে? তাছাড়া ব্রজেশ্বরবাবু মিছে কথা বলছেন কেন! তাঁর তো মাকে ভয় করার দরকার নেই"

"ওটা বোধ হয় ওঁর স্বভাব। রাজনীতি করেন কি না। তাছাড়া সান্ত্বনার —মানে নিজের স্ত্রীর সম্মান রক্ষা করার জন্যেই মিছে কথা বলেছেন বোধহয়। ওঁর স্ত্রীকে কেউ সন্দেহ করে এটা বোধ হয় উনি চান না"

"হ্যাঁ, সে বিষয়ে একটু বেশী সজাগ মনে হচ্ছে। আসবামাত্রই স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন! কিন্তু এতে সন্দেহ করবারই বা কি আছে। মোটর অ্যাকসিডেণ্ট হয় না? মোটর অ্যাক্সিডেণ্ট হয়ে তোমরা একটা হোটেলে এসেছিলে এতে মা-ই বা দোষ ধরবেন কেন—সব কথা যদি তাঁকে খুলে বল তোমরা—"

"তিনি দোষ ধরবেন বলে' দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে এসেছেন। তাঁকে নিরস্ত করা সহজ কাজ নয়। বদ্ধপরিকর পুরুষকেই সামলানো শক্ত, উনি তার উপর স্ত্রীলোক—"

"উনি সম্পর্কে তোমার মা হন সে কথাটা মনে রেখ। বিয়ে হয়ে থেকে তুমি

ওঁর সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারছ না ; তুমি যদি ওঁকে শ্রদ্ধা না কর উনি তোমাকে ভালবাসেন কি করে'! হাজার হোক, তুমি ওঁর জামাই—"

অনীতা এমনভাবে খোঁপার কাঁটা গুঁজলে যেন শত্রুর বুকে ছুরি হানছে।

"ও রকম স্ত্রীলোক আমি আর কখনও দেখি নি। পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কি না জানি না। প্রতিহিংসা না জিঘাংসা—ওই যে কি একটা কথা আছে—তা যে কোনও নারীর হৃদয়ে এতখানি থাকতে পারে তা আমার কল্পনাতীত ছিল। ওঁর সামনে আমি দাঁড়াতেই পারি না। মোপলা দস্যুদল, মারাঠা বীর বা পাঞ্জাবী গুণ্ডা হয়তো পারে, আমি পারি না। আমি নিরীহ ভদ্রলোক —সাংঘাতিক কিছু করা আমার সাধ্যাতীত। উনি আমার কথা বিশ্বাস করতেন না জানি, তাই মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়েছিল ; তুমি করবে, কিন্তু উনি করবেন না, উনি আলাদা জাতের লোক"

"আমার মায়ের সম্বন্ধে খবরদার ওরকম করে' বোলো না বলছি"—কেঁপে উঠল অনীতার ঠোঁট দুটো—"তিনি আমার জন্তেই এত করেছেন, আমাকে ভালবাসেন বলে' "

"এবং আমাকে ঘৃণা করেন বলে' "

অনীতা ক্ষিপ্রহস্তে খোঁপাটা জড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

"এর বেশী আর কিছু নেই আশা করি তোমার বলবার"

"এখন এই পর্য্যন্তই থাক না। চা খেয়ে বাকীটা—"

অনীতা এরপর যা করলে তা অপ্রত্যাশিত। দড়াম করে' বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল সে উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে'।

"অনীতা, ছি ছি কি করছ তুমি—"

"যাও তুমি নীচে গিয়ে সান্ত্বনার সঙ্গে চা খাও গিয়ে"

"তুমিও চল"

"আমি যাব না। চা খাব না আমি। মাথা ধরেছে আমার"

মিনিটখানেক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সুশোভন নীচে নেবে গেল অবশেষে।

সব শুনে সুরেশ্বরী বললেন, "আহা, মাথা ধরবেই তো। আসামাত্রই ওকে এক কাপ চা খাইয়ে দেওয়া উচিত ছিল আমাদের। সে কথাটা মাথাতেই এল না কারও"

"আমারই আসা উচিত ছিল। সব গুলিয়ে ফেলছি"—দিগ্বিজয় বললেন।

"তোমার দোষ কি। আমি বাড়ির গিন্নি আমারই ভাবা উচিত ছিল"

সমস্যা জটিলতর হবার পূর্ব্বেই সুরেশ্বরী দেবী ভাবলেন আগে অনীতাকে চা-টা খাইয়ে আসা যাক, তারপর ধীরে-সুস্থে ঠিক করা যাবে দোষটা আসলে কার।

নিজেই এক কাপ চা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। ডিসে খান দুই মাখন-মাখানো টোষ্টও ছিল। কিন্তু চা চল্‌কে পড়ে' সেগুলোর এমন জবজবে অবস্থা হলো যা প্রায় অনীতারই মনোভাবের অনুরূপ। সুরেশ্বরী এই রকম একটা কিছু আশঙ্কাও করছিলেন। হাত কাঁপছিল তাঁর। যখন তিনি উপরে উঠে অনীতার ঘরের দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হলেন তখন টোষ্ট পুডিং হয়ে গেছে প্রায়।

তাঁর গলা শুনে অনীতা তাড়াতাড়ি উঠে কপাট খুলে দিলে। একটু লজ্জিতও হল। চা খেলে।

"চল না নীচে", সুরেশ্বরী দেবী ইতস্তত করে' বললেন একবার।

"যাচ্ছি একটু পরে"

"সুশোভনকে পাঠিয়ে দেব কি"

"না থাক। মাথাটা বড্ড ধরেছে। একটু ঘুমুই"

"সেই ভালো। ঘুমোও তাহলে"

সুরেশ্বরী দেবী নেমে এলেন ভয়ে ভয়ে। সান্ত্বনা চুপি চুপি এসে জিগ্যেস করলে, "আমি গিয়ে আলাপ করব একটু?"

"না। একলা থাক খানিকক্ষণ"

সুশোভন চা খেয়ে দিগ্বিজয়বাবুর দিকে চেয়ে বললে, "একটা চক্কোর দিয়ে আসা যাক, কি বলেন"

"হ্যাঁ, বেশ তো। ওই পশ্চিম দিকটায় যাও। বেশ ফাঁকা মাঠ আছে। ঝোপ ঝাড়ও আছে। বেশ নির্জ্জন ওদিকটা। একটা ছড়ি নেবে?"

একটা ছড়ি দিলেন তাকে। ছড়ি হাতে বেরিয়ে পড়ল সুশোভন। কিছুদূর গিয়েই সে ছড়ি চালাতে লাগল পথের দুধারের গাছপালার উপর। অনুপস্থিত স্বর্ণপ্রভার উপরই লাঠি চালাচ্ছেন যেন। না, আর সে খাতির করবে না, লড়েই যাবে সে এবার ভদ্রমহিলার সঙ্গে। এস্পার ওস্পার করতেই হবে যাহোক একটা। অনীতাকে নিয়ে সরে' পড়বে সে—বিলেতে পালাবে—।

…অনেক দূর হাঁটলে সে। একটা গাছতলায় বসে' পড়ল অবশেষে। হাত পা আর চলছে না যেন। উপরের দিকে চেয়ে দেখলে নির্ম্মেঘ নীলাকাশ। একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে। সোঁদাসোঁদা মাটির গন্ধ উঠছে চারিদিকে। চমৎকার! লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সুশোভন গাছতলায়। ভাবতে লাগল—ইংরেজ সমাজে শুনেছি পুরুষদের কাছে শাশুড়ী একটি ভয়ঙ্কর চীজ। আমাদের সমাজে মেয়েরা শাশুড়ীর ভয়ে অস্থির হয়। আমি ইংরেজও নই মেয়েও নই, অথচ আমার কপালেই এরকম খাণ্ডার শাশুড়ী জুটে গেল। উঃ! জ্বালিয়ে মেরেছে! ওহো, গোঁসাইজির হোটেলে সেই দোকানদারের সাইকেলটা পড়ে আছে। কেউ আবার নিয়ে না যায়। কাল যা হয় ব্যবস্থা করতে হবে একটা। অনীতার রাগটা কমলে এখন বাঁচা যায়। সব কথা বুঝিয়ে বলার সময়ও দিচ্ছে না যে—এমন অবুঝ আর অভিমানী—কি করা যায়! ভাবতে লাগল। ধীরে ধীরে চোখের পাতা বুজে এল তার।

অনেকক্ষণ পরে সুশোভন যখন ফিরল তখন স্বরেশ্বরী দেবী বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। সুশোভনের জামা ভিজেছে, কাপড়ে কাদা লেগেছে—চুল

উসকো-খুসকো, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত-গোছের। সুরেশ্বরী দেবীর আশঙ্কা হল আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করছিল না তো।

সুশোভন একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলিল—"একটা গাছতলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম"

"ওমা, সে কি।

"ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম বড্ড"

"তাতো হবেই। বিছানায় শুয়ে ঘুমুলেই হ'ত"

"অনীতা এখনও ঘুমুচ্ছে বোধ হয়"

"সে তো চলে গেছে"

"চলে গেছে?"

"হ্যাঁ, সে চলে গেছে"

"কোথায়"

"সদানন্দবাবু এসেছিলেন—তিনি এর আগেও বোধ হয় এসেছিলেন একবার আজ। তিনি—"

"সেই লোকটা আবার ধাওয়া করেছে এখান পর্য্যন্ত! সাংঘাতিক তো! ভদ্রলোককে চেনেন আপনারা?"

"হ্যাঁ, একটু আধটু চেনা আছে। ভারী পরোপকারী লোক শুনেছি। তোমার সঙ্গেও আত্মীয়তা আছে শুনলুম শ্বশুরবাড়ীর দিক দিয়ে"

"থাকলেই বা! এমনভাবে এসে অনীতাকে নিয়ে যাওয়াটা ভারি অদ্ভুত লাগছে কিন্তু"

সুশোভনের কথার সুরে থতমত খেয়ে গেলেন সুরেশ্বরী একটু। এই রকমই কিছু একটা আশঙ্কা করছিলেন তিনি। সামলে নিয়ে তবু বললেন, "না, না, ভয়ের কিছু নেই। তিনি অনীতার মায়ের কাছ থেকে চিঠি এনেছিলেন একটা। সেই চিঠি পেয়ে অনীতা চলে গেল। আমি অনীতাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম

যে তোমাকে না বলে' এমনভাবে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে! কিন্তু রাগ হয়েছে মেয়ের, কিছুতে শুনলে না আমার কথা, চলে গেল"

"কতক্ষণ হল গেছে ?"

"তা অনেকক্ষণ হবে। আমার মোটরটা করেই গেল। মোটর ফিরছে বোধহয় এতক্ষণ"

"সদারঙ্গবিহারীও গেল সেই মোটরে ?"

"না। তাঁর তো নিজের মোটর বাইক ছিল, তাতেই গেছেন তিনি। আমি তাঁকে বলে দিয়েছি যে তিনি যেন অনীতাকে আর তোমার শাশুড়ীকে বুঝিয়ে বলেন যে এ নিয়ে রাগারাগি করবার কিছু নেই। অনর্থক কেন মাথা খারাপ করছেন তাঁরা। কিছুই তো হয় নি। সান্ত্বনার কাছে সব শুনেছি আমি—"

"কি বললেন শুনে"

"বললেন আমি এসব ব্যাপারে জড়াতে চাই না নিজেকে"

"কিন্তু সমস্তক্ষণই তো এসব ব্যাপারেই জড়িয়ে রেখেছেন নিজেকে দেখছি। উঃ, আচ্ছা এক চিটেগুড়ের পাল্লায় পড়া গেছে কাল থেকে। অনীতা কোথায় গেছেন বলতে পারেন ? মানে, তাঁর মা কোথায় আছেন এখন ? সেই হোটেলেই, না আর কোথাও"

"তাতো জানি না বাবা। গাড়িটা ফিরলে ড্রাইভার বলতে পারবে। তবে অনীতার মা অনীতাকে যে চিঠিটা লিখেছিলেন সেটা পড়ে ছিল ওপরের শোবার ঘরে। আমি তুলে রেখে দিয়েছি, পড়ি নি। তুমি যদি পড়তে চাও তো—"

'হ্যাঁ চাই—"

সুরেশ্বরী দেবী চিঠিটা এনে দিলেন।

"ব্রজেশ্বরবাবুরা কোথা ?"

"তারাও বেরিয়ে গেছে। ষ্টেশনে গেছে ফেরবার ট্রেনের খবর নিতে। আসবে এখুনি"

সুশোভন ভ্রূকুঞ্চিত করে' চিঠিখানা পড়ছিল।

"উঃ—" হঠাৎ সে বলে' উঠল।

"কি"

"পড়ছি শুনুন। কি ভয়ঙ্কর"

সুশোভন চিঠিখানা পড়তে লাগল।

কল্যাণীয়াসু,

এতক্ষণ তুমি নিশ্চয় আবিষ্কার করিয়াছ যে সুশোভন এবং ব্রজেশ্বরবাবু আমাদের যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

আমি সদারঙ্গের বাসায় বসিয়া এই পত্র লিখিতেছি। ফাংনাফিরিঙ্গিপুরের পাশের গ্রাম ছিপছররামারিতে সে থাকে। তাহার মোটর বাইকের পিছনে চড়িয়া এখানে পৌছিয়াছি। পথে অসীম দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছে। মোটর বাইক উলটাইয়া একটা ঝোপের ভিতর পড়িয়া যাই। গা ছড়িয়া গিয়াছে, কাপড়-চোপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এই দুর্ঘটনাটি না ঘটিলে আমি নিজেই তোমাকে আনিতে যাইতাম।

কাল রাত্রে যখন সুশোভন এবং সান্ত্বনা গোঁসাইজির হোটেলে ছিল তখন দৈবক্রমে সাদারঙ্গ সেখানে গিয়ে পড়ে। সান্ত্বনার সহিত পূর্ব্ব হইতেই তাহার আলাপ ছিল। সান্ত্বনা নিজে সদারঙ্গের কাছে সুশোভনকে নিজের স্বামী বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। তাহারা যে একঘরে এক বিছানায় রাত্রি কাটাইয়াছে একথাও সদারঙ্গ পরে বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছে।

তোমাকে এসব কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম—কারণ সত্যকে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই; যতই অপ্রিয় এবং কঠোর হউক না কেন, সাহস সংগ্রহ করিয়া তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে। সৎসাহস ভিন্ন ব্রহ্মেরও কৃপালাভ করা যায় না।

অনেক জেরা করিয়া সদারঙ্গের নিকট হইতে একথাও আমি জানিয়াছি যে ওই সান্ত্বনা মেয়েটি একটি নাম-করা মেয়ে। আর একটি ভদ্রলোকের সঙ্গেও

উহার নাকি বদনাম রটিয়াছিল। ক্ষীণভাবে মনে পড়িতেছে আমিও যেন সম্প্রতি গুজবটা শুনিয়াছিলাম।

তুমি অবিলম্বে আমার কাছে চলিয়া এস। দিগ্বিজয়বাবুর মোটর আছে শুনিলাম। সম্ভব হইলে সেইটা লইয়া এস। আশা করি এ উপকারটুকু তাঁহারা করিবেন। যদি না করেন তুমি সদারঙ্গের মোটর বাইকের পিছনে চড়িয়াই চলিয়া আসিবে। তাহাকে বলিবে খুব সাবধানে যেন চালায়। বেশী জোরে চালাইবার দরকার নাই।

তুমি আসিলে পরামর্শ করিব কি করা উচিত এখন। সুশোভনের বিলাস-লালসার বহু উপকরণের মধ্যে তুমিও যে একটি তাহার এই ভ্রান্ত ধারণা চূর্ণ করিতে হইবে। সর্ব্বাগ্রে যেমন করিয়া হোক তাহাকে এ বিষয়ে সচেতন করিতে হইবে—আমি করিবই—তাহার পর তুমি যাহা চাও তাহাই হইবে।

আমি গোড়াতেই সন্দেহ করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত কর নাই। ব্রহ্মের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।

তুমি অবিলম্বে চলিয়া এস। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষিনী

তোমার মাতা।

পুনশ্চ। তোমার বাবা কলিকাতা ফিরিয়া গিয়াছেন।

"এখন আমি সেখানে যাই কি করে'? মানে যেতে হবেই যেমন করে' হোক"—চিঠি পড়া শেষ করে' সুশোভন জিগ্যেস করলে।

"এখনই যাবে! সে কি! কাপড় জামা ছাড়, খাওয়াদাওয়া করে' বিশ্রাম কর, তারপর ওসব হবে'খন। ওদের মনটা একটু থিতুক না"

"না। আমাকে এখনই যেতে হবে। অনীতার সঙ্গে এখনই দেখা করা দরকার—"

"কিন্তু গাড়িটা তো ফেরেনি এখনও"

"আমি হেঁটেই বেরিয়ে পড়ছি। রাস্তায় যদি আপনার গাড়ির সঙ্গে দেখা হয় নিয়ে নেব সেটা। আচ্ছা, চলি নমস্কার"

(২৭)

"অনীতা কোথা? এত দেরি কেন তোমার! এতক্ষণ আমাকে কি দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে রেখেছ বলতো। তোমার পাঁচীর-মাকে আমি দূর করে' দিয়েছি! অত্যন্ত অবাধ্য। অনীতা কই?"

সদারঙ্গবিহারীলাল ঢুকতেই স্বয়ম্প্রভা উপরোক্তভাবে সম্ভাষণ করলেন। ক্লান্ত সদারঙ্গ চশমা খুলে লেন্স থেকে ধূলো পরিষ্কার করলেন আগে। এত ধূলো জমে ছিল যে ভাল করে' দেখতে পাচ্ছিলেন না তিনি।

"অনীতা আসে নি?"

স্বয়ম্প্রভা আত্মসম্বরণ করে' রইলেন যতটা পারলেন। তারপর সংযত কণ্ঠেই বললেন, "তুমি গিয়েছিলে তাকে আনতে—ফিরে এসে আমাকে জিগ্যেস করছ সে এসেছে কিনা। তুমি—"

"এতক্ষণ তার আসা উচিত ছিল। আশ্চর্য্য তো! ফানি! সে আমার আগে মোটরে করে' বেরিয়েছে, বাঃ—"

"সে বেরিয়েছে ঠিক তো?"

"ঠিক বই কি! মোটরে করে'"

"আমার চিঠি পড়ে' কি বললে"

"তা শুনিনি। শুনলাম চুপ করে' ছিল। কিন্তু বেশ মজা হ'ল তো। বাঃ হয় তো—"

"তুমি তার সঙ্গে দেখা করনি?"

"সে দোতলায় ছিল। আমি সেখানে উঠব কি করে'। সুরেশ্বরী দেবী চিঠিটা নিয়ে গিয়ে তাকে দিয়েছিলেন"

"বাবাজি ছিলেন কোথা"

"বাবাজি? মানে, ওদের ঠাকুর?"—বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করলেন সদারঙ্গ-বিহারীলাল।

"ইয়ার্কি করছ নাকি"

"ঠাকুরকেই তো বাবাজি বলি আমরা, মানে এ অঞ্চলে সবাই বলে"—বিস্মিত সদারঙ্গ উত্তর দিলেন—"ওদের ঠাকুরটা কোথায় ছিল জানতে চাইছেন?"

"ওর স্বামী কোথা ছিল"

"কার স্বামী? সুরেশ্বরী দেবীর?"

"আরে না, না—কি গাড়োলের পাল্লাতেই পড়েছি। অনীতার স্বামী সুশোভন"

"জানি না"

"সে ওর কাছে ছিল না?"

"কার কাছে?"

"অনীতার কাছে। তুমি কি ভেবেছিলে সুরেশ্বরী দেবীর কাছে বলছি?"

"হ্যাঁ"

"সুরেশ্বরী দেবীর কাছে ছিল?"

"না। আমি ভেবেছিলাম সুরেশ্বরী দেবীর কাছে সুশোভন আছে কিনা আপনি জানতে চাইছেন"

"আঃ হু। ওকে দেখেছিলে?"

"কাকে?"

"কি বিপদ! সুশোভনকে, সুশোভনকে"

"বললাম তো। ওর খবর জানি না"

"না বলনি তুমি"—অযথা ধমকে উঠলেন স্বয়ম্প্রভা। তারপর একটু থেমে আসল প্রসঙ্গে এলেন আবার।

"অনীতা আমার চিঠি পড়ে' মোটরে করে' বেরিয়েছে সেখান থেকে ?"

"হ্যাঁ। এ কথাও তো বলেছি আপনাকে। দেখুন, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে আমার। কিছু খেয়ে নি। শরীর আর বইছে না"

"সুশোভন কোনও সুলুক-সন্ধান পায় নি তো ?"

"সুলুক ?"

"সুলুক সন্ধান। ও টের পায় নি তো যে অনীতা চলে এসেছে ?"

"না। এক মিনিট, একটু সবুর করুন। গোড়া থেকে সব বলব আবার। হাত মুখ ধুয়ে একটু কিছু খেয়ে নিতে দিন আমাকে"

"অনীতাকে আনতে গেলে, কিন্তু সে-ই এখনও এল না। তার খবরটা পর্য্যন্ত দিতে পারবে না ?"

"এক্ষুণি আসবে। ড্রাইভার হয় তো রাস্তা চেনে না, কিম্বা বাড়ি চেনে না। ঘুরছে। এক্ষুণি এসে পড়বে"

"ঠিক বলেছ। আশ-পাশেই ঘুরছে হয় তো। তুমি এক কাজ কর না হয়"

"কি"

"রাস্তায় গিয়ে তোমার মোটর সাইকেলের হর্ণটা বাজাও। তাহলে ওরা বুঝতে পারবে। অন্ধকারে রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না ঠিক। যাও—"

"দেখুন বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে আমার। আর পেরে উঠছি না। সেই সকাল থেকে সমস্ত দিন—মানে এক নাগাড়েই প্রায়। তা ছাড়া আপনি এমন অস্থির হচ্ছেন কেন তাও তো বুঝছি না। আমি গোড়া থেকেই তো বলছি—সান্ত্বনা মেয়েটি খুব ভাল—একা একটা নাইট-স্কুল চালাত—রীতিমত 'গুড' যাকে বলে—স্বরেশ্বরী দেবীও 'কনফার্ম' করলেন এ কথা"

"বাজে বক্তৃতা না করে' যা বলচি কর গে যাও। রাস্তায় হর্ণ বাজাও গিয়ে। যাও, আর দেরি কোরো না"

সদানন্দ আর প্রতিবাদ করতে সাহস করলেন না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে হর্ণ বাজাতে লাগলেন। কোনও ফল হল না। ফিরে এসে খেতে বসলেন। স্বয়ংপ্রভার তাড়ায় খেতে খেতেও বার দুই উঠে' গিয়ে হর্ণ বাজিয়ে আসতে হল তাঁকে। কিন্তু অনীতার মোটর এল না।

গোঁসাইজি প্রাত্যহিক নিয়ম অনুসারে হোটেল বন্ধ করবার পূর্ব্বে চারিদিকটা দেখে নিচ্ছিলেন একবার। দোরগোড়ায় ঠেসানো বাইসিকলটার দিকে একবার চাইলেন। কখন এসে ভদ্রলোক নিয়ে যাবেন কে জানে। বাইরের ঘরে একটা ব্যাগ আর একটা বেঁটে ছাতা রয়েছে, সেই মেয়েটির বোধ হয়, যিনি হোটেলে এসে রাত্রিবাস করতে চাইছিলেন। নাক কুঁচকে এমনভাবে চাইলেন সেগুলোর দিকে, যেন সেগুলো থেকে কোনও দুর্গন্ধ নির্গত হচ্ছে। তারপর উপরে গেলেন। গুরু-ভগ্নীর খোঁজ নিলেন একবার। নাবছেন এমন সময় দেখলেন একটি মোটর এসে দাঁড়াল তাঁর হোটেলের সামনে। আবার কে জুটল এসে এ সময়। বাইরের ঘরটাতে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি যে আপাততঃ অতিথি-সৎকার করতে অক্ষম এই কথাগুলি আর একবার উচ্চারণ করবার সুযোগ পেয়ে ঈষৎ পুলকিতও হলেন মনে মনে।

অনীতা মোটর থেকে নেবে এল।

"আপনিই কি এই হোটেলের মালিক"

"হ্যাঁ। কিন্তু আপাততঃ অতিথি-সৎকার করতে অক্ষম আমি। আমার দু'টি ঘরেই লোক আছে"

"এখানে সকালের দিকে আমি এসেছিলাম একবার। তখন আপনি ছিলেন না—"

"ও। এই জিনিসগুলি আপনার তাহলে"

"হ্যাঁ"

"তাহলে নিয়ে যান। এখানে তো স্থান নেই। আর একজন মহিলাও

আসতে চেয়েছিলেন—তিনি সদারঙ্গবাবুর বাইকের পিছনে চড়ে যাচ্ছিলেন—আমি ভেবেছিলাম এগুলো তাঁরই বুঝি"

"হ্যা, আমাদেরই। আমি তাঁর মেয়ে"

"ও! এই বয়সেও আপনার মায়ের বুকের পাটা আছে বলতে হবে। বাইসিকলের পিছনে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া কম সাহসের কাজ নয়, বিশেষত এ বয়সে। জিনিসগুলো নিতেই এসেছেন তাহলে আপনি"

"হ্যা। আর একটু কাজও আছে—"

"আবার কি"

একটা খবর যদি দিতে পারেন"

"কিসের খবর"

"দেখুন, আপনার এই হোটেলকে কেন্দ্র করে' নানা রকম অদ্ভুত খবর শোনা যাচ্ছে। আমিও তার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। আপনার মুখ থেকে সত্যি কথাটা শুনতে চাই"

"আমার হোটেল সম্বন্ধে অদ্ভুত খবর! শুনে স্তম্ভিত হচ্ছি। কে বলেছে—"

"সদারঙ্গবিহারীলাল বলে' এক ভদ্রলোক। তিনি নাকি কাল রাত্রে এখানে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন—"

"ও, তিনি! তাঁর অসাধ্য কিছু নেই"

"তিনি কাল রাত্রে এখানে না কি একজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে দেখেন। তাঁরা এখানে না কি কাল রাত্রে ছিলেনও। তাঁদের সঙ্গে আর কোনও তৃতীয় ব্যক্তি ছিল কি?

"কংগ্রেসকর্মী অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে আর তাঁর স্ত্রীর কথা বলছেন কি?"

"হ্যা। অন্তত—তাঁরা দু'জনে কি ছিলেন এখানে?"

"আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই আমি জানবেন। ওরকম ভাবে জেরা যদি করেন কিছু বলব না। তবে ভদ্রভাবে যদি জানতে চান বলছি, হ্যা

তাঁরা ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। একটা হতচ্ছাড়া কুকুর ছিল অবশ্য—"

"দেখুন সমস্ত ঘটনা আমার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা দরকার। আপনি দয়া করে' যা জানেন খুলে বলুন। খবরগুলো আমাকে জানতেই হবে যেমন করে' হোক। দরকার হলে আইনের সাহায্যও নিতে হবে শেষ পর্য্যন্ত—"

"আইনের সাহায্য! আপনি কি বলতে চান, আমার হোটেলে বে-আইনী কিছু করি আমি? আইন দেখাচ্ছেন আমাকে! জানেন আমার হোটেল যে আইন অনুসারে চালাই আমি—তা একেবারে নিখুঁত? সন্দেহজনক কোন কিছুকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় না এখানে"

"তা জানি বলেই তো আপনাকে এত কথা জিগ্যেস করছি"

গোঁসাইজির ভাব-ভঙ্গী দেখে অনীতা ঈষৎ মোলায়েম স্বর ধরলে। তা না হলে কার্য্যোদ্ধার হবে না। তার এ কথায় প্রীতও হলেন গোঁসাইজি। বললেন, "কোনও বাজে লোককে ঢুকতে দিই না আমি এখানে। এখানে ও-সব চালাকি চলবার উপায় নেই"

ঈষৎ হেসে অনীতা বললে—"কিন্তু আপনাকে কেউ ঠকাতেও তো পারে"

"ঠকাবে? আমাকে? আমি কি কচি খোকা?"

"ধরুন, কাল যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা যে ব্রজেশ্বরবাবু আর তাঁর স্ত্রী এ কি করে' জানলেন আপনি"

"সদানন্দবাবু এই সব বলে' বেড়াচ্ছেন বুঝি! দেখুন, আমি প্রমাণ না রেখে কোনও কাজ করি না। একবার এক অ্যানার্কিষ্ট ছোকরা আমাকে ফাঁকি দিয়েছিল, তার পর থেকে আমি সাবধান হয়েছি। তা ছাড়া একজন কংগ্রেস-কর্ম্মী অধ্যাপক কি মিছে কথা বলবেন?"

"তিনি হয়তো বলবেন না, কিন্তু তাঁর নাম করে' অপর কেউ আপনাকে ঠকিয়ে যেতে পারে"

"তাঁর নাম করে'?"—ঈষৎ থতমত খেয়ে গেলেন গোঁসাইজি, তারপর

অযৌক্তিকভাবে বলে' উঠলেন—"দেখুন, আপনি যদি আইনের সাহায্য নেন আপনার বন্ধু সদারঙ্গবাবু মানহানির দায়ে পড়ে' যাবেন বলে' দিচ্ছি। আমার হোটেলের নামে এ রকম যা তা কথা রটিয়ে পরিত্রাণ পাবেন না উনি—"

"না, তাঁর কথা বিশ্বাস করি নি আমি। আমি শুধু জানতে চাইছি যিনি এসেছিলেন তিনিই যে ব্রজেশ্বরবাবু এর কোনও প্রমাণ আছে কি আপনার ?"

"প্রমাণ ? তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একঘরে একখাটে শুয়েছিলেন আমি তা স্বচক্ষে দেখেছি—মানে, দৈবাৎ দেখে ফেলেছি"

"এটা কি একটা প্রমাণ হল ? আপনিই বলুন"

ভ্রূকুঞ্চিত করে' গোঁসাইজি চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ অনীতার দিকে। সধীন মেয়ে তো ! কালে কালে হচ্ছে কি !

"আরও প্রমাণ আছে, আসুন আমার সঙ্গে। আমি যতটা পেরেছি প্রমাণ রেখেছি। আসুন—"

অনীতার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গোঁসাইজির পিছু পিছু আপিস ঘরে ঢুকল সে। আশা আর আশঙ্কার দ্বন্দ্ব চলছিল তার মনে। বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করছিল।

গোঁসাইজি তাঁর 'অ্যাড্‌মিশন রেজিস্টার'খানি পাড়লেন।

"এই খাতায় প্রত্যেক অতিথিকে স্বহস্তে নিজের নাম এবং পরিচয় লিখে দিতে হয়। আমি স্বচক্ষে ব্রজেশ্বরবাবুকে এই খাতায় নিজের নাম এবং পরিচয় লিখতে দেখেছি। এই দেখুন—"

"দেখি"

দেখেই অনীতার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"আপনি স্বচক্ষে তাঁকে লিখতে দেখেছেন"

"তিনি যখন লিখছিলেন আমি ঘরে এসে ঢুকলাম। স্বচক্ষে দেখেছি বই কি—"

অনীতার বুকের ভিতরটা সহসা মুচড়ে উঠল অনুতাপে। ছি, ছি, সুশোভনের প্রতি কি অবিচারই করেছে সে। এ হাতের লেখা সুশোভনের হতেই পারে না।

এমন স্পষ্ট গোটাগোটা করে' লিখতেই পারে না সুশোভন। তার লেখা তো অর্দ্ধেক পড়াই যায় না, এমন হিজিবিজি করে' লেখে সে।

খাতা বন্ধ করে' অনীতা বেরিয়ে এল আপিস ঘর থেকে। গোঁসাইজিও এলেন।

"দেখুন, আমার হোটেলের বদনাম দেবার সাহস হয় নি আজ পর্য্যন্ত কারও—তা তিনি সদারংই হোন বা সদ্বিক্রমই হোন। কোনও খুঁত রাখি নি আমি। এটা হোটেল নয়, পান্থনিবাস—"

"না আপনার ব্যবস্থা সত্যিই খুব ভাল। আমাদেরই ভুল হয়েছিল। অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার—"

অনীতা মোটরে চড়ে বসল। কতকগুলো সমস্যার সমাধান হল না এখনও। সুশোভন কাল রাত্রে কোথায় শুয়েছিল? সুশোভন বললে কাল রাত্রে সে এখানে ছিল। কোথায় শুয়েছিল তাহলে? যাই হোক, একটা ব্যাপার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল—সুশোভনকে মিছে সন্দেহ করেছিল তারা। কাল রাত্রে সুশোভন যাই করে' থাক, সে নির্দ্দোষ। বেচারি বার বার চেষ্টা করেছে নিজের দোষস্খালন করবার—কিন্তু সে তার কথায় কর্ণপাত পর্য্যন্ত করে নি।

"এখন কোথায় যাব মা?"—ড্রাইভার জিগ্যেস করল।

"ফিরে চল—"

"বাড়ি?"

"হ্যাঁ"

"এই থাম থাম"—

চীৎকার করে' উঠল সুশোভন।

"দিগ্বিজয়বাবুর গাড়ি না কি"

কঁ্যাচ করে' থেমে গেল গাড়িটা।

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—ড্রাইভার জবাব দিলে মুখ বাড়িয়ে।

"শোন, আমি গাড়ি নিয়ে ছিপ্‌ছররামারি বা ফাৎনাফিরিজিপুরে যাব—মানে, অনীতাকে যেখানে রেখে এসেছ সেইখানে রেখে এস আমাকে। জরুরি দরকার"

"তুমি!"

"অনীতা?"

"এস, ভিতরে ঢোক"

তড়াক করে' মোটরে উঠে বসল স্থশোভন।

"দেখ, আমি সব বুঝিয়ে বলতে চাই। তুমি অমন অবুঝের মতো করছ কেন। বুঝিয়ে বলছি সব, শোন আগে—"

"দরকার নেই। কিচ্ছু বলবার দরকার নেই। পরে বোলো কোন সময়ে যদি তোমার ইচ্ছে হয়। আমি সব খবর নিয়েছি। বড় অন্যায় হয়ে গেছে আমার। রাগ কোরো না, লক্ষীটি। প্রথমটা মনে হয়েছিল—আমায় মাপ কর তুমি—মাপ কর—বল, মাপ করেছ?"

স্থশোভন এটা প্রত্যাশা করে নি। ঘটনা-পরম্পরা যে এমন নাটকীয়ভাবে হঠাৎ ডিগবাজি খেয়ে যাবে তা তার কল্পনাতীত ছিল।

"মাপ? মোটেই না, মানে ও প্রশ্নই ওঠে না। আমাকে ভুল বুঝে তোমরা কেন যে এমন করছ—"

"আর কক্ষণো করব না। এইবারটি মাপ কর"

"না, না, মাপ মানে—উঃ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে উঠলাম মনে হচ্ছে। থাক্, এখন কি করা যায় বল তো"

স্থশোভনের ইচ্ছে করছিল বেলুনের মতো উড়তে।

"চল দু'জনে কোলকাতা ফিরে যাই"

"তা তো যাবই। রাতটা কোথায় কাটানো যায়? এখানে ভালো হোটেল আছে কোথাও বলতে পার"

"দীঘড়াতে আছে। কাছেই"—ড্রাইভার উত্তর দিলে।

"তাহলে সেইখানেই নিয়ে চল আমাদের"

গাড়ি দীঘড়া অভিমুখে ধাবিত হল।

"এইবার সব বলি তাহলে খুলে"—অনীতার দিকে ঘুরে বসল স্থশোভন।

"কি দরকার—আসল কথাটা জেনেই গেছি যখন"

"কি করে' জানলে"

"গোঁসাইজির সঙ্গে দেখা করে'। অ্যাড্‌মিশন রেজিস্টারটা দেখেছি। দু'একটা কথা যদিও স্পষ্ট হয় নি এখনও, কিন্তু সে পরে হলেও চলবে"

গাড়ি দীঘড়ায় এসে পৌঁছল।

নেবেই স্থশোভন চেঁচিয়ে উঠল—"আরে গণেশ যে! তুমি এখনও যাও নি।"

গোঁফ চুমরে গণেশ বললে, "এইবার যাব। সমস্ত দিন লেগে গেল রেডিয়েটারটা সারাতে। এখানকার মিস্ত্রি সব অতি বাজে। ঝালতেই জানে না"

"ঠিক হয়েছে এখন ?"

"হয়েছে"

"গাড়ি কোথায় তোমার"

"মিস্ত্রির বাড়ির সামনে"

"চল তাহলে তোমার গাড়িতেই ফিরি। এখনি যাব কিন্তু"

"বেশ। গাড়িটা আনি তাহলে"

গণেশ চলে গেল।

স্থশোভন অনীতার দিকে ফিরে বললে, "দিগ্বিজয়বাবুকে একটা চিঠি লিখে দি তাহলে—যে পরে কোনও এক সময় আসব আমরা। এখন ফিরে চললুম"

"বেশ"

পকেটবুক থেকে একখানা পাতা ছিঁড়ে স্থশোভন একখানা চিঠি লিখে দিলে। ড্রাইভারকে বখশিসও দিলে। তারপর হোটেলে ঢুকল। গরম ভাত, মুগের ডাল, আর গরম মাছভাজা পাওয়া গেল। যথেষ্ট।

খাওয়া দাওয়া সেরে অনীতা বললে—"কোলকাতা যাবার আগে মাকে কিন্তু খবরটা দিতে হবে"

"হ্যাঁ, সদারঙ্গবিহারীলালকেও"

"আমি গিয়ে দেখা করে' এলে কেমন হয়। কাছেই তো, না ?"

সুশোভন ইতস্তত করতে লাগল।

"তোমার গিয়ে দরকার নেই। এখানকার পথঘাট ভাল নয়, তাছাড়া তোমাকে তোমার মা হয় তো ছাড়তে চাইবেন না—সে আবার এক বখেড়া হবে। তার চেয়ে আমিই যাই বরং। খবরটা দেওয়া তো কেবল—"

"আমি মাকে একটা চিঠি লিখে দিই না হয় যে ভয়ের কোনও কারণ নেই। আমাদের আশঙ্কা অমূলক—কি বল—"

মুচকি হেসে সুশোভনের দিকে চাইলে অনীতা।

"বেশ তাই দাও"

হোটেলওয়ালার কাছ থেকে কাগজ চেয়ে অনীতা চিঠি লিখতে বসল। লিখতে লিখতে অনীতা হঠাৎ জিগ্যেস করলে "আচ্ছা কাল রাত্রে তুমি ছিলে কোথা ? তুমিও ওইখানেই ছিলে ?"

"সে অনেক কথা। পরে শুনো"

"এইটুকু বল না এখন—"

"হ্যাঁ, ওই হোটেলেই ছিলাম। তবে নানা স্থানে। ঘর তো একটি। কখনও বারান্দায়, কখনও খাবার ঘরে, কখনও উঠোনে, কখনও সিঁড়িতে—এইভাবে কাটিয়েছি আর কি। ভিজেওছিলাম বেশ—"

"ছি, ছি, কি দুর্গতি"

"চরম"

"অসুখ না করে"

"না কিচ্ছু হবে না"

"কিন্তু তোমরা দু'জনে মিলে মিথ্যে কথাটা বললে কেন তা এখনও বুঝতে পারছি না আমি। সান্ত্বনা হোটেলে আছে—মিছে করে' একথা বলতে গেলে কেন"

"না বললে তুমি আমাদের সঙ্গে মোটরে আসতে না"

"আহা"

"নাও, চিঠিটা লিখে ফেল চটপট"

*　　　　*　　　　*

"এতো সঙীন প্যাচ হল দেখছি"—সদারঙ্গবিহারী চিবুক চুলকে বলে' উঠলেন।

"প্যাচ! মেয়েটা অন্ধকারে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, সেটা তোমার কাছে প্যাচ মনে হচ্ছে! আবার যাও, দেখ কি হল"

"রাস্তায় গিয়ে আর কি করব। ছ'বার তো গেলাম। দিগ্বিজয়বাবুর 'কারে' এসেছে, চিন্তার কোনও কারণ আছে বলে' মনে হয় না। প্যাচ অন্য কারণে বলছিলাম। আমাদের কি হবে"

"আমাদের?"

"মানে, শোবার কথা ভাবছি। দোতলার পাঁচির মায়ের ঘরটায় অবশ্য আপনি শুতে পারেন"

"আমি ঘুমুব না। চিন্তায় আমার ঘুম আসবে না। যেখানেই আমাকে শুতে দাও—খাড়া বসে' থাকব আমি সারারাত"

"ও। তাহলে, মানে রাগ করবেন না, আমিই ভাবছিলাম পাঁচির মায়ের ঘরটায় শোব। আপনার সেখানে হয়তো কষ্ট হবে। কিন্তু আপনি যদি জেগে থাকাই 'ডিসাইড' করে' থাকেন তাহলে—ঘরটা কিন্তু—"

"আমি দেখেছি সে ঘর, রাতটা কাটিয়ে দিতে পারব"

"বেশ। কিন্তু আপনি গায়ে কি দেবেন? পাঁচির মায়ের লেপ ছিল একটা—"

"চল দেখি গিয়ে"

"সেই ভাল। না হয় পাড়া থেকে চেয়ে-চিন্তে আনব একটা। জনার্দ্দনবাবু একটা এক্‌স্‌ট্রা লেপ করিয়েছেন এবার জানি"

"চল"

একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন দু'জনে। পাঁচির মা থাকত ছাতের ছোট্ট ঘরটায়। সিঁড়ির দুয়ারে মিলারের তালা লাগানো ছিল একটা, চাবি লাগাবামাত্র লাফিয়ে খুলে যায় যেগুলো—আবার টিপলেই বন্ধ হয়ে যায়। সদারঙ্গ চাবিটা খুললেন। রিংসমেত তালাটা 'হুর্দো'তে ঝুলতে লাগল।

…পাঁচির মার তক্তাপোষের উপর কোণের দিকে বিছানার মতো কি একটা গোটানো ছিল। স্বয়ম্প্রভা—খুলে দেখলেন সেটা। দেখে নাক সেঁটকালেন।

সদারঙ্গবিহারী বললেন, "আপনি যদি ওটা গায়ে না দিতে চান, আমিই দেব না হয়। আমার লেপটা আপনি নিন। তাহলে পাড়ায় বেরিয়ে ছুটোছুটি করতে হয় না আর। রাত প্রায় দশটা হল তো—"

"বেশ তাই হবে। চল নীচে যাই। সিঁড়ির কপাট আবার বন্ধ করতে গেলে কেন। খোল"

"বন্ধ তো করি নি। হাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে বোধহয়। খুলছি। আরে—এ কি—"

"কি হল"

"এ যে বন্ধ। বাইরে থেকে বন্ধ—আরে"

"শিগ্‌গির কপাট খোল বলছি। রসিকতা করবার সময় এ নয়"

"খুলছে না। একি—আরে"

"খোল বলছি"

"পারছি না, বাইরে থেকে বন্ধ করে' দিয়েছে কেউ। তালাটা বাইরে ঝুলছিল"

"বাজে কথা। ধাক্কা মার। বন্ধ করতে আসবে কে? আর করবেই বা কেন? ঠেল, জোরে ঠেল, ধাক্কা দাও"

সদারঙ্গবিহারীলাল ধাক্কা দিলেন, তারপর ঠেললেন, তারপর স্বয়ম্প্রভার দিকে চাইলেন একবার। মুখে করুণ হাসি। মাথা নাড়লেন। আবার ঠেললেন। কিন্তু না, কপাট খুলল না।

"বাইরে থেকে বন্ধ করে' দিয়েছে কেউ। তালাটা বাইরে ঝুলছিল কি না। কেউ হয়তো ঠাট্টা করে' কিম্বা, কি জানি—"

"আবার ঠেল। ঠেল। গুঁতো মারো। গায়ে জোর নেই না কি! সর—"

"দেখুন আপনি যদি পারেন। দেখুন। পারবেন না। অসম্ভব"

স্বয়ম্প্রভা চেষ্টা করলেন। দাঁতে দাঁত দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করলেন। হল না। তারপর হঠাৎ তিনি রুখে দাঁড়ালেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—"তুমিই যড় করেছিলে বোধহয় কারও সঙ্গে—"

"যড়! রামঃ—না—না—ছি—রাঃ। পা ছুঁয়ে বলতে পারি আপনার"

"কে তবে বন্ধ করলে কপাট"

"কি করে'—বলব। আপনিও যেখানে আমিও সেখানে। হয়তো পাড়ার কেউ ঢুকেছিল, ইয়ার্কি করে' গেছে। অন্যায় কিন্তু। খুব। ভাবতেই পারি না"

"যেমন করে' হোক বেরুতেই হবে"

"কি করে' তাতো বুঝতে পারছি না"

"সমস্ত রাত এখানে থাকব বলতে চাও তোমার সঙ্গে। বেরুতে হবে যেমন করে' হোক। অনীতা যে কোনও মুহূর্ত্তে এসে পড়তে পারে"

"তা পারে। কিন্তু—ছি—কি কাণ্ড। কি করি বলুন তো"

"চেঁচাও। পাড়ার সবাইকে জাগাও চেঁচাও—"

"না, না, ছি, সে কি হয়! আমি এখানে বাস করি, আমার একটা মান-সম্ভ্রম আছে এখানে। না—চেঁচানো চলবে না। লোকে হাততালি দেবে।

চেনেন না আপনি এদের। গুজবের চোটে কান পাতা যাবে না। সে ভয়ানক ব্যাপার হবে। আপনার পক্ষেও। ঘাবড়ে যা তা করবেন না। দাঁড়ান—"

স্বয়ম্প্রভা পাঁচির মার খাটের উপর বসে' পড়লেন। বিস্রস্ত-কেশ, স্ফীত-নাসারন্ধ্র। সদারঙ্গবিহারীলাল চশমটা খুলে মুছলেন। তারপর সেটা পরে' সভয়ে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

"সমস্ত রাত তোমার সঙ্গে এই ঘরে থাকতে হবে নাকি"—চীৎকার করে' উঠলেন স্বয়ম্প্রভা।

"দোহাই আপনার, চেঁচাবেন না অমন করে' "

"কপাট খোল এক্ষুণি। তা নাহলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করব আমি—"

"না, না, লোকে হয়তো ভাববে আমি বলাৎ—মানে, খারাপ কিছু করছি বুঝি একটা। একটু সবুর করুন। আমি দূরে থেকে দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা মেরে মেরে দেখি। হয় তো ভেঙেও যেতে পারে—ভয়ানক শব্দ হবে কিন্তু—"

"যা করবার কর। আমি এখানে আর একদণ্ড থাকতে চাই না"

ছোট ঘর। দৌড়বার বেশী স্থান ছিল না। মালকোঁচা মেরে সামান্য একটু ছুটে এসে সদারঙ্গবিহারী যে ধাক্কাটা মারলেন তা নিতান্তই হাস্যকর। কপাট খোলা দূরে থাক তেমন কোনও শব্দও হল না।

"ঠেল, ঠেল, জোরে, আরও জোরে"—চেঁচাতে লাগলেন স্বয়ম্প্রভা।

"হেঁইও—হেঁইও"—সদারঙ্গ চেঁচাতে লাগলেন ঠেলতে ঠেলতে।

"ঠেল, ঠেল, আরও জোরে—"

"বাপ্‌স্—উঃ! চেঁচাবেন না অত জোরে দোহাই আপনার। পাড়ার লোকে যদি শুনে ফেলে—বুঝতেই পারছেন"

(২৮)

অনুসন্ধান করতে করতে সুশোভন সদারঙ্গবিহারীর বাসায় এসে দেখলে কপাট খোলা। আলো জ্বলছে। ঘরে নেই কেউ। ছাতাটি এবং ব্যাগটি সে মেঝেতে

নামিয়ে রাখলে। তারপর অনীতার চিঠিটা বার করে' টেবিলের উপর ঠিক সামনেই এমন ভাবে রাখলে যাতে ঘরে ঢুকলেই চোখে পড়ে।

উপরে শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে—সিঁড়ি রয়েছে একটা বারান্দার দিকে। আলো দেখা যাচ্ছে, কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে। ঘর থেকে বেরিয়ে সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল সে। পায়ে ছিল রবার সোল্ড্ জুতো, কোনও শব্দ হল না। সিঁড়ির কপাটটা হাওয়াতে আপনি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দোদুল্যমান মিলারের তালাটা চোখে পড়ল। সদারঙ্গবিহারীলাল এবং স্বয়ম্প্রভার কথার টুকরো শুনতে পেলে দু'একটা। ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুশোভন। পরমুহূর্তেই হাসি চিকমিক্ করে' উঠল তার চোখে। আস্তে আস্তে উঠে তালাটি কুট করে' লাগিয়ে দিয়ে নেবে এল সে। চাবির রিংটি টেবিলের উপর রেখে বেরিয়ে পড়ল। মিনিট দশেকের মধ্যেই হোটেলে পৌঁছে গেল আবার।

"খুব চট করে' ফিরলে তো"

"হ্যাঁ, চিঠিটা সদারঙ্গবাবুকে দিয়েই চলে এলাম। কথাবার্তা হল না তেমন কিছু"

"মাকে কেমন দেখলে"

"তিনি পাশের ঘরে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আর দেখা করি নি"

"চটবেন খুব"

"গণেশ এসেছে ?"

"হ্যাঁ"

"চল তবে আর দেরি কেন"

"চল"

মোটর ছুটে চলেছে নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে অন্ধকার ভেদ করে'। ঘেঁসাঘেঁসি করে' পাশাপাশি বসে' অনীতা আর সুশোভন। সুশোভনের কাঁধে মাথা রেখে অনীতা ঘুমুচ্ছে।

সমাপ্ত

দশ-ভাণ

ভাণঃ স্যাদ্ ধূর্ত্তচরিতো নানাবস্থান্তরাত্মকঃ।
একাঙ্ক এক এবাত্র নিপুণঃ পণ্ডিতো বিটঃ।
—সাহিত্য-দর্পণ

"বনফুল"

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষে
প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দু' টাকা বারো আনা

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাত চন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ

সুনিপুণ কথা-শিল্পী

শ্রীমনোজ বসু

করকমলেষু

১০. ৬. ৪৫

ভাগলপুর।

সূচীপত্র

শিক-কাবাব

প্রকাণ্ড একটি হল-ঘর। ছাদ পাকা নয়, খাপরার চাল। একটি বড় বরগা ঘরের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যান্ত চলিয়া গিয়াছে, দেখা যাইতেছে। পর্দ্দা টাঙাইয়া হলটিকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। পর্দ্দা একটি নয়, দুইটি—পাশাপাশি টাঙানো আছে। পর্দ্দার ওপারে কি আছে তাহা দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু উভয় পর্দ্দার সন্ধিস্থল ফাঁক করিয়া দিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে। ঘরের দুই দিকে দুইটি দরজা আছে। ঘরের মাঝামাঝি একটি গোল টেবিল এবং দেওয়াল ঘেঁষিয়া ছোট লম্বা-গোছের আর একটি টেবিল রহিয়াছে। গোল টেবিলের চারিধারে কয়েকখানি দামী চেয়ার আছে। সুদৃশ্য ডোম-সমন্বিত একটি ইলেকট্রিক্ বাতি জ্বলিতেছে। একটি প্লেট হাতে করিয়া করিম খানসামা প্রবেশ করিল। করিম খানসামার নুর আছে; পরিধানে চেক-চেক লুঙ্গি, ফতুয়া এবং মলিন ফেজ। প্লেটটি ছোট লম্বা টেবিলে রাখিয়া করিম উৎসুক নয়নে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে ডাক দিল

করিম। কই রে শিবু, শিকগুলো নিয়ে আয়।

শিবু। [নেপথ্য হইতে] যাই।

করিম। [এদিক ওদিক চাহিয়া] সব ঘরগুলোর খাপরা নাবিয়েছে দেখছি। ঘরের মাঝামাঝি আবার পর্দ্দা টাঙিয়েছে কেন! শিবু, ওরে শিবু!

শিবু। [নেপথ্য হইতে] যাই—যাই।

শিবু প্রবেশ করিল। ঝানু চেহারা। তাহার কাঁধে ঝাড়ন, পরনে ফতুয়া এবং হাতে গোটা দুই লোহার শিক। শিবু আসিয়াই চোখ বড় বড় করিয়া ঠোঁটে আঙুল দিল

শিবু। আরে, চুপ চুপ করিম মিয়া, অত চেঁচায় না।

করিম। কেন?

শিবু। [পর্দ্দা দেখাইয়া, চুপি চুপি] আরে, দেখছ না?

করিম। দেখছি তো, পর্দ্দা টাঙালে যে হঠাৎ?

শিবু। [চুপি চুপি] ওপারে মেয়েমানুষ আছে।

করিম। [সবিস্ময়ে ও নিম্ন কণ্ঠে] তাই নাকি ?

শিবু। তা না হ'লে শুধু শুধু পর্দ্দা টাঙাব কেন ?

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল

করিম। কর্ত্তা তা হ'লে আর একটি উড়িয়ে এনেছেন ?

শিবু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল

শিবু। তাই না শিক-কাবাব করবার জন্যে তোমার ডাক পড়েছে। তোমার হাতের শিক-কাবাব নইলে কর্ত্তার ফুর্ত্তিই জমে না যে।

করিম দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিল

করিম। দাও তা হ'লে শিকগুলো, মাংসটা গেঁথে ফেলি চটপট।

শিবু শিক দিল, করিম মাংস গাঁথিতে লাগিল

শিবু। এখানে টেবিলটা ময়লা করবে কেন, চল না, রান্নাঘরে ব'সে গাঁথবে।

করিম। রান্নাঘরে যা ধোঁয়া করেছ তুমি !

শিবু। কয়লায় আগুন দিয়েছি যে, যাই একটু হাওয়া করি গিয়ে, মদও আনা হয় নি এখনও। তুমি মাংসটা গেঁথে নিয়ে চটপট এস।

গমনোদ্যত

করিম। আরে আরে, শোন না—[বাম চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া] চিড়িয়া ফাঁসল কি ক'রে ?

শিবু। বাবুর ওই যে একটি নতুন মোসাহেব জুটেছে আজকাল—

করিম। কে, পান্নালালবাবু ?

শিবু। হ্যাঁ। উনিই উড়িয়ে এনেছেন আজ সন্ধ্যেবেলা।

করিম। [সাগ্রহে] কোথা থেকে ?

শিবু। আমাকে জিজ্ঞেস ক'র না, আমি কিছু জানি-টানি না।

করিম। তুমি বাবা পুরনো ঘুঘু, তুমি জান না !

শিবু মুচকি হাসিল

শিবু। মাইরি বলছি, কালীর কসম। আমি চাকর মনিষ্যি, সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না।

করিম। তবু—

শিবু। যেটুকু জানি, সেটুকু হচ্ছে এই—সকালে বৈঠকখানা ঝাড়পোঁছ করছি, এমন সময় এক টেলিগেরাপ এল। জীবনধনবাবু তখন সেখানে ব'সে। টেলিগেরাপ প'ড়ে বাবু আমাকে বললেন, ওরে, পালকির বেয়ারাগুলোকে ব'লে দে, সন্ধ্যের সময় যেন তারা পালকি নিয়ে ইষ্টিশানে থাকে, জেনানি সোয়ারি আসবে। আর তুই বাগানবাড়িটা পরিষ্কার ক'রে রাখিস।

শিবু একবার পর্দার প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া নিম্নকণ্ঠে
পুনরায় সুরু করিল

আমি বললাম বাগানবাড়িতে তো জেনানি রাখবার মত ঘর নেই, মাঝের হল-ঘরটি ছাড়া সব ঘরের খাপরা নাবানো হয়েছে। বাবু ধমকে উঠলেন, বললেন, ওই হল-ঘরেই ফরাসের চাদর টাঙিয়ে একটা পর্দার ব্যবস্থা ক'রে রাখ।

পুনরায় পর্দার প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিল

করিম। [মাংস গাঁথিতে গাঁথিতে] তারপর ?

শিবু। তারপর আর কি, সন্ধ্যের সময় পালকি এসে ওই পেছনের দরজাটায় লাগল, পান্নালালবাবু এসে কি একটু ফুসফুস গুজগুজ করলেন, চিড়িয়া এসে খাঁচায় ঢুকল। আমি ঝি-মাগীকে দিয়ে এক বালতি জল, একটা ঘটি আর কিছু জলখাবার পাঠিয়ে দিলাম। [হাত উল্টাইয়া] কত্তার ইচ্ছেয় কম্ম। যেমন যেমন বলেছিলেন, তেমনই তেমনই করেছি ; তোমাকেও খবর দিতে বলেছিলেন, তুমিও এসে গেছ ; যাই এবার, দেখি আঁচটার কতদূর !

গমনোদ্যত

করিম। আরে, দাঁড়াও দাঁড়াও, আসল খবরটাই তো বললে না।

শিবু। [সবিস্ময়ে] আবার কি ! যা জানি, তা তো বললাম।

করিম। [ভুরু নাচাইয়া] মানে, চিড়িয়াটি কি রকম ? বুলবুল, না ছাতারে ?

শিবু। [মাথা নাড়িয়া] জানি না ভাই।

করিম। [অবিশ্বাসভরে] আরে যাও যাও।

শিবু। সত্যি বলছি, কালীর কসম। তবে পর্দ্দার ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, বাগ্দী ক্যাওড়া নয়, ভদ্রলোকের মেয়ে।

করিম। [লুব্ধ আগ্রহে] বল কি ?

শিবু। তাই তো মনে হয়।

ভুট্টা নামক বালক-ভৃত্য প্রবেশ করিল

ভুট্টা। এই পেঁপে-বাটাটা মাংসে পড়ে নি।

করিম। সেকি, কোথায় ছিল ওটা এতক্ষণ ?

ভুট্টা। রান্নাঘরের কোণের দিকটায় ছিল।

করিম। একটা শিক তো গাঁথা হয়ে গেছে। আচ্ছা দে, বাকি মাংসটায় মিশিয়ে দিই।

মিশাইয়া দিল

শিবু। তুই উনুনটায় হাওয়া কর গিয়ে, আমি যাচ্ছি।

ভুট্টা চলিয়া গেল

করিম। বাগ্দীই হোক, ক্যাওড়াই হোক, আর ভদ্দরলোকই হোক, শেষ পর্য্যন্ত তো আমাদের ভোগেই লাগবে।

হঠাৎ ক্যাঁক ক্যাঁক করিয়া হাসিয়া উঠিল

শিবু। [নিম্ন কণ্ঠে] আরে, চুপ চুপ, শুনতে পাবে যে, পাশেই রয়েছে।

পর্দ্দার ওপাশে চেয়ার সরানোর শব্দ পাওয়া গেল। উভয়েই সেদিকে সচকিত দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ

করিম। নিস্তারিণীটাকে আজকাল দেখলে কিন্তু কষ্ট হয়। দেখেছ এদানীং তাকে তুমি ?

শিবু। দেখেছি।

করিম। গায়ে চাকা চাকা কি বেরিয়েছে বল দিকি ?

শিবু। [নির্ব্বিকারভাবে] কি আবার, কুট।

করিম। ক্যাওড়ার মেয়ে হ'লে কি হয়, রূপ ছিল বটে এককালে! প্রথম বাবুর কাছে যখন এল—ওরে ব্বাস রে—চোখ-ঝলসান রূপ!

শিবু। কিন্তু হ'লে কি হয়, শেষ পর্য্যন্ত যে ওরা গিয়ে ব্যবসা খোলে! ব্যবসা যাঁহাতক খুলেছে কি মরেছে!

করিম। কি করবে বল, বাবু তো আর চিরকাল পোষে না। পেট চালাতে হবে তো বেচারীদের।

শিবু। [দরজার পানে চাহিয়া] ওই কত্তা এসে পড়লেন, এখনও মদ আনা হয় নি। চল চল, যেটুকু বাকি আছে রান্নাঘরে ব'সেই গেঁথো।

উভয়ে চলিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে শিবু ঝাড়ন দিয়া টেবিলটা ঝাড়িয়া দিল। কথা কহিতে কহিতে জমিদার এবং মোসাহেব পান্নালাল আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পান্নালাল একটু রোগা-গোছের, ছিমছাম, চোখে চশমা, গোঁফদাড়ি কামানো। জমিদারটি খুব মোটা বর্ত্তুলাকার ব্যক্তি। তিন থাক চিবুকের উপর কটা রঙের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মাথার সামনের দিকটায় টাক

জমিদার। ওসব কবিত্ব-টবিত্ব রাখ তুমি, মনে ঘাঁটা প'ড়ে গেছে বাবা। আগে ইতিহাসটা শুনি।

পান্নালাল। ইতিহাস তো বললাম সংক্ষেপে।

জমিদার। সংক্ষেপে-টংক্ষেপে চলবে না, বিশদভাবে শুনতে চাই। ইতিহাসটি পুরোপুরি না শুনে আমি ছুঁচ্ছি না ওসব। সেবারে মনে নেই, এক পুলিস-কেসেই ফেঁসে গেলাম বাবা, হাজারখানেক টাকা লম্বা হয়ে গেল ঘুষঘাষ দিতেই। এস, বসা যাক, ভাল ক'রে সব গুছিয়ে বল দিকি শুনি। হ্যাংলার মত হামলে পড়বার বয়স গেছে—হঁ হঁ হঁ হঁ হঁ [হাসিলেন]।

পান্নালাল। বেশ শুনুন তা হ'লে।

চেয়ার টানিয়া দুজনে উপবেশন করিলেন

জমিদার। দাঁড়াও, সিগার বার করি।

পকেট হইতে সিগার-কেস বাহির করিলেন

দেশলাইটা কোথা গেল ?

এ পকেট ও পকেট খুঁজিতে লাগিলেন

ঠিক ফেলে এসেছি, এমন ভুলো মন হয়েছে আজকাল ! ওরে শিবে !

পান্নালাল পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিলেন

পান্নালাল। এই যে আমার কাছে আছে।

জমিদার। দাও। এইবার আনুপূর্ব্বিক সব কাহিনীটি বল দিকি বাবা, ভদ্দরলোকের মেয়ে তোমার খপ্পরে পড়ল কি ক'রে ?

পান্নালাল। ওই যে বললাম, শেয়ালদা স্টেশনে পুলিসের হাতে ধরা প'ড়ে কাঁদছিল। আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল আর কি।

জমিদার। আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল ? তুমি জানলে কি ক'রে ?

পান্নালাল। পুলিসের কাছে শুনলাম, রেল-লাইনে মাথা দিয়েছিল।

জমিদার। তারপর ?

পান্নালাল। তারপর আমি পুলিসকে কিছু দিয়ে-টিয়ে উদ্ধার করলাম। একটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালাম বোঝালাম—

জমিদার। [সকৌতুকে] কি বোঝালে ?

পান্নালাল। বোঝালাম যে, এত অল্প বয়সে মরবার দরকার কি ! চল, আমি তোমাকে একটি চাকরি জুটিয়ে দিচ্ছি আমার এক জমিদার বন্ধুর বাড়িতে।

জমিদার। আরে এটা তো শেষের ঘটনা। গোড়া থেকে সব বল না, শুনি। শেয়ালদা স্টেশনেই বা এল কি ক'রে, তার আগেই বা কোথা ছিল ? দাঁড়াও, এটা আগে ধরিয়ে নিই, তুমিও নাও একটা।

জমিদারবাবু সিগার ধরাইতে লাগিলেন। দেখা গেল Alcoholic tremor আছে, হাত কাঁপে। পান্নালালও একটি সিগার লইয়া ধরাইলেন

পান্নালাল। [ধোঁয়া ছাড়িয়া] সেই মামুলি কাহিনী আর কি।

জমিদার। কি ?

পান্নালাল। মেয়ের বয়স হ'ল, কিন্তু পাত্র জুটল না, বাপ মা বিয়ের জন্যে ছটফট ক'রে বেড়াতে লাগল—

জমিদারবাবুর সিগারটা ঠিকমত ধরিতেছিল না। তিনি তাহা ধরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন

জমিদার। কি বললে, ছটফট ক'রে বেড়াতে লাগল, আই সি তারপর?

পান্নালাল। তারপর যা হয়। কেউ চাইলে টাকা, কেউ চাইলে রূপ, কেউ চাইলে গান, কেউ চাইলে বাজনা, কেউ চাইলে নাচ, কেউ চাইলে লেখা-পড়া, কেউ চাইলে সব—

জমিদারের সিগার ঠিক ধরে নাই, নিবিয়া গেল। তিনি কম্পমান হস্তে পুনরায় তাহা ধরাইতে ধরাইতে গল্পে মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন

অর্থাৎ বরপক্ষের চাহিদা সবই প্লাসের কোঠায় আর মেয়েপক্ষের দিকে সবই মাইনাস। সুতরাং বিয়ে হ'ল না, বয়স বাড়তে লাগল।

জমিদার। [এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া] এইবার ধরেছে। কি বললে, বয়স বাড়তে লাগল, আই সি। [সহসা] মেয়েটি দেখতে কেমন?

পান্নালাল। এস না, দেখবে?

জমিদার। না, এখন থাক। এই অপেক্ষা ক'রে থাকার মধ্যেই একটা কিক আছে হে, দেখলেই তো সব ফুরিয়ে গেল—হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ। যাক, ইতিহাসটা আগে শুনে নিই। ভাল কথা, ওকে ওখানে বসতে-টসতে দিয়েছ তো ভাল ক'রে?

পর্দার দিকে চাহিলেন

পান্নালাল। একটা চেয়ার দিয়েছি।

জমিদার। বেশ, এইবার বল শুনি। তারপর কি হ'ল?

পান্নালাল। তারপর একটু রোমান্টিক ব্যাপার ঘটল।

জমিদার। কি রকম?

পান্নালাল। স্বাভাবিক নিয়মে মেয়েটি একটি প্রতিবেশী যুবকের প্রেমে পড়ল।

জমিদার। [হাসিলেন] হঁ হঁ হঁ হঁ হঁ হঁ।

পান্নালাল। তারপরই কিন্তু হ'ল মুস্কিল, মনে মিলল, কিন্তু জাতে মিলল না।

জমিদারবাবু এ কথায় অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিলেন। হাস্যবেগ দমন করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না—এঃ হে হে হে হে হে করিয়া উচ্চকণ্ঠে ফাটিয়া পড়িলেন। শিবু এক বোতল হুইস্কি ও কয়েকটি গ্লাস লম্বা টেবিলটিতে রাখিয়া গেল

জমিদার। [সিগারের ছাই ঝাড়িয়া] বেড়ে বলেছ কথাটা হে, মনে মিলল, কিন্তু জাতে মিলল না, অ্যাঁ! তারপর?

পান্নালাল। উধাও হ'ল একদিন দুজনে।

জমিদার। উধাও হ'ল! বল কি?

পান্নালাল। হ্যাঁ।

জমিদারবাবু বার্ত্তাটি উপভোগ করিলেন এবং মৃদু হাসিয়া বলিলেন

জমিদার। ঠেকল গিয়ে কোথায়?

পান্নালাল। কাশীতে।

জমিদার। পুণ্য বারাণসী তীর্থে! [সহসা চক্ষু দুইটি বড় করিয়া] খান জায়গায় গিয়ে পড়ল বল।

পান্নালাল। [মুচকি হাসিয়া] সে কথা আর বলতে! খান খান হয়েও গেল।

জমিদার। কি রকম! এ যে রীতিমত উপন্যাস ক'রে তুললে তুমি বাবা! থাম থাম, এটা আবার নিবে গেল, ধরিয়ে নিই, আর গলাটাও একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক, কি বল, অ্যাঁ? ওরে শিবু!

কম্পমান হস্তে সিগার ধরাইতে লাগিলেন। কয়েক বোতল সোডা লইয়া হন্তদন্তভাবে শিবু প্রবেশ করিল

তুই সোডা আনতে গেছলি বুঝি? ব্যাটা আগে থাকতে কিছু এনে রাখবে না। বোতলটা খোল।

শিবু। খোলাই আছে হুজুর।

শিবু হুইস্কির বোতল এবং তিনটি গ্লাস আনিয়া গোল টেবিলটাতে রাখিল। জমিদারবাবু দুইটি গ্লাসে মদ ঢালিলেন। শিবু সোডা খুলিল

জমিদার। [তৃতীয় গ্লাসটি দেখাইয়া] এটা আবার কার জন্যে ?

শিবু। জীবনধনবাবুর আসবার কথা ছিল।

জমিদার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তো, সে এখনও এল না কেন ? নে, ঢাল।

শিবু সোডা ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গেল। দুইজনে দুইটি গ্লাস তুলিয়া লইয়া 'সিপ' করিতে লাগিলেন

এইবার বল শুনি। খান খান হয়ে গেল কি রকম ?

পান্নালাল। মানে, কাশীর পাণ্ডার হাতে পড়ল আর কি। পাণ্ডাগুলো তো গুণ্ডারই নামান্তর।

জমিদার। আর সেই ছোকরা ?

পান্নালাল। ছোকরা আর কি করবে, তার না ছিল ট্যাঁকের জোর, না ছিল গায়ের জোর।

জমিদার। প্রেমের জোর তো ছিল। কাশী পর্যন্ত টেনে তো নিয়ে গেছল বাবা—হঁ হঁ হঁ হঁ হঁ হঁ—তারপর ?

পান্নালাল। মেয়েটি পাণ্ডাদেরই আশ্রয়ে রইল দিনকতক।

জমিদার। আশ্রয়ে—অ্যাঁ !

মুচকি হাসিলেন। চর্ব্বিস্ফীত গাল দুইটি আরও স্ফীত হইয়া উঠিল

পান্নালাল। দিন দশেক ছিল সেখানে। তারপর অসহ্য হওয়াতে পালাল একদিন।

জমিদার। পালাল ! এবার কার সঙ্গে ?

পান্নালাল। এবার একা, রাত্রে চুপি চুপি দরজা খুলে—

জমিদার পুনরায় সিগার ধরাইতেছিলেন

জমিদার। মেয়েটির তা হ'লে খুব ইয়ে আছে বল। [সহসা] আচ্ছা, এত সব খবর তুমি পেলে কি ক'রে ?

পান্নালাল। মেয়েটি সব বলেছে আমাকে।

জমিদার। মেয়েটির বাপ মা কোন খোঁজ করে নি ?

পান্নালাল। করেছিল কি না, মেয়েটি জানে না।

জমিদার। মেয়েটিও বাপ-মাকে কিছু জানায় নি ?

পান্নালাল। জানাবে কি ক'রে ? নিরক্ষর পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, নিঃসম্বল। তা ছাড়া অত বড় কলঙ্কের পর—

জমিদার। যাক, তারপর ?

পান্নালাল। পালিয়ে যাবার পর সন্তোষবাবু ব'লে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল।

জমিদার। ছোকরা, না বুড়ো ?

পান্নালাল। বুড়ো।

জমিদার। বুড়ো! তারপর ?

পান্নালাল। বুড়ো আশ্রয় দিলে।

জমিদার। আশ্রয় দিলে মানে ? খোলসা ক'রে বল না বাবা!

পান্নালাল। মানে চাকরাণী হিসেবে বাহাল করলে।

জমিদার। [সহাস্যে] পাটরাণী না ক'রে চাকরাণী করবার মানে ? ধার্ম্মিক ব্যক্তি, না মেয়েটা কুৎসিত ?

পান্নালাল। ধার্ম্মিক ব্যক্তি। কিন্তু—

হাসিলেন

জমিদার। আবার 'কিন্তু' কেন বাবা ? মুখোসের তলা থেকে লেলিহান জি-উ-হ্বা দেখা গেল নাকি, অ্যাঁ ?

পান্নালাল। না ধার্ম্মিক কিছু করবার ফুরসতই পেলেন না। তাঁর এক গোঁফ-ছাঁটা ভাগ্নে ছিল, সেই ব্যাটাই খেলতে লাগল '

জমিদার। গোঁফ-ছাঁটা ? দেখেছ নাকি তাকে ?

পান্নালাল। ফোটো দেখেছি। ওর কাছে তার একখানা ফোটো আছে।

জমিদার। ওরে ব্বাবা! ফোটো পর্য্যন্ত রয়েছে—ভাগ্নের সঙ্গে ব্যাপার তা হ'লে বেশ ঘনীভূত হয়েছিল বল।

পান্নালাল। খুব। বিয়ে করবে আশ্বাস দিয়ে ছোকরা ওকে নিয়ে কলকাতায় ভেগেছিল।

জমিদার। [চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া] বটে! তারপর? [সহসা] ওরে শিবু!

পর্দ্দার ওপারে খট করিয়া একটা শব্দ হইল। শিবু আসিয়া প্রবেশ করিল

শিবু। কি বলছেন হুজুর?

জমিদার। শিক-কাবাবের কতদূর?

শিবু। আজ্ঞে দেখি।

চলিয়া গেল

জমিদার। জীবনধনের এখনও পর্য্যন্ত কোন পাত্তা নেই, কেন বুঝতে পারছি না! মেয়েমানুষের গন্ধ পেয়েছে, তার এতক্ষণ আসা উচিত ছিল।

পান্নালাল। জীবনধন জানে নাকি?

জমিদার। জানে বইকি। তোমার টেলিগ্রাম যখন এল, তখন তো সে আমার কাছে ব'সে। টাহ্মু লোক—মালটাল টানতে গেছে বোধ হয়। আসবে ঠিক। সে থাকলে আরও জমত। তারপর কি হ'ল?

পান্নালাল শূন্য গ্লাসটি নামাইয়া রাখিয়া দিলেন

পান্নালাল। ভাগ্নে তো ভাগলেন কলকাতায়। সঙ্গে সঙ্গে মামাও ছুটলেন তার পিছু পিছু।

জমিদার। সেই ধার্ম্মিক মামা?

পান্নালাল। হ্যাঁ।

জমিদার। তাঁর ছোটবার হেতুটা?

পান্নালাল। ধার্ম্মিক ব'লেই। তিনি ছুটলেন ভাগ্নেকে ফিরিয়ে আনতে, পাছে সে বিয়ে ক'রে ফেলে।

জমিদার। আই সি।

শূন্য গ্লাসটি রাখিয়া দিলেন

ভাগ্নে ফিরে এল ?

পান্নালাল। নিশ্চয়। অনুতপ্ত চিত্তে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে করতে।

জমিদার। [হাসিলেন] হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ তারপর ?

পান্নালাল। মেয়েটা রইল কলকাতায়।

জমিদার। কার কাছে ?

পান্নালাল। সন্তোষবাবু তাকে এক অবলা-আশ্রমে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে এলেন।

শিবু আসিয়া প্রবেশ করিল

শিবু। শিক-কাবাবের এখনও একটু দেরি আছে বাবু, এখনও ঠিক নরম হয়নি।

জমিদার। [ধমকাইয়া] নরম আবার কোন্ জন্মে হবে ? মদ ফুরিয়ে গেলে ও গুষ্টির পিণ্ডি নিয়ে কি করব আমি ? সেবারেও ঠিক এই কাণ্ড হ'ল।

গ্লাসে খানিকটা মদ ঢালিলেন

নে, সোডা দে। তুমি আর একটু নেবে নাকি পান্নালাল ?

পান্নালাল। না থাক, পরে নোব।

শিবু সোডা ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গেল

জমিদার। [বেশ বড় এক চুমুক পান করিয়া] হ্যাঁ, তারপর ? অবলা-আশ্রমে ভর্ত্তি ক'রে দিলে, তারপর ?

পান্নালাল সিগার ধরাইলেন

পান্নালাল। তারপর আর কি, তপ্ত কটাহ থেকে অগ্নিকুণ্ডে। সেখানে এক ব্যাটা রাঘব-বোয়াল ম্যানেজার ছিল—

জমিদার মদ 'সিপ' করিতেছিলেন, এ কথা শুনিয়া আনন্দে 'বিষম' খাইলেন

জমিদার। হে হে হে হে হে—রাঘব-বোয়াল—অ্যাঁ—বেড়ে উপমাটা দিয়েছ তো হে—না চিবিয়েই গেলে, অ্যাঁ ?

পান্নালাল উপমা-প্রয়োগের কৃতিত্বটা স্মিত মুখে উপভোগ করিতে লাগিলেন

ম্যানেজার রসিক ব্যক্তি বল। চিবিয়ে সব জিনিস যে গলাধঃকরণ করা যায় না, সেটা জানে, অ্যাঁ?

টলিতে টলিতে অসম্বৃত-বেশবাস মুক্তকচ্ছ জীবনধন প্রবেশ করিলেন। বগলে বোতল, কণ্ঠে গান

জীবনধন। [সুরে] গয়লা দিদি লো, তোর ময়লা বড় প্রাণ—

জমিদার। এস এস, জীবনধন এস, তোমাকেই খুঁজছিলাম এতক্ষণ। ভয় হচ্ছিল, কোথাও আটকেই গেলে বুঝি।

জীবনধন। [জড়িত কণ্ঠে] যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে—

জমিদার। ব'স ব'স।

জীধনধন চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলেন

জীবনধন। সাড়া পেয়েই কোথায় সরালে বাবা পান্নু?

পান্নালাল মুচকি হাসিলেন

জমিদার। আরে, ব'স না আগে।

জীবনধন ধপাস করিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন

জীবনধন। হুকুম তো তামিল করলাম ইন্দ্রদেব, এইবার অপ্সরাটিকে আসতে বলুন।

জমিদার। হচ্ছে হচ্ছে, সব হচ্ছে। ততক্ষণ এক আধ পেগ চালাও না।

জীবনধন। তথাস্তু।

জমিদার। শিবু তোমার জন্যে আলাদা একটা গেলাস রেখে গেছে। এই নাও।

তৃতীয় গ্লাসে মদ ঢালিলেন

সোডা চাই?

জীবনধন। না। স্বয়ং সুজলা ধান্যেশ্বরী উদরে বিরাজ করছেন—জলের অভাব নেই। নির্জ্জলাই দিন।

নির্জ্জলা পান করিয়া মুখবিকৃতি করিলেন

জমিদার। হ্যাঁ, অবলা-আশ্রমে কি হ'ল তারপর? রাঘব-বোয়াল করলে কি?

পান্নালাল। রাঘব-বোয়াল আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে, আমাকে যদি না গিলতে দাও, পাঞ্জাবীর কাছে বিক্রি ক'রে দোব।

জমিদার। [সবিস্ময়ে] পাঞ্জাবীর কাছে?

জীবনধন। [জড়িত কণ্ঠে বিড় বিড় করিয়া বলিল] পাঞ্জাবীরা গুড ট্যাক্সি-ড্রাইভার—বেপরোয়া হাঁকায় বাবা।

জমিদার মুচকি হাসিলেন

জমিদার। পাঞ্জাবী মানে?

পান্নালাল। অবলা-আশ্রমগুলো থেকে পাঞ্জাবীরা মেয়ে কিনে নিয়ে যায় যে, বিয়ে করবে ব'লে। বেশ দাম দিয়ে কেনে, এক হাজার দেড় হাজার পর্য্যন্ত দাম দেয়।

জমিদার। তাই নাকি? জানতাম না তো এ কথা। তুমি জানতে জীবনধন?

জীবনধন। [হাতজোড় করিয়া] যদি অভয় দেন, একটি কথা নিবেদন করি।

জমিদার। কি?

জীবনধন। অত্যন্ত বাজে বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে হুজুর। পাঞ্জাবী প্রসঙ্গে আলোচনা চলবে জানলে কোন্ শালা—

জমিদার। আহা, আর এক পেগ চড়াও না, ততক্ষণ আমরা গল্পটা শেষ করি।

জীবনধনকে আরও খানিকটা নির্জ্জলা হুইস্কি ঢালিয়া দিলেন

আর কতটা বাকী পান্নালাল?

পান্নালাল। আর বেশি নেই।

জীবনধন। [সানুনয়ে] তাড়াতাড়ি শেষ কর পানু, লক্ষ্মী ধন আমার।

করিম শিক-কাবাব লইয়া প্রবেশ করিল

করিম। একটা শিক নিয়ে এলুম, হুজুররা একটু চেখে দেখুন তো। ওরে শিবু, প্লেট নিয়ে আয় তিনখানা।

শিবু তিনখানি প্লেট দিয়া চলিয়া গেল, করিম তিনটি প্লেটে শিক-কাবাব ভাগ করিয়া দিল

জীবনধন। [এক কামড় দিয়া] উঃ, বড় গরম যে! উঃ উঃ, এ যে নেশা ছুটিয়ে দিলে বাবা—উঃ।

পান্নালাল। [সামান্য ভাঙ্গিয়া লইয়া চিবাইতে চিবাইতে] এখনও একটু কসর আছে হে।

জমিদার বাম হাত দিয়া খানিকটা তুলিয়া ডান হাত দিয়া টানিয়া দেখিলেন

জমিদার। হ্যাঁ, বেশ কসর আছে এখনও। নিয়ে যা, আরও খানিকটা হবে।

পান্নালাল ও জমিদার প্লেট ঠেলিয়া দিলেন। জীবনধন কিন্তু প্লেট ছাড়িলেন না

জীবনধন। আমার এই বেশ লাগছে বাবা, বেড়ে ঝাল ঝাল হয়েছে। করিমের মসলার হাতটি একেবারে নিখুঁত।

চক্ষু বুজিয়া চিবাইতে লাগিলেন। করিম দুইটি প্লেট লইয়া চলিয়া গেল

জমিদার। [পান্নালালকে] তারপর?

পান্নালাল। গতিক খারাপ দেখে মেয়েটি একদিন অবলা-আশ্রমের পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাল।

জমিদার। আবার পালাল? এতো খুব তুখোড় মেয়ে দেখছি হে! পাঁচিল ডিঙিয়ে, অ্যাঁ?

পান্নালাল। পাঁচিল ডিঙিয়ে।

জীবনধন। [সানুনয়ে] সংক্ষেপ কর বাপ পানু।

জমিদার। তারপর?

পান্নালাল। তারপর কলকাতার জনসমুদ্রে ঘোলটান খেতে খেতে শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে হাজির এবং সেখানে—

জমিদার। এবং সেখানে চারিচক্ষের মিলন, আর অমনই আমাকে টেলিগ্রাম—এহ্ এহ্ এহ্ এহ্! বুদ্ধিকে তোমার বলিহারি!

পান্নালাল স্মিত মুখে সিগার ধরাইতে লাগিলেন

পান্নালাল। ইতিহাস তো শুনলে, এইবার একটু আলাপ-পরিচয় হোক।

জমিদার। আলাপ-পরিচয় করতে পারি, কিন্তু আর কিছু নয়। আজই সরিয়ে ফেল ওকে। [সহসা] তুমি আমাকে কি ঠাউরেছ বল দিকি?

পান্নালাল একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন

পান্নালাল। তুমি একদিন বলেছিলে কিনা যে, যদি ভাল জিনিস কখনও চোখে পড়ে—

জমিদার। এর নাম ভাল জিনিস! সাত ঘাটের জল খাওয়া রাবিশ দাগী মাল। ছি ছি ছি ছি!

জীবনধন। আরে বাবা, বারই কর না, দেখি জিনিসটা।

পর্দ্দার ওপার হইতে চেয়ার সরানোর একটা শব্দ হইল। পর্দ্দাটা একটু নড়িয়া উঠিল

জমিদার। [চর্ব্বিস্ফীত হাসি হাসিয়া] অধীর আগ্রহে ছটফট করছে ব'লে মনে হচ্ছে যেন!

সহসা জীবনধনের পানে চাহিলেন

আরে, ছি ছি জীবনধন, তুমি করছ কি, কাঁচা মাংসগুলো চিবুচ্ছ? রক্ত বেরুচ্ছে যে ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে।

জীবনধন। বড় মিঠে লাগছে কিন্তু।

আর একটা শিক লইয়া করিম পুনরায় প্রবেশ করিল

করিম। আগেকার শিকটায় পেঁপে দেওয়া হয়নি, এই শিকটা দেখুন তো হুজুর। শিবু, প্লেট আন।

শিবু প্লেট দিয়া চলিয়া গেল। করিম প্লেটে কাবাব পরিবেশন করিতে লাগিল। জমিদারবাবু তিনটি গ্লাসে আবার খানিকটা করিয়া মদ ঢালিয়া লইলেন

জমিদার। ওরে শিবু!

শিবু। [নেপথ্য হইতে] আজ্ঞে যাই।

কয়েক বোতল সোডা লইয়া প্রবেশ করিল

জমিদার। সোডা ভাঙ।

শিবু সোডা ভাঙিয়া জমিদারবাবুর হাতে দিল, তিনি নিজের গ্লাসে ও পান্নালালবাবুর গ্লাসে পরিমাণমত সোডা ঢালিয়া লইলেন

পান্নালাল। [শিক-কাবাব খাইয়া] এইবার ঠিক হয়েছে।

জমিদার। [একটু চাখিয়া] হুঁ।

জীবনধন। [বেশ খানিকটা মুখে পুরিয়া, নিমীলিত চক্ষে] দীর্ঘজীবী হও বাপ করিম, তুমি ছদ্মবেশী অন্নপূর্ণা বাপ।

করিম ও শিবু চলিয়া গেল। তিনজনে জমাইয়া শিক-কাবাব সহযোগে মদ্যপান করিতে লাগিলেন

পান্নালাল। এইবার ডাকব?

জীবনধন। ডাক না বাপ। [সুর করিয়া] সময় বহিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়—

জমিদার। ডাকতে পার, তবে আমি ওসবের মধ্যে নেই। ওসব দশ-হাত-ঘোরা জিনিস টাচ করি না আমি।

পান্নালাল। [হাসিয়া] আলাপ ক'রে দেখতে ক্ষতি কি?

জীবনধন। কিস্যু ক্ষতি নেই।

পান্নালাল। ডাকি তা হ'লে?

জমিদার। ডাক।

পান্নালাল। সৌদামিনী!

পর্দার ওপার হইতে কোন উত্তর আসিল না

সৌদামিনী!

কোন উত্তর নাই

ঘুমিয়ে পড়ল নাকি!

পান্নালাল উঠিয়া গেলেন ও পর্দা ফাঁক করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন

এ কি !

জমিদার। কি ?

তিনিও উঠিয়া গেলেন ও অন্য পর্দ্দটা ফাঁক করিয়া ধরিলেন। দেখা গেল, শূন্যে শেমিজ-পরা একটি নারীদেহ বরগা হইতে ঝুলিতেছে। পরনের শাড়ি খুলিয়া সৌদামিনী গলায় দড়ি দিয়াছে। জীবনধনও উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। রক্তাক্ত মুখে ভীত বিস্মিত নেত্রে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন

জীবনধন। গলায় দড়ি দিয়েছে—অ্যাঁ, সেকি !

যবনিকা

লেহ্য

পটোত্তলন করিলে রঙ্গমঞ্চের ভিতর দেখা যাইতেছে—'যুবক-সমিতি' নামক বাঙালীদের ক্লাব। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ক্লাবের হল-ঘরটিতে একটি টেবিলে বীরেন, ভব, ছবি ও মহাদেব তাস খেলিতেছে। হল-ঘরটি নেহাৎ ছোট নয়। পাশে আর একটি ঘরও আছে। তাহার প্রবেশপথ হল ঘরের ভিতর দিয়া, দরজাটি দেখা যাইতেছে। একটি দেওয়াল ঘেঁষিয়া কয়েকটি আলমারিতে বই রহিয়াছে। তাস খেলিবার আরও গোটা দুই টেবিল আছে, এখনও খেলোয়াড় জোটে নাই। ইহা ছাড়া আরও দুইটি টেবিল আছে।—একটি বড় গোল টেবিল, তাহার উপর কতকগুলি সাময়িক-পত্রিকা, তাহার চারপাশে কয়েকটি চেয়ার। আর একটি ছোট ড্রয়ার-ওয়ালা টেবিল, ফুট-লাইটের কাছাকাছি ডান দিক ঘেঁষিয়া আছে। তাহার এক দিকে একটি চেয়ার এবং বিপরীত দিকে একটি টুল। এটি ক্লাবের সেক্রেটারী মহাশয়ের টেবিল। সেক্রেটারি অক্ষয়বাবু এখনও আসেন নাই। ফুট লাইটের কাছাকাছি বাম দিকে একটি অর্গ্যান রহিয়াছে। ধীর পদসঞ্চারে হরেন আসিয়া প্রবেশ করিল। হরেনের পোশাক পরিচ্ছদ বেশ ছিমছাম, মুখভাব কিন্তু হতাশাব্যঞ্জক। হরেন আসিয়া গোল টেবিলে একটি চেয়ার টানিয়া বসিল, একটি সিগারেট ধরাইল এবং একটা খবরের কাগজের পাতা উল্টাইতে লাগিল

ছবি। কি হে হরেন, তোমার ইণ্টার্‌ভিউ কেমন হ'ল আজ?

হরেন। [বিষন্ন হাসি হাসিয়া] ওই ইণ্টার্‌ভিউ পর্য্যন্তই, আর বেশিদূর্ এগুবে ব'লে মনে হয় না।

ছবি। [দান ফেলিয়া] তোমাকে যে ডেকেছিল ওই যথেষ্ট; মহাদেবকে তো ডাকেও নি।

মহাদেব। আমার ভগ্নীপতি তো আর সব্‌ডিভিশনাল অফিসার নয় ভাই।

বীরেন। শ্যামকেও ডেকেছিল না ইণ্টার্‌ভিউ করবার জন্যে?

ছবি। হ্যাঁ, তার গলাও চমৎকার।

মহাদেব। [সশ্লেষে] তার জ্যাঠাও মুন্সেফ।

ছবি। শুধু মুন্সেফ আর সব্‌ডিভিশনাল অফিসারের খাতিরেই ওদের ডাকে

নি। হরেন শ্যাম তুজনেই ফাস্ট ক্লাস অনার্স। তুমি না হয় গাইতে পার স্বীকার করি, কিন্তু তুমি দু দুবার ফেল ক'রে তবে বি. এ. পাস করেছ, সেটা ভুলো না।

মহাদেব রুখিয়া উঠিল

মহাদেব! গানের সঙ্গে বি. এ. পাসের সম্পর্ক কি? তা ছাড়া তুমি কি বলতে চাও, কোয়ালিফিকেশন নিক্তির ওজনে মেপে সবাইকে ডেকেছে? আমি না হয় তুবার ফেল, কিন্তু হাবু? সে ফাস্ট ক্লাস এম. এ, গানও করে চমৎকার।

বীরেন। [দান ফেলিয়া] হাবু তোয়াক্কাও করে না এ সবের, তাকে সিনেমায় লুফে নেবে। সে অ্যাক্টিংও করে চমৎকার।

মহাদেব। তোয়াক্কা করুক আর নাই করুক, আমার কথা হচ্ছে—

ভব। আহা, বাজে কথা ছেড়ে খেল না তুমি, কি ফেলবে ফেল।

মহাদেব ছবির দিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানিয়া তাস ফেলিল। হরেন কাগজ উল্টাইতে লাগিল

ছবি। ওরে ঝগড়ু, এক গেলাস জল নিয়ে আয়।

মহাদেব। আর চারটি সুপুরি!

ক্লাবের বুড়া চাকর ঝগড়ু জল ও সুপারি দিয়া গেল

বীরেন। [পটাং করিয়া তাস ফেলিয়া] বাঙালীকে আর চাকরি পেতে হচ্ছে না এই বেহারে, তা তিনি ফাস্ট ক্লাসই হোন আর যাই হোন। তবে ধনেশ্বরবাবুর বাঙালীদের দিকে একটু নেকনজর আছে ব'লেই যদি বাঙালীকে রাখেন।

ছবি। [তাস ফেলিয়া] যা বলেছ।

বীরেন। এবার তুবে, চোবে, তেওয়ারি, প্রসাদ, সিং, লাল এদেরই পোয়া বারো। আমি তো আমার ছেলেটার নাম রেখে দিইছি খুবলাল—নাম-মাহাত্ম্যে যদি ব্যাটা উতরে যায়।

মহাদেব। [হাসিয়া] কিন্তু বাবা, উপাধিটা লুকোবে কি ক'রে? সেন শুনলেই যে—

বীরেন। সেন বলব না, শর্ম্মা বলব।

ভব পুনরায় অধীর হইয়া উঠিল

ভব। তাস খেলতে ব'সে এত বাজে কথা বল কেন? খেলতে বসেছ, খেল না। ইয়াকি দিতে দিতে ব্রিজ খেলা হয় না।

নীরবে খানিকক্ষণ খেলা চলিল। একহাত শেষ হইয়া গেল। ভব খাতায় পয়েন্টস টুকিয়া লইল। পুনরায় তাস বিতরণ করিয়া 'কল' সুরু হইল। হরেন বাম হাত দিয়া নিজের রগ দুইটা টিপিতে টিপিতে খবরের কাগজ পড়িতে লাগিল

ছবি। কাগজে খবর কি হে হরেন"

হরেন। একজন ডেটিনিউ মারা গেছে।

বীরেন। ও বেচারাদের আর কোন গতি হ'ল না।

ভবেশ ও জহরের প্রবেশ

ভবেশ। আজকে শরৎ বোসের স্টেট্‌মেণ্টটা পড়েছ হে?

জহর। পড়ি নি! একেবারে আগুন ছুটিয়ে দিয়েছে।

উভয়ে চেয়ার টানিয়া গোল টেবিলে বসিল

ভবেশ। এতেও কি ওদের লজ্জা হবে ভেবেছ?

জহর। রামঃ।

ভবেশ। আমার কি মনে হয় জান?

জহর। কি?

ভবেশ। এই কিষাণ মুভ্‌মেণ্টই শেষ পর্য্যন্ত সব্বাইকে গ্রাস করবে।

তাসের টেবিল হইতে বীরেন প্রতিবাদ করিল

বীরেন। সুভাষ বোস নয় কেন?

ভবেশ। সুভাষ বোস পারত, কিন্তু ওর মালা আর ফোটোর দিকে বড্ড বেশি লক্ষ্য।

২০১৭

বীরেন। সেটা কার নয় শুনি ?

ছবি। সক্কলের।

বীরেন। নেতা হতে হ'লে পাব্লিসিটি দরকার। যার যত পাব্লিসিটি, সেই তত বড় নেতা।

ভবেশ। তা হ'লে জবাকুসুম তৈলের নেতা হবার দাবি সবচেয়ে বেশি বল।

দুই তিন জন হাসিয়া উঠিল

বীরেন। আমাদের একটা প্রধান দোষ কি জান আমরা নিজের লোকের ভাল কখনও দেখতে পারি না, বুকটা কেমন যেন করকর ক'রে। আমাদের মধ্যে একজন লোক একটু মাথা-চাড়া দিয়ে অল-ইণ্ডিয়া ফিগার হয়েছে, কোথায় সকলে মিলে একজোট হয়ে তাকে তুলে ধরবে, না—

ভবেশ। আহা, তুলে ধরতে আমি রাজি আছি—

ভব আবার অধীর হইল

ভব। আরে, খেলতে বসেছ খেল না, কি বিপদ! বীরেন, কি দেবে দাও।

বীরেন তাস ফেলিল

ছবি। গোলামটা দিলি যে ?

বীরেন। ওর চেয়ে ছোট আর কিছু নেই।

ছবি। তবেই গেম হয়েছে এবার!

জহর। [পকেটে হাত দিয়া] ওহো, সিগারেট-কেসটা ফেলে এলাম বাড়িতে। ভবেশ, একটা সিগারেট দাও তো যদি থাকে।

ভবেশ সিগারেট-কেস বাহির করিয়া দিল

তুমি আবার ক্যাপ্স্ট্যান কবে থেকে ধরলে ?

ভবেশ। কাঁইচিটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেছে আজকাল।

জহর। গোল্ডফ্লেক ধর। লংক্লথের পাঞ্জাবি, বঙ্গলক্ষ্মীর কাপড়, গ্রেজকিড

পাম্‌শু আর গোল্ডফ্লেক সিগারেট—এ চারিটি জিনিসের মার নেই বাবা। ওই আজকাল বাঙালীত্ব।

ভবেশ। [হরেনের প্রতি] কি হে হরেন, অমন মিইয়ে রয়েছ কেন হে?

জহর। রগ টিপছ যে, মাথা ধরেছে নাকি?

হরেন কিছু না বলিয়া বিষণ্ণ হাসি হাসিল

ভবেশ। আপিসে শুনলাম, ধনেশ্বর তোমাকে ডেকেছিল ইণ্টারভিউ করবার জন্যে। কি হ'ল?

হরেন। ইণ্টারভিউ হয়ে গেল, বললে, পরে খবর পাঠাব।

ভবেশ। গান-টান শুনলে? রবি ঠাকুরের গান-টান গাও নি তো?

হরেন। [হাসিয়া] না।

ভবেশ। কি গান গাইলে?

হরেন। থিয়েটারি গান।

জহর। [সবিস্ময়ে] ধনেশ্বর গান শুনলে মানে? তার তো কুকুর পোষার শখ আছে জানি, গানের শখও আছে নাকি?

ভবেশ। তুমি কিছু জান না নাকি?

জহর। না, আমি তো এখানে ছিলাম না। কর্পোরেশনের সেই চাকরিটার চেষ্টায় কলকাতায় গেছলাম; হ'ল না যদিও কিছুই। ধনেশ্বরের খবরটা শুনি, ধনেশ্বর গান শিখছে নাকি?

ভবেশ। না, গান শিখছে না, ওদের হাই ইস্কুলটার জন্যে একজন গানের মাস্টার অ্যাপয়েণ্ট করবে। ওদের ইস্কুলে গানের ক্লাস খুলছে কিনা, তাই।

জহর। ও। কিন্তু গানের ও কি বোঝে, ও তো ডগ-এক্সপার্ট।

ভবেশ। ওর টাকা আছে, সুতরাং ও সব বোঝে। ওর বাপের টাকাতেই ইস্কুল, ও বুঝবে না তো কি তুমি বুঝবে?

জহর। আরে, ও যে আকাট মুখ্যু।

তাসের টেবিল হইতে মহাদেব ফোড়ন দিল

মহাদেব। আকাট মুখ্যু নইলে অমন বিজ্ঞাপন দেয়!

জহর। কি বিজ্ঞাপন?

মহাদেব। নান নীড অ্যাপ্লাই হু ইজ নট এ গ্র্যাজুয়েট।

ছবি। বাঃ, গাইয়ে গ্র্যাজুয়েট যদি পাওয়া যায়, লোকে ছাড়বে কেন? এইতেই শুনছি আড়াইশোখানা দরখাস্ত পড়েছে—আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট চাইলে তো দু চার হাজার প'ড়ে যেত।

মহাদেব। গানের সঙ্গে গ্র্যাজুয়েটের সম্পর্ক কি?

ছবি। যদি দুবার বি, এ, ফেল করা লোক চাইত, তা হ'লেই ঠিক হ'ত তোর মতে, না?

মহাদেব। [রুখিয়া,] দেখ ছবি, আমাকে বারবার এমন ক'রে ইন্‌সাল্ট ক'র না ব'লে দিচ্ছি। হাটে হাঁড়ি আমিও ভাঙতে জানি।

সক্রোধে তাস ফেলিল

ছবি। হাঁড়ি মানে?

মহাদেব। লজ্জা থাকলে লোক-সমাজে আর মুখ দেখাতে না তোমরা।

ছবি। কিসের লজ্জা?

বীরেন। আরে, ঝগড়া কর কেন?

মহাদেব। কিসের লজ্জা! দামড়া বোনের কীর্ত্তিতে শহরে টি টি প'ড়ে গেছে, যেন কিছু জানেন না, ন্যাকা!

ছবি। কি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

তাস ফেলিয়া আস্তিন গুটাইয়া উঠিয়া পড়িল

মহাদেব। আমিও ভয় করি নাকি তোমাকে?

আস্তিন গুটাইতে লাগিল

ভব। কি বিপদ দেখ দিকি!

বীরেন, ভবেশ ও জহর উঠিয়া যুদ্ধোন্মুখ দুই বীরের যুদ্ধোদ্যমে বাধা দিল

বীরেন। ছি ছি মহাদেব, এসব কি?

জহর। ব'স ব'স, কি ছেলেমানুষি কর সব!

ভবেশ। ক্লাবের একটা ডিসিপ্লিন থাকা দরকার তো?

সকলে মিলিয়া ছবি ও মহাদেবকে জোর করিয়া থামাইয়া দিল। তাহারা উভয়ে স্ব স্ব চেয়ারে বসিল

ভব। তোমাদের সঙ্গে খেলতে ব'সে দেখছি, মুস্কিলে পড়েছি। ছবি, কি ফেলবে ফেল, আমি আটা দিয়েছি—আচ্ছা, রগ-চটা লোক সব!

আবার খেলা চলিতে লাগিল। হরেন কলরবে একটু সচকিত হইয়া পড়িয়াছিল, কলরব থামিতে টেবিলে মাথা রাখিয়া শুইল

ভবেশ। ও কি হে হরেন, ঘুমুচ্ছ নাকি?

হরেন। [হাসিয়া] হ্যাঁ, একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে।

ভবেশ। কটা গান গাইতে হয়েছিল সবসুদ্ধু তোমাকে?

হরেন। পাঁচখানা।

জহর। পাঁচখানা গান গেয়েই কাত হয়ে পড়লে বাবা! শ্যাম তো সেবার বরযাত্রী গিয়ে সারারাত গাইলে একটানা।

ভবেশ। [হরেনকে] তোমাকে একটা টিপ দিই শোন। ওর প্রাইভেট সেক্রেটারি চপলাকান্তবাবুকে যদি তোয়াজ করতে পার, সব ঠিক হয়ে যাবে। ধনেশ্বর ওর মুঠোর মধ্যে।

জহর। তোয়াজ করবার উপায়টাও ব'লে দাও। ভয়ঙ্কর ঘুষখোর ব্যাটা।

ভবেশ। ঘুষ দিয়ে পেরে উঠবে না তুমি। একটি টিপ দিই শোন, ও নিজে গান-টান লেখে, কবিতাও লেখে। ওর লেখা গানে যদি সুর-টুর দিয়ে দিতে পার, তা হ'লে আর দেখতে হবে না।

কথা কহিতে কহিতে নবীন ও বিমলের প্রবেশ

নবীন। দেখে আয়, নর্মা শিয়ারার মাইরি দারুণ প্লে করেছে।

বিমল। আরে দ্যাৎ, আদ্ধেক কথা বোঝাই যায় না। ওর চেয়ে আমাদের বাংলা ফিল্ম ঢের ভাল।

নবীন। বাংলা ফিল্ম! বাংলা ফিল্মে নর্মা শিয়ারার বের কর দিকি একটা।

বিমল। দরকার নেই আমার নর্মা শিয়ারারে। এ কি হরেন নাকি, শুয়ে পড়লি যে? [ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে] খুব বেশি নেশা হয়েছে নাকি?

হরেন। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে।

নবীন। নেশা হয়েছে মানে?

বিমল। সাংঘাতিক কিছু নয়, আমার বাসায় গিয়েছিল, এক গেলাস সিদ্ধি খেয়েছে।

ভবেশ। তুমি আর সিদ্ধি খাওয়াবার লোক পেলে না, হরেনকে সিদ্ধি খাওয়াতে গেলে!

জহর। আমরা থাকতে!

পত্রিকাখানা টানিয়া উল্টাইতে লাগিল

নবীন। কাঁধে ক'রে বাড়ি না নিয়ে যেতে হয়—ওরা হ'ল গুড বয়।

একটা সিনেমা-সাপ্তাহিক উল্টাইতে উল্টাইতে

গাবো মাইরি একটা জিনিয়স। কি পোজ দেখেছিস? দেখ দেখ, ছবি-খানা দেখ একবার। [সকলকে দেখাইল]

ভবেশ। পত্রিকাখানা দাও তো জহর।

জহর। থাম, দিচ্ছি, একটু দেখে নিই, দাঁড়াও।

ভবেশ। আরে, ওয়াণ্টেড দেখতে চাও তো 'স্টেট্স্‌ম্যান' দেখ না, এই নাও। পত্রিকায় এডিটোরিয়ালটা দেখা হয় নি আজ। দাও।

ষ্টেট্স্‌ম্যান আগাইয়া দিল। হরেনের নাক ডাকিতে লাগিল

হরেন যে একেবারে ঘায়েল হয়ে পড়ল দেখছি!

বিভূতির প্রবেশ

বিভূতি। সান্যালের মেয়েটি মারা গেল।

দুই তিন জনে একসঙ্গে। তাই নাকি?

বিভূতি। পুড়িয়ে আসছি।

বীরেন। কে দেখছিল ?

বিভূতি। বিজন ডাক্তার।

মহাদেব। অত জুনিয়ারের হাতে রেখেছিল বরাবর ?

জহর। রেখেছে কি সাধে বাবা, ফী লাগে না এক পয়সা, তাই রেখেছে।

ভব। এখানকার জুনিয়ার সিনিয়ার সব সমান, সব ব্যাটাই হাতুড়ে।

ভবেশ। [বিভূতিকে] আর কি খবর ?

বিভূতি। ম্যাহোমেডেন স্পোর্টিং জিতেছে।

অনেকেই। তাই নাকি, কি ক'রে জানলে ?

বিভূতি। রেডিওতে এক্ষুনি শুনে এলাম।

জহর। আমাদের ক্লাবে একটা রেডিও না নিলে আর চলছে না।

ভবেশ। কামতাবাবুকে তো বলেছি, যদি কিছু আদায় করতে পারি। লছমিবাবুকেও বলেছি।

বীরেন। আমরা বেহারীদের গালও দোব, আবার তাদের কাছে গিয়ে ভিক্ষেও করব। বেশ আছি আমরা!

জহর। আমাদের অক্ষয় সেক্রেটারি টীম নিয়ে জামালপুরে গেছে না আজ ?

বিভূতি। হ্যাঁ।

ভবেশ। ফেরে নি এখনও ?

ছবি। এতক্ষণ ফিরেছে বোধ হয়। আসবে এখুনি।

বিভূতি। [নিদ্রিত হরেনকে দেখিয়া] হরেন শুয়ে ঘুমুচ্ছে যে এমন অসময়ে!

বিমল। ওকে বিরক্ত ক'র না, ওর ভয়ানক মাথা ধরেছে।

বিভূতি একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া বসিল

বিভূতি। হঠাৎ মাথা ধরবার মানে ?

বিমল। সব কথার মানে যে তোমাকে জানতেই হবে, তার মানে কি? আশ্চর্য্য দেখ দিকি, মাথা ধরার মানে ওকে বাতলাও এখন।

মহাদেব। [ছবির অলক্ষ্যে ইঙ্গিত করিয়া] তোমাদের পাড়ায় আসল খবরটা কি হে বিভূতি?

বিভূতি। [ছবির পানে এক নজর চাহিয়া ও হাসিয়া] ঠিক আছে, মোটর রোজ আসছে।

নবীন। বেড়ে আছ বাবা তুমি!

বিভূতি। বেড়ে আছি মানে?

বিমল। [ছদ্ম গাম্ভীর্য্যভরে] মানে, তীর্থস্থানে আছ আর কি! সবাইয়ের তো সে সৌভাগ্য হয় না।

ভবেশ পত্রিকার এডিটোরিয়াল পড়িতেছিল। সে হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিল

ভবেশ। দেখ, এটা চণ্ডীমণ্ডপ নয়, ক্লাব। এখানে ওসব আলোচনা চলবে না।

জহর। [স্টেট্‌স্‌ম্যানের ওয়াণ্টেড কলম হইতে চোখ তুলিয়া] ঠিক কথা।

হয়তো ইহা লইয়া একটা বাদ প্রতিবাদ সুরু হইত, কিন্তু অবিনাশ, অনাদি, করুণা, যুগল, ফনী, পরেশ, কান্তি ও বিপিন আসিয়া প্রবেশ করাতে তাহা আর হইল না। সকলেই সবিস্ময়ে তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিল। অবিনাশের হাতে বাঁশী, অনাদির হাতে সেতার, যুগলের হাতে এস্রাজ, করুণার হাতে ডুগি-তবলা, ফণীর হাতে বেহালা।

পরেশ, কান্তি ও বিপিনের শুধু-হাত

ভবেশ। কি ব্যাপার হে? থিয়েটার আসন্ন নাকি?

অবিনাশ। [হাসিয়া] কাল এখানকার স্কুলে প্রাইজ। হেডমাস্টার মশায় ধরেছেন, আমাদের কন্সার্টটা বাজিয়ে দিতে হবে।

পুনরায় খেলায় বাধা পড়াতে ভব ভ্রূকুঞ্চিত করিল ও নিজের হাতের তাসগুলি দেখিতে লাগিল

যুগল। আমাকে তোমরা ধ'রে আনলে, কিন্তু আমার কাল বাইরে যাওয়ার দরকার ছিল।

ফণী। থাম থাম। শেয়ালের ইয়ের দরকার হ'লে শেয়াল পর্ব্বতে গিয়ে ইয়ে করে—তোর যে সেই দশা হ'ল দেখছি রে।

ভবেশ। ছি যুগল, পাব্লিক ফাংশানে হেল্প করা প্রত্যেক সিটিজেনের কর্ত্তব্য। ওরকম ক'র না।

এডিটোরিয়ালে মন দিল

নবীন। [সিনেমা-সাপ্তাহিকের আর একটা ছবি দেখাইয়া] বিমল, এইটে দেখ, উঃ, দারুণ মাইরি! দাঁড়াবার কায়দাটা দেখ।

বিমল ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল। নবাগত পরেশ, কান্তি ও বিপিন আসিয়া তিনটি চেয়ার অধিকার করিল

ছবি। [অবিনাশকে] কোন গৎটা বাজাচ্ছ কালকে?

মহাদেব। ভৈরবী গৎটা বাজিও। ওটা বেশ হয় তোমাদের।

অনাদি। বিকেলবেলা ভৈরবী কি সুবিধে হবে? ভাবছি, কানাড়াটা বাজাব, যদিও কানাড়ারও সময় বিকেল নয়।

ছবি। না না, কানাড়াই ঠিক হবে। ইমন কি পূরবী হ'লে আরও ভাল হ'ত।

ভব ক্ষেপিয়া উঠিল

ভব। আরে বাপু, তোমরা বাজাবে তো সুরু ক'রে দাও না ও ঘরে গিয়ে খেলার মাঝখানে এসে বাগড়া দিচ্ছ কেন?

বাদকগণ পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিল। ভবেশ পত্রিকাখানা মুড়িয়া রাখিয়া সহসা আবিষ্কার করিল যে, তাস খেলিবার লোক জুটিয়া গিয়াছে

ভবেশ। এই তো আমরা আটজন হয়ে গেছি। দুখানা টেবিলও খালি রয়েছে—সময় নষ্ট ক'রে আর লাভ কি?

পরেশ। কিছু লাভ নেই।

বিপিন। চল, খেলা যাক।

কান্তি। ওঠ হে জহর, ওয়াণ্টেড পরে দেখো।

বিভূতি। [নবীনকে] ছবি দেখে আর কি হবে বাবা, চল।

হাত হইতে সিনেমা-সাপ্তাহিক কাড়িয়া লইল

বিমল। তোমরা গোলমাল ক'র না বেশি। হরেনটা একটু ঘুমুক, এমন নেতিয়ে পড়বে জানলে কি আমি ওকে সিদ্ধি খাওয়াই! কি বিপদ দেখ দিকি!

সকলে গিয়া দুইটি টেবিল দখল করিয়া তাস খেলিতে বসিল। পাশের ঘরে কানাড়ার গৎ সুরু হইয়া গেল। হরেন টেবিলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতে লাগিল। মিনিট দুই গৎ বাজিবার পর সহসা চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া গেল এবং গৎ থামিয়া গেল। হরেন স্বপ্ন দেখিতেছে। স্বপ্নটি এই ভাবে দেখানো যাইবে—আলো জ্বলিলে দেখা যাইবে, একটি কালো পর্দ্দা আসিয়া যুবক-সমিতির ঘরটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ডান দিকে সেক্রেটারির টেবিল টুল ও চেয়ার এবং বাম দিকে অর্গ্যানটি কেবল দেখা যাইতেছে। বাকি সব কালো পর্দ্দার ওপারে আছে। হরেন আসিয়া প্রবেশ করিল। হরেন প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিক দিয়া প্রবল গুম্ফধারী ভোজপুরী দারোয়ান বলিষ্ঠকায় রামবৃক্ষ সিংহও আসিয়া দাঁড়াইল

রামবৃক্ষ। কেয়া মাংতে হেঁ ?

হরেন। চপলাকান্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

রামবৃক্ষ। হোবে না।

হরেন। [সবিনয়ে] আমার বড় জরুরি দরকার।

রামবৃক্ষ। হোবে না।

হরেন। কেন ?

রামবৃক্ষ। [গুম্ফ চুমরাইয়া] হামরা খুশি।

হরেন সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল

বুঝলিন—চপ্লাকান্‌ত্‌বাবুকা সাথ মুলাকাৎ হোবে না—হামরা খুশি, বুঝলিন ?

হরেন। [আরও সবিনয়ে] আমার বড় জরুরি দরকার ছিল।

রামবৃক্ষ। [নির্ব্বিকারভাবে] উস্‌মে হামারা কেয়া হ্যায় ?

হরেন। মানে ?

রামবৃক্ষ। আরে ভাইয়া, হোবে না। চপ্লাকান্‌ত্‌বাবুকা সাথ এইসে মুলাকাৎ হোবে না। রামবৃছ সিং ফজুল বাৎমে গলনেবালা আদমি নেহি।

হরেন। [সসঙ্কোচে] মানে—

রামবৃক্ষ। [ভ্যাঙাইয়া] মানে মানে মানে! ত্নিয়েমে একিহি চিজকো তো মানে হ্যায়।

অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী সহযোগে টাকা বাজাইল

হরেন। [অর্থ বুঝিতে পারিয়া স্মিত মুখে] ও, তার জন্যে আর কি!

পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া একটি আধুলি দিতে গেল

রামবৃক্ষ। [সবিস্ময়ে] আরে, ছিয়া ছিয়া ছিয়া! ই কি ভদ্দর আদমিকা কাম হ্যায়! কুল্লম আঠ আনা পয়সা? উ কোন্ ছুঁয়েগা? ছিয়া ছিয়া ছিয়া!

হরেন। [সান্ত্বনয়ে] এর বেশি আর আমার কাছে নেই যে সিংজি।

রামবৃক্ষ। [ধমকাইয়া] তব সিধা রাস্তা দেখো। চপ্লাকান্ত্ বাবুসে মুলাকাৎ নেহি হোগা।

হরেন। এখন এই নাও, চাকরি হয়ে গেলে তোমাকে নগদ ত্নটাকা বকশিশ দোব।

রামবৃক্ষ। ঠিক?

হরেন। ঠিক।

রামবৃক্ষ। ঠিক?

হরেন। ঠিক।

রামবৃক্ষ। ঠিক?

হরেন। ঠিক।

রামবৃক্ষ আধুলি লইয়া ট্যাঁকে গুঁজিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হিতৈষী হইয়া উঠিল

রামবৃক্ষ। নোক্‌রি কোরবার হিন্‌ছা যদি থাকে, একঠো কাম মগর কোরতে হোবে।

হরেন। কি?

রামবৃক্ষ। চপ্লাকান্ত্ বাবুকা পয়ের চাট্‌নে পড়েগা।

হরেন। পা চাটতে হবে?

রামবৃক্ষ। [চক্ষু বড় বড় করিয়া] হাঁ, পাঁ চাটতে হোবে।

হরেন। [সবিস্ময়ে] কি ক'রে ?

রামবৃক্ষ। জিব্‌ভা নিকালকে। ওই টিবিল দেখছিন ?

টেবিলটি দেখাইল

হরেন। দেখছি।

রামবৃক্ষ। ওই কুরসি দেখছিন ?

চেয়ারটি দেখাইল

হরেন। দেখছি।

রামবৃক্ষ। ওই টুল দেখছিন ?

টুলটি দেখাইল

হরেন। দেখছি।

রামবৃক্ষ। চপ্পাকান্ত্‌বাবু কুরসি পর বৈঠকে টিবিল পর পয়ের চঢ়ায় দিবিন—আর আপ টুল পর বৈঠকে জিব্‌ভা নিকালকে উনকো পয়ের চাটবিন।

হরেন। [আরও বিস্মিত] এ রকম করার মানে ?

রামবৃক্ষ। চপ্পাকান্ত্‌বাবুকো খুশি।

গুম্ফ চুমরাইতে লাগিল

হরেন। আর কেউ করছে এ রকম ?

রামবৃক্ষ। বহুত, রোজ আতা হ্যায়।

হরেন। শ্যামবাবু এসেছিলেন ?

রামবৃক্ষ। হাঁ। মগর সেকলো না, বেচারা ওকি করতে করতে জান জি লিয়ে ভাগলো।

হরেন হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রামবৃক্ষ আর একটু সদয় হইল

হামারা একঠো সল্লা শুনবিন ?

হরেন। কি ?

রামবৃক্ষ। পহলে এক টুকরা হররা খাইয়ে লিন, তব কুস্থ মালুম নেই হোবে।

হরেন। হররা কি ?

রামবৃক্ষ। আপনারা যাকে বোলছিন হোরতুক্কি।

হরেন। হরীতকী ?

রামবৃক্ষ। হাঁ, হোরতুক্কি।

হরেন। কোথায় পাব এখন ?

রামবৃক্ষ। হামারা বটুয়ামে হ্যায়।

কোমরের বটুয়া হইতে এক টুকরা হরীতকী বাহির করিয়া হরেনকে দিল

বাস্, মুমে দে কর চবাতে রহিয়ে। কুস্ মালুম হোবে না।

হরেন যন্ত্রচালিতবৎ তাহা মুখের মধ্যে পুরিয়া চিবাইতে লাগিল

চপ্লাকান্ত্ বাবুকো বোলাই ?

হরেন সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল

এ চপ্লাকান্ত্ বাবু, এক পয়ের চাটনেওয়ালা ছোকরা হাজির হুয়া হ্যায়।

চপলাকান্তবাবু প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখভাবে দাম্ভিকতা পরিস্ফুট। চেহারা স্থূলাকৃতি, জবড়জং, দেখিলেই রাগ হয়। চপলাকান্ত আসিতেই হরেন মেরুদণ্ড বক্র করিয়া নমস্কার করিল। রামবৃক্ষ চলিয়া গেল

চপলাকান্ত। কে আপনি ?

হরেন। [শ্রদ্ধা-কোমল কণ্ঠে] আজ্ঞে, আমি—

চপলাকান্ত। আমি! নাম কি বলুন না ?

হরেন। হরেন। আমি আপনাদের ইস্কুলে গানের মাস্টারি—

চপলাকান্ত। বুঝেছি। মাইনে এখন আমরা ত্রিশ টাকার বেশি দিতে পারব না, তা জানেন তো ?

হরেন। জানি।

চপলাকান্ত। পা চাটতে রাজি আছেন ?

হরেন। আছি।

চপলাকান্ত। আপনার জিব দেখি?

হরেন জিব বাহির করিল

দাঁত দেখি?

হরেন দাঁত বাহির করিল

মুখের মধ্যে কোন রকম ঘা-টা নেই তো?

চপলাকান্ত। একবার এক ব্যাটাকে দিয়ে পা চাটিয়ে পাময় আমার একজিমা হয়ে গেছল। আপনি রোজ মুখ ধোন তো?

হরেন। ধুই।

চপলাকান্ত। কি দিয়ে?

হরেন। খড়িগুঁড়ো।

চপলাকান্ত। এবার থেকে কুন্দদন্ত টুথ পাউডার ব্যবহার করবেন, ওতে আমার শেয়ার আছে।

হরেন। আজ্ঞে, এবার থেকে তাই করব।

চপলাকান্ত। বমি-টমি ক'রে আবার কেলেঙ্কারি করবেন না তো?

হরেন। আজ্ঞে না।

চপলাকান্ত। আচ্ছা, বেশ। আপনি একটা গৎ বাজান ততক্ষণ, আমি আসছি এখনি।

চপলাকান্তবাবু চলিয়া গেলেন। হরেন অর্গ্যানে বসিয়া একটি গৎ বাজাইতে লাগিল।
একটু পরে চপলাকান্তবাবু ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার হাতে একটি খাতা ও
একটি কুকুরের মুখোশ

চপলাকান্ত। দেখুন, চাকরি যদি রাখতে চান, আর একটি কাজ করতে হবে। এই মুখোশ প'রে আমার তৈরি এই গানটা গাইতে হবে। ধনেশ্বরবাবু ভারী পছন্দ করেন গানখানা। সুর আমিই দিয়েছি। আপনি এটা একটু রপ্ত ক'রে নিন। আমার মুখস্থ আছে, আপনি খাতা দেখে গানটা মুখস্থ করবেন।

খাতাটা হরেনকে দিলেন

নিন, এইবার মুখোশটা পরুন।

হরেন মুখোশ পরিল

কুকুর পেছনের পায়ে দাঁড়ালে যে রকম দেখতে হয়, সেই ভাবে দাঁড়ান।

হরেন সেই ভাবে দাঁড়াইল

এইবার আমার সঙ্গে সঙ্গে গান করুন।

চপলাকান্তের সহিত হরেন গাহিতে লাগিল। চপলাকান্ত গাহিবেন, শুনিয়া শুনিয়া হরেন গাহিবে এক এক কলি

গান

তু তু তু ক'রে ডাকবে যখন,
ল্যাজটি নেড়ে আসব তখন,
লুটিয়ে প'ড়ে চাটব চরণ—
রাতুল চরণ রে।
পারবে না কেউ রুখতে মোরে
পারবে না রে কেউ।
ভেউ ভেউ ভেউ।
শিস দিয়ে বা আঙুল নেড়ে
লেলিয়ে দিলেই ছুটব তেড়ে,
শত্রু মিত্র বিচার ছেড়ে
ফেলব পেড়ে রে।
টুঁটির পরে দাঁতের পাটি
বসিয়ে দেব ক্যাঁক।
ঘ্যাক ঘ্যাক ঘ্যাক।
আবার যখন চাবুক তুলে
ফেলবে পিঠের চামড়া খুলে,
ল্যাজ গুটিয়ে চরণমূলে
থাকব প'ড়ে রে।

বলব, প্রভু, ঠাঁই দাও গো,
একটুখানি শুই।
কুঁই কুঁই কুঁই।

আবার সহসা সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেল। আলো জ্বলিলে দেখা গেল, কালো পর্দা অন্তর্হিত হইয়াছে, পূর্ব্ববৎ সকলে বসিয়া তাস খেলিতেছে, পাশের ঘরে ঐক্যতান বাজিতেছে, হরেন গোল টেবিলে মাথা রাখিয়া গোঁ গোঁ করিতেছে। বিমল তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল

বিমল। [হরেনকে ঠেলিয়া] হরেন, হরেন, হরেন, ওঠ ওঠ ওঠ। এঃ, তুই ডোবালি দেখছি আমাকে।

হরেন উঠিয়া পড়িল

হরেন। উঃ, বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখলাম।

বিমল। কি স্বপ্ন?

হরেন। যেন—[সহসা থামিয়া গেল]

বিমল। মাত্র এক গেলাস সিদ্ধি খেয়ে একি কেলেঙ্কারি তোর!

হরেন হতভম্ভ হইয়া বসিয়া রহিল

ভবেশ। একটু তেঁতুল গুলে খাইয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

বিমল। তেঁতুল এখন পাই কোথা?

বিমল যে টেবিল হইতে উঠিয়া আসিয়াছিল, সেই টেবিলের খেলোয়াড়গণ বিমলকে ডাকিতে লাগিল

বিভূতি। সেসব বাড়ি গিয়ে ক'র, এখন এস।

জহর। আশ্চর্য্য লোক!

পরেশ। এইজন্যেই তো খেলতে ইচ্ছে করে না তোমাদের সঙ্গে! সায়েবরা ব্রিজ খেলে, টুঁ শব্দটি থাকে না।

বিমল। [হরেনকে] তুই আর একটু ঘুমো না হয়।

বিমল গিয়া খেলায় যোগদান করিল। হরেন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পাশের ঘরে কানাড়া গৎ বাজিতে লাগিল। পাশের ঘর হইতে ঝগড়ু বাহির হইল। তাহার হাতে সুতায় বাঁধা কতকগুলি স্লিপ।

ঝগড়ু। [হরেনকে] বাবু, সিগারেটের দামটা দেবেন? অনেক দিন হয়ে গেল।

হরেন যেন সম্বিত ফিরিয়া পাইল

হরেন। কত বাকি আছে?

ঝগড়ু। পাঁচ টাকা সাড়ে ন আনা।

হরেন। এখন নয়, পরে দোব।

ঝগড়ু চলিয়া গেল। তাসের টেবিল হইতে নবীন ইহা লক্ষ্য করিল

নবীন। হরেন, ধার শোধ করছ নাকি হে, তা হ'লে আমার দোকানের টাকা কটাও ফেলে দিও ভাই।

হরেন কিছু বলিল না, নবীনের দিকে চাহিয়া শুধু একটু হাসিল

ছবি। তোমার আবার কিসের দোকান?

নবীন। আমার মানে বৈজুপ্রসাদ ভূধরমলের। ওদের দোকানে সেল্‌স্‌ম্যান হয়ে ঢুকেছি যে আমি ও মাস থেকে। হরেন গেল মাসে কয়েকটা শার্ট করিয়েছে সেখান থেকে কাপড় নিয়ে।

ছবি। ও।

ভব। আবার তোমরা বাজে কথা কইতে সুরু করলে? জ্বালাতন তোমাদের নিয়ে! খেলতে বসেছ, খেল না।

বীরেন। আমাদের নির্ম্মলের 'মনোহারি স্টোর্স' কেমন চলছে হে?

বিভূতি। [তাস ফেলিয়া] ভালই।

নবীন। ওরে ঝগড়ু, জল নিয়ে আয় এক গেলাস।

মহাদেব। আর চারটি সুপুরি।

ঝগড়ু জল ও সুপারি দিয়া গেল

বীরেন। আরে, নির্ম্মলের নাম করতে করতেই নির্ম্মল এসে হাজির যে!

নির্ম্মল আসিয়া প্রবেশ করিল এবং পকেট হইতে এক তাড়া বিল বাহির করিল

ছবি। ওকি, পকেট থেকে বার করছ বিল নাকি?

নির্ম্মল। [হাসিয়া] এইখানেই তোমাদের সব্বাইকে একসঙ্গে পাওয়া যাবে। [হরেনের দিকে চাহিয়া] কিছু দেবে নাকি ভাই ?

হরেন। [ম্লান হাসি হাসিয়া] এখন নয়, পরে।

বীরেন। বিল-টিল এখন রাখ। ক্লাবে বিল! তুই যে মাড়োয়ারীরও বেহদ্দ হয়ে উঠলি রে!

অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। হিপ হিপ হুর্‌রে।

ভবেশ। তোমাদের টিম জিতল নাকি ?

অক্ষয়। আরে ড্যাং, গোরাদের সঙ্গে জেতা সোজা নাকি ? তিনটি গোল ঠেসে দিয়েছে। তা ছাড়া রেফারি ব্যাটা ভয়ঙ্কর পার্শিয়ালিটি করছিল।

ছবি। তবে 'হিপ হিপ হুর্‌রে' কিসের ?

অক্ষয়। হরেনের চাকরি হয়ে গেছে।

অনেকেই। তাই নাকি ?

উল্লাসে উত্তেজনায় হরেন দাঁড়াইয়া উঠিল

হরেন। কি ক'রে জানলে তুমি ?

অক্ষয়। ধনেশ্বরবাবুর সঙ্গে স্টেশনে দেখা হ'ল, তিনিই বললেন। তোমার গান খুব ভাল লেগেছে তাঁর।

হরেন। সত্যি ?

অক্ষয়। কালই অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার পাবে। থ্রী চিয়ার্স ফর্ হরেন—হিপ হিপ হুর্‌রে, হিপ হিপ হুর্‌রে, হিপ হিপ হুর্‌রে।

সকলে। হিপ হিপ হুর্‌রে।

যবনিকা

জল

[একটি প্রকাণ্ড কাচ-পাত্রের অভ্যন্তর। পাত্রটি ফ্লাস্ক্-জাতীয় এবং এত বড় যে, তাহার সমস্তটা দেখা যাইতেছে না। যতটুকু দেখা যাইতেছে, তাহা বহুগুণ বৃহদীকৃত অতি-ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। দৃশ্যমান অংশের দুই পার্শ্বে দুইটি মোটা সাদা কীলকের মত বস্তু দেখা যাইতেছে, এ দুইটি প্ল্যাটিনাম ইলেক্ট্রিক নোড। কাচপাত্রটির ভিতরে কোটি কোটি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু ইতস্তত সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু তাহাদের সকলকে দেখা যাইতেছে না। বৃহদীকৃত অংশটুকুর মধ্যে যখন যাহারা আসিতেছে, তাহাদেরই কেবল দেখা যাইতেছে। নাটকীয় প্রয়োজনে পরমাণুগুলিকে মনুষ্যরূপে কল্পনা করা হইল। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের বিভিন্নতাও তাহাদের পরিচ্ছদের বর্ণ-বিভিন্নতা দ্বারা প্রদর্শিত হইবে। হাইড্রোজেনদের পরিচ্ছদ শ্বেত এবং অক্সিজেনদের পরিচ্ছদ গৈরিক বর্ণের। হাইড্রোজেনদের পরিচ্ছদে হাইড্রোজেনের প্রোটন-ইলেক্ট্রনসমন্বিত রাসায়নিক রূপটি লাল সুতা দিয়া অঙ্কিত থাকিবে; তাহাদের পতাকাও এই চিহ্ন বহন করিবে। অক্সিজেনদেরও তদ্রূপ।]

কয়েকটি হাইড্রোজেন-পরমাণু তর্ক করিতে করিতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন

১ হা। আমাদের ধর্ম্মই আলাদা, সে কথা বললে চলবে কেন?

২ হা। ধর্ম্ম আলাদা সে কথা কে অস্বীকার করছে, কিন্তু আমরা, যে কারণেই হোক, এক জায়গায় এসে জুটেছি যখন—

৩ হা। সে তো ঠিকই।

১ হা। সে তো ঠিকই! বলতে বাধল না তোমার কথাটা, গলায় আটকে গেল না? ছি ছি ছি ছি।

৩ হা একটু কাচুমাচু হইয়া গেলেন

২ হা। [১ হা-কে] আহা, তুমি কথাটা বুঝছ না তলিয়ে। আমাদের সঙ্গে অক্সিজেনদের অনেক বিষয়ে অমিল আছে তা ঠিক, ও ব্যাটারা পাজির পা-ঝাড়া তাও ঠিক; কিন্তু এটাও তো ঠিক কথা, আমরা, যে কারণেই হোক,

একসঙ্গে এসে জুটেছি এবং একসঙ্গে বসবাসও করতে হচ্ছে। কথাটা বুঝে দেখ তলিয়ে।

১ হা। [উষ্মাভরে] আমি বুঝতে চাই না। [৪ হা-কে] তুমি চাও ?

৪ হা। না।

১ হা। [৫ হা-কে] তুমি চাও ?

৫ হা। আমি ! আমি বাবা সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না, যে কদিন বাঁচব, যেখানেই থাকি চুপচাপ থাকব।

১ হা। [চটিয়া] তার মানে ? ভিদভিদে স্বার্থপর পাজি তুমি।

৫ হা হাসিভরা দৃষ্টিতে ৩ হা-র দিকে চাহিলেন

৬ হা। [১ হা-কে] আরে, তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন, আমি তোমার পক্ষে আছি। ল'ড়ে যাও ব্যাটাদের সঙ্গে, তারপর যা হয় হবে। কি করতে চাও তুমি ?

১ হা। মীটিং।

২ হা। মীটিং ! আমি ভাবছিলাম, বুঝি ঘোরতর কিছু করবে। মীটিং করতে আমিও রাজি আছি। ওরাও করছে।

৩ হা। সে তো ঠিকই।

১ হা। সবাই রাজি আছ তা হ'লে ?

৭ হা এতক্ষণ কিছু বলেন নাই, গলা-খাঁকারি দিয়া আগাইয়া আসিলেন

৭ হা। [১ হা-কে] আজ হঠাৎ তুমি এত ক্ষেপে গেলে কেন বল তো ?

২ হা। আসল কথাটা খুলে বল দিকি ভাই ?

৬ হা। যাই কারণ হোক, তোমার স্বপক্ষে আমি আছি, বল তুমি খুলে— আজ ক্ষেপবার কারণটা কি ?

৫ হা। আমারও কৌতূহল হচ্ছে, যদিও আমি কারও সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না।

১ হা চক্ষু পাকাইয়া নিরুত্তর রহিলেন

৪ হা। মীটিং করবার আগে কারণটা শোনা দরকার।

৩ হা। সে তো ঠিকই।

৭ হা। কারণটা বল, সবাই বুঝে দেখি। ধাঁ ক'রে একটা মীটিং করলেই হ'ল না তো! এতদিন তুমি কিছু বল নি, আজ হঠাৎ ক্ষেপে উঠলে, এর মানেটা কি! ধাঁ ক'রে একটা মীটিং করলেই হ'ল না তো! [অর্থভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন]

২ হা। আমার মতে মীটিং জিনিসটাই ধাঁ ক'রে করা যায়। আর কিছু ধাঁ ক'রে করা শক্ত আমাদের পক্ষে।

৭ হা। কি নিয়ে মীটিং করবে, কেন মীটিং করবে, আজই বা হঠাৎ কেন মীটিং করবে, এর কথাতেই বা কেন মীটিং করবে—এ সবগুলি পরিষ্কার না হ'লে—

৩ হা। সে তো ঠিকই।

১ হা এইবার কথা কহিলেন

১ হা। মীটিং করতে চাই নিজের জন্যে নয়, ধর্ম্মের জন্যে। আমাদের ধর্ম্ম আজ বিপন্ন।

২ হা। [সবিস্ময়ে] তাই নাকি!

১ হা। [৪ হা-কে] ধর্ম্ম বিপন্ন নয়?

৪ হা। নিশ্চয়।

১ হা। কে না জানে, আজ আমাদের ধর্ম্ম বিপন্ন! কে না জানে, ধর্ম্মকে বিপন্ন হতে দিয়েছি ব'লেই আমরাও আজ বিপন্ন, আমরাও আজ লাঞ্ছিত, আমরাও আজ অপমানিত! কে না জানে, এই ধর্ম্মকে যতদিন আমরা আমাদের জীবনে তার সম্মানিত সর্ব্বোচ্চ আসন দিতে না পারব, ততদিন আমাদের মুক্তি নেই! কে না জানে, আমাদের অপমানিত আত্মা যে বদ্ধ কারাগৃহের রুদ্ধ দ্বারে মাথা কুটে মরছে, সে কারাগৃহকে ধূলিসাৎ করতে পারে কেবল আমাদের ধর্ম্মবল! কে না জানে, যে মর্ম্মন্তুদ বেদনার কুশাঙ্কুর অহরহ আমাদের নগ্ন চরণতলকে ক্ষতবিক্ষত করছে, তার একমাত্র—

সবেগে অষ্টম হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রবেশ

৮ হা। সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।

অনেকেই। কি? কি?

৮ হা। [বুক চাপড়াইয়া] হায় হায়, আমার ষোল বছরের জোয়ান মেয়েকে কতকগুলো অক্সিজেন-গুণ্ডা এসে ধ'রে নিয়ে চ'লে গেল। হায় হায় হায় হায়!

বুক চাপড়াইতে লাগিল

৫ হা। থানায় খবর দিয়েছ?

৮ হা। সেখানেই যাচ্ছি, কিন্তু দারোগাও যে অক্সিজেন।

৪ হা। তবু যাও, থানায় খবর দেওয়াটা দরকার।

৩ হা। সে তো ঠিকই।

৮ হা চলিয়া গেল

১ হা। বন্ধুগণ, এখনও কি সন্দেহ আছে যে, আমাদের ধর্ম্ম বিপন্ন?

২ হা। দুটি বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে।

১ হা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ২ হা-র পানে চাহিলেন

১ হা। কি কি?

২ হা। আমার প্রথম সন্দেহ, তুমি এই যে আজ হঠাৎ 'ধর্ম্ম ধর্ম্ম' ব'লে চেঁচিয়ে একটা হৈ চৈ বাধাবার চেষ্টায় আছ, এর মূল কারণ ধর্ম্ম নয়, এর মূল কারণ তোমার ছেলে চাকরি পায় নি, একটি অক্সিজেনযুবক পেয়েছে। আমার দ্বিতীয় সন্দেহ, এই যে হাইড্রোজেনকুমারীটি অক্সিজেন-গুণ্ডা কর্ত্তৃক অপহৃত হয়েছে, এর মূল কারণ ওর বাপটি অপদার্থ। খুব সম্ভবত ওই মেয়েটির কাছ থেকে ওই গুণ্ডার দল প্রণয়ঘটিত কোনরূপ ইসারাও পেয়েছিল, তা না হ'লে দিনে দুপুরে—

১ হা। তুমি পাষণ্ড।

২ হা। সম্ভবত। কিন্তু আমার যা সত্যি সত্যি মনে হচ্ছে, অকপটে আমি তা বলতে বাধ্য এবং এখানকার লোকাল-বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে ধর্ম্ম নিয়ে দলাদলি করবার পক্ষপাতীও আমি নই।

৩ হা। সে তো ঠিকই।

১ হা। আবার বলছি, তুমি পাষণ্ড। আমাদের ভোটের জোরে আজ তুমি লোকাল-বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে অক্সিজেনদের চাকরি দিচ্ছ, লজ্জা করে না তোমার ?

৫ হা। [৬ হা-কে জনান্তিকে] কোণ-ঠাসা করেছে।

৬ হা। [চুপি চুপি] করবে না, অতি পাজি লোক যে! কিছুতেই কণ্ট্রাক্টটা আমায় দিলে না হে।

২ হা। চুপি চুপি বললেও তোমার কথাটা শুনতে পেয়েছি। দেখ, লোকাল-বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে আমি ন্যায়বিচার করতে বাধ্য। আমায় সব দিক ভেবে তবে তো—

৭ হা। [হাসিয়া] কিন্তু ভায়া, স্বজাতির উপকার করা কি ন্যায়ধর্ম্মের বাইরের জিনিস ? এই যে আমরা না খেয়ে না দেয়ে তোমার ভোটের জন্য চতুর্দ্দিক তোলপাড় ক'রে বেড়ালাম, এইটেই কি তার প্রতিদান ?

২ হা। আমায় কি করতে বল তোমরা। সমস্ত অক্সিজেনদের আপিস থেকে তাড়িয়ে দোব ?

১ হা। নিশ্চয়, পত্রপাঠ—

৭ হা। না গো, না, সবাইকে তাড়িয়ে দিতে যাবে কেন, তবে আমাদের দিকটাও একটু দেখো, এই আর কি।

২ হা। যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আমি—

১ হা। কিছুই করছ না তুমি। তুমি ভেবেছ, অক্সিজেনদের খোশামোদ ক'রে হাতে রাখতে পারলে আগামী ইলেক্‌শনে তোমার সুবিধে হবে। মনেও স্থান দিও না তা, ওরা সাপের জাত, সুযোগ পেলেই ছোবল দেবে।

৬ হা। নিঃসন্দেহে।

২ হা। কিন্তু আমাদের মধ্যেই বা একতা কই, আমাদের মধ্যে খুব বড় একটা দল অক্সিজেনদের সঙ্গে বেশ মেলামেশা করে। তারা বিশ্বপ্রেমিক।

১ হা। তারা স্বার্থপর। তারা ভ্রদলেরই সুবিধেটা পুরোমাত্রায় ভোগ করতে চায় এতটুকু স্বার্থত্যাগ না ক'রে। তারা সুবিধেবাদী, তারা পাঁঠার মাংসটি খেতে চায়, কিন্তু পাঁঠা কাটা দেখতে পারে না, আড়ালে পাঁঠাটি অপরকে দিয়ে কাটিয়ে নিতে চায়!

৬ হা। [১ হা-কে] অত কথায় দরকার কি, তুমি মীটিং করতে চাও, কর না হে, আমি তোমার স্বপক্ষে আছি। [৪ হা-কে] তুমি নেই?

৪ হা। নিশ্চয়।

৭ হা। আমার কিন্তু মনে হয়, ভেবে দেখা উচিত। ধাঁ ক'রে কিছু একটা—

২ হা। মীটিং করতে আমার আপত্তি নেই। সময়ে খবর পেলে আসব, এখন আমি চলি। এস হে।

২ হা ও ৩ হা চলিয়া গেলেন

৬ হা। [২ হা-র গমনপথের দিকে চাহিয়া] অতিশয় দাম্ভিক লোক। মোসায়েবটিও জুটেছে বেশ।

৭ হা। [উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া] গোড়ায় গোড়ায় বলি নি আমি! গরিবের কথা বাসী হ'লে মিষ্টি লাগে ভায়া।

৫ হা। [সবিস্ময়ে] আপনি তো মশাই, ওকে ভোট দেবার জন্যে সাধাসাধি করেছিলেন, এখন আবার বলছেন—

৭ হা। আহা, সে আগেই বলেছিলাম আমি, ইলেক্‌শনের আগে—অনেক আগে—[১ হা-কে দেখাইয়া] ও সব জানে।

৫ হা। এইবার ব্যাপারটা খুলে বল।

১ হা। এর পরের ইলেক্‌শনে আমি দাঁড়াব।

৪ হা। নিশ্চয়।

৬ হা। মীটিংটা ক'রে ফেল।

৭ হা। তুমি দাঁড়ালে তো বাঁচি আমরা। তাই তো আমি গোড়ায়

জানতে চাইছিলাম, কি নিয়ে মীটিং করবে, এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'ল। তা ছাড়া ও লোকটার সামনে খোলাখুলিভাবে তোমার কথায় সায় দিতেও পারছিলাম না। বোঝই তো।

নেপথ্যে বাদ্যভাণ্ড ও কলরব শোনা গেল

৫ হা। [দূরের দিকে চাহিয়া] একদল অক্সিজেন এই দিকে আসছে হে, প্রসেশন ক'রে বাজনা বাজিয়ে।

১ হা। তাই নাকি ?

৬ হা। হ্যাঁ হে, একটি দঙ্গল।

১ হা। খুব সম্ভব মীটিং করবে। তালে ঠিক আছে ওরা। অথচ আমরা—

৭। চল, একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে শোনা যাক, কি করে ব্যাটারা।

হাইড্রোজেন-পরমাণু দল অন্তর্হিত হইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গৈরিক-পতাকাধারী গৈরিক-পরিচ্ছদ-পরিহিত অক্সিজেন-পরমাণুগণের প্রবেশ। একটি অক্সিজেন-যুবকের স্কন্ধ হইতে হার্মোনিয়ম বিলম্বিত, আর একজনের মুখে বাঁশী বাকি কয়েকজন জাতীয় সঙ্গীত গাহিতেছেন। ইহা ব্যতীত আরও অনেকে আছেন। হাইড্রোজেন-পরমাণুদের অনুমান সত্য, একটি সভাই হইবে। একজন মাল্যশোভিত সভাপতি এবং ঠিক পিছনেই তাঁহার আসন বহন করিয়া একটি যুবক দাঁড়াইয়া আছেন। নিকটেই আর একজনের মস্তকে একটি পাট-করা শতরঞ্চি দেখা যাইতেছে। জাতীয় সঙ্গীত চলিতে লাগিল।

—জাতীয় সঙ্গীত—

আমরা আর্য্য, আমরা অক্সিজেন
আমরা শুদ্ধ
আমরা বুদ্ধ
আমাদের কথা ভগবান স্মরিছেন।

নির্ম্মল করি বিষাক্তে
বিষ্ণুভক্তে, কি শাক্তে
তীব্র দাহনে জ্বালাই আমরা
গালাইয়া করি ঢালাই আমরা
অক্‌সাইডের সনাতন ছাঁচে হে—
গ্রাহ্য করি না কেবা কিবা বলিবেন।
আমাদের কথা ভগবান স্মরিছেন।
আমারা শুদ্ধ
আমরা বুদ্ধ
আমরা আর্য্য, আমরা অক্সিজেন।

সঙ্গীত শেষ হইয়া গেলে সভাপতির আসনটি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল, শতরঞ্জিটিও পাতা হইল। দেখিতে দেখিতে সভা জমিয়া উঠিল, যাঁহারা বসিতে পাইলেন বসিয়া পড়িলেন, যাঁহারা পাইলেন না দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখা গেল, সভায় কেবল অক্সিজেন-পরমাণু নয়, হাইড্রোজেন-পরমাণুও আছেন। ১ হা, ৪ হা, ৫ হা, ৬ হা এবং ৭ হাও সভাপতির পিছন দিকে ভিড়ের মধ্যে আসিয়া জুটিলেন।

সভাপতি। আজ সকাল থেকে ক্রমাগত সভা ক'রে বেড়াচ্ছি, আরও দু জায়গায় বাকি আছে, স্থতরাং আপনাদের যার যা বলবার আছে, একে একে চটপট ব'লে যান।

একটি অক্সিজেন-পরমাণু উঠিয়া দাঁড়াইলেন

আপনি বলবেন? বেশ, বলুন।

১ অ। আমরা সকলেই এক বিরাট কারাগারে বন্দী, আমাদের বাহির হইবার পথ নাই, দুর্ভেদ্য কারা-প্রাচীর নিষ্ঠুর নিশ্চলতায় আমাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু আমাদের কারা-প্রাচীরের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহা দুর্ভেদ্য হইলেও স্বচ্ছ। ইহার ভিতর দিয়াই আমরা আকাশ দেখিতে পাই, মহাকাশচারী সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের জ্যোতির্ম্ময় অভিযান বিস্মিত নয়নে

চাহিয়া দেখি, ছুটিয়া বাহির হইতে চাই, কিন্তু দুর্ভেদ্য প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসি, মনে হয়—

সভাপতি। সংক্ষেপ করুন।

১ অ। মনে হয়, কবে ওই মহাকাশে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত স্বচ্ছন্দে সঞ্চরণ করিতে পারিব! মনে হয়, কবে আমাদের এই অভিশপ্ত জীবনের অবসান হইবে! মনে হয়—

২ অ। [ঈষৎ নিম্ন কণ্ঠে] আরে কচু খেলে যা, তুমি আগে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তার কথাটা বল না, আকাশ নিয়ে পরে মাথা ঘামিও।

সভাপতি। [শান্ত কণ্ঠে] সংক্ষেপে কাজের কথাটাই আগে বলুন।

১ অ। আচ্ছা বেশ।

গলা-খাঁকারি দিয়া বক্তৃতার মোড় ফিরাইলেন

আপনারা সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, আজকাল ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তাগুলির কি ভীষণ অবস্থা। প্রায় প্রতি রাস্তাতেই গ্রীষ্মকালে এক হাঁটু ধূলা এবং বর্ষাকালে এক হাঁটু কাদা থাকে। পুলগুলিও মেরামত-অভাবে জীর্ণ। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, কণ্ট্রাক্টারেরা ফাঁকি দিতেছে। এই প্রসঙ্গে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, বর্ত্তমানে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের শতকরা আশিজন কণ্ট্রাক্টার এবং পঁচাত্তরজন ওভারশিয়ারই হাইড্রোজেন-জাতীয়। যোগ্যতা সত্ত্বেও বহু অক্সিজেন-কর্ম্মী দেশের কাজে নিজেদের শক্তি নিয়োগ করিবার অধিকার হইতে অন্যায় ভাবে বঞ্চিত হইয়াছেন। ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড এবং লোকাল-বোর্ড উভয় প্রতিষ্ঠানেরই চেয়ারম্যান হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেন যখন কর্ণধার, তখন অক্সিজেনদের কর্ণই যে বারংবার নিপীড়িত হইবে, তাহাতে যদিও বিস্মিত হইবার কিছু নাই, তবু আমরা করদাতাগণ, এই সভায় আমাদের কাতর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছি। আশা করি, ইহা নিষ্ফল হইবে না।

২ অ। বাঃ, বেড়ে বলেছ, এইবার ব'স।

সভাপতি। হ্যাঁ, আপনি এবার বসুন।

করতালির মধ্যে ১ অ উপবেশন করিলেন

আরও যদি কারও কিছু বলবার থাকে তো বলুন।

৩ অ। [সবিনয়ে] আমাকে এঁরা এই সভায় কিছু বলবার জন্যে অনুরোধ করেছেন, আমিও তাতে সম্মতি দিয়েছি—নিজের বাগ্মিতা জাহির করবার জন্যে নয়, কারণ আমি যে বাগ্মী নই, তা আপনারা সকলেই জানেন; আমি সম্মতি দিয়েছি কতকটা কর্ত্তব্যের খাতিরেও বটে, কতকটা আপনাদের সাহচর্য্যসুখ লাভ করবার জন্যও বটে। বর্ত্তমানে হাইড্রোজেন-অক্সিজেনের বিরোধটা অতিশয় প্রবল আকার ধারণ করেছে, এবং এ সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা নানারকম গুজব বক্তৃতায় ও খবরের কাগজের মারফৎ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হওয়াতে সমস্যাটিকে আরও জটিল ক'রে তুলেছে। এই যেমন ধরুন, 'নারী-ধর্ষণের' কথা। কতকগুলি দুর্ব্বৃত্ত প্রতি বৎসরই এই হীন কার্য্য ক'রে থাকে, গত বৎসরে এ সম্বন্ধে যতটুকু সত্য আমি সংগ্রহ করেছি, সেইটুকুই এই সভায় বলব। কোন মন্তব্য আমি করব না, আপনারা নিজেরাই এ থেকে যা বোঝবার বুঝে নিন।

অক্সিজেন কর্ত্তৃক অক্সিজেন-নারী ধর্ষণ

বিধবা—১২ জন

সধবা—২৪ জন

কুমারী—১৮ জন = মোট ৫৪ জন

অক্সিজেন কর্ত্তৃক হাইড্রোজেন-নারী ধর্ষণ

বিধবা—৭ জন

সধবা—১৩ জন

কুমারী—৬ জন = মোট ২৬ জন

হাইড্রোজেন কর্তৃক হাইড্রোজেন-নারী ধর্ষণ

বিধবা—৩৫ জন

সধবা—২০ জন

কুমারী—১৩ জন = মোট ৬৮ জন

হাইড্রোজেন কর্তৃক অক্সিজেন-নারী ধর্ষণ

বিধবা—২২ জন

সধবা—২১ জন

কুমারী—৫ জন = মোট ৪৮ জন

স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, হাইড্রোজেনরাই অধিকসংখ্যক নারী ধর্ষণ করেছেন, যদিও অক্সিজেনরাও এ বিষয়ে একেবারে নিরপরাধ নন। আমি নিজে অক্সিজেন-জাতীয় হ'লেও সকলের জন্যই লজ্জাবোধ করছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি হাইড্রোজেন-জাতীয়দের এই অধিক অপরাধ-প্রবণতার দিকে কর্তৃপক্ষদের দৃষ্টিও আকর্ষণ না ক'রে পারছি না। এর বেশি আমার আর কিছু বলবার নেই।

করতালির মধ্যে উপবেশন করিলেন

সভাপতি। আর যদি কেউ কিছু বলতে চান তো বলুন এবার।

৪ অ। আমাদের পাড়ার কয়েকটি কুমারী আপনাদের সম্মানার্থে ওরিয়েণ্টাল নাচ-গান প্র্যাক্‌টিস করছে কদিন থেকে। যদি অনুমতি করেন, তাদের নিয়ে আসি।

সভাপতি। আর কারও কিছু বলবার নেই ?

৪ অ। আজ্ঞে না।

সভাপতি। নিয়ে আসুন তা হ'লে। বেশি দেরি করবেন না—আরও দু জায়গায় যেতে হবে আমাকে, মনে রাখবেন।

৪ অ। আজ্ঞে না, এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

ভিড় ঠেলিয়া ছোকরা বাহির হইয়া গেল এবং ক্ষণপরেই গোটা চারেক মেয়েকে আনিয়া হাজির

করিল। দেখিবার মত বস্তু চারিটি। তাহারা আসিতেই সকলে সরিয়া গিয়া নাচের আসর করিয়া দিল এবং নর্ত্তকীগণ আধুনিক কায়দায় হাত-পা বাঁকাইয়া নাচ-গান সুরু করিল

—গান—

নীল আকাশের হাতছানি
জানি জানি জানি গো
বহন করে কোন্ বাণী!
মন ভ'রে যায় উদাসে
বুক ভ'রে যায় হুতাশে
আনমনে গো আনমনে—
খুলে রাখি দখিন বাতায়নখানি ॥
নীল আকাশের হাতছানি—
পরাণ চঞ্চল করে—
আঁখির কোণে জল ভরে
হায় হায় হায় হায় রে—
মনের বীণায় যায় কে মধুর মীড় টানি ॥
নীল আকাশের হাতছানি—

নৃত্যগীত-অবসানে নর্ত্তকীগণ এক পার্শ্বে উপবেশন করিতেই সভাপতি মহাশয় কালক্ষেপ না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভদ্রলোক অক্সিজেন-বংশাবতংস, ইঁহার বিদ্যায় বুদ্ধিতে চরিত্রবলে অক্সিজেন-কুল উজ্জ্বল।

সভাপতি। অদ্য এই দুর্দ্দিনে অক্সিজেন-বংশীয় পৌরজনকে আমি পুনরায় আমাদের অতীত গৌরব-কথাগুলি শুনাইতে চাই। প্রতি সভায় বরাবর আমি এই কথাগুলিই বারম্বার আবৃত্তি করিতেছি এই আশায় যে, আমাদের অতীত গৌরব-কথাগুলি স্মৃতি-পথে সতত জাগরূক রাখিলে আমরা হীনকার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হইব। আমরা যে বিশ্বব্যাপারে নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মত বস্তু নহি,

বস্তুত আমরা যে আছি, তাহার প্রথম আভাস পাইয়াছিলেন Boyle। কিন্তু তিনি আভাস মাত্রই পাইয়াছিলেন, আর কিছুই পান নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে John Mayow সত্যের কিছু নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও আমাদের প্রকৃত রূপটি কি, তাহা ধরিতে পারেন নাই। হয়তো পারিতেন, কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে এবং ফ্লজিস্টন থিওরির প্রাদুর্ভাবে তাহা আর ঘটে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পদে Scheele এবং Priestley আমাদের বিশিষ্ট অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া রসায়ন-জগতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি আমাদের প্রকৃত রূপটি, আমাদের চরিত্রের বিশিষ্ট ধর্ম্মটি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সে আবিষ্কার করিয়াছিলেন মহামতি Lavoisier ; এই Lavoisier-ই সর্ব্বপ্রথম বুঝিয়াছিলেন যে দহন মানেই আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠ মিলন। শুনিয়াছি, আমাদের এই মিলনের ফলে Neutral oxide, Acidic oxide, Basic oxide, Amphoteric oxide, Peroxide এবং Compound oxide নামে ছয় প্রকার সঙ্কর কিন্তু প্রবল-শক্তিসম্পন্ন বিবিধ-গুণ-সমন্বিত রাসায়নিক বস্তুর উদ্ভব হইয়াছে। শুনিয়াছি—

পিছন দিকের ভিড় ঠেলিয়া ১ হা অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল ভ্রূকুটি-কুটিল, চক্ষুদ্বয় অগ্নিবর্ষণ করিতেছে

১ হা। আমার কিছু বক্তব্য আছে।

আরও আগাইয়া আসিলেন। সভাপতি মহাশয় উচ্ছ্বাসের মুখে বাধা পাইয়া একটু থতমত খাইয়া গেলেন। সভাপতি হিসাবে হয়তো তিনি ১ হা-কে বাধা দিতে পারিতেন, কিন্তু ১ হা-র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবভঙ্গি দেখিয়া নিরস্ত হইলেন

সভাপতি। [নিরীহভাবে] বেশ, বলুন কি বক্তব্য আপনার। আগে বললে দেখতে শুনতে সব দিক থেকেই শোভন হ'ত। [বসিলেন]

১ হা। আগে কিছু বলবার আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু আপনার বক্তৃতা শুনে আমার ধমনীতে ধমনীতে সমস্ত রক্ত টগবগ ক'রে ফুটে উঠেছে।

নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল

সভাপতি। বেশ, বলুন।

১ হা। [উত্তেজিত উদাত্ত কণ্ঠে] নিজেদের মশাল-আলোকে যদি আপনাদের চক্ষু অন্ধ না হ'ত তা হ'লে আপনারা দেখতে পেতেন, নিজেদের ঢক্কা-নিনাদে যদি আপনাদের কর্ণ বধির না হ'ত তা হ'লে আপনারা শুনতে পেতেন যে, হাইড্রোজেন নামেও এক অতি প্রাচীন বনিয়াদী জাতি বহুকালাবধি আপনাদের সান্নিধ্যে বাস করছে ; বুঝতে পারতেন, তাদের মহিমাও আপনাদের মহিমার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয় ; স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হতেন না যে, তাদের প্রাচীন ইতিহাসের বুকেও Paracelsus Cavendish এবং Lavoisier-এর নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত আছে ; চিন্তা ক'রে শঙ্কিত হতেন যে, আগ্নেয়গিরির উৎক্ষিপ্ত ধূমরাশিতে, সূর্য্যের জ্বলন্ত শিখায়, বায়ুলোকের উর্দ্ধস্তরে হাইড্রোজেন-পরমাণুগণ নিত্য বিরাজমান ; অনুসন্ধান ক'রে জ্ঞানলাভ করতেন যে, আমরাও Hydride নামক রাসায়নিক বস্তুর জনক ; প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়ঙ্গম করতেন যে,—

সহসা ভিড়ের ভিতর হইতে একটি পাদুকা নিক্ষিপ্ত হইল, এবং তাহা আসিয়া ১ হা-র বুকে লাগিল। ১ হা থামিয়া গেলেন, কিন্তু ক্ষণপরেই পাদুকাটি উত্তোলন করিয়া পুঙ্গব-কণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন.

যে ভীরু নপুংসক ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে কাপুরুষের মত এই জুতো ছুঁড়েছেন, তিনি যদি জারজ না হন, তা হ'লে এগিয়ে আসুন তিনি, তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি, চ'লে আসুন।

আস্তিন গুটাইয়া আগাইয়া গেলেন। সভা নিস্তব্ধ

আবার বলছি, চ'লে আসুন।

আরও খানিকটা আগাইয়া গেলেন। আগাইয়া যাইতে গিয়া ঝোঁকের মাথায় তিনি একজন নর্ত্তকীর পা মাড়াইয়া দিলেন, নর্ত্তকীটি কাতর কণ্ঠে "উঃ, বাবা গো" করিয়া উঠিলেন

জনৈক অ। মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিয়েছে, মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিয়েছে।

সভায় একটা কলরব হইতে লাগিল। দেখা গেল ৩ অ, যিনি নারী-ধর্ষণ বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তিনি গা বাঁচাইয়া সরিয়া পড়িতেছেন। কলরব ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। জনৈক হাইড্রোজেন-যুবক কর্ত্তৃক আহত হইয়া সভাপতি রক্তাক্ত-কলেবরে ভূশায়ী হইলেন। আরও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। ঘুষি, জুতা, ছাতা, ছড়ি, লাঠি এবং অবশেষে ছোরাছুরিও চলিতে লাগিল। উভয় পক্ষেরই দুই চারিজন রক্তাক্ত হইয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন। কলরবে, আর্ত্তনাদে, গালাগালিতে সমস্ত স্থানটা ভয়াবহ হইয়া উঠিল। ব্যাপার যখন চরমে উঠিয়াছে, তখন দড়াম করিয়া একটা শব্দ হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া গেল এবং দুইটি প্ল্যাটিনাম ইলেক্‌ট্রিক নোডের মধ্যবর্ত্তী স্থান তড়িৎশিখায় ক্ষণিকের জন্য আলোকিত হইয়া তড়িৎবৎ মিলাইয়া গেল। আলো জ্বলিলে দেখা গেল, হাইড্রোজেন অক্সিজেন কেহ নাই, একটি টেবিলের উপর অবস্থিত ফ্লাস্কে নির্ম্মল জল টলমল করিতেছে। তড়িৎশিখার যাদুস্পর্শে হাইড্রোজেন-অক্সিজেন পরমাণুগুলির লম্ফঝম্প জল হইয়া গিয়াছে।

যবনিকা

অবাস্তব

একটি প্রশস্ত কক্ষ। কক্ষের দুইটি দ্বার। আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু অল্প যাহা আছে তাহা বেশ মূল্যবান। ঘরে দুইখানি টেবিল আছে। একটি অপেক্ষাকৃত বড়, সেটি কোণের দিকে রহিয়াছে। তাহার উপর রক্তবর্ণ শেড্ দেওয়া একটি ইলেক্‌ট্রিক বাতি এবং তিন-চারখানি পুস্তক ছাড়া আর কিছু নাই। পুস্তকগুলি উপর্যুপরি সাজানো আছে। টেবিলটির পাশে একটি আরাম-কেদারা এমনভাবে রহিয়াছে যে তাহাতে শুইয়া ইলেক্‌ট্রিক্ বাতিটির সহায়তায় বেশ পড়া যায়। আরাম কেদারার নিকট একটি চেয়ারও রহিয়াছে। দ্বিতীয় টেবিলটি ছোট। সেটি ঘরের মাঝামাঝি বাম দেওয়াল ঘেঁসিয়া রহিয়াছে। দুইটি টেবিল এমনভাবে আছে যে, একটি আর একটিকে আড়াল করিতেছে না। দ্বিতীয় টেবিলটির দুই পাশেও দুইখানি বেতের চেয়ার রহিয়াছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ছোট টেবিলটির সামনে দাঁড়াইয়া বিখ্যাত লেখক অশোক দত্ত পাইপে তামাক ভরিতেছেন। টেবিল ল্যাম্পটি এখন জ্বলিতেছে না, শিলিং ল্যাম্প হইতে ঘরটি উজ্জ্বলভাবে আলোকিত। অশোকবাবু বেশ একটি মূল্যবান ড্রেসিং গাউন পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। ভৃত্য সিতাবি একটি ট্রে-তে করিয়া কফির সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল।

অশোক। কি রে, কজনের সঙ্গে আলাপ-টালাপ করলি?

একটু সলজ্জভাবে হাসিয়া সিতাবি ছোট টেবিলটিতে কফির সরঞ্জাম রাখিল।

আলাপ-টালাপ বেশী করো না, বুঝলে?

পাইপ ধরাইলেন

সিতাবি। আজ্ঞে না।

অশোক। কারো সঙ্গে আলাপ হয় নি?

সিতাবি। মাত্তর একজনের সঙ্গে হয়েছে। আজ যখন বাজার করতে যাচ্ছিলাম, তখন মাঠের ওপাশে যে বাড়িটা রয়েছে সেই বাড়ীরই একটি বাবু আমাকে ডেকে আমাদের কথা জিগ্যেসাবাদ করছিলেন।

সিতাবি কাপে কফি ঢালিতে লাগিল

অশোক। কি জিগ্যেসাবাদ করছিলেন ?

সিতাবি। আপনার নাম ধাম সব জিগ্যেস করছিলেন ; আরও জিগ্যেস করছিলেন এখানে এসেছেন কেন, এই সব আর কি—

অশোক। তুই কি বললি ?

সিতাবি। বললাম বাবুর শরীর খারাপ তাই এখানে এসেছেন হাওয়া বদলাতে। বাবুটি বেশ আলাপী লোক। আপনার সঙ্গে এসে আলাপ করবেন বললেন।

অশোক একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া উপবেশন করিলেন

অশোক। ও, সে সব বন্দোবস্তও ক'রে এসেছ তা হলে! আর কি কি আলাপ হ'ল তাঁর সঙ্গে ?

সিতাবি কফিতে দুধ ঢালিয়া পেয়ালা আগাইয়া দিল

সিতাবি। এই সব আর কি, জিগ্যেস করছিলেন তোমার বাবু কি করেন।

অশোক। (স্মিত মুখে) কি বললি তুই ?

সিতাবি। বললাম—বাবু বই নেকেন !

অশোক। বলেছ তো ? সবাইকে ওই কথা বলে বেড়াও, আর দলে দলে লোক এসে বিরক্ত করুক আমায়।

কফিতে এক চুমুক দিলেন

সিতাবি। না, সবাইকে বলব কেন।

অশোক। আর কাউকে বলো না। নিরিবিলিতে থাকবার জন্য কোলকাতা থেকে পালিয়ে এসে শহরের বাইরে তেপান্তর মাঠে এই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছি। তুমি লোক জুটিও না যেন !

সিতাবি। (একটু ইতস্তত করিয়া, চুপি চুপি) শুনছি এটা নাকি ভুতুড়ে বাড়ি বাবু !

অশোক। কে বললে ?

সিতাবি। বাজারে শুনলাম। সেই জন্যেই নাকি কেউ ভাড়া নেয় না, আর সেই জন্যেই নাকি এতবড় বাড়ির ভাড়া এত কম।

অশোক। ওসব বাজে কথা। তুই যা রান্না কর গিয়ে—

সিতাবি চলিয়া গেল। অশোক দত্ত পেয়ালা তুলিয়া আরও দু-এক চুমুক কফি পান করিলেন। তাহার পর আপন মনেই বলিলেন

ভুতুড়ে বাড়ি—হ্যাঃ—যত সব গাঁজাখুরি!

আরও দুই-এক চুমুক পান করিলেন। সিতাবি পুনঃপ্রবেশ করিল

সিতাবি। ভূদেববাবু দেখা করতে এসেছেন।

অশোক। ভূদেববাবু কে?

সিতাবি। ওই যে সকালে যিনি ডেকে জিগ্যেসাবাদ করছিলেন—

অশোক। ও। এই সুরু হ'ল! আচ্ছা ডেকে নিয়ে এস!

সিতাবি চলিয়া গেল ও ক্ষণপরে ভূদেববাবুকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। অশোকবাবু উঠিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন

নমস্কার, আসুন, আসুন, বসুন। একটু কফি খান, সিতাবি আর একটা পেয়ালা নিয়ে আয়।

সিতাবি চলিয়া গেল, ভূদেববাবু উপবেশন করিলেন

ভূদেব। (স-সম্ভ্রমে) আপনিই কি বিখ্যাত লেখক অশোক দত্ত?

অশোক। (হাসিয়া) বিখ্যাত কি না জানি না, তবে লিখি বটে।

ভূদেব। আমি আপনার লেখার একজন বিশেষ ভক্ত।

অশোক স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন

আপনি এখানে এসেছেন কি বেড়াতে?

অশোক। ঠিক বেড়াতে নয়, চেঞ্জে। কোলকাতায় শরীরটা কিছুতেই ভাল থাকছে না। ভাবলাম বাইরে কিছুদিন কাটালে যদি—

ভূদেব। হয়েছে কি আপনার?

অশোক। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, কিছুই হজম হয় না—এই চা কফি টফি খেয়েই কাটাই!

সিতাবি আর একটি কাপ লইয়া আসিল এবং ভূদেববাবুকে কফি ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গেল। ভূদেব কফি পান করিতে লাগিলেন। মিনিট খানেক পরে—

ভূদেব। আপনি এই বাড়িটা নিলেন কেন?

অশোক। কোলকাতায় একদিন এই বাড়ির প্রোপ্রাইটার রমেশবাবুর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁর কাছেই শুনলাম যে এ জায়গাটা ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার পক্ষে ভাল। তাছাড়া তিনি খুব শস্তায় দিতে চাইলেন বাড়িটা। এমন ইলেকট্রিক ফিটেড্ বাড়ির মাত্র কুড়ি টাকা ভাড়া—খুবই শস্তা!

অশোক পুনরায় পাইপ ধরাইলেন

ভূদেব। (একটু মৃদু হাসিয়া) বিনা পয়সায় থাকতে দিলেও এ অঞ্চলের কেউ এ বাড়িতে থাকতে রাজি হবে না।

অশোক। কেন, বলুন তো?

ভূদেব। বাড়িটার একটা ইতিহাস আছে—

অশোক। কি ইতিহাস?

ভূদেব। (হাসিয়া) সে আর নাই শুনলেন রাত্তির বেলা! নিয়েই যখন ফেলেছেন তখন দেখুন না দু-চার দিন বাস ক'রে। আপনি তো আজই এসেছেন, না?

অশোক। হ্যাঁ। শুনিই না কি ইতিহাসটা!

ভূদেব। রাত্তিরে হয়তো ভয়টয় পাবেন, দরকার কি! (হাসিয়া) আমিও আসতাম না এখানে রাত্তিরে, কেবল আপনার নাম শুনে দেখা করতে এলাম। যদিও নিজের চোখে দেখিনি কখনও কিছু—তবু—

অশোক। শুনিই না ব্যাপারটা কি—

উভয়ের কফি পান শেষ হইল

ভূদেব। যদি ভয়টয় পান—

অশোক। ভয় আমি কাউকে করি না। কাউকে করি না অবশ্য ঠিক নয়, জন্তু-জানোয়ার চোর-ডাকাতকে করি এবং সে সবের জন্যে আমি প্রস্তুতও থাকি সর্ব্বদা।

টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া একটি ছোট পিস্তল বাহির করিয়া স্মিতমুখে সেটি তুলিয়া দেখাইলেন

ভূদেব। (সবিস্ময়ে) পিস্তলের লাইসেন্স আপনাকে দিয়েছে! সাধারণত কাউকে দেয় না।

অশোক। আমার বাবা একজন রিটায়ার্ড বড় পুলিশ অফিসার। তাঁর খাতিরেই পেয়েছি আর কি—

ভূদেববাবু পিস্তলটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন

ভূদেব। বাঃ, চমৎকার পিস্তলটি, একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে নেওয়া যায়!

অশোক। সাবধানে নাড়াচাড়া করবেন—লোডেড্ আছে—দিন আমাকে।

পিস্তলটি দস্ত টেবিলের একধারে সরাইয়া রাখিলেন এবং প্রশ্ন করিলেন

এইবার বলুন তো শুনি, বাড়ির ইতিহাসটা কি। কোন ভৌতিক ব্যাপার? আমার চাকরটা বলছিল সে কার কাছে নাকি শুনেছে এটা ভুতুড়ে বাড়ি!

ভূদেব। ও, আপনি শুনেছেন তা হ'লে?

অশোক। এখুনি শুনলাম। ব্যাপারটা কি বলুন তো

ভূদেব। ওই ভৌতিক ব্যাপারই—

অশোক। ভূতে করে কি, ঢিল ছোঁড়ে?

ভূদেব। (হাসিয়া) ঢিল ছোঁড়ে না।

অশোক। তবে?

ভূদেব। তা হ'লে গোড়া থেকেই বলি শুনুন—

অশোক। বলুন।

পাইপ নিবিয়া গিয়াছিল, পুনরায় ধরাইয়া লইলেন

ভূদেব। এ বাড়িটা অনেক দিনের। শুনেছি মিস্টার চৌধুরি বলে একজন বিলেত-ফেরত বাঙালী প্রথমে তৈরি করান বাড়িটা। তিনি ছিলেন সেকেলে বিলেত-ফেরত, বিলেতে গিয়ে মেম বিয়ে করেছিলেন।

অশোক। তাই না কি!

ভূদেব। হ্যাঁ। মেমসায়েবকে নিয়েও এসেছিলেন সঙ্গে ক'রে এদেশে। তাঁকে নিয়ে সমাজে বাস করতে পারবেন না বলেই বোধ হয় লোকালয়ের বাইরে বাড়িটা করিয়েছিলেন। অগাধ টাকা ছিল তাঁর।

অশোক। কি ছিলেন তিনি, ব্যারিস্টার?

ভূদেব। না, তিনি পাটের ব্যবসা ক'রে লক্ষপতি হয়েছিলেন শুনেছি।

অশোক। ও। তারপর?

ভূদেব। বিলেতে থাকতেই তাঁর একটি মেয়ে হয়েছিল। সেই মেয়ের তত্ত্বাবধান করবার জন্যে একটি নিগ্রো চাকর রাখেন তিনি। দেশে আসবার সময় নিগ্রো ছেলেটিকে সঙ্গে করেও এনেছিলেন।

অশোক। নিগ্রো?

ভূদেব। হ্যাঁ কুচকুচে কালো একটি নিগ্রো ছেলে।

অশোক। তারপর?

ভূদেব। তাঁরা সবাই এই বাড়িতেই ছিলেন—মিস্টার চৌধুরি, মিসেস চৌধুরি, মিস চৌধুরি আর সেই নিগ্রো ছেলেটি। আরও অবশ্য অনেক চাকর বাকর ছিল, রীতিমত সায়েবি কেতায় থাকতেন তাঁরা।

অশোক। তারপর?

ভূদেব। মিস্ চৌধুরি আর সেই নিগ্রো ছেলেটির বয়সের তফাৎ ছিল সাত আট বছর মাত্র। তারা দুজনে একসঙ্গে এই বাড়িতে মানুষ হতে লাগল। তারপর সাধারণত যা হয়—

অশোক। প্রেম?

ভূদেব। হ্যাঁ।

অশোক। (হাসিয়া) বেশ জমিয়ে এনেছেন তো, তারপর কি হ'ল আত্মহত্যা ?

ভূদেব। না, আত্মহত্যা ঠিক নয়, যা হ'ল তা ভয়ানক।

অশোক। কি ?

ভূদেব। মিস্টার চৌধুরি রগচটা রাগী মেজাজের লোক ছিলেন। ভয়ানক মদ খেতেন, রেগে গেলে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকতো না। কেলেঙ্কারি যখন অনেক-দূর গড়িয়েছে মিস্টার চৌধুরি হঠাৎ একদিন টের পেলেন। টের পেয়ে তিনি যা করলেন তা সাংঘাতিক। নিগ্রো ছেলেটাকে আর মিস চৌধুরিকে গুলি ক'রে মেরে ফেললেন।

অশোক। বলেন কি মশাই, নিজের মেয়েকে গুলি করলেন ?

ভূদেব। তাই তো শুনেছি আমরা।

অশোক। তারপর ?

ভূদেব। তারপর তাদের মৃতদেহ সঙ্গে সঙ্গে পুঁতে ফেললেন।

অশোক। কোথায় ?

ভূদেব। এই বাড়িরই কোনখানে।

অশোক। তাই না কি ! তারপর কি হ'ল ?

ভূদেব। তারপর তাঁরা বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কোলকাতা চলে গেলেন এবং কোলকাতাতেই বাড়িটা জলের দামে এক য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানকে বিক্রি ক'রে দিলেন। সেই য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানই এসে প্রথমে ইলেকট্রিক কানেক্শান নিয়েছিল বাড়িটাতে। বেচারা কিন্তু বাস করতে পারে নি।

অশোক। কেন, কি হ'ল ?

ভূদেব। প্রথম প্রথম আবছা আবছা তারা নাকি ছায়া-মূর্ত্তি দেখতে পেত। প্রথমে ততটা গ্রাহ্য করে নি। কিন্তু একদিন সকালে উঠে দেখা গেল, তাদের সতেরো-আঠারো বছরের মেয়েটি বিছানায় মরে পড়ে আছে। কে তার ঘাড়টি মুচড়ে রেখে গেছে।

অশোক। (সবিস্ময়ে) সে কি!

ভূদেব। হ্যাঁ। য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সায়েব পালালো। বাড়িটা এমনি খালি পড়ে রইলো অনেকদিন। অনেক দিন পরে এক ভাটিয়া কিনলে বাড়িটা। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার, ভাটিয়া যেদিন এসে পদার্পণ করলে বাড়িতে সেইদিনই তার মৃত্যু হ'ল!

অশোক। সেই দিনই! কি ক'রে?

ভূদেব। কি ক'রে তা কেউ ঠিক বলতে পারে না। রাত্তিরে খেয়ে দেয়ে সবাই শুয়েছে—হঠাৎ গভীর রাত্তিরে তার-স্বরে চীৎকার! সবাই ছুটে গিয়ে দেখে বাড়ির মালিক মেজের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে, কান দিয়ে চোখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

উভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। সিতাবি আসিয়া প্রবেশ করিল এবং কফির সরঞ্জাম প্রভৃতি লইয়া চলিয়া গেল

অশোক। আর কোন ঘটনা আছে?

ভূদেব। অনেক ঘটনা আছে। তারপর বাড়িটা যায় উমাকান্তবাবুর হাতে। উমাকান্তবাবুর ব্যাপারটাও খুব আশ্চর্য্যজনক। তাঁকে এসে বাড়িতে বাসও করতে হয় নি। বাড়ি কেনবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ যেদিন ডকুমেণ্ট রেজিস্টার্ড হয়ে গেল সেইদিনই তাঁর বড় ছেলে কলেরায় মারা গেল। তিনি অলুক্ষণে বাড়ি রাখলেন না, সঙ্গে সঙ্গে বেচে ফেললেন। কিনলে বেহারের এক জমিদার। বাড়িটা কেনবার পর মাস ছয়েক তিনি আসেন নি। যেদিন এলেন সেদিনটা কিছু হ'ল না, কিন্তু তারপর দিন তিনিও মারা গেলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! সর্পাঘাতে মারা গেলেন ভদ্রলোক!

অশোক। কি রকম?

ভূদেব। তাঁর চাকরটা বললে যেদিন রাত্রে তিনি মারা যান সেদিন দুটো প্রকাণ্ড সাপ—একটা টকটকে লাল আর একটা কুচকুচে কালো সমস্ত রাত সারা

বাড়িময় দাপাদাপি করে বেড়িয়েছে। এত ভীষণ তাদের তর্জ্জন যে রাস্তার লোক পর্য্যন্ত থমকে দাঁড়িয়ে গেছে!

অশোক। অদ্ভুত তো।

ভূদেব। সত্যিই অদ্ভুত!

অশোক। তারপর!

ভূদেব। তারপর বাড়িটা কিনলেন রমেশবাবু! ঠিক কিনলেন না, পেলেন। তিনি ওই বেহারি জরিদারদের উকিল ছিলেন, ফি হিসেবে তাঁদের কাছে অনেক টাকা বাকী পড়েছিল; জমিদার মারা যাওয়ার পর তারা আর টাকা দিতে পারলে না, তার বদলে এই বাড়িটা পেলেন তিনি। নিজে তিনি অবশ্য কখনও এসে এ বাড়িতে বাস করেন নি, করবার সাহসই হয় নি। কিন্তু ভাড়াটে পেলে তিনি ছাড়েন না, বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দেন, আর যে ভাড়াটে আসে—

সহসা থামিয়া গেলেন

অশোক। কি হয় তাদের?

ভূদেব। একটা না একটা কিছু হয়!

অশোক। (হাসিয়া) আপনি বিশ্বাস করেন এসব?

ভূদেব। আমি নিজেই তো তিনজন ভাড়াটের খবর জানি—একজন পাগল হয়ে গেল, একজনকে ছাত থেকে ঠেলে ফেলে দিলে আর একজনের ছোট ছেলেটি যে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। আর একটা কি বিশেষত্ব জানেন, প্রত্যেকবার আলাদা রকম কিছু একটা হয়!

অশোক পাইপ ধরাইয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িলেন

অশোক। (হাসিয়া) আপনি অবশ্য যা বললেন তার থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না। এ বাড়িতে উপর্য্যুপরি কয়েকটা মৃত্যু ঘটেছে তা ঠিক, কিন্তু প্রত্যেক মৃত্যুরই তো একটা না একটা সঙ্গত কারণও রয়েছে। কেউ সাপে কামড়ে, কেউ কলেরায়, কেউ ছাত থেকে পড়ে, কেউ য়্যাপোপ্লেক্সিতে। এ সবের দ্বারা এটা প্রমাণ হয় না যে এটা ভুতুড়ে বাড়ি।

ভূদেব। তা অবশ্য ঠিক।

নিজের হাত-ঘড়ি দেখিলেন

এ অঞ্চলের কিন্তু সব্বাই ভয় করে এই বাড়িটাকে! আপনাকে রাত্তির বেলা এসব গল্প শোনালাম, আপনার ভয় টয় করবে না তো?

অশোক। কিছুমাত্র না। ভূতের গল্প শুনে ভয় পাবার বয়স আর নেই—

ভূদেব পুনরায় হাত-ঘড়ি দেখিলেন

ভূদেব। আজ তা হ'লে এবার উঠি। রাত প্রায় দশটা হল।

অশোক। আচ্ছা।

অশোক ভূদেবের সঙ্গে সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত আগাইয়া গেলেন। ভূদেব যথাবিধি নমস্কারান্তে বাহির হইয়া যাইবার পর অশোক খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর ধীর-পদ-সঞ্চারে ফিরিয়া আসিয়া ছোট টেবিলের নিকট চেয়ারে উপবেশন করিলেন এবং চিন্তিতমুখে রিভলভারটি তুলিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। তাহার পর পাইপে তামাক ভরিলেন এবং পাইপটি ধরাইয়া চিন্তা করিতে করিতে অন্যমনস্ক ভাবে পাইপে টান দিতে লাগিলেন।...সহসা চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া গেল। ক্ষণ পরেই যখন আলো জ্বলিল তখন দেখা গেল অশোকবাবু কোণের দ্বিতীয় টেবিলটির নিকট আরাম কেদারায় শুইয়া একটি বই পড়িতেছেন, গাঢ়রক্তবর্ণ শেড্ দেওয়া টেবিল ল্যাম্পটি কেবল জ্বলিতেছে। ঘরের অন্ধকার শেডের আভায় রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে। দ্বারপ্রান্তে খুট করিয়া শব্দ হইল। অশোক তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া বসিলেন। দেখা গেল দ্বারপ্রান্তে একটি কালো কাফ্রি যুবক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার পরিধানে ধপধপে সাদা সাহেবি পোষাক। অশোকের পানে নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া আছে।

অশোক। সিতাবি, সিতাবি—

পুনরায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই শিলিং ল্যাম্পটি জ্বলিয়া উঠিল। দেখা গেল অশোক আরাম কেদারায় নয়, ছোট টেবিলটির কাছে বেতের চেয়ারেই বসিয়া আছেন। সিতাবি আসিয়া প্রবেশ করিল।

সিতাবি। কি বলছেন বাবু?

অশোক যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন

অশোক। কি আশ্চর্য্য জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখলুম না কি। দেখ্ তো বাইরে কেউ এসেছে কি-না?

সিতাবি চলিয়া গেল ও ক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিল।

সিতাবি। না, কেউ নেই তো!

অশোক। ভাল ক'রে দেখিচিস্?

সিতাবি। আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন আবার কে আসবে!

অশোক। রান্নার কত দেরি?

সিতাবি। বেশী দেরি নেই আর। আমি যাই, সুপটা চড়িয়ে এসেছি—

চলিয়া গেল

অশোক। আশ্চর্য্য! ঠিক মনে হচ্ছিল আমি যেন খাওয়া দাওয়ার পর আরাম কেদারায় শুয়ে বই পড়ছি আর সেই নিগ্রো ছেলেটা যেন এসে দাঁড়িয়েছে। ফানি!

একটু অস্বাভাবিক ভাবে হাসিলেন

না, এ রকম কল্পনা করা তো ঠিক নয়! আশ্চর্য্য ব্যাপার, ঠিক কিন্তু মনে হচ্ছিল—

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া খানিকক্ষণ পদচারণা করিলেন। তাহার পর আসিয়া ছোট টেবিলটায় বেতের চেয়ারে বসিলেন। পুনরায় পাইপ ধরাইলেন এবং রিভলভারটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ পরে পুনরায় আবার সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেল। ক্ষণ পরেই আলো জ্বলিলে দেখা গেল আগেকার মতো অশোকবাবু কোণের বড় টেবিলটার কাছে আরাম কেদারায় শুইয়া বই পড়িতেছেন। গাঢ় রক্তবর্ণ শেড দেওয়া টেবিল ল্যাম্পটি কেবল জ্বলিতেছে। পুনরায় দ্বারপ্রান্তে খুট করিয়া শব্দ হইল, অশোকবাবু তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া বসিলেন; দেখা গেল সাদা সাহেবি পোষাক পরা কাফ্রি যুবকটি দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া অশোকের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে।

অশোক। কে?

কাফ্রি যুবক আগাইয়া আসিল এবং আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া দন্তকে ঝুকিয়া সেলাম করিল। অশোক খোলা বইখানা টেবিলের উপর উপুড় করিয়া রাখিয়া সোজা হইয়া বসিলেন।

কি চাই ?

কাফ্রি যুবক আরও আগাইয়া আসিল, আর একবার সেলাম করিল এবং পকেট হইতে একটি ভিজিটিং কার্ড বাহির করিয়া অশোকের হাতে দিল। অশোক টেবিল ল্যাম্পের আলোয় কার্ডটি পড়িয়া দেখিলেন।

মিস্ চৌধুরি ! কি চান তিনি ?

কাফ্রি। (অস্বাভাবিক মোটা গলায়) মো-লা-কা-ৎ !

অশোক ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া উত্তর দিলেন

অশোক। বেশ, ডেকে নিয়ে এস তাঁকে

কাফ্রি-মূর্ত্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি ষোল-সতেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল। মেয়েটির পরিধানে ধপধপে সাদা গাউন, পায়ের মোজা এবং জুতাও সাদা। পিঠে টকটকে লাল রিবন-বাঁধা বেণী দুলিতেছে।

কি চান আপনি ?

মেয়েটি মুচকি হাসিতে হাসিতে আগাইয়া আসিল

আসুন, বসুন।

মেয়েটি আসিয়া চেয়ারে বসিল, কিন্তু কোন কথা কহিল না, কেবল মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল

কি চান আপনি ?

মেয়েটি নীরব

কথা বলছেন না কেন ?

মেয়েটি নীরব

কি চাই আপনার ?

মেয়েটি নীরব

কোন দরকার যদি না থাকে যেতে পারেন আপনি।

বলিবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি উঠিয়া চলিয়া গেল। অশোক পুনরায় পড়িতে যাইবেন এমন সময় আবার দ্বারপ্রান্তে সেই কাফ্রি-মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। ঠিক সেইরূপ আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া আগাইয়া আসিল এবং সেলাম করিয়া পুনরায় তাঁহার হাতে কার্ড দিল।

মিস চৌধুরি ! কি চান তিনি ?

কাফ্রি। (পূর্ব্ববৎ মোটা গলায়) মো-লা-কা-ৎ।

অশোক। যদি কিছু দরকার থাকে আসতে বল! কিন্তু—

অশোকের কথা শেষ হইতে না হইতে কাফ্রি মিলাইয়া গেল এবং মিস চৌধুরি দ্বারপ্রান্তে দেখা দিয়া পূর্ব্ববৎ মুচকি হাসিতে হাসিতে আগাইয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল

আমার কাছে কি দরকার আপনার বলছেন না তো!

মেয়েটি নীরবে মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল

কি, দরকারটা কি?

মেয়েটি নীরব

বলুন না, গোপনীয় কিছু?

মেয়েটি নীরব

আপনি বোবা না কি!

মেয়েটি নীরবে মুচকি হাসিল

কিছুই যদি বলবেন না, তা হ'লে এসেছেন কেন?

মেয়েটি নীরব

উদ্দেশ্য কি আপনার?

মেয়েটি নীরব

কি আশ্চর্য্য! কিছু যদি বলবার থাকে বলুন, আর না থাকে তো যান।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া গেল। আবার দ্বারপ্রান্তে কাফ্রি-মূর্ত্তি দেখা দিল এবং পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে আসিয়া সেলাম করিয়া কার্ড দিল

আবার মিস্ চৌধুরি! কি আশ্চর্য্য, কি চান তিনি?

কাফ্রি। (পূর্ব্ববৎ মোটা গলায়) মো-লা-কা-ৎ।

অশোক। কিন্তু মোলাকাতের উদ্দেশ্যটা কি! আচ্ছা বিপদে পড়লাম তো! দরকার থাকে তো আসতে বল—আর—

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কাফ্রি অন্তর্হিত হইল এবং মুচকি হাসিতে হাসিতে মিস্ চৌধুরি আসিয়া চেয়ারে বসিলেন

দেখুন আমি পড়ছি, আমাকে এ রকমভাবে বিরক্ত করা উচিত নয় আপনাদের।

হাত দিয়া টেবিলে উপুড় করা বইটি দেখাইলেন। মেয়েটি কোনই উত্তর দিল না

সত্যি সত্যি আপনার দরকারটা কি বলুন দেখি খুলে।

মেয়েটি নীরব

এমন ভাবে বিরক্ত করবার মানে কি ?

মেয়েটি নীরব। অশোকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি উচ্চতর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন

কোন উত্তর দেবেন না আপনি ?

মেয়েটি নীরব

আপনি কি মনে করেন আমি ভয় পেয়ে যাব ?

মেয়েটি নীরব

দেখুন ভয় পাবার ছেলে আমি নই। ভুতটুতে আমি বিশ্বাস করি না। তা ছাড়া, এই দেখুন আমার পিস্তল আছে, আমাকে বেশী রাগাবেন না। রেগে গেলে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না আমার !

পিস্তল দেখিবামাত্র মেয়েটি পাশের দরজা দিয়া সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং পরমুহূর্ত্তেই একটি মরা শিশু আনিয়া সেটা টেবিলে শোয়াইয়া দুই কোমরে হাত দিয়া বিকট রবে হাসিয়া উঠিল

মিস চৌধুরি। হা-হা-হা-হা-হা—

সঙ্গে সঙ্গে অশোকের পিস্তল গর্জ্জন করিয়া উঠিল—পুনরায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া গেল। ক্ষণপরে যখন ঘরের শিলিং ল্যাম্পটি জ্বলিয়া উঠিল তখন দেখা গেল, অশোকের রক্তাক্ত দেহটা ছোট টেবিলটার উপর উপুড় হইয়া রহিয়াছে, ডান হাতে মুষ্টিবদ্ধ পিস্তলটা হইতে ধোঁয়া বাহির হইতেছে। কোণের বড় টেবিলটায় ইলেকট্রিক বাতি জ্বলিতেছে না এবং সেখানকার একটি পুস্তকও স্থানচ্যুত হয় নাই।

যবনিকা

নব সংস্করণ

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস মিষ্টার রক্ষিতের অফিস-কক্ষ। কক্ষটি বেশ প্রশস্ত অর্থাৎ একটি বড় সেক্রেটেরিয়ট টেবিল, কয়েকখানা চেয়ার, ফাইল সমন্বিত কয়েকটা শেল্‌ফ্‌ থাকা সত্ত্বেও কক্ষটিতে পরিক্রমণ করিবার মতো স্থান আছে। মিষ্টার রক্ষিত একটু উত্তেজিতভাবে পরিক্রমণও করিতেছেন। অফিস-কক্ষের পাশে আর একটি ঘর রহিয়াছে, তাহার দরজা দেখা যাইতেছে। মিষ্টার রক্ষিতের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হইলেও শরীর বেশ বলিষ্ঠ। মুখটা দেখিলে ভয় হয়, হঠাৎ মনে হয় বুলডগের মুখে কাঁচা-পাকা এক জোড়া গোঁফ গজাইয়াছে। পরিধানে খাকি হাফ শার্ট, হাফ প্যাণ্ট, হোস এবং মিলিটারি বুট। কোমরে চামড়ার চওড়া কোমর-বন্ধ। মুখে পাইপ। দ্বারপ্রান্তে খুট করিয়া শব্দ হইল। মিষ্টার রক্ষিত ফিরিয়া দেখিলেন। দ্বাররক্ষী কনেষ্টবলটি প্রবেশ করিয়া মিলিটারি কায়দায় স্যালিউট্‌ করিল এবং একটি কার্ড দিল। মিষ্টার রক্ষিত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কার্ডটি দেখিলেন—

রক্ষিত। (কার্ডটি টেবিলে রাখিয়া) সা'বকো আনে বোলো।

কনেষ্টবল সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণপরেই ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত প্রৌঢ় নিবারণবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। নিবারণ মিষ্টার রক্ষিতের বাল্যবন্ধু এবং স্থানীয় কলেজের প্রফেসার।

নিবারণ। রক্ষিত, যা শুনছি তা সত্যি নাকি ?

রক্ষিত। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) সত্যি।

রক্ষিতের চক্ষু দুইটি হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া বাহির হইল। তিনি আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া পাইপটা কামড়াইয়া ধরিলেন। নিবারণ একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন।

নিবারণ। সত্যি অপর্ণা পালিয়েছে ?

রক্ষিত। (সহসা উচ্চকণ্ঠে) হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার একমাত্র মেয়ে অপর্ণা পালিয়েছে। তুমি কি তাই নিয়ে ঠাট্টা করতে এসেছ না কি আমাকে ! ইফ্‌ সো—

পুনরায় আত্মসম্বরণ করিয়া পাইপ কামড়াইলেন

নিবারণ। (শান্তকণ্ঠে) এটা কি ঠাট্টা করবার বিষয় ! বন্ধুর বিপদে আসা উচিত বলেই এসেছি। যদি বিরক্ত হও, উঠে যাচ্ছি—

উঠিবার উপক্রম করিলেন

রক্ষিত। (সহসা ঘুরিয়া) Please take your seat and don't be silly !

নিবারণ পুনরায় বসিলেন এবং রক্ষিত পদচারণ করিতে লাগিলেন

নিবারণ। কোন খবর-টবর পেয়েছ ?

রক্ষিত। কিছু না। কিন্তু (সহসা প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইয়া) আচ্ছা, আমায় মেয়েকে তো তোমরা পড়িয়েছ। তার সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি বল তো!

নিবারণ। আমার ধারণা খুব ভাল ! ফিলজফির নতুন যে ছোকরা প্রফেসারটি এসেছেন, চেন বোধ হয় তাঁকে, মঙ্গলময়বাবু—তিনিও তো খুব প্রশংসা করছিলেন সেদিন। বলছিলেন খুব ভালো মেয়েটি—

রক্ষিত। ভাল মানে কি ?

নিবারণ। লেখাপড়ায় ভাল, ব্যবহার ভাল।

রক্ষিত। চরিত্র ?

নিবারণ। আমার তো ধারণা ছিল ভালই—

রক্ষিত। তা হ'লে how do you explain this ? তোমাদের কেয়ারে মেয়েকে কলেজে পড়তে দিলাম, তার এই ফল ?

নিবারণ। (হাসিয়া) দেখ ভাই, ছাত্রছাত্রীদের চরিত্রের দায়িত্ব নেওয়া আমাদের সাধ্যাতীত, একরকম অসম্ভব।

রক্ষিত। তোমরা চার্জ নিয়েছ তোমরা জানবে না তো কে জানবে !

নিবারণ। নোট বই মুখস্থ করিয়ে পরীক্ষা পাশ করানো যায় কিন্তু চরিত্র গড়া যায় না। চরিত্র জিনিসটা গড়ে ওঠে ছেলেবেলায়। সে সময় আমরা কোথা ! তাছাড়া—

সহসা থামিয়া গেলেন ও একটু হাসিলেন

রক্ষিত। তা ছাড়া কি?

নিবারণ। হেরিডিটি বলেও একটা জিনিস আছে। হাজার চেষ্টা করলেও নিমের বিচি থেকে আম গাছ হ'তে পারে না!

রক্ষিত। তা হ'লে তুমি কি বলতে চাও?

নিবারণ। আমি বলতে চাই (যেন কোন একটা রূঢ় সত্য চাপিয়া গেলেন) হুঁ—

রক্ষিত। What do you mean by হুঁ?

নিবারণ। I mean মেয়েদের চরিত্র judge করবার বেলায় বাপেরা নিজেদের চরিত্রটা ভুলে যায়।

রক্ষিত। গস্‌স্‌! তুমি কি আমাকে ধর্ম্মের উপদেশ দিতে এসেছ না কি! ইফ্‌ সো—

আত্মসম্বরণ করিয়া পুনরায় পাইপ কামড়াইলেন

নিবারণ। দেখ ভাই, মেয়েকে যখন উচ্চশিক্ষা দিয়েছ তখন অত অধীর হ'লে চলবে না। তার তাল সামলাতে হবে।

রক্ষিত। তার মানে?

নিবারণ। মানে, তার স্বাধীনতাকে সহ্য করতে হবে।

রক্ষিত। স্বাধীনতা মানে কি উচ্ছৃঙ্খলতা?

নিবারণ। তা অবশ্য নয়। কিন্তু এটাও ঠিক যে, লেখাপড়া শেখানো মানেই শেকল ভাঙবার উপায় শেখানো। খাঁচার পাখীকে আকাশের খবর দিলে খাঁচা সম্বন্ধে তার মোহ না থাকাটাই স্বাভাবিক। তার শিক্ষিত স্বাধীন বুদ্ধির উপর আস্থা রাখা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। অধীর হয়ো না!

রক্ষিত। মেয়ে পালিয়ে গেছে, অধীর হব না, বল কি! তা ছাড়া, তার বিয়ের সব ঠিক ঠাক, জব্বলপুরের জমিদারের বড় ছেলের সঙ্গে। তারা মেয়ে দেখে পছন্দ ক'রে গেছে। তিন জায়গায় তো পছন্দই করলে না!

নিবারণ। ছি ছি ছি ছি, তোমরা লেখাপড়া জানা বড় বড় মেয়েকেও গরু-বাছুরের মতো বের করে দেখাও, ওরা তো রিভোল্ট করবেই!

রক্ষিত। না দেখে লোকে বিয়ে করবে কেন? দেশসুদ্ধ পাত্রীর বাপ পাত্রদের দোরে সাধাসাধি করছে টাকার থলি নিয়ে—

নিবারণ। তা হ'লে মেয়েকে লেখাপড়া না শিখিয়ে সকাল সকাল বিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল তোমার। দু নৌকোয় পা দিয়ে নদী পার হওয়া শক্ত, ডুবে যাবারই বেশী সম্ভাবনা।

রক্ষিত। দেখ নিবারণ, এটা তোমার লেকচার থিয়েটার নয়। আর তোমার বক্তৃতা শোনবার অবসরও নেই আমার।

নিবারণ। বক্তৃতা দিতে আসিনি আমি। যে জন্যে এসেছি তা হ'লে শোন। শুনছি না কি তুমি কলেজের কয়েকজন ছেলেকে অ্যারেষ্ট করেছ?

রক্ষিত। নিশ্চয়ই করেছি। ক্রিমিনালকে অ্যারেস্ট করবার জন্যেই গভর্ণমেণ্ট মাইনে দিয়ে আমাদের রেখেছে!

নিবারণ। (সবিস্ময়ে) এরা সবাই ক্রিমিনাল্?

রক্ষিত। আমার সন্দেহ হয়!

নিবারণ। সন্দেহ হবার হেতু?

মিষ্টার রক্ষিত টেবিলের নিকট গেলেন এবং ড্রয়ার টানিয়া কয়েকখানা চিঠি বাহির করিয়া নিবারণের হাতে দিলেন

রক্ষিত। সব জায়গায় রিপ্লাই প্রিপেড্ টেলিগ্রাম ক'রে যখন জানলাম যে মেয়ে জানাশোনা কোন জায়গায় যায় নি, তখন I broke open her boxes and found these love-letters! সব ব্যাটাকে অ্যারেষ্ট করেছি আমি!

নিবারণ সবিস্ময়ে চিঠিগুলি উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিলেন ও তাহার পর সেগুলি টেবিলে রাখিয়া দিলেন

নিবারণ। মানলুম না হয় লাভ-লেটার্স লিখেছে। কিন্তু লাভ-লেটার্স লেখা ক্রাইম্ নয়। তা যদি হয়, তা হ'লে সব চেয়ে বড় ক্রিমিনাল তুমি!

রক্ষিত। দেখ নিবারণ, I am not in a mood for jokes now.

নিবারণ। কয়েকটি ছোকরা তোমার মেয়েকে প্রেমপত্র লিখেছে এতে এতটা খাপ্‌পা হয়ে উঠেছ কেন বল তো! তোমাকে রসিক বলেই জানতুম!

রক্ষিত। রসিকতার সময় অসময় আছে! এ নিয়ে তুমিও রসিকতা করতে না যদি অপর্ণা তোমার মেয়ে হ'ত।

নিবারণ স্মিতমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন

নিবারণ। যে ছেলেগুলিকে অ্যারেষ্ট করেছ—কি করতে চাও তাদের নিয়ে?

রক্ষিত। এনকোয়্যারি।

নিবারণ। কোথায় তারা?

রক্ষিত। কাউকে 'বেল্' দিইনি আমি। কাল সমস্ত রাত লক্-আপে ছিল, এখন পাশের ঘরে রয়েছে। Good-for-nothing beggars all of them!

নিবারণ। কেবলমাত্র সন্দেহের উপর নির্ভর ক'রে এতগুলি ভদ্দরলোকের ছেলেকে এমনভাবে—

রক্ষিত। You shut up! ভদ্দরলোকের ছেলে! ভদ্দরলোকের ছেলে ভদ্দরলোকের মেয়েকে এরকম ভাবে চিঠি লেখে না।

নিবারণ। মাঝে মাঝে দু-একটা বানান ভুল ছাড়া চিঠিগুলোতে আর বিশেষ কোন দোষ দেখলাম না। সকলেই তো বেশ সরস ভাষায় তোমার মেয়ের স্তুতিগান করেছে—এতে অত চটছ কেন?

রক্ষিত। দেখ নিবারণ, there is a limit to everything.

নিবারণ। Ought to be!

রক্ষিত। (সহসা আগাইয়া আসিয়া) তোমার উদ্দেশ্যটা কি?

নিবারণ। এই ছেলেদের গার্জেনরা আমাকে এসে ধরেছে।

রক্ষিত। ও, সুপারিশ করতে এয়েছ তুমি! তবে যে বললে বন্ধুর বিপদ

শুনে (সহসা অধীরভাবে) O you teachers and professors, you are a hopeless lot of hypocrites !

নিবারণ অবিচলিত

নিবারণ। একটা বিষয়ে তোমার তারিফ করতেই হয় ; এতদিন পুলিশে চাকরি করেও ভাষাটা বেশ শ্লীল রাখতে পেরেছ তুমি !

রক্ষিত। দেখ নিবারণ !

নিবারণ। (সানুনয়ে) এদের ছেড়ে দাও ভাই !

রক্ষিত। না।

নিবারণ। দেখ—

রক্ষিত। (প্রায় চীৎকার করিয়া) না, না, না—কিছুতেই এদের ছেড়ে দেব না আমি ! This is abduction !

নিবারণ। আমি বলছি এরা নির্দোষ। শোন—

রক্ষিত। কিছু শুনতে চাই না আমি ! তোমার সহানুভূতিজ্ঞাপন যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে—you may go and let me do my duty. (সহসা) এরা নির্দোষ ! তুমি জানলে কি ক'রে ?

নিবারণ। আমার তাই ধারণা।

রক্ষিত। ধারণা ! আমার কি ধারণা জান ?

নিবারণ। কি ?

রক্ষিত। সতেরোটা গাধা মরে একটা মাস্টার হয় !

নিবারণ। মানে ?

রক্ষিত। মানে-টানে কিছু শুনতে চাই না আমি—please go. I want to see through the game.

নিবারণ। দেখ শহরের এতগুলো ভদ্রলোককে চটানো ঠিক নয় ! আজকালকার দিনে—

রক্ষিত। তুমি কি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ নাকি ?

নিবারণ। মোটেই না। জিনিসটার নানা দিক তোমাকে দেখাচ্ছি—

রক্ষিত। আমি দেখতে চাই না কিচ্ছু—please go.

নিবারণ হতাশ হইয়া চুপ করিলেন। রক্ষিত একবার ক্রুদ্ধভাবে তাঁহার দিকে তাকাইয়া পদচারণা করিতে লাগিলেন

রক্ষিত। বসে আছ যে!

নিবারণ। তাড়িয়ে দেবে না কি?

রক্ষিত। অন্য লোক হ'লে এতক্ষণ দিতাম! (একটু পরে) দশটা তো বেজে গেছে। তোমার কলেজ নেই?

নিবারণ। কলেজের ছুটি। এদের তা হ'লে ছাড়বে না কিছুতেই?

রক্ষিত। না।

নিবারণ। কাজটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। আচ্ছা, উঠি তা হ'লে।—জিনিসটা ভেবে দেখো—

রক্ষিত পাইপ ধরাইতেছিলেন, কোন উত্তর দিলেন না, নিবারণ চলিয়া গেলে চেয়ারে গিয়া বসিলেন এবং ঘণ্টা টিপিলেন। কনেষ্টবল আসিয়া প্রবেশ করিল

রক্ষিত। (একটি চিঠি লইয়া ও লেখকের নাম দেখিয়া) জ্যোৎস্নাভূষণকে বোলাও।

কনেষ্টবল চলিয়া গেল। একটু পরে একটি লিকলিকে রোগা গোছের ছোকরা প্রবেশ করিয়া সভয়ে প্রণাম করিল। রক্ষিত বার দুই তাহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন

রক্ষিত। তোমার পুরো নাম কি?

জ্যোৎস্না। আজ্ঞে, জ্যোৎস্নাভূষণ চৌধুরি।

রক্ষিত। তুমি আমার মেয়ে অপর্ণাকে চেন?

জ্যোৎস্না। চিনি।

রক্ষিত। কি ক'রে আলাপ হ'ল?

জ্যোৎস্না। একসঙ্গে পড়ি আমরা।

রক্ষিত। তাকে প্রেমপত্র লিখতে ?

জ্যোৎস্না। (ঢোঁক গিলিয়া) আজ্ঞে না।

রক্ষিত। (একটি পত্র তুলিয়া) এটা তা হ'লে কার লেখা !

পড়িতে লাগিলেন

"প্রাণের অর্পণা, তুমি আজ থার্ড পিরিয়ডে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিলে কেন ? আমি কেসে কেসে গলা চিরে ফেললাম তবু আমার দিকে একবার চাইলে না—"

এ কার লেখা ?

জ্যোৎস্না। (শুষ্ককণ্ঠে) আজ্ঞে ঠিক বুঝতে পারছি না, এ চিঠি কি ক'রে—

রক্ষিত। (ধমক দিয়া) বুঝতে পারছ না, স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার ! চাবকে পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে ফেলব তোমার, তা জানো ?

জ্যোস্না। এইবারটি মাপ করুন, আর কক্‌খনো এমন করব না।

রক্ষিত। অপর্ণা কোথায় আছে জানো ?

জ্যোৎস্নাভূষণ কাঁদিয়া ফেলিল

জ্যোৎস্না। (চক্ষু মুছিয়া) আজ্ঞে না।

রক্ষিত। (পুনরায় ধমক দিয়া) সত্যি কথা বল ! ঠিক জান তুমি—

জ্যোৎস্না। সত্যি বলছি, জানি না !

রক্ষিত। মিথ্যে ব'লে আমার কাছে পার পাবে না !

জ্যোৎস্না। সত্যি বলছি সার।

রক্ষিত। আচ্ছা যাও, এখন ওই ঘরে গিয়ে ব'স। সত্যি বলছ কি না, এখুনি টের পাব আমি।

জ্যোৎস্নাভূষণ পাশের ঘরে চলিয়া গেল। রক্ষিত আবার ঘণ্টা টিপিলেন।

কনেষ্টবল আসিল

রক্ষিত। (আর একটি পত্র দেখিয়া) বিহঙ্গমবাবু কো বোলাও।

বিহঙ্গম আসিয়া প্রবেশ করিল। বিহঙ্গমের দশ-আনা ছ-আনা চুল ছাঁটা, পায়ে বকলশ-দেওয়া চেটাই-বুনানি স্যাণ্ডাল। ছোকরা বেশ সপ্রতিভ

বিহঙ্গম। Good morning, sir.

রক্ষিত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল বিহঙ্গমের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন

রক্ষিত। তোমরা কি জাত ?

বিহঙ্গম। আজ্ঞে আমরা কায়স্থ। মিত্তির আমাদের উপাধি।

রক্ষিত। কোন ইয়ারে পড় ?

বিহঙ্গম। থার্ড ইয়ারে

রক্ষিত। কি কম্‌বিনেশন্‌ ?

বিহঙ্গম। হিস্ট্রি, ফিলজফি। হিস্ট্রিতে অনার্স আছে।

রক্ষিত। আমার মেয়েকে চেন ?

বিহঙ্গম। যতগুলি মেয়ে আমাদের সঙ্গে পড়ে সব্বাইকে চিনি। আপনার মেয়ের নাম কি ?

রক্ষিত। অপর্ণা।

বিহঙ্গম। (পুলকিত কণ্ঠে) খুব চিনি ! ফরসা ফরসা দোহারা গোছের চেহারা তো ?

রক্ষিত পাইপ কামড়াইয়া জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন

রক্ষিত। পিঠের চামড়ার প্রতি যদি মায়া থাকে ভদ্রভাবে কথার উত্তর দাও।

বিহঙ্গম। (সবিস্ময়ে) বেফাঁস তো কিছু বলি নি !

রক্ষিত। আমার মেয়েকে তুমি চিঠি লিখতে ?

বিহঙ্গম। ক্লাসমেট যখন, লিখে থাকবো দু-একখানা, ঠিক মনে নেই।

রক্ষিত বিহঙ্গমের লেখা পত্রখানা তুলিয়া দেখাইলেন

রক্ষিত। এটা কি তোমার লেখা ?

বিহঙ্গম। (আগাইয়া আসিয়া) কই দেখি—ও হ্যাঁ, আমারই। (সবিস্ময়ে) আপনি পেলেন কি করে !

রক্ষিত। শেষের দু'লাইন কবিতাও কি তোমার রচনা ?

হিষ্ট্রির ক্লাসেতে তুমি কেন হলে লেট

মম হৃদি-গবাক্ষের ওগো জুলিয়েট !

বিহঙ্গম। (হাসিয়া) হাতের লেখা আমার, কিন্তু রচনা ভূতোর।

রক্ষিত। পুরো নাম কি ?

বিহঙ্গম। ভূতনাথ পালিত।

রক্ষিত। কোথায় থাকে সে ?

বিহঙ্গম। নাপতে পাড়ায়।

রক্ষিত। ঠিকানা কি ?

বিহঙ্গম। ফাইভ এ খল্লু মিঞা লেন।

রক্ষিত ঘণ্টা বাজাইলেন। কনেষ্টবল প্রবেশ করিল

রক্ষিত। বদরুদ্দিন কো বোলাও।

বদরুদ্দিন দারোগা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল

ফাইভ এ খললু মিঞা লেনের ভূতনাথ পালিতকে অ্যারেস্ট করে আন।

বিহঙ্গম সবিস্ময়ে একবার রক্ষিত এবং একবার দারোগার মুখের পানে চাহিল। দারোগা চলিয়া গেল

বিহঙ্গম। আমাদের সবাইকে এমন করে হ্যারাস করছেন কেন সার ? কাল সারারাত মশার কামড়ে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছি আমরা।

রক্ষিত। (ধমক দিলেন) Shut up. আমার মেয়েকে প্রেমপত্র লিখতে গেছলে কেন, তার উত্তর দাও !

বিহঙ্গম। এমনি।

রক্ষিত। এমনি মানে ?

বিহঙ্গম। আর পাঁচজন লেখে দেখে আমিও লিখলুম একদিন।

রক্ষিত কটমট করিয়া তাহার দিকে চাহিলেন। কি একটা বলিতে গিয়া আত্মসম্বরণ করিলেন। তাহার পর সংযতভাবে বলিলেন।

রক্ষিত। অপর্ণা কোথায় পালিয়ে গেছে জান ?

বিহঙ্গম। পালিয়ে গেছে না কি! জানি না তো!

রক্ষিত। সত্যি কথা বলো।

বিহঙ্গম। সত্যি কথাই বলছি, এই প্রথম শুনলুম!

রক্ষিত একটি কাগজ ও পেন্সিল আগাইয়া দিলেন

রক্ষিত। এই কাগজে লিখে দাও যে অপর্ণা কোথা গেছে—তুমি কিছু জানো না। লিখে নীচে নিজের নাম সই করে দাও।

বিহঙ্গম তাহাই করিল

ও ঘর থেকে ওকেও ডাকো।

বিহঙ্গম জ্যোৎস্নাভূষণকে ডাকিয়া আনিল

রক্ষিত। (জ্যোৎস্নাকে) এইখানে নাম সই কর।

জ্যোৎস্না নাম সই করিল

যাও।

জ্যোৎস্নার সহিত বিহঙ্গমও চলিয়া যাইতেছিল, রক্ষিত বাধা দিলেন

তুমি যেও না।

জ্যোৎস্নাভূষণ চলিয়া গেল

কলেজের কোন্ কোন্ ছেলের সঙ্গে অপর্ণার ভাব ছিল জানো? সত্যি কথা যদি বল, তা হ'লে তোমায় ছেড়ে দেব।

বিহঙ্গম। সত্যি কথা বললে বিশ্বাস করবেন?

রক্ষিত। নিশ্চয় করব।

বিহঙ্গম। কলেজের সমস্ত ছেলেরা ওর সঙ্গে ভাব করবার জন্যে পাগল—ও কিন্তু কাউকেই আমল দেয় না। ইন্দ্রলাল তো ক্ষেপে গেছে বললেই হয়—ছকু—

রক্ষিত পাইপ কামড়াইয়া আত্মসম্বরণ করিলেন

রক্ষিত। বাজে কথা শুনতে চাই না। কার সঙ্গে ওর সব চেয়ে বেশী মাখামাখি জানো?

বিহঙ্গম। না।

রক্ষিত। যাও—ওঘরে বস গিয়ে তা হ'লে। স্কাউণ্ড্রেল্স্!

বিহঙ্গম গটগট করিয়া চলিয়া গেল। রক্ষিত পুনরায় ঘণ্টা টিপিলেন। কনেষ্টবল আসিল

ইন্দ্রলালবাবু কো বোলাও।

রক্ষিত ইন্দ্রলালের পত্রটি পড়িতে লাগিলেন। ইন্দ্রলাল আসিয়া প্রবেশ করিল। ইন্দ্রলালের চেহারা দেখিলেই মনে হয় সে কবি। মাথায় বাবরি চুল, চোখে চশমা, পাঞ্জাবির উপর চাদরটি বেশ কায়দা করিয়া পরিয়াছে। গোঁফ-দাড়ি নাই। তাহাকে কেহই যেন সম্যক্রূপে বুঝিতে পারিতেছে না—মুখে চোখে এমনি একটা মর্ম্মাহত ভাব। ইন্দ্রলাল আসিয়া নমস্কার করিল না, সবিস্ময়ে রক্ষিতের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

রক্ষিত। তোমার পুরো নাম কি?

ইন্দ্রলাল উত্তর দিল না, কেবল এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল

দেখছ কি অমন করে?

ইন্দ্রলাল সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল

ইন্দ্রলাল। (স-সম্ভ্রমে) আপনিই কি মিস্ অপর্ণা রক্ষিতের বাবা?

রক্ষিত। হ্যাঁ। তার সম্বন্ধে কি জানো তুমি?

ইন্দ্রলাল। (গলা খাঁকারি দিয়া) আপনার মেয়ে অপর্ণা দেবী, মানে, (পুনরায় গলা খাঁকারি দিয়া) মানে, আমার বিশ্বাস তিনি একজন আদর্শ নারী। আমরা সীতা, সতী, গার্গী, লীলাবতী নিয়ে উচ্ছ্বসিত হই বটে—

রক্ষিত। (সপদদাপে) Shut up!

ইন্দ্রলাল হকচকাইয়া থামিয়া গেল। রক্ষিত নিষ্ঠুর নিষ্পলক নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটু সাহস সংগ্রহ করিয়া ইন্দ্রলাল পুনরায় সুরু করিল

ইন্দ্রলাল। আমার কথাটা শুনুন দয়া ক'রে। ইতিপূর্ব্বে আমি দু-তিনবার আপনার কাছে আসবার চেষ্টা করেছি কিন্তু আপনার দারোয়ানরা আমাকে ঢুকতে দেয় নি। আজ যখন ভাগ্যক্রমে আপনার কাছে আসতে পেরেছি তখন সমস্ত কথা খুলে বলতে চাই আমি! মানে—

রক্ষিত। এ চিঠি তোমার লেখা ?

চিঠি দেখাইলেন

ইন্দ্রলাল। কই দেখি, এ চিঠি আপনি পেলেন কি করে !

চিঠিখানি লইয়া সাগ্রহে পড়িতে লাগিল। রক্ষিত ভ্রূকুটি-ভীষণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন

কলমটা একবার দেবেন দয়া ক'রে—ও আমার পকেটেই তো আছে—চাঁদের চন্দ্রবিন্দুটা পড়ে গেছে তাড়াতাড়িতে—ঠিক করে দি—

পকেট হইতে কলম বাহির করিয়া সংশোধন করিতে গেল। রক্ষিত উঠিয়া হাত হইতে চিঠিখানা ছিনাইয়া লইলেন

রক্ষিত। (পুনরায় উপবেশন করিয়া) আমার কথার জবাব দাও ! এ চিঠি তোমার লেখা ?

ইন্দ্রলাল। ওটা তো আমার বটেই—আরও অনেক চিঠি লিখেছি আমি—এই বিষয়েই তো আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই খোলাখুলি।

রক্ষিত। কি আলোচনা ?

ইন্দ্রলাল। আগেই আপনাকে বলেছি, মানে (গাঢ় স্বরে), আমার দৃঢ় ধারণা মিস্ অপর্ণা রক্ষিত একজন আদর্শ নারী। আমি যেদিন থেকে তাঁর পরিচয় পেয়েছি সেই দিন থেকেই তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা অসঙ্কোচে নিবেদন করেছি।

রক্ষিত। (ক্ষিপ্ত কণ্ঠে) একটি চড়ে তোমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব রাস্‌কেল্ ! শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি !

ইন্দ্রলাল। মিস্ রক্ষিত বলেছিলেন আপনাকে সব কথা অসঙ্কোচে জানাতে, বলেছিলেন যে আপনার যদি অমত না হয়—

রক্ষিত। (সবিস্ময়ে) কিসের অমত ?

ইন্দ্রলাল। মানে, (একটু ইতস্তত করিয়া) মানে, আমি তাঁকে পত্নীত্বে বরণ ক'রে ধন্য হ'তে চাই !

রক্ষিত। (অধিকতর বিস্মিত) তার মানে !

ইন্দ্রলাল। (ঢোঁক গিলিয়া) মানে, বিয়ে করতে চাই !

রক্ষিত। বিয়ে করতে চাও ! বাই জোভ ! অপর্ণাকে ?

ইন্দ্রলাল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রক্ষিত। আমার মেয়েকে বিয়ে করবার সঙ্গতি আছে তোমার ? তোমার বাবা কি করেন ?

ইন্দ্রলাল। চাকরি করেন।

রক্ষিত। মাইনে কত ?

ইন্দ্রলাল। আশি টাকা।

রক্ষিত। তুমি কি কর ?

ইন্দ্রলাল। থার্ড ইয়ারে পড়ি।

রক্ষিত। ভাই-বোন আছে ?

ইন্দ্রলাল। চার বোন, দু ভাই।

রক্ষিত। বোনদের বিয়ে হয়েছে ?

ইন্দ্রলাল। না।

রক্ষিত। তোমার পুরো নাম কি ?

ইন্দ্রলাল। ইন্দ্রলাল পোদ্দার।

রক্ষিত। বেনে ?

ইন্দ্রলাল। আজ্ঞে হ্যাঁ, গন্ধবণিক।

রক্ষিত। তুমি অপর্ণাকে বিয়ে করতে চাও ?

ইন্দ্রলাল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রক্ষিত সকৌতুক বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন

সবই তো খুলে বললাম। এবার আপনি কি করবেন তা যদি—

রক্ষিত। I shall beat you black and blue !

ইন্দ্রলাল। অপর্ণা দেবীর জন্যে যে-কোন নির্য্যাতন আমি হাসিমুখে সহ্য করতে—

রক্ষিত। Shut up you fool! অপর্ণা এখন কোথায় আছে জানো?

ইন্দ্রলাল। এখন তো কলেজের ছুটি, খুব সম্ভবত বাড়িতে আছেন।

রক্ষিত। ভণ্ডামি করবার চেষ্টা কোরো না—you can't pull my leg! কাল থেকে অপর্ণাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

ইন্দ্রলাল। তাই না কি!

রক্ষিত। সে কোথা গেছে জানো?

ইন্দ্রলাল। আজ্ঞে না।

রক্ষিত। এই কাগজে নাম সই কর তা হ'লে—

বিহঙ্গমের লেখা কাগজটি দিলেন

Please remember you shall have a very nasty time if your statement is untrue.

ইন্দ্রলাল সহি করিয়া দিল

ইন্দ্রলাল। (সহসা) আমার কষ্ট হচ্ছে, ভয়ঙ্কর কষ্ট হচ্ছে!

রক্ষিত। যাও, ওই ঘরে গিয়ে বস।

ইন্দ্রলাল পাশের ঘরে চলিয়া গেল। রক্ষিত পুনরায় ঘণ্টা টিপিলেন, কনেষ্টবল আসিল

অমিয়বাবু কো বোলাও।

কনেষ্টবল চলিয়া গেল, অমিয় আসিয়া প্রবেশ করিল। অমিয়র বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ; ধরণ ধারণ একটু উদ্ধতগোছের। পরিধানে হাফ শার্ট, কাপড় মালকোচামারা, পায়ে স্যাণ্ডাল। অমিয় একজন স্পোর্টস্‌ম্যান।

অমিয়। আমি জানতে চাই আমাদের এমনভাবে ধরে আনবার মানে কি?

রক্ষিতের চক্ষু দুইটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিল

রক্ষিত। তোমরা সবাই ক্রিমিনাল!

অমিয়। ক্রিমিনাল?

রক্ষিত। এ চিঠি কার লেখা?

পত্রটি দেখাইলেন

অমিয়। কিসের চিঠি, দেখি—

দেখিয়া ফিরাইয়া দিল

কার লেখা জানি না।

রক্ষিত। তোমার লেখা নয় ?

অমিয়। না।

রক্ষিত। নীচে অমিয় নাম লেখা রয়েছে দেখতে পাচ্ছ না ?

অমিয়। আমাদের কলেজে সাতটা অমিয় আছে। ল্যাংড়া অমিয়, কবি অমিয়, অমিয় দত্ত, অমিয় সেন, প্লেয়ার অমিয়, অমিয় নাগ—আর আমি !

রক্ষিত। তোমার নাম কি ?

অমিয়। অমিয় ঘোষাল।

রক্ষিত একটি সাদা কাগজ ও পেন্সিল আগাইয়া দিলেন

রক্ষিত। বাকী কজনের পুরো নাম আর ঠিকানা লিখে দাও এতে।

অমিয়। কেন ?

রক্ষিত। Because I order you to do so.

অমিয়। দেব না।

রক্ষিত। দেবে না !

অমিয়। না, কারো নামে চুকলি খাওয়া আমার স্বভাব নয়।

রক্ষিত। I order you again.

অমিয় অবিচলিত দাঁড়াইয়া রহিল

যা বলছি তা কর !

অমিয়। এদের নাম নিয়ে কি করবেন ?

রক্ষিত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন

রক্ষিত। এই অপরাধে তোমার জেল হয়ে যেতে পারে তা জান ?

অমিয়। অপরাধটা কি !

রক্ষিত। You are refusing to help law and justice.

অমিয়। (নির্ব্বিকারভাবে) জেল যেতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। নন-কো-অপারেশনের সময় ছমাস খেটেও এসেছি।

রক্ষিত। তুমি এদের নাম লিখে দেবে, কি দেবে না?

অমিয়। দেব না।

রক্ষিত। (চিঠিটা তুলিয়া) তুমি বলছ এ চিঠি তোমার লেখা নয়?

অমিয়। না। কিন্তু মিথ্যে কথা বলতেও আমার আপত্তি নেই। ও চিঠি আমার লেখা স্বীকার করলেই যদি বখেড়া মিটে যায় স্বীকার করতে রাজী আছি।

রক্ষিত। আমার মেয়ে অপর্ণা কোথায় আছে জানো?

অমিয়। আপনার মেয়ে অপর্ণা কোথায় আছে আমি কি করে জানব! আপনারই জানবার কথা—

রক্ষিত। দেখ বেশী যদি কথা বল—I shall tear out your dirty tongue! আমার মেয়ে কোথায় আছে জানো কি-না? Yes or no?

অমিয়। না।

রক্ষিত। অপর্ণার বিষয়ে কি জান?

অমিয়। অনেক কিছু জানি, কিন্তু বলব না।

রক্ষিত। I know how to break you and your like। যাও, ওঘরে বস গিয়ে এখন! রাস্‌কেল্‌স্‌!

ঘণ্টা টিপিলেন। কনেষ্টবল আসিল। কনেষ্টবলের সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণা আসিয়া প্রবেশ করিল এবং তাহার পিছু পিছু অধ্যাপক মঙ্গলময় দাস।

এ কি, অপর্ণা!

অপর্ণা। (হাসিয়া) আমরা দুজনে তোমাকে প্রণাম করতে এলুম বাবা!

রক্ষিত। তার মানে?

মঙ্গলময় খুব সপ্রতিভভাবে আগাইয়া আসিলেন

মঙ্গলময়। আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করেছি।

রক্ষিত সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন অপর্ণার মাথায় সিঁদুর রহিয়াছে

রক্ষিত। বিয়ে করেছেন! আপনি! আমার মেয়েকে!

মঙ্গলময়। আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেক আগে থেকেই ঠিক করেছিলাম আমরা।

অপর্ণা। (আবদার-তরল কণ্ঠে) তুমি রাগ করতে পাবে না বাবা!

রক্ষিত। (মঙ্গলময়কে) আপনি ওর প্রফেসার না?

মঙ্গলময়। (স্মিতমুখে) তাতে কি হয়েছে? শাস্ত্রে শিষ্যার স্ত্রী হতে বাধা নেই।

রক্ষিত। এমন ভাবে লুকিয়ে বিয়ে করার মানে!

মঙ্গলময়। আপনাকে বললে আপনি বিয়ে দিতে রাজি হতেন না।

রক্ষিত গুম্ হইয়া রহিলেন

অপর্ণা। (আবদারমাখা স্বরে) রাগারাগি কোরো না বাবা।

রক্ষিত। আমি মত দিতুম না জানলেন কি ক'রে আপনি? পাত্র হিসেবে আপনি খারাপ নন।

মঙ্গলময়। কিন্তু জাতে আমি সদ্গোপ, আপনারা কায়স্থ!

রক্ষিত। সদ্গোপ—অ্যাঁ—বলেন কি! সদ্গোপ আপনি! সদ্গোপ!

মঙ্গলময়। আইন অনুসারে তাতে কোন বাধা নেই। আপনার মেয়ে মাইনর নয়, সে স্বেচ্ছায় আমাকে বিয়ে করেছে—আইন অনুসারে আমাদের ম্যারেজ রেজিষ্টার্ড হয়েছে। (হাসিয়া) বে-আইনী কিছু করিনি।

রক্ষিত। No, no, this cannot be. I want an explanation for all this. (প্রায় চীৎকার করিয়া) Do you hear, I want an explanation!

কেহ কোন উত্তর দিল না। রক্ষিত পাইপটায় দুবার টান দিলেন—ধোঁয়া বাহির হইল না। ছাত্র চারিজন দ্বারের নিকট আসিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রফেসারের সহিত চোখো-চোখি হইবামাত্র সকলে যুগপৎ তাঁহাকে নমস্কার করিল।

সকলে। (স-সম্ভ্রমে) নমস্কার মাস্টার মশাই!

যবনিকা

বানপ্রস্থ

একটি পোড়ো নীলকুঠির একটি কক্ষ। ঘরটিতে দুইটি বড় দরজা এবং কয়েকটি জানালা রহিয়াছে। আসবাব-পত্র কিছুই নাই। দরজা ঠেলিয়া বরদা ও জগমোহন প্রবেশ করিলেন। জগমোহনের হাতে দুইটি মুগুর, বরদার হাতে কিছু নাই। উভয়েই স্বাস্থ্যবান, যদিও উভয়েরই বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। জগমোহনের গোঁফ দাড়ি কামানো, চোখে মুখে এমন একটি ভাব আছে যে দেখিলেই মনে হয় লোকটি রসিক। বরদার বেশ জমকালো কাঁচাপাকা এক জোড়া গোঁফ আছে, গোঁফের প্রান্তদ্বয় উর্দ্ধমুখী। বরদার চোখে-মুখেও এমন একটা ভাব আছে যে, দেখিলে মনে হয় লোকটি রাশভারি এবং চটা মেজাজের। বরদার রং কালো এবং বড় বড় চোখ দুটি লাল। তাঁহারা প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি ভৃত্য-জাতীয় ব্যক্তি একটি শতরঞ্চি বগলে করিয়া প্রবেশ করিল।

জগমোহন। শতরঞ্চিটা পেতে ফেল। বরদা, একটু সর তো ভাই, শতরঞ্চিটা বেশ চৌরস ক'রে পাতুক।

বরদা একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। চাকরটি শতরঞ্চি বিছাইতে লাগিল। জগমোহন ঘরের কোণে গিয়া মুগুর দুইটি রাখিয়া দিলেন।

ভৃত্য। (শতরঞ্চি পাতা শেষ করিয়া) আমি এবার যাই হুজুর ?

জগমোহন। বেশ, যা—ভাড়া পেয়ে গেছিস তো ?

ভৃত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর !

নমস্কার করিয়া ভৃত্য প্রস্থান করিল

জগমোহন। ওরে শোন্ !

ভৃত্য পুনরায় প্রবেশ করিল

আমাদের সেই মালের নৌকোটার সঙ্গে যদি দেখা হয়, ব'লে দিস তাড়াতাড়ি আসে যেন।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে হুজুর।

চলিয়া গেল

জগমোহন। যাক্—এসে তো পড়া গেল। ওপারের জমিদারবাবুদের খবর পাঠিয়েছিলাম, তাঁরাও ঘরটা সাফসুতরো করিয়ে রেখেছেন দেখছি। বাপরে বাপ—রাস্তা কি সহজ, স্টেশন থেকে বারো ক্রোশ গরুর গাড়ি, তারপর নৌকো—ওকি ভুরু কুঁচকে আছ কেন? এর মধ্যেই ঘাবড়াচ্ছ! তখুনি বলেছিলাম তোমার দ্বারা এসব হবে না।

বরদা। ঘাবড়াব কেন, আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি তোমার বুদ্ধি দেখে।

জগমোহন। কি রকম?

বরদা। এত জিনিস থাকতে তুমি কেবল মুগুর দুটো নিয়ে এলে। ফলের বাস্কেট্ পড়ে রইলো ওই নৌকোটাতে, মুগুর নিয়ে কি করব এখন!

জগমোহন। ব্যস্ত হও কেন! ও নৌকোটাও এসে পড়ল বলে। পান্সির মাঝিটাকে তো বলেও দিলুম শুনলে, যদি দেখা পায় তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিতে। আসবেও তারা তাড়াতাড়ি। আগাম ভাড়া দিয়ে দিয়েছি। খিদে পেয়েছে না কি?

বরদা। খুব বেশী নয়, একটু একটু।

জগমোহন হাসিলেন

জগমোহন। তোমার পাল্লায় পড়ে এলাম তো। আসল ব্যাপারটা এইবার খুলে বল দিকি। এমন ভাবে পালিয়ে আসার অর্থ টি কি—

বরদা। অর্থ আবার কি, অর্থ তো আগে বলেইছি।

জগমোহন। আমি শুনতে চাইছি নির্গলিতার্থ। মানে—

বরদা। মানে টানে কিছু নেই—এ বয়সে শান্তিতে থাকতে হ'লে বানপ্রস্থ নেওয়া ছাড়া গতি নেই। মানুষের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে।

জগমোহন। এ সব তো প্রাচীন কথা। হঠাৎ এ্যাদ্দিন পরে এ খেয়াল হবার মানে?

বরদা। (উদ্দীপ্ত কণ্ঠে) খেয়াল! কিছুমাত্র আত্ম-সম্মান জ্ঞান থাকলে

বুড়ো বয়সে সংসারে থাকা উচিত নয়। একটা বুড়ো সংসারের অলঙ্কার নয়, ভার। তার মানে মানে সরে যাওয়াই উচিত।

জগমোহন। (হাসিয়া) অর্থাৎ পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে ?

বরদা। পরিবারের সঙ্গে আবার সদ্ভাব থাকে কার কোন্ দিন! তুমি ব্যাচিলার মানুষ, পরিবারের স্বাদ পাওনি কখনও, তাই ইডিয়টের মতো কথাটা বললে। কোনও ভদ্রলোকের কখনও কোনদিন কস্মিন্‌কালে পরিবারের সঙ্গে সদ্ভাব থাকে নি—থাকতে পারে না।

জগমোহন কিছু না বলিয়া হাসিলেন

শুধু পরিবারের সঙ্গে কেন কারো সঙ্গে আমার সদ্ভাব নেই। এ যুগের কারো সঙ্গে আমাদের মিলতে পারে না।

জগমোহন। বল কি !

বরদা। মিলবে কি ক'রে! আমাদের পছন্দ বালাপোষ, ওদের পছন্দ চেস্টারফিল্ড ; আমাদের জামা গলা-বন্ধ, ওদের জামা গলা-খোলা ; আমরা মুগুর ভাঁজি, ওরা তাস ভাঁজে ; আমরা কুস্তি করি পালোয়ানের সঙ্গে—ওরা ব্যাড্‌মিন্‌টন্ খেলে মেয়েদের সঙ্গে। আমরা দামী গড়গড়ায় তাওয়া দিয়ে অম্বুরি তামাক খাই, ওরা ফোঁকে সিগারেট। ওদের সঙ্গে আমাদের মিলতে পারে না—পারে না—পারে না।

প্রত্যেক 'পারে না'র সহিত তিনি প্রসারিত বাম করতলে মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ করতল দিয়া আঘাত করিলেন

জগমোহন। তোমার গিন্নিটি তো সেকেলে, এই থিওরি অনুসারে তাঁর সঙ্গে অন্তত তোমার ভাব থাকা উচিত ছিল।

বরদা। তুমি আইবুড়ো কার্ত্তিক, তুমি গিন্নি-ফিন্নির কিছু বোঝ কি! ওরা হ'ল ঝড়ের আগে এঁটো পাতের জাত। যেদিকে হাওয়া বয়, সেইদিকেই ছোটে।

জগমোহন। তার মানে ?

বরদা। তার মানে—নির্ব্বিচারে প্রবলের পক্ষ নেয়। আমার এখন বয়স গেছে, উপার্জ্জন করি না; সুতরাং গিন্নি এখন ছেলেদের দলে যোগ দিয়েছে। ভাবছে—ও বুড়োটার আর কি পদার্থ আছে—ওটাকে তো আমসি-চোষা ক'রে শেষ ক'রে এনেছি। (সহসা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে) তা না ভাবলে—

সহসা আবার থামিয়া গেলেন

জগমোহন। তা না ভাবলে?

বরদা। তা না ভাবলে কখনও আমার কথার উপর কথা কইতে আসে? অমন সুন্দরী সদ্বংশের মেয়ে পছন্দ করলাম, কারুর মনে ধরল না। নানান্ বায়নাক্কা। দুর্গা নাম ছেলের পছন্দ নয়, মেয়ে গান গাইতে জানে না। আরে মোলো, গান শুনতে চাস তো ভাল একটা বাঈজী ডেকে গান শোন্ না। শুনে তৃপ্তি পাবি। তারা রুটির জন্যে গান শিখেছে—হার্মোনিয়াম প্যাঁ-পোঁ ক'রে ন্যাকামি করবার জন্যে নয়। তা ছাড়া. বউ গান গাইবে কখন বল তো হ্যা— এসেই তো ঢুকবে রান্নাঘরে, তারপর আঁতুড়ে। সারাটা জীবন রান্নাঘর-আঁতুড়ঘর করতে হবে যাকে, সে গান গাইবে কখন!

জগমোহন। তোমার বড় ছেলের বিয়ে কোথায় ঠিক হ'ল?

বরদা। কে জানে! কোন এক ধূসরা বলে মেয়ের সঙ্গে।

জগমোহন। ধূসরা!

বরদা। হ্যাঁ ধূসরা। ধূসরা ফোয়ারা জর্জেট মর্জিনা—যার সঙ্গে খুশি ছেলের বিয়ে দিক—আমি ওসবের মধ্যে নেই। আমি জীবনের বাকী দিন ক'টা শান্তিতে নির্জ্জনে কাটিয়ে দিতে চাই, বাস্।

পদচারণ করিয়া জানলার নিকট গিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। জগমোহন স্মিতমুখে বরদার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বরদা সহসা ঘুরিয়া প্রশ্ন করিলেন

দুধ পাওয়া যায় এখানে?

জগমোহন। এখানে কিছু পাওয়া যায় না; তবে এখানে যদি থাকো, ওপারের গোয়ালাদের কাছ থেকে দুধের ব্যবস্থা হতে পারে।

বরদা। খেয়া নৌকো নেই বলছ, তারা পার হবে কি করে ?

জগমোহন। তারা মোষের পিঠে চড়ে পার হয় সাধারণতঃ।

বরদা। ও।

পুনরায় জানলার দিকে ফিরিলেন

জগমোহন। বাড়িতে কি ব'লে এসেছ ?

বরদা। জমিদারী দেখতে বেরুচ্ছি। এক তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না আমি কোথায় এসেছি।

জগমোহন। থাকতে পারবে তো, দেখ—

বরদা। তুমি যদি পারো, আমি পারবো না কেন।

জগমোহন। আমার কথা ছেড়ে দাও, অনেক ঘাটের জল খাওয়া অভ্যেস আছে আমার। চিরটা কাল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ওভারশিয়ারি ক'রে কাটিয়েছি, তাছাড়া আমার তিন কুলে কেউ নেইও বুক চাপড়ে কাঁদবে। তোমারি নানান্ বখেড়া—

বরদা। আমার আবার কি বখেড়া দেখলে।

জগমোহন। (হাসিয়া) বখেড়া বই কি! তোমার ফরাস চাই, তাকিয়া চাই, বই চাই, খাবার চাই, তামাক চাই, মুগুর চাই—মুগুর না ভাঁজলে খিদেই হয় না। তোমার মতো লোকের এসব জায়গায় থাকা শক্ত বই কি।

বরদা। কিছু শক্ত নয়। সব জুটিয়ে নেব। ফরাস, তাকিয়া, বই, খাবার সবই তো আসচে। নৌকোটা কতক্ষণে এসে পৌছবে বল তো! তুমি নিয়ে এলে মুগুর ছুটো—ফলের বাস্কেটটা ফেলে। আশ্চর্য্য বুদ্ধি তোমার!

জগমোহন। মুগুর ছুটো হাতে ছিল, নিয়ে এলাম। আমাদের ঐ ছোট পানসিতে কি তোমার ওই বিরাট বড় বড় ছুটো ফলের বাস্কেট আঁটতো? ও ছুটোকে বাস্কেট বল কি হিসেবে, ছুটো তো প্রকাণ্ড বড় বড় প্যাকিং কেস। কি ফল এনেছ এত ?

বরদা। সমস্ত ড্রাই ফ্রুট্স্। ছু'জনের স্বচ্ছন্দে মাসখানেক চলে যাবে।

তার পর ঠিক করেছি, কলকাতা থেকে রেগুলার বাস্কেট আনাব। নিজেদের একটা নৌকোও রাখতে হবে, বুঝলে ? চমৎকার নির্জন জায়গাটি—

একটু শিস্ দিলেন। সহসা শূন্যে করতালি দিয়া

বেশ মশা আছে দেখছি এখানে।

জগমোহন। মশা তো হবেই, বুনো জায়গা।

বরদা। তুমি নিধেটাকেও ওই নৌকোটাতে রেখে এলে। সে থাকলে তবু—

জগমোহন। বাঃ—অত খাবারটাবার, কাপড়চোপড়, হোল্ড অল্, স্যুট কেশ, ট্রাঙ্ক, য়্যাটাচি—সব ওই অচেনা মাঝি ব্যাটাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আসব ! নিধে পুরোনো চাকর, সব সামলে-সুমলে আনতে পারবে।

বরদা। [সক্ষোভে] তুমি যদি মুগুর দুটো না এনে তামাকের সরঞ্জামটা আর মহাভারতটা আনতে, তা হলে আরাম ক'রে ব'সে একটু পড়া যেত।

জগমোহন। সব এসে পড়বে এক্ষুণি, ঘাবড়াচ্ছো কেন ? বস না।

বরদা। শতরঞ্চির উপর দু'জনে মুখোমুখি হয়ে বসে থাকব ! তার চেয়ে চল বাইরে একটু ঘুরে বেড়ানো যাক।

জগমোহন। বাইরে স্রেফ শেয়াল কাঁটা আর কন্টিকারি ছাড়া কিচ্ছু নেই। এইখানেই বসতে হবে।

বরদা। এই জঙ্গলে সায়েবগুলো কেমন বাংলোটা বানিয়েছে দেখেছ !

ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন

জগমোহন। আগে এখানে নীল চাষ হ'ত কি না।

বরদা। [আর একটি দরজায় উঁকি দিয়া] এদিকেও আর একটা ছোট রুম রয়েছে হে।

জগমোহন। এ বাড়িটাতে অনেকগুলো রুম। পূবদিকে একটা চমৎকার বারান্দাও আছে।

বরদা। [সহসা জানালার দিকে চাহিয়া] ওহে, দেখ দেখ, আর একখানা

কাদের নৌকো যেন ভিড়েছে এসে। কে একজন যেন নেবে আসছেও—বেশ হনহন ক'রে আসছে। ভটচাষ্যি-ভটচাষ্যি চেহারা।

জগমোহন। এই পোড়ো বাংলোটার লোভে অনেকে পিক্‌নিক করতে আসে এখানে। শিকারও মেলে শীতকালে—

বরদা। তুমি ওপারের জমিদারবাবুদের ব'লে সব ঠিক ক'রে ফেলেছ তো?

জগমোহন। সমস্ত—মায় ভাড়া পর্য্যন্ত।

বরদা। ভদ্রলোক আমাকে দেখতে পেয়েছেন, এইদিকেই ঘুরলেন।

জগমোহন। বেশ তো, আসুন না, গল্প ক'রে সময় কাটবে।

বরদা। উঃ, কি ভয়ানক মশা হে—

চটাং করিয়া মারিলেন

(নেপথ্যে) আসতে পারি ?

বরদা। [আগাইয়া গেলেন] আসুন, আসুন—নমস্কার !

শিরোমণি মহাশয় প্রবেশ করিলেন

আপনারা বুঝি বেড়াতে এসেছেন ?

শিরোমণি। ওনারা হয়তো বেড়াতে এসেছেন, আমি এসেছি অদৃষ্টের ফেরে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কোন পাপের ফলেই সম্ভবত দূষিত সংসর্গ করতে হচ্ছে, তা না হ'লে আমি অম্বিকা শিরোমণি স্বেচ্ছায় এদের সঙ্গে বেড়াতে আসি না।

জগমোহন। আসুন আসুন, বসুন !

বরদা। হ্যাঁ, বসুন বসুন।

জগমোহন। [হাসিয়া] তুমি এইমাত্র মহাভারতের খোঁজ করছিলে স্বয়ং শিরোমণি মশায় এসে হাজির হয়ে গেছেন। কত শাস্ত্রচর্চ্চা করবে কর এখন বসে বসে।

বরদা। যা বয়স হ'ল এখন শাস্ত্রচর্চ্চাই করতে হবে ভাই। তা ছাড়া,

শাস্ত্রচর্চ্চা আমার ভালও লাগে খুব। শিরোমণি মশায় চটে আছেন বলে মনে হচ্ছে—বসুন।—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন।

সকলে উপবেশন করিলেন

শিরোমণি। চটব কার ওপরে বলুন, নিজের অদৃষ্টের ওপরে? তবে ক্ষুব্ধ হতে তো বাধা নেই। ক্ষুব্ধ হয়েছিও।

বরদা। যা বলেছেন, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই।

শিরোমণি। যথার্থ কথা, কিন্তু পুরুষকার বলেও একটা জিনিস আছে। কঠোপনিষদ বলেছেন—

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ
তয়োঃ শ্রেয় আদাদানস্য সাধু
ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥

জগমোহন। আপনারা ততক্ষণ শাস্ত্রালাপ করুন, আমি বাইরে থেকে ঘুরে আসি একটু। দেখি আমাদের নৌকাটা আসছে কি-না।

শিরোমণি। কিসের নৌকা?

বরদা। আমাদের জিনিসপত্র যে নৌকাটায় আছে সেটা এখনও এসে পৌঁছয়নি। হ্যাঁ, তুমি একটু খোঁজ নাও গিয়ে—

জগমোহন বাহির হইয়া গেলেন

আপনি যে শ্লোকটি বললেন তার অর্থ কি?

শিরোমণি। তার অর্থ হচ্ছে গিয়ে—শ্রেয় আর প্রেয় পরস্পর বিভিন্ন জিনিস এবং দুই-ই জীবকে বিভিন্নরূপে আবদ্ধ করে। যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তাঁর মঙ্গল হয়, আর যিনি শ্রেয়কে ছেড়ে প্রেয়কে অর্থাৎ সুখকরকে বরণ করলেন তিনিই মলেন, পরমার্থ থেকে বিচ্যুত হলেন।

ট্যাঁক হইতে নস্যদানি বাহির করিয়া নস্য লইলেন

আমি এখন প্রেয়-বিলাসী পরমার্থ-বিচ্যুত এক ছোকরার কবলে কবলিত। দুরদৃষ্ট আর কি।

বরদা। তাই না কি! ব্যাপারটা কি!

শিরোমণি। মানে, বিপথগামী এক শিষ্যের পাল্লায় পড়েছি এবং সে বিপথগামী বলেই তাকে ছেড়ে যেতে পারছি না। কারণ স্বয়ং ভগবান গীতায় বলছেন—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

ধর্ম্মের পুনঃ স্থাপনের জন্যই ধার্ম্মিককে অধার্ম্মিকের সঙ্গ করতে হয়, উপায় নেই। তা ছাড়া বেতনও দেয়, সুতরাং অধিকতর নিরুপায়!

বরদা। (উচ্ছ্বসিত) আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভারি আনন্দিত হলাম। চমৎকার! সময়টা ভাল ভাবেই কাটবে মনে হচ্ছে। আপনার সেই বিপথগামী শিষ্যটি কোথায়?

শিরোমণি। ওই যে নৌকাবিহার করছেন তিনি। আমার আর বরদাস্ত হ'ল না, নৌকো থেকে নেমে পড়লাম আমি। ছোকরার এদিকে লেখাপড়ার দিকে ঝোঁক আছে, এম. এ. পাশ, মৌলভী রেখে ফার্সি উর্দ্দু শিখেছে, সংস্কৃত চর্চ্চার জন্যে আমাকে বেতন দিয়ে রেখেছে—কিন্তু হ'লে কি হবে—অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ। ওই অবিদ্যাতেই সব মাটি করেছে।

বরদা। যা বলেছেন। এ যুগটাই অবিদ্যার যুগ। যে ভারতে একদিন—

জগমোহন ফিরিয়া আসিলেন

কি হ'ল হে, নৌকোর কোন পাত্তা পেলে?

জগমোহন। কই, কিছু তো দেখতে পেলাম না। একটু পরেই এসে পড়বে। শিরোমণি মশায়ের সঙ্গে ততক্ষণ শাস্ত্রালাপ করা যাক—

শিরোমণি। আমি শাস্ত্রের কতটুকুই বা জানি! তা ছাড়া, শাস্ত্র—যার অর্থ হ'চ্ছে প্রাচীন অনুশাসন—যা দেবগণ ঋষিগণ বেদ-তন্ত্র-স্মৃতি-পুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন সে শাস্ত্র আজকাল কে মানছে বলুন। শাস্ত্রচর্চ্চা আজকাল একটা অবান্তর ব্যাপার। এই ধরুন না, যে জমিদারপুত্রটির সঙ্গে আমি এসেছি সে কি মনুসংহিতোক্ত রাজার ধর্ম্ম পালন করে ?

বকবচ্চিন্তয়েদর্থান্ সিংহবচ্চ পরাক্রমেৎ
বৃকবচ্চানুলম্পেত শশবচ্চ বিনিস্পতেৎ।

ও বকও নয়, সিংহও নয়, বৃকও নয়, শশও নয়—উপমা দিতে হলে বলতে হয় ও একটা ছাগল ছাড়া আর কিছু নয়।

বরদা। (সমঝদারের মত ভঙ্গী করিয়া) ঠিক বলেছেন, আজকাল ব্যাপারই ওই রকম।

জগমোহন। (হাসিয়া) না, সেকথা বললে শুনব কেন! শাস্ত্রের প্রভাব এখনও কিছু কিছু আছে বই কি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো আপনার সামনেই বর্ত্তমান ; ইনি সংসারে বীতরাগ হয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন ক'রে এখানে এসেছেন।

বরদা। তুমি থামো দিকি।

জগমোহন। থামবো কি রকম, যা সত্যি—

শিরোমণি। বানপ্রস্থ ? তাই নাকি, এ যুগের পক্ষে বিস্ময়কর বটে। বানপ্রস্থ ক'রকম জানেন ?

বরদা। আজ্ঞে না। (হাসিলেন)

জগমোহন। যদি আপত্তি না থাকে বানপ্রস্থের বিষয় আপনি কিছু বলুন না। আমরা দুজনেই এ বিষয়ে অজ্ঞ।

বরদা। (সাগ্রহে) আজ্ঞে হ্যাঁ বলুন বলুন

শিরোমণি। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ভৈক্ষ্য—শাস্ত্রোক্ত এই চতুর্ব্বিধ আশ্রম। মহানির্ব্বাণতন্ত্র কিন্তু বলছেন কলিযুগে গার্হস্থ্য ও ভৈক্ষ্য ভিন্ন অন্য

কোন আশ্রমই নেই। ও বিষয়ে কিন্তু মতভেদ আছে, ব্যাসদেব বলেন—যাক্ সে সব—এখন বানপ্রস্থের কথা শুনুন।

নস্য লইলেন

বানপ্রস্থ হচ্ছে তৃতীয় আশ্রম। অদ্রোহে বা অল্পদ্রোহে জীবিকা নির্ব্বাহ করে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী দারপরিগ্রহ অপত্যোৎপাদনাদি সমাধানান্তে বনবাসগমন পূর্ব্বক অকৃষ্ট পচ্য ফলাদি ভক্ষণ ক'রে যে ঈশ্বরারাধনা তাকেই বলে বানপ্রস্থ। বানপ্রস্থ দ্বিবিধ—

বরদা। (মুগ্ধ) আপনার জ্ঞানের গভীরতা দেখে সত্যিই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি ক্রমশ। আপনারাই হলেন ভারতের গৌরব।

জগমোহন। (সোৎসাহে) সে কথা আর বলতে!

বরদা। বলুন বলুন শুনি।

শিরোমণি। বানপ্রস্থ দ্বিবিধ—অশ্মকুট্ট ও দন্তদূখলিক।

বরদা। তাই না কি! দন্তদূখলিক!

শিরোমণি। যারা পক্ষান্তে বা মাসান্তে ভোজন করে তাদেরই দন্তদূখলিক বলে।

বরদা। বানপ্রস্থে খেতেও মানা না কি?

জগমোহন। (অপাঙ্গে বরদার পানে চাহিয়া) তবেই সেরেছে!

শিরোমণি। না, না, খেতে মানা নেই, তবে আহার বিষয়ে সংযত হবার নানা বিধান আছে। ফালকৃষ্ট আহার্য্যই নিষিদ্ধ। অন্যান্য বিধানও আছে, তার মধ্যে তিনবার স্নান করা, জটাবল্কল ধারণ করা, প্রতিগ্রহনিবৃত্ত হওয়া, স্বাধ্যায়বান হওয়া, দান্ত আত্মবান হওয়া—এইগুলোই প্রধান।

বরদা। এ সব করবার মানে?

জগমোহন। ভীষণ আইন কানুন দেখছি!

শিরোমণি। ভোগলিপ্সাকে নিষ্পিষ্ট ক'রে অবলুপ্ত করতে পারাই বানপ্রস্থের উদ্দেশ্য। গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে যেমন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শরীর মনকে

প্রস্তুত ক'রে নিতে হয়, তেমনি ভৈক্ষ্য আশ্রমে প্রবেশ করবার জন্যে বানপ্রস্থে সমস্ত বাসনাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হয়। সেইজন্যে গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যে, বর্ষাকালে ভূতলশায়ী হয়ে এবং হেমন্তকালে আর্দ্রবস্ত্রধারী হয়ে থাকার নিয়ম আছে। আসল কথা কি জানেন ?

বরদা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, শেষোক্ত বাক্যে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন

বরদা। আজ্ঞে হ্যাঁ, আসল কথাটাই বলুন সহজ ক'রে।

শিরোমণি। আসল কথা উপনিষদে পাবেন। ছান্দোগ্যে আছে—শ্রদ্ধা নিষ্ঠাসাপেক্ষ, নিষ্ঠা কর্ম্মসাপেক্ষ এবং কর্ম্ম সুখসাপেক্ষ—

নস্য লইলেন

বরদা। একটা ভারি অভাব বোধ করছি, জগমোহন!

জগমোহন। কিসের ?

বরদা। তামাকের। তুমি খালি মুগুর দুটো নিয়ে এলে—

জগমোহন। নৌকো এই এসে পড়ল বলে', একটু ধৈর্য্য ধর না।

বরদা। তুমি আর একবার বেরিয়ে দেখ না হয়।

জগমোহন। যাচ্ছি। পণ্ডিত মশায়ের কথাটা শেষ হয়ে যাক। এমন উপদেশাত্মক ভাল কথা তো চট্ ক'রে শোনা যায় না।

বরদা। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলুন—ছান্দোগ্যে—

শিরোমণি। ছান্দোগ্য বলছেন, শ্রদ্ধা নিষ্ঠাসাপেক্ষ, নিষ্ঠা কর্ম্মসাপেক্ষ, কর্ম্ম সুখসাপেক্ষ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সুখ কি ?

জগমোহন। ঠিক কথা, ওই সুখের খোঁজেই তো এখানে আসা।

বরদা। ওইটেই তো আসল প্রশ্ন।

শিরোমণি। তার আসল উত্তরও ওই ছান্দোগ্যেই পাবেন। যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য। ভূমাই চরম সুখ। এখন ভূমা হচ্ছে—

বরদা। হ্যাঁ বলুন, বলুন।

শিরোমণি। ভূমা হচ্ছে সেই জিনিস, যা লাভ করলে অন্য কোন বস্তু দেখা যায় না, শোনা যায় না, জানা যায় না। যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যচ্ছৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি—স ভূমা। যা অল্প, যা সীমাবদ্ধ তাই মরণশীল, তাই দুঃখজনক। অর্থাৎ সমস্ত বাসনা-কামনা-বর্জ্জিত না হ'লে ভূমা লাভ হয় না। বৃহদারণ্যকে যাকে বলেছে এষণা—সেই এষণামুক্ত হতে হবে।

বরদা চটাং করিয়া একটা মশা মারিলেন

বরদা। ঠিক বলেছেন, মায়াই হল আসল বখেড়া। ওইতেই তো ডুবেছি আমরা।

(নেপথ্যে) শিরোমণি মশায় আছেন না কি ?

শিরোমণি। আমার শিষ্যপ্রবর এসে হাজির হয়েছেন। এসো হে রঙ্গলাল—ভিতরে এসো।

রঙ্গলাল আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। চোখে প্যাঁশনে, পরিধানে সিল্কের পাঞ্জাবী, হাতে জলন্ত সিগারেট। মুখে মৃদু হাসি, চক্ষু বুদ্ধিদীপ্ত। সপ্রতিভ সুদর্শন ব্যক্তি। বয়স আন্দাজ চল্লিশ হইবে

বরদা। আসুন, আসুন, নমস্কার।

জগমোহন। (হাসিয়া) আপনার শিরোমণি মশায়ের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করছিলাম। আসুন, বসুন।

রঙ্গলাল প্রতিনমস্কার করিয়া হাস্যদীপ্তচক্ষে সকলের মুখপানে একবার চাহিয়া দেখিলেন; তাহার পর সিগারেটটায় শেষ টান দিয়া সেটা জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন

রঙ্গলাল। এই রবিন্সন ক্রুশো-মার্কা দ্বীপে যে শিরোমণি মশায় শাস্ত্রালাপ করবার মতো লোক আবিষ্কার করতে পারবেন তা আমি ধারণাই করতে পারি নি! আশ্চর্য্য ব্যাপার! ঠিক পেয়ে গেছেন তো!

জগমোহন। বসুন। আপনার সঙ্গেও আলাপ করা যাক।

রঙ্গলাল। (উপবেশনান্তে) শিরোমণি মশায়, থেমে গেলেন কেন—কি বলছিলেন বলুন আমিও একটু শুনি।

বরদা। ভূমা সম্বন্ধে বলছিলেন উনি।

রঙ্গলাল। আহা, ভূমা কথাটা বড় ভাল। চুমার সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর মিল হয়!

বরদা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন

শিরোমণি। এসেই ফাজলামি স্থরু করলে তো বাবা!

রঙ্গলাল। Sorry—আর একটি কথাও বলব না, আপনি যা বলছিলেন বলুন।

বরদা। আমার দিকে অমন ক'রে চেয়ে আছেন যে রঙ্গলালবাবু?

রঙ্গলাল। আপনার শরীর দেখছি। বাঃ, এই বয়সেও তো চমৎকার শরীর রেখেছেন। ফাইন্!

বরদা। কুস্তি-লড়া শরীর, এখনও মুগুর ভাঁজি।

রঙ্গলাল। ও তাই।

জগমোহন। শিরোমণি মশায়, থেমে গেলেন যে।

বরদা। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলুন।

শিরোমণি নস্য লইলেন

শিরোমণি। বলছিলাম, বৃহদারণ্যকের উপদেশ হচ্ছে—এষণামুক্ত হতে হবে। পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা—সর্ব্বপ্রকার এষণামুক্ত হয়ে পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করলেই পরমানন্দে লীন হবার আশা করা যায়। তৎপূর্ব্বে নয়।

রঙ্গলাল। মাপ করুন শিরোমণি মশায়, আমি কিন্তু পরমানন্দ লাভ করতে চাই অন্য উপায়ে।

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

শিরোমণি। বন্ধন নিয়ে মুক্তির স্বাদ মেলে না বাবা, কবিতাতেই ও সব

শুনতে ভাল। মুক্তি পেতে হলে রীতিমত সাধনা করতে হয়, নিরাসক্ত হয়ে পূজা করতে হয়।

রঙ্গলাল। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বলছেন—

প্রতিদিন নদীস্রোতে পুষ্পপত্র করি অর্ঘ্যদান
পূজারীর পূজা অবসান।
আমিও তেমনি যত্নে মোর ডালি ভরি
গানের অঞ্জলি দান করি
প্রাণের জাহ্নবী জল-ধারে
পূজি আমি তারে।
বিগলিত প্রেমের আনন্দ বারি সে যে
এসেছে বৈকুণ্ঠধাম ত্যেজে।

বরদা। (উচ্ছ্বসিত) বাঃ, আপনিও তো গুণী লোক মশায়! (তাহার পর সহসা) জগমোহন নৌকোর গতিক কিন্তু খারাপ মনে হচ্ছে।

জগমোহন। আরে ব্যস্ত হও কেন, এখনি এসে পড়বে।

রঙ্গলাল। নৌকোর কথা শুনলেই আমার রবীন্দ্রনাথের 'দিন শেষে' কবিতাটা মনে পড়ে—

দিন শেষ হয়ে এল আঁধারিল ধরণী
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
"হাঁগো এ কাদের দেশে বিদেশী নামিনু এসে,"
তাহারে শুধানু হেসে যেমনি—
অমনি কথা না বলি ভরা ঘট ছলছলি
নতমুখে গেল চলি তরুণী
এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরণী।
নামিছে নীরব ছায়া ঘন বন শয়নে
এদেশ লেগেছে ভাল নয়নে—

সহসা থামিয়া গেলেন

না, এটা ঠিক হচ্ছে না। আপনাদের মুক্তি-টুক্তি নিয়ে সদালোচনা হচ্ছিল, আমার এ রকম ভাবে বাধা দেওয়াটা—

বরদা। না না বলুন আপনি, চমৎকার লাগছে।

রঙ্গলাল। (হাসিয়া) আমিও মুক্তিকামী লোক, শিরোমণি মশায়ও তাই। আমাদের দুজনের পথ খালি বিভিন্ন।

শিরোমণি। দেখ রঙ্গলাল, ইতিপূর্ব্বে তোমাকে পুনঃপুনঃ বলেছি, এখন আবার বলছি এবং যতদিন বাঁচব বলব—মুক্তি নিয়ে কবিত্ব করা এক জিনিস এবং সত্যি সত্যি মুক্তি পাওয়া আর এক জিনিস। কহোল-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদের যা বাণী—

রঙ্গলাল। মাপ করুন শিরোমণি মশায়, কহোল-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদের বাণী বহুবার শুনেছি আপনার মুখ থেকে, কিন্তু কবির বাণীও কি তার চেয়ে কোন অংশে কম ?

আবৃত্তি স্থরু করিলেন

যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের
স্থরের ভঙ্গীতে
মুক্তির সঙ্গম-তীর্থ পাবো আমি আমারি প্রাণের
আপন-সঙ্গীতে
সে দিন বুঝিব মনে নাই নাই বস্তুর বন্ধন
শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে তোমারি এ বীণার স্পন্দন
নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন
ছন্দে তালে ভুলিব আপনা
বিশ্বগীত পদ্মদলে স্তব্ধ হবে অশান্ত ভাবনা।

আপনি কি বলতে চান, রবীন্দ্রনাথের এ কবিতায় মুক্তির বার্ত্তা নেই ?

শিরোমণি। বার্ত্তা থাকতে পারে, কিন্তু কেবল বার্ত্তা পেলেই মুক্তি পাওয়া যায় না। প্রাচীন ঋষিগণ মুক্তিলাভের জন্যে যে সব বিধি-বিধান বেঁধে দিয়েছেন

তা বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করতে হবে। প্রাচীন বিধানের প্রতি এই যে তোমাদের অশ্রদ্ধা এটা মোটেই ঠিক নয়। তোমাদের সর্ব্বাগ্রে চিত্তশুদ্ধি করা দরকার। অনুতপ্ত চিত্তে আত্মানুশাসন না করলে কখনও চিত্তশুদ্ধি হয় না এবং চিত্তশুদ্ধি না হ'লে—

রঙ্গলাল। আপনারা তা হ'লে চিত্তশুদ্ধি করতে থাকুন, আমি কেটে পড়ি।

বরদা। (ব্যাকুল ভাবে) না, না, না—সে কি কথা, আপনি বসুন। আপনার আবৃত্তি শোনা যাক আরও দু-চারটে।

জগমোহন। সত্যি চমৎকার আবৃত্তি করেন আপনি।

রঙ্গলাল। শিরোমণি মশায় চটে যাবেন।

বরদা। না না চটবেন কেন ?

শিরোমণি। ও যতই না কেন কবিতা আওড়াক, একথা মানতেই হবে যে, আসক্তি ত্যাগ না করলে ব্রহ্মলাভ হয় না এবং আসক্তি ত্যাগ করতে হলে তৃষ্ণা এবং আসঙ্গ ত্যাগ করা চাই। শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন—

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় ! কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ।১৪।৭।

কর্ম্মে আসক্তি জন্মে তৃষ্ণা এবং আসঙ্গ দ্বারা—এই তৃষ্ণা এবং আসঙ্গ ত্যাগ না করলে ভূমালাভ অসম্ভব। তৃষ্ণা এবং আসঙ্গ ত্যাগ করা সহজ নয় মানি, কিন্তু তার জন্যে অনুতপ্ত হও।

রঙ্গলাল। [স্মিতহাস্যে] আমার কি মনে পড়ছে জানেন ?

শিরোমণি। কি ?

রঙ্গলাল। রুবাইয়াৎ।

আবৃত্তি সুরু করিলেন

Iram indeed is gone with all its Rose
And Jamshyd's sev'n ringed cup where no one knows

But still the Vine her ancient Ruby yields
And still a garden by the water blows.

বরদা। চমৎকার, অনেক দিন পরে ফিট্‌জেরাল্ড বেশ লাগলো—বাঃ।

শিরোমণি। আমি ওসব ইংরিজি মিংরিজি বুঝি না, কিন্তু ছান্দোগ্যের সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জালানিতি—

বরদা। আপনি একটু চুপ করুন শিরোমণি মশাই, দোহাই আপনার। রঙ্গলালবাবু, আপনি আরও খানিকটা বলুন রুবাইয়াৎ থেকে। চমৎকার লাগছে।

শিরোমণি কিছু না বলিয়া নস্য লইলেন। জগমোহন স্মিতমুখে বরদার দিকে চাহিলেন, রঙ্গলালবাবু আবৃত্তি সুরু করিলেন

And David's lips are lock't, but in Divine
High-piping Pehlvi with 'wine, wine, wine
Red wine'—the Nightingale cries to the Rose
That yellow cheek of hers to incarnadine,
Come, fill the cup, and in the Fire of Spring
The winter garment of Repentance fling :
The bird of time has but a little way
To fiy,—and lo, the bird is on the wing.
Here with a Loaf of Bread beneath the bough
A flask of wine, a book of verse ann Thoru
Beside me singing in the wilderness,
And wilderness is Paradise enow.

বরদা। Excellent, চমৎকার। [সহসা] জগমোহন, তুমি কিন্তু ভাই দেখ একবার বেরিয়ে—

জগমোহন। যাচ্ছি যাচ্ছি, ব্যস্ত হও কেন? শোন না রঙ্গলালবাবুর আবৃত্তি খানিকক্ষণ।

বরদা। [রঙ্গলালবাবুর দিকে ফিরিয়া] সত্যি চমৎকার আপনার আবৃত্তি। শিরোমণি মশায়ের সংস্কৃতের অং বং-এর পর কর্ণে যেন একেবারে মধু-বর্ষণ করলেন। শিরোমণি মশায় রাগ করবেন না যেন—আমরা মানে—একটু ই'য়ে ধরণের, মানে—[হাসিলেন]

শিরোমণি। [সজোরে নস্যের টিপ টানিয়া] রাগ করবার আর কি আছে এতে। ও ভাষা বুঝিও না, ওর রসও পাই না।

রঙ্গলাল। ভাষা বোঝবার তো কিছু নেই, সুরটা কানে লাগলেই হল! সুরটাই আসল, অমন যে ব্যাকরণের উপসর্গ, তাও সুর-সংযোগে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

প্রপরাপ সমন্বব নিরদুরভি
ব্যধি সুদতি নিপ্ পতি পর্য্যপয়:

শিরোমণি। [উচ্চভাবে] আমি সব সুরই বুঝি, বুঝলে বাবা। টোলে কাব্য অলঙ্কার পড়তে হয়েছিল আমাকে; কিন্তু তোমরা, আজকালকার ছেলেরা কেবল একটি সুরই বোঝ, আর সব বিষয়ে তোমরা অসুর।

রঙ্গলাল কোন উত্তর না দিয়া স্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন

বরদা। বেশ, খিদে পাচ্ছে কিন্তু ক্রমশ। জগমোহন (চটাৎ করিয়া একটা মশা মারিলেন) তুমি দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছো তো!

জগমোহন। আচ্ছা এই উঠলাম। আমি গিয়েই বা কি করব, নদীর পানে চেয়ে থাকলেই তো নৌকো বোঁ বোঁ ক'রে এসে পড়বে না। যাক্—বার বার বলছ যখন যাচ্ছি—

রাগের ভান করিয়া চলিয়া গেলেন

রঙ্গলাল। আপনাদের সঙ্গে খাবার নেই না কি? আমাদের সঙ্গেও যা

ছিল সব খতম হয়ে গেছে। খানিকটা মাস্টার্ড পড়ে আছে খালি। শিরোমণি মশায়, আপনার কলাগুলো আছে, না নিঃশেষ করেছেন ?

শিরোমণি। সে কোন্ কালে—

পুনরায় নস্য লইলেন

রঙ্গলাল। শিরোমণি মশায় আমাকে ছেড়ে থাকতেও পারবেন না, যেখানে যাব আমার সঙ্গে যাওয়া চাই—অথচ আমার সঙ্গে মতের মোটে মিল নেই—খালি ঝগড়া আর ঝগড়া—

শিরোমণি। ঝগড়া হবে না, এমন দুর্ল্লভ মানবজন্ম পেয়েছ—সেটা কেবল ভোগ-বিলাসেই কাটিয়ে দেবে ? তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কি, কেবল ভেসে চলা ?

রঙ্গলাল। (হাসিয়া) তাই কি ছাই জানি। রবিঠাকুরের ভাষায়—কী চাই কী চাই বচন না পাই মনের মতন রে—

বেঠিক পথের পথিক আমার
অচিন সে জন রে
চকিত চলার ক্বচিৎ হাওয়ায়
মন কেমন করে
নবীন চিকণ অশথ পাতায়
আলোর চমক কানন মাতায়
যে রূপ জাগায় চোখের আগায়
কিসের স্বপন সে
কী চাই কী চাই বচন না পাই
মনের মতন রে।

বরদা। বাঃ

শিরোমণি। কিন্তু এ সমস্তই হ'ল দেহজ মোহের বিকার, কিন্তু দেহটা যে কিছু নয় একথা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। গীতার কথা ভুললে চলবে না—বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়—

বরদা। দোহাই শিরোমণি মশায়, সংস্কৃতের কচকচি একটু থামান! এবার একটু কাব্যালোচনা হোক। চমৎকার লাগছে রঙ্গলালবাবুর আবৃত্তি—

শিরোমণি। বেশ তাই হোক—আমি চললাম।

সক্রোধে চলিয়া গেলেন

রঙ্গলাল। (হাসিয়া) উনি যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই ছিলেন। নীহার একা রয়েছে—

গলা খাঁকারি দিলেন

বরদা। নীহার কে?

রঙ্গলাল। সে আছে একজন।

বরদা। যাক্ সংস্কৃতের কচকচি থামলো—বাঁচা গেল।

রঙ্গলাল। সংস্কৃতকে অশ্রদ্ধা করবেন না মশাই, সংস্কৃতে কালিদাস কাব্য লিখেছেন—

অশোকনির্ভৎসিতপদ্মরাগ-
মাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারং
বসন্ত পুষ্পাভরণং বহন্তী।
আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিবস্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিনী পল্লবিনী লতেব।

বরদা। আহা চমৎকার!

রঙ্গলাল। কালিদাস আপনার পড়া আছে?

বরদা। এককালে বি-এ পাশ করেছিলুম—সেই সূত্রে কুমারসম্ভবের খানিকটা পড়তে হয়েছিল বই কি।

রঙ্গলাল। মনে আছে সেখানটা আপনার, মদনের সঙ্গে বসন্ত যেখানে মহাদেবের কাছে আবির্ভূত হয়েছেন সেখানের বর্ণনাটা—

মধু দ্বিরেফ: কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমান:
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডুয়ত কৃষ্ণসার: ।
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি
গজায় গণ্ডূষজলং করেণু:
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং
সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা।

বরদা। (সোচ্ছ্বাস) আহা, কাণ যেন জুড়িয়ে গেল। সত্যি, সংস্কৃতের মত ভাষা নেই—

রঙ্গলাল। যে কোন ভাষাতেই সুর লাগলে মিষ্টি হয়। ফারসী গজল কত মিষ্টি! একেবারে মাতিয়ে দেয়—

বুল্‌বুল্ জেহো অমোগ্‌ত্‌হ্ শীরি
সুখনীরা সুখনীরা সুখনীরা
গুল অজ্ রুখৎ অমোগ্‌ত্‌হ্ নাজুক্
বদনীরা বদনীরা বদনীরা।*

সুরই আসল, ছন্দই আসল—ভাষা কিছু নয়। এই সুর, এই ছন্দ এই নেশা—পাগল করে দেয় মানুষকে। এরই উন্মাদনায় রবীন্দ্রনাথ একদিন লিখেছিলেন বোধ হয়—

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগ সম

* জ্=z-এর মত উচ্চারণ, খ=guttural খ্‌হ্, শ=sh, স=s

ফাল্গুন রাতে দক্ষিণ বায়ে
কোথা দিশা খুঁজে পাই না
যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না—

বরদা। (দ্বারের পানে চাহিয়া) কিন্তু জগমোহন এখনও ফিরল না, আজ না খেয়ে মরতে হবে দেখছি। তামাকের জন্যও প্রাণটা আইঢাই করছে।

রঙ্গলাল। সিগারেট খাবেন ?

বরদা। না, সিগারেট আমি খেতে পারি না। তামাক না হ'লেও চলবে —কিন্তু খেতে না পেলে আমি মারা যাব। বেশ খিদে পেয়েছে মশাই—

রঙ্গলাল। আপনি মরতে ভয় পান ?

বরদা। তা পাই বই কি, আপনি পান না ?

রঙ্গলাল। না। রবার্ট ব্রাউনিঙ-এর সঙ্গে মিলিয়ে আমার বলতে ইচ্ছে করে—

For sudden the worst turns best to the brave
The black minute's at end
And the elements rage, the fiendish voices that rave
Shall dwindle, shall blend,
Shall change, shall first become a peace out of pain
Then a light, then thy breast
O, thou, soul of my soul, I shall clasp thee again
And with God be the rest !

নেপথ্যে মিষ্ট মেয়েলি গলায় গান ভাসিয়া আসিল—

"গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে
ওগো পথিক, তুমি এসে বসবে বারে বারে"

বরদা। (উৎকর্ণ) চমৎকার মিষ্টি গলা তো—কে গাইছে মশাই ?

রঙ্গলাল। (হাসিয়া) নীহার পালিয়ে এসেছে।

বরদা। নীহার মেয়েমানুষ নাকি?

রঙ্গলাল। নিশ্চয়, রীতিমত মেয়েমানুষ!

উঠিয়া গেলেন এবং জানালা দিয়া ডাকিলেন

নীহার, ভেতরে এসো—

নীহার প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বরদাবাবু চটাং করিয়া একটা মশা মারিলেন

তুমি পালিয়ে এলে যে?

নীহার। শিরোমণি মশায়ের কাছে থাকা যায়!

বরদা ও রঙ্গলাল উভয়েই হাসিলেন

বরদা। বসুন, বসুন (সরিয়া স্থান করিয়া দিলেন) রঙ্গলালবাবু, ইনি বুঝি আপনার—

রঙ্গলাল। না, কেউ হন না (একটু হাসিয়া) অথচ সব হন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া
সে নারী বিচিত্র বেশে, মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া
দীপখানি তুলে ধরে, মুখে চেয়ে, ক্ষণকাল থামি
চিনেছে আমারে
তারই সেই চাওয়া সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে।

বরদা। ইনি খুব ভাল গান গাইতে পারেন?

রঙ্গলাল। চমৎকার, একখানা শুনিয়ে দাও না নীহার

নীহার। কোন্‌টা গাইব?

রঙ্গলাল। যা তোমার খুশি।

নীহার। হার্মোনিয়মটা আনতে বলুন তা হ'লে হীরুকে। খালি গলায় আমি গাইতে পারব না।

রঙ্গলাল। বেশ তো হার্মোনিয়মটা আনুক না। এইখান থেকে ডাকলেই শুনতে পাবে বোধ হয় হীরু—

জানালার কাছে উঠিয়া গেলেন ও উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন

হীরু! হীরু!

(নেপথ্য হইতে হীরু) আজ্ঞে হ্যাঁ—

রঙ্গলাল। হার্মোনিয়মটা আনো এখানে।

(নেপথ্য হইতে হীরু) যে আজ্ঞে।

বরদা। আশ্চর্য্য ব্যাপার, জগমোহনের কোন পাত্তা নেই।

রঙ্গলাল। শিরোমণির সঙ্গে আবার শাস্ত্রালাপ সুরু করেছেন বোধ হয়। শিরোমণি মশায় লোক পেলে তো ছাড়বেন না।

বরদা। কিন্তু নৌকোটার কি হল? হু হু ক'রে হাওয়াও উঠেছে একটা—

রঙ্গলাল। এ রকম নির্জ্জন স্থানে হু হু করে হাওয়া উঠলে কি মনে হয় জানেন?

বরদা। কি?

রঙ্গলাল। রবিঠাকুর।

[আবৃত্তি সুরু করিলেন]

হু হু ক'রে বায়ু ফেলিছে সতত
দীর্ঘশ্বাস
অন্ধ আবেগে করে গর্জ্জন
জলোচ্ছ্বাস।
সংশয়ময় ঘন নীল নীর
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর

অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া
 দুলিছে যেন—

হীরু হার্মোনিয়ম লইয়া প্রবেশ করিল ও সেটি নীহারের সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া গেল।

রঙ্গলালবাবু আবৃত্তি করিয়া চলিলেন—

তারি 'পরে ভাসে তরণী হিরণ
তারি 'পরে পড়ে সন্ধ্যা কিরণ
তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি
 হাসিছ কেন ?
আমি তো বুঝি না কি লাগি তোমার
 বিলাস হেন !

বরদা। এইবার একখানা গান হোক। আপনি থামুন।

রঙ্গলাল। এ কবিতার শেষটা আরো চমৎকার, শুনুন না—

আঁধার রজনী আসিবে এখনি
 মেলিয়া পাখা
সন্ধ্যা আকাশে স্বর্ণ আলোক
 পড়িবে ঢাকা।
শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ
শুধু কানে আসে জল কলরব
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ু ভরে তব
 কেশের রাশি।
বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর
"কোথা আছ, ওগো, করহ পরশ
 নিকটে আসি",
কহিবে না কথা দেখিতে পাব না
 নীরব হাসি।

বরদা। এইবার গান হোক—কবিতা থামান আপনার।

নীহার। কোন্‌টা গাইব ?

রঙ্গলাল। সেই গজলটা গাও না।

নীহার হার্মোনিয়ম টানিয়া লইল এবং একটি উর্দ্দু গজল গাহিল। খুব দরদ দিয়া গাহিল।

বরদা। (সোচ্ছ্বাসে) চমৎকার !

রঙ্গলাল। ভাল লাগল আপনার ?

বরদা। চমৎকার, চমৎকার—খুব চমৎকার !

রঙ্গলাল। চমৎকার লাগল ? আমার তেমন সুবিধে লাগল না। ভাল দেখে গাও আর একখানা

বরদা। হ্যাঁ হ্যাঁ—আর একটা হোক। বাইরে তখন যেটা গাইছিলেন—

নীহার। গানের সুরের আসনখানি-টা ?

বরদা। হ্যাঁ।

রঙ্গলালবাবু পকেট হইতে সিগারেট কেশ বাহির করিয়া খুলিয়া দেখিলেন সিগারেট নাই

আমার সিগারেটের টিনটা কি তোমার য়্যাটাচিতে আছে ?

নীহার। হ্যাঁ।

রঙ্গলাল। চাবিটা দাও তো নিয়ে আসি আমি। (বরদার দিকে ফিরিয়া) আপনি গান শুনুন ততক্ষণ—আমি সিগারেট নিয়ে আসি। (চলিয়া গেলেন)

নীহার গান ধরিল—"গানের সুরের আসনখানি"। গান শেষ হইয়া গেল, তবু রঙ্গলালবাবু ফিরিলেন না

বরদা। (অভিভূত) সত্যি আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। (একটু ইতস্তত করিয়া) আপনি, মানে রঙ্গলালবাবুর সঙ্গে আপনার—

নীহার। না, সম্পর্ক কিছু নেই।

বরদা। আপনি তা হ'লে—

নীহার। (সলজ্জে) আমাকে 'আপনি' বলে লজ্জা দেবেন না—

বরদা। (গলা খাঁকারি) ও হ্যাঁ—আচ্ছা—

নীহার। আর একটা গান শুনবেন ?

বরদা। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই ! (সহসা) জগমোহন গেল ত গেলই !

নীহার গান ধরিল—'ঘুম ঘোরে এলে মনোহর।' বরদা মুগ্ধ দৃষ্টিতে নীহারের পানে চাহিয়া রহিলেন

নীহার। (সলজ্জ কণ্ঠে) অমন ক'রে দেখছেন কি !

বরদা। তোমাকে। মনে পড়ছে প্রথম যৌবনে যে মেয়েটিকে পাগলের মত ভালবেসেছিলাম সেও ঠিক যেন তোমারি মত দেখতে ছিল। আজ যেন অনেকদিন পরে তার সঙ্গে দেখা হ'ল এই নির্জ্জনে। বড় ভাল লাগছে !

মুগ্ধ ভাব স্পষ্টতর হইয়া উঠিল

নীহার। (কুণ্ঠিত) আর একটা গান গাইব ?

বরদা। গাও।

নীহার ধরিল—'বাঁধ না তরীখানি আমারি নদীকূলে'। বরদা উন্মুখ-দৃষ্টিতে নীহারের মুখের পানে চহিয়া রহিলেন। গান চলিতে লাগিল। সহসা গানের মাঝখানেই বরদা বাধা দিলেন—

গান থাক—চল আমরা দু'জনে বেড়াই গিয়ে—

নীহার। কোথায় ?

বরদা। নদীর ধারে। পূবদিকে একটা চমৎকার বারান্দাও আছে, চল সেইখানে বসি গিয়ে। চল আর গান ভাল লাগছে না।

নীহার। (একটু ইতস্তত করিয়া) চলুন।

পাশের দরজাটা দিয়া উভয়ে চলিয়া গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জগমোহন ও রঙ্গলাল আসিয়া প্রবেশ করিলেন। রঙ্গলালের মুখে সিগারেট

জগমোহন। বরদা আবার কোথা গেল ?

রঙ্গলাল। (জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলেন) ওই যে ! নীহারের

সঙ্গে পূবদিকের বারান্দায় বসে গল্প করছেন। বেশ জমে গেছেন মনে হচ্ছে।

জগমোহন। যতক্ষণ অন্যমনস্ক থাকে ততই ভাল। আমি এখন কি করি বলুন তো ?

রঙ্গলাল। নৌকো না আসবার কি কারণ হতে পারে ?

জগমোহন। যে কারণটা আমার মনে হচ্ছে তা যদি হয়ে থাকে তা হ'লে তো ভয়ানক ব্যাপার।

রঙ্গলাল। কি ?

জগমোহন। মাঝি ব্যাটাদের অগ্রিম ভাড়া দিয়ে এসেছিলাম, তারা তাই নিয়ে যদি তাড়ি খেয়ে থাকে, তা হ'লেই তো সর্ব্বনাশ। তা হ'লে আজ আর নৌকো আসবেই না। আর না যদি আসে তা হ'লে বরদা আমাকে আর আস্ত রাখবে না।

রঙ্গলাল। বেশ তো আমার নৌকোটা নিয়ে এগিয়ে দেখা যাক্। স্রোতের মুখে যেতে আর কতক্ষণ লাগবে।

জগমোহন। আপনারা তা হ'লে এখানেই বসবেন বলছেন ?

রঙ্গলাল। চলুন না আমিও যাই। বেড়াতেই তো বেরিয়েছি। বরদাবাবু ততক্ষণ একটু অন্যমনস্ক থাকুন—

হাসিলেন। তাহার পর জগমোহনের দৃষ্টিতে একটা
প্রশ্ন লক্ষ্য করিয়া বলিলেন

আরে না না মশাই, আমার ওসব কম্প্লেক্স্ নেই। কাঙালের মতো কোন জিনিস আঁকড়ে থাকা আমার স্বভাবই নয়। তা ছাড়া, নীহার সন্দেশ নয় যে বরদাবাবু টপ করে গালে ফেলে দেবেন। যদি দেনও (হাসিয়া) I dont mind! চলুন। অমন সন্দেশ ঢের দেখেছি।

জগমোহন। কিন্তু শিরোমণি মশায় ?

রঙ্গলাল। হ্যাঁ শিরোমণি মশায় একটা প্রব্লেম্ বটে। এই যে শিরোমণি মশায় আসছেনও দেখছি—

শিরোমণি প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে পট্টবস্ত্র

শিরোমণি মশায়, কাপড় বদলে এলেন যে—

শিরোমণি। আমাদের ফিরতে দেরি আছে তো?

রঙ্গলাল। একটু দেরি আছে—

শিরোমণি। তাহলে আমি সন্ধ্যাহ্নিকটা সেরেই নিই এখানে।

রঙ্গলাল। বেশ তো, সন্ধ্যাহ্নিকের সরঞ্জাম তো আপনার সঙ্গেই আছে, নায় কুঁজোয় ক'রে গঙ্গাজল পর্য্যন্ত এনেছেন আপনি। আনতে বলব হীরুকে—?

শিরোমণি। আমি বলেছি—ওই যে এসেও পড়েছে।

হীরু প্রবেশ করিল। তাহার হাতে গঙ্গাজলের কুঁজো কোশাকুশি, কুশাসন

রঙ্গলাল। চলুন জগমোহনবাবু, আমরা যাই তা হ'লে।

জগমোহন। চলুন।

উভয়ে চলিয়া গেলেন। হীরুও আসন প্রভৃতি পাতিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল। শিরোমণি মহাশয় আবৃত্তি করিতে করিতে সাড়ম্বরে আহ্নিক সুরু করিলেন। খানিকক্ষণ পরে বরদা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পিছু পিছু নীহার। বরদার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত—

নীহার। আপনি অমন ক'রে হঠাৎ উঠে এলেন যে?

বরদা। জগমোহনটা গেল কোথা! ভয়ানক খিদে পেয়েছে আমার—

জানালার কাছে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে

জগমোহন—জগমোহন—জগমোহন—জগা—

শিরোমণি মহাশয় প্রাণায়াম করিতেছিলেন। তাঁহার মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হইয়া উঠিল। হীরু প্রবেশ করিল

হীরু। আজ্ঞে, ওনারা লৌকো ক'রে চ'লে গেলেন।

বরদা। (সবিস্ময়ে) নৌকো ক'রে চ'লে গেলেন! কোথা গেলেন!

হীরু। আপনার নৌকোটার খোঁজেই বেরিয়েছেন। আপনাকে আর দিদিমণিকে এইখানে অপিক্ষে করতে বলে গেলেন।

বরদা। অপিক্ষে করতে বলে গেলেন!

হীরু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

চলিয়া গেল

বরদা। উঃ, এমন ফ্যাসাদে মানুষে পড়ে!

নীহার। চলুন, আমরা তা হ'লে একটু বসে গল্প করি ওই বারান্দায় গিয়ে।

বরদা। চল—

উভয়ে চলিয়া গেলেন। শিরোমণি মহাশয় আরও খানিকক্ষণ পরে সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে শিবস্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। "প্রভুমীশমনীশমশেষগুণম্—" ইত্যাদি। খানিকক্ষণ পরে হীরু আসিয়া প্রবেশ করিল।

হীরু। ওই বাবুটি কোথা গেলেন?

শিরোমণি স্তোত্রপাঠ বন্ধ করিলেন।

শিরোমণি। (রাগতভাবে) কেন?

হীরু। ওনাদের লৌকোটা ডুবে গেইচে, তলার পাটাতন একখানা নাকি আলগা ছিল, সেটা হঠাৎ খুলে গিয়ে ডুবে গেইচে লৌকোটা। একটা মাঝি আইচে সাঁতরে—

শিরোমণি। একটু নির্ঝঞ্ঝাটে পূজো করবারও জো নেই। বাবু ওদিকের বারান্দায় আছে, বলগে যা—

হীরু চলিয়া গেল। শিরোমণি পুনরায় স্তোত্রপাঠে মন দিলেন।
খানিকক্ষণ স্তোত্রপাঠ চলিল। বরদা প্রবেশ করিলেন।
ওষ্ঠ দৃঢ়-নিবদ্ধ, নাসারন্ধ্র স্ফীত। পিছু পিছু নীহার

নীহার। অমন অস্থির হচ্ছেন কেন?

বরদা। আমার মাথা ঘুরছে—

নীহার। মাথা ঘুরছে? একটু বসুন না, বলেন তো (ইতস্তত করিয়া) একটু বাতাস ক'রে দি—

শিরোমণি সক্রোধে উঠিয়া পড়িলেন

শিরোমণি। ওরে হীরু, এসব জিনিসপত্তর নিয়ে আর একটা ঘরে চল্। কি পাপের ভোগেই পড়েছি আমি—

পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। হীরুও আসিয়া জিনিস-পত্র লইয়া তাঁহার অনুগমন করিল

নীহার। বাতাস ক'রে দেব একটু?

বরদা। (রুক্ষকণ্ঠে) না—

নীহার। তাতে ক্ষতি কি! দিই না একটু—

বরদা। (অধিকতর রুক্ষকণ্ঠে) না! জগা রাস্কেলটা—

উঠিয়া পড়িলেন এবং অধিকতর উত্তেজিতভাবে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। তারপর সহসা দাঁত কড়মড় করিয়া

ওই মাঝি ব্যাটার হাড় ঠেঙিয়ে গুঁড়ো ক'রে দেব আমি। ব্যাটা, পাজি, হারামজাদা! (উচ্চৈঃস্বরে) হীরু, হীরু—

হীরুর প্রবেশ

হীরু। আজ্ঞে, কি বলছেন?

বরদা। (সক্রোধে) ডাক মাঝি ব্যাটাকে, জুতিয়ে ব্যাটার পিঠের চামড়া তুলে ফেলি। পাটাতন আলগা ছিল! ইয়াকি—

নীহার। না, না, গরীবমানুষকে আর মারধোর ক'রে কাজ নেই। হীরু, তুই যা।

হীরু চলিয়া গেল

বরদা। (অসংলগ্নভাবে) স্কাইণ্ড্রেল, রোগ্, রাসকেল, সোয়াইন্—

নীহার। (বরদার বাহুমূলে হাত দিয়া, সান্ত্বনয়ে) একটু স্থির হোন্—

বরদা ঝটকা মারিয়া নীহারের হাত সরাইয়া দিলেন

বরদা। (অপ্রত্যাশিতভাবে ধমক দিয়া) চুপ কর, ফাজিল কোথাকার।

নীহার। (অভিমান-ক্ষুণ্ণকণ্ঠে) এতে আর ফাজলামির কি দেখলেন !

বরদা কোন উত্তর দিলেন না। ব্যর্থ আক্রোশে পিঞ্জরাবদ্ধ
ব্যাঘ্রের ন্যায় পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

নীহার মুখ টিপিয়া একটু হাসিল

নীহার। তা হ'লে ততক্ষণ একটা গান গাই, শুনুন—

বরদা উত্তর দিলেন না। একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন নীহার হার্মোনিয়মটি টানিয়া লইয়া বসিল এবং গান ধরিল। বরদা—পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন

আমার মনটি করিয়া চুরি
আমার প্রাণটি করিয়া চুরি
এই আসি বলে গিয়েছিলে চলে
এতদিনে এলে ফিরি, হে সখা,
এতদিনে এলে ফিরি।

বরদা। (অপ্রত্যাশিতভাবে থামিয়া ও চীৎকার করিয়া) গান থামাও !

নীহার কিন্তু গান থামাইল না, আর একটু মুচকি হাসিয়া গাহিয়া চলিল—

কত মরু গেছে কত সাগরে
কত সাগর শুকাল বারি
কত নদী গেছে পথ ভুলি, হে সখা,
সখা, গলে গেছে কত গি-ই-রি

বরদা। (দাঁতমুখ খিঁচাইয়া ক্ষিপ্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন) একশো বার বলছি, আমার খিদে পেয়েছে—খিদে পেয়েছে, ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে—গান-টান কিচ্ছু ভাল লাগছে না—চুপ কর তুমি—

নীহার তবু থামে না

তবে রে তোর গানের নিকুচি করেছে !

ক্রুদ্ধ বরদা কোণ হইতে একটা মুগুর তুলিয়া সবেগে সেটা হার্মোনিয়মের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। আর্ত্ত চীৎকার করিয়া নীহার সরিয়া দাঁড়াইল। হার্মোনিয়মের পাশ দিয়া গিয়া মুগুরটা গঙ্গাজলের কুঁজোটাকে স-শব্দে চুরমার করিয়া দিল।

যবনিকা

কবয়ঃ

পাত্র-পাত্রী

লেখক…লেখক এবং কবি

বৃন্দাবন কুন্ডু…মোদক
নরসুন্দর…নাপিত
ভবেশ…মালী
ধ্রুবেশ গুড়…অতি-আধুনিক-মনা
— সকলেই নিরক্ষর

অম্বিকেশ নন্দী…জম্বুদ্বীপের জমিদার

চন্দ্রমুখী…অম্বিকেশের কন্যা

ছয় জন দারোয়ান।

[নিজের ঘরটিতে লেখক বসিয়া আছেন। ঘরটির একটি বিশেষত্ব আছে, দেওয়াল দেখা যাইতেছে না, চারিদিক রঙীন পর্দা দিয়া ঢাকা। ঘরের পিছন দিকে পর্দাগুলি বিভক্ত হইয়া দুইটি দ্বারে পরিণত হইয়াছে। অভিনয়কালে দেখা যাইবে দ্বারের বাহিরে নানারঙের আলো ফুটিয়া উঠিতেছে ও ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে। লেখক ঘরের মধ্যস্থলে বসিয়া আছেন। তাঁহার বয়স অল্প, দেখিতে সুশ্রী, পরিধানে সাদাসিদা পরিচ্ছদ, কারণ তিনি গরীব। ঘরে কয়েকটি মোড়া ছাড়া আসবাব নাই। একটি টেবিলে কাগজ কলম প্রভৃতি লিখিবার সরঞ্জাম দেখা যাইতেছে।]

লেখক [দর্শকবৃন্দকে]

নমস্কার বন্ধুগণ, আশা করি ভাল আছেন সকলে
আমাদের এ জম্বুদ্বীপে খারাপ থাকা শক্ত
জম্বুদ্বীপে কিছু না থাক আনন্দটি আছে সবার দখলে
একটুখানি সুযোগ পেলে হর্ষভরে হই মোরা উন্মত্ত।
হবেই এটা বলতে
স্ফূর্তি সদাই জলছে মনে ঠোঁটের ফাঁকে, চোখের কোণে

তৈল-বিহীন হয় না কভু সলতে।
সবাই হেথায় ফুর্ত্তি করে হাসে নাচে ও খায় দায়
আজকে কিন্তু আমি মশাই পড়েছি এক বেকায়দায় ;
টাকার ফেরে পড়ে গেছি—দশটি নগদ টঙ্কা
জাগছে চিতে শঙ্কা !
দশটি টাকার জন্যে হবে কাব্য বিপর্য্যস্ত
এ যে বিপদ মস্ত !
চক্ষু দিয়ে যদিও তারে করি নি কো দর্শন
কর্ণপথে প্রবেশ ক'রে করছে হৃদয়-কর্ষণ
নামের মোহে মন হয়েছে বন্দী
সুমিষ্ট নাম, অপূর্ব্ব নাম—চন্দ্রমুখী নন্দী।
কবিতাটা লিখেইছি তো—কিন্তু তার অর্থকেই
মহত্তর করতে হবে দশটি টাকা সহযোগে
বাপের তার সর্ত্ত এই !
আমার সম্বল একটি টাকা—

দেখাইলেন

ভরসা একটি আশার 'পর
জম্বুদ্বীপে বক্তা সবাই অধিকাংশই নিরক্ষর।
কালি কলম কাগজ ঘাঁটা—হেথায় কারো সে শখ নেই
স্বভাবকবি অনেক আছেন আমি ভিন্ন লেখক নেই।
চন্দ্রমুখীর পাণিপ্রার্থী হন যদি কেউ তাঁরে
আসতে হবে এই লেখকের দ্বারে।
কন্যাসহ নন্দী মশাই সন্ধ্যা বেলা এসে
এই খানেতেই কাব্যবিচার শেষে
শ্রেষ্ঠ কবি-করে

কন্যাটিরে দেবেন সমাদরে,
অবশ্য সে যদি পারে দিতে
দশটি টাকাও সুপ্রসন্ন চিতে !
সকাল থেকে বসে বসে লিখেছি তো কাব্য
কিন্তু হায় রে—দশটি টাকা—যাক গে কত ভাবব
যা হবার তা হবেই হবে—থাকে যদি ভাগ্যে
ভাবব না আর যাক গে—

বাহিরে জল-তরঙ্গের বাজনার মতো ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই বৃন্দাবন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। লেখক সাড়ম্বরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন—

এস এস বৃন্দাবন আগে যদি জানতাম
তোমার মতো মহৎ লোকের মিলবে আজি দরশন
কারো কাছে চেয়ে-চিন্তে কার্পেট একটা আনতাম
তার ওপরে বিছিয়ে দিতাম কুন্দ কলি অগণন !
এমন সময় আস না তো—হচ্ছে কেমন সন্দ'
সকাল সকাল আজকে কেন দোকান করলে বন্ধ।

বৃন্দাবন। লেখনী-সম্রাট ওহে, জ্ঞান-তুঙ্গ শির,
জিলাপি বেচিতেছিনু বসিয়া দোকানে
ট্যাটরার বাদ্যভাণ্ড গুরু ও গম্ভীর
আকুল করিয়া দিল অন্তরে ও কানে !
অম্বিকেশ নন্দী নাকি করিছে প্রচার
কন্যার বিবাহ তার দিবে এইবার ?

লেখক। তাহাই তো বলিতেছে সবে

বৃন্দাবন। চন্দ্রমুখী-বিষয়েতে কবিতা রচিতে নাকি হবে ?
সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হবে যার
চন্দ্রমুখী তার ?

লেখক। তারই বটে—কিন্তু ভাই শুধু পদ্য নয়,
আরও সর্ত্ত আছে গদ্যময়।

বৃন্দাবন। কিবা কহ কহ,
আমি অহরহ
কবিতা লিখিব বসি'—
চন্দ্রমুখী-মুখ-শশী
চটচটে ভাব-লেই দিয়া
রাখিব সাঁটিয়া
শূন্য মম হৃদয়-আকাশে,
দোকান রহিবে বন্ধ, কিবা যায় আসে।
কহ, কোন সর্ত্ত আছে আর ?

লেখক। সম্পূর্ণ কবিতা চাই পূর্ব্বেই সন্ধ্যার।

বৃন্দাবন। প্রচুর সময়, এক ঘণ্টা আছে হাতে,
মহাকাব্য হয়ে যাবে তাতে !
ভাব-রস উথলিছে বুকে
চারি ছত্র কবিতা তো এখনি রচিব মুখে মুখে।
নাই মনে ? সে বৎসর রায়েদের বাড়ি
সরবরাহ করেছিনু মাল এক গাড়ি
মাত্র একটি ঘণ্টার নোটিসে ?
একই ব্যক্তি আমিই বটি সে !
আশা করি আর কোন নাহিক ঝঞ্ঝাট ?

লেখক। আছে ভায়া, আছে আরও গাঁট !
কবিতাতে মিল থাকা চাই চন্দ্রমুখীর সঙ্গে
মণি যেমন গাঁথা থাকে কাঞ্চনেরই অঙ্গে !

বৃন্দাবন। অথবা সন্দেশ যথা সুন্দর ছাঁচেতে!
অন্তরে ফুটিছে রস কল্পনা-আঁচেতে···

লেখক। কাগজেতে ঢালতে হবে আঁচের থেকে নাবিয়ে
মুক্তোর মত অক্ষরেতে লিখতে হবে বাগিয়ে!

বৃন্দাবন। দমাইয়া দিলে যে তাহলে
লেখনী চলে না হাতে মোর—
তাড়ুটাই চলে!

লেখক। আমি তব ভৃত্য আছি ঠিক—

বৃন্দাবন। পারিশ্রমিক?

লেখক। একটি টাকা। মুক্তোর মতো অক্ষরে
এমন ধারা লিখে দেব চন্দ্র-মুখী-বক্ষরে
কাঁপিয়ে দেবে দুরু দুরু—

বৃন্দাবন তৎক্ষণাৎ লেখককে একটি টাকা দিলেন

বৃন্দাবন। বেশ, তাহলে করি শুরু?
থাম, দাঁড়াও কোন দিক দিয়ে ভাবি—
যদি বলি চন্দ্রমুখী তুমি মম হৃদ-প্যাটরার চাবি
কিম্বা যদি বলি চন্দ্র তুমি আমার জগৎ

লেখক। লেখার সঙ্গে দশটি টাকাও দিতে হবে নগদ

বৃন্দাবন। দিব দিব তা-ও দিব নহি পিছপাও
কবিতাটা ভাবি আগে কেন বাধা দাও।
তুমি রস আমি গোল্লা তুমি পুর আমি যে কচুরি
তুমি চিনি আমি বস্তা, মনে আসে উপমা প্রচুরই—
তুমি···না না না···ওদিকেতে যাই—
সম্মুখে থাকিলে কেহ জুৎ নাহি পাই।

বৃন্দাবন ভাবগ্রস্ত হইয়া কবিতা ভাবিতে ভাবিতে একটু দূরে সরিয়া গেলেন এবং একটি মোড়া টানিয়া বসিলেন। বাহিরে আবার জল-তরঙ্গ বাজিল।

লেখক। ঘণ্টা বাজায় কে

নেপথ্যে কণ্ঠস্বর

ফুল-বাগানের মালী আমি ভবেশ

লেখক। আসুন আসুন করুন প্রবেশ

দরজা দিয়া ভবেশ প্রবেশ করিলেন। বৃন্দাবন ইহা দেখিতে পাইলেন না। ভবেশ দেখিতে সুশ্রী নয়। দশ-আনা ছ-আনা চুল ছাঁটা, ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি পরা, তলায় গোলাপী গেঞ্জি। দুই কানে ফুল গোঁজা, হাতে ফুলের মালা জড়ান। মাথায় টেরি, এত তেল মাখিয়াছেন যে গড়াইয়া পড়িতেছে।

লেখক। ফুলের বনে বসতি যাঁর সৌরভে নিশ্বাস
তিনি আজি দীনের দ্বারে! হচ্ছে না বিশ্বাস!

ভবেশ। সাধে কি এসেছি, জ্বালায় জ্বলছি
মাইরি বলছি!
কোণে ও কে? অসুস্থ কি? রয়েছে চোখ বুজে!

লেখক। চেনেন না কি শ্রীবৃন্দাবন কুণ্ডে?
সুবিখ্যাত রস-স্রষ্টা, চৌমাথাতে মিষ্টান্ন ভাণ্ডার
তার পাশেই মুদির দোকান দেখেন নি কি তাঁর?

ভবেশ। বৃন্দাবন? না, চিনি না। দুলছে কেন অমন ধারা!

লেখক। ছন্দ-দোলায় দিশাহারা,
এসেছেন মোর কাছে ছেড়ে নিজ গৃহে

ভবেশ। বল কি হে!
কবি-আত্মা ময়রা-বক্ষে
দেখতে হ'ল তাও চক্ষে!

বৃন্দাবন। গোলমাল করিও না, কেটে যায় সুর,
আরে কে ও ভবেশ চতুর !
ভুলি নি তোমার নাম বাকি রাখিয়াছ দাম
বহুপূর্ব্বে নিয়েছিলে কিছু মতিচুর।

পুনরায় ভাবগ্রস্ত হইলেন

"তুমি মতি আমি চুর—এ চিবুকে তুমি সুর—"

ভবেশ। মৎলব আছে বাবা
বেরাল বসে শুঁকছে গোলাপ উঁচু ক'রে থাবা !
শোন লেখক পষ্ট বলি খুলে
তোমার কাছে আসি নি পথ ভুলে
নন্দীকন্যা চন্দ্রমুখীর ঝাঁঝে
প্রাণের খাঁজে খাঁজে—
মানে—

লেখক। অধম সবই জানে।
যা বলেন—রাজি আছি করিবারে তাও

ভবেশ। ভাও বাৎলাও
আমার কবিতা লিখে দাও যদি
ক-টাকা চাও ?

লেখক। দু-টাকা

ভবেশ। দুই নয় ভাই, একটি,—লক্ষ্মী,
ফাঁসাইতে যদি পারি ও পক্ষী
এক মুঠো টাকা দেব ইনাম্—

লেখক। রাজি হলাম।

ভবেশ টাকা দিলেন

বৃন্দাবন। [বুক চাপড়াইয়া] হায় কি মুস্কিল
চন্দ্রমুখীর সাথে জোটে না যে মনোমত মিল !

ভবেশ। কসিটাকে কর কিছু ঢিল
হয়ত মিলিবে অকস্মাৎ।

লেখক। [অর্দ্ধ-স্বগত] তিন হ'ল—বাকি এখন সাত।

ভবেশ। এই মূৰ্ত্তি সামনে রেখে কাব্য করা শক্ত হবে ভাই
একটুখানি একলা হ'তে চাই।

লেখক। বেশ তো, কোথায় বসতে চান

ভবেশ। খুশি হ'ত প্রাণ
পেতাম যদি নিরিবিলি, একটু আলো ঝিলিমিলি
কাছেপিঠে থাকত আতরদান,
গদি-আঁটা নরম সোফা থাকলে হ'ত আরও তোফা
বুঝছই তো চরম কাব্য ভাবব তাতে বসে
শেষতক্ সব ভেস্তে না যায় বসতে পারার দোষে !
তোমার দেখছি কাঠ-খোট্টা ব্যাপার—

লেখক। এই মোড়াটায় বসুন না হয় পেতে দিচ্ছি র‍্যাপার—

ভবেশ। বেশ তাই হোক, কিন্তু লেখক আর কেউ যদি আসে
গোলমাল যেন না করে আমার পাশে।
একটি বেফাঁস বাক্য কিম্বা মূৰ্ত্তি বেয়াড়া রকম
একটি হপ্তা করে ফেলে মোরে জখম।
কাব্যই নয় হয়ে যাবে মোর স্বাস্থ্য-নাশ

লেখক। সৰ্ব্বনাশ !

লেখক মোড়ায় র‍্যাপার পাতিয়া দিতে ভবেশ তদুপরি বসিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সজোরে আবার বাহিরে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

ভবেশ। এবার আমি করছি শুরু হুঁশিয়ার—

লেখক। [অৰ্দ্ধ-স্বগত]

আর এক জন, চমৎকার !

হুড়মুড় করিয়া নরসুন্দরের প্রবেশ, হাতে প্রকাণ্ড একটা কাঁচি। লোকটি বেঁটে মোটা। বাঁ হাতে একটি চিরুনিও রহিয়াছে। নরসুন্দর খুবই উত্তেজিত।

নরসুন্দর। লেখক—লেখক

শুনেছ ?

নন্দী—চন্দ্রমুখী !

ঢ্যাটরা শোনা মাত্রই

আমি বেরিয়ে এলাম ছুটে !

খাঁচা ছাড়া পাখীর মতো

ধনুক-ছোঁড়া তীরের মত—

পারলাম না থাকতে

শহর—সমস্ত শহর উত্তেজিত—

চন্দ্রমুখী—চন্দ্রমুখী—

রাজরাণী হবার যোগ্যতা তার

প্রতি আঙুলে একটা ক'রে আংটি

প্রতি আংটিতে দামী পাথর

ইয়া বড় বড়

কানে হীরের দুল

দুল নয় যেন মোচা—

লেখক। কাঁচি সামলাও—চোখে দিও না খোঁচা

নরসুন্দর। সামলাতে পাচ্ছি না

নিজেকে সামলাতে পাচ্ছি না আমি,

ইচ্ছে করছে নাচি !

লেখক,

লেখ, লেখ—
আমার কবিতাটা লিখে দাও আমাকে!
গদ্য কবিতায় অভ্যস্ত আমি
কিন্তু মিল মেলাবই!
চন্দ্রমুখীকে পাই যদি
ওঃ যদি পাই
আর
চুল কাটতে হবে না
দাড়ি ছাঁটতে হবে না
বনে' যাব—
তরে' যাব—
কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ
আমার বুকের কথা
টুকে দাও তুমি!

নেপথ্যে ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর

বেরিয়ে আয় ব্যাটা
ধূসর পেঙ্গুইন
রেলটুনটুনি
চুপ
নিঝ্‌ঝুম
আধখানা—

নরসুন্দর। [বিব্রত]
ঐ যাঃ—ছি ছি!
অতি আধুনিক কবি ধ্রুবেশ গুড়ের
ছাঁটছিলাম দাড়ি!

অর্দ্ধেকটা ছেঁটেছিলাম
এমন সময় শুনলাম চ্যাটরা
ছুটে এলাম আত্মহারা হয়ে
ডাক দিলে আমায় অনাগত

ক্রুদ্ধ ধ্রুবেশ গুড়ের প্রবেশ। খুব রোগাগোছর লোক, দাড়ির এক দিক ঠিক আছে, অন্য দিকে খাবছা খাবছা করিয়া ছাঁটা। গলায় একটা রঙীন তোয়ালে বাঁধা।

লেখক। গুড় মহাশয়, স্বাগত

গুড়। অরুন্ধতীর সরু জ্যোতি
ঠোঁটে—হুঁ!
মুচকি?
চার পাশ ঘিরে চতুর চিকনিক
কেন?

লেখক। হাসছি কেন? অনেক দিনের অদর্শনের পরে
দেখা পেয়ে বুক উঠেছে ভরে!

গুড় মহাশয় নরসুন্দরকে দেখিয়া বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন।

গুড়। ওই যে—শ্রাদ্ধ—লোপাট—
চালাকি—!
হাস্যাস্পদ
সূর্য্য-প্রাখর্য্য, তপ্ত পথ, ছুটছি…
আধ-ছাঁটা দাড়ি—
বাষ্পীয় সম্ভ্রম!

লেখক। ধ্রুবেশবাবু, একটু ধরুন দম।
নর-সুন্দর নাপিত হ'লেও মনে মনে মস্ত কবি উনি
অন্তরেতে অহরহ জলে কাব্য-ধুনী।
প্রিয়া-মিলন লাগি—

গুড়। মিলন !
নাকের সঙ্গে ঘুসির
পিঠের সঙ্গে জুতোর
থুড়ি থুড়ি
ঊনবিংশ শতাব্দীর উপমা ওগুলো—
থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে টেলিভিশন মেড়ে
বিলিতী ছ-পেনি মাসিক পত্রের
যে কোন ছোঁড়া লেখকের চোখে
পরিয়ে দিন অঞ্জন,
তারই আবছায়া সৌন্দর্য্যের সঙ্গে
আলশেশিয়ান কুকুরের ল্যাজনাড়ার সুর

ভবেশ। ওহে লেখক, পাগলটাকে দাও না করে দূর !

বৃন্দাবন। ঐ যা, ফের কাট্‌ল সুর !

নরসুন্দর। সবিনয়ে বলছি
আর একদিন
সত্যি বলছি আর একদিন
দেব
হ্যাঁ দেব
বাকি দাড়িটা নিশ্চয়ই ছেঁটে দেব আপনার।
আজ কিন্তু রেহাই দিন
দোহাই !

মোড়া টানিয়া বসিলেন।

লেখক। ধ্রুবেশবাবু, আপনিও তো মস্ত কবি শুনি
ছড়িয়ে বেড়ান পান্না-চুনী
বেণাবনে, আড়ালে আব-ডালে !

উচ্চাঙ্গের চতুষ্পদী ছাড়ুন না এই তালে
দাবড়ে বেড়াক চন্দ্রমুখীর বুকে—

গুড়। ময়নামতীর চরে জাগে সুখে
শ্যাওলার স্বপ্ন
শাকুনিক আকুতি !
ধূসর-পিঙ্গল মিনমিনে পায়রা সব
খরচ
ভয়ানক খরচ
গুহা…
অক্ষি-কোটর

লেখক। চন্দ্রমুখী ধনীর মেয়ে নিজের আছে মোটর
টো-টো ক'রে বেড়ান যদি রেস্ত পাবেন টো-টোর !

গুড়। তাই কি ?
কটা-চুলে জড়ানো ভায়োলেট পাপড়ি ?
ঘা-খাওয়া এরোপ্লেনের পুচ্ছোৎক্ষিপ্ত ধোঁয়া ?
সত্যি !
নীলাভ সবুজাভা !
হাঁ হাঁ
মনে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি যেন
নিবু নিবু জোনাকী-উৎসবে
নিঃশব্দ পদধ্বনি
ক্লিওপেট্রার !
আসছে··· ভাব আসছে···
চিনে মাটির টবে

লেখক। ভাবলে শুধু চলবে না কো লিখতে হবে!
নন্দী নিজে দেখবে এসে কন্যা সহ—

গুড়। কি দুঃসহ!
লিখতে?
স্বপ্নের ফোটোগ্রাফ!

লেখক। করেন যদি মাফ
স্বপ্নটিকে বাঁধতে পারি দিয়ে আখর বাঁধ
একটি টাকা পেলে পরেই পাতব লেখার ফাঁদ!

গুড়। এক টাকা!
অত্যন্ত দেশী!
শিলিং
ফ্রাঁ—

লেখক। টাকা নইলে পারব না!

গুড়। (দন্তে দন্ত ঘষিয়া)
স্বপ্নকে মূর্ত্তি দেবে।
শাদা কাগজে তুলবে
কালি-আবর্ত্ত!

লেখক। কি করব, নন্দীর ওই সর্ত্ত—

গুড়। তবে নাও—টাকাটাই বড় নয়—উঃ মর্ত্ত্য!

টাকা দিলেন

পাষণ্ড—
অ্যামেথিষ্ট্
কপিশ!

লেখক। [হাসিয়া]

একটি কথা রাখলে মনে হালকা হবে বিষ
চন্দ্রমুখীর ঠোঁটটি রাঙা চোখটি কালো মিশ !

গুড় মহাশয় মোড়া টানিয়া বসিলেন ও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ভবেশ। কচকচানি থামল বাবাঃ—বাঁচা গেল
রে মন্নয়া, মিলটি এবার মিলিয়ে ফেল !
চন্দ্রমুখী, খুকি, শুঁকি, ঝুকি, ধুকপুকি
উঁহু হচ্ছে না ঠিক—ঢুকি, রুখি,—উঁহুঁ—

নরসুন্দর। মুহুর্মুহু
আসছে আর পালাচ্ছে !
গদ্য কবিতার ধাত,
কিলবিলিয়ে মিল আসে না,
আসে আর পালায়
এসেছে—পেয়েছি—এই—
চন্দ্রমুখী
ছন্দ ঠুকি—

গুড়। কৃকলাস উৎসুকই…

বৃন্দাবন। হে বন্ধু, নীরব থাকা যদি অসম্ভব
দূরে গিয়ে কর কলরব

ভবেশ। ক্যাঁক্ করে ধরেছি এবার চাঁদ
ঘুঘু দেখেছ দেখ নি তো ফাঁদ !
"অয়ি চন্দ্রমুখী
ফুলবনে আমি বাঁশী ফুঁকি—"

বৃন্দাবন। চন্দ্রমুখী হোয়ো না নির্ম্মম

হৃদয়-বাঁশী মম—

ভবেশ। কি বললে, বাঁশী! খবরদার আর বলবে না

পুকুর চুরি ঢুকুর বেলায় চলবে না!

গুড়! কৃকলাস উংসুকই

বাঁশী বাজে—

ভবেশ। ফের বাঁশী! খবরদার

মানা করছি বারম্বার

বাঁশী আমার, বাঁশী আমার, বাঁশী আমার!

বাঁশী ছাড়া নিতে পার অন্য কিছু যা খুশি—

লেখক। কল্পনা-আঁকুসি

কখন কি যে পেড়ে আনে ভাব-শাখা হ'তে

ভবেশ। কিন্তু ভাই সহিব না আমি কোন মতে

যদি তাহা ক্রমাগত খালি বাঁশী পাড়ে!

ধরি ঘাড়ে—

লেখক। আপনারা সব কবি প্রেমিক

পাড়ি জমান পাথারে

আপনাদের কি হওয়া সাজে

বাবলা-বনের ছাতারে!

ঝগড়া থামান—

মারতে মশা বুদ্ধিমানের পাততে কি হয় কামান!

নরসুন্দর। [হঠাং উত্তেজিত]

লেখক, লেখক

হয়েছে

মিল করেছি

মনের ধূপদানীতে
ধোঁয়াচ্ছে ভাবের ধূপ—

ভবেশ। আরে চুপ—
বাঁশীর ব্যাপার মিটুক আগে।

নরসুন্দর। মিল যে ভাগে!
চট ক'রে, লেখক—
লিখে নাও আমারটা—!
আমি গন্ধ-সুখী
তবু চন্দ্র-মুখী
আমি ছন্দ ঠুকি
বাঁশী মন্দ্র—

ভবেশ। তুমিও বাঁশী, রামচন্দ্র!
কিন্তু নয় হাসি—
ছাড়তে হবে বাঁশী।

নরসুন্দর। চিরকাল ধরে বাঁশী বাজে কবিতায়
বাঁশী চিরন্তন

ভবেশ। [মুখভঙ্গী করিয়া]
আজ কিন্তু আমি আগে বাজিয়েছি ধন!

বৃন্দাবন। আমি বৃন্দাবন
মোর বাঁশী আরও সনাতন!

গুড়। মিথ্যুক
করমচা-খোর কোকিল!
সাইরেন—
কষ্ট।

লেখক। একটি কথা বলছি কিন্তু পষ্ট
হু হু করে সমাজ হচ্ছে নষ্ট।

নরসুন্দর। ঠিক বলেছেন!
কুছ্ পরোয়া নেই
ভাগাভাগি করি আসুন
থাক্
সবার কবিতাতেই বাঁশী থাক
রাজি আছি আমি—

ভবেশ। আমি রাজী নই—ইয়ার্কি
ইজ্জত নেই প্রিয়ার কি!
বাঁশী মোর প্রিয়া তার কাছে
আমি একক—

নরসুন্দর। ভাই লেখক
তুমিই তাহলে
মীমাংসা কর।
তোমার নিজের কোন স্বার্থ নেই
নেই কোন ব্যক্তিগত দ্বেষ

বৃন্দাবন। ইহাতে নাহিক মোর আপত্তির লেশ!

ভবেশ। [অনিচ্ছা সহকারে]
ছাড়বেন না যখন—বেশ!

লেখক। বাঁশী যদি বাজান সবাই বেশ তো
কালের এবং স্থানের মতো সুরেরও নেই শেষ তো!
বাজবে ওতে বেহাগ টোড়ি বাজবে ওতে মূলতান
চন্দ্রমুখীর গলবে পরাণ না হয় যদি ভুল তান।
কিন্তু যদি আমার কথায় রাখেন মশাই আস্থা

বাঁশী ছাড়ুন ! পচে গেছে, ধরুন অন্য রাস্তা
বৃন্দাবনে বাজত বাঁশী সিনেমাতেও বাজছে
রেফারি আর গার্ড সাহেবে সবাই বাঁশী সাধছে
বাঁশী ছাড়ুন,—বাঁশী ছাড়াও আছে অনেক যন্ত্র

ভবেশ। ঝাড়লে দেখছি অন্য রকম মন্ত্র !

নরসুন্দর। ঠিক হ'ল তাহ'লে
বাঁশী-বর্জ্জন ?
বেশ
আমার আপত্তি নাই !

সকলেই আবার স্ব-স্ব স্থানে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং বাঁশী-বর্জ্জিত ভাব ভাবিতে লাগিলেন।

লেখক। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—আরও পাঁচটি চাই
সেই, পাঁচটি কি উপায়ে কোথাথেকে পাই !
অদেখা মোর সাকী
পাঁচটি টাকার জন্যে শেষে ফসকে যাবে নাকি !
কবিতাটি লিখেছি যা—নিজের মুখে উচিত নয় ক বলা—
এক্কেবারে মর্ম্ম-গলা !
কিন্তু হায় রে পাঁচটি টাকা, পাঁচটি রজত খণ্ড—
তার অভাবেই সবটা হবে পণ্ড !
চুরি করার সময়ও নেই—যা হবার তা হবে—
না পাই যদি তবে
স্বপ্ন দেখেই কাটবে জীবন—জন্মেছি এই বঙ্গে—
কাব্য করেই কাটিয়ে দেব স্বপ্ন-সাকীর সঙ্গে !

নরসুন্দর। [হঠাৎ চীৎকার করিয়া]
বাস—হয়ে গেছে

বেঁধেছি
লেখক, লেখ শীগ্‌গির—
গদ্য-কবিতা-ম্যাড়া
ঢু মারছে মনে
মিলগুলো দেবে এখনি তছনচ ক'রে
লিখে নাও—শীগ্‌গিরি—

লেখক। এই যে ভাই—হাজির

লেখক কাগজ কলম বাগাইয়া বসিলেন

নরসুন্দর। "ওগো চন্দ্রমুখী
আমার কল্পনা-স্বর্গে কেন দিলে উঁকি—"
স্বর্গের চেয়ে কুঞ্জই ভাল বোধ হয়
লেখ
"আমার কল্পনা-কুঞ্জে কেন দিলে উঁকি
ভুল ভুটি কত চমৎকার—"

বৃন্দাবন। হয়েছে আমার
লেখ লেখ হে লেখক—দেরি নহে আর।
"নহ সূর্য্য—নহ তারা—"

নরসুন্দর। "আমি আত্মহারা—"

লেখক। দু-হাত আমার চলে না ভাই, একসঙ্গে এমন ধারা—

গুড়। [হঠাৎ ছুটিয়া আসিলেন]
"জ্যামাইকা দ্বীপের বন্দরে আছে যত শামুকী—
নিকোলাসের পিতৃস্বসার রিগ্রেশন্ উঠুক—"

ভবেশ। এবার তবে আমারও ফুল ফুটুক—
লেখ দেখি আমারটা
সবাই দেখি মস্ত কবি—কামার, কুমোর, চামারটা!

চোর ব্যাটারা, ভেবেছিল বাঁশীটাকে ভেঙ্গে
চন্দ্রমুখীর কাছে আমায় দেবে না আর ঘেঁষতে !
কিন্তু বাবা ফুলবাগানে যার—

নরসুন্দর। "ভুল ভুটি কত চমৎকার—"

ভবেশ। "ফুল ফোটান যায় না সখি করে কেবল বুজরুকি—"

বৃন্দাবন। "নহ সূর্য্য, নহ তারা, নহ পুষ্প, ওগো চন্দ্রমুখী।"

নরসুন্দর। "আমি আত্মহারা হয়ে খালি ছন্দ ঠুকি !"

লেখক। আমি একসঙ্গে কি ক'রে টুকি !
একে একে হৃদয়গুলি মেলুন
সামলাতে কি পারি মশাই একসঙ্গে
চার চারটে বেলুন !
নরসুন্দর বলুন আগে—ওঁরই প্রথম দাবি
উনিই প্রথম খুলেছিলেন ভাবের ঘরের চাবি।

লেখক আবার লিখিবার জন্ত কলম তুলিয়া লইলেন

নরসুন্দর। "ওগো চন্দ্রমুখী
আমার কল্পনা-কুঞ্জে কেন দিলে উঁকি !
ভুল ভুটি কত চমৎকার
আমি আত্মহারা হয়ে খালি ছন্দ ঠুকি !"

লেখক। [মুগ্ধভাবে]
একে বলে কারুকার্য্য চারু—!

ভবেশ। হরিজন-হস্তে যেন ঝাড়ু—!

নরসুন্দর। বাগান সাফ করতে হয়
ঝাড়ুর কথা মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক !

ভবেশ। মুখ সামলে—বেল্লিক—

লেখক। শান্তি, শান্তি,—ঝগড়াঝাঁটি ভোল
বৃন্দাবন তুমি এবার ঢাক্‌নাখানি তোল।
বৃন্দাবন। নহ সূর্য্য, নহ তারা, নহ পুষ্প, তুমি চন্দ্রমুখী,
তবুও তোমারে বন্দি' ছন্দ হয় সুখী
অন্তরে আবেগ জাগে, কণ্ঠে জাগে সুর
বক্ষে জাগে হর্ষ অহেতুকী।
লেখক। আহা, যেন তরমুজ!
ভবেশ। বন্ধুভাবে বলছি শোন বৃন্দাবন রুদ্র
সত্যি যদি চন্দ্রমুখীর হৃদয় দখল করতে চাও
অবিলম্বে শেষ কথাটি বদলে দাও—
চলবে না ও কোনক্রমে—
লেখক। বেশ হয়েছে, যাচ্ছ কেন দমে'!
আপনি আসুন গুড়মশায়, করুন মোদের সুখী।
গুড়। জ্যামাইকা দ্বীপের বন্দরে আছে যত শামুকী
নিকোলাসের পিতৃস্বসার রিপ্রেশন্ উঠুক কিম্বা নামুকই
ভলভিউলাস, ফোটোমিটার, নীট্‌শের যত ফক্কুড়ি
সব তুচ্ছ তোমার কাছে চন্দ্রমুখী, চন্দ্রমুখী।
লেখক। আমার বিশ্বাস এই লেখাটির কৃষ্টি
চন্দ্রমুখীর ধূসর মনে করবে সুধা-বৃষ্টি।
ভবেশ। আমি কিন্তু গুড়মশাই
একটি কথা বলতে চাই!
দু-বার চন্দ্রমুখী কেন?
ডাক হবে একটি ডাক—
তাতে যদি সাড়া না দেয়—চুলোয় যাক!

গুড় ক্রুদ্ধ দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন মাত্র, কিছু বলিলেন না।

লেখক। বড্ড কড়া সমালোচক আপনি মশাই

ভবেশ। ফুল নিয়ে দিবারাত্রি করতে হয় যে মাজা-ঘষাই !
ফুলের একটি তোড়া বাঁধা
এটা ছাঁটো, ওটা কাটো দস্তুর মতো ইয়ে দাদা
লোকে ভাবে শক্ত কি আর

লেখক। আপনারটা বলুন এবার

ভবেশ। আমারটা ? মানে, বেশ লিখুন
হয় নি কিন্তু তত নিপুণ !
মাজা-ঘষা করবারও নেই সময় আর
ভাবটি কিন্তু চমৎকার
"ফুল ফোটান যায় না সখি ক'রে কেবল বুজরুকি
ঘটি ঘটি জল ঢাললেই হয় না কভু ফুল সুখী
সময় মত হিসেব মত ঝাঁঝরি দিয়ে ঢালতে হয়
আশা করি মনের কথা বুঝছ তুমি চন্দ্রমুখী"

বৃন্দাবন। বৃক্ষে কভু নাহি ফলে মূর্খ !

নরসুন্দর। সত্যি কি সূক্ষ্ম !
যেন ছুঁচ
মর্ম্ম করে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় !

গুড়। ছায়াপথের মোড়ঃ
নীলপরী ম্যাঙ্গোস্টিন খায়
বন্দী নয়
মুক্ত—

লেখক। ঠিক যেন সুকতো
ভারী তৃপ্তি দিলে—

সকলের কবিতাগুলি লেখা হইয়া গেল। লেখক সেগুলি গুছাইয়া রাখিয়া দিলেন।

নরসুন্দর। সবাই মিলে
জটলা ক'রে লাভ কি
নন্দী মশায় এলে
তার পর সব আসা যাবে।
তিনি কত দূর
তাই বরং দেখা যাক, চল।
কি বল লেখক

লেখক। বেশ তাই হোক—

লেখক ব্যতীত সকলের প্রস্থান

লেখক। নামছে আঁধার ডাইনে বামে নিবছে আলো
জ্বালব না দীপ আঁধার আমার লাগছে ভালো।
জোনাক জ্বলে আঁধার ভরি
চিকমিকিয়ে রূপোর জরি
চুমকি-দেওয়া নীলাম্বরী
অঙ্গেতে আজ কে জড়ালো
কি সুন্দরী ওই মেয়েটি কাজল-কালো!
কপালটিতে ছোট্ট ক'রে টিপটি আঁকা—
কিন্তু হায় রে পাঁচটি টাকা, পাঁচটি টাকা
পাঁচটি টাকা!

বাম দিকের পর্দাটি সন্তর্পণে সরাইয়া প্রথমে বৃন্দাবনের মুণ্ড পরে সশরীরে বৃন্দাবন প্রবেশ করিলেন এবং পা টিপিয়া আগাইয়া আসিলেন।

বৃন্দাবন। হে লেখক, আসিলাম আর এক বার

লেখক। কেন, কি ব্যাপার,

বৃন্দাবন। শোন ভাই
চন্দ্রমুখীকে আমি চাই।
সংশয় জাগিছে চিতে
ভবেশ কবিতাটিতে
সহজ ভাষায়
কহিয়াছে যাহা হায়
যদিও তাহাতে নাই উচ্চতর ভাব
তবু কিন্তু তাহার প্রভাব
সহজ বলিয়া
চন্দ্রমুখী-হৃদয়েরে দিবে উতলিয়া!
একে নারী, ধনীর দুলালী
কটমট কবিতারে হয়তো ভাবিবে গালাগালি।
তুমি কিন্তু পার ভাই বাঁচাইতে মোরে
ভবেশের কবিতাটি দাও পঙ্গু ক'রে
কলম তোমার হাতে,—আমারে বাঁচাও—

লেখক। পারি,—যদি এক টাকা দাও

বৃন্দাবন। এক্ষুনি, নাও—

লেখক। ঠিক হয়ে যাবে, দাঁড়িও না যাও—

বৃন্দাবন সন্তর্পণে প্রস্থান করিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকের পর্দা সরাইয়া নরসুন্দর মুণ্ড বাড়াইলেন এবং চোরের মতো প্রবেশ করিলেন।

নরসুন্দর। আর কেউ আছে নাকি, লেখক

লেখক। না, আপাতত একক।
কি চাই

নরসুন্দর। শোন ভাই—
কবিতা আমার সুবিধে হয় নি!

মিল দিতে গিয়ে
ভারি পষ্ট হয়ে গেছে কবিতাটা

লেখক। ভালই তো, স্বচ্ছতা থাকাটা—

নরসুন্দর। আগে নাও, ধর টাকাটা

এক টাকা দিলেন

লেখক। কি রকম হ'ল এটা

নরসুন্দর। বুঝিয়ে বলছি শোন—
অম্বিকেশ, চন্দ্রমুখী
কবিতার 'ক'ও বোঝে না !
তাই
যে-কবিতা যত দুর্ব্বোধ্য
সে-কবিতা তত গভীর
ওদের কাছে ;
ধ্রুবেশ গুড়ই জিতবে সুতরাং
যদি না তুমি ওর লেখার প্যাঁচগুলো খুলে

লেখক। [হাসিয়া]
দিই চেঁছে ছুলে ?

নরসুন্দর। একেবারে সরল রেখা বানিয়ে দাও !

লেখক। আচ্ছা, যাও—

পর-মুহূর্ত্তেই ডান দিকের পর্দ্দা সরাইয়া ধ্রুবেশ গুড় এবং বাম দিকের পর্দ্দা সরাইয়া ভবেশ মুণ্ড বাড়াইলেন

ধ্রুবেশ। লেখক !

ভবেশ। লেখক !

ধ্রুবেশ। এরোপ্লেন নির্নিমেষ কিমামি হেঁচকি—!

ভবেশ। কবিতার ছেঁচকি—

ধ্রুবেশ। আমি এসেছি লেখকের কাছে
ভবেশ। আমারও একটু দরকার আছে
ধ্রুবেশ। আপনি একটু বাইরে যাবেন ?
ভবেশ। আপনি একটি মোয়া খাবেন ?
ধ্রুবেশ। সত্যি এক বার বাইরে যান
ভবেশ। মাইরি প্রাণ !
লেখক। ঝগড়া করা তো মিথ্যে আওয়াজ ফাঁকা
আসল কথাটি বলছি পষ্ট ক'রে
দেন যদি মোরে আর একটি ক'রে টাকা
ওদের কবিতা দিচ্ছি নষ্ট ক'রে !
প্রতিদ্বন্দ্বী এক জন শুধু রবে
চন্দ্রমুখীরে পাওয়াটা সহজ হবে।
ভবেশ। বেশ, তাই হোক তবে

টাকা দিলেন

ধ্রুবেশ। বিবেক !
হে অষ্টিচ্ ক্ষমা কর
নিরুদ্ধ আকুতির কনকনানি,
কিন্তু—ওঃ
যাক্—

টাকা দিলেন

ভবেশ। [যাইতে যাইতে]
বৃন্দাবনকে ভয়টা আমার বেশী
তার সঙ্গেই আসল রেষারেষি
এ দুটো তো নিটোল নিরেট

চলিয়া গেলেন

ধ্রুবেশ। [ধীরে ধীরে অবনত শিরে]
আঙুর-গন্ধী কিসমিসের প্লেট
স্পর্দ্ধা, অসমসাহসিক।
হে নরসুন্দর
পাবে না তুমি
সান্ত্বনা এইটুকু—

বাহির হইয়া গেলেন

লেখক। এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়
সাত আট নয়
এ যে প্রায় হয় হয়!
এক মোটে বাকি!
প্রিয়া—সখি—শাকী—
বাকিটা কি ক'রে পাই
গুড় মশাই, ও গুড় মশাই—
শুনে যান

ধ্রুবেশ গুড় প্রবেশ করিলেন

ধ্রুবেশ। আবার কি চান
লেখক। হচ্ছে আমার আনন্দ
ধ্রুবেশ। ভেকের যকৃতে সনাতন পিত্ত-ছন্দ!
লেখক। বলতে চাই একটি কথা একলা শুধু আপনাকে
নারীর সেরা চন্দ্রমুখী সত্যি যদি চান তাঁকে
ভবেশটিকে করতে হবে নিষ্প্রভ
ধ্রুবেশ। ভেঙে বলুন, আর এক টাকা ফের দোব?
লেখক। সত্যি যদি পারেন দিতে মিলবে বাহু-বন্ধ-সুখ
চন্দ্রমুখী বামে নিয়ে হয়ে যাবেন চন্দ্র-মুখ।

ধ্রুবেশ। উঃ

জাম্বুবানের সংস্কার!

মৃতা মৈথিলী

অথচ জীবিতা...

কিন্তু—উঃ—

টাকা দিয়া সবেগে চলিয়া গেলেন।

লেখক। [সোচ্ছ্বাসে]

হে ধ্রুবেশ গুড়

নীলকণ্ঠ তুমি চন্দ্রচূড়

চিত্ত মম করিলে নির্ব্বিষ

কি আনন্দ কি আনন্দ ইস্!

সহসা তন্ময় হইয়া

আলোক মিলিছে ওই অন্ধকার-সনে

অম্বরে গম্ভীর স্বর উঠিছে গুঞ্জরি

শত বর্ণ বিচ্ছুরিত প্রদীপ্ত আসনে

নীলাম্বরী সন্ধ্যা হাসে শ্যামলী সুন্দরী—

উত্তেজিত বৃন্দাবন, নরসুন্দর, ভবেশ ও ধ্রুবেশের পুনঃপ্রবেশ।

বৃন্দাবন। কন্যাসহ আসিছেন নন্দী অম্বিকেশ

নরসুন্দর। চন্দ্রমুখীর চতুর্দ্দোলাটা চমৎকার বেশ!

ধ্রুবেশ। ইউবোটে আর তিমি মাছে...

ভবেশ। লেখক, আয়না আছে?

লেখক। না ভাই

ভবেশ। কি মুস্কিল, আয়না কোথা পাই—

নরসুন্দর। নখদর্পণ সঙ্গে আছে তাতেই দেখে নিন।

লেখক। ওঁরা এসেছেন—সরুন রাস্তা দিন

সকলে ত্রস্ত হইয়া সরিয়া গেলেন। দক্ষিণ দিকের পর্দা সরাইয়া দুইজন দারোয়ান প্রবেশ করিল এবং পর্দা টানিয়া ধরিয়া রাখিল, শ্রীযুক্ত অম্বিকেশ নন্দী প্রবেশ করিলেন। ফর্সা বেঁটে লোক—দেখিলে মনে হয় যেন খর্ব্বাকৃতি কাবুলিওয়ালা এবং চটা মেজাজের। তাঁহার পিছনে চারিজন দারোয়ান দ্বারা বাহিত হইয়া চন্দ্রমুখীর চতুর্দ্দোলা প্রবেশ করিল। চতুর্দ্দোলাটি শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া অথবা তৃতীয়ার চন্দ্রের মত দেখিতে, চমৎকার করিয়া সাজান। চন্দ্রমুখী গৌরবর্ণা, পরিচ্ছদ রূপালি-জরির-কাজ-করা কালো রঙের। চতুর্দ্দোলা এক ধারে নামান হইলে চন্দ্রমুখী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। লেখক দুইটি মোড়া পাশাপাশি রাখিতেই অম্বিকেশ ও চন্দ্রমুখী উপবেশন করিলেন। দারোয়ানেরা সারি বাঁধিয়া পিছনে দাঁড়াইল।

অম্বিকেশ। জম্বুদ্বীপের সুধীবৃন্দ সময় বেশী নাই আজ
অল্প দু-চার কথা বলেই শেষ করতে চাই কাজ।
আপনারা তো জানেন সবই তবু আবার বলছি
চিরটা কাল আমি আপন খেয়াল মতই চলছি।
মেয়ের পাত্র হিসেবে তাই সন্ধানি সেই লোককে
কাব্য-লোকের রঙীন স্বপন ভাসে যাহার চক্ষে!
চাই না কোন হোমরা-চোমরা রেকর্ড ব্রেকার কুস্তির
জানতে চাই না সে ব্যক্তিটি অস্থির বা সুস্থির,
বিদ্বান বা ধনী কি না সুবোধ কিম্বা দুর্ব্বোধ
একটি কথা জানব কেবল আছে কি না সুর বোধ!
সুর থাকলে পরস্পরে পটাবে ও পটবে
তা নইলে সারা-জীবন ছন্দ-পতন ঘটবে!
লোক দেখেছি অনেক রকম গেছি প্রয়াগ পুষ্কর
সার বুঝেছি বেসুরো লোক নিয়ে চলা দুষ্কর!
পদ্য-লেখক রসিক জনে পারলে দিতে কন্যা
ভাগ্য বলে মানব আমি মেয়েও হবে ধন্যা।
পদ্যও নয়, বাক্যও নয়, আসল কথা রসটি
এবং নিয়ম-রক্ষা বাবদ রজত-মুদ্রা দশটি!

লেখক মশাই আনুন দেখি, কে বাজাল কোন সুর
গণেশপ্রসাদ, চতুরীলাল হরেন কিম্বা মনসুর
যে-ই হোক সে,—চিত্তে যদি থাকে কাব্য-দর্পণ
তারই হাতে চন্দ্রমুখী করব আমি অর্পণ !

লেখক লেখাগুলি চন্দ্রমুখীর হস্তে দিলেন

লেখক। অক্ষম অপটু হস্তে আঁকিয়াছি অক্ষরের ছবি
সামান্য লেখক আমি—এঁরা সব কবি।

চন্দ্রমুখী। (মুগ্ধ) আপনিই লেখক ! সুবিখ্যাত লিপিকার !

অম্বিকেশ। পড় ; দেরি কেন করছ আর—

চন্দ্রমুখী। [একটি কাগজ তুলিয়া]
এটির নীচে নাম দেখছি বৃন্দাবন

বৃন্দাবন। আমিই সেই অধম জন

উচ্ছ্বসিত হইলেন

জানি দেবি জানি
আমার কবিতাখানি—

অম্বিকেশ। চুপ করুন। পড় চন্দ্রমুখী

চন্দ্রমুখী। [পড়িতে লাগিলেন]
নহ মণ্ডা, নহ গজা, নহ ল্যাংচা মোরব্বা-হরতুকি—

বৃন্দাবন। এ কি এসব তো আমি কোথাও—

অম্বিকেশ। চুপ করুন, পড়ে যাও—

চন্দ্রমুখী। নহ মণ্ডা, নহ গজা, নহ ল্যাংচা মোরব্বা-হরতুকি
তবু তুমি মিষ্ট চন্দ্রমুখী
নয়ন মুদিয়া ভাবি বুঁদিয়া কি উপমা তোমার ?
সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় আমি কি উজবুকই !

অম্বিকেশের মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া চন্দ্রমুখীকে প্রশ্ন করিলেন

অম্বিকেশ। তোর লাগল কেমন ?

চন্দ্রমুখী। [হাসিয়া]

আর যা-ই হন ফুলবনের ভোমরা ইনি নন !

মনে হচ্ছে ময়রা-বাড়ীর ভীমরুল—

বৃন্দাবন। ভুল, আগাগোড়া সব ভুল

ও কবিতা আমি লিখি নাই

ভবেশ ও ধ্রুবেশ। [একযোগে]

মিছে কথা কেন বল ভাই

বৃন্দাবন। হে শ্রদ্ধেয়, অম্বিকেশ নন্দী

ভিতরেতে আছে হীন ফন্দি

কহিতেছি তার-স্বরে ও কবিতা নহেক আমার

ভবেশ ও ধ্রুবেশ [সমস্বরে] নিশ্চয় তোমার—

বৃন্দাবন। [আত্মহারা] মন এ স্বপ্ন, না জাগরণ !

অম্বিকেশ। [চন্দ্রমুখীকে] দ্বিতীয়টা—ধর

চন্দ্রমুখী। এটির লেখক নর-সুন্দর

কে তিনি—

লেখক [দেখাইয়া] এই যে ইনি—

চন্দ্রমুখী [পড়িতে লাগিলেন] আমি কি পরিপাটি সখি কামাই ছাঁটি

থাকি কখনও সিধা ফের কখনও ঝুঁকি,

মোর কাঁইচি চলে ঘন চুলের তলে

আমি ভৃত্য তব ওগো চন্দ্রমুখী !

নরসুন্দর [ক্ষেপিয়া]

লেখক, লেখক

খুন

খুন করব তোমায়—

অম্বিকেশ [সগর্জ্জনে] এই কোন্ হ্যায়—

একজন দারোয়ান আগাইয়া আসিল

অম্বিকেশ। টানতে টানতে বাইরে নে যাও
ধরে গলার চাদর
হাল্লাবাজ বাঁদর !

দারোয়ান নরসুন্দরকে বাহির করিয়া দিয়া স্বস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে নরসুন্দর পুনঃ প্রবেশ করিলেন এবং এক পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চন্দ্রমুখী। তৃতীয় কবিতার লেখক ভবেশ

অম্বিকেশ। বেশ—

ভবেশ। মোর কবিতার মানে বুঝতে
অভিধান হবে না-কো খুঁজতে !
সোসাসুজি মোটামুটি—

ধ্রুবেশ। হায় মাখনমুগ্ধ রুটি
তিতিক্ষার স্বপ্ন দেখ
তৈল-সিক্ত গুম্ফ
পেট্রল-সিক্ত কর—

অম্বিকেশ। [ধমকাইয়া] ফের গোলমাল করছেন ! নাও, পড়—

চন্দ্রমুখী। [পড়িতে লাগিলেন] খোল-পচা আর গোবর-পচা
চটকে নিয়ে পাতা-পচার সঙ্গে
গাছের গোড়ায় দেন যদি কেউ
ভবিষ্যতে হবেন মহা সুখী—

ভবেশ। থামুন—থামুন—এ কি এ !

অম্বিকেশ। আপনাকেও কি দারোয়ান দিয়ে—

ভবেশ সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত হইলেন

চন্দ্রমুখী। খোল পচা আর গোবর-পচা
চটকে নিয়ে পাতা-পচার সঙ্গে
গাছের গোড়ায় দেন যদি কেউ
ভবিষ্যতে হবেন মহাসুখী
সার নইলে ফুল ফোটে না
এই কথাটা বুঝবে না কেউ বঙ্গে
ওগো চন্দ্রমুখী !

ভবেশ। লেখক, তুমি সত্যি কথা কও

অম্বিকেশ। [ধমক দিলেন] চোপ রও !
সব কজনই মহা দিগ্‌গজ—নেইক কেবল শুঁড় !

চন্দ্রমুখী। এর পরেরটি শ্রীধ্রুবেশ গুড়
"জ্যামাইকা দ্বীপের বন্দরে আছে যত শামুকী
নিকোলাসের পিতৃস্বসার রিপ্রেশন উঠুক কিম্বা নামুকই,
ভলভিউলাস্ ফোটোমিটর নীটশের যত ফক্কুড়ি
সব তুচ্ছ তোমার কাছে চন্দ্রমুখী, চন্দ্রমুখী—"

অম্বিকেশ ক্রোধে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। চন্দ্রমুখী লেখকের পানে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

চন্দ্রমুখী। আমায় নিয়ে এমন ক'রে ঠাট্টা করার অর্থ টা কি ?

লেখক। সব তো পড়া শেষ হয় নি
আরও একটা আছে বাকী

চন্দ্রমুখী। [পুলকিতা] আপনি সেটার কবি নাকি—

লেখক। নিজের মুখে বলব তা কি !

অম্বিকেশ। এই শুনলাম, দশটি মাত্র টাকাও তোমার নেই

লেখক। পেয়ে গেছি বরাত জোরেই—

অম্বিকেশ। আশা করি কর নি কো চুরি,

লেখক। আজ্ঞে না, পুরোপুরি,
সত্যি বলছি, পুরোপুরি উপার্জন !
অম্বিকেশ। বাজে কথায় সময় গেল অনেকক্ষণ।
পড় শুনি—আশা করি লেখ নি কো যা' তা,—
চন্দ্রমুখী। [কম্পিত কণ্ঠে]
উনি পড়ুন, ঘুরছে আমার মাথা
লেখক। [আবেগভরে পড়িতে লাগিলেন]
সুরবাহারের সুরটি যেন রূপ ধরেছে প্রজাপতির ডানায়
শঙ্খ ধবল পাত্রে যেন মেহেদি রঙ্ টলছে কানায় কানায়
চাঁদনী রাতে বাঁশীর সুরে উতল হিয়া হয়েছে উন্মুখই
কোথা চন্দ্রমুখী।
চন্দ্রমুখী। [অস্ফুট স্বরে] চমৎকার !
অম্বিকেশ। সময় বৃথা নষ্ট ক'রে কাজ কি আর !
লেখক এবং চন্দ্রমুখী
পরস্পরে হউক সুখী
আমরা এখন অবান্তর
উঠিয়া পড়িলেন
লেখক। সুখের দিনে কারও সঙ্গে রাখতে চাই না মনান্তর।
যথাকালে শোধ করব সবার ঋণ
আপনারা সব আশিস দিন
বাঁধি আমার বাস্তু
সকলে। তথাস্তু

যবনিকা*

---

* Clifford Bax-প্রণীত The Poetasters of Ispahan অবলম্বনে রচিত।

আকাশ নীল

জমিদার জনার্দ্দন রায়ের বাড়ির সম্মুখস্থ বাগান। বাগানের একপ্রান্তে জনার্দ্দনবাবুর প্রকাণ্ড বাড়িখানা এবং অপরপ্রান্তে প্রকাণ্ড গেটটা দেখা যাইতেছে। গেটটা খোলা আছে। গেটের ভিতর দিয়া একটি 'বল্' সবেগে আসিয়া বাগানের ভিতর পড়িল এবং লাফাইতে লাফাইতে গিয়া একটা ঝোপে ঢুকিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অমল আসিয়া প্রবেশ করিল। অমলের বয়স বছর দশেক হইবে। চেহারায় তেমন কোন বিশেষত্ব নাই। শ্যামবর্ণ, রোগা গোছের। অমল এ প্রদেশে আগন্তুক, তাই নির্ভয়ে জনার্দ্দন রায়ের বাগানে প্রবেশ করিয়াছে। এ অঞ্চলের কোন বালক পাগল জনার্দ্দন রায়ের ত্রিসীমানায় ঘেঁসে না। অমল বাগানে ঢুকিয়া বলটি খুঁজিতে লাগিল। একটু পরেই অমলের খেলার সঙ্গী বিশু আসিয়া গেটের বাহিরে দাঁড়াইল। বিশু অমলের সহপাঠী এবং এইখানেই তাহার বাড়ি। অমল ছুটিতে বিশুর বাড়িতেই বেড়াইতে আসিয়াছে। বিশু গেটের বাহিরে দাঁড়াইয়া অমলকে ডাকিতে লাগিল।

বিশু। অমল চলে এস তুমি—

অমল। বলটা খুঁজে নিয়ে যাচ্ছি।

বিশু। বল থাক, চলে এস তুমি—

অমল। [সবিস্ময়ে] কেন ?

বিশু। চলে এস, তারপরে বলছি।

অমল। বলটা নিয়ে আসি, থাম।

বিশু। আরে, আমি বলছি বল থাক, চলে এস তুমি। জনার্দ্দনবাবু বড় ভয়ানক লোক।

অমল। কেন, কি করবে ?

বিশু। ধরলে আর আস্ত রাখবে না।

অমল। ইস্।

বিশু। সত্যি বলছি, পালিয়ে আয়।

অমল বিশুর কথা গ্রাহ্য না করিয়া বল খুঁজিতে লাগিল।

বিশু। এই অমল—

অমল। বলটা খুঁজে নিয়ে যাচ্ছি, দাঁড়া না।

বিশু। পাগলা যদি বেরিয়ে আসে ভয়ানক কাণ্ড করবে।

অমল। পাগলা না কি ?

বিশু। মাথার ছিট আছে, তার ওপর দারুণ মাতাল, সর্ব্বদাই মদ খেয়ে থাকে। সব্বাই ভয় করে ওকে, আত্মীয় স্বজনরা পর্য্যন্ত ছেড়ে পালিয়েছে, ও একাই থাকে। পালিয়ে আয়—

অমল। আমি কাউকে ভয় করি না। বল না খুঁজে নিয়ে আমি যাচ্ছি না।

বল খুঁজিতে লাগিল।

বিশু। যদি বেরিয়ে আসে মজাটি বুঝবে।

অমল। তোর ভয় করে তো তুই পালা না—

বিশু। আচ্ছা, আমি তাহলে ততক্ষণ কান্তু, গোরা, জীবন, রবিকে ডেকে আনি গিয়ে। তুই বলটা যদি পাশ ভালই, সবাই মিলে বল খেলা যাবে তা না হলে হাডুডুডু খেলব, কেমন ? তুই বেশীক্ষণ কিন্তু থাকিস না ওখানে।

অমল। বলটা পেলেই আমি যাচ্ছি, তুই যা—

[বিশু চলিয়া গেল, অমল বল খুঁজিতে লাগিল। দূরে দেখা গেল জনার্দ্দন রায় বাহির হইয়াছেন এবং অমলের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন। লোকটী সত্যই ভীষণ-দর্শন। গায়ের রঙ্ মিশ-কালো, মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা। ছোট ছোট চোখে হিংস্র দৃষ্টি। আজানুলম্বিত বাহু, ঝাঁকড়া ভুরু, বলিষ্ঠ গঠন। মনে হয় সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া আছেন। অনেকটা গরিলার মতো হাব ভাব। অমল প্রথমটা দেখিতে পায় নাই, হঠাৎ ঘাড় ফিরাইতেই চোখো-চোখি হইয়া গেল। উভয়ে পরস্পরের দিকে চাহিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিল। তাঁহার পর জনার্দ্দন খানিকটা আগাইয়া আসিলেন এবং হাতছানি দিয়া অমলকে ডাকিলেন। অমল নির্ভয়ে আগাইয়া গেল।]

জনার্দ্দন। [কর্কশ কণ্ঠে] এখানে কি হচ্ছে ?

অমল। আমাদের বলটা এখানে—

জনার্দ্দন। [দাঁত কড়মড় করিয়া] চোপ রও—

অমল চুপ করিয়া গেল। তাহার পর ইতস্তত করিয়া আবার সুরু করিল।

অমল। আমাদের বলটা আপনার বাগানে ঢুকেছে তাই—

জনার্দ্দন। [সবিস্ময়ে] বল্! কিসের বল্, কার বল্? [দাঁত কড়মড় করিয়া] মিথ্যুক পাজি কোথাকার!

অমল। আমি মিথ্যে কথা কখনও বলি না।

জনার্দ্দন। [চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া] ও!

[সহসা হাসিয়া উঠিলেন]

ক্যহ্ ক্যহ ক্যহ ক্যহ্ ক্যহ ক্যহ! তোমার নাম কি?

অমল। অমল।

জনার্দ্দন। যুধিষ্ঠির নয়? ক্যহ ক্যহ্ ক্যহ ক্যহ ক্যহ—!

এইরূপ অদ্ভুত শব্দ করিয়া হাসিতে হাসিতে সহসা জনার্দ্দন গম্ভীর হইয়া গেলেন, ক্রমশঃ ভ্রূ যুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, হিংস্র চোখের দৃষ্টি অমলের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অমল। [নির্ভীকভাবে] কি দেখছেন?

জনার্দ্দন। যুধিষ্ঠিরকে! [সহসা উচ্চকণ্ঠে] যোগী সিং, যোগী সিং—

[ভিতর হইতে যোগী সিং নামক দারোয়ান বাহির হইয়া আসিল—]

যোগী সিং। জি হুজুর।

জনার্দ্দন। হামারা হান্টার লে আও।

যোগী সিং ভিতরের দিকে যাইতে যাইতে অমলকে ইঙ্গিত করিয়া পলাইতে বলিল। অমল নড়িল না।

অমল। আমি আমার বলটা খুঁজে নিয়ে এখুনি চলে যাচ্ছি!

জনার্দ্দন। চলে যাওয়াচ্ছি দাঁড়াও না, পাজি মিথ্যুক কোথাকার, বল্!

অমল। আমি কখনও মিথ্যে কথা বলি না।

জনার্দ্দন। কোথায় তোমার বল্ ?

অমল। এইখানে কোথাও ঢুকে আছে।

জনার্দ্দন। [চীৎকার করিয়া] দেখাও, কোথায় তোমার বল্। পাজি মিথ্যুক কোথাকার, এসেছেন ফুল ছিঁড়তে, বলছেন বল্।

অমল। ফুল ছিঁড়তে আসি নি আমি।

জনার্দ্দন। চোপরাও পাজি মিথ্যুক—

অমল। [দৃঢ়স্বরে] আমি মিথ্যে কথা কখনও বলি না।

জনার্দ্দন। কখনও বল না ?

অমল। না।

জনার্দ্দন। [ভ্যাঙাইয়া] কিছুতে না ?

অমল। না।

জনার্দ্দনের মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হইয়া উঠিল। সহসা আগাইয়া গিয়া তিনি অমলের কান ধরিলেন।

জনার্দ্দন। [কানে মোচড় দিয়া] কিছুতে মিথ্যা বলবে না ?

অমল। না।

জনার্দ্দন। [আকাশের দিকে আঙুল দেখাইয়া] আকাশের রঙ কি বল দেখি ?—

অমল। নীল।

জনার্দ্দন। [কানে আর এক পাক দিয়া] নীল নয়, লাল। বল, আকাশের রঙ লাল !

অমল। না, আকাশের রঙ্ নীল।

[জনার্দ্দন অমলের কান ছাড়িয়া দিলেন একটু তফাতে দাঁড়াইয়া বিস্মিত ক্রোধে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার চক্ষু দুইটি হিংস্র হইয়া উঠিল—]

জনার্দ্দন। [ধমক দিয়া] বল, আকাশ লাল।

অমল। আকাশ নীল।

[জনার্দ্দন হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে আগাইয়া গিয়া অমলের গালে জোরে এক চড় মারিলেন।]

জনার্দ্দন। [চক্ষু দুইটি ছোট করিয়া ধীর কণ্ঠে] বল, আকাশ লাল।

অমল। আকাশ নীল।

[জনার্দ্দন পুনরায় চড় মারিলেন ; অমল পড়িয়া যাইতে যাইতে সামলাইয়া লইল।]

জনার্দ্দন। বল, আকাশ লাল।

অমল। না, আকাশ নীল।

[জনার্দ্দন পুনরায় চড় মারিলেন, এত জোরে যে অমল পড়িয়া গেল। পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইল।]

জনার্দ্দন। [কর্কশ কণ্ঠে] এখনও বল আকাশ লাল।

অমল। না, আকাশ নীল।

[জনার্দ্দন উপর্যুপরি তাহাকে আরও কয়েকটা চড় মারিয়া আবার ভূশায়ী করিয়া ফেলিলেন। অমল পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইল]

জনার্দ্দন। কিছুতে বলবে না তুমি?

অমল। না।

জনার্দ্দন। [চীৎকার করিয়া] শিগগির বল, আকাশ লাল।

অমল। না, আকাশ নীল।

জনার্দ্দন। [আরও চীৎকার করিয়া] খুন করে ফেলব তোমায় আমি, শিগগির বল আকাশ লাল।

অমল। না, আকাশ নীল—

জনার্দ্দন। যোগী সিং যোগী সিং—

[শঙ্কর মাছের হান্টার লইয়া যোগী সিং বাহির হইয়া আসিল। সে ইচ্ছা করিয়াই এতক্ষণ দেরি করিতেছিল।]

অমল। আমাকে বল্ খুঁজতে দিন।

জনার্দ্দন। তোমাকে নতুন বল্ কিনে দেব আমি, বল আকাশ লাল—

অমল। না, আকাশ নীল।

[সপাং করিয়া এক ঘা চাবুক পড়িল]

জনার্দ্দন। বল আকাশ লাল।

অমল। [আরও দৃঢ় কণ্ঠে] আকাশ নীল।

সপাং সপাং করিয়া আরও ঘা কয়েক চাবুক পড়িল। দুই এক জায়গা কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। অমল অবিচলিত।

জনার্দ্দন। না বলিয়ে ছাড়চি না তোমায় আমি। আ-কা-শ লা-ল।

অমল। আকাশ নীল।

জনার্দ্দন। যোগী সিং, কুর্ত্তা খোল দেও! দেখি কত বড় ত্যাঁদড় ছেলে তুমি।

যোগী সিং। বোলিয়ে না বাবু আকাশ লাল, ইসমে ক্যা হ্যায়!

[অমল নিরুত্তর]

জনার্দ্দন। [ধমক দিয়া] জলদি কুর্ত্তা খোলো তুম উল্লু—

যোগী সিং অমলের জামা খুলিয়া ফেলিল।

জনার্দ্দন। বল, আকাশ লাল।

অমল। [অকম্পিত কণ্ঠে] আকাশ নীল।

জনার্দ্দন মরিয়া হইয়া হাণ্টার চালাইতে লাগিলেন। অমল মাটিতে পড়িয়া ছটফট্ করিতে লাগিল।

জনার্দ্দন। [হাঁপাইতে হাঁপাইতে] এখনও বল, আকাশ লাল।

অমল। [মাটিতে শুইয়া শুইয়া] আকাশ নীল।

[জনার্দ্দন পুনরায় চাবকাইতে লাগিলেন]

জনার্দ্দন। [পাগলের মত চীৎকার করিয়া] আকাশ লাল, আকাশ লাল, আকাশ লাল, শিগগির বল—আকাশ লাল।

অমল। আকাশ নীল!

জনার্দ্দন উন্মাদের হাসি হাসিয়া উঠিলেন, কাহ ক্যহ কাহ ক্যহ এবং পুনরায় নিষ্ঠুরভাবে হাণ্টার চালাইতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ চাবকাইয়া থামিলেন এবং বাম হাত দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিলেন।

জনার্দ্দন। বল, আকাশ লাল—

কোন উত্তর আসিল না।

যোগী সিং। ছোড় দিজিয়ে হজুর, ছোকরা বেহোঁস্ হো গয়া।

জনার্দ্দন। [বিস্মিত কণ্ঠে] বেহোঁস হো গিয়া!

[হাণ্টারটা ফেলিয়া দিয়া মূঢ়ের মত চাহিয়া রহিলেন। গেটের বাহিরে দেখা গেল বিশু, কানু, গোরা, জীবন, রবি সভয়ে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া আছে।]

যবনিকা।

অন্তরীক্ষে

অন্তরীক্ষে গ্রীক দেবী অ্যাথেনা দাঁড়াইয়া আছেন। চতুর্দ্দিকে বিরাট মহাশূন্য, ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু জ্যোতিষ্ক জ্বলিতেছে; দক্ষিণে রজতশুভ্রজ্যোতি একটি নীহারিকা বাষ্পীয় দেহ বিস্তার করিয়া অসীম শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে; পিগেসাস নক্ষত্রমণ্ডলীতে একটা ধূমকেতু দেখা যাইতেছে; কাছে দূরে উল্কাপাত হইতেছে। অ্যাথেনার পদতলে বহুনিম্নে পৃথিবীগ্রহ। অ্যাথেনা মানবী হইলে দেখিতে পাইতেন না, কিন্তু দেবী বলিয়া সৌরচক্রের দ্বাদশ রাশিকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন। দেখিতে পাইতেছেন যে, মকররাশিতে পূর্ণিমার চন্দ্র, মীনরাশিতে প্রবালবর্ণ মঙ্গল, বৃষরাশিতে প্রদীপ্ত বৃহস্পতি নীলকান্ত শনি, সিংহ রাশিতে দ্যুতিমান শুক্র এবং কর্কট রাশিতে জ্যোতিষ্মান সূর্য্য দেদীপ্যমান। সূর্য্যকে একটি নক্ষত্রের মত প্রতীয়মান হইতেছে। দেহহীন রাহু কন্যারাশিকে এবং কবন্ধ কেতু মীনরাশিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। পৃথিবীর খানিকটা অংশে ঘনকৃষ্ণ মসীরেখার মত শ্রাবণের পুঞ্জীভূত মেঘমালা, তাহাতে বিসরণশীল বিদ্যুৎ-স্ফুরণ দেখা যাইতেছে। অ্যাথেনা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পৃথিবীর দিকেই চাহিয়া আছেন। চিরন্তনী ক্রন্দসীর অবরুদ্ধ ক্রন্দন-ধ্বনি মহাশূন্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

অ্যাথেনা। গ্রীসকে মনে পড়ছে, মনে পড়ছে অ্যাথেন্সকে, মনে পড়ছে অ্যাথেন্সের অ্যারিওপ্যাগাস্‌কে। [কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া] অ্যাথেন্সবাসীরা এখনও প্যান্‌থেনিয়া উৎসব করে কি? এখনও কি আমি তাদের কাছে সত্য?

সহসা মহাশূন্যে উড্ডীয়মান বিহঙ্গমের পক্ষ-বিধূনন-শব্দ শোনা গেল। ক্ষণপরেই এক বিরাট ময়ূরপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দিবাকান্তি হীরা দেবী আবির্ভূত হইলেন এবং অ্যাথেনাকে দেখিয়া ময়ূরের গতিরোধ করিলেন।

হীরা। খবর শুনেছ অ্যাথেনা?

অ্যাথেনা। কি?

হীরা। আমার সপত্নীরা এখনও কেউ মরে নি।

অ্যাথেনা। আকাশ-দেবতা জিউস-পত্নীরা যে অমর! কেন, হ'ল কি?

হীরা। তাঁরা সবাই সদলবলে স্বামীসন্নিধানে এসেছেন।

অ্যাথেনা। সদলবলে, মানে?

হীরা। সন্তানসন্ততি-সহ। হোরি মোরিদের নিয়ে থেমিস, চ্যারিটিদের নিয়ে ইউরিনোম, পার্সেফনকে নিয়ে ডেমিটির, মিউজদের নিয়ে নেমোসাইন, অ্যাফ্রোডাইটিকে নিয়ে ডাওনি, এমন কি লেটো—যাকে সবচেয়ে ঘৃণা করি আমি, সেও এসেছে অ্যাপোলো আর আর্টেমিসকে নিয়ে।

অ্যাথেনা। কেন, ব্যাপার কি?

হীরা। পৃথিবীতে আবার যুদ্ধ বেধেছে।

অ্যাথেনা। যুদ্ধ? অ্যাকিলিস, হেক্টর, এজাক্স, প্যারিস, অ্যাগামেম্‌নন এরা তো বহুদিন হ'ল ম'রে গেছে, আবার যুদ্ধ করবে কে?

হীরা। পৃথিবী উর্ব্বরা, নূতন বীর জন্মেছে আবার।

অ্যাথেনা। অসম্ভব।

হীরা। অসম্ভব নয় অ্যাথেনা, এমন সব বীর জন্মেছে শুনলাম, যারা জলে স্থলে আকাশে সর্ব্বত্র যুদ্ধ করছে। আকাশ-দেবতা জিউস আর জল দেবতা

পসিডোনের-কর্তৃত্ব বুঝি আর থাকে না, হেডিসেরও রাজত্ব যায়-যায়, মানুষ পাতালেও প্রতাপ বিস্তার করছে।

অ্যাথেনা। তারাই তা হ'লে আবার জন্মগ্রহণ করেছে। পুরাতনরাই নূতন নাম নিয়ে নূতনত্বের দাবি করছে। [সহসা] আমার যেতে ইচ্ছে করছে আবার।

হীরা। কোথায় ?

অ্যাথেনা। গ্রীসে। তোমরা আমাকে বাণী-বিদ্যাদায়িনী বানিয়েছ, কিন্তু জিউসের মস্তক বিদীর্ণ ক'রে যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম, সেদিন আমার কণ্ঠে ছিল যুদ্ধের হুঙ্কার। মনে নেই ট্রয়ের যুদ্ধ ?

হীরা। সব মনে আছে, তার আগের ঘটনা সোনার আপেলের গল্প—তাও মনে আছে [হাসিলেন] আমি এখন চললাম।

অ্যাথেনা। কোথায় ?

হীরা। দূরে, অনেক দূরে—জালের বাইরে।

অ্যাথেনা। [সবিস্ময়ে] জালের বাইরে ! মানে ?

হীরা। আমার সপত্নীরা খবর এনেছেন যে, পৃথিবীর বীরদর্পে শুধু মর্ত্ত্য নয়, স্বর্গেরও সমূহ বিপদ আসন্ন, জিউস যদি অবিলম্বে এর কোন প্রতিকার না করেন, কিছু আর থাকবে না।

অ্যাথেনা। জিউস কি করছেন ? অ্যাফ্রোডাইটিকে পাঠাচ্ছেন মর্ত্ত্যে ?

হীরা। মর্ত্ত্যের যে বীরপুরুষটি সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর, তিনি নাকি নারী-মোহ-মুক্ত, সুন্দরী পাঠালে কোন ফল হবে না।

অ্যাথেনা। তা হ'লে তো সত্যিই চিন্তার কথা, কি করছেন তা হ'লে জিউস ?

হীরা। লেটোর পরামর্শে তিনি এক অদ্ভুত কাজ করছেন।

অ্যাথেনা। কি ?

হীরা। পৃথিবীর যত বড় বড় কবিদের আমন্ত্রণ ক'রে এক সভার আয়োজন করেছেন এর প্রতিবিধানকল্পে।

অ্যাথেনা। কবিদের ?

হীরা। হ্যাঁ, কেবল মৃত কবিদের, জীবিতদের নয়, ঔপন্যাসিক, বক্তা, চিত্রকর, ভাস্করদেরও নয়, কেবল যাঁরা ছন্দে বেঁধে কাব্য লিখেছেন তাঁদের সভা হবে।

অ্যাথেনা। কেন, ঔপন্যাসিক, বক্তা, চিত্রকর, ভাস্কর এঁরাও তো এক হিসেবে কবিই ?

হীরা। [সশ্লেষে] তোমার হিসেব আর লেটোর হিসেব এক নয়। লেটো বলেছে ছান্দিক কবিদের সভা হোক, সুতরাং তাই হবে, তোমার বা আমার কথা টিকবে না, তুমি যেন বলতে যেও না কিছু, আমার মত অপমানিত হবে। বহুকাল পরে লেটোকে পেয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন জিউস।

অ্যাথেনা। কিন্তু কবিদেরই বা একসঙ্গে পাবেন কি ক'রে জিউস ? কে কোন্ লোকে ভেসে বেড়াচ্ছেন তার ঠিক আছে কি !

হীরা। তাই তো জাল পাতা হচ্ছে।

অ্যাথেনা। বুঝতে পারছি না ঠিক।

হীরা। আলোর জাল পাতা হবে সারা আকাশ জুড়ে, আর তার বাইরে হবে স্বর্গীয় সঙ্গীত। কবিরা গান শুনে আসবেন আর জালে আটকে যাবেন।

অ্যাথেনা। গান গাইবে কে ?

হীরা। মিউজরা আর আর্টেমিস।

অ্যাথেনা। আর্টেমিস মানে, ডায়ানা ?

হীরা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডায়ানা, গ্রীক নাম পছন্দ হচ্ছে না বুঝি। তোমাকে মিনার্ভা ব'লে ডাকতে হবে নাকি ? আমাকে কেউ জুনো বললে তো গা জ্বালা করে আমার।

অ্যাথেনা। তুমি পালাচ্ছ কেন ?

হীরা। সপত্নীদের কৃতিত্ব চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দেখব ! চল, তুমিও চল।

অ্যাথেনা। সারা আকাশ জুড়ে জাল পাতা হবে বলছ, কোথায় যাব ?

হীরা। যত বড় জালই হোক তার সীমা আছে, আকাশ কিন্তু অসীম। আমরা জালের বাইরে গিয়ে দাঁড়াই চল।

অ্যাথেনা। কেন?

হীরা। সব পণ্ড ক'রে দেব। জিউস আকাশের সম্রাট, কিন্তু আমিও আকাশের সম্রাজ্ঞী, আমাদের উভয়ের অনুমতি ব্যতীত কোন বিষয়ের শেষ মীমাংসা হতে পারে না।

অ্যাথেনা। তার জন্যে বাইরে যাবার দরকার কি?

হীরা। ওই মিউজদের আমি বিশ্বাস করি না, ওরা সাইরেন, ওরা মায়াবিনী, হয়তো হঠাৎ মুগ্ধ ক'রে ফেলবে আমাকে, হয়তো ওদের মতে মত দিয়ে ফেলব।

অ্যাথেনা। মত দিয়ে ফেললেই বা ক্ষতি কি? পৃথিবী যদি বিপন্ন হয়ে থাকে, গ্রীসও বিপন্ন হয়েছে। গ্রীসের প্রতি এতটুকু মায়া নেই তোমার?

হীরা। গ্রীসের প্রতি? না, এতটুকু না, গ্রীস কি আমাকে বুঝেছিল কোন দিন? তারা কোথাও আমার পূজো করত তক্তা খাড়া ক'রে, কোথাও বা কাঠের গুঁড়ি, কোথাও বা থাম। আমায় কিছু বুঝেছিল ভাস্কর পলিক্লিটাস, তাও সম্পূর্ণ নয়। [সক্ষোভে] আমার নিজের স্বামীই বুঝলে না আমাকে, অপরে কি বুঝবে! চল যাই, ওরা এসে পড়বে এখনই।

অ্যাথেনা। আমি যাব না।

হীরা। তবে থাকো আমি যাই।

হীরার ইঙ্গিত পাইয়া ময়ূর পাখা বিস্তার করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল। অ্যাথেনা কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অ্যাথেনা। যুদ্ধ হচ্ছে! কেন? হেলেন আবার জন্মাল নাকি? না, চুপ ক'রে থাকলে চলবে না, হীরার ভাবভঙ্গি ভাল নয়, জিউসকে সাবধান ক'রে দেওয়া উচিত।

অন্তর্হিত হইলেন। ক্ষণপরেই বিস্তৃত আকাশপটে সূক্ষ্ম স্বর্ণতন্তুসন্নিভ অসংখ্য আলোকরেখা পরিস্ফুট হইল এবং দেখিতে দেখিতে এক বিরাট জ্যোতির্ময় জালক অন্ধকার মহাশূন্যে দিগদিগন্ত

ব্যাপিয়া দুলিতে লাগিল। জালের বাহিরে রূপসী মিউজগণ ডায়েনা সমভিব্যাহারে একে একে আবির্ভূত হইলেন। প্রত্যেকের হস্তে একটি করিয়া 'লায়ার', প্রত্যেকেরই অঙ্গে সুস্থ গ্রীক সৌন্দর্য্য, প্রত্যেকের পরিধানে নাতিবহুল গ্রীক পরিচ্ছদ, সুন্দর বিশিষ্ট অনাড়ম্বর। ধীরে ধীরে তাঁহারা সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। ক্রমশ সমস্ত অন্তরীক্ষ উদাত্ত গম্ভীর মহৎ এবং মধুর সুরসম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে দূরে কয়েকটি ছায়ামূর্ত্তি অস্পষ্টভাবে দেখা গেল, নিকটবর্ত্তী হইলে বোঝা গেল পাঁচজন, দুইজন আগাইয়া আসিলেন, তিনজন একটু পিছাইয়া রহিলেন। তাঁহাদের আকৃতি যে কি, তাহা বোঝা গেল না। একটা ঘন কুয়াশা যেন প্রত্যেককে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, এবং সেই কুয়াশা ভেদ করিয়া একটা অপরূপ দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইতেছে।

প্রথম ছায়ামূর্ত্তি। মহাশূন্যে জ্যোতির্ম্ময় এ কি অপূর্ব্ব প্রকাশ!

দ্বিতীয় ছায়ামূর্ত্তি। যিনি দেবতাগণের জন্ম ও শক্তির হেতু, যিনি হিরণ্যগর্ভের জনক, তাঁরই এ নূতন লীলা।

প্রথম ছায়ামূর্ত্তি। কে আপনি?

দ্বিতীয় ছায়ামূর্ত্তি। আমি? আমিও তাঁরই প্রকাশ মাত্র।

প্রথম ছায়ামূর্ত্তি। আপনার পরিচয় পেতে পারি কি?

দ্বিতীয় ছায়ামূর্ত্তি। অসংখ্য আমার পরিচয়, কোন্‌টা বলব, ব'লে লাভই বা কি?

প্রথম ছায়ামূর্ত্তি। আপনি মর্ত্ত্যবাসী ছিলেন নিশ্চয়?

দ্বিতীয় ছায়ামূর্ত্তি। ছিলাম, মর্ত্ত্যে শ্বেতাশ্বেতর নামে একটা উপনিষদও রচনা করেছিলাম, মর্ত্ত্যে তাই আমার পরিচয়। [অর্দ্ধ স্বগত] জানি না, সে গ্রন্থ এখনও আছে কি না!

প্রথম ছায়ামূর্ত্তি। উপনিষদের ঋষি আপনি! আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

দ্বিতীয় ছায়ামূর্ত্তি। [নমস্কারান্তে] আপনি কে?

প্রথম ছায়ামূর্ত্তি। আমি দ্বৈপায়ন, কেউ কেউ বেদব্যাসও বলে আমাকে।

দ্বিতীয় ছায়ামূর্ত্তি এ পরিচয়ে বিশেষ বিচলিত হইলেন না, মনে হইল, যেন চিনিতে পারিলেন না।

তিনি নীরবে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং একটু দূরে সরিয়া গেলেন। তৃতীয় ছায়ামূর্ত্তি প্রথমের নিকট সরিয়া আসিলেন।

তৃতীয় ছায়ামূর্ত্তি। কি অপূর্ব্ব সঙ্গীত! এই সঙ্গীতের ঠিক সুরটি ধরবার সাধনায় দিবারাত্রি অতিবাহিত করেছিলাম একদিন, কিন্তু কিছুই করতে পারি নি, কিছুই হয় নি।

প্রথম ছায়ামূর্ত্তি। আপনি কে?

তৃতীয় ছায়ামূর্ত্তি। হোমার।

প্রথম ছায়ামূর্ত্তি চিনিতে পারিলেন না।

বেদব্যাস। সত্যিই অপূর্ব্ব সঙ্গীত, আমরা সম্ভবত কিন্নরলোকের সমীপবর্ত্তী হয়েছি।

উপনিষদের ঋষি। [মৃদুকণ্ঠে আপন মনে]

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষস্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ।

হোমার। কি অপূর্ব্ব সুর!

বেদব্যাস। শুধু সুর নয়, আকাশপটে বিলম্বিত আলোক-রেখা-রচিত ওই জালটিও অপূর্ব্ব।

হোমার। আমি অন্ধ, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

অসহায়ভাবে ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন। চতুর্থ ছায়ামূর্ত্তি আগাইয়া আসিলেন।

চতুর্থ ছায়ামূর্ত্তি। কি অপরূপ দৃশ্য, কি সুমধুর সঙ্গীত! বিরহী শ্রীরামচন্দ্রের দুঃখ-অপনোদন মানসে পম্পাতীরে বসন্তবর্ণনা-প্রসঙ্গে সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীতের অবতারণা করেছিলাম মনে পড়ছে, কিন্তু এ কি দেখলাম আজ, এ কি শুনলাম, এ যে কল্পনাতীত!

বেদব্যাস। পম্পাতীরে! আপনি কি তা হ'লে আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী?

চতুর্থ ছায়ামূর্ত্তি। [সগর্ব্বে] হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, মহেন্দ্রধ্বজসঙ্কাশ গূঢ়জত্রু শ্রীরামচন্দ্রের পদরেণুপবিত্র আর্য্যাবর্ত্তই আমার মর্ত্ত্যবাস ছিল।

বেদব্যাস। আপনার পরিচয় জানতে বাসনা করি। আমিও ভারতবর্ষীয়।

চতুর্থ ছায়ামূর্ত্তি। মর্ত্ত্যলোকে আমি রত্নাকর নামে পরিচিত ছিলাম।

বেদব্যাস। কবিগুরু বাল্মীকি!

সসম্ভ্রমে নমস্কার করিলেন।

বাল্মীকি। [প্রতিনমস্কারান্তে] গুরুভার বহন করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা-কীর্ত্তন করবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম একদিন, তাই আমার পরম সৌভাগ্য, আর কিছু কামনা করি না। আপনি কে?

বেদব্যাস। আমি আপনার পরবর্ত্তী, আমার নাম দ্বৈপায়ন। পম্পা হ্রদকে মনে আছে এখনও আপনার?

বাল্মীকি। মনে আছে বইকি। তার তীরে সেই কর্ণিকার, সিন্ধুবার, মাতুলুঙ্গ, কোবিদার পুষ্পের শোভা, তার নীরে মধুকর-ভূষিত কমলকুল, অদূরে শিখী-শিখিনীর নৃত্য, দাত্যূহের করুণ কণ্ঠস্বর, সেই অঙ্কোল, কুরুণ্ট, চূর্ণক বৃক্ষরাজি, সেই শ্যামাকান্তি ঋষ্যমূক পর্ব্বত—এসব কি ভুলতে পারি কখনও! [একটু থামিয়া] কিন্তু আকাশপটে আজ এ কিসের ছবি, ওই সুন্দরীরা কে? এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতের হেতু কি?

উপনিষদের ঋষি। [যেন আপন মনে উত্তর দিলেন]

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।

হোমার কান পাতিয়া মিউজদের সঙ্গীত শুনিতেছিলেন।

হোমার। [মাথা নাড়িয়া] হেক্সা মিটারে ঠিক এই সুর ফোটানো অসম্ভব। না, আমি পারি নি।

পঞ্চম ছায়ামূর্ত্তি নিকটবর্ত্তী হইলেন।

পঞ্চম ছায়ামূর্ত্তি। এ কি মনোহর চিত্র, এ কি স্বর্গীয় ঐক্যতান। গন্ধমাদনবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্যকান্তমণি-নির্ম্মিত পাত্রে কল্পতরুর আসব পান

ক'রেও তো এ অভিনব-সৃষ্টির কল্পনা করতে পারবেন না। কোন্ শিল্পীর সৃষ্টি এ?

কেহ উত্তর দিলেন না। বেদব্যাস ফিরিয়া দেখিলেন এবং নিকটে সরিয়া আসিলেন।

বেদব্যাস। আপনি কি ভারতভূমি থেকে আসছেন?

পঞ্চম ছায়ামূর্ত্তি। এসেছি অনেক দিন। এত দিন যে, আমি কবে কোথায় জন্মেছি, তা এখন পণ্ডিতদের তর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেদব্যাস। ও, পণ্ডিতরা শ্রান্ত হন নি এখনও আপনার সম্বন্ধে! তা হ'লে আপনি আধুনিক। আপনার নামটি জানতে পারি কি?

পঞ্চম ছায়ামূর্ত্তি। কালিদাস দেবশর্ম্মণঃ।

বেদব্যাস। ভারতভূমির কোন্ অঞ্চলে ছিলেন আপনি?

কালিদাস। উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলাম।

বেদব্যাস কালিদাসকে অর্ব্বাচীন মনে করিয়াই সম্ভবত আর বাক্যালাপ করিলেন না। বাল্মিকী, হোমার এবং উপনিষদের ঋষি ইতিমধ্যে দূরে সরিয়া একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। বেদব্যাসও তাহাই করিতে লাগিলেন। কালিদাস একা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কালিদাস। এ দিব্যাঙ্গনাগুলি কে? গন্ধর্ব্বকন্যা, কিন্নরী, দেববালা, না মানবী? আশ্চর্য্য রূপ, আশ্চর্য্য কণ্ঠস্বর!

দেখিতে দেখিতে দূরে সরিয়া গেলেন। ইহার ঠিক পরেই আরও তিনজন আসিলেন। ইঁহাদেরও চারিদিকে একটা কুয়াশার আবরণ, কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ বলিয়া লোকগুলিকে চেনা যায়। শ্যামবর্ণ ছিপছিপে গড়ন দেখিয়া ভার্জ্জিলকে, লম্বা মুখ, ভারী চোয়াল, বহির্ম্মুখী পুরু অধর, সম্মুখে-ঈষৎ-ঝুঁকিয়া-পড়া দেহ, শুকচঞ্চু নাসা, ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ, চাপ দাড়ি, গম্ভীর বিষণ্ণ বদন, শান্ত গমনভঙ্গি দেখিয়া দান্তেকে এবং 'কলার' দেখিয়া শেক্স্পিয়ারকে চিনিতে বিলম্ব হয় না। শেক্স্পিয়ার আড়চোখে একবার ভার্জ্জিলকে, একবার দান্তেকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। দান্তে গভীর ঔদাসীন্যভরে কাহাকেও এবং কিছুই দেখিতেছিলেন না। ভার্জ্জিল অবাক হইয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

ভার্জ্জিল। বাই থিওক্রিটাস—এ যে—

কথা শেষ করিতে পারিলেন না, চাহিয়া রহিলেন। দান্তে এতক্ষণ কাহারও দিকে চাহিয়া দেখেন নাই, এই উচ্ছ্বাসোক্তিতে তাঁহার দিকে ফিরিয়া দেখিলেন এবং ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন।

শেক্‌স্পিয়ার। [ভার্জিলকে থিয়েটারি কায়দায় অভিবাদন করিয়া] আপনার মত একজন সুরসিক ব্যক্তির পরিচয় লাভ করবার সৌভাগ্য হবে কি আমার ?

ভার্জিল। আমার পরিচয় ? আমি একজন কেল্‌ট চাষার ছেলে, ইটালির বাইরে মান্‌টুয়াতে জন্ম হয়েছিল আমার।

দান্তের ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইল।

শেক্‌স্পিয়ার। চাষার ছেলে ? হ'লেই বা! অন্যে বলে, আমি নাকি কসাইয়ের ছেলে। [সগর্বে] অথচ আমার বাবার যে কোর্ট অব আর্ম্‌স ছিল তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। আপনি কার ছেলে তা জেনে অবশ্য সুখী হলাম, কিন্তু আপনার পরিচয় জানবার কৌতূহল আমি সম্বরণ করতে পারছি না।

ভার্জিল। [সহাস্যে] আমি গেঁয়ো মানুষ, পিতার পরিচয়েই নিজের পরিচয় দিয়ে থাকি। [একটু চুপ করিয়া থাকিয়া] আমার বাবা চাষা ছিলেন বটে, কিন্তু অবস্থা নেহাত খারাপ ছিল না আমাদের। আমাদের চাষবাস ছাড়া বনকর ছিল, মৌমাছি পালন করতাম আমরা, বাবা আমাকে লেখাপড়া শিখতে প্রথমে ক্রিমোনা, তারপর মিলানে পাঠান।

শেক্‌স্পিয়ার। [বিস্ময়ের অভিনয় করিয়া] ও, তা হ'লে মস্ত বড় একজন বিদ্বান ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হ'ল আমার!

ভার্জিল। বিদ্বান ব'লে কিন্তু কোন খ্যাতি হয় নি আমার, আমার সামান্য যা খ্যাতি তা কবি হিসেবে।

শেক্‌স্পিয়ার। তাই বলুন।

থিয়েটারি কায়দায় পুনরায় অভিবাদন করিলেন। দান্তের ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইল

শেক্‌স্পিয়ার। আপনি কবি! এর চেয়ে বড় পরিচয় মানুষের আর হতে পারে না।

ভার্জিল। [সসঙ্কোচে] সামান্য গ্রাম্য কবি আমি, আমার একলোগ্‌স—

দান্তে। একলোগ্‌স!

ভার্জিল। হ্যাঁ, এক্‌লোগ্‌স ব'লে একটা কবিতাগুচ্ছ আছে আমার, আসেনিয়াস পোলিও অবশ্য প্রশংসা করেছিল বইটার—

দান্তে। জর্জিক্‌স, ইনিড কি আপনারই লেখা?

ভার্জিল। হ্যাঁ, ও বই দুটো পরে লিখি। জর্জিক্‌সটা অক্টেভিয়াসকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে, আর ইনিডটা অগাস্টাসের ফরমাশে লিখতে হয়েছিল, কিন্তু—

দান্তে। আপনি ভার্জিল?

ভার্জিল। [চোখ-মিটিমিটি করিয়া] হ্যাঁ? আপনি, আপনাকে তো ঠিক—

দান্তে সহসা নতজানু হইয়া অভিবাদন করিলেন। শেক্‌স্পিয়ার shrug করিয়া একটু সরিয়া গেলেন

দান্তে। আপনি আমার আদর্শ, আপনারই কৃপায় সংসারের জটিল অরণ্যে পথ খুঁজে পেয়েছি আমি, আমার কমেডিয়াতে আপনিই প্রথম পথপ্রদর্শক, বিয়াত্রিচের কাছে আপনিই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছেন আমাকে—

ভার্জিল। আমি! কই, আমার তো কিছুই মনে নেই!

দান্তে। [উঠিয়া দাঁড়াইলেন] মানুষ ভার্জিলকে আমি দেখেছি, শুধু দেখি নি, পূজা করেছি।

শেক্‌স্পিয়ার একটু দূরে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উভয়কে লক্ষ্য করিতেছিলেন। সহসা যেন কি একটা কথা মনে পড়িয়া যাইতে আগাইয়া আসিলেন

শেক্‌স্পিয়ার। যদি অনুমতি দেন—আচ্ছা থাক, আপনাদের আলাপে বাধা দেব না।

ভার্জিল। কি বলুন?

শেক্‌স্পিয়ার। আপনি কি জুলিয়াস সীজারকে দেখেছিলেন?

ভার্জিল। দেখেছিলাম বইকি, তাঁকে যখন খুন করে, তখন আমি রোমে রেটরিক আর ফিলজফি পড়ছি।

শেক্‌স্পিয়ার। লোকটা আসলে কি রকম ছিল বলুন তো?

ভার্জিল। ট্রায়াম্‌ভিরেটের সবাই যেমন তেমনই। বাইরে হিতৈষী জননায়ক, অন্তরে অহঙ্কারী ক্ষমতাপ্রিয় স্বার্থপর।

শেক্‌স্পিয়ার। ও!

ভার্জিল। হঠাৎ তার কথা মনে পড়ল কেন?

শেক্‌স্পিয়ার। শেক্‌স্পিয়ার ব'লে একজন নাট্যকার তাকে মস্ত একটা হিরো খাড়া ক'রে নাটক লিখেছে একখানা। আপনাকে দেখে হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল কথাটা।

দান্তে। [ভার্জিলকে] আপনি এখানে কেন?

ভার্জিল। সুরের টানে চ'লে এলাম। তুমি?

দান্তে। আমি? আমি ঘুরেই বেড়াচ্ছি কেবল। পৃথিবীতে শেষজীবনটা এর ওর তার দুয়ারে ঘুরেছি, ম'রেও শান্তি পাই নি, প্রেতের মত মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখানে কেন এসেছি জানি না, হয়তো সুরেরই মোহে, হয়তো—

ভার্জিল। এমন উদ্‌ভ্রান্ত কেন তুমি?

দান্তে। পৃথিবীতে বড় কষ্ট পেয়ে এসেছি। [সহসা] জানেন, কবর থেকে তুলে আমার হাড়গুলো পর্য্যন্ত পুড়িয়ে দিত ওরা, যদি র‍্যাভেনার নাগরিকরা বাধা না দিত?

ভার্জিল। [স্নেহভরে শান্তকণ্ঠে] মর্ত্ত্যের কথা ভুলে যাও, চল, গান শুনবে চল, এস।

ভার্জিলের পিছু পিছু দান্তে দূরে চলিয়া গেলেন। শেক্‌স্পিয়ার কোমরে হাত দিয়া আকাশের দৃশ্যটা দেখিতে লাগিলেন

শেক্‌স্পিয়ার। মন্দ নয়। যদি সুযোগ থাকত, তা হ'লে—এ আবার কে?

অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে অন্ধ মিল্টন প্রবেশ করিলেন

মিল্টন। [অর্দ্ধ-স্বগত]

A little onward lend thy guiding hand
To those dark steps, a little farther on.

শেক্‌স্পিয়ার। কে আপনি?

মিল্টন। আপনি কে, পাব্লিক অফিসার?

শেক্‌স্পিয়ার। বাই জোভ, না। এখানে পাব্লিক কোথায় যে পাব্লিক অফিসার থাকবে?

মিল্টন। এটা কি Prison in Gaza নয়?

শেক্‌স্পিয়ার। এখানে prisonও নেই, tavernও নেই। একটা tavern খুঁজে খুঁজে হায়রান হয়ে গেছি, কোথাও কিছু নেই।

মিল্টন। গান শুনে মনে হচ্ছিল, বুঝি Gazaর prisonএর কাছাকাছি festival হচ্ছে। Samson Agonistesএ যা কল্পনা করেছিলাম, তাই বুঝি হঠাৎ বাস্তব মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। এ জায়গাটা তা হ'লে কি Chaos?

শেক্‌স্পিয়ার। কি যে তা জানি না ঠিক।

মিল্টন। আপনিও আমার মত অন্ধ নাকি?

শেক্‌স্পিয়ার। অন্ধ নই, কিন্তু মনে হচ্ছে, হ'লে ভাল হ'ত, এমন কল্পনা আর বাস্তবের দোটানায় পড়তে হ'ত না। চোখ থেকে মুশকিল হয়েছে, দেখছি এক রকম, মনে হচ্ছে আর এক রকম।

মিল্টন। কি দেখছেন?

শেক্‌স্পিয়ার। দেখছি, অন্ধকার মহাশূন্যে গ্রহনক্ষত্র জ্বলছে, রূপসী যুবতী কয়েকজন গান গাইছেন, আর তাঁদের সামনে দুলছে বিরাট একটা আলোর জাল, মনে হচ্ছে, অনেকগুলো বিদ্যুৎ যেন স্থির হয়ে গেছে হঠাৎ একসঙ্গে।

মিল্টন। [সাগ্রহে] আলো! আলোর জাল!

শেক্‌স্পিয়ার। হ্যাঁ।

মিল্টন। কি মনে হচ্ছে আপনার?

শেক্‌স্পিয়ার। প্রথমেই মনে হয়েছিল, সুযোগ থাকলে আমার মিডসামার নাইট্‌স ড্রীমে এই সীনটা ঢুকিয়ে দিতাম।

মিল্টন। মিড্ সামার নাইট্‌স ড্রীম! আপনি কে?

শেক্‌স্পিয়ার। উইলিয়াম শেক্‌স্পিয়ার।

মিল্টন। শেক্‌স্পিয়ার! [দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া] কই, কোথা আপনি?

শেক্‌স্পিয়ার। এই যে, কেন?

একটু সরিয়া আসিতেই মিল্টন তাঁহাকে আবেগভরে জড়াইয়া ধরিলেন

শেক্‌স্পিয়ার। [স্বগত] আহা, লোকটা যদি মেরী ফিটন হ'ত!

মিল্টন। আপনাকে যে এমন ভাবে পাব, তা কোন দিন কল্পনাও করি নি আমি। জানেন, সাহিত্য-জগতে আমার প্রথম প্রবেশ আপনার সেকেণ্ড ফোলিও এডিশনে।

শেক্‌স্পিয়ার। আমার নাটকের এডিশন হয়? বেন জন্‌সন বলত—

হঠাৎ উত্তেজিতভাবে গেটে আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং ইঁহাদের উপস্থিতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া লুব্ধদৃষ্টিতে মিউজদের দিকে চাহিয়া রহিলেন

শেক্‌স্পিয়ার। [অর্দ্ধস্বগত] লোকটি রসিক আছে।

গেটে। [আপন মনে] গ্রেট চেন্? ক্যাথারিন? ফ্রেডারিক? বুফ্? লারোচে? স্টীন? ভুলপিয়াস? মেরিয়েন? [কিছুক্ষণ দেখিয়া] না, এরা তারা নয়।

শেক্‌স্পিয়ার আগাইয়া গেটের কাছে গেলেন। মিল্টন কেমন যেন তন্ময় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার ঠোঁট নড়িতে লাগিল, মনে হইল, যেন তিনি মনে মনে কিছু আবৃত্তি করিতেছেন

শেক্‌স্পিয়ার। [ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গীতে] যদি অনুমতি করেন—

গেটে। [ঘাড় ফিরাইলেন] আমাকে বলছেন?

শেক্‌স্পিয়ার। হ্যাঁ।

গেটে। কি বলুন?

শেক্‌স্পিয়ার। আপনি এখনই যে সুমিষ্ট নামগুলি উচ্চারণ করলেন, সেগুলি কি ওই সুন্দরীদের নাম? ওঁদের সম্বন্ধে আমারও কৌতূহল কিঞ্চিৎ উদ্রিক্ত হয়েছে।

গেটে। আমি যাঁদের নাম করলাম, তাঁরা মর্ত্ত্যলোকে আমার প্রণয়িনী ছিলেন।

শেক্স্পিয়ার। এতগুলি !

গেটে। আপনি বায়োলজি পড়েছেন ?

শেক্স্পিয়ার। না।

গেটে। পড়লে বিস্মিত হতেন না। কোথা বাড়ি ছিল আপনার ?

শেক্স্পিয়ার। ইংল্যাণ্ডে।

গেটে। ইংল্যাণ্ডে, তাই। জার্মেনিতে হ'লে এত বিস্মিত হতেন না। একটু পরে] অবশ্য ইংল্যাণ্ডে একটি লোক ছিলেন, তিনিও বিস্মিত হতেন না।

শেক্স্পিয়ার। কে তিনি ?

গেটে। উইলিয়াম শেক্স্পিয়ার।

শেক্স্পিয়ার। ও।

গেটে মিউজদের দিকে চাহিতে চাহিতে দূরে সরিয়া গেলেন

শেক্স্পিয়ার। চলুন, মিস্টার—ভাল কথা, আপনার নামটাই জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

মিল্টন। জন মিল্টন।

শেক্স্পিয়ার। চলুন মিস্টার মিল্টন, একটু অগ্রসর হওয়া যাক। ও কি, আপনি খোঁড়াচ্ছেন কেন ?

মিল্টন। গাউট আছে আমার।

উভয়ে অপসৃত হইলেন। গান করিতে করিতে বিদ্যাপতির প্রবেশ

বিদ্যাপতি। কত চতুরানন মরি মরি যাওত

ন তুয়ে আদি অবসানা

তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত

সাগর-লহরী সমানা

বিপরীত দিক দিয়া চণ্ডীদাসের প্রবেশ

চণ্ডীদাস। ওই, বিদ্যাপতি নাকি হে?

বিদ্যাপতি। [সবিস্ময়ে] চণ্ডীদাস!

চণ্ডীদাস। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

বিদ্যাপতি। তার মানে?

চণ্ডীদাস। এ দেবলোকেও তোমাকে দেখে যতটা আনন্দ পেলাম, এমন আর কিছুতে পাই নি ভাই, এমন কি ওই দেবীদের দেখেও না।

বিদ্যাপতি। তবু চল, তামাসাটা দেখাই যাক।

চণ্ডীদাস। হ্যাঁ, দেখতে হবে বই কি।

উভয়ে সরিয়া গেলেন। গল্প করিতে করিতে শেলী ও কীট্‌স প্রবেশ করিলেন। শেলী তাঁহার দীর্ঘ অবিন্যস্ত চুলে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিয়া সেগুলিকে আরও অবিন্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন

কীট্‌স। সত্যি?

শেলী। হ্যাঁ, সত্যি। এরিয়েল ডুবে গেল, আমি তলিয়ে গেলাম, তোমার কবিতার বইটা পকেটে ছিল আমার, তারপর কিছুদিন পরে ভেসে উঠলাম; বায়রন, লে হাণ্ট, ট্রেলনি সমুদ্রের ধারে চিতা সাজিয়ে আমার শবটাকে মদে ভিজিয়ে পুড়িয়ে ফেললে।

কীট্‌স। পুড়িয়ে ফেললে?

শেলী। পুড়িয়ে ফেললে।

কীট্‌স। কিন্তু তুমি তো ঠিক তেমনই আছে দেখছি।

শেলী হাসিয়া উঠিলেন

শেলী। ওরা পাগল, তাই পোড়াবার চেষ্টা করেছিল আমাকে। আগুনকে কখনও পোড়ানো যায়? [কীট্‌সের চিবুক ধরিয়া] অ্যাডোনিস কখনও মরে? [সহসা] হ্যাঁ, একটা কথা শুনেছ? প্রমেথিউস আবার বন্দী হয়েছে, আবার ঈগলে তার লিভার ছিঁড়ে খাচ্ছে।

কীট্‌স। তাই নাকি?

শেলী। খবরটা পেয়েই আমি জিউসের খোঁজে যাচ্ছিলাম।

কীট্‌স। কেন, জিউসের কাছে কেন?

শেলী। এবার জিউস তাকে বন্দী করে নি, করেছে ম্যামন। আমি ভাবছি, প্রমেথিউস ক্যান নেভার বি বাউণ্ড ব'লে আর একটা কবিতা লিখব।

কীট্‌স। কিন্তু এখানে ছাপাখানা আছে কি?

শেলী। সেইজন্যেই তো জিউসের কাছে যাচ্ছিলাম, তাঁকে বলব একটি সুন্দর পাখী সৃজন করুন আপনি, সোনার মত তার পালকের রং হবে; প্রবালের মত চঞ্চু, নীলকান্তমণির মত চোখ, কণ্ঠস্বর হবে অর্ফিউসের বাঁশীর মত সেই পাখী আমার কবিতা গেয়ে বেড়াবে পৃথিবীর আকাশে আকাশে।

কীট্‌স। [উৎসাহিত] চমৎকার হবে, কি বললেন জিউস?

শেলী। জিউসের কাছে যাওয়া হ'ল কই, এদের গান শুনে চ'লে এলাম। এরা কে বল তো?

কীট্‌স। জানি না। মনে হচ্ছে, যেন একটা নূতন ধরনের গ্রীসিয়ান আর্ন জীবন্ত হয়ে উঠেছে আকাশপটে!

শেলী। যা বলেছ, চল, আর একটু এগিয়ে ভাল ক'রেই দেখা যাক।

উভয়ে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ ওমর খৈয়াম প্রবেশ করিলেন। চলনে, দৃষ্টিতে, হাস্যে, গমনভঙ্গিমায় পাকা এপিকিউরানকে চেনা যাইতেছে। আকাশের দিকে চাহিয়া সহাস্য ভ্রূভঙ্গিসহকারে সুন্দরীদের একে একে তিনি নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন

ওমর খৈয়াম। শুধু কতকগুলো রঙিন পেয়ালা! সরাব কই?

মাথা নাড়িলেন, শুভ্র দাড়িতে একবার হাত বুলাইলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। ক্ষণপরেই অবনত মস্তকে চিন্তাকুল আননে কালো ফ্রক কোট ও পাঁশুটে রঙের ট্রাউজার পরিহিত আর এক ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রশস্ত শুভ্র উন্নত ললাট, রক্তাভ কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশদাম, রোম-লেশ-হীন পরিচ্ছন্ন মুখমণ্ডল, সুবর্ণ লোহিতাভ প্রতিভা-তীক্ষ্ণ চক্ষু, দৃঢ়নিবদ্ধ বঙ্কিম ওষ্ঠাধর। ভিক্টর হিউগো।

হিউগো। রোবেস্‌পেয়ার! রোবেস্‌পেয়ারের মতটাই কি ঠিক?

খানিকক্ষণ আনত-আননে চিন্তা করিলেন

বিদ্রোহ ? ভেঙে ফেলাটাই কি সব সময়ে সমীচীন ? কিন্তু এ কি—

সহসা মিউজদের সঙ্গীত থামিয়া গেল। একটা দূরাগত গম্ভীর বজ্রনির্ঘোষ ক্রমশ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে এক বিরাট ঈগলবাহিত স্বর্ণসিংহাসন উর্দ্ধলোক হইতে নামিয়া আসিল। সিংহাসনে সৌম্যমূর্ত্তি বজ্রপাণি আকাশদেবতা জিউস বসিয়া আছেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থেমিস, ইউরিনোম, ডেমিটির, পার্সেফন, নেমোসাইন, লেটো, অ্যাপোলো, ডাওনি, অ্যাফ্রোডাইটি এবং অ্যাথেনা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অ্যাপোলোর হাতে লরেলের একটি মুকুট (ডায়াডেম) রহিয়াছে। মিউজগণ এবং ডায়ানাও আসিয়া ইঁহাদের সহিত যোগ দিলেন ও জিউসের সিংহাসনের দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে সমাগত কবিগণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইলেন। হোমার ও মিল্টন কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু সঙ্গীত বন্ধ হইয়া যাওয়াতে তাঁহারা উভয়েই উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

জিউস। হে শ্রেষ্ঠ কবিগণ, আজ এক বিশেষ কারণে আপনাদের সকলকে একত্রিত করেছি, পৃথিবীর সমূহ বিপদ সমুপস্থিত, ক্ষিপ্ত মানবগণ নৃশংস হিংস্রতায় পুনরায় সভ্যতাকে ক্ষতবিক্ষত ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলছে, জল স্থল অন্তরীক্ষ কোথাও শান্তি নেই। আপনারা কবি, আপনারা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, আপনারা নিয়ামক, আপনারাই মানব-সমাজের প্রকৃত নেতা। আপনারা এক সভা আহ্বান ক'রে এর প্রতিবিধানের চেষ্টা করুন। এ যুদ্ধ নিবারণ করা দেবতার সাধ্যাতীত, কারণ দেবতার প্রতি মানবেরা আস্থা হারিয়েছে। সুন্দরীশ্রেষ্ঠা অ্যাপোলো-জননী লেটোর অভিমত—আপনাদের সাহায্য ব্যতীত এ সমরানল নির্ব্বাপিত করা অসম্ভব। শ্রীযুক্তা লেটোর ধারণা সুস্থ অসুস্থ সর্ব্বপ্রকার মানবই এখনও আপনাদেরই বশীভূত। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা এ বিষয়ে যত্নশীল হোন। এইবার সভাপতি নির্ব্বাচন করা যাক তা হ'লে। এ সভার সভাপতি-পদ কে অলঙ্কৃত করবেন ? অ্যাথেনা, তুমি কি বল ?

অ্যাথেনা। হোমার।

নেমোসাইন। হোমারকে এ সভার সভাপতি নির্ব্বাচন করা আমাদের পক্ষে অশোভন হবে, সকলে বলবে, আমরা পক্ষপাতিত্ব করেছি। আমি বাল্মীকির নাম প্রস্তাব করি।

থেমিস। আমার মতে এ সভায় বাল্মীকি অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি উপনিষদের ঋষি। উনিই ভারতীয় সভ্যতার প্রতীক।

ইউরিনোম। আমি বেদব্যাসকে আহ্বান করছি।

অ্যাফ্রোডাইটি। আমার কিন্তু পছন্দ মহাকবি কালিদাসকে। নর-নারীর সুখ-দুঃখের কবি উনি।

ডেমিটির। পৃথিবীর সুখ-দুঃখ, পৃথিবীর সভ্যতা নির্ভর করে কৃষকদের উপর। সুতরাং জর্জিক্সের কবি ভার্জিলকেই আমি সভাপতি-পদে বরণ করতে চাই।

প্রথম মিউজ। চণ্ডীদাসও গ্রাম্য কবি, ওঁর সুমিষ্ট সঙ্গীতে পাষাণও বিগলিত হয়, উনি ইচ্ছে করলে অনায়াসে এ কলহ নিবারণ করতে পারেন, এ সভার উনিই নেতা হোন।

দ্বিতীয় মিউজ। বিদ্যাপতিই বা কিসে কম?

পার্সেফন। তোমরা একটা বিষয়ে ভুল করছ, মধুরকণ্ঠ হ'লেই হবে না শুধু। যে পৃথিবী নরকে পরিণত হয়েছে, তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে স্বর্গসুষমা দান করতে হবে। কমেডিয়ার কবি দান্তে ছাড়া এ কাজ আর কেউ পারবেন না। তিনি শুধু কবি নন, যোদ্ধাও, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে তাঁর।

ষষ্ঠ মিউজ। জীবন-দর্শনের মহাকবি ওমর খৈয়ামকে আমি অভিবাদন করি। তিনিই এ ভার গ্রহণ করুন।

তৃতীয় মিউজ। স্বর্গ নরক স্বপ্ন বাস্তব বহুবিধ মানবের বহুবিধ সুখ-দুঃখ-আশা-আশঙ্কা বহুকালাবধি যিনি রঙ্গমঞ্চে মূর্ত্ত করেছেন, সেই শেক্স্পিয়ার থাকতে আর কি কারও সভাপতি হওয়া সম্ভব?

চতুর্থ মিউজ। গম্ভীর উদাত্ত সুরে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যিনি স্বচ্ছন্দে বিহার করেছেন, যিনি জীবনে কখনও কোন অন্যায়ের সমর্থন করেন নি, যাঁর নৈতিক আদর্শ মাউণ্ট অলিম্পাসের মতই ঋজু ও সমুন্নত, সেই মহাকবি মিল্টনকেই আমি এই সভায় সভাপতি-পদ বিভূষিত করতে অনুরোধ করি।

লেটো। আমি কিন্তু বরণ করতে চাই, কবি নাট্যকার দার্শনিক গেটেকে। তাঁর নাট্য-প্রতিভা যুগান্তকারী, গীতিকবিতা সুধানিষ্যন্দী, দর্শন চিরন্তন সত্য-সন্ধানী। তিনি শুধু ভাব-বিলাসী কবি নন, তিনি বৈজ্ঞানিকও। কৃষিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা সমস্তই আজীবন চর্চ্চা করেছেন তিনি, বহু দেশে ভ্রমণ করেছেন, যুদ্ধ করেছেন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে, রাজ্যশাসন করেছেন ডিউকের সহচররূপে—তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কে আছে এ সভায় ?

পঞ্চম মিউজ। কিন্তু এই যুদ্ধের কারণ বৃদ্ধ কুচক্রীদের স্বার্থপরতা। আমাদের আদর্শ যৌবন, প্রেম, মুক্তি, আর সে আদর্শের ধ্বজাবাহক মহাকবি শেলী। শেলী ছাড়া এ আদর্শ আর কে প্রচার করতে সক্ষম, তা তো আমি জানি না।

ডায়েনা। কীট্‌স।

ষষ্ঠ মিউজ। (সশ্লেষে) কেন, উনি এন্‌ডিমিয়নের কবি ব'লে ?

সপ্তম মিউজ। আমি আহ্বান করছি ওই উন্নতললাট প্রতিভা-প্রদীপ্ত ফরাসী মহাকবি ভিক্টর হিউগোকে। উনি শুধু শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক নন, উনি দীনদরিদ্রের বন্ধু, স্বাধীনতা-মন্ত্রের উদ্গাতা, ফ্রেঞ্চ রেভলুশনের কবি।

ষষ্ঠ মিউজ। ওঁর মতের ঠিক নেই, উনি প্রথমে রয়ালিস্ট ছিলেন।

জিউস। [আদেশের ভঙ্গিতে] তর্ক ক'র না ইরাটো।

ষষ্ঠ মিউজ চুপ করিল।

জিউস। [কবিগণকে] আপনাদের কারও যদি কিছু বলবার থাকে বলুন।

উপনিষদের ঋষি। যে অদ্বিতীয় প্রচ্ছন্নাভিপ্রায় পরম পুরুষ নানা শক্তিযোগে নানা বিষয়ের সৃষ্টি করেন, একমাত্র তিনিই এ বিরোধের অবসান করতে পারেন। সেই পরম পুরুষের প্রেরণা-লাভ সাধনা-সাপেক্ষ, সভা ক'রে তা হবে না।

জিউস। [সবিস্ময়ে] কি ক'রে জানলেন ?

উপনিষদের ঋষি। [দৃঢ় প্রতীতি সহকারে]—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

সকলে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল

জিউস। আর কেউ কিছু বলবেন ?

হোমার। আমি এ দায়িত্ব নিতে অক্ষম। আমার বক্তব্য আমি আমার কাব্যে ব'লে এসেছি, তার বেশি আমার আর বলবার কিছু নেই। মর্ত্ত্যবাসীরা আমাকে অন্ধ ক'রে দিয়েছিল, তাদের সংস্রবে যাওয়ার বাসনাও নেই আমার।

বাল্মীকি। মর্ত্ত্যের যে স্মৃতিটি কাঁটার মত আমার মর্ম্মমূলে বিঁধে আছে, সেটি সুখস্মৃতি নয়।

জিউস। কেন, কি হয়েছিল ?

বাল্মীকি। আমার সীতাকে স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করেছিলাম, তবু সে চিরদুখিনী, তবু তাকে পাতালপ্রবেশ করতে হ'ল। মর্ত্ত্যের ব্যাপারে লিপ্ত থাকতে অনুরোধ করবেন না আমাকে।

বেদব্যাস। কবিগুরু বাল্মীকি যে ভার নিতে পরাঙ্মুখ, আমি সে ভার নিতে যাব কোন সাহসে ? আমাকে ক্ষমা করুন আপনারা।

জিউস। কালিদাস ?

কালিদাস। [সকাতরে] পাত্রস্থ তৈল ও বর্ত্তিকা নিঃশেষ হ'লে উষাকালীন দীপশিখা যেরূপ নির্ব্বাণোন্মুখ হয়, আমারও সেই দশা, অন্ধকার বিদূরিত করবার সামর্থ্য নেই আমার।

ভার্জ্জিল। আমারও নেই। তাছাড়া আমার বিশ্বাস, মানুষ চিরকালই পৃথিবীতে মারামারি কাটাকাটি করবে, ওসব হট্টগোল থেকে দূরে স'রে থাকাই ভাল।

জিউস। এ ধারণা কেন হ'ল আপনার কবি ?

ভার্জিল। অভিজ্ঞতা থেকে।

জিউস। চণ্ডীদাস, আপনি ?

চণ্ডীদাস। প্রণয়-কলহ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার কলহের সমাধান করবার .কৌশল আমার জানা নেই।

বিদ্যাপতি। রাজা শিবসিংহ আর লছিমা দেবী যদি জীবিত থাকতেন, তা হ'লে তাঁদের সাহায্যে হয়তো আমি কিছু চেষ্টা করতে পারতাম। তাঁদের অবর্ত্তমানে মর্ত্ত্যের ব্যাপারে আমি অসহায়।

দান্তে। মর্ত্ত্যের ব্যাপারে আমার বহু অভিজ্ঞতা আছে। ঘিবেলাইনদের পক্ষ নিয়ে গুয়েলফ্‌দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে পোপ অষ্টম বনিফিসের কিছু পরিচয় পেয়েছি, বিয়াঞ্চি আর নেরিদেরও চিনি, নির্ব্বাসনে লর্ড অফ ভেরোনার বাড়িতে পরভৃতের মত সসঙ্কোচে বাস ক'রে এসেছি, গুইডো নোভেলের চাকরিও করেছি কিছুদিন; আমার ডি মনার্কিয়া বইখানাতে লীগ অফ নেশনের আভাস দিয়েছিলাম, সেখানা কার্ডিনাল পোল্‌গেট পুড়িয়ে দিয়েছে শুনেছি, এর পর আমার কাছ থেকে আর কি আশা করেন আপনারা ? আমার জীবনের যা আদর্শ, মর্ত্ত্যে তার কোন মূল্য নেই।

শেক্‌স্পিয়ার। মর্ত্ত্যের থিয়েটারে তার মূল্য আছে। আদর্শবাদী ব্রুটাস, আদর্শবাদী হ্যাম্‌লেট নিজেরা মরেছিল বটে, কিন্তু থিয়েটার খুব জমেছিল। কিন্তু আমার দল ভেঙে গেছে, থিয়েটারও আর আমি জমাতে পারব না।

ওমর খৈয়াম। আমারও সেই দশা। সেই সাকী, সেই সরাব, সেই গোলাপ সেই বুলবুল, সেই সরাইখানা কিছু নেই। হোটেল রেডিও সিনেমার যুগে আমি অচল।

জিউস। মহাকবি মিণ্টন ?

মিণ্টন। মর্ত্ত্যে আমার জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছিল কবিতা লিখে নয়, ক্রম্‌ওয়েলের চিঠির ল্যাটিন তর্জ্জমা ক'রে এবং ধর্ম্ম আর রাজনীতি নিয়ে প্যাম্‌ফ্লেট লিখে [হাসিলেন] সে সুখও অবশ্য বেশি দিন থাকে নি, প্রোটেক্-

টরেটের পর রেস্টোরেশন এসেছিল, হাতে হাতকড়ি পড়েছিল, জরিমানা দিতে হয়েছিল। [সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া] যেখানে বিবাহিতা স্ত্রী পালিয়ে যায়, মেয়ে বাপকে যন্ত্রণা দেয়, স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবার যুক্তি দেখিয়ে এরিওপ্যাজেটিকা লিখতে হয়, সেখানে—

Which way I flee is Hell, my self an Hell
And in the lowest deep a lower deep
Still threatening to devour me opens wide.

অভিভূত হইয়া থামিয়া গেলেন

গেটে। আমি এবার উঠি।

জিউস। এ বিষয়ে কিছু ব'লে যান।

গেটে [হাই তুলিয়া] আমি দার্শনিক স্পাইনোজার শিষ্য, আমি প্রকৃতির উপাসক। প্রকৃতি মানুষকে যে পথে নিয়ে চলেছে তাতে বাধা দেবার আমার প্রবৃত্তিও নেই, সামর্থ্যও নেই। [শেলীকে দেখাইয়া] এঁরা তরুণ, এঁরা হয়তো কিছু—

শেলী। আমি বর্ত্তমানে বাস করি না, আমি বাস করি ভবিষ্যতে। যে ঝ'ড়োহাওয়া শুষ্ক শীর্ণ পীত বিবর্ণ পাতার রাশিকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে ধ্বংসের মুখে, সেই ঝ'ড়ো হাওয়াই সঙ্গে সঙ্গে বপন ক'রে চলেছে নূতন সৃষ্টির বীজ। আমি ভবিষ্যতের শ্যামস্নিগ্ধ কোমল কিশলয়দের দেখতে পাচ্ছি। যুদ্ধ নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজনই নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে ভবিষ্যতে।

জিউস। [কীট্‌সকে] আপনিও কি কিছু করবেন না মর্ত্ত্যের জন্যে, যাকে এত ভালবাসতেন একদিন ?

কীট্‌স। ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিনখানা কি এখনও আছে মর্ত্ত্যে ?

জিউস। আছে।

কীট্‌স। তা হ'লে আমি মর্ত্ত্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না। আমি দূর থেকেই তার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকব।

হিউগো। সেই ভাল। আমি ওদের মুক্তির জন্যে কি না করেছি? নাটক, উপন্যাস, কাব্য, বক্তৃতা কিছু বাকি রাখিনি—কিন্তু ফল হয়েছে কি? আমার জীবনলেখক বলেছেন যে, আমার ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশন সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস থিয়েটারি উচ্ছ্বাস মাত্র! আমার আর প্রবৃত্তি নেই ওসবে।

জিউস। আপনারা সকলেই যদি অসম্মত হন, তা হ'লে আমাকে নিজের রাজকীয় ক্ষমতা ব্যবহার করতে হবে। [অ্যাপোলোকে] অ্যাপোলো, তোমার যাকে খুশি সভাপতি কর। দাও, ডায়াডেম পরিয়ে দাও।

ময়ূরের পক্ষবিধূনন-শব্দ শোনা গেল। ঝড়ের বেগে হীরা দেবী প্রবেশ করিলেন

জিউস। অ্যাপোলো, সভাপতি বরণ কর।

হীরা। না, করবে না। আমি আকাশের সম্রাজ্ঞী, আমার আদেশ ব্যতীত অ্যাপোলো কিছু করতে পারে না।

জিউস। বেশ, তুমিই আদেশ দাও।

হীরা। দেব না, এঁদের একজনকেও পছন্দ নয় আমার।

জিউস। একজনকেও না?

হীরা। [তীব্রকণ্ঠে] না না, কাউকে নয়। সার্ব্বজনীন উদার দৃষ্টি এঁদের কারও নেই। একজনের আছে জানি, কিন্তু তিনি—

সহসা চতুর্দ্দিক ইন্দ্রধনুবর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সপ্তাশ্ব-বাহিত হিরণ্ময় অরুণ-রথে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিলেন; সকলেই সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। অ্যাপোলো নির্নিমেষে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর নির্ভীক পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া তাঁহার মস্তকে লরেলের মুকুট পরাইয়া দিলেন। হীরা মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন, বাধা দিলেন না

রবীন্দ্রনাথ। [সবিস্ময়ে] এ কি, এখানেও সভা নাকি!

চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। তাহার পর সহসা এতগুলি বিখ্যাত কবিকে একত্রিত দেখিয়া বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং ক্ষণপরেই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া অভিজাত-সুলভ শ্রদ্ধাভরে সকলকে প্রণাম করিলেন।

যবনিকা

১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪৮

স্থান—মেয়েদের কলেজ-হস্টেলের একটি ঘর।

সময়—বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষ ভাগ।

তারিখ—১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪৮।

রাত্রি প্রায় দশটার কাছাকাছি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, গুরু গুরু গর্জ্জন শোনা যাইতেছে, কিন্তু এখনও বর্ষণ শুরু হয় নাই। বিদ্যাসাগরের মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে যে সান্ধ্য-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা সবেমাত্র ভাঙিয়াছে। চার পাঁচটি পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের মেয়ে কলরব করিতে করিতে ঘরটিতে প্রবেশ করিল। একজনের হাতে বিদ্যাসাগরের একখানি বাঁধানো ছবি। মেয়েগুলির সাজসজ্জা দেখিয়া মনে হয় না যে, তাহারা কোন গম্ভীর শোকসভা হইতে আসিতেছে, বরং মনে হয় তাহারা সিনেমা হইতে ফিরিল।

প্রথমা। বাবা বাবা বাবা! বিদ্যাসাগরের মৃত্যু-বার্ষিকী, নয় তো, আমাদের মৃত্যু-বার্ষিকী, একটা ফাঁড়া যেন!

দ্বিতীয়া। যা বলেছিস, বক্তৃতা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা! লোকগুলো বলতে আরম্ভ করলে আর থামতে চায় না।

তৃতীয়া। আজও আমার ডেন্‌টিস্টের কাছে যাওয়া হ'ল না, পরশুদিনই ফিলিংটা প'ড়ে গেছে, ভেতরে কিছু একটা ঢুকে গেলে আবার—। [সহসা চতুর্থাকে] তুই সেদিন মার্কেট থেকে এই শাড়িটা কিনলি বুঝি ?

চতুর্থা। হ্যাঁ।

প্রথমা। রংটা আর একটু 'সোবার' হ'লে ভাল হ'ত।

দ্বিতীয়া। [অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া] ও তো আর তোমার পছন্দ অনুসারে শাড়ি কিনবে না।

চতুর্থা। [ঈষৎ কোপভরে] তোমাদের খালি ওই এক চিন্তা!

পঞ্চমা। তাতে দোষটা কি, ভাবী স্বামীর পছন্দ অনুসারে চলাই তো ভাল।

দ্বিতীয়া। আচ্ছা, কি কেলেঙ্কারি করলে বল দেখি আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট! বলবার ক্ষমতা নেই যখন, বলতে ওঠা কেন, আমতা আমতা ক'রে, ঘেমে, ঢোঁক গিলে—ছি—ছি!

চতুর্থা। সত্যি! আর আমাকে শুধু শুধু এই ছবিটা নিয়ে যেতে বললে কেন বল তো? ওরা বেশ বড় সুন্দর ছবি এনেছিল, আমি শুধু শুধু ব'য়ে মলুম এটা।

তৃতীয়া। বেচারী!

পঞ্চমা। ল কলেজের ছেলেটি বেশ বললে কিন্তু।

প্রথমা। আমি শুনি নি।

পঞ্চমা। কানে আঙুল দিয়ে ছিলি নাকি?

প্রথমা। আমি শুধু দেখছিলাম তাকে।

দ্বিতীয়া। সত্যি, কি মিষ্টি দেখতে ছেলেটি!

তৃতীয়া। [চতুর্থাকে] তোর কিন্তু এমন ভাবে সেজেগুজে যাওয়াটা ঠিক হয় নি।

চতুর্থা। [ফোঁস করিয়া উঠিল] আহা, তবু যদি ওঁকে মাসে দুবার ক'রে না দেখতে আসত!

তৃতীয়া। [গালে হাত দিয়া] আমাকে মাসে দুবার ক'রে দেখতে আসে!

চতুর্থা। না এলে সেজেগুজে সিনেমাতে পার্টিতে যাওয়ার অত ঘটা কেন? আমরা যেন বুঝি না কিছু!

তৃতীয়া। যত সব বাজে কথা।

রোষভরে বাহির হইয়া গেল

প্রথমা। [চতুর্থাকে] তোর 'বেড পিল' আর আছে?

চতুর্থা। আছে।

প্রথমা। আমাকে দেতো ভাই একটা।

চতুর্থা টেবিলের উপর হইতে একটি ছোট লালরঙের কৌটা দিল

চতুর্থা। একটি মাত্রই আছে আর।

প্রথমা। যাই এবার, আমার চুল খুলতে বাকি এখনও। [দ্বিতীয়াকে] আয় না।

দ্বিতীয়া। যা না, আমি আসছি।

প্রথমা। না, আমার বড় ভয় ক'রে ভাই ওই বারান্দাটা দিয়ে একা যেতে, ওখানকার বাল্‌বটাও আবার ফিউজ হয়ে গেছে।

চতুর্থা। বুড়ো ধাড়ি মেয়ে একথা বলতে লজ্জা করে না ?

প্রথমা। নিজে যা সাহসী, তা জানা আছে। সেদিন একটা কালো বেড়াল দেখে আঁতকে উঠেছিলেন।

চতুর্থা। বেড়াল দেখে আঁতকে উঠতে পারি, তোমাদের মত ভূতের ভয় আমার নেই।

প্রথমা। মিথ্যুক কোথাকার ! [পঞ্চমাকে] তবে তুই আয়।

পঞ্চমা। চল. একে—একটা কথা ব'লে যাই থাম,

চতুর্থার কানে কানে কি যেন বলিল, উভয়েই একটু হাসিল

প্রথমা। তোদের ফুসফুস-গুজগুজের আর অন্ত নেই !

পঞ্চমা। চল এইবার।

পঞ্চমা ও প্রথমা বাহির হইয়া গেল

দ্বিতীয়া। আমাকে এইবার নোটটা দে ভাই, যাই। মেঘ করেছে বৃষ্টি নামবে বোধ হয়, আমার দিকের জানালা আবার খোলা আছে।

চতুর্থা। এই যে দিই, খুঁজতে হবে একটু ।

দ্বিতীয়া। ছবিখানা নিয়ে ঘুরছিস কেন, টাঙিয়ে রাখ না। পেরেকের খোঁচ-টোঁচ লেগে অমন সুন্দর শাড়িখানা ছিঁড়ে যাবে আবার ! কত পছন্দ ক'রে কিনে দিয়েছেন ভদ্রলোক।

চতুর্থা শেলফে 'নোট' খুঁজিতেছিল, এই কথায় ঘাড় ফিরাইয়া মুচকি হাসিল

দ্বিতীয়া। বাঁ দিকের ওই কোণের দিকে বসেছিলেন তো? দেখেছি আমি।

চতুর্থী একটি খাতা আনিয়া দ্বিতীয়াকে দিল। আকাশের গুরুগুরু গর্জ্জন স্পষ্টতর হইয়া উঠিল

দ্বিতীয়া। [সচকিত] আমি যাই। সত্যি, তোর সাহস আছে বলতে হবে, আমি মরে গেলেও এই সিংগল-সীটেড রুমে থাকতে পারতাম না।

দ্বিতীয়া চলিয়া গেল। চতুর্থী তখন বিদ্যাসাগরের ছবিটি যথাস্থানে টাঙাইয়া রাখিল। ক্ষণকাল ছবিটির পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর কি ভাবিয়া একটি প্রণাম করিল। তাহার পর গুনগুন করিয়া গান করিতে করিতে আয়নার সম্মুখে গিয়া পোষাকী ঝুমকো হার প্রভৃতি গহনাগুলি খুলিয়া রাখিতে লাগিল। নিঃশব্দচরণে বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। আয়নায় ছায়া পড়িতেই মেয়েটি ফিরিয়া দেখিল এবং বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল

মেয়েটি। কে আপনি?

বিদ্যাসাগর নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন

কে আপনি?

বিদ্যাসাগর। ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দিকি, চিনতে পার কি না।

মেয়েটি চিনিবার চেষ্টা করিল

মেয়েটি। কই না, চিনতে পারছি না

বিদ্যাসাগর। তবে চললুম।

গমনোদ্যত

মেয়েটি। [আদেশের ভঙ্গিতে] দাঁড়ান।

বিদ্যাসাগর ফিরিলেন

বিদ্যাসাগর। কি?

মেয়েটি। আপনি রাত্রে এখানে এলেন কি ক'রে?

বিদ্যাসাগর। বিনা নিমন্ত্রণে সাধারণত আমি কোথাও যাই না। তোমরা আজ আমাকে স্মরণ করেছিলে তাই এসেছিলাম, তাড়িয়ে দিচ্ছ, চ'লে যাচ্ছি।

মেয়েটি। আপনাকে স্মরণ করেছিলাম!

বিদ্যাসাগর। অন্তত খবরের কাগজে তাই বিজ্ঞাপিত হয়েছে।

অস্বস্তিকর সত্যটা সহসা মেয়েটার চেতনায় প্রতিভাত হইল। সে দেওয়ালের ছবিটার দিকে চাহিয়া আবার বিদ্যাসাগরের মুখের দিকে চাহিল। বিদ্যাসাগর হাসিলেন

মনে হচ্ছে, যেন চিনেছ চিনেছ।

মেয়েটি। [রুদ্ধশ্বাসে] আপনি কি—?

বিদ্যাসাগর। [হাসিয়া] এখনই যে বড় বড়াই করছিলে, ভূতের ভয় নেই তোমার!

মেয়েটি ভয়ে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল

ভয় পেও না, কোন ভয় নেই তোমার, আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হবে না।

মেয়েটি। [সবিস্ময়ে] আপনি বিদ্যাসাগর!

বিদ্যাসাগর। এতক্ষণে চিনতে পারলে যা হোক তবু।

মেয়েটি। আপনি ভূত হয়ে আছেন!

বিদ্যাসাগর। বর্ত্তমান যে নই, তার প্রমাণ তো তুমিই এখনই দিলে। সামনে এসে দাঁড়ালাম, তবু চিনতে পারলে না। চিনতে যদি বা পারলে, এখনও ভয় খাচ্ছ মনে মনে। তোমার সঙ্গে তুটো কথা কইতে এসেছিলাম, তা আর হ'ল না দেখছি। [একটু থামিয়া] আমার জন্যে আজ সন্ধ্যে থেকে অনেক কষ্ট পেয়েছ, শোও এবার, অনেক রাত হয়েছে।

মেয়েটি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল

যাও, শোও গিয়ে। সকালে উঠে ভেবো, রাত্রে একটা ভূতের স্বপ্ন দেখেছিলে।

হাসিলেন

মেয়েটি। আপনার কথা শুনে আপনাকে কিন্তু আর ভয় করছে না আমার। ঠিক মনে হচ্ছে আপনি যেন বেঁচে আছেন।

বিদ্যাসাগর। বেঁচে আছি বই কি—[হাসিয়া] জীবন-চরিতের পাতায়। আমার কথা থাক, আর ভয় করছে না যখন, তোমার কথাই একটু বল শুনি। কোন্ শ্রেণীতে পড় তুমি ?

মেয়েটি। আমি এম. এ. পড়ি।

বিদ্যাসাগর। এম. এ. পড় ! বাঃ বাঃ, বড় সুখী হলাম। চন্দ্রমুখী যখন এম. এ. পাস করেছিল, তখন ভারী আহ্লাদ হয়েছিল আমার, তাকে একখণ্ড শেক্স্পীয়রের গ্রন্থাবলী উপহার দিয়েছিলাম। তোমার কিন্তু এখনও বিবাহ হয় নি, নয় ?

মেয়েটি। না।

বিদ্যাসাগর। কেন, এখনও বিবাহ হয় নি কেন ?

মেয়েটি। আপনি এ কথা বলছেন ! আপনিই তো বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন শুনতে পাই।

বিদ্যাসাগর। আমাদের কালে বড্ড কচি কচি শিশুদের বিয়ে হ'ত যে ! তাই তার বিরুদ্ধে লেগেছিলাম। তা ব'লে সময়ে বিয়ে করবে না ? এত এত লেখাপড়া শিখে লাভ কি, যদি তোমরা দেশকে সু-সন্তান না দিতে পার ?

মেয়েটি। [মুচকি হাসিয়া] কেন চাকরি করব।

বিদ্যাসাগর। চাকরি করবে ! কেন ?

মেয়েটি। স্বাধীনভাবে থাকতে পারব। সামান্য টাকার জন্য স্বামীর কিংবা আর কারও মুখ চেয়ে থাকা অপমানকর।

বিদ্যাসাগর। ইস্কুলের সেক্রেটারি বা হাসপাতালের ডাক্তারের মন যুগিয়ে চলাটা কম অপমানকর মনে হয় বুঝি তোমাদের কাছে ? তা হবে। কিন্তু কই, তোমাদের মুখে প্রসন্নতা তো দেখতে পাচ্ছি না ! আজ দেখলাম, দলে দলে মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারও সীমন্তে সিঁদুর নেই, অথচ সকলেই প্রায় যৌবনের শেষ সীমায় উপনীত আর সকলেই বিষণ্ণ মুখ। বাইরে হাসিখুশি বটে, কিন্তু বিষাদের ছাপটি ঢাকা পড়ে নি। বিধবাদের এই দুঃখ ছিল ব'লেই

তো সর্ব্বস্ব পণ ক'রে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলাম আমি। কিন্তু এখন দেখছি, বিধবা-বিবাহ তো চললই না, কুমারীদের পর্য্যন্ত বিয়ে হওয়া দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। সেই কথাটি জানবার জন্যেই তোমার কাছে এসেছি আজ। এমন সুন্দর চেহারা তোমার, বিয়ে হয় নি কেন বল তো ?

মেয়েটি। [অনুযোগভরে] পাত্রই জোটে না, বিয়ে হবে কি ক'রে ?

বিদ্যাসাগর। কেন, দেশে পুরুষ নেই ?

মেয়েটি। ভাল পাত্র বড় বেশি পণ চায়। আমার বাবা গরীব মানুষ, কোথা পাবেন অত টাকা ?

বিদ্যাসাগর। [সবিস্ময়ে] গরিবের মেয়ে বুঝি তুমি ! ও বাবা, তোমার সাজসজ্জা দেখে ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি বা কোন রাজারাজড়ার মেয়ে !

মেয়েটি একটু অপ্রতিভ হইল

মেয়েটি। এসব বাইরেই এমনই ঝকমকে দেখতে, দাম খুব বেশি নয়। এই দেখুন না, এই জর্জেটখানার দাম মাত্র দশ টাকা।

বিদ্যাসাগর। তাও তো খুব কম নয় মা। আমার বাবার মাসিক বেতন ছিল দশ টাকা, তাই দিয়ে সংসার চালাতে হ'ত তাঁকে। তোমার বাবার মাইনে কত ?

মেয়েটি। দেড়শো।

বিদ্যাসাগর। তা হ'লে তো বেশ মোটা মাইনে। তবু তোমার জন্যে একটি বর যোগাড় করতে পারেন নি তিনি !

মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল

বেশ তো, তিনি না পেরেছেন, না পেরেছেন, তুমি তো সাবালিকা হয়েছ, তুমি নিজেই পছন্দ ক'রে বিয়ে কর না কাউকে।

মেয়েটি। [ওষ্ঠভঙ্গি করিয়া] সব অপদার্থের দল, কাকে পছন্দ করব বলুন ?

বিদ্যাসাগর। ঠিক বলেছ, তাই দেখছি, সব অপদার্থ। [একটু পরে] কিন্তু দেখ, এর জন্যে তোমরাই দায়ী।

মেয়েটি। [সবিস্ময়ে] আমরা দায়ী?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, তোমরাই। নারীর মনের কামনাই তো পুরুষের চরিত্র গঠন করে। তোমরা তো আজকাল পুরুষের চরিত্রে বীরত্ব মনুষ্যত্ব এসব কামনা করছ না, তোমরা কামনা করছ পুরুষ চাকরি ক'রে হোক, চুরি ক'রে হোক, যেমন ক'রে হোক রাশি রাশি টাকা রোজগার ক'রে আনুক, আর তোমরা তাই দিয়ে দিব্যি গাড়ি-বাড়ি গয়না কর। তোমাদের কামনা অনুসারে তাই দেশ জুড়ে চাকর আর চোরের সৃষ্টি হয়েছে। এখন আফশোস করলে কি হবে বল? তোমরা যেদিন দারিদ্র্যকে তুচ্ছ ক'রে মনুষ্যত্বকে বরণ করতে প্রস্তুত হবে, সেদিন আবার এই কাপুরুষদের ভেতরই সত্যিকার মানুষ দেখা দেবে। [সহসা] আচ্ছা, তোমাদের এমন মতিচ্ছন্ন হ'ল কবে থেকে বল দিকি? আগে মেয়েরা কামনা করত, শিবের মত স্বামী হোক—যে শিব নগ্ন দরিদ্র, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় নীলকণ্ঠ—

মেয়েটির আত্মসম্মানে একটু আঘাত লাগিল

মেয়েটি। আমাদের দেশে ভাল ছেলে যে নেই তা নয়, এমন ভাল ছেলে আছে যারা মহৎ আদর্শের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে।

বিদ্যাসাগর। [সোল্লাসে] এই তো চাই! ওদের মধ্যেই একজনকে পছন্দ কর না।

মেয়েটি হাসিয়া ফেলিল

বিদ্যাসাগর। ও, পছন্দ ক'রে রেখেছ বুঝি একজনকে?

মেয়েটি। শুধু আমার পছন্দ হ'লেই তো চলবে না।

বিদ্যাসাগর। আবার কার পছন্দ চাই?

মেয়েটি। বাপ-মার, সমাজের।

বিদ্যাসাগর। ভাল ছেলেকে বিয়ে করলে বাধা দেবেন তাঁরা ?

মেয়েটি। দেবেন, যদি—

বিদ্যাসাগর। এদেশ এখনও বদলায় নি দেখছি। বাধা মানবে কেন তুমি, লেখাপড়া শিখছ কেন তবে ? আলোর কাছে অন্ধকার টিকতে পারে কখনও ? বিধবা-বিবাহেও সমাজ বাধা দিয়েছিল, সে বাধা কি আমি মেনেছিলুম ?

মেয়েটি। তা হ'লে আপনি বিদ্রোহ করতে বলছেন ?

বিদ্যাসাগর। নিশ্চয়।

মেয়েটির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল

মেয়েটি। [একটু ইতস্তত করিয়া, সহসা] চেহারা দেখবেন তার, আমার কাছে ফটো আছে, নিয়ে আসি দাঁড়ান।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মেয়েটি ছুটিয়া গিয়া ঘরের কোণে রক্ষিত তোরঙ্গের নিকট হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং তোরঙ্গ খুলিতে লাগিল। বিদ্যাসাগর নিঃশব্দচরণে বাহির হইয়া গেলেন। মেয়েটি ফোটো বাহির করিয়া আনিল

মেয়েটি। কই, কোথায় গেলেন আপনি— ?

বাহিরে মেঘের গুরুগুরু শব্দ শোনা যাইতে লাগিল

যবনিকা



বনফুল

রচনাবলী ০৭